



বাংলা

হায়াতুল হায়াওয়ান

১

আল্লামা কামাল উদ্দীন দামেরী রহ.





ভাষান্তর

মাওলানা রুহুল আমীন

হায়াতুল হায়ওয়ান

বাংলা

(প্রথম খণ্ড)

মূল

ইমাম কামাল উদ্দীন মুহাম্মদ দামিরী (রহঃ)

অনুবাদ

মাওলানা রূহুল আমীন

মাষ্টার্স : ইসলামিক ষ্টাডিজ, কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

সম্পাদনায়

রিজওয়ান জমীরাবাদী

ফাজেলে জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম

প্রকাশনায়

জাবালে নূর প্রকাশন

ইসলামী টাওয়ার ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

হায়াতুল হায়ওয়ান বাংলা
(প্রথম খণ্ড)

মূল
ইমাম কামাল উদ্দীন মুহাম্মদ দামিরী (রহঃ)

অনুবাদ
মাওলানা রূহুল আমীন
মাষ্টার্স : ইসলামিক ষ্টাডিজ, কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

সম্পাদনায়
রিজওয়ান জমীরাবাদী
ফাজেলে জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম

(প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত)

প্রথম প্রকাশ ঃ নভেম্বর - ২০০৯ইং

মূল্য ঃ ৩২০.০০ টাকা মাত্র

প্রকশনায়
জাবালে নূর প্রকাশন
ইসলামী টাওয়ার ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

সূচীপত্র

হায়াতুল হায়ওয়ান বাংলা প্রথম খন্ড

অনুবাদকের কথা ২১

প্রকাশকের কথা ২২

আল্লামা দামীরী (রহঃ) এর সংক্ষিপ্ত জবনালোচনা ২৩

باب الالف

اَسَدٌ

সিংহ ২৪

সিংহের কতিপয় নাম নিম্নে উল্লেখ করা হল ২৪

সিংহের নাম সর্বপ্রথমে বর্ণনা করার কারণ ২৪

সিংহের বিভিন্ন প্রকার ২৫

সিংহের বৈশিষ্টাবলী ২৫

মহানবী (সাঃ) এর হাদীছে সিংহের বর্ণনা ২৭

হযরত সফীনা (রাঃ) এর ঘটনা ২৮

উৎবা ইবনে আবু লাহাবের জন্য নবী করিম (সাঃ) এর বদ দেয়া ২৯

সংক্রমনের ফেকহী মাসায়েল ৩১

নবী করিম (সাঃ) এর যুগের এক ঘটনা ৩২

সিংহের ভয় থেকে নিরাপদ থাকার দোয়া ৩৩

হযরত দানিয়াল (আঃ) এর ঘটনা ৩৩

হযরত দানিয়াল (আঃ) এর সময় কাল ৩৫

ইব্রাহী ইবনে আদহামের (রঃ)উপদেশ ৩৬

ঝাড়-ফুঁক ৩৬

জনৈক বাদশাহ এবং তার তাওবা ৩৭

হযরত নূহ (আঃ) এর একটি ঘটনা ৩৯

আবু মুসলিম খুরাসানীর ঘটনাসমূহ ৪০

আবু মুসিলম খুরাসানী সম্পর্কিত আরো কিছু বিষয় ৪৪

খলিফা মনসুরের একটি সুন্দর জবাব ৪৫

সিংহের শরয়ী বিধান ৪৬

কবি ফারাজদাকের প্রখ্যাত কবিতা	৪৯
কবি ফারাজদাকের পরিচয়	৫৩
চিকিৎসায় সিংহের উপকারিতা এবং তার কতিপয় বৈশিষ্ট	৫৫
কালাম শাস্ত্রের উপকারিতা	৬২
একত্ববাদের প্রকৃত সংজ্ঞা	৬৪
জ্যোতিষ শাস্ত্র	৬৬

الابل

(২) উট	৬৮
উটের কতিপয় বৈশিষ্ট	৬৯
হাদীছে উটের আলোচনা	৭০
উটের বিভিন্ন প্রকার	৭১
গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়	৭২
উটের স্বভাব ও চরিত্র	৭৩
উটের শরয়ী হুকুম	৭৫
উটের যাকাতের বিভিন্ন মাসআলা	৭৬
উট সম্পর্কে প্রবাদ ও উদাহরণ	৭৭

ابابيل

(৩) আবাবীল পাখী	৭৯

اتان

(৪) গাধী	৮১

اخطب

(৫) গাধা বিশেষ	৮৫

أُخَيْضِر

(৬) এক ধরনের মৌমাছি	৮৫

اخيل

(৭) ছোট আকারের পাখী বিশেষ	৮৫

اربد

(৮) বিষধর সাপ বিশেষ	৮৬

ارخ

(৯) নীল গাই	৮৭

ارضة

(১০) ঘুন পোকা ৮৭
ঘুন পোকার বৈশিষ্ট ৮৮

ارقم

(১১) গোখরা সাপ ৯০

ارنب

(১২) খরগোস ৯১
খরগোসের কতিপয় বৈশিষ্ট ৯২
বিচারপতি সুরাইহ এর জীবন কথা ৯৬
চিকিৎসা ক্ষেত্রে খরগোসের উপকারীতা ৯৮

ارنب بحرى

(১৩) সামুদ্রিক খরগোস ১০০

اروية

(১৪) পাহাড়ী বকরী ১০১
হাদীছে পাহাড়ী বকরীর আলোচনা ১০১
পাহাড়ী বকরীর কতিপয় গুণাগুন ১০৩

اساريع

(১৫) গুয়া পোকা ১০৫

اسفع

(১৬) চিল ১০৭

الاسقنقور

(১৭) টিকটিকি সাদৃশ এক প্রকার প্রাণী ১০৭

اسود سالخ

(১৮) কাল সাপ ১০৮
ছদকাহ আপদ-বিপদ দূর করে ১১০

اصرمان

(১৯) কাক ও বাজ্র ১১১

اصلة

(২০) অতি বিষাক্ত সাপ বিশেষ ১১২
দজ্জাল চিহ্নিত করা ১১৩

اطلس

(২১) কাল রং এর নেকড়ে ১১৩

اطوم

(২২) সামুদ্রিক কচ্ছপ ১১৪

اطيش

(২৩) পাখী বিশেষ ১১৪

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) ১১৫

الاغثر

(২৪) জলজ পাখী ১১৬

الافال والافائل

(২৫) উটে বাচ্চা ১১৬

الافعى

(২৬) সর্প ১১৭

দৃষ্টান্ত ও প্রবাদ ১২০

শেখ সালেহ এর হত্যাঘটনা ১২৩

সালেহ বিন আব্দুল কুদ্দুস ১২৩

افعوان

(২৭) পুরুষ সাপ ১২৪

নাজ্জারের ছেলেদের বুদ্ধিমত্তা ১৩১

ইবনুত তিলমীয সম্পর্কে আলোচনা ১৩৫

الاقهبان

(২৮) হাতী ও মহিষ ১৩৯

الاملول

(২৯) প্রাণী বিশেষ ১৩৪

الانس

(৩০) মানুষ ১৩৪

الانسان

(৩১) মানুষ ১৪০

সাবের ও শাকের তথা ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ পরায়ন ১৪৩

দৈনন্দিন আমল ও ওযীফা ১৪৫

ইবাদতে প্রশান্তি ও বিভিন্ন বিষয়ে বরকতের জন্য ১৪৬

নবী করীম (সাঃ) এর দর্শন লাভ ১৪৬

ঈমান রক্ষা ১৪৭
নেক অভ্যাসসমূহ ১৪৭
ইসমে আযম কোনটি ? ১৪৮
যাদের দোয়া কবুল হয়ে থাকে ১৫০
দোয়া-দরূদ ওজিফা ১৫০
জীবনে উন্নতি ও রিযিক বৃদ্ধির জন্য ১৫১
তার পর এই দোয়া ১৫১
অন্ধকার থেকে বাঁচার জন্য ১৫১
বিশেষ বৈশিষ্ট ও ওজীফা ১৫১
অগ্রগতি উন্নতি ও রিযিকের জন্য আরো কতিপয় আমল ১৫২
দুশ্চিন্তা ও ভয়-ভীতি থেকে বাঁচার জন্য ১৫২
আসমানের দরজা খোলার জন্য ১৫২
দুশ্চিন্তা থেকে নিরাপদ হওয়ার আমল ১৫৩
রোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার আমল ১৫৩
বিপদাপদে ছাওয়াব অর্জন করার আমল ১৫৩
ঋণ পরিশোধ করতে পারার আমল ১৫৪
কিয়ামত দিবসে অধিক পিপাসা থেকে মুক্তি ১৫৫
ঋণ পরিশোধের জন্য আরেকটি আমল ১৫৬
বিপদাপদ থেকে বাঁচার আমল ১৫৭
জালিম সম্প্রদায় থেকে বাঁচার আমল ১৫৭
রাষ্ট্রপরিচালকে ভয় থেকে বাঁচার জন্য ১৫৭
ইসলামের উপর অবিচল থাকার জন্য ১৫৮
কল্যাণ ও বরকতের আমল ১৫৮
ব্যবসা-বানিজ্যে উন্নতি অগ্রগতির আমল ১৫৮
সহজ মৃত্যু এবং নিরাপদের আমল ১৫৯
মাথা ব্যথা উপশমের আমল ১৫৯
আরেকটি পরীক্ষিত আমল ১৬০
আরেকটি আমল ১৬০
বন্ধুত্ব পরিচয় করার উপায় ১৬৬
রমনীকে স্বপ্নে দেখা ১৬৭

(৩২) সমূদ্রের মানুষ ১৭১

الانقد

(৩৩) সজারু ১৭১

মাড়রি ব্যথার জন্য তাবিজ ১৭২

الانكليس

(৩৪) বাইঙ্গ মাছ ১৭৪

الانن

(৩৫) পায়রার ন্যায় পাখী বিশেষ ১৭৫

الانيس

(২৬) জলজ পাখী ১৭৫

الانوق

(৩৭) ঈগল ১৭৬

ইমাম সুহাইলী (রহঃ) এর জীবনী ১৭৮

الاوزة

(৩৮) বড় হাঁস বা জল কুক্কুট (মাছরাঙ্গ) ১৮০

আবু নাওয়াস সম্পর্কে কিছু কথা ১৮০

রাজ হাসের কতিপয় বৈশিষ্ট ১৮২

হযরত আলী (রাঃ) এর শাহাদাত বরণ ১৮৩

হযরত আলী (রাঃ) এর পবিত্র সমাধি ১৮৬

নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর জীবন চরিত ১৮৫

প্রথম খলিফা - হযরত আবু বকর (রাঃ) ১৮৮

হযরত আবুবকরের ইন্তিকাল ও খেলাফতের সময়সীমা ১৯২

হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) এর খেলাফত ১৯২

হযরত ওমর (রাঃ) এর প্রসিদ্ধ কাজসমূহ ১৯৩

একটি বিস্ময়কর ঘটনা ১৯৬

হযরত ওমর (রাঃ) এর কিছু উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড ১৯৯

দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর (রাঃ) এর শাহাদাত ২০০

শাহাদাতের তারিখ ও খেলাফত কাল ২০১

তৃতীয় খলীফা হযরত উছমান গণী (রাঃ) এর খেলাফত ২০২

তাঁর উল্লেখযোগ্য কার্যাদী ২০৩

হযরত উছমানের (রাঃ) গুণাবলী ২০৪

মতানৈক্য ও ঝগড়ার উৎপত্তি ২০৫

অবরোধ কালে হযরত আলী (রাঃ) এর সাহায্য ২০৭

হযরত উছমান (রাঃ) এর প্রতি আক্রমণ ২০৭

শাহাদাত বরনের তারিখ ২০৮

হযরত ওছমানের (রাঃ) খেলাফতকাল ২০৯

চতুর্থ খলীফ হযরত আলী ইবনে আবি তালিবের (রাঃ) খেলাফত ২০৯

মায়ের গর্ভ থেকে খতনাসহ জন্মগ্রহণকারী কয়েকজন পয়গাম্বর ২১০

হুযূরে পাক (সাঃ) এর ওহী লেখকগণ ২১১

নবুয়াতের ইতিহাস সংরক্ষণকারী সাহাবায়ে কেরাম ২১১

হুযূর (সাঃ) এর দেহরক্ষীগণ ২১১

নবুওয়াত যুগে সম্মানিত ফক্বীহ সাহাবা (রাঃ) গণ ২১২

মদীনা মুনাওয়ারার সম্মানিত মুফতী তাবেয়ীগণ ২১২

দুষ্কপান অবস্থাতে যারা কথা বলেছেন ২১২

মৃত্যুর পরেও যারা কথা বলেছিলেন ২১২

মায়ের গর্ভে নির্ধারিত সময়ের অতিরিক্ত অবস্থানকারীগণ ২১৩

নমুরুদ নামে যারা বাদশাহ ছিলো ২১৩

চার মাযহাবের ইমামগণ ২১৩

সম্মানিত মুহাদ্দিসীনে কেরাম ২১৪

হযরত আলী (রাঃ) এর কাছে জনসাধারণের বাইয়াত ২১৪

হযরত আলী (রাঃ) এর ব্যাপারে হযরত উমর (রাঃ) এর পরামর্শ ২১৫

হযরত আলী (রাঃ) এর আখলাক ও কৃতিত্ব ২১৫

তাঁর বয়স এবং খেলাফত কাল ২১৭

ইবনে আলী (রাঃ) হযরত হাসান (রাঃ) এর খেলাফত

হযরত হাসান বিন আলীকে (রাঃ) কে বিষ প্রয়োগ ২২০

তাঁর ইন্তিকালের তারিখ ২২১

হযরত হাসানের (রাঃ) খেলাফতকাল ২২১

হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ) এর খেলাফত ২২১

হযরত মোয়াবিয়ার শারীরিক গঠন ও তাঁর বংশ ২২২

হযরত মোয়াবিয়ার (রাঃ) ইন্তিকাল এবং খেলাফতকাল ২২৪

ইয়াজিদ ইবনে মোয়াবিয়ার খেলাফত ২২৪

হযরত হোসাইন (রাঃ) এর হত্যাকরী কে ছিল ২২৫

ইয়াজিদের ছেলে মোয়াবিয়ার শাসন	২২৯
মোয়াবিয়া ইবনে ইয়াজিদের মৃত্যু তারিখ	২৩২
মারওয়ান ইবনে হাকামের খেলাফত	২৩২
মরওয়ানের খেলাফতকাল	২৩৩
মরওয়ানের ছেলে আব্দুল মালেক এর খেলাফত	২৩৩
রোমের বাদশাহর পক্ষ থেকে আব্দুল মালেকের নামে পত্র	২৩৫
আব্দুল মালেকের পক্ষ থেকে এ পত্রের জবাব	২৩৬
মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে হোসাইন এর পরামর্শ	২৩৭
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাঃ)	২৩৯
জনৈক মনোবিজ্ঞানীর ভবিষ্যদ্বানী	২৪০
আব্দুল্লাহ ইবেন যুবাইর এর খেলাফত	২৪২
আব্দুল্লাহ বিন জুবায়েরের খেলাফতকাল	২৪৩
ওয়ালিদ ইবনে আব্দুল মালেকের খেলাফত	২৪৪
ওয়ালীদের বিজয়াভিযানসমূহ	২৪৫
সুলাইমান ইবনে আব্দুল মালেকের খেলাফত	২৪৬
উত্তম চরিত্রের নিদর্শন	৩৪৬
সুলায়মান ইবনে আব্দুল মালেকের কৃতিত্ব	২৪৭
সুলায়মানের ইন্তিকাল ও তার শাসনকাল	২৪৯
হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ (রাঃ) এর খেলাফত	২৫০
খলীফা ওমর বিন আব্দুল আজীজের জবাব	২৫৫
ওমর ইবনে আব্দুল আজীজের (রহঃ) চরিত্র ও কৃতিত্ব	২৫৭
ওমর ইবনে আব্দুল আজীজের ইন্তিকাল	২৫৯
ইয়াজিদ ইবনে আব্দুল মালেকের শাসনকাল	২৬০
হিশাম ইবনে আব্দুল মালেকের শাসন	২৬২
ওলীদ ইবনে ইয়াজিদ ইবনে আব্দুল মালেক এর শাসনামল	২৬৩
ইয়াজিদ ইবনে ওয়ালীদ ইবনে আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ানের শাসনামল	২৬৬
ইব্রাহীম ইবনে ওয়ালীদের খেলাফত	২৬৮
মারওয়ান ইবনে মুহাম্মদের শাসনামল	২৬৮
আব্বাসীয় খেলাফত	
খলীফা আবুল আব্বাস সাফফাহ	২৬৯

আবু জাফর মানসুরের খেলাফত ২৭০
মাহদীর খেলাফতামল ২৭২
মুসা আল মাহদীর খেলাফত ২৭২
হারুনুর রশীদের শাসনকাল ২৭৩
হারুনুর রশীদের উদারতার একটি ঘটনা ২৭৪
আহমদ আমীনের শাসনামল ২৭৫
ইমাম আসমায়ী কর্তৃক মামুন ও আমীনের সাক্ষাৎকার ২৭৭
মামুনুর রশীদের জন্মের ঘটনা ২৭৮
আমিনের পরলোকগমন ও খেলাফত ২৭৯
আব্দুল্লাহ আল মামুনের শাসনামল ২৮০
ইব্রাহীম আল মু'তাসিম এর শাসনামল ২৮১
ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) এর স্বপ্ন ২৮৬
মহত্মনা ইমাম আহমদ (রহঃ) ২৮৭
ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের পরিচয় ২৮৮
হারুন ওয়াসিক বিল্লাহর শাসনামল ২৯০
কোরআন সৃষ্টি হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে আলোচনা ২৯১
যৌন শক্তি বৃদ্ধিকারক ঔষধ ২৯৫
জাফর মুতাওয়াক্কিলের শাসন কাল ২৯৭
মুনতাসির বিল্লাহর শাসনামল ৩০০
মুস্তাঈন বিল্লাহর শাসনামল ৩০১
মুহাম্মদ মা'তাজ বিল্লাহ ইবনে মুতাওযাক্কিলের শাসন ৩০৬
জাফর মুহতাদি বিল্লাহ ইবনে হারুনের শাসনকাল ৩০৬
একটি তর্ক-বিতর্ক অনুষ্ঠান ৩০৮
আহমদ মু'তাযিদ ইবনে মাওফিক এর শাসনকাল ৩১৪
আলী মুকতাফী বিল্লাহ ইবনে মু'তাযিদ এর শাসনকাল ৩১৪
আবুল ফজল জাফর মুক্তাদির বিল্লাহর শাসনকাল ৩১৫
মোহাম্মদ কাহের বিল্লাহ প্রমুখের শাসনামল ৩২০
আহমদ রাজি বিল্লাহ ইবনে মুক্তাদির বিল্লাহর শাসনকাল ৩২১
ইব্রাহীম মুক্তাফীর শাসনামল ৩২৩
আবু বকর আব্দুল করিম আত্তায়ি লিল্লাহর শাসনকাল ৩২৬
আহমদ কাদির বিল্লাহ ইবনে ইছহাকের শাসন কাল ৩৩১

আবু মনসুর জাফর রাশেদ বিল্লাহর শাসন	৩৩৫
মুত্তাজি বিনূরিল্লাহ ইবনে মুক্তানজিদ বিল্লাহর খেলাফত	৩৩৮
জাহের বি আমরিল্লাহ ইবনে নাসিরুদ্দীনিল্লাহর খেলাফত	৩৪০
জাহের বি আমরিল্লাহর জীবন চরিত	৩৪০
মুক্তানছির বিল্লাহর জীবন চরিত	৩৪১
মুক্তাছিম বিল্লাহর শাসনকাল	৩৪৩
হাকিম বি আমরিল্লাহর খেলাফত	৩৪৫
মু'তাযিদ বিল্লাহর খেলাফত	৩৪৬
মুতাওয়াক্কিল আলাল্লাহর খেলাফত	৩৪৬
মুক্তাঈন বিল্লাহের খেলাফত	৩৪৬
বন্ধু -বান্ধব ও নিকটজনদের প্রতি উপদেশ	৩৪৯
মুতাযিদ বিল্লাহ আবুল ফাতাহ দাউদ এর খেলাফত	৩৫৪
মুক্তাকফী বিল্লাহর খেলাফত	৩৫৫
উবায়দী বংশ	৩৫৬
অপরাধির পরিচয় করা একটি নিয়ম	৩৬১
الالفة	
(৩৯) বাঘিনী	৩৬৩
الالق	
(৪০) নেকড়ে বাঘ	৩৬৩
الاودع	
(৪১) জংগলী ইঁদুর	৩৬৩
الاورق	
(৪২) মেটে রং এর উট	৩৬৩
الاوس	
(৪৩) বাঘ	৩৬৪
ওয়েস করণী (রহ.)	৩৬৫
الايلس	
(৪৪) বড় মাছ	৩৬৬
الايم والاين	
(৪৫) সাপ	৩৬৬
الايّل	

(৪৬) বারো শিংগা ৩৬৭
এরিষ্টটলের দর্শন ৩৬৮
ইমাম যুজাযী ৩৭০
ইমাম আল জাওয়ালিকী ৩৭১
ابن اوى
(৪৭) বাগডাস ৩৭২

باب الباء

البابوس
(৪৮) মানব শিশু ৩৭৪
البازىَ
(৪৯) বাজ পাখী ৩৭৪
আব্দুল্লা ইবনে মুবারক ৩৭৬
বাদশাহ হারুনুর রশীদের ঘটনা ৩৭৬
একটি উপদেশ মূলক কাহিনী ৩৮১
الباذل
(৫০) উট ৩৮২
الباقعه
(৫১) বুদ্ধিমান মানুষ ৩৮৬
بالام
(৫২) মাছ ৩৮৬
নুন এবং বালাম মাছ ৩৮৮
البال
(৫৩) বড় মাছ ৩৮৯
الببر
(৫৪) এক প্রকারের বাঘ (বাব্বর বাঘ) ৩৮৯
الببغاء
(৫৫) তোতা ৩৯১
الببح
(৫৬) জলজ পাখী ৩৯৬
البجع
(৫৭) লম্বাঠোট বিশিষ্ট পাখী বিশেষ ৩৯৬

البحزج

(৫৮) নীল গাইয়ের বাচ্চা ৩৯৬

البخاق

(৫৯) পুরুষ নেকড়ে ৩৯৬

البخت

(৬০) এক প্রকারের উট ৩৯৬

البدنة

(৬১) হজ্জে কোরবানীর জন্তু ৩৯৮

সর্ব প্রথম উৎসর্গ কারী ৪০০

বুদনার উপর সাওয়ার হওয়া যাবে কি না? ৪০১

البذج

(৬২) মেষ এর বাচ্চা ৪০২

البراق

(৬৩) বুরাক্ব ৪০৪

শবে মেরাজে হযরত জিব্রাঈল (আ.) নবী করিম (স.) এর সাথে সওয়ার হয়েছিলেন কিনা? ৪০৬

উম্মুল মুমিনীন হযরত ফাতেমা (রা.) এর মর্যাদা ৪০৬

নবী করিম (স.) এর সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত ৪০৮

البرذون

(৬৪) টাট্টু ঘোড়া ৪১১

হযরত ওমর ফারুক (রা.) এর সিরিয়াতে গমন ৪১৩

আবুল হোসাইন সম্পর্কে একটি কাহিনী ৪১৪

البرغش

(৬৫) মশা বিশেষ ৪২১

البرغن

(৬৬) নীল গাই এর শাবক ৪২১

البرغوث

(৬৭) ডাশ ৪২১

ডাশ পোকা থেকে নিরাপদ থাকার আমল ৪২৩

البرا

(৬৮) এক প্রকারের মোরগ ৪২৭

البرقانة

(৬৯) টিড্ডি ৪২৭

البرقش

(৭০) চড়ুই পাখী ৪২৭

البُركة

(৭১) এক প্রকার সামদ্রিক পাখী ৪২৮

সুলতান মাহমুদ·এর পরিচয় ৪৩৪

البطس

(৭৪) বিশেষ প্রকারের মাছ ৪৩৭

البعوض

(৭৫) মশা ৪৩৭

নমরুদের নাকে মশা প্রবেশের ঘটনা ৪৪২

মালাকুল মউত কর্তৃক মৃত্যুর জরিপ করা ৪৪৩

ইমাম যমাখশরী (রহ.) ৪৪৪

দুশ্চিন্তা দূরিভূত হওয়ার আমল ৪৪৫

মুসা আল কাজিমের মৃত্যু ৪৪৭

ইয়াহইয়া ইবনে ইয়ামার কে ? ৪৫২

بعير

(৭৬) উট ৪৫৬

বাসর রাতের দোয়া ৪৫৮

বাদীর বিরুদ্ধ উটের সাক্ষ্য প্রদান ৪৫৯

হারুনুর রশিদ এর পেরেশানী এবং

ফুজাইল ইবনে আয়াজ এর উপদেশ: ৪৬২

হযরত ইমাম আওযায়ী ৪৭০

بغاث

(৭৭) শকুনের চেয়ে ছোট সামান্য সবুজ সাদা রঙ্গের পাখী বিশেষ ৪৭৪

بغل

(৭৮) খচ্চর ৪৭৫

খচ্চরের উপর আরোহনের কাহিনী ৪৭৬

আলী বিন হোসাইন এর পরিচিতি ৪৭৭

হযরত আলী বিন যায়নুল আবেদীনের ইন্তেকাল ৪৭৯

শেখ আবূ ইছহাক সিরাজী ফিরোজাবাদী	৪৭৯
ইমাম আজম আবু হানিফা (রহ.)	৪৮০
নযর বিন শামাইলের ইকটি জ্ঞানগর্ভ ঘটনা	৪৮২
হারুনুর রশীদের দরবারে ইমাম আবু ইউসুফের জ্ঞানের মূল্যায়ন	৪৮৩
একজন রাফেজী মতাবলম্বীর দুষ্টামী	৪৮৮
নবী করিম (স.) এর দুলদুল নামের খচ্চর	৪৯০
জনৈক ডাকাত পাদরীর ঘটনা	৫০০
البغيبغ	
(৭৯) হরিণ	৫০৪
البقر الاهلى	
(৮০) গৃহ পালিত গাভী	৫০৮
সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার সহজ আমল	৫০৮
সহজে প্রসবের জন্য একটি আমল	৫০৮
গাভীর একটি বিস্ময়কর ঘটনা	৫০৯
জলালুদ্দৌলার ব্যাপারে কিছু কথা	৫১২
আরবগণের একটি প্রথা	৫১৪
بقرو حشى	
(৮১) নীল গাই	৫২১
হাদীছ শরীফে নীল গাইয়ের আলোচনা	৫২২
بقر الماء	
(৮২) সামুদ্রিক গাভী	৫২৪
বনী ইস্রাইলের গাভী	৫২৪
بق	
(৮৩) ছারপোকা	৫২৪
ছারপোকা থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায়	৫২৫
ছারপোকা সংক্রান্ত স্বপ্নের ব্যাখ্যা	৫২৬
بكر	
(৮৪) জোয়ান উট	৫২৭
হযরত আলী (রা.) এর হাদীছে আছে	৫২৯
بلبل	

(৮৫) বুলবুলি ৫৩১
ইমাম মালেক (রহ.) এর প্রতি একটি প্রশ্ন ৫৩৪

بُلح

(৮৬) শকুনের চেয়ে সামান্য বড় পাখী বিশেষ ৫৩৫

بلشون

(৮৭) বক ৫৩৫

بُلَصوص

(৮৮) পাখী বিশেষ ৫৩৬

بنات الماء

(৮৯) সামুদ্রিক বালিকা ৫৩৬

بنات وردان

(৯০) গোবরে পোকা ৫৩৬

بهار

(৯১) সাদা রঙ্গের মাছ ৫৩৬

بهثة

(৯২) নীল গাই ৫৩৭

بهرمان

(৯৩) চড়ুই পাখীর পাখী বিশেষ ৫৩৭

بهمة

(৯৪) গাভী, ভেড়া, বকরীর বাচ্চা ৫৩৭

بهيمة

(৯৫) চতুষ্পদ জন্তু ৫৩৯
হাশরের ময়দানে গবাদী পশু ৫৪১

بُوم وبُومة

(৯৬) পেঁচা ৫৪৫
পেঁচার উপকারিতা ৫৪৯

بُوَه

(৯৭) পেঁচার সাদৃশ্য পাখী ৫৫১

بوقير

(৯৮) সাদা রংয়ের পাখী ৫৫২

بينيب

(৯৯) সামুদ্রিক মাছ বিশেষ ৫৫৩

بياخ

(১০০) মাছ বিশেষ ৫৫৩

ابوبر اقش

(১০১) চড়ুই পাখীর মতই পাখী বিশেষ ৫৫৩

ابو برا

(১০২) কুয়েল ৫৫৩

ابوبريص

(১০৩) টিকটিকি ৫৫৩

باب التاء

تاليب

(১০৪) পাহাড়ী (পুরুষ) ছাগল ৫৫৪

تبيع

(১০৫) গো- বাছুর ৫৫৪

تبشر

(১০৬) হলুদ পাখী ৫৫

تُثفل

(১০৭) ভেড়া ৫৫৫

تدرج

(১০৮) তিতরের মত পাখী বিশেষ ৫৫৫

تخش

(১০৯) ডলফিন ৫৫৫

تفلق

(১১০) জলজ পাখী বিশেষ ৫৫৬

تفه

(১১১) বিড়ালের মত একটি প্রাণী ৫৫৬

تمّ

(১১২)মাছরাঙ্গার মত পাখী বিশেষ ৫৫৭

تمساح

(১১৩) কুমীর ৫৫৭
কুমীরের কতিপয় বৈশিষ্ট ৫৫৮

تميلة

(১১৪)বিড়ালের মত প্রাণী বিশেষ ৫৬১
মেশক আম্বর সম্বন্ধে বিশেষ ধারণা ৫৬১

تنوط

(১১৫) পাখী বিশেষ ৫৬৩

تنين

(১১৬) অজগর সাপ ৫৬৩
হযরত মুসা (আ.) এর লাঠির বৈশিষ্ট ৫৬৫
অজগরের শরয়ী বিধান ৫৬৬

تورم

(১১৭) তিতর পাখী বিশেষ ৫৬৯

تولب

(১১৮)গাধার বাচ্চা ৫৭০

تيس

(১১৯) ছাগ ৫৭০
হাজ্জাজ বিন ইউসুফের একটি ঘটনা ৫৭৪
হাজ্জাজের মৃত্যুর ঘটনা ৫৮০
চিকিৎসা ক্ষেত্রে (বকরার) ছাগ এর উপকারিতা ৫৮৩

باب الثاء

ثاغية

(১২০) মেষ ৫৯১

ثرملة

(১৬১) শিয়ালিনী ৫৯১

ثعبان

(১৬২) অজগর ৫৯১
আব্দুল্লাহ বিন যিদআন ৫৯৪

ثعالة

(১২৩) মাদী শৃগাল ৬০২

ثعبة

(১২৪) গিরগিট ৬০৩

ثعلب

(১২৫) শিয়াল ৬০৪

ছারপোকা বিদূরিত করার পন্থা ৬০৭

শিয়ালের চালাকী ও তা থেকে বাঁচার উপায় ৬০৮

প্রাণীদের বুদ্ধি সংক্রান্ত একটি ঘটনা ৬০৯

বাঘের খেদমত এবং শিয়ালের ধূর্ততা ৬১৬

হাদীছ শরীফে শৃগালের আলোচনা ৬১৬

চিকিৎসা ক্ষেত্রে শিয়ালের উপকারিতা ৬২০

ثفا

(১২৬) বুনের বিড়াল ৬২২

ثقلان

(১২৭) মানব দানব ৬২২

ثلج

(১২৮) ঈগল ৬২২

ثنى

(১২৯) দুই বছরের প্রাণী ৬২২

ثور

(১৩০) বলদ ৬২৩

জান্নাতের খাদ্য ৬২৪

চন্দ্র সূর্য বলদ প্রতিম ৬২৫

বলদ সম্পর্কে প্রবাদ বাক্য ৬২৮

চিকিৎসা ক্ষেত্রে বলদের উপকারিতা ৬৩০

الثول

(১৩১) পুরুষ মৌমাছি ৬৩১

الثيتل ث

(১৩২) পাহাড়ী বকরী - ৬৩২

অনুবাদকের কথা

জীব-জন্তু-প্রাণী মানব জাতির জন্য একটি নিত্যনৈমিত্তিক-জরুরী বস্তু। খাওয়াতে, চড়াতে, পালাতে, কৃষিতে, ঔষধীতে, সৌন্দর্য দর্শনে ইত্যাদি ইত্যাদি কাজে জীব-জন্তু মানুষের অত্যাবশ্যক। আবার কিছু প্রাণীতো এমনও আছে যাদের বসবাস সার্বক্ষণিক মানুষকে ঘিরেই । অনেক সময় মানুষ অতিষ্টও হয় বটে কিন্তু প্রাকৃতিকভাবে এসব প্রাণীর উপস্থিতি এক প্রকার রহমত স্বরূপই হয়ে থাকে। এক কথায় বলতে গেলে প্রাণী জগতের অস্তিত্ব ছাড়া মানুষের জীবন যাপন দুস্কর-অসম্ভব। বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে প্রাণী নির্ভর অনেক কাজ-এর বিকল্প বাস্তবে রূপ পাচ্ছে। কিন্তু এমন বহু আবশ্যিক দিক আছে যে গুলো প্রাণী ছাড়া আদৌ সম্ভব নয় এবং আগামীতেও হবে না।

যুগ যুগ ধরে মুসলিম-অমুসলিম বড় বড় মণীষীগণ প্রাণী জগত নিয়ে বহুবিদ গবেষণা চালিয়েছেন। যাদের গবেষণার ফলশ্রুতিতেই এ পর্যন্ত প্রাণী জগত থেকে মানুষের উপকৃত হওয়া। আল্লামা কামালুদ্দীন মুহাম্মদ দামিরী (রহঃ) প্রাণী জগত সম্পর্কে ভিন্ন ধারার একটি গবেষণা মুসলিম উম্মাহকে উপহার দিয়েছেন। যে গবেষণা ছিল আপন সময়ের জন্য অনন্য। বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে প্রাণী জগত সম্পর্কে আরো বহুবিদ গবেষণা চলছে এবং চলবে। কিন্তু বেশ কিছু কারণে আল্লামা দামীরীর প্রাণী জগত সম্পর্কে গবেষণাটা বর্তমানেও অনন্য হয়ে রয়েছে। ইসলামী শরীয়তে কোন কোন প্রাণীর কি হুকুম, কোন প্রাণীকে কিভাবে কে স্বপ্নে দেখলে তার ব্যাখ্যা কি হতে পারে এ ধরনের গবেষণালব্দ আরেকটি গ্রন্থ এখনও বের হয়নি। সে হিসেবে আল্লামা দামীরীর হায়াতুল হাওয়ান নামক কিতাবটি এখনও সেরা গ্রন্থ-তাতে কোন সন্দেহ নেই।

আমি কামিলের পরীক্ষার্থী থাকা কালীন কোন বিশেষ প্রয়োজনে কিতাবটি আমার ক্রয় করতে হয়েছে। কিতাবটির ভাষা ছিল উর্দূ। উর্দুভাষায় আমি খুব একটা পাকা ছিলাম না। সে জন্য একিতাব থেকে উপকৃত হতে আমাকে বহু অভিধানের শরণাপন্ন হতে হয়েছে। অভিধান থেকে কোন শব্দ আমি বের করার পর সেগুলোকে পত্রস্থ করারও একটা ধারা আমার মধ্যে ছিল। এক সময় চিন্তা হল কিতাবটির এত শব্দ আমি পত্রস্থ করলাম যদি আল্লাহ করে কিতাবটির একটি বাংলা অনুবাদ আমার দ্বারা হয়ে যায় তবে আমার দেশবাসী তা থেকে ভালই উপকৃত হতে পারতো। অনেকটাই দূরাশা বললেই চলে। কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি যখন ইসলামীক ষ্টাডিজে মাষ্টার্স করতে ছিলাম তখন আমাকে আমার এক বন্ধু কিতাবটির অনুবাদের ব্যাপারে পরামর্শ দেন। তাকে বললাম আমি দূর্বল! এ কথা শুনে সে আমাকে বলল সাধনাই তো সব কিছু দূর্বলতা কাটে। তার উৎসাহপূর্ণ কথা শুনে আমি কিতাবটির অনুবাদের ব্যাপারে আরো অনুরাগী হই। দৈনিক কিছু কিছু কাজ করার দৃঢ় ইচ্ছা নিয়ে কাজ এগুতে থাকি। এর ভিতর এক দিন কোন একটি বই মেলায় কিতাবটির একটি বাংলা অনুবাদ আমার হাতে পড়ে। তা দেখে আমার মনে হতাশার জন্ম হয়। আমার বন্ধুদের বললাম জীবনে একটা কাজে হাত দিলাম কিন্তু এতে সফল হলাম না। কেন? কারণ.....। তারা বলল এটাকি কথা হলো? এ অনুবাদ গ্রন্থতো তোমার জন্য আরো সহায়ক হবে। এতে হতাশ হওয়ার কি আছে। একটি কিতাবের কত অনুবাদ হতে পারে। হতাশা কাটল। উৎসাহ দ্বিগুণ হলো। কিন্তু সময়ের স্বল্পতার কারণে কাজ খুব ধির গতিতেই এগুচ্ছিল।

ইতিমধ্যে আমার কুয়েতের ভিসা হয়ে যায়। অবশ্য অনুবাদক হিসেবেই ভিসাটি এলো। পার্থিব তাড়নায় কুয়েতে এসে প্রবাসীদের সঙ্গি হয়ে গেলাম। প্রবাসের গ্লানী কাটতে অনেক দিন সময় লেগেছে। আমার কর্মস্থলের পাশে একজন মাওলানাকে সবসময় হটা চলা করতে

দেখতেছিলাম। এক দিন তাঁর সাথে পরিচয় হয়। হতে হতে কথা প্রসঙ্গে একদা হায়াতুল হায়ওয়ানের অনুবাদের বিস্তারিত ঘটনা তাকে বলা হয়ে গেল। তিনি আমাকে এহেন মহৎ কাজে উৎসাহ প্রদান করেন এবং নিজেও সম্পাদনাগত কাজ কর্মে সময় দিবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। তাতে আমার উৎসাহের ধারা গতি পেল। আমার অনুবাদের কপিসহ কিতাবটি কুয়েতে নিয়ে আসি। কিন্তু কাজ চলে না। বিভিন্ন ব্যস্ততার ফাঁকে কাজ কতইবা চলবে। তারপরেও ধীরে ধীরে অনুবাদকাজ সমাপ্তির দিকে যাচ্ছিল। একদিন আমার সে বন্ধু মাওলানা রিজওয়ান জমীরাবাদীকে বললাম ভাই আমার কাজ তো এক প্রকার সমাপ্তির দিকে এখন আপনার কাজ। তিনি বললেন আমিতো আপনার সাথে ওয়াদা করে আটকে গেলাম। আচ্ছা দেখি চেষ্টা করব। তিনি আসলেই চেষ্টা করেছেন। হাজার কর্মব্যস্ততার মাঝেও কিতাবটির বেশিরভাগ অংশ দেখে দিয়েছেন। অনুবাদগত অনেক ভূল ভ্রান্তিও তাঁর চোখে ধরা পেড়েছে এবং তা তিনি শুদ্ধ করে দিয়েছেন। সে জন্য আমি তার শুকরিয়া আদায় করি।

বছর দুয়েক পার হওয়ার পর দেশে আসার ব্যবস্থা হল। আগে থেকেই ভাবতে ছিলাম, ভাল হোক বা খারাপ হোক কাজ তো করছি, কিন্তু এটি প্রকাশ করার ক্ষেত্রে কি করতে পারি জানি না। দেশে ফেরার পর বন্ধুগণের সাথে পরামর্শ করলাম। বিভিন্নজন বিভিন্ন পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু আমার অন্তরে আসল বইটি আপাতত কাউকে ছাপার জন্য দেব না। বরং আমি নিজেই ছাপব। এর ভিতর গাউসিয়া পাবলিকেশন্সের ম্যানেজার মাওলানা আবু তাহেরের কাছে দেখা হল। তাঁর কাছেও বেশ পরামর্শ পেলাম। তাঁর সহযোগিতায়ও ধন্য হয়েছি।

পরিশেষে আমি আল্লাহ পাকের শুকর আদায় করি। আমাকে যারা সার্বিক ভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদেরও শুকরিয়া আদায় করি। বিশেষ করে মওলানা জমীরাবাদীর ইহসানের উপর আমি খুব বেশী শুকরগুজার। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন কিতাবের উসীলায় আখেরাতে মুক্তির পথ খুলে দেন। আমীন। রুহুল আমীন

আল্লামা কামালুদ্দিন দামীরী (রহঃ) এর সংক্ষিপ্ত জীবনালোচনা

নাম ঃ কামাল উদ্দীন মুহাম্মদ। উপনাম : আবুল বাক্বা। পিতা : মুসা বিন ঈসা।

বংশ পরম্পরা ঃ কামাল উদ্দীন মুহাম্মদ বিন মূসা বিন ঈসা বিন আলী আদ্দামীরী আল মিশরী। আল্লামা সাখাবী (রহঃ) লিখেন: প্রথমে তাঁর নাম ছিল কামাল উদ্দীন। পরে তিনি নামের সাথে মুহাম্মদ শব্দটি যুক্ত করেন আক্বায়ে নামদার হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর নামের বরকত অর্জনের জন্য। তাঁর বিভিন্ন কিতাবে মুহাম্মদ যুক্ত কামলুদ্দীন মুহাম্মদ লিখা হয়েছে।

জন্ম: তিনি কত সনে জন্মগ্রহণ করেছেন তা নিয়ে বিভিন্ন মত রয়েছে। ইবনে শেহাব (রহঃ) লেখেন ৭৫০ হিজরীতে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। আল্লামা হাফেজ সখাবী (রহঃ) ও আবুল ফালাহ আব্দুল হাই লেখেন তিনি ৭৪২ হিজরী মোতাবেক ১৩৪৯ঈসায়ীতে জন্মগ্রহণ করেন। মিশরের ক্বায়রোতেই তাঁর জন্ম হয়। এখানেই তিনি বড় হয়েছেন।

বড় হওয়ার পর তিনি দর্জী কাজে জড়িয়ে পড়েন। বেশ কিছু দিন পর তাঁর ইলমে দ্বীন অর্জন এবং বিভিন্ন দ্বীনি শিক্ষার গুরুত্ব বুঝে আসায় তিনি উক্ত পেশা ত্যাগ

করে আল আজহার বিশ্ব বিদ্যালয়ে লেখা পড়া আরম্ভ করেন। শিক্ষার সকল স্তর শেষ করার পর তিনি সময়ের বড় বড় আলেমদের অন্যতম হিসেবে পরিগণিত হন। তাঁর ইলমী দক্ষতা মেধা ও যোগ্যতা দেখে তাঁকে বিচারপতি হওয়ার প্রস্তাব দিলে তিনি তা সরাসরি নাকচ করে দেন।

তিনি আহলে সুন্নাত ওয়ালজামাআতের আক্বীদায় মজবুত ছিলেন। মাজহাবের ক্ষেত্রে তাঁকে শাফেয়ী বলেই বিভিন্ন জন মত প্রকাশ করেছেন এবং তাঁর লেখা লেখীতে সেটিই প্রকাশ পায়। তাসাউফ ও তারীকত মারেফাতের ক্ষেত্রেও তাঁর মর্যাদা ছিল সুউচ্চ। তিনি শেষ বয়সে সব সময় রোযা রাখতেন।

লেখাপড়া শেষে তিনি শিক্ষা দানকেই জীবনের আসল উদ্দেশ্য ও কর্ম হিসেবে বেচে নেন। সে হিসেবে তিনি বিভিন্ন স্থানে শিক্ষা দান করেছেন বলে প্রমান পাওয়া যায়। মিশরের বিভিন্ন স্থানে তিনি শিক্ষকতা করেছেন এবং বেশ কিছু দিন তিনি মক্কা মুকাররামাতেও শিক্ষা দান করেছেন। ঐতিহাসিকদের মতে তিনি দুবছর মক্ক শরীফে শিক্ষা দান করেন। বিশেষ করে তিনি প্রত্যেক শনিবার শিক্ষানিবেশ ছাত্রদের নিয়ে কাটাতেন, তাদের সময় দিতেন। তক্বী আল ফাসী লিখেন আল্লামা দামীরী (রহঃ) ৭৭৫ সনে মক্কা শরীফ আসেন এবং কিছু দিন অবস্থান শেষে দেশে ফিরে যান।৭৮৫ হিজরীতেও তিনি মক্কায় আসেন এবং কিছু দিন বসবাস করেন। ৭৯৯ সনে তিনি আরেকবার মক্কাতুল মুকাররামায় আসেন এবং কিছু দিন থেকে চলে যান। যতবার তিনি মক্কায় এসেছেন প্রত্যেকবারই হজ্জ করেছেন।

ছেলে সন্তান ঃ তিনি মক্কা শরীফে থাকা কালে ফাতেমা বিনতে ইযায়াহকে বিয়ে করেন। তাঁর ঔরষে তিনজন সন্তান জন্মগ্রহণ করে। তাঁরা হলেন উম্মে হাবীবা, উম্মে সালমা এবং আব্দুর রহমান।

গ্রন্থাবলী: লেখালেখির জগতে তাঁর বিচরণ বহু উর্ধ্বে। বিভিন্ন বিষয়ে তিনি অন্যান্য গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং তাঁর কিতাবাদী মকবুল হয়েছে। ১। আদদিবাজাহ ফী শরহে সুনানে ইবনে মাজাহ। ২। আননাজমুল ওয়াহহাজ ফী শরহিল মিনহাজ। ৩। আল জওহারুল ফরীদ ফী ইলমিত তাওহীদ।৪। হায়াতুল হায়ওয়ান কুবরা।

ঐতিহাসিক আবুল ফালাহ লেখেন হায়াতুল হায়ওয়ান কিতাবটি তিনি তিনভাবে লিখেছেন। ১। হায়াতুল হায়ওয়ান কুবরা (বৃহৎ) । ২। হায়াতুল হাওয়ান ওসতা (মাঝরী)। ৩। হায়াতুল হায়ওয়ান সুগরা (ছোট)।

কুবরাতে তিনি সকল বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। ওসতাতে বর্ধিত অংশগুলো ফেলে দেওয়া হয়েছে এবং সুগরাতে শুধু জন্তু বিষয়ক কথাগুলো রেখেছেন।

হায়তুল হায়ওয়ান কিতাবটি যেহেতু মানবসমাজের জন্য উপকারের একটি বড় মাধ্যম ছিল সে হিসেবে কিতাবটির সংক্ষিপ্ত রূপ দিয়েছেন বহু বড় বড় আলেম।

১। আয়নুল হায়ওয়ান।২। মুখতাসার লিশ শায়খ ওমর বিন ইউনুস বিন উমর হানাফী (রহঃ)। ৩। মুখতাসার লিশ শায়খ তকীউদ্দীন বিন মুহাম্মদ বিন আহমদ আলফাসী। (৪) তায়্যিবুল হায়াত। (৫) দীওয়ানুল হায়ওয়ান। (৬) যায়লুল হায়ওয়ান। (৭) বাহজাতুল ইনসান ফী লাহজাতিল হায়ওয়ান ইত্যাদি। এসকল সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ থেকে হায়াতুল হায়ওয়ান কিতাবটির গ্রহণযোগ্যতা, শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ব অনুমান করা যায়।

ইহকাল ত্যাগ ঃ আল্লামা দামীরী (রহঃ) কায়রোতে জামাদিউল উলা ৮০৮ হিজরী মোতাবেক ১৪০৫ ঈসায়ীতে ইন্তিকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন)। তাঁকে মাকবেরাতুস সূফিয়া মাঈদুস সুআদাতে দাফন করা হয়।

باب الالف

اَسَدٌ

সিংহ

اســـد সিংহকে বলা হয়। সিংহ সুপ্রসিদ্ধ ও সুপরিচিত একটি হিংস্র জন্তু। আরবীতে এ জন্তুকে اَسَدٌ বলা হয়।এর جمع বা বহুবচন ، اُسُوَدٌ، اُسْدٌ، اَسْدٌ اَسَادٌ ইত্যাদি।এর স্ত্রীলিঙ্গকে আরবীতে لَبُوَةٌ বলে।

সিংহের কতিপয় নাম:

আরবীতে সিংহের অনেক নাম আছে। বিদ্যানদের কথা হলো, কোন জিনিসের বেশি নাম থাকা সে বস্তু অধিক গুরুত্বপূর্ণ হওয়ারই প্রমাণ বহন করে।ইমাম ইবনে খালুইয়াহ বলেন, সিংহের পাঁচশত নাম রয়েছে, সে হিসেবে এর সে পরিমাণ গুরুত্ব ও গুণও আছে। তবে আলী ইবনে কাসিম ইবনে জা'ফর আললাগাভী এর একশ ত্রিশটি নামের কথা লিখেছেন।

সিংহের কতিপয় নাম নিম্নে উল্লেখ করা হল:

اسامه، بيهس، تاج، جخدب، حرث، حيدرة، دواس، رئبال، زفر، سبع، صعب، ضرغام، ضيغم، طيثار، عبنس، غضنفر، فرافصة، كهمس، ليث، متانس، متهيب، هرماس، ورد

ভাষাবিদগণ সিংহের নিম্নবর্ণিত কয়েকটি উপাধি উল্লেখ করেছেন:

ابوابطال، ابوحخص، ابواخفياف، ابوزعفران، ابوشبل، ابو عباس، ابوحرث

সিংহের নাম সর্বপ্রথমে বর্ণনা করার কারণঃ

অত্র কিতাবের সংকলক বলেন- আমি কিতাবের প্রারম্ভে সর্বপ্রথম সিংহের কথা উল্লেখ করার কারণ হল- জংলী জন্তুর মধ্যে সিংহ ভদ্র প্রকৃতির ও উত্তম জন্তু। সিংহ মর্যাদা, শক্তি, বীরত্ব, কঠিঅন্তর, চতুর, বদমেজাজ, দুশ্চরিত্র হওয়ার ক্ষেত্রে জন্তুদের মধ্যে সে অত্যন্ত প্রতাপশালী। একারণেই হয়ত কারো শক্তি, সাহসিকতা, বীরত্ব, দুঃসাহস এবং দৃঢ়পদক্ষেপের ক্ষেত্রে সিংহের উদাহরণ দেয়া হয়। হযরত হামযা ইবনে আব্দুল মুত্তালিবকে (রাঃ) (তাঁর

সাহসিকতার কারণে) اسد الله বা "আল্লাহর সিংহ" বলা হতো। জ্ঞানীগণ এও বলেছেন যে, হযরত হামযা (রাঃ) এর উপাধী اسد الله হওয়াটা স্বয়ং সিংহের গৌরব। হযরত আবু কাতাদা "ফারিছুনন্নবী" অর্থাৎ হুযূর (সাঃ) এর শ্বশুর-কেও আসাদুল্লাহ বলা হতো।

সিংহের বিভিন্ন প্রকার :

সিংহ বিভিন্ন প্রকৃতির ও বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। এরিষ্টটল লিখেন, অতি আশ্চার্যজনক এক প্রকার সিংহ আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছে। এর রং লালছে, তার মুখমন্ডল দেখতে মানুষের মতই। কিন্তু লেজ ছিল বিচ্ছুর মত। সম্ভবত আরবীতে একে ورد বলা হয়। কিছু সিংহ আছে আকৃতিতে গাভীর ন্যায়। এর কালো রংএর এক বিগত লম্বা শিং হয়ে থাকে।

প্রাণীবিদগণ লিখেন, সিংহীর বাচ্চা প্রসব অতি আশ্চার্য জনক। সিংহীর পেট থেকে কেমন যেন একটি গোশতের টুকরাই ভুমিষ্ট হয়।যা না নড়া ছড়া করে, না কোন কিছুর অনুভুতি রাখে। তিন মাস পর্যন্ত এ গোশতের টুকরাই সংরক্ষিত থাকে। সিংহ এতে ফুঁক দিতে থাকে এবং ক্রমান্বয়ে এতে চোখ, আত্মা এর পর শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জন্ম নেয়। এ গোশতের টুকরাটি বিভিন্ন আকৃতিতে রূপান্তরিত হয়ে এক পর্যায়ে সিংহশাবকের রূপ নেয়। সিংহী শাবকটিকে নিজের দুগ্ধ পান করিয়ে লালন করে। এক সময় সিংহ শাবকটি চক্ষু মেলে জগতকে অবলোকন করে, জগতের কথা ভাবে। সিংহশাবকের এহেন ক্রমোন্নতিতে প্রায় ছয় মাস লেগে যায়। আস্তে আস্তে সিংহ এবং সিংহী এ শাবকটিকে পশু হিসেবে গড়ে তুলে নিজেদের রক্ষক হিসেবে গড়ে তুলে।

সিংহের বৈশিষ্টাবলী :

প্রাণীবিদগণের মতে সিংহ এমন বেশ কিছু বৈশিষ্টের অধিকারী হয়ে থাকে বা অন্যান্য প্রাণীতে থাকে না। এ ছাড়া তারা সিংহের বিভিন্ন সৌন্দর্যও বর্ণনা করেছেন। ক্ষুধার সময় ধৈর্য ধারণ এবং পানির পিপাসা কম অনুভূত হওয়া ইত্যাদি তার বিশেষ বিশেষ গুণাবলীর মধ্যে অন্যতম। তার আরেকটি বিশেষ গুণ হল অন্য প্রাণীর শিকার তথা ঝুটা সে বক্ষন করে না। সিংহ যে প্রাণী শিকার উক্ত প্রাণীর ফেট ফেটে কিছু অংশ আহার করে বাকীটি ফেলে দেয়। তার নিক্ষিপ্ত অংশ সে আর খায় না। অধিক ক্ষুধায় সে খুব হিংস্র হয়ে উঠে। (আহারের পর)

পেট ঠান্ডা হলে সম্বিত ফিরে পায়। কুকুরের ঝুটা পানি সে কখনো পান করে না। এ ব্যাপারে কবি বলেন-

اترك جها من غير بغض ☆ وذاك لكثرة الشركاء فيه
اذا وقع الذباب على طعام☆ رفعت يدى ونفسى تشتهيه
وتجتنت الاسود ورودماء☆ ذاكان الكلاب ولغن فيه

আমি তার সাথে কোন রূপ ঈর্ষা ও বৈরীতা ছাড়াই সম্পর্ক স্থাপন করেছি। শুধু এ ভিত্তিতেই সেই অকপট বন্ধু হয়ে গেল।

কোন খাদ্যে মৌমাছি নিপতিত হলে আমি আমার হাতকে বিরত রাখি (অর্থাৎ তা খায় না) অথচ (খাওয়ার জন্য) আমার মনে খুব তাড়না থাকে।

আর সিংহ এমন ঘাটের পানি পান করে না যেখানে কুকুর ঝুটা করেছে।

কবি কলম সম্পর্কে কবিতায় লিখেছেন:

وارقش مدهوف الشباه مهفهف☆ وهو جميع يشتت شمل الخطب
ترين له الآفاق شرقا ومغربا☆ وتعنو اله ملاكها وتطمع
حمى الملك مغطوما كماكان تعتمى☆ به الاسد فى لاجام وهو رفع

কোমল কলম তার সমরূপ অন্যান্য কলমের মধ্যে বর্ণ বৈষম্যের অধিকারী যা দুর্ঘটনাসমূহ লেখার মাধ্যমে একাগ্রতায় বিশৃংখলা সৃষ্টি করে দেয় এবং সে নিজে শান্ত থাকে।

পূর্ব থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্তের সকল জিনিস কলমের অনুগত হয়ে যায়। জগতের সকল শক্তি তার আনুগত্য ও বাধ্যতা স্বীকার করে।

বাঘের বাচ্চা যেমন দুধ ছাড়ার সময় থেকেই পুরো এলাকার (জঙ্গলের) রক্ষণাব্যক্ষনের দায়িত্বভার গ্রহণ করে, এবং মায়ের গর্ভে দুধ পান কালীন সময় স্বয়ং হেফাজতে থাকে।

সিংহের বৈশিষ্টসমূহে এ-ও যে, সিংহ তার শিকারকৃত প্রাণীকে চিবানো ছাড়াই অগ্রভাগের দাঁত দ্বারা কুচি কুচি করে খায়। এর মুখে লালা কম আসে। সে কারণে সবসময় সিংহের মুখে পুঁতি গন্ধযুক্ত হয়ে থাকে।

সিংহের সচরাচর বৈশিষ্ট হল- সে খুবই সাহসী ও বাহাদুর হয়ে থাকে।

তবে ভীরুতাও কম পাওয়া যায় না। মোরগের আওয়াযকে সিংহ ভয় করে। শিম পাঞ্জির ঝনঝনানীতে সে ভয় অনুভব করে এবং বিড়ালের উচ্চৈস্বরে শব্দে সে ভীত হয়। আগুন দেখলে সিংহ থমকে যায়।

সিংহের সামনের দুপায়ের থাবা অত্যন্ত শক্তিশালী। তার সাথে কোন প্রাণীর সাথেই বন্ধুত্ব গড়ে উঠে না। কারণ সে কোন প্রাণীকেই নিজের সতুল্য মনে করে না। কারণ কোন প্রাণীই সিংহের আক্রমনে পাল্টা জবাব দেওয়ায় সক্ষম নয়।

সিংহের চামড়া অন্য কোন প্রাণীর শরিরে রাখা হলে ক্রমান্বয়ে সে প্রাণীর লোম উঠে যায়। কোন ঋতুবতী মহিলার নিকট সিংহ যেতে পারেনা যতই শক্তি সে প্রয়োগ করুক না কেন। সবসময় সে সর্দিতে ভোগে। তার আয়ুও হয় অনেক দীর্ঘ। তার বার্ধক্যের নিদর্শ হল দাঁত পড়ে যাওয়া।

মহানবী (সাঃ) এর হাদীছে সিংহের বর্ণনা:

ইবনে সাবা. আচ্ছুবূতী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন. একদা নবী করীম (সাঃ) সফরের পথে বিশ্রামরত একটি কাফেলার নিকটবর্তী হলেন। তাঁদের সম্পর্কে তিনি জানলেন এবং তাদেরকে বললেন, তোমাদের কি কোন দূর্ঘটনা ঘটেছে? উত্তরে তারা বললেন হে আল্লাহর রসূল! সম্মূখ পথে একটি সিংহ আছে, সে মানুষকে ভীতি প্রদর্শন করছে। ব্যাপারটা জানার পর হুজুর (সাঃ) বাহন থেকে নামলেন এবং সিংহের কাছে গিয়ে সিংহটিকে কান ধরে রাস্তা থেকে সরিয়ে দিলেন।

বর্ণনাকারী বলেন, রসূল (সাঃ) তোমার সম্পর্কে সত্যিই বলেছেন যে, তোমাকে বনী আদমের উপর আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় না করার কারণে বিজয়ি করেছেন। আদম সন্তান যদি আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় না কর তবে তারা বিজয়ী হবেই এবং আপন কর্ম ক্ষেত্রে কারো উপর নির্ভর করতে হবে না। (শিফাউস সুদূর)

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আদম থেকে বর্ণিত, যদি আদম সন্তান আল্লাহ তাআলার শক্তি ও ক্ষমতার উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রাখত তবে [redacted] অন্য কারো উপর নির্ভশীল হতে হত না আর না নিজেদের আপদ-[redacted] প্রয়োজনে কারো মুখাপেক্ষী হতে হত। (আবূদাউদ)

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত : রাসূল (সাঃ) বলেন, হযরত ঈসা ইবনে মরয়াম (আঃ) দুনিয়াতে এমনভাবে অবতরণ করবেন যে, তাকে দেখলে মনে হবে তাঁর মাথা থেকে যেন ফোটা ফোটা পানি বেয়ে পড়ছে। মূলত তাঁর মাথায় কোন প্রকার আর্দ্রতা থাকবে না। তিনি ক্রুশ চিহ্নকে ভেঙ্গে দিবেন। (তাঁর আগমনের কারণে) শুকরকে হত্যা করা হবে। অধিক ধন সম্পদ হবে, দুনিয়ায় পূর্ণ মাত্রায় ইনসাফ, ন্যায় বিচার, সর্বক্ষেত্রে নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হবে। সিংহের সাথে উট, বাঘের সাথে গাভী একই স্থানে পানি পান করবে। ছাগল ও ব্যঘ্র একই জায়গায় পানি করবে, তাতে পরস্পরে কোন প্রকার ভয়-ভীতি থাকবে না। ছোট ছোট শিশু সাঁপের সাথে খেলা-ধুলা করবে তাতে কেউ কারো ক্ষতির কল্পনও করবে না। এমনি অবস্থাতে হযরত ঈসা (আঃ) ৪০ বছর জীবিত থাকবেন। এর পর স্বাভাবিক ভাবেই তিনি ইন্তিকাল করবেন। অত্যন্ত জাকজমকপূর্ণ আয়োজনের মাধ্যমে মুসলমানগণ তাঁর কাফন, জানাযা এবং দাফন সম্পন্ন করবে।

হযরত সফীনা (রাঃ) এর ঘটনা :

ছোর ইবনে এয়াজিদের সময় ইমাম আবু নাঈম কিতাবুল হুলিয়াতে লিখেন, একথার উপর আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, সিংহ হারামী লোকদেরকেই শুধ খেয়ে থাকে। হযরত ছফীনা (রাঃ) ছিলেন রাসূল (সাঃ) এর খাদেম। তাঁরই একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা আছে যা বাঘের সাথেই সংঘটিত হয়েছে।

মোহাম্মদ বিন মুনকাদির বলেন, স্বয়ং হযরত সফীনা (রাঃ) আমার কাছে বর্ণনা করেন যে, আমি এক সময় নৌকায় ছড়ে সমুদ্র ভ্রমন করছিলাম, হঠাত নৌকাটির একটি অংম ভেঙ্গে গেলে নৌকাটি ডুবে যায়। (নৌকা থেকে ছুটে যাওয়া) একটি তক্তার উপর আমি বসে পড়লাম। তক্তাটি ভাসতে ভাসতে এমন একটি বনের নিকট ভিড়ল যে খানে সিংহরা বাস করে। দেখতে পেলাম, এক সিংহ আমার দিকেই তেড়ে আসছে। সিংহকে উদ্দেশ্য করে বললাম আমি সফীনা, হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ) এর খাদেম। এ সময় অবশ্য আমি পথ হারিয়ে উদ্ভ্রান্তের মতই ছিলাম। তা শুনতেই সিংহ মাথা নেড়ে ইঙ্গিত করতে লাগল। শেষপর্যন্ত সেই আমাকে সুজা পথে এনে দাঁড় করিয়ে দিল। এর সিংহ গর্জন করতে লাগল। তাতে আমি বুঝলাম সেই চলে যাচ্ছে, আমি নিরাপদ

গেলাম। ইমাম বায়হাকী (রহঃ) মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির থেকেই এ ঘটনা বর্ণনা করেন যে, হযরত সফীনা রোমের কাছে সেনাবাহিনীর পশ্চাদে থেকে যান, তখন তাঁকে বন্দী করা হলো। এর পর তিনি এখান থেকে পলিয়ে নিজ সেনাবাহিনীর খোঁজে আসতে ছিলেন।

এমতাবস্থায় দেখলেন রাস্তার মধ্যে একটি সিংহ দাঁড়িয়ে আছে। সিংহকে সম্বোধন করে তিনি বললেন হে আবুল হেরছ (ইহা সিংহের উপাধি) আমি ছফীনা, নবী করিম (সঃ) এর খাদেম। একথা শুনে সিংহটি লেজ গুটিয়ে তাঁর কাছে এসে গেল।

হযরত সফীনা (রাঃ) কোন কিছুর বিকট আওয়াজ শুনতে পেলেই সিংহটিকে আকড়ে ধরতেন বা সিংহটির কাছে ভিড়ে যেতেন। এমনিভাবে হযরত সফীনাহ (রাঃ) সিংহের সাথেই চলতে লাগলেন। এভাবে চলতে চলতে শেষ পর্যন্ত তাঁর সৈন্য বাহিনীকে পেয়ে গেলেন। তারপর সিংহটি নিজ গন্তব্যে চলে গেল। (দালাইলুননুবুয়াত)

উৎবা ইবনে আবু লাহাবের জন্য নবী করিম (সাঃ) এর বদ দেয়া :

নবী মুহাম্মদ (সঃ) উৎবাহ ইবনে আবু লাহাবের জন্য এভাবে বদ দোয়া করেছিলেন যে, হে আল্লাহ! তোমার কুত্তাগুলোর মধ্যে একটি কুত্তার উঁপর আমাকে বিজয়ি করে দাও। সুতরাং হুযূর (সঃ) এর বদদোয়ার ফলে সিরিয়ার এক দূর্গে যুরক্কা নামক স্থানে এক কিংহ তাকে গ্রাস করে ফেলে।

হযরত আসওয়াদ বিন হোবার থেকে বর্ণিত যে, একদা আবু লাহাব এবং তার ছেলে উৎবাহ সিরিয়া ভ্রমনের জন্য তৈয়ার হল। আসওয়াদ বিন হোবার বলেন , আমিও তার সাথে গেলাম। আমরা যখন আশ শকরা নামক স্থানে পৌছলাম তখন এক ইহুদী রাহিবের গীর্জার নিকট তাঁবু দেখলাম। রাহিব বলল (হে লোক সকল) তোমরা এখানে কিভাবে থাকবে? কেননা এখানে অনেক হিংস্র প্রাণী থাকে। তখন আবু লাহাব বলল তোমরা তার প্রতি নজর রেখো। কেননা মোহাম্মদ (সঃ) আমার ছেলের জন্য বদদোয়া করেছেন। এখন তোমাদের নৈতিক দায়িত্ব যে, তোমরা তোমাদের আসবাব পত্র ঐ গীর্জার উপর রেখে এবং আমার ছেলেকে ঐ আসবাব পত্রের উপর একটি দেয়াল বানিয়ে আর এই সাথে তোমরা সবাই এর চারদিকে শুয়ে থাকবে। সুতরাং

তাই করলাম। (যা আবু লাহাব বলেছিল) আসবাব পত্র আমরা একত্র করতে লাগলাম আর তা অনেক উঁচু হয়ে গেল। তার আসপাশে আমরা মোটামুটি দেয়াল বনিয়ে নিলাম এবং এর মাঝখানে উৎবাহ শুইল। রাতে এক সিংহ এল এবং আমাদের সকলেরই মুখের ঘ্রাণ নিতে আরম্ভ করল। অতঃপর সে লাফ দিয়ে আসবাব পত্রের উপরে উঠে গেল এবং উৎবার মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলল। সিংহটি তাকে হত্যা করার সময় তার মুখ থেকে একথা বেরিয়েছিল যে ''আমার তলোয়ার হে কুকুর''। অর্থাৎ আমার তলোয়ার কোথায়! কুকুর আমাকে হত্য করে ফেলছে। সে সিংহটিকে তার অসুস্থ চোখে মনে হয় কুকুর দেখতেছিল। এরপর থেকে সে আর কিছুই বলতে পারল না। (আবু নাঈম)

অন্য এক বর্ণনায় আছে যে সিংহটি উৎবার শরীরকে টুকড়া টুকড়া করে ফেঁড়ে ফেলে। (উৎবার মুখ থেকে শেষ কথা ছিল) ''সিংহ আমাকে মেরে ফেলছে।'' সুতরাং সেখানেই তার মৃত্যু ঘটল। ঘটনার পর আমরা সবাই সিংহটিকে খোঁজাখুজি করতে লাগলাম। কিন্তু তাকে আমরা কোথাও পেলাম না।

হাদীসের দ্বন্দ্ব ও নিরসন:

হাদীসে এসেছে-নবী করিম (সাঃ) এরশাদ ফরমান কুষ্ঠ রোগকে তোমরা যেভাবে ভয় কর তেমনি ভয় কর সিংহকে। অন্য বর্ণনায় আছে যে, নবী করিম (সঃ) এক কুষ্ঠ রোগীর গায়ে হাত বুলিয়ে দোয়া পড়ে তাকে রাসূল (সঃ) এর সহিত খানা খাওয়ান। দোয়াটি ছিল এই,

بسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه

এ ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেন কুষ্ঠ রোগী এবং শ্বেত রোগ সংক্রমিত হয়। অধিকাংশ উলাময়ে কেরাম বলেন, কুষ্ঠ রোগীর সন্তান সন্ততিরাও এই রোগ থেকে কমই আত্ম রক্ষা করতে পারে। এই রোগ পিতার হলে সন্তানের শরীরেও সংক্রমিত হয়। ইমাম দামিরী (রহঃ) বলেন, ইমাম শাফেয়ীর কথা যে, কুষ্ঠ ও শ্বেত রোগ সংক্রমিত হয় এর অর্থ হল সে নিজে নিজে সংক্রমিত হতে পারে না। বরং আল্লাহর দেয়া চিহ্ন যা দাগের মাধ্যমেই সংক্রমিত হয়ে থাকে। এই জন্য আল্লাহ তা'আলার এই নিয়ম প্রচলিত , যদি কোন সুস্থ ব্যক্তি কোন রোগাক্রান্ত (সংক্রামক) রোগীর সহিত স্বাভাবিক চলাফেরা করে এবং একই সাথে চলাফেরা করে তাহলে সুস্থ ব্যক্তিও এই রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা

রয়েছে। এমনিভাবে সে ঘনিষ্টজন তার ভাগ্যের কারণেই এতে লিপ্ত হয়ে পড়ে। যাদ অপরজনও উক্ত রোগে পতিত হয়ে পড়ে তখনই লোকেরা বলতে থাকে যে এই ে রাগটা সংক্রমিত। অথচ নবী করীম (সঃ) এরশাদ ফরমান -ইসলাম ধর্মে ছোঁয়াছে বলে কোন রোগ নেই এবং দূর্ভাগ্য ও মন্দ কাল বলতে কিছুই নেই। (এ ব্যাপারে বিস্তারিত পরে আলোচনা হবে ইনশা আল্লাহ)

ইমাম ছিদলানী (রঃ) বলে "কুষ্ঠরোগীর সন্তান এই রোগ থেকে কোন অবস্থায়ই নিরাপদ থাকতে পারে না।" ইমাম শাফেয়ীর (রহঃ) এই রকম বলা হাসি ঠাট্টার মতই বুঝে নেয়া দরকার যে, ছেলে যেমন পিতার কোন শিরা টেনে ধরার কারণে পিতা মজলুম , তেমনি দ্বিতীয় কথা হল এই যে, এক ব্যক্তি নবী করিম (সঃ) এর নিকট এসে অভিযোগ দায়ের করল যে, আমরা স্ত্রী অত্যন্ত কাল এক সন্তা প্রসব করেছে। (অর্থাৎ সে আমাদের কারো মতই নয়) অতঃপর নবী (সঃ) বললেন এ শিশুটি অন্য কারো কালোরঙ্গের প্রভাবে কালো হয়েছে অর্থাৎ তার পূর্ব পুরুষদের কেহ কাল রং করত। যার প্রভাব এই শিশুর মধ্যে এসে গেছে। এরকম ভাবে হাদীসের ব্যাখ্যার কারণে দুটি হাদীসের মতানৈক্য বিদূরীত হয়ে যায়। যেমন - সর্বনাশা রোগে আক্রান্ত ব্যকি কোন সুস্থ সবল ব্যক্তি তার নিকট গমন করবে না।

অন্য একটি হাদীছে এসেছে যে, কোন এক সময় এক কুষ্ঠ রোগী বাইয়াত গ্রহণের নিমিত্তে নবী করিম (সাঃ) এর নিকট আসে। তখন নবী করিম (উম্মতকে শিক্ষার জন্য) তার দিকে হাত বাড়ালেন না, বরং তিনি একথা বললেন যে, তুমি হাত বাড়িওনা আমি তোমাকে বাইয়াত করে নিলাম।

অন্য হাদীছে নবী করিম (সাঃ) এরশাদ ফরমান যে, কোন সুস্থ সবল ব্যক্তি কুষ্ঠ রোগীর সাহিত সব সময় দেখা সাক্ষাৎ করবেনা। তোমরা যখন এরকম কোন রোগীর সহিত কথা বার্তা বলবে তখন তোমাদের ও তার মধ্যে যে, কম পক্ষে এক নেযাহ পরিমান দূরত্ব বজায় থাকে।

সংক্রমনের ফেকহী মাসায়েল:

শায়খ সালাহুদ্দীন ইরাকী (রহঃ) বলেন, নবী করিম (সাঃ) বলেন কোন সুস্থ ব্যক্তি কুষ্ঠ রোগীর নিকট যাবে না। এই হাদীছ থেকে সুচিন্তিত মত দেয়া যায় যে, যদি কোন শিশুর মা-বাবা কুষ্ঠ কিংবা শ্বেত রোগে আক্রান্ত হয় তাহলে শিশুর

লালন পালনের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেয়ে যাবে। এই জন্য যে, মায়ের সাথে থাকা এবং দুধ পান করার কারণে শিশুরও কুষ্ঠ কিংবা শ্বেত রোগ হওয়ার ভয় থাকে। (কিতাবুল কাওয়ায়িদ)

আল্লামা কামালুদ্দিন দামিরী (রঃ) বলেন, শায়খ সালাহুদ্দীন ইরাকী (রঃ) যা বলেছেন তা একদম পরিস্কার । সুতরাং ইবনে তাইমিয়াহ (রহঃ)ও তা সমর্থন করেন। যেমন কোন রোগাক্রান্ত ব্যক্তি যদি সুস্থ ব্যক্তির সহিত পান্থশালায় বা ঘরে বসবাস করতে চায় তাহলে নিয়মানুবর্তিতা বজায় রাখা দরকার। অথবা সুস্থ ব্যক্তি অনুমতি দিতে হবে। দ্বিতীয় পন্থা হলো-যদি কোন কুষ্ঠ রোগী পূর্ব থেকে কোন ঘরে অবস্থান করতে থাকে অতঃপর সে ঘরে কোন সুস্থ ব্যক্তি স্থায়ী ভাবে থাকার জন্য ঐঘরে আগমন করে তাহলে ঐ রোগীকে ধমকিয়ে ঘর থেকে বের করে দিবে- তবে শর্ত হলো উক্ত সুস্থ ব্যক্তি উক্ত ঘরে থাকার বৈধতা দাবী করতে হবে। আল্লামা দামিরী (রঃ) বলেন, আমাদের ওলামায়ে কের াম এ ব্যাপারে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে, যদি কোন এমন বাঁদী হয় যে, যার মনিব হয় কুষ্ঠ রোগী তাহলে উক্ত বাদীর জন্য ইহা উচিত হবে যে, মনিব কুষ্ঠ রোগীকে তার সহিত থাকার ব্যবস্থা করা।

অন্য আরো একটি পন্থা হল যে, যদি কোন কুষ্ঠ রোগী ব্যক্তি তার স্ত্রীর সহিত থাকার কোন বাদী না না পায় তাহলে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিতে হবে। কেননা এখানে স্ত্রী নিজে স্বাধীন এবং উক্ত স্বাধীনতাকে ইসলামী শরীয়তে অভিবাদন জানিয়েছে।

নবী করিম (সাঃ) এর যুগের এক ঘটনা:

নবী করিম (সাঃ) এক সময় কোন এক মহিলাকে বললেন তোমাকে বাঘে খাবে। ঠিকই দেখা গেল তাকে বাঘেই খেয়েছে।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত অন্য একটি হাদীসে আছে নবী করিম (ঃ) তার সাহাবী (রাঃ) কে বললেন তোমরা কি জান সিংহ গর্জনের সময় কি বলে?

সাহাবাগণ জবাব দিলেন আল্লাহ তাঁর রাসূর (সাঃ)ই ভাল জানেন। নবী করিম (সাঃ) এরশাদ ফরমান সিংহ বলে - হে আল্লাহ তুমি আমাকে নো ভাল মানুষের উপর বিজয়ি করো না।

সিংহের ভয় থেকে নিরাপদ থাকার দোয়া:

হযরত আলী (রাঃ) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) কে বলেন, তুমি যখন এমন কোনা উপত্যকায় থাকবে যেখানে সিংহের ভয় থাকে তখন তুমি এই দোয়া পড়বে

اعوذ بالدانيال وباالجب من شر الاسد

হযরত দানিয়াল (আঃ) এর ঘটনা:

একদা হযরত দানিয়াল (আঃ) কে একটি গভীর কূপে ফেলে দেয়া হয়েছিল তখন বনের হিংস্র প্রাণীরা তার নিকট এসে লেজ দুলিয়ে তাকে স্নেহ মমতা করে তার শরীর চাটতে লাগল। এই অবস্থায় আল্লাহ পাকের একজন ফেরেস্তা আগমন করে এবং হে দানিয়াল হে দানিয়াল (আঃ) বলে ডাকতে থাকেন। তখন হযরত দানিয়াল (আঃ) উত্তরে বলেন, কে আমাকে ডাকতেছেন? ফেরেস্তা বললেন আমি আপনার রবের এক ফেরেস্তা। তিনি (আল্লাহ) আহার্য দিয়ে আপনার নিকট আমাকে প্রেরণ করেছেন। এই সময় হযরত দানিয়াল (আঃ) সংক্ষিপ্ত এই দোয়া পাঠ করেছিলেন:

الحمد لله الذى لاينسى من ذكره الخ (বায়হাকী)

আবু বকর আব্দুল্লাহ বিন আবু দানিয়া একটি ঘটনা বর্ণনা করেন যে, বাদশাহ বোখতে নছর একদা দুটি সিংহকে বন্দী করে একটি কূপে ফেলে দেন। অতঃপর নির্দেশ দিলেন যে, হযরত দানিয়াল (আঃ) কে ও উক্ত কূফে নিক্ষেপ কর। বাদশাহর হুকুম কার্যকর হল, সেখানে হযরত দানিয়াল (আঃ) এর খাদ্যের প্রয়োজন হলো। তখন আল্লাহ তায়াআলা সিরিয়াতে অবস্থান রত হযরত আরমিয়া (সাঃ) কে অহী মারফত জানালেন যে, ইরাকে (কূপের অভ্যন্তরে পতিত) হযরত দানিয়াল (আঃ) এর জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা করে সেখানে যাও। সুতরাং আল্লাহর হুকুমে হযরত আরমিয়া (আঃ) ইরাকে গেলেন এবং কূপের প্রাচীরে দাঁড়িয়ে তার (দানিয়াল) নাম ধরে ডাকতে লাগলেন। এমন সময় হযরত দানিয়াল (সঃ) কূপের অভ্যন্তর থেকে বলতে লাগলেন আপনি কে? কেন আসছেন? তিনি বললেন যে আমি আরমিয়া (আঃ) আমাকে আপনার পরওয়ার দিগার পাঠিয়েছেন। তখন হযরত দানিয়াল (আঃ) এই দোয়া পড়ে ছিলেন:

الحمد لله الذى لاينسى من ذكره والحمد لله الذى لايغيب من

رجاه والحمد لله الذى من وثق به لا يكله الى سواه لله الذى يجزى بالاحسان احسانا والحمد لله الذى يجزى بالصبر نجاة وغفرانا والحمد لله الذى يكشف مزنا بعد كربنا والحمد لله الذى هو ثقتنا حين يسوه ظننا باعمالنا والحمد لله الذى هو رجاء نا حين تقطع الحيل منا۔

এই ঘটনাটিই হযরত আবুবকর আব্দুল্লাহ ইবনে আবু দানিয়া থেকে অন্যভাবে বর্ণিত আছে যে, হযরত দানিয়াল (সঃ) যে বাদশাহর শাসনাধীন ছিলেন তার রাজ দরবারে একদা জ্যোতিষী এবং জ্ঞানীদের একটি দল উপস্থিত হয় এবং তারা বাদশাহকে জানালো যে, অমুক রাতে এমন এক ছেলের জন্ম হবে যে আপনার রাজ্য উলট পালট করে দেবে। এ কথা শুনে বাদশাহ আদেশ জারী করলেন যে, এই রাতে যত ছেলে জন্ম গ্রহণ করবে তাকে হত্যা করে ফেলো। সুতরাং সে রাতেই হযরত দানিয়াল (আঃ) জন্ম গ্রহণ করেন। তার মা বাদশাহর ভয়ে নবজাতক শিশু দানিয়াল (আঃ) কে সিংহ বনে রেখে আসলেন। তাকে ফেলে আসা মাত্রই সিংহও সিংহী এসে যায় এবং হযরত দানিয়াল (আঃ) কে তারা জিহবা দিয়ে চাটতে থাকে। এভাবে আল্লাহ পাক জালেম বাদশাহ থেকে হযরত দানিয়াল (আঃ) কে রক্ষা করলেন।অতঃপর আল্লাহ পাক তাকে সেখান থেকে বের করে এনে সম্মানিত করেন।

এমন একটি ঘটনাও বর্ণিত আছে যে, আবু আব্দুর রহমান ইবনে আবু জুনাদ বলেন যে, আমি হযরত আবু বারদাহ ইবনে আবু মুসা আশয়ারী (রাঃ) এর হাতে এমন একটি আংটি দেখেছি যে যার পাথরে মানুষের ছবি অঙ্কিত ছিল। যাকে দুটি সিংহে উক্ত আংটিকে জিহবা দ্বারা চাটতে ছিল। তখন আবু দারদা (রাঃ) বলেন এই আংটি হযরত দানিয়াল (আঃ) এর ছিল। যা আমার শ্রদ্ধেয় আব্বা এমন এক স্থান থেকে সংগ্রহ করেছিলেন যেখানে হযরত দানিয়াল (আঃ) কে সমাহিত করা হয়েছি। অতএব আমার আব্বা শহরের সমস্ত আলেমদের নিকট এ ব্যাপারে জানতে চাইলেন তারা জবাব দেন যে, হ্যাঁ এই আংটির মধ্যে হযরত দানিয়াল (আঃ) এর ছবি ছিল, যাকে দুটি সিংহের জিহবা দ্বারা চেটে ছিল। এ জন্য তা এখনো বিদ্যমান আছে। এ জন্য আল্লাহপাক এর অনুগ্রহকে বিস্তৃতি ঘটাননি।

আল্লামা কামাল উদ্দীন দামিরী (রহঃ) বলেন হযরত দানিয়াল (আঃ) যখন জন্ম গ্রহণ করেন এবং তাকে জীবনের দুবার মারাত্মক পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষায় তিনি সফলতার সহিত উত্তীর্ণ হন। আল্লাহ্ পাক তাকে এই অনুগ্রহ দান করেন তার নাম নিয়ে হিংস্র ও ক্ষতিকর প্রাণী থেকে বাচার জন্য দোয়া করলে আল্লাহ্ পাক হেফাজত করবেন। মাআজ বিন রেফায়া আনছারী (রহঃ) বলেন একদা হযরত ইয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়া (আঃ) হযরত দানিয়াল (আঃ) এর কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন- তখন তিনি কবরের ভিতর থেকে দোয়া পড়ার আওয়াজ শুনেছিলেন। দোয়াটি হল:

سبحان من تعزز بالقدرة وقهر العبادات بالموت

তৎক্ষণাত এই দোয়ার জবাবে অদৃশ্য থেকে এক আওয়াজ এল যে, হে দানিয়াল আমি সে সত্তা যে নিজের ক্ষমতাবলে শ্রেষ্ঠতম, এবং যিনি বান্দার মৃত্যুর কারণে বান্দাকে অক্ষম করে রেখেছেন যে ব্যক্তি এ দোয়া পড়বে তার জন্য সাত আকাশ ও সাত যমীন ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে।

হযরত দানিয়াল (আঃ) এর সময় কাল:

হযরত দানিয়াল (আঃ) অত্যাচারী ও স্বৈরাচারী শাসক বোখতে নছরের যমানায় জন্ম গ্রহণ করেন। আল্লাহ্ পাক হযরত দানিয়াল (আঃ) কে নবুওয়াত এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দ্বারা সুশোভিত করেছিলেন। ঐতিহাসিক গণের মতে বাদাশাহ বোখতেনছর হযরত দানিয়াল (আঃ) কে ইস্রাইলী বন্দীদের সহিত জেলখানায় বন্দি করেছিলেন। অতঃপর বাদশাহ একরাতে এক ভীতিজনক স্বপ্ন দেখে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। মানুষের নিকট বাদশাহ এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা চাইলে সবাই অপরাগতা প্রকাশ করে। যখন বাদশাহ্ হযরত দানিয়াল (আঃ) এর নিকট উক্ত স্বপ্নের ব্যাখ্যা চাইলেন তখন তিনি ব্যাখ্যা দিলেন। স্বপ্নের তাবীরটি বাদশাহর মনোপুত হল। এখন থেকে বাশাহ্ তাকে সম্মান ও মর্যাদার চোখে দেখতে থাকেন। ঐতিহাসিকগণের মতে হযরত দানিয়াল (আঃ) এর পবিত্র কবর সুয়েজ সমুদ্রে (সুয়েজখাল) দেখা গিয়েছে। সুতরাং আবু মুসা আশয়ারী তার কবর খুঁজতে গিয়ে কৃতকার্য হন। তিনি তার লাশ মোবারককে কবর থেকে বের করে আবার কাফন পরিয়ে জানাযা পড়ে সুয়েজ সমুদ্রের দাফন করে কবরের উপর পানি প্রবাহিত করে দেন।

ইব্রাহী ইবনে আদহামের (রঃ)ধর্মোপদেশ:

আব্দুল জব্বার ইবনে কালীব বলেন যে, একদা এক ভ্রমনে আমি হযরত ইব্রাহীম ইবনে আদহামের সহিত ছিলাম। এমন সময় দেখলাম যে, সম্মুখ থেকে একটি সিংহ আসতেছে তখন তিনি এই দোয়া পড়তে উপদেশ দিলেন।

اللهم احرسنا بعينك اللتى لا تنام واحفظنا بركنك الذى لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا ولا نهلك وانت رجاء نا يا الله يا الله

তিনি দোয়া পড়তেছেন আর আমি দেখলাম যে, আমাদের মঙ্গল হচ্ছে। অর্থাৎ সিংহ আমাদের কিছু করেনি।

ঝাড়-ফুঁক ঃ

দার্শিনকিগণ বলেন যে, কোন ব্যক্তির যদি ভয়, ক্রোধ ও চিন্তা রোগে আক্রান্ত হয় তাহলে নিম্নের আয়াত লিখে শরীরের যে কোন স্থানে বেঁধে দিলে আল্লাহর রহমতে সব দূর হয়ে যাবে। এমনিভাবে দুশমনের উপর বিজয়ী এবং কাজ - কর্মে বরকত, অজ্ঞতা রোগ, শারীরিক কষ্ট ইত্যাদির জন্যও ইহা আশ্চর্য ফলপ্রদ।

এই আয়াতের বৈশিষ্ট হল যে এর মধ্যে বৈয়াকরনিক যাবতীয় অক্ষর সমূহ একত্রিত হয়েছে। এই আয়াত কোন পবিত্র বরতনে লিখে গোলাপ জল, যাইতুন অথবা তিলের তৈলে ধৌত করে শারীরিক কষ্ট যেমন ফোঁড়া, পিছলী, বাগী ইত্যাদি রোগীর জন্য বিশেষ উপকারী। আয়াত গুলো হল:

১ম আয়ত , আলে-ইমরান

ثم انزل عليكم من بعد الغم امنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد اهمتهم انفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الارض من شي قل ان الامر كله لله، يخفون فى انفسهم مالا يبدون لك ، يقولون لوكان لنا من الامر شئ ما قتلنا ههنا قل لو كنتم فى بيوتكم لبراز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم وليبتلى الله ما في صدوركم وليمحص مافى قلوبكم والله عليم بذات الصدور (سوره آل عمران پاره: ٤)

২য় আয়ত, ফাতাহ

محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم فى وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم فى التورات ومثلهم فى الانجيل كزرع اخرج شطاه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار ، وعد الله الذين آمنوا وعملو الصلحت منهم مغفرة واجر عظيما (الفتح : پ٢٦)

জনৈক বাদশাহ এবং তার তাওবা:

ঐতিহাসিকগণ বলেন একদা এক বাদশাহ ঘোরাফেরা করতে করতে এক বস্তীতে এসে উপস্থিত হলে বাদশাহ তৃষ্ণা অনুভূত করলেন। বাদশাহ তখন এক বাড়ীতে গিয়ে পানি চাইলেন। এমন সময় বাদশাহ দেখলেন, কাঁখে করে এক মহিলা পানি নিয়ে যাচ্ছে। বাদশাহ সে মেয়েকে দেখে তার প্রেমে পড়ে যান এবং তার পিছু ধরে। মেয়েটিও বাদশাহর মনোভাব বুঝে ফেলে। মেয়েটি যখন বুঝতে পারল যে বাদশাহর হাত থেকে বাঁচা সম্ভব নয় তখন সে ঘরে প্রবেশ করে একটি কিতাব নিয়ে এলো। মেয়েটি বাদশাহর সামনে কিতাব রেখে চলে গেল এবং বলর যে মনোযোগ সহকারে কিতাবটি পড়ুন। তাহলে আপনি এই কিতাব থেকে সোজা রাস্তায় চলার শিক্ষা পাবেন। বাদশাহ কিতাবখানা পড়তে লাগলেন। হঠাৎ করে তার ভ্যাবিচারের আয়াতের উপর পড়ে। যাতে ভ্যাবিচারকারী নারী ও পুরুষ উভয়ের ব্যাপারে ধমকি ও তিরস্কারের আলোচনা রয়েছে এবং ব্যাভিচারকারীদের জন্য পরকালে অত্যন্ত কঠোর শাস্তির ধমক রয়েছে। আয়াত দেখে বাদশাহর শরীরের লোম খাড়া হয়ে গেল। সুতরাং বাদশাহ পাপ থেকে বিরত রইলেন এবং আর পাপ করবেন না বলে সংকল্প করলেন। বাদশাহ মেয়েটিকে ডেকে কিতাবখানা তার হাতে ফেরত দিয়ে সেখান থেকে বিদায় নিলেন।

ঘটনার সময় মেয়েটির স্বামী বাড়ীতে ছিল না। কিছুক্ষণ পর তার স্বামী ঘরে আসলে মেয়েটি স্বামীর নিকট ঘটনার আদ্যোপান্ত শুনাল। সুতরাং স্বামী -স্ত্রীকে মারাত্মক সন্দেহ করে বসল যে, হয়ত সে বাদশাহর মনোবাঞ্ছা পূরণ করেছে। সুতরাং স্বামী আর স্ত্রীর উপর আর কোন বীরত্ব দেখালনা। অতঃপর স্বীম কয়েকদিন পর্যন্ত এ ব্যাপারটি নিয়ে খুব চিন্তিত রইলেন।

এদিকে স্ত্রী ও তার স্বামীর উপস্থিতিতে নিকটাত্মীয়দের সম্মুখে ব্যাপারটি বর্ণনা করল। সকল আত্মীয় স্বজন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলো যে, ব্যাপারটি কেন বাদশাহর দরবারে আলোচনা করা হবে না?

সে (মহিলা) বাদশাহর দরবারে গিয়ে হাজির হল। সর্বপ্রথম সে বাদশাহকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করে বলল আল্লাহ পাক আমাদের বাদশাহকে সার্বিক মঙ্গ করুন। অতঃপর আত্মীয়রা বলল , হে মহামান্য বাদশাহ! সে (স্বামী) আমাদের নিকট থেকে বর্গাচষের জন্য জমি নেয়। ওয়াদা মত জমি চাষও করে । আবার সে জমিকে বেকার রেখেছে। কিন্তু এখন সে জমি নিজেও করে না আবার আমাদের ফেরতও দেয় না। অথচ জমি পলি পড়ে থাকার কারণে জমিটি বেকার হয়ে যাচ্ছে। বাদশাহ এ আরজি শুনে স্বামীকে বললেন জমি চাষ করতে তোমাকে কে বাধা দিল? (তুমি জমি চাষ করছনা কেন?) স্বামী জবাব দিল বাদশাহ নামাদর! আমার সন্দেহ যে, আমার জমিতে হয়ত কোন সিংহ আছে। আমি তাকে ভয় পাচ্ছি এবং তার ধারে কাছে যাবার শক্তি সাহসও আমার নেই এবং তার সহিত লড়াই করারও ক্ষমতা আমার নেই। বাস! একথা শুনেই বাদশাহ (আসল ঘটনা) বুঝে ফেলেন।

প্রশ্নোত্তর পর্বের পর বাদশাহ স্বামীকে উদ্দেশ্য করে বলেন- দেখ তোমার জমি কিন্তু খুবই বাল এবং চাষবাদের উপযোগী। যাও চাষাবাদ করতে থাক। এখন থেকে সিংহ আর কখনো তোমার জমিতে প্রবেশ করবেনা। অতঃপর বাদশাহ স্বামী স্ত্রী উভয়কে পুরস্কার দেয়ার জন্য আদেশ করে দরবার ভঙ্গ দিলেন।

অন্য একটি ঘটনা :

প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ শামছুদ্দীন ইবনে খল্লেকান বলেন, মারজিয়া বাদশাহ মোতাসিম বিল্লাহর দরবারে হাজির হলে বাদশাহ তার উপর অত্যন্ত রাগান্বিত হন। জনসাধারণ বাদশাহকে তার ব্যাপারে কোন প্রকার দ্রুত সিদ্ধান্ত না নেয়ার পরামর্শ দেয়। কারণ মারজিয়া একজন সম্মানী ও ধনাঢ্য ব্যক্তি। একথা শুনে বাদশাহ কবি আবু তামামের কবিতাটি আবৃত্তি করলেন-

ان الاسود اسود الغاب همتها ☆ يوم الكريهة فى المسلوب لاالسلب

অর্থাৎ: যুদ্ধের দিন সিংহ অর্থাৎ বাহাদুর লোক ধন সম্পদ ও ভোগ্য

পন্যের জন্য আক্রমন করেন না, বরং তার মূল নিশানা হয় সম্পদশালী ব্যক্তি।

খালেদুল কাতেব কত উত্তম কবিতাই না বলেছেন :

علم الغيث الندى حتى اذا ☆ ماوعاه علم لباس الاسد

* (নন্দিত ব্যক্তি) বৃষ্টিকে দান করার ছবক শিক্ষা দিল বৃষ্টি যখন এ ছবক স্মরণ করল তখন বাঘগুলোকে বীরত্ব শিক্ষা দিল।

فاذا الغيث مقر بالندى☆ واذا الليث مقر بالجلد

* কারণ হল বৃষ্টি তাকে চিনে আর বাঘ তার বীরত্ব স্বীকার করে।

ظفر الحب بقلب دنف ☆ بك والقسم بجسم ناحل

* ভালবাসা সে অন্তর অর্জন সফলতা লাভ করল যে তোমার ভালবাসায় অসুস্থ ছিল। আর অসুস্থতা একটি দুর্বল শরীরকে বসে আনতে স্বচেষ্ট।

وبكى العاذل لى من رحمتى☆ فبكانى لبكاء العاذل

* তুমি তিরস্কারী, আমার উপর দয়া করে কেঁদেছ- আমি সে তিরস্কার র কারীর ক্রন্দনে কেঁদেছি।

بكى عاذلى من رحمتى فرحمته☆ وكم مسعد من مثله ومعين

আমাকে তিরস্কারকারী আমার ভদ্রতার কারণে কেঁদে ফেলল-তখন আমিও তার প্রতি দয়া দেখালাম এবং সে যেন আমার কতই সহায়ক।

ورقت دموعى العين حتى كانها☆ دموع دموعى لا دموع جفونى

আর নয়ন যুগল থেকে যখন অশ্রু বর্ষিত হতে লাগল তখন আমার এমন অনুভূত হল যে, ইহা আমার চোখের জল নয় - বরং তা অশ্রুরই অশ্রু।

হযরত নূহ (আঃ) এর একটি ঘটনা:

ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, হযরত নূহ (আঃ) আঙ্গুরের একটি লতা বা গাছ রোপন করলেন। একদিন ইবলিশ এসে উক্ত লতার মধ্যে ফুঁৎকার দিলে তা শুকিয়ে যায়। এ অবস্থা দেখে হযরত নূহ (আঃ) অত্যন্ত বিরক্তি বোধ করলেন। অতঃপর ইবলিস হযরত নূহ (আঃ) এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর নবী! আজ আপনাকে বিমর্ষ দেখাচ্ছে কেন? তিনি ঘটনাটি শুনালেন। ইবলিস হযরত নূহ (আঃ) কে পরামর্শ দিল যে, এই লতাকে সবুজ শ্যামল দেখতে চাইলে

আপনি আমার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করুন। আপনি অনুমতি দিলে আমি এই লতার মধ্যে সিংহ, চিতা বাঘ, ভাল্লুক, বাগডাস, কুকুর, শৃগাল, মোরগ এই সাত প্রকার প্রাণীর রক্ত এনে ঢেলে দেব। আমার বিশ্বস এভাবে করলে লতাটি আবার সবুজ শ্যামল হয়ে উঠবে। হযরত নূহ (আঃ) ইবলিশকে একাজের অনুমতি দিলেন। মূল ঘটনা জানতেন না বিধায় এ অনুমতি দিয়েছিলেন। কারণ সে সময় পর্যন্তও নূহ (আঃ) নজরানা পেশ করার বৈধতা সম্পর্কে কোন প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হননি। ইবলিস শেষ পর্যন্ত উল্লেখিত সাত প্রকার প্রাণীর রক্ত উক্ত আঙ্গুরের লতায় ঢেলে দিল। কি আশ্চর্য! আঙ্গুরের লতা সবুজ শ্যামল হয়ে উঠল। এমনকি যেখানে আঙ্গুর লতায় এক প্রকার ফল ফলত, রক্ত ঢালার কারণে সেখানে সাত প্রকার আঙ্গুর ফলতে শুরু করল। এ জন্য মদ পানকারীরা সিংহের মত সাহসী, ভাল্লুকের মত শক্তিশালী, চিতা বাঘের মত রাগান্বিত, বাগডাসের মত হৈ হোল্লোড় কারী, কুকুরের মত ঝগড়াটে, শৃগালের মত চাটুকার এবং মোরগের মত চেচামেচি কারী হয়ে থাকে। সে যুগেই হযরত নূহ (আঃ) এর সম্প্রদায়ের উপর মদ হারাম করে দেয়া হয়। (রাওযাতুল উলামা)

হযরত নূহ (আঃ) এর নাম ছিল আব্দুল জব্বার এবং তার ভ্রাতার নাম ছাবী ইবনে মালিক। ছায়িবীনের ধর্ম ও মতাদর্শ তার দিকেই সম্পর্কিত। আলেমগণ বলেন, হযরত নূহ (আঃ) দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তাঁর উম্মৎগণকে ধর্মের দিকে আহবান করতে থাকেন। তাঁর আহবানে খুব অল্প মানুষই সাড়া দেয়। হযরত নূহ (আঃ) নিজ উম্মতের জন্য বিলাপ করে (কাঁদে نوح) এ কারণে তাঁর নাম হয় নূহ। (অধিক ক্রন্দনকারী)

আবু মুসলিম খুরাসানীর ঘটনাসমূহ:

আব্দুর রহমান ইবনে মুসলিম যিনি আবু মুসলিম খুরাসানী নামেই বিখ্যাত। উমাইয়্যা গোত্রের সাথে যুদ্ধ করার পর তিনি সব সময় এই কবিতাগুলো পাঠ করতে থাকতেন।

ادركت بالحزم والكتمان وماعجزت ☆ عنه ملوك بنى مروان اذحشدوا
مازلت اسحى بجهد فى دمارهم ☆ والقوم فى غفلت بالشام قد رقدوا
حتى ضربتهموا بالسيف فانتبهوا ☆ من نومه لم ينمها قبلهم احد
ومن رعى غنما فى ارض مسبعة ☆ ونام عنها تولى رعيها الاسد

* আমি সাবধানতা ও বিশ্বস্ততার এমন স্থান অর্জন করেছি - যা মারওয়ান গোত্রের সব রাজা বাদশাহগণ একত্র হয়েও পারেনি।

* তাকে ধ্বংস করার জন্য আমি সর্বক্ষণ চেষ্টা করি আর শত্রুরা শাম দেশে অলস শুয়েছিল।

এক পার্যায়ে আমি তাদের উপর তরবারী ব্যবহার করলাম- তখন তারা এমন ঘুম থেকে জাগ্রত হল, ইতিপূর্বে কেউ এমনভাবে ঘুমায়নি।

* যে ব্যক্তি হিংস্র প্রাণীর আবাসস্থলে অসাবধানতায় ছাগল চড়ায় এবং অলসতার রশি লাগায় তাকে প্রাণীদের দায়িত্ব দেয়া স্বয়ং বাঘকে দেয়ার মতই।

ইতিহাসবিদ শামছুদ্দিন ইবনে খাল্লেকান লেখেন খলিফা আবুল আব্বাস সাফফাহ আবু মুসলিম খুরাসানীর কার্যক্রম ও উত্তম তাদবীরের কারণে তাকে সম্মান করতেন। কিন্তু সাফফাহ ইন্তেকাল করলে তার সহোদর মানসুরকে খলিফা মনোনীত করা হয়। তার শাসনামলে আবু মুসলিম খুরাসানীর পক্ষ থেকে কিছু অহংকারযুক্ত কাজ কর্মের আভাস পান, সে কারণে খলিফা মানসুর তার প্রতি অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে পড়েন। খলিফার রাগ এমন পর্যায়ে পৌছে যে, খুরাসানীকে হত্যা করার জন্য সংকল্প করেন। মানসুর এ ব্যাপারে পেরেশান হয়ে তার সভাসদদের নিয়ে পরামর্শ করেন তাতে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারলেন না।

খলিফা মানছুর মুসলিম একদা ইবনে কুতাইবাহ এর নিকট পরামর্শ চেয়ে বললেন আবু মুসলিম খুরাসানীর ব্যাপারে এখন আমি কি করি? মুসলিম ইবনে কুতাইবাহ উত্তরে বলেন-

لوكان فيهما الهة الا الله لفسدتا

"আসমান ও যমীনে যদি আল্লাহা ব্যতীত আর কোন শাসক থাকত তাহলে উভয়ের মধ্যে ঝগড়া ফাসাদ হতো"

তার কথার ইঙ্গিত ছিল যে, যদি রাজ্যের মধ্যে কয়েকজন বাদশাহ হয় (অর্থাৎ বাদশাহর সমকক্ষ আর কেউ থাকে) তাহলে রাজত্ব উলট পালট হয়ে যায়। খলিফা মানসুর একথা শ্রবনে বলেন হে ইবনে কুতাইবাহ তুমি আমাকে কতইনা উত্তম পরামর্শ দিয়েছ! এখন আমি খুব সাবধানতা ও বুদ্ধির সাথে আগে বড়ব।

খলিফা এখন খুরাসানীর ব্যাপারে সুযোগের অপেক্ষা করতে লাগলেন এবং প্রায় বিষয়েই তাকে ধোকা দিতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত মানসুর একদিন মাদায়েন গিয়ে আবু মুসলিম খুরাসানীকে হত্যার ফন্দী করল এবং সেখানে তাকে ডেকে পাঠাল। খলিফা তার সাঙ্গ-পাঙ্গকে শিখিয়ে দিলেন যে, আমি যখন আমার হাত মুখে রাখব তখনই তোমরা তার উপর আক্রমণ করে বসবে। আবু মুসলিম খুরাসানী যখন খলিফার দরবারে হাজির হলেন, তখন খলিফা খুরাসানীর ত্রুটিবিচ্যুতি বর্ণনা করে তাকে ভর্ৎসনা করতে লাগলেন। আলাপ আলোচনার ভিতর এক পর্যায়ে খলিফা তার হাত মুখে রাখলেন এবং সে মাত্রই পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী ঘাতকদল তার উপর ঝাপিয়ে পড়ল। আবু মুসলিম খুরাসানী চিৎকার করে বলতে লাগলেন , হে আমিরুল মু'মিনীন! আপনি আমাকে শত্রুদের হাতে তুলে দিতে চাচ্ছেন? খলিফা মানসুর বললেন, আল্লাহর দুশমন, তোর চেয়ে আরো বড় কোন দুশমন আছে?

আবু মুসলিম খুরাসানীকে হত্যা করার পর দেখা গেল তার লোকজন বাদশাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করল। খলিফা তাদেরকে দমন করতে এমন এক কৌশল গ্রহণ করলেন যে, বিদ্রোহীদেরকে হাজার হাজার টাকা ও স্বর্নমুদ্রা ঘোষণা দেয়ার আদেশ করলেন। এতে করে সবাই একদম চুপ হয়ে যায়। খলিফা খুরাসানীর মাথা পৃথক করে তার সমর্থকদের সামনে পেশ করলেন। তার পর একটি কাপড়ে জপিয়ে নিলেন।

এ সকল ঘটনা শেষ হওয়ার পর জাফর বিন হানজালা আগমন করলেন। তিনি এসে দেখলেন আবু মুসলিম খুরাসানীর মাথা কাপড়ে মুড়ানো। তখন জাফর বললেন হে আমিরুল মুমিনীন! আজ থেকে আপনার খেলাফতের প্রথম দিন শুরু হল। খলিফা মানসুর অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এ কবিতা আবৃত্তি করেন।

فالقت عصاها واستقربها النوى ☆ كما قرعينا بالاياب المسافر

অর্থাৎ: প্রিয়তমা পরিশ্রান্ত হয়ে নিজ লাঠির উপর ভর করে দাঁড়াল। আর বিরহ বিচ্ছেদ তার প্রকৃতিতে প্রশান্ত ময় হয়ে গেল যেমন মুসাফির প্রত্যাবর্তন করে শান্তির ঢেকুর গিলে।

زعمت ان الذى لا يقتضى ☆ فاستوى بالليل ابا مجرم

তুমি ভাব ছিলে যে, যদি ঋণ পরিশোধ না হয় তাহলে আবু মুজরিমকে

ওজন করে পুরোপুরি হক আদায় করব।

اشرب بكأس كنت تسقى بها☆ امر فى الحلق من العلقم

তুমি যেভাবে পিয়ালাতে অন্যকে পান করিয়ে থাক তা আমিও পান করে দেখব। তখন তা কণ্ঠনালীতে তিক্ত ফলের চেয়েও অধিক তিক্ত মনে হল।

আবু মুসলিম খুরাসানীকে লোকেরা আবু মুজরিমও বলত। তাই কবি আবু দালাম বলে -

ابا مجرم ماغير الله نعمة☆ على عبده حتى يغير ها العبد

খলিফা মনসুর আবু মসলিমকে হত্যার পর জনগণের সামনে একটি ভাষণ দেন। ওহে আবু মুজরিম আল্লাহ পাকের নিয়ম হল তার বান্দার কাছ থেকে নিয়ামত ততক্ষণ উঠিয়ে নেন না যতক্ষণ বান্দা নিজে অকৃতজ্ঞ না হয়।

افى دولت المنصور حاولت غدره ☆ الا ان اهل الغدر آبائك الكرد

হে আবু মুজরিম! তুমি কি মনসুরের রাজত্বে গাদ্দারী করতে চাও। মনে রেখো তোমার পিতৃ পুরুষ কুর্দীরাই কৃতঘ্নতা প্রকাশ করেছিল।

ابا مجرم خوفتنى القتل فانتحى ☆ عليك بما خوفتنى الاسد الورد

আবু মুজরিম তুমি আমাকে হত্যার হুমকি দিচ্ছিলে যে বাঘের ভয় তুমি আমাকে দেখিয়েছিলে সেই তোমার উপর বিজয়ী হয়েছে।

فمن اطاعك فانفعه لطاعطك☆ كما اطاعك واد لله على الرشد

তোমার কথা যদি কেউ মান্য করে তাহলে সে তোমার আনুগত্য করার কারণে তার উপকার কর এবং তাকে সঠিক রাস্তায় তুলে দাও।

ومن عصاك فعافه معاقبة☆ تنهى الظلوم ولا تقعد على ظمد

যে তোমার বিরোধীতা করে তাকে তুমি এমন সাজা দাও যেন অত্যাচারীও বিরত হয়ে যায়, মনের কুটিলতা নিয়ে কাছে উঠ-বসা বৈধ নয়।

তিনি বলেন- শুরু শুরু আবু মুসলিম নেককার লোকছিলেন- পরে তিনি বদদ্বীন হয়ে যান। খলিফা মহিলা কবি নাবেগাহ যুবইয়ানীর কবিতা পাঠ করত: ভাষণ সমাপ্ত করেন।

আবু মুসিলম খুরাসানী সম্পর্কিত আরো কিছু বিষয়:

আবু মুসলিম খারাসানীকে ১৩৬ অথবা ১৩৭ হিঃ শাবানে হত্যা করা হয়। ঐতিহাসিক ইবনে খাল্লেকান বলেন, আবু মুসলিম থেকে হাদিস শুনার কথা প্রমানিত। উলামা ও মোহাদ্দেছীন তার কাছ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। আবু মুসলিম খুরাসানীর ব্যাপারে প্রসিদ্ধি আছে যে, এক সময় তিনি খুৎবা দিতে ছিলেন এ মুহূর্তে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল যে, আপনার মাথায় কাল কাপড় কেন? তিনি বললেন নবী করিম (সঃ) মক্কা বিজয়ের দিন মক্কায় প্রবেশ করার সময় তার মাথায় কাল রং এর পাগড়ী ছিল। এটি রাজকীয় পোষাক এবং শান শওকতের হয়ে থাকে। ইবনে রেফায়া বলেন একাধিক হাদিসে এ বিষয়টি আছে। একদা নবী করীম (সঃ) মিম্বরে আরোহন করলেন। তখন তিনি কাল কাপড়ের পাগড়ী মাথায় বাঁধলেন। আর তার শিমলা উভয় কাধের মাঝখানে ঝুলিয়ে দিলেন। তখন থেকে বনু আব্বাস এই নিয়মে খুৎবা পাঠের সময় কাল রং এর পাগড়ী মাথায় বাধার নিয়ম করে।

কেউ কেউ বলেন, আবু মুসলিম খুরাসানী যে সকল লোকের সাথে যুদ্ধ করে অথবা বন্দী করে অথবা বিনা অপরাধে হত্যা করে তাদের সংখ্যা প্রায় ছয় লাখের কাছাকাছি হবে। বিজ্ঞ উলামায়েকেরাম তার বংশ সম্পর্কে বিভিন্নমত পোষণ করেন। কেউ বলেন তিনি আরবী বংশজোত ছিলেন, কেউ বলেন তিনি ছিলেন অনারবী। আবার কারো মতে তিনি কুরদী বংশের এক গোত্রের লোক ছিলেন। আবু মুসলিম খুরাসানীর ব্যাপারে উলামায়ে কেরাম বলেন আব্দুল্লাহ বিন মোবারকের সাথে তা সাক্ষাত হয়েছে। আব্দুল্লাহ বিন মোবারকের নিকট কেউ প্রশ্ন করল যে, জনাব আবু মুসলিম খুরাসানী ভাল মানুষ ছিলেন না কি তিনি হাজ্জাজ বিন ইউসুফের মত লোক ছিলেন? তিনি বলেন আমি একথা বলবনা যে আবু মুসলিম খুরাসানী ভাল মানুষ ছিলেন বরং তিনি হাজ্জাজ বিন ইউসুফ এর চেয়েও খারাপ ছিলেন।

আবু মুসলিম খুরাসানীর জ্ঞানে ছিল সজীবতা। তিনি ছিলেন বাকপটু এবং উত্তম ব্যাখ্যা বিশ্লেষক। কেউ তাকে কারো সাথে হাসি ঠাট্টা করতে দেখেনি এবং তার মুখমন্ডলে কখনো খুশীর চিহ্নও লক্ষ্য করেনি। তিনি তাড়াতাড়ি রাগান্বিত হতেন না। তিনি বছরে একবারই স্ত্রী গমন করতেন। এ ব্যাপারে তার মতামত

ছিল সঙ্গম এক প্রকার আনন্দ। তার ব্যাপারে আরেকটি প্রসিদ্ধ কথা হল কোন ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করল যে আপনি বনি উমাইয়্যার সঙ্গে কেন বৈরীতা রাখেন? তিনি বলেন ইমাইয়ারা নিজেদের নিকটজনদের বিশ্বাস করেনা নিজেদেরকে নিজেরা অনেক দূরে ঠেলে দেয়। তারা দুশমনদেরকে বিশ্বাস করে আপন করতে চায়। এতে করে দুশমন তো বন্ধু হয়ইনা বরং বন্ধুরা দুশমন হয়ে যায়।

খুরাসীর ব্যাপারে প্রসিদ্ধ যে, বনু উমাইয়্যাকে ধ্বংস করার মধ্যে তিনি খুবই উৎসাহী ছিলেন এবং বনু আব্বাস এর হুকুমত প্রতিষ্ঠা করা এবং এ গোত্র থেকে খলিফা নির্বাচন করার জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেন। তিনি আব্বাসীয় খেলাফত প্রতিষ্ঠা করেই ক্ষান্ত হন।

খলিফা মনসুরের একটি সুন্দর জবাব:

খলিফা মানসুর ইবনে হুবায়রাকে বন্দী করে বলেন যে, আবু হুবায়রা, তুমি কিন্তু নিজেই নিজের মেয়েদের জন্য পরিখা খনন করছ। অবরোধের সংবাদ যখন আবু হুবায়রা অগত হলেন তখন তিনি মানুরকে বললেন আমার ব্যাপারে যে ব্যক্তি একথা বলে তাহলে চলুন, আপনি এবং আমার মধ্যে সামনা সামনি হওয়া দরকার। মানসুর আবু হুবায়রার নিকট এই জবাব প্রেরণ করলো যে, আমার ও তোমার মধ্যে উদাহরণ এরকম যে, সিংহের সামনে একটি শুকর যে রকম। শুকর সিংহকে বলল এসো আমার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। সিংহ বলল আমি কিভাবে তোমার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব। যেহেতু তুমি আমার সমকক্ষ নও। তাতে যদি তোমার দ্বারা আমার কোন ক্ষতি হয়ে যায় তাহলে আমার খুব লজ্জা হবে। কিন্তু যদি আমি তোমাকো পরাজিতও করে ফেলি, তবে তুমি বলবে, আমিতো শুকরই। এতে তো আমার কোন প্রশংসা মিলবে না। আর না তোমাকে হত্যা করলে আমার কোন গৌরব প্রকাশ পাবে। শুকর বলল যদি আপনি আমার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে না আসেন তাহলে আমি সমস্ত হিংস্র প্রাণীদেরকে জানিয়ে দেব যে, সিংহ আমার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে আসেনি সে ভীরু, কাপুরুষ। সিংহ উত্তর দিল তোমর মিথ্যা বলার লজ্জাকে সহ্য করা সহজ কিন্তু তোমার খুনে আমার হাত রঞ্জিত করা কঠিন। (বেদায়া নেহায়া)

সিংহের শরয়ী বিধান :

ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) সহ সকল উলামায়ে কেরাম একমত যে সিংহের গোশত হারাম। উলামায়ে কেরামের দলীল হল ঃ নবী করিম (সঃ) এর হাদীছ - নবী করিম (সাঃ) এরশাদ ফরমান হিংস্র প্রাণীদের মধ্যে যে সকল প্রাণীর দাঁত সূঁচালো অর্থাৎ দাঁত দ্বারা শিকার করে সেগুলো হারাম।

এ ব্যাপারে ইমাম দামিরী (রহঃ) সূচালো দাঁত দ্বারা উদ্দেশ্য উদ্দেশ্য নিয়েছেন যে সকল প্রাণী শুধু সূচালো দাঁত দ্বারা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে শিকার করে। কিন্তু ইমাম মাওরিদী বলেন, ইমাম শাফেয়ীর মাযহাব হল বড় দাঁত দ্বারা উদ্দেশ্য সে সমস্ত প্রাণী যাদের সূচালো দাঁত অত্যন্ত শক্ত এবং শক্তিশালী এবং যার দ্বারা সে অন্য প্রাণীর উপর আক্রমণ করে থাকে। মোট কথা তাদের মতে সুঁচালো দাঁত দ্বারা আক্রমণ করাই হারাম হওয়ার বড় কারণ।

আবু ইসহাক আল মারুযী বলেন, যে সকল প্রাণীর জীবন তাদের সূঁচালো দাঁতের উপরই নির্ভশীর তাদেরকেই বড় দাঁত বিশিষ্ট প্রাণী বলে এবং এগুলি হারাম হওয়ার কারণ। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা (হঃ) বলেন আমাদের মতামত হল বড় দাঁত বিশিষ্ট প্রাণী হলো ঐগুলো যারা প্রথমেই তাদের সূঁচালো দাঁত দ্বারা শিকারকে আক্রমণ করে না। এমনিভাবে সে সকল প্রাণী সূঁচালো দাঁত ছাড়াও বেঁচে থাকে। ফকীহগণ উপরোক্ত তিনটি কারণই বর্ণনা করেছেন। সমস্ত কারণ সমূহের মধ্যে মূল কারণ ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এর। মধ্যম স্তরের কারণ ইমাম শাফেয়ী (রঃ) এর এবং প্রকৃত কারণ আবু ইসহাক আল মারুযী (রঃ) এর। সুতরাং প্রথম দুকারণের মূল ভিত্তির উপর গন্ডার হালাল হয়। এ জন্য যে, গন্ডার নিজেকে নিজে এরকম দেখে যে, সে শায়িত আছে কিন্তু সে তাড়া তাড়ি শিকার বানিয়ে নেয়। ইমাম শাফেয়ীর উল্লেখিত কারণের উপর ভিত্তিতে সমস্ত বিড়ালই হালাল হয়ে যায়। এজন্য বিড়াল নিজের সূচালো দাঁতের সাহায্য নেয় না। যদিও শিকার করাই বিড়ালের উদ্দেশ্য থাকে । সম্ভবত একথা এ জন্য বলা হয়েছে যে, বিড়ালের সূঁচালো দাঁতের শক্তি কম থাকে। কিন্তু ইমাম শাফেয়ীর ২য় মতামত হল, তার মাযহাবে বিড়াল হালাল হওয়ার স্বীকৃতি দেয়। (এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা باب السين এ হবে ইনশা আল্লাহ)

ইমাম শফেয়ী (রহঃ) কর্তৃক বর্ণিত কারণে বাগডাসও হালাল হয়ে যায়। কারণ সে প্রথমে আক্রমন করেই কোন কিছু করে না। কিন্তু ইসহাক মাজুযী (রহঃ) এর বর্ণিত কারণ অনুযায়ী বাগডাসা হালাল নয়। এ জন্য সে সূচালো দাঁতের উপরই নির্ভর করে বেঁচে থাকে। আর একথাই অধিক সত্য বলে বুঝা যায়। ইমাম মালেক (রহঃ) র মতামত হলো তার মাযহাবে সমস্ত সূঁচালো দাঁতের প্রাণীই মাকরূহ। তিনি হারাম বলেন না। তিনি পবিত্র কোরআনের এই আয়াত পেশ করেন।

قل لا اجد فيما اوحى الى محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة اودما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس (انعام ايت: ١٤٥)

হে রাসূর ! আপনি বলে দিন, ওহীর মাধ্যমে যে সমস্ত বিধান আমার কাছে পৌছেছে এর মধ্যে ভক্ষনকারীর জন্য আমি কোন হারাম খাদ্য পাই নাই, যা সে ভক্ষন করে। কিন্তু মৃত অথবা প্রবাহিত রক্ত অথবা শুকরের গোশত এটা অপবিত্র। ইমাম দামিরী (রহঃ) এর মত হল, আমাদের সাথী ইমাম শাফেয়ীর নিকট এই হাদীসই দলীল যার মধ্যে এ ব্যাপারেই আলোচনা রয়েছে যে, সূঁচালো দাঁত বিশিষ্ট প্রত্যেক প্রাণীই হারাম।

ইমাম মালেক (রহঃ) এর দলীলে জবাব হল, উল্লেখিত আয়াতে এ সংবাদ দেয়া হয়েছে যে, সে সময় উল্লেখিত আয়াতে বর্ণিত বিষয়গুলো ছাড়া অন্য বিষয়গুলো হারাম ছিল না। পরে এ ব্যাপারে ওহীর মাধ্যমে নবী করিম (সঃ) কে অবগত কারানো হয় যে, প্রত্যেক সূচালো দাঁত বিশিষ্ট প্রাণী হারাম। এ জন্য এ হাদীছের উপর আমল করা জরুরী হয়ে গেল। আমাদের ইমাম সাহেবও স্বীয় মতাদর্শে জোর দিয়ে বলেন যে, দেখতে হবে আরবের লোকেরা সিংহ, বাঘ, কুকুর, হায়েনা, ভল্লুক ইত্যাদি খায়না। আর না সাপ, বিচ্ছু, ইঁদুর , চিল, কাক, গাধা, শূকর , বুগাছ পাখী ইত্যাদি খায়। বাঘ বেচা কেনা করা যায় না। কারণ তার দ্বরা কোন উপকার পাওয়া যায় না। আল্লাহ পাকও বাঘের মাধ্যমে কোন শিকার করা প্রাণী খাওয়া হারাম বলেছেন।

প্রবাদ বাক্য ও উদাহরণ সমূহ:

আরবদের রীতি হলো, তারা বেশী বেশী প্রাণীদের উদাহরণ ব্যবহার করে থাকে। তারা কারো প্রশংসা বা দনাম করতে গিয়ে কোন প্রাণী দিয়ে

উদাহরণ না দিলে তা অপূর্ণ মনে করে থাকে। এর কারণ সম্ভবত এটিই যে, আরবগণ হিংস্র প্রাণীর জংগল, কীট, মাকড়শা এবং সাপের গর্তের নিকট জীবন যাপন করে। এই জন্য প্রাণীর উদাহরণ দেয়া তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। হযরত আমর বিন আস (রাঃ) বলেন, আমি নবী করিম (সঃ) থেকে কম করে হলেও এক হাজার প্রবাদ বাক্য সংরক্ষণ করেছি। এ জন্য হাসান বিন আব্দুল্লাহ আল আছকারী তার লিখিত "কিতাবুল আমছাল" নামক কিতাবে কম পক্ষে এক হাজার প্রবাদ বাক্য সম্বলিত হাদীস উল্লেখ করেছেন। এ সকল হাদীছের মধ্যে কোন হাদীস এমনও আছে যেগুলোতে সিংহের উদাহরণ রয়েছে।

যেমন আরবগণ বলেন- هو اكرم من الاسد

সে সিংহের চেয়ে অধিক ভদ্র।

هو ابخر من الاسد -তার মুখে সিংহের চেয়েও অধিক দুর্গন্ধ।

هو اكبر من الاسد -সে সিংহের চেয়েও অধিক বয়সের। সে সিংহের চেয়েও অধিক বীর পুরুষ।

هو اشجع من الاسد - সে সিংহের চেয়েও অধিক সাহসী।

এমনিভাবে আরবগণ সিংহের ভয় সম্পর্কেও উদাহরণ দিয়ে থাকেন। একদা মজনু (আমের বিন কায়স) তার প্রেমিকা লাইলীকে বলে

يقولون يوما ما وقد جئت هيهم ☆ وفى باطنى نار يثب لهيبها

একদিন আমি যখন তার (লাইলীর) মহল্লায় গেলাম এবং সে সময় আমার মধ্যে প্রেমের অগ্নিশিখা প্রজ্জলিত হয়ে উঠল, তখন সে বললো:

اما تختشى من اسد نا فاجبتهم ☆ هو كل نفس ابن حل حبيبها

তুমি কি আমাদের বাহাদুর সিংহকে ভয় করনা? আমি বললাম প্রত্যেক মানুষেরই অভিষ্ট লক্ষ্য ঐ স্থান যেখানে তার প্রেমিকা স্থায়ীভাবে বসবাস করে।

আরবগণ বদনামের ক্ষেত্রেও সিংহের উদাহরণ দিয়ে থাকে। اســـــد الشـــرى এমন একটি উপত্যাকার নাম যেখানে অধিক পরিমাণে সিংহ বসবাস করে। সেখান থেকেই সালমার (আরবের প্রসিদ্ধ প্রেমিকা) বাড়ীর রাস্তা ছিল। সুতরাং কবি ফারাজদাক বলে

وان الذى سمعى ليفسدزوجتى ☆ كساع الى اسد الشرى يثتبيلها

যে ব্যক্তি আমার ও আমার স্ত্রীর মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করার চেষ্টা করে সে যেন اسد الشرى থেকে সিংহের বাচ্চা নিয়ে নিল।

কবি ফারাজদাকের প্রখ্যাত কবিতা :

নিম্নে উল্লেখিত কবিতাগুলো কবি ফারাজদাকের সাথে সম্পর্কযুক্ত করা হয়। তার রচনাসমূহের সুক্ষ্মতার প্রশংসার কারণে ফারাজদাককে ক্ষমা করার আশা করা যায়। ঘটনা হল - এক বছর হিশাম বিন আব্দুল মালেক হজ্জ করতে নিজ পিতার কাছে আগমন করেন। তাওয়াফ করার সময় তার ইচ্ছা হলো হাজরে আসওয়াদ চুম্বন এবং তাকে স্পর্শ করে ধন্য হবেন। কিন্তু অতিরিক্ত ভিড়ের চাপে তিনি তা করতে সক্ষম হলেন না। এরপর তার জন্য একটি চেয়ার আনা হল। এতে তিনি বসে পড়লেন। এ অবস্থায় হযরত যায়নুল আবেদীন আলী ইবনে হুসাইন ইবনে আলী (রাঃ) সেখানে আগমন করেন। তিনি দৈহিকভাবে অত্যন্ত সুন্দর ছিলেন এবং সুগন্ধী ব্যবহারের কারণে তাঁর শরীর থেকে সুবাস ছড়াচ্ছিল। তিনি কাবা ঘর তাওয়াফ করার জন্য এগিয়ে গেলেন এবং যখন হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করার ইচ্ছা করলেন তখন বীড় ভেঙ্গে গেল। তিনি স্থান পেয়ে গেলেন। অবস্থা দৃষ্টে হিশাম অবাক হয়ে পড়ল। এই অবস্থায় তার সাথে থাকা সিরিয়ার এক ব্যক্তি বিজ্ঞাস করল শাহজাদা! এ লোক কে? তাকে ইজ্জত করতে গিয়ে জন সাধারণ তো দৃষ্টন্ত স্থাপন করে ফেলল। সিরীয় লোকটিকে হিশাম বলল আমি তাকে চিনি না। অথচ তিনি তাকে চিনতেন। এখানে জন সাধারণের মধ্যে কবি ফারাজদাক ও উপস্থিত ছিলেন। কবি একথা শুনে বললেন যে, আমি তাকে ভাল করে জানি ও চিনি। সিরীয় লোকটি বলল তাহলে বলুন তিনি কে? সে সময় কবি ফারাজদাক হযরত যায়নুল আবেদীনের (রাঃ) শানে কবিতা বলেন:

هذا الذى تعرف البطحاء وطاته☆ والبيت يعرفه والحل والحرم

তিনি সে লোক যাকে প্রস্তরময় প্রান্তরের বিন্ম্র ভূমি, বায়তুল্লাহ, হিল্ল ও হেরেম সবাই ভাল করে চেনে।

هذا على رسول الله والده☆ امست بنور هداة تهتدى الامم

তিনি যায়নুল আবেদীন ইবনে আলী (রাঃ) এবং হুযূর পাক (সঃ) তাঁর নানা। তারই আলোকময় পরিচয়ে জনগণ সঠিক পথের সন্ধান পাচ্ছে।

هذا ابن خير عباد الله كلهم☆ هدا التقى النقى الطاهر العم

তিনি আল্লাহার প্রিয় বান্দাদের সবচেয়ে উত্ত ব্যক্তির ছেলে, পরিস্কার পরিচ্ছন্ন, খোদাভীরু অতি পবিত্রতম এবং তিনি নেতা।

اذا رأته قريض قال قائلها☆ الى مكارم هذا ينتهى الكرم

কোরাইশরা যখন তার দর্শন লাভ করে তখন তারা তৎক্ষনাৎ এমনিভাবে উঠে যায় যে তার সম্মান শেষ পর্যন্ত কতটুকু।

ينمى الى ذروة العزا اللتى قصرت☆ عن نيلها عرب الاسلام والعجم

এই ব্যক্তির মান মর্যাদা ও সম্মান এমন উচ্চাসনে পৌছে গেছে যে মান মার্যাদা অর্জন করতে আরব অনারব সবাই দুর্বল হয়ে যায়।

يكاد يمسكه عرفان راحته ☆ ركن الحطيم اذا ما جاء يستلم

হাজরে আছওয়াদকে চুম্বন করার সময় রুকনে হাতিম তাকে ফেরত দিতে চায় - কারণ সে তার হাতকে (আগে থেকেই) ভাল করে জানে।

فى كفه خيزر ان ريحه عبق☆ من كف اروع فى عرنينة شمم

তার পবিত্র হাতে বাদশাহীর লাঠি যার মধ্যে হোসাইন (রাঃ) এর পবিত্র হস্তের পরশে সুগন্ধি ফুটে রয়েছে এবং যার নাম হোসাইন (রাঃ)

يغضى حياء ويغجى من مهابته☆ فما يكلم الا حين يبتسم

তার লজ্জাশীলতার কারণে দৃষ্টিকে নিম্নমুখী রাখে। কিন্তু তার প্রভাবের কারণে জনতা তাদের দৃষ্টিকে নিম্নমুখী রাখে এবং তিনি যখন মুচকী হাসেন তখন জনতা কথা বলতে সাহস করে না।

ينشق نور الهدى من نور غرته☆ كاشمس ينجاب عن اشر اقها القتم

তার কপালের জ্যোতির কারণে হেদায়েতের নূর প্রকাশ পাচ্ছে যেমনি সূর্যোদয়ে সকল আগমনে অন্ধকার দূর হয়ে যায়।

مشتقة من رسول الله نبعه☆ طابت عناصرة والخيم والثيم

তার সম্মানিত বংশ নবী (সঃ) পর্যন্ত পৌছেছে, তার বংশ অভ্যাস, আচার ব্যবহার সবই পবিত্র।

هذا ابن فاطمة ان كنت جاهله☆ بجده انبياء الله قد ختصموا

তুমি যদি তাকে জানতে না চাও তবে শুন! তিনি ফাতেমা (রাঃ) এর নন্দন এবং তার বংশের ধারাবাহিকতাই নবুওয়তের পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

الله شرفه قد ماوعظه ☆ جرى بذالك له فى لوحه القلم

আল্লাহ তাআলাই তাকে মান মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। যার সম্পর্ক লওহে মাহফুজে কলম জারী হয়।

كلتا يديه غياث عم نفعهما ☆ يستو كفان ولا يعروهما عدم

তার উভয় হাতে অধিক কল্যাণ রয়েছে। তার কাছে অনেক পুরস্কারের আশা করা যায় এবং কখনো তার উপর দারিদ্রতা বিজিত হয় না।

سهل الخليقة لا تخشى بوادره ☆ يزينه اثنان حسن الخلق والشيم

তিনি অত্যন্ত নম্র স্বভাবের লোক, তার পক্ষ থেকে রাগ-ক্রোধের কোন ভয় নেই তিনি ধৈর্যশীল ও বুযর্গী, দুটি মহান গুণে অলংকৃত।

حمال اثقال اقوام اذا قترحوا ☆ حلوالشمائل يحلو عنده نعم

কোন গোত্র তার নিকট ঋন চায়লে তিনি তা সহ্য করেন-তার যাবতীয় আচরণ মধুর , তার নিকট যে কোন সময় চাইলে তিনি হ্যাঁ বলেন।

ما قال لاقط الا لى تشهده ☆ لو لا اتشهد كانت لائه نعم

তিনি ইতিবাচক ব্যতীত কখনো নেতিবাচক কথা বলেন না। যদি ইতিবাচক না হতো তবে তার সেখানে 'না' ও 'হ্যাঁ' হয়ে যেতো।

عم البرية بالاحسان فانقشعت ☆ عنها الغيابة والاملاق والعدم

তার দয়া ও অনুগ্রহের প্রভাব সারা সৃষ্টি জগতের উপর পতিত হয়েছে। তার বদৌলতে সমস্ত মাখলুক থেকে অন্ধকার , দারিদ্রতা , নিঃস্বতা, উপবাস ইত্যাদি বিদূরীত হয়ে গিয়েছে।

من محشر حبهم وبغضهمو ☆ كفر وقربهمو منجى والنعم

তিনি এমন এক স্তরের সাথে সম্পর্ক রাখেন যার সাথে ভালবাসা রাখাই প্রকৃত দ্বীন, বৈরীতা রাখা কুফরী তার নৈকট্য পাওয়া নাজাতের কারণ।

يستدفع السوء البلوى بحبهم ☆ ويستزاد به الاحسان والنعم

তাঁর ভালবাসা ও মহব্বত বিপদাপদ দূর করা যায় তার দ্বারাই নিয়ামতে

ক্রম উন্নতি আসে।

من جده وان فضل الانبياء له☆ وفضل امته دانت له الامم

তিনি সেই ব্যক্তি যার নানার কারণেই নবীগণের বুযর্গী ও সম্মান হয়েছে।

مقدم بعد ذكر الله ذكر همو☆ فى كل بدء ومختوم له الكلم

প্রত্যেক বস্তুতেই আল্লাহর জিকিরের পরই তার জিকির প্রাধান্যপ্রাপ্ত। তার জিকিরের পরই কথা শেষ করা হয়।

وان عدا هلم التقى كانوا ائمتهم☆ او قيل من خيرا هل الارض قيل هم

যদি খোদা ভীরু লোক পরিসংখ্যান করা হয় তাহলে তাকেই গণ্য করা হয়। যদি প্রশ্ন করা হয় যে, যমীনে উত্তম লোক কে? তাহলে জবাব একটাই -তিনিই।

لايستطيع جواد لعد غايتهم☆ ولا بد اينهو ا قوم وان كرموا

কেউই তার মর্যাদায় পৌছতে পারে না, পারে না কোন গোত্র তার সমকক্ষ হতে, হউক সে যতই ভাল।

هم الغيوث اذا مازمه ازمت☆ والاسد الشرى والباس معتدم

যখনই কোন দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় তখনই তিনি বৃষ্টি হিসেবে আবির্ভূত হন। ভীতি ও শংকার স্থানে তিনি হয়ে যান সিংহের ন্যায়।

لاينقص لعسر بطامن اكفهم ☆ سان ذالك ان اثروا وان عدموا

দানশীলতা তার হাতকে সংকোচিত করতে পারে না। তার কাছে সম্বৃষ্টি এবং সংকোচতা সমানই।

يابى لهم ان يحل الذم ساحتهم ☆ خلق كريم وايد بالندى هضم

তাঁর বদনাম করলে তার পুত পবিত্র চরিত্র এবং তার বরকতের হাতেই বাধা দেয়।

اى الخلائق ليست فى رقابهم ☆ لاولية هذا اوله نعم

সৃষ্টির মধ্যে এমন কে আছে যে, যার গর্দানে তাঁর দয়া এবং অনুগ্রহের শৃংখল নেই?

من يعرف الله يعرف اولية ذا☆ فالدين من بيت هذا ناله الامم

যে লোক আল্লাহকে জানেন সে তাঁর বড়ত্বকেও চিনে- কারণ সবাই তারই পারিবারিক সূত্রে দ্বীন অর্জন করেছে।

ان كنت لا تعرفه فالله يعرفه☆ والعرش يعرفه واللوح والقلم

যদি তুমি তাকে না চেন, না জান- আল্লাহ তাকে ভাল ভাবেই জানেন ও চিনেন, আরশ, লওহে মাহফুজ এবং কলমও তাকে চিনে।

وليس قولك هذا بضائره☆ العرب تعرف من انكرت العجم

তিনি কে? তোমার এ কথায় তার কোন ক্ষতি হবে না। কারণ যাকে তুমি হিংসা কর তাকে আরব অনারব সবাই জানে।

কবি ফারাজদাকের মুখে এই কবিতা শ্রবনে হিশামের কিছুটা রাগ এল। সে কারণে মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী আসফান নামক স্থানে ফারাজদককে বন্দী করা হয়। হযরত যায়নুল আবেদীন যখন ব্যাপারটি অবগত হলেন তখন তিনি ফারাজদাকের নিকট ১২ হাজার স্বর্ণ মুদ্রা প্রেরণ করেন এবং ক্ষমা চেয়ে বলেন আমার নিকট আরো বেশী থাকলে তাই দিতাম। ফারাজদাক বলেন, ওহে রাসূলের সন্তান! আমি যা বললাম (কবিতা) তা আল্লাহর রাসূলের মুহব্বতের কারণে বললাম। কিছু গ্রহণের নিমিত্তে বলিনি। হযরত যায়নুল আবেদীন বললেন অনেক অনেক ধন্যবাদ। কথা হল যে, আমি তো আহলে বায়তের লোক, যখন কোন কাজ করি তখন পিছপা হই না। একথা বলায় ফারাজদাক তার দেয়া উপঢৌকন গ্রহণ করলেন। বন্দী শালাতেই তিনি হিশামকে ভর্ৎসনা করলেন। শেষ পর্যন্ত হিশাম তাকে মুক্ত করে দিল।

কবি ফারাজদাকের পরিচয়:

ফারাজদাকের আসল নাম হুমান বিন গালিব। ফারাজদাক তার উপাধি। কিন্তু তার মূল নাম বিস্মৃত হয়ে গিয়ে ফারাজদাকই প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং এতেই তিনি সমধিক পরিচিত হন। আভিধানিকভাবে ফারাজদাক অর্থ হল- গন্ধযুক্ত আটা দ্বারা খাবার তৈরী করা। ঐতিহাসিকগণ বলেন ফারাজদাক নামে প্রসিদ্ধি লাভ করার কারণ হলো যে একদা তার বসন্ত রোগ হয়, আল্লাহ তাআলা তাকে সুস্থ করলে বসন্ত থেকে তিনি মুক্ত হলেন বটে কিন্তু তার মুখমন্ডলে এর দাগ থেকে যায়। যে কারণে তাকে দেখতে কুশ্রী মনে হত। এই কারণেই তাকে ফারাজদাক বলা হয়। কারো কারো মতে এই নামে প্রসিদ্ধ হওয়ার কারণ হলো

তিনি ছিলেন বেঁটে দেহের, চরিত্র হীন এবং রুক্ষ মেজাজের লোক। এ কারণে তাকে ফারাজদাক বলা হয়।

ইবনে খাল্লেকান বলেন, তার পূর্ব পুরুষদের মধ্য থেকে মুহাম্মদ বিন ছুফিয়ান নামের এক লোক ছিল। যাকে সে তিন ব্যক্তির মধ্যে গণনা করা হয় যারা জাহেলিয়্যাত যুগে মুহাম্মদ নাম ছিল। এ জন্য ইতিহাসে এই তিন ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো নাম পাওয়া যায় না। মুহাম্মদ (সাঃ) এর জন্মের পূর্বে তাদের নাম মুহাম্মদ রাখা হয়। তার কারণ হিসেবে বলা হয় যে, এই তিন ব্যক্তির পূর্ব পুরুষদের মধ্য থেকে কোন কোন মানুষ তাদের যুগের কোন এমন বাদশাহর দরবারে আগমন করে যাদের কাছে আসমানী কিতাবের জ্ঞান ছিল। বাদশাহ তাদেরকে নবী করিম (সাঃ) এর আগমন এবং তার পবিত্র নাম সম্পর্কে অবগত করেন। তারা যখন দেশে ফিরে গেল এবং দুনিয়া থেকে বিদায়ের পূর্বে তাদের স্ত্রীদের সন্তান সম্ভবা দেখে অছিয়ত করে ছিল যে, যদি কোন ছেলে সন্তান জন্ম গ্রহণ করে তাহলে তার নাম মুহাম্মদ রাখবে। তারা ইন্তেকালের পরে তাই করা হল যে, ঐ সমস্ত নারীরা তাদের নিজ নিজ সন্তানের নাম মুহাম্মদই রাখল। এই তিন ব্যক্তি হল (১) মুহাম্মদ ইবনে সুফিয়ান মুজাশা'। তিনি কবি ফারাজদাক এর দাদা (২) মুহাম্মন ইবনে আহিহাহ ইবনে জালাহ। তিনি আব্দুল মোত্তালিবের সৎভাই ছিলেন। (৩) মুহাম্মদ বিন হামরান বিন রাবিয়াহ। কিন্তু নবী করিম (সঃ) এর দ্বিতীয় ইসম শরীফ "আহমাদ" এর এই বৈশিষ্ট যে, এর পূর্বে এই নামে কোন ব্যক্তির নাম রাখা হয়নি।

হাদীসে নববী (সাঃ):

হযরত যায়েদ বিন আসলাম (রাঃ) তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত নূহ (আঃ) আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী নৌকাতে আরোহন করার সময় প্রতিটি প্রাণীর এক জোড়া করে নৌকায় উঠালেন। তাঁর সাথীগণ বলল (হে আল্লাহর নবী) আমরা কিভাবে (জাহাযে) শান্তিতে থাকব। যেখানে সিহং আছে? তখন আল্লাহ পাক সিংহের উপর জ্বর চাপিয়ে দিলেন। ভূমন্ডলে সর্ব প্রথম রোগ জ্বর। তখন থেকে সিংহের শরীরে স্থায়ীভাবে জ্বর থাকে। জাহাযের লোকেরা আবার ইঁদূর সম্পর্কে নবীর নিকট অভিযোগ জানালেন যে, ইঁদুর আমাদের রাখা খাবার সরাঞ্জাম এবং অন্যান্য আসবাব বিনষ্ট করে ফেলছে। তখন আল্লাহ পাক

সিংহের মধ্যে হাঁচির ব্যবস্থা করলেন। সিংহ তাই করলো। তার হাঁচি থেকে বিড়াল বের হয়ে এলো। এরপর ইঁদুর বিড়ালকে দেখে চুপসে গেল।

আরেকটি বর্ণনায় আছেঃ

হুযূর পাক (সাঃ) বলেন- আল্লাহ তাআলা যখন নূহ (আঃ) কে আদেশ দিলেন যে, প্রত্যেক প্রাণীর এক জোড়া করে জাহাযে উঠিয়ে নাও, তখন নূহ (আঃ) আরজ করলেন হে আল্লাহ ! আমি সিংহ ও ছাগলের সাথে কি আচরণ করব? এমনিভাবে বাঘ ও ছাগল, কবুতর ও শৃগালের সহিত কিভাবে রাখার চিন্তা করব? তখন আল্লাহ তাআলা ওহী মারফত জানালেন যে, হে নূহ! এই সমস্ত প্রাণীদের মধ্যে কে শত্রুতামী সৃষ্ঠি করল? নূহ (আঃ) বললেন আল্লাহই তো এদের মধ্যে শত্রুতামীর সৃষ্টি করলেন। তখন আল্লাহ বললেন তাহলে আমিই এদের মধ্যে ভালবাসা, মিল মহব্বত সৃষ্টি করে দেব। কেউ কাউকে কোন ক্ষতি করবে না।

চিকিৎসায় সিংহের উপকারিতা এবং তার কতিপয় বৈশিষ্ট :

শাইখ আব্দুল মালেক ইবনে যহীর যিনি বস্তুর বৈশিষ্ট সম্পর্কে জানতেন তিনি বলেন যে, যদি কোন ব্যক্তি তার পুরো দেহে সিংহের চর্বি মালিশ করে তার নিকট কোন হিংস্র প্রাণী আসবে না। না সে ব্যক্তির কাছে কোন হিংস্র প্রাণীর ভয় থাকবে। কুমীর সিংহের হুংকার শুনতে পেলে তার দম বন্ধ হয়ে যায়। কোন ব্যক্তি মাসের প্রথম তারিখে পুরুষ সিংহের পীত ডিমের সাথে মিমিয়ে পান করলে নারীদের সমস্ত প্রতিবন্ধক দূর হয়ে যায়। কোন ব্যক্তি যদি সিংহের চুলসহ চামড়া গলায় তাবিজ রেখে দেয় তাহলে পুরুষের সে রোগ দূর হবে যা বালেগ হবার পূর্বে হয়ে থাকে। কিন্তু বালেগ হওয়ার পরে তা হলে কোন কাজে আসবে না। কোন স্থানে সিংহের লোমে আগুন দেয়া হলে তার গন্ধে সেখান থেকে সকল হিংস্র প্রাণী পালিয়ে যাবে। সিংহের গোস্ত অর্ধাঙ্গ রুগীর জন্য বিশেষ উপকারী। সিংহের চামড়া যদি কাপড়ে জড়িয়ে সিন্দুকে ভরে রাখা হয় তাহলে কাপড়ে উই পোকা ধরবে না। কেউ যদি সিংহের দাঁত সাথে রাখে তাহলে দাঁতের রোগ থেকে মুক্ত থাকবে। সিংহের চর্বি হাত পায়ে মালিশ করলে ঠান্ডা লাগার কোন ভয় নেই। আর সারা শরীরে মালিশ করলে উকুন ইত্যাদির কোন ভয় থাকবে না। হেকিম হারমাছ বলেন সিংহের চামড়ার উপর বসলে অর্শ্ব, গেঁটেবাত, আঙ্গুলের

যে কোন ধরনের রোগ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। সিংহের চর্বি গোলাবের তৈলে মিশিয়ে চেহারায় মালিশ করা হলে সাধারণ জনগণ কেন বাদশাহ পর্যন্ত তাকে ভয় করবে।

ত্বরানী বলেন যে, সিংহের পীত দ্বারা সুরমা বানিয়ে ব্যবহার করলে চোখের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। কারো হলমী রোগ হলে সিংহের পীত্তরস পৌনে চার রতি সমান ইসাবগোল ও পোদিনা পাতা একত্র করে ভক্ষণ করলে রোগ ভাল হবে। সিংহের অন্ডকোষ, মগজ ও সোহাগা এবং ছাতু একত্রে মিশিয়ে শুকিয়ে পাতলা করে শরবতের মত ব্যবহার করলে পেটের যাবতীয় রোগ দূর হয়ে যাবে। ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে পড়া লোক সিংহের চর্বি মালিশ করলে স্বস্তি ফিরে আসবে। এমনিভাবে এর পায়খানা শুকিয়ে পরিস্কারক কোন সুগন্ধির সাথে মিশিয়ে শরীরে যে কোন সাদা দাগে লাগিয়ে দিলে তা আরোগ্য হবে। সিংহের পায়খানা শুকিয়ে কোন মদ্যপকে না জানে মত পান করিয়ে দিলে সে আর মদ পান তো করবেই না, এমনকি মদ দেখা মাত্রই একে ঘৃণা করবে। যদি কেউ সিংহের পীত মধুর সাথে মিশিয়ে গলগন্ড রোগে মালিশ করে তাহলে রোগ উপশম হবে। সিংহের চর্বি রসুনে মিশিয়ে হালকা করে শরীরে মালিশ করা হলে কোন হিংস্র প্রাণী কাছে ভিড়বে না।

স্বপ্নের ব্যাখ্যা:

স্বপ্নে সিংহ দেখলে এর ব্যাখ্যা বিভিন্ন প্রকার হতে পারে: যেমন, সে অত্যাচারী হবে, জবর দখলকারী হবে অথবা সে হবে বীর বাহাদুর। আবার সে কারো বিনাশকারী শত্রুও হতে পারে অথবা সে কোন কাজে পূর্ণরূপে সফল হবে। আক্রমনের বিজয়ী হওয়ারও চিহ্ন হতে পারে।সিংহ সকল প্রাণীর মধ্যে এমনই বিপদসংকুল যে, তার থাবা থেকে না কোন সুহৃদ আর না কোন দুশমন বাঁচতে পারে। স্বপ্নের ব্যাখ্যাতাগণ বলেন যে, স্বপ্নে সিংহ দেখলে মৃত্যু নিকটবর্তী বলে প্রতীয়মান হয়। সে জন্য এই ধরনের মানুষ যেকোন ভাবেই মৃত্যুর নিকট চলে যায়। কিন্তু কোন কোন সময় সে মারাত্মক ব্যাধি থেকে মুক্ত, সুস্থ হওয়ার সুসংবাদ বহন করে। স্বপ্নে কেউ দেখল যে, সিংহ তাকে দেখে পালিয়ে যাচ্ছে। এর ব্যাখ্যা হবে যে, সে যে ব্যাপারে ভয় করছে সে ব্যাপার থেকে সে মুক্তি পাবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেশের শাসক অথবা সম্পদশালী হওয়ারও আলামত

বহন করে। তাই পবিত্র কোরআনে এরশাদ হচ্ছে:

ففرت منكم لما خلفتكم فوهب لى ربى حكما وجعلنى من المرسلين

আমার যখন ভয় হলো তখন আমি তোমাদের কাছ থেকে পালিয়ে গেলাম। তারপর আমার পালনকর্তা আমাকে বুদ্ধি-মত্তা দান করেছেন এবং তাঁর প্রেরিত পুরুষদের মধ্যে আমাকে শামিল করলেন।

আল্লামা মোহাম্মদ বিন শিরীন বলেন, কেউ দেখল যে সিংহ তার সামনে এসেছে এরপর সিংহটি তার কাছ থেকে চলে যাচ্ছে। এর ব্যাখ্যা হবে, সে লোক স্থায়ীভাবে কোন অসুখে নিপতিত হবে অথবা জেলখানায় জীবন কাটাবে। এ জন্য রোগবালাই মোমিনের জন্য জেলখানা কিন্তু কখনো কখনো এরকম হয় যে, অসুস্থতার মধ্যে নিপতিত হওয়ার ব্যাখ্যা প্রদন করে। যদি কেউ দেখে যে, সে সিংহের পশম/গোস্ত/হাড় গ্রহণ করেছে, তাহলে তার ব্যাখ্যা হবে এই যে, সে ব্যক্তি কোন বিচারক অথবা কোন শত্রুর কাছ থেকে ধন-সম্পদ প্রাপ্ত হবে। যদি কেউ দেখে যে, সে সিংহের উপর আরোহন করেছে, কিন্তু তার ভয় অনুভব হচ্ছে , তাহলে তার ব্যাখ্যা হবে, সে কোন বিপদ-আপদ অথবা কোন কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হবে। সিংহের উপর আরোহী যদি ভয় না পায় তাহলে ব্যাখ্যা হবে, সে তার শত্রুর উপর বিজয়ী হবে। যদি কেহ দেখল যে সে সিংহের সাথে একত্রে শুয়ে আছে। এর ব্যাখ্যা হবে, সে তার দুশমন থেকে নিরাপদে থাকবে। কেউ দেখল যে সে নিজে সিংহের মাথা খেয়ে ফেলছে। এর ব্যাখ্যা হবে সে কোন রাজ্যের শাসক হতে যাচ্ছে। কেউ দেখ যে, সে সিংহকে চিড়ে ফেঁড়ে মেরে ফেলছে, তাহলে সে কোন দুশমনের সাথে বন্ধুত্ব করবে। কেউ দেখ যে, সে সিংহের বাচ্চা কোলে নিয়েছে, স্বপ্ন দেখাকালীন তার স্ত্রী যদি গর্ভবতি হয় এবং স্ত্রীর সহিত স্বপ্ন বলল যে, তুমিতো এক ছেলে সন্তান জন্ম দিয়েছো কিন্তু স্বপ্নতো এরকম নয় তাহলে এর ব্যাখ্যা হবে যে, সে কোন নেতার সন্তানকে লালন পালন করবে। যদি কেউ দেখে যে তাকে দেখে সিংহ তর্জন-গর্জন করছে তাহলে ব্যাখ্যা হবে যে, সে অসুস্থ হয়ে পড়বে। যদি দেখে যে, সিংহ তাকে হত্যা করে ফেলছে। দর্শক যদি গোলম হয় তাহলে সে আযাদ হয়ে যাবে। অন্যথায় দর্শক কোন বিচারককে ভয় করবে। কেউ দেখল যে, সিংহ তর্জন গর্জন করছে তাহলে ব্যাখ্যা হবে যে কোন বিচারকের পক্ষ থেকে তার প্রতি ধমক আসবে। যদি কেউ দেখে

যে, সিংহ তার সাথে চাটুকারীতা করছে তাহলে তার ব্যাখ্যা হবে যে, তার পক্ষ থেকে কোন আশ্চার্য ঘটনা প্রকাশ পাবে অথবা তার সকল শত্রু পরাজয় বরণ করবে।

শিক্ষণীয় কথা:

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেন যে, মানুষ যদি একথা বুঝে নেয় যে, ইলমে কালাম তর্ক শাস্ত্র বতিল রুচি ছাড়া আর কিছুই নয়- তাহলে এ শাস্ত্র থেকে জনগণ এভাবে পালাবে যেভাবে সিংহ দেখে পালিয়ে যায়।

ইমাম গাযালী (রহঃ) বলেন, যদি তার নিকট যুদ্ধবিদ্যা অধ্যয়ন করা এবং অলংকার শাস্ত্র অর্জন করা না জায়েযই হয় যেমন তিনি জ্যোতিষ শাস্ত্র সম্পর্কে বলেন, তাহলে অলংকার শাস্ত্র কি বৈধ নাকি ছওয়াবের কাজ। কিন্তু এছাড়া কোন কোন উলামায়ে কেরাম অলংকার শাস্ত্রের ধারাবহিকতার মধ্যম পন্থা থেকে হঠকারিতা করেছেন এবং তা শিক্ষা করা আর না করার ক্ষেত্রে উলামায়েকেরামের মতবিরোধ প্রকাশ করেছেন।

উলামাদের মধ্যে যারা বিরোধীতা করেছেন তারা বলেন ইলমে কালাম শিক্ষা করা ও দেয়া বিদআত অথবা হারাম। অধিকন্তু উলামায়েকেরাম এও বলেছেন যে, কোন বান্দা তার প্রভূর সাথে শিরক ব্যতীত সব পাপ করে মিলিত হওয়াটা ইলমে কালাম শিক্ষা করে তার প্রভূর সাথে স্বাক্ষাত করার চেয়ে উত্তম।

কেউ কেউ বলেন, কালাম শাস্ত্র শিক্ষা করা শুধু ওয়াজিবই নয় বরং ফরজ হয়ত ফরজে কেফায়া নয়ত ফরজে আইন। এ ফতোয়া থেকে তাদের উদ্দেশ্য হল কালাম শাস্ত্র শিক্ষা করা এবং শিক্ষা দেয়া উত্তম কাজ এবং নেক কাজ বরং তা ইবাদতের মধ্যে উত্তম ইবাদত। কারণ কালাম শাস্ত্র দ্বারা আল্লাহর একত্ববাদের জ্ঞান আরো মজবুত হয়। কালাম শাস্ত্র দ্বারা দ্বীন এবং মিল্লাত এর সমস্ত বিরোধী শক্তির মোকাবেলা করা যায়।

যারা কালাম শাস্ত্র শিক্ষা করা হারাম বলেন, তারা হলেন ইমাম শাফেয়ী, মলেক, আহমাদ, সুফিয়ান (রহঃ) এবং আহলে হাদীসের আলেমগণ। ইবনে আব্দুল আলা বলেন, একবার ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) হাফসুল ফারদ এর সঙ্গে মুনাজারায় নিমগ্ন ছিলেন। আমি ইমাম শাফেয়ীর নিকট শুনে ছিলাম যে, শিরক ব্যতীত সব রকম পাপ করেই সে তার প্রভূর সাথে সাক্ষাত করা ইলমে

কালামের আলেম হয়ে স্বাক্ষাত করার চেয়ে উত্তম। ইমাম শাফেয়ী একথাও বলেছেন যে, আমার নিকট আহলে হাদীছ উলামাদের একথা সংবাদ পৌছেছে যে, (যদি আমার জানা না থাকত) তাহলে আমি ধারণাও করতাম না যে সে এমন কথা বলেছে যে, বান্দা তার প্রভূর যাবতীয় নিষিদ্ধ বস্তুর চর্চা করেছে কিন্তু শিরকে অংশ নেয়নি তাহলে কোন ক্ষতি নেই সে ঐব্যক্তির তুলনায় উত্তম যে ইলমে কালাম পড়ে থাকে।

কারাবীস (রহঃ) থেকে বর্ণিত যে ইমাম শাফেয়ীকে কালাম শাস্ত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি ক্রোধ প্রকাশ করে বলেন এ ব্যাপারে হাফসুল ফরদ এবং তার অনুসারীরা প্রশ্ন করলে আল্লাহ পাক তাদের ধ্বংস করে দেবেন। বর্ণিত আছে যে, যখন ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) অসুস্থ হয়ে পড়লেন তখন হাফসুল ফরদ তার নিকট আসেন এবং বলেন আমি কে? ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেন তুমি হাফসুল ফরদ (আল্লাহ পাক তোমাকে রক্ষা করবেন না।) আর না তুমি আল্লাহর হেফাজতে আছ। যতক্ষণ না তুমি এই কাজ থেকে প্রত্যাবর্তন করছ যার মধ্যে তুমি নিমগ্ন আছ। তিনি (রহঃ) এও বলেছেন যে যদি তুমি কারো নিকট শ্রবণ কর যে, সে এই বিষয়ে আলোচনা করছে তাহলে এই নামীয় বর্ণনা হয় অথবা অন্য কিছু তাহলে স্বাক্ষী থেকো যে, সে ঐ সমস্ত উলামাদের মত যাদের না আছে কোন দ্বীন আর না আছে কোন মতাদর্শ।

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেন যে, কালামবাদীদের ব্যাপারে আমার ফতোয়া হল যে, তারা খেজুরের বাকলের সহিত মারা যাবে আর ভবঘুরে হয়ে যাবে। তিনি এও বলেন, তাদের শাস্তি এরকম হবে যারা কিতাবুল্লাহ এবং রাসূলের সুন্নত ত্যাগ করে নিজেদের মনগড়া একটা কিছু বানিয়ে নিয়েছে।

এ ব্যাপারে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) এর মতামত হল -কালাম শাস্ত্রের আলেম -এর কোন মঙ্গল হবে না। তিনি আরো বলেন কালাম শাস্ত্রের সাথে সম্পর্ক যুক্ত ব্যক্তির অন্তরে নিশ্চয়ই কোন অদৃশ্য রোগ বিদ্যমান আছে। যেমন- কপটতা, দ্বিধাদ্বন্দ্ব, সন্দেহ, বক্রতা এবং বিভ্রান্তি। আবার ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) এর বৈঠকেই এ জঘণ্য কথায় তার বক্তব্য অনেক দীর্ঘায়িত করেন এবং বলেন যে, আল হিরার ছুলমাহদী তার চেষ্টা সাধানায় ও খোদাভীতির মাধ্যমে বিদয়াতীদের কথা বাতিলের জন্য কিতাব লিখে ছিলেন।

কিন্তু পরে এ সিদ্ধান্ত বাতিল করেন। ইমাম আহমদ তার নিকট বলেন যে, আমার অনুশোচনা হয় যখন তিনি বিদআতের বিরুদ্ধে কিতাব রচনা করেন তখন সর্ব প্রথম বিদআতকে পরিবর্তন করেন নি। এর পর থেকেই এর উপর বাতিল লেখা হতে থাকে।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল সে মজলিশে কালাম শাস্ত্রের সমালোচনা করে দীর্ঘ বক্তব্য প্রদান করে বলেন যে, আলহারাসুল মারাসী ধার্মিক ও খোদাভীরু হওয়া সত্বেও বিদআতী ও বাতিল ফেরকার অন্তর্ভূক্ত। আত্ম পূজারী ও বিদআতীদের সাক্ষ্য গ্রহণ যোগ্য নয়। ইমাম মালেক (রহঃ) এর একথার উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে তার কোন কোন শাগরিদ বলেন তিনি আহলে বাতেল দ্বারা উদ্দেশ্য নিয়েছেন প্রবৃত্তি পূজারী। হোক সে যে কোন মতাদর্শের অনুসারী। ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) বলেন যারা কালাম শাস্ত্রের সাহায্যে বিদ্যার্জন করেছেন তারা নাস্তিক। (অর্থাৎ যারা বিদ্যার্জনের ব্যাপারে কালাম শাস্ত্রকে হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করেছেন অর্থাৎ কালাম শাস্ত্র দ্বারা সূচনা করেছেন তারা বেদ্বীন) সলফে সালেহীনদের কোন কোন আহলে হাদীছ ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর এমতামতকে সমর্থন করেছেন। সুতরাং কালাম শাস্ত্র শিক্ষা করার ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের পক্ষ থেকে অনেক সাবধানতা রয়েছে। কিন্তু যারা ধর্ম জ্ঞানে সুপন্ডিত হয়েও অধিক কঠিন শব্দ ব্যবহার করেছেন এরা হিসেবের বাইরে।

অন্যান্য দের দলীল সমূহ:

দ্বিতীয় মত পোষণকারীগণ বলেন যে, কালাম শাস্ত্র শিক্ষা করা ওয়াজিব বা ফরজ। তাদের প্রমাণ হল কালাম শাস্ত্রের শুধু সে অংশই নিষিদ্ধ, যার মধ্যে বস্তুর জাওহার বা আরজ হওয়ার ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে। কারণ হলো তা এমন একটি পারিভাষিক বিষয় যার অস্তিত্ব সাহাবায়ে কেরামের যুগে ছিল না। তাই আশ্চর্য ও বিরল কোন বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা কণ্ঠনালী থেকে বের করার জন্য এভাবে করা হয় যে, দেখুন যে কোন জ্ঞান হোক সেখানে মানুষকে বুঝানোর জন্য এবং যেহেনকে উপস্থিত ও তেজ করার জন্য এমন কিছু পরিভাষা তৈরী করা হয়। যেমন হাদীছ ও তাফসীর সম্পর্কে এমন কতগুলো পরিভাষা এবং ফেক্বাতে এমন কতগুলো আগাম মাসআলা আবিস্কার করা হয় যেগুলো বাস্তবায়ন খুবই বিরল। সুতরাং আমাদেরকে প্রমাণ দেওয়ার জন্য এমন কিছু পক্ষ

অবলম্বন করে রাখতে হয় যে গুলো দিয়ে সময় সাপেক্ষে বেদআতীদের মেধাকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়া যায় এবং তাদের উপস্থিত দলীলকে খন্ডন করা যায়। এসব শুধু মাত্র মেধাকে গতিশীল করার জন্য এবং সময় সাপেক্ষে দালিলিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার জন্য প্রয়োজন। যেমন যুদ্ধের আগে যাবতীয় অস্ত্র সরাঞ্জাম তৈরী রাখা আরকি।

একটি আপত্তি ও তার জবাব:

কেউ যদি বলে যে, কালাম শাস্ত্র অর্জনের ব্যাপারে আপনার কাছে প্রাধান্য প্রাপ্ত এবং গ্রহণযোগ্য কথা কোনটি? এর জবাব হলো কালাম শাস্ত্রে সম্পূর্ণভাবে নিন্দা বা সম্পূর্ণ ভাবে প্রশংসা এর বৈধতার প্রবক্তা হওয়া মোটামুটি ভাবে ভূল, এর পেছনে বিস্তারিত আলোচনা ও ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে। বিস্তারিত আলোচনা হলো:

বিস্তারিত ও বিশদ ব্যাখ্যা:

১। কোন কোন বস্তু এমন আছে যে যার মধ্যে নিষিদ্ধ ব্যাপারটি স্থিত রয়েছে। যেমন মদ ও মৃত প্রাণী। এগুলোর মধ্যে হারামের গুনাগুণই উপস্থিত রয়েছে। প্রথমটিতে হল যে, মদ মানুষকে নেশাগ্রস্ত করে দেয়। তার জ্ঞান বুদ্ধি বহাল থাকেনা। দ্বিতীয়টিতে মৃত হওয়া, যার মধ্যে সুস্থতার এবং পবিত্রতার কিছুই থাকে না। এতে দুর্গন্ধ ও নষ্ট হওয়ার অবস্থা সৃষ্টি হয়ে যায় । অধিকন্তু মানুষিক সুস্থতার জন্য ক্ষতিকারকও বটে। এর ব্যাপারে মানুষ যদি আমাদের কাছে ফতোয়া চায় তাহলে আমরা হারাম হিসেবে ফতোয়া দিয়ে থাকি। এবং এর অন্যদিকে মনোযোগ দেয়া হয়না। অপারগ অবস্থায় মৃত বস্তু ও মোবাহ হয়ে যায়। যেমন মানুষ খানা খাওয়ার সময় গলায় খাদ্য আটকে গেলে এবং বের করার জন্য মদ ব্যতীত আর কোন কিছু না পেলে মদ পান করাও মোবাহ হয়।

২। আবার কোন কোন বস্তু এমন আছে যা নিষিদ্ধ হওয়ার উপকরণ মূল বস্তুতে থাকেনা বরং কোন বাহ্যিক গুণের কারণে নিষিদ্ধ হওয়ার হুকুম তার উপর বর্তে। যেমন মুসলমান কোন বস্তু ক্রয় করল এবং এতে আলোচনার সুযোগও রেখেছে তাহলে এই আলোচনার সময় সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে তা বিক্রি করা জায়েয নয়। দ্বিতীয় উদাহরণ হলো জুম্মার আযানের সময় ক্রয়-বিক্রয় করা, তৃতীয় উদাহরণ মাটি ভক্ষন করা ইত্যাদি। কারণ মাটি খাওয়া অনেক

ক্ষতির কারণ। আবার মাটি খাওয়ার মাছআলাতে অনেক সুরত রয়েছে যে, কম খেলে ক্ষতি না বেশী খেলে? এজন্য মূল কথা হলো মাটি খাওয়া হারাম। যেমন-বিষ প্রাণ বধকারী, চাই কম হউক বা বেশী হউক। উভয় অবস্থাতেই হারাম। আর যদি বেশী খাওয়া হয় তাহলে নিশ্চিতভাবে ক্ষতি বেশী হয় বরং মানুষকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। তাই বিষকে সম্পূর্ণ রূপেই হারাম বলা হবে। মধু অতিরিক্ত পান করা। এমন ব্যক্তির জন্য ক্ষতিকারক যার মেযাজ খিটখিটে। আর তা একেবারে মাটির মতই। এজন্য মাটি বেশী কাওয়া ক্ষতি প্রমাণিত। এ জন্য মদ হারাম হওয়ার উপর সর্বোতভাবে আদেশ জারী করা অতঃপর মধু সর্বোতভাবে হালাল হওয়ার উপর আদেশ জারী করার জন্য এর বাহ্যিক অবস্থার উপর দৃষ্টিপাত করতে হবে। তাই কোন বস্তুতে আদেশ জারী করতে হলে এর বাহ্যিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুঝা গেল সবচেয়ে উত্তম হলো কালাম শাস্ত্র এর ব্যাপারে শান্তনা মূলক আলোচনা করা অর্থাৎ এভাবে বলতে হবে যে, কালাম শাস্ত্র ক্ষতি কারক, আবার উপকারও করে। এজন্য কালাম শাস্ত্রের উপকারীতা সম্মুখে রেখে উপকার লাভের সময় এর প্রয়োজনীয়তাকে চোখের সামনে হালাল বা মানদুব বা ওয়াজিব স্বীকৃতি দেয়া হবে। আর যদি কালাম শাস্ত্রের মাধ্যমে ক্ষতি বা বিনষ্ট হওয়ার ভয় থাকে সে সময় তা হারাম হয়ে যাবে। কালাম শাস্ত্রের মাধ্যমে এমনভাবে ক্ষতি হয় যে, কোন কোন সময় এর দ্বারা সন্দেহ সৃষ্টি হয় বিশ্বাসে নম্রতা আসে, এর দৃঢ়তা ও আস্থা বিনষ্ট হয়ে যায়। এ অবস্থা মানুষের প্রাথমিক অবস্থাতেই সৃষ্টি হয়। যখন সন্দেহজনক প্রমানাদী হয় অথবা এতে মানুষ মতবিরোধ করে তখন এভাবে বিশ্বাসের মধ্যে গড় বড় হয়ে থাকে। তাছাড়া কালাম শাস্ত্র দ্বারা আরো ক্ষতি হয় যে, কোন কোন সময় বেদআতীরা নিজেদের উদ্ভাবনে এমন শক্ত অবস্থান গ্রহণ করে যে, যার উপর ভিত্তি করে তারা হঠকারিতার সুযোগ পায়। এমনি ভাবে তাদের বিশ্বাসে আরো পূর্ণতার সৃষ্টি হয়। কিন্তু এ ক্ষতি শুধু অনুসরণ ও অনুকরণের ভিত্তিতে ঝগড়ার কারণে সৃষ্টি হয়।

কালাম শাস্ত্রের উপকারিতা:

দর্শন শাস্ত্রের উপকারিতা হলো এতে প্রকৃত অবস্থাকে সুবিন্যস্ত ভাবে

বর্ণনা করা হয়। আর যার উপর বাস্তব অবস্থার ভিত্তি করা হয় এর পরিচিতি লাভ হয়। অন্যান্য উপকারীতার মধ্যে সাধারণের বিশ্বাসের সংরক্ষণ এবং বেদআতীদের সন্দেহ। এদেরকে সব ধরণের বিভ্রান্তি থেকে বাচানই উদ্দেশ্য হয়। এ কারণে সাধারণ লোক জ্ঞানানুযায়ী পুরোপুরি অবগত হতে সক্ষম হয় না। বরং তারা এ ব্যাপারে দুর্বল হয়ে থাকে। যে কারণে তারা বেদআতীদের আলোচনায় ভীতির মধ্যে পড়ে যায় এবং পরাস্ত হয়। (সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো) যে , সাধারণ লোক নিজেদেরকে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করাটা কর্তব্য মনে করে। এজন্য সাধারণ মানুষের বিশ্বাসকে বেদাআতীদের শিক্ষা এবং তাদের কুসংস্কার থেকে নিরাপত্তা বিধান উলামায়েকেরামের দায়িত্ব। যেমনিভাবে ধনসম্পদ এবং ন্যান্য অধিকার সংরক্ষণ করা তার কাজ হয়, এমনিভাবে জন্ম মৃত্যুর মাসআলাতে যতক্ষণ পর্যন্ত উলামায়ে কেরাম যে মাসআলাটি শিক্ষাদেন এবং এর প্রচার প্রসারের জন্য প্রস্তুত থাকেন না, সে সময় পর্যন্ত সে বিদ্যা বাকী থাকেবনা। আবার তা ছেড়েও দেয়া হলে জ্ঞান খতম হয়ে যাওয়ার আশংকা।

স্মর্তব্য বিষয় হলো দর্শন শাস্ত্রের মুদ্রণ এবং একে কিতাব আকারে পেশ করার মাধ্যমে বেদআতীদের সন্দেহ যুক্ত বিষয়াদি দূর করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়। যতক্ষণ না তা শিক্ষা ও চর্চার মাধ্যমে যেহেনে বসানো হয়। এজন্য উপযোগী মনে হয় যে, কালাম বা দর্শন শাস্ত্রকে তাদরীসী রূপ দিয়ে তা পড়তে পড়াতে থাকাও জরুরী। কিন্তু ইলমে কালাম পড়া কোন সাধারণ লোকের কাজ নয়- যেমন ফিকহ ও তাফসীর পড়া সাধারণ লোকের কাজ ন। ইলমে কালাম ঔষূধের মত আর ফিকাহ শাস্ত্র খাদ্যের মত। স্পষ্ট যে, খাদ্যের ক্ষতি থেকে নিরাপদ থাকা কঠিন কাজ। আর ঔষধ থেকে বেচে থাকা যায়।

একটি সংসয় ও তার নিরসন:

কেউ যদি বলেন যে, উলামায়ে কেরাম একত্ববাদের সংজ্ঞা বর্ণনা করেছেন যে, তাওহীদ হল ইলমে কালামের আলোচনা পর্যালোচনার বিধি বিধানের সহিত পরিচিত হওয়া, এ প্রতিদ্বন্দ্বির যাবতীয় আপত্তিকে নিজ বৃত্ত কর্মের মধ্যে আয়ত্ব করার নাম তাওহীদ তথা একত্ববাদ। আর এ ধরনের লোক কখনো একত্ববাদের প্রয়োগ সোবাহ-সন্দেহ সৃষ্টি করার যোগ্যতা ও ক্ষমতা এবং নিন্দনীয় জবাব দেয়ার যোগ্যতার উপরও করে থাকে। এমনকি এদের মধ্যে

কোন কোন স্তর নিজেদেরকে আহলে হাওহীদ ও আহলে আদল পর্যন্ত বলেছে। এর জবাব হল এই যে, এটি একত্ববাদের সংজ্ঞা নয় বরং অন্য সংজ্ঞা হল যে যাকে দার্শনিকদের একটি দল নিজেরাই তা বুঝতে অসহায়, কিন্তু তারা যদিও বা কিছু বুঝতে পেরেছেন, তাও সঠিকভাবে একত্তবাদের সংজ্ঞা বর্ণনা করার যোগ্যতা রাখেনা।

একত্ববাদের প্রকৃত সংজ্ঞা:

তাওহীদ তথা একত্ববাদের প্রকৃত সংজ্ঞা হলো (জগতে) যে সকল কর্ম সম্মুখে আসে অথবা কোন ঘটনা ঘটে- হউক এর সম্পর্ক ভাল বা মন্দের সাথে, এর সবই আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে এবং তার নির্দেশেই হয় এমন বিশ্বাস রাখা। বিশ্বাস এভাবে রাখবে যাতে কিছু মনোযোগের দিকেও পরিবর্তন হয়ে যায়। এটি সবচেয়ে উত্তম তাওহীদ। তাওহীদ একটি মূল্যবান পাথর যার উপর দু'প্রকার চাদর মোড়ানো হয়েছে। প্রকাশ্য কথা হল এগুলোর মধ্যে একটি চাদর প্রকৃত মূল্যবান পাথরের কাছাকাছি হবে অন্যটি দূরে।

তাওহীদের প্রথম ধাপ হলো, মুখে লাইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়বে। এটি তাওহীদই বটে। তবে এটি এমন তাওহীদ যার মাধ্যমে খৃষ্টানদের ত্রিত্ববাদের বিশ্বাস বাতিল হয়। কিন্তু এ ধরণের তাওহীদের স্বিকারোক্তি কোন কোন সময় মোনাফিক লোকেরাও করে থাকে। যার আভ্যান্তরীন বিষয় প্রকাশ্য বিষয়ের সহিত মিল থাকে না।

তাওহীদের দ্বিতীয় ধাপ হলো লা ইল্লাহ ইল্লাল্লাহর স্বিকৃতি দেয়ার পর অন্তরে কোন প্রকার লুকোচুরী বা কোন দ্বন্দ্ব-সন্দেহ বিদ্যমান না থাকা। বরং গোপনীয় বিষয়ের মত বাহ্যিক দিক থেকেও সে বিশ্বাসের প্রভাব বর্তমান থাকে। এ ধরনের তাওহীদ সাধারণ মানুষের সাথে সম্পৃক্ত। সুতরাং দার্শনিক আলেমগণের কর্তব্য হল যে, তারা এ ধরনের তাওহীদের ব্যাপারে সাধারণ লোককে রক্ষা এবং তাদেরকে দেখাশুনা করতে থাকবে। আর বিরুদ্ধবাদী ও বিদাআয়তীদের সন্দেহ সমূহকে তাদের থেকে বিদূরীত করে তাদেরকে বিশ্বাসযোগ্য অন্তরে পরিণত করতে থাকবে। উলামায়ে কেরাম ও ফুকাহায়েকেরাম এই একত্ববাদ বা তাওহীদের মূল্যবান রহস্যকে দুটি চাদরে আবৃত করেছেন এবং সে দুটি ধাপ থেকে সমস্ত লোককে জড়িত করেছেন। কিন্তু

লোকের অবস্থা এ হলো যে, তারা তাওহীদের এ দুটি চাদরকে এমনিভাবে ছেড়ে দিয়েছেন যে, এর সহিত কোনই সম্পর্ক নেই।

একন বাকী থাকল তাওহীদের মগজ কি? তাহলো এই যে, বাহ্যিক যাবতীয় বিষয়কে এরকম বুঝতে হবে যে, এগুলো যা কিছু আছে তার সবই আল্লাহর পক্ষ থেকেই এসেছে। তার সহিত সামান্য মনোযোগ বস্তুর দিকেও থাক চাই। এর পর সে এমনভাবে আল্লাহ্ তাআলার ইবাদত করতে থাকবে যাতে বুঝা যায় সে প্রকৃত স্রষ্টাকে উপাস্য এবং তারই ইবাদতের জন্য এক মাত্র যোগ্য মনে করছে এবং তার ইবাদতের সাথে অন্য কাউকে অংশীদার করে না। এই বিস্তারিত আলোচনার পর উল্লেখিত সংজ্ঞা থেকে আকাইদ বাতিলাহ্ এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ বের হয়ে যাব।

এখন বুঝতে হবে, যে ব্যক্তি নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করল, সে তাঁর প্রবৃত্তিকে নিজের উপাস্য করে নিল। পবিত্র কুরআনে রয়েছে

افرأيت من اتخذ اله هواه، ابغض اله فى الارض عند الله هو الهوى

দুনিয়াতে আল্লাহর নিকট বান্দার ঘৃণিত উপাস্য হল তার প্রবৃত্তি।

প্রকৃত কথা হল যে, যে ব্যক্তি শুধু নিজ চিন্তাভাবনা উপর কাজ করবে তার উপর একথা বর্তাবে যে, ভূত পূজারী মূলত ভূতের পূজা করেনা বরং সে তার প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে। (এর কারণ হিসেবে বলা যায় যে, তার পূর্ব পুরুষরা যে ধর্মের অনুসরণ করত আর যে অবস্থায় যিন্দেগী কাটাত এর প্রভাব থেকে তার বংশধররাও বাঁচতে পারেনা, বরং সন্তান সন্ততিরাও এ রঙ্গেই রঙ্গীন হয়ে যায়) তারা সে তার নফস যে দিকে ধাবিত সে কাজেরই অনুসরণ করে থাকে। যা প্রবৃত্তিরই পুজা। সুতরাং এ ব্যাখ্যায় সৃষ্টির উপর কঠোরতা আরোপ করা এবং এর দিকে প্রত্যাবর্তন করা তাওহীদ থেকে বের হয়ে যাবে।

যে ব্যক্তি এ বিশ্বাস পোষণ করে যে, দুনিয়াতে যা কিছুই হচ্ছে বা হবে তা সবই আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছানুযায়ীই হচেছ বা হবে। কোন মানুষই কারো প্রতি কাঠিন্যতা আরোপ করতে পারেনা। এরূপ উধ্বতন স্থানের নাম তাওহীদ। এটি তাওহীদে সিদ্দীকীনদের এই স্থান হয়। এখন আপনি ভেবে দেখুন যে আপনার যেহেনকে কোন বস্তুতে ঘুরিয়েছে? এবং তাওহীদের কোন চাদরে সন্তুষ্ট হতে চান। প্রকৃত একত্ববাদী হলো যার আক্বীদা এই হয় যে, আল্লাহ এক এবং তার

সমস্ত উপায়ের কেন্দ্র এই সত্তাই। নিজের যাবতীয় ফিকর ও চিন্তাকে এর মধ্যেই জমাটবদ্ধ করে দিতে হবে।

আল্লামা দামিরী (রহঃ) বলেন, আমি আলজাওয়াহিরুল ফরীদ ফি ইলমিত্তাওহীদ নামক কিতাবের অষ্টম পরিচ্ছেদে বিস্তারিত ভাবে এর উপর আলোচনা করেছি। যাতে করে সব ধরণের সন্দেহ দূরীভূত হয়ে যায়। অধিকন্তু আমার কিতাবকে পূর্ববর্তী আলেম সমাজের কথাকে সাহাবায়েকেরামের কথা দ্বারা সুসজ্জিত করেছি।

জ্যোতিষ শাস্ত্র:

জ্যোতিষবিদ্যা শিক্ষা করা ও অর্জন করা নিন্দনীয় কাজ। নবী করিম (সঃ) এরশাদ ফরমান যখন তকদীরের আলোচনা হতে দেখবে তখন চুপ থাকবে। যখন তারকার আলোচনা হতে দেখবে তখন চুপ থাকবে। আর আমার সাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারে যখন সমালোচনা হতে থাকবে তখনও চুপ থাকবে। অন্য একটি হাদীছে আছে নবী করিম (সঃ) বলেন আমার পরবর্তী উম্মতের ব্যাপারে আমি তিনটি বিষয়ের ভয় অনুভব করছি। (১) নেতৃস্থানীয় লোকদের অত্যাচার ও বাড়াবাড়ি থেকে (২) তারকা রাজির উপর বিশ্বাস ভক্তি থেকে এবং (৩) অদৃষ্টের প্রতি অস্বীকার করা তেকে।

আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর (রাঃ) বলেন, জ্যোতিষবিদ্যা শুধু তুমি এতটুকু শিখতে পার যতটুকু দ্বারা জল ও স্থলের রাস্তা সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। এর চাইতে বেশি শিক্ষা গ্রহণ করো না।

তিন কারণে জ্যোতির্ষবিদ্যা শিক্ষা করা নিষিদ্ধ। প্রথমত: এর দ্বারা মানুষের বিশ্বাস প্রতিক্রিয়াশীল হয়। তারা যখন একথা জানতে পারে যে, তারকার গতির পরে অমুক নাবঃ উদ্ভাবন দুর্ভ্যাগ্য হবে। তাহলে এটি তার অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, তারকাই প্রকৃত ফলদায়ক আর তাই উপাস্য। আর এটি জগত পরিচালক। কারণ এই যে, সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম মহামূল্যবান আকাশের উদারতার উপর বিপত্তি যে কারণে অন্তরে তার বড়ত্ব জামে যায়। এমন অনুভব করতে থাকে যে, ভাল মন্দ যা কিছু ঘটে এর দ্বারাই হয়। এ বিশ্বাসের কারণে আল্লাহর স্মরণ অন্তর থেকে বের হয়ে যায়। কমজোর ও দুর্বল বিশ্বাস ব্যক্তির দৃষ্টি বস্তু থেকে আগে বাড়ে না। তবে বিজ্ঞ আলেম বস্তুর হাকীকত সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত

থাকে।

দ্বিতীয় কারণ হলো, জ্যোতিষীদের যাবতীয় ভবিষ্যদ্বাণী সম্পূণ অনুমান প্রসূত। যে কোন প্রকৃত বিষয় সম্পর্কে এদের জ্ঞান নেই। সে সময় যৌক্তিক বিষয়ও প্রকাশ পায় না। গনক বিদ্যার প্রতি নির্দেশ জারী করা আর মূর্খতার প্রতি নির্দেশ জারী করার মতই। এ অবস্থায় গনক বিদ্যার নিন্দা শুধু এ জন্য করা হয় যে, ইহা নিরেট মূর্খতা এ জন্য নয় যে, ইহাও বিদ্যা।

হযরত ইদ্রিস (আঃ) এর ব্যাপারে প্রসিদ্ধ যে, তাকে জ্যোতিষ বিদ্যা দান করা হয়েছিল। তবে তা ছিল মো'জেযা স্বরূপ। এখন তো এই বিদ্যা শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু বর্তমানে আমরা দেখতে পাই যে, গণকের দেয়া কোন কোন সংবাদ সঠিক হয়ে যায়। তবে তা ঘটনাক্রমেই হয়ে থাকে। এর বাইরে আর কিছু নয়।

কোন কোন সময় গণক তাদের নিয়মের উপর একটি ঘটনা বলে ফেলে। তবে এর কারণ সম্পেকে তার কিছু জানা থাকে না।যে কারণগুলো সম্পর্কে জানা বুঝা মানুষের সাধ্যের বাইরে। ঘটনাক্রমে জুতিষীর ব্যাখ্যা মত কাজ হয়ে যায় যা আল্লাহ তাআলা করে দেন। আর সে শর্তসমূহ পূর্ণ না হলে তার দাবী মিথ্যা হয়ে যায়। যেমন কোন ব্যক্তি পর্বতের উপর থেকে ঘোর অন্ধকারে মেঘমালা দেখে শুধু অনুমান করে বলে দিল যে, আজ বৃষ্টি হবে। অথচ আকাশে মেঘ থাকার কারণে সম্ভাবনা রয়েছে যে বৃষ্টি হতে পারে। আবার তাও সম্ভাবনা রয়েছে যে, বৃষ্টি না হয়ে ধোয়াও বের হতে পারে। তাহলে একথা সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, শুধু মেঘ হওয়াই বৃষ্টি হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয় বরং বৃষ্টি হওয়ার জন্য অন্যান্য কারণও থাকতে পারে। এমনিভাবে কোন নাবিক দিক দেখেই এ দাবী করে না যে, নৌকা নিরাপদেই চলতে পারে। যদিও সে বাতাস সম্পর্কে পারদর্শী এবং বাতাসের গতি সম্পর্কে সে ভাল করে জানে। তবু বাতাসের অন্য কোন কারণ থাকতে পারে যা তার জ্ঞানের বাইরে। এ জন্য কোন কোন সময় তার কথা সত্য হতে পারে আবার কখনো তার এই অনুমান ভূলও হতে পারে।

তৃতীয় কারণ হল গনক বিদ্যা দ্বারা কোন উপকার নেই। এ জন্য তা একটি অপ্রয়োজনীয় বিদ্যা। অতিমূল্যবান জীবনকে এ ধরনের কাজে ব্যয় করা যার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই। তা কি কোন বুদ্ধিমানের কাজ? এর মধ্যে সময় ব্যয় করে সীমাতিক্রম করা মারাত্মক ক্ষতি হয়। যেমন এক হাদীসে আছে-

একদা নবী করিম (সঃ) এমন একজন লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন যার চতুর্পার্শে অনেক লোক ভীর জমাচ্ছিল। নবী করীম (সঃ) জিজ্ঞেস করলেন সে কে? লোকেরা বলল হে আল্লাহর নবী (সঃ) সে একজন গণক। নবী (সঃ) বললেন, সে কোন ব্যাপারে অভিজ্ঞ? লোকেরা বলল সে কবিতা ও আবরদের বংশাবলী সম্পর্কে অভিজ্ঞ। নবী (সঃ) বললেন তার কাছে এমন বিদ্যা রয়েছে যাতে কোন উপকার নেই এবং এতে মারাত্মক ক্ষতির কারণ রয়েছে।

আরেক বর্ণনা অনুযায়ী ''ইলম মূলত তিন প্রকারের হয়ে থাকে (১) আয়াতে মুহকামা-র ইলম (২) সুন্নাতে জারিয়ার ইলম (৩) উত্তরাধিকার সুত্রে প্রাপ্ত সম্পদের ইলম।

বর্ণিত হাদীসদ্বয় থেকে বুঝা যায় যে, জ্যোতিষ বিদ্যা এবং এর ন্যায় অন্যান্য ইলমে আত্ম নিয়োজিত থাকা নিজকে বিপদে ফেলে দেওয়ারই নামান্তর এবং অহেতুক কাজে সময় ব্যায় করা। তাই ভাগ্যে যাই কিছু আছে ঘটবেই। আবার এও ধারনা করা প্রয়োজন যে, গণক বিদ্যার মাধ্যমে চিকিৎসা এবং ইলমে তাবীর দ্বারা যাচাই না করা উচিত। কারণ চিকিৎসার সাথে মানবিক প্রয়োজনীয়তা জড়িত রয়েছে। দ্বিতীয়তঃ এর অধিকাংশ প্রমানদি দার্শনিক ও চিকিৎসকগণ অবগত হয়ে থাকেন। এমনিভাবে স্বপ্ন ব্যাখ্যার জ্ঞান তা যদিও অনুমান ভিত্তিক, কিন্তু এ থেকে হাদীছসমূহে নবুওতের ছেচল্লিশতম অংশের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। আবার এতে কোন প্রকার ভয় এবং আক্বীদা-র বিনষ্টের সন্দেহ নেই।

ইমাম দামিরী (রঃ) বলেন এর প্রয়োজনীয়তার দিক বিবেচনা করে আমরা আমাদের কিতাবে এ দু'প্রকার ইলম (চিকিৎসা ও তাবীর) থেকে চিত্তের কিছু খোরাক বা আকর্ষণ গ্রহণ করেছি। কারণ এ ধরনের ইলমে ভূলের সম্ভাবনা তুচ্ছ।

الابل

(২) উট

الابل অর্থ উট। এর বহুবচন آبال আসে। কিন্তু যখন يا নিসবতী বা সম্বন্ধ বাচক ইয়া যুক্ত করা হয় তখন ابلى তথা যবর যুক্ত ইয়া হবে। ইবনে সায়্যিদা বলেন جمال শব্দটি اسم واحد বহুবচনেও এর প্রয়োগ হয়ে থাকে।

মূলত শব্দটি বহুবচন নয়। আর না اسم جمع বরং শব্দটি জিন্স হিসেবেই ব্যবহৃত হয়। জওহারী লিখেন যে, جمال শব্দের বহুবচন হবে না। বরং শব্দটি স্ত্রী বাচক। তাই নিয়ম হল যে, اسم جمع যার একবচন এর শব্দসমূহ থেকে হবে না এবং তা বোধ সম্পন্নদের বেলায় ব্যবহৃত হয় তাহলে, এ সমস্ত শব্দের জন্য স্ত্রীলিঙ্গ থাকা করা অত্যাবশ্যক। কিন্তু শব্দটিকে যখন تصغير বানানো হয় তখন ১ এর বৃদ্ধি করা হয় যে اُبَيلة ।

উরওয়াতুল বারেক্বী এর বর্ণনা, "নবী করিম (সঃ) এরশাদ ফরমান (প্রাণী জগতে) উট গৃহস্তের জন্য সম্মান ও মর্যাদার প্রতীক। ছাগল বরকতের কারণ হয় এবং ঘোড়ার কপালে তো মঙ্গল ও সৌভাগ কিয়ামত পর্যন্ত নির্ধারিত রয়েছে। (ইবনে মাজাহ)

ওহাব ইবনে মুনাব্বেহ এর বর্ণনা, হযরত আদম (আঃ) নিজ নিহত ছেলের জন্য এত দীর্ঘ সময় পর্যন্ত উট জমা করতেছিলেন যে, কতদিন হচ্ছিল তার কোন হিসাব নেই। এ দীর্ঘ সময় হযরত হাওয়া (আঃ) এর সাথে সাক্ষাৎ হয়নি। (তার কাছ থেকে দূরে ছিলেন কোন প্রকার মিলন হয়নি)।

আভিধানিকগণ বলেন , আরবরা উটকে نبات الليل বলে থাকেন। যদি উট নয় বছরের অথবা চার বছরের হয় তাহলে এই শ্রেণীর নর ও মাদীর জন্য بعير শব্দ ব্যবহার করা হয়। এর বহুবচন ابعرة، بعراة এবং এর جمع الجمع باعر، باعروا ইত্যাদি আসে। شارف বৃদ্ধা উটনীকে বলে। এর বহুবচন شرف، شروف، شرف، شرف ইত্যাদি আসে। দুই কুজ ওয়ালা উটকে عوامل বলে। উট অত্যন্ত আনুগত্যশীল প্রাণী। কিন্তু রোজ রোজ দেখতে দেখতে এর বিরলতা চলে গেছে।

উটের কতিপয় বৈশিষ্ট:

উটের বিশেষ গুণ হল, সে খুবই ভারী বোঝা নিয়ে কোন প্রকার কষ্ট ছাড়াই অনায়াসে চলতে পারে। আবার নিজের ইচ্ছানুযায়ী বসতেও পারে। তার আনুগত্যের ধরন হল তাকে যদি কোন মাদী ইদুরও তার নাকের রশি ধরে কোথাও নিয়ে যায় তাহলে অনায়াসে নিয়ে যেতে পারবে। তার পৃষ্ঠদেশ এতই প্রশস্ত যে, মানুষ এর পিঠে করে মাল পত্র খানা-পিতার বস্তু, প্রয়োজনীয় বাসন কোসন লেপ-তোষক বালিশ, কাপড় চোপড় ইত্যাদি নিয়ে আরোহন করতে

পারে। আরোহীর মনে হবে সে যেন তার ঘরেই বসে আছে। এই সকল ভারি আসবাব নিয়ে সে অনায়াসেই চলা ফেরা করতে সক্ষম।

পবিত্র কোরআনে এমন বিস্ময়কর অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করেছে "তারা কি উটের প্রতি লক্ষ করে না যে, উটকে কিভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে ? আল্লাহ তাআলা তার দীর্ঘ ঘাড় এজন্য সৃষ্টি করেছেন যাতে সে ভারী বোঝা নিয়ে উঠাবসা করতে পারে এবং ভারী বোঝা উঠাতে পারে। যে দেশে উট নেই সে দেশের লোককে উট সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে তারা খুব চিন্তা ফিকিরি করে এই জবাবই দেবে যে, উট হল এমন প্রাণী যার ঘাড় হয় অত্যন্ত লম্বা। আল্লাহ তাআলা উটকে এমন করে এজন্য সৃষ্টি করেছেন যাতে পানির নৌকার মত উটও স্থলের নৌকা হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

উটের গুণাবলীর মধ্যে এও একটি যে, সে পিপাসা নিবারণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে থাকে। ভ্রমনাবস্থায় যদি ১০ দিনও পানি পান না করে তাতেও সে ধৈর্য ধরে থাকে। এমনিভাবে উট সে সমস্ত ঘাস লতা পাতাও খায় যা অন্য তৃণভোজী প্রাণীরা খায় না। হযরত সাঈদ বিন যুবাইর বলেন যে, একদা পথি মধ্যে আমার সাথে কাজী সুরাইহ এর সাক্ষাৎ ঘটল। আমি তাকে বললাম জনাব আপনি কোথায় যাচ্ছেন? তিনি বললেন, আমি কোনছাহ (কূফা শহরের নিকট একটি গ্রাম) যাচ্ছি। আমি আবার বললাম সেখানে গিয়ে কি করবেন? তিনি বললেন, আমি সেখানে গিয়ে দেখব যে, আল্লাহ পাক উটকে অতি আশ্চার্য করে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ পাক উটকে নৌকার সাথে এজন্য তুলনা করেছেন যে, উটও যেন এক প্রকার স্থলের কিস্তির।

হাদীছে উটের আলোচনা:

হুযূর পাক (সাঃ) বলেন, উটকে ভাল মন্দ বিলো না, কারণ সে রক্ত চোষণ যন্ত্র বিশেষ এবং সে ভদ্রলোকের আংটি বিশেষ। উপরোক্ত কথার মর্ম হল, উটকে রক্তপন হিসেবে দেয়া হয়। যার বদৌলতে ভরণ-পোষণ, লাভবান এবং প্রাণ হেফাজতে থাকে। হত্যাকারী কেসাস (হত্যার বদলা হত্যা) থেকেও বাঁচতে পারে। অন্য এক বর্ণনায় আছে নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, উটকে ভাল মন্দ বলোনা। কারণ সে আল্লাহর মহত্বের রূহ। ইবনে সঈদা তার মর্ম এই বলে ব্যক্ত করেছেন, সে সকল সম্পদের মধ্যে উটকে গণ্য করা হয় যার দ্বারা আল্লাহ পাক

মানুষকে প্রাচুর্য দান করেন।

আরেক বর্ণনায় আছে, উটকে গালি দিওনা, কারণ সে আল্লাহ তাআলার মহত্বের প্রাণী। হযরত আবু মুসা আশআরী (রাঃ) এর এক হাদীছে নবী করীম (সাঃ) এরশাদ ফরমান, পবিত্র কোরআন সবসময় তিলাওয়াত করতে থাক। (তাহলে ভুলবে না) আমি সে সত্তার কসম করে বলছি যার হাতে মোহাম্মদ (সাঃ) এর প্রাণ, কোরআন এত তাড়াতাড়ি সিনা থেকে বের হয়ে যায় যে উটও এত তাড়াতাড়ি তার সশি থেকে সরে যেতে পারে না, (বোখারী - মুসলিম))

হযরত ইবনে উমর (রাঃ) এর বর্ণনা, নবী করিম (সাঃ) এরশাদ ফরমান যে, কোরআন তেলাওয়াতকারীর তুলনা হল-বাঁধা উটের মত। যদি মালিক এর তদারকী করে তাহলে সে বন্দী এবং রক্ষিত থাকে। আর যদি তাকে ছেড়ে দেয় তবে সে চলে যায়। তেমনিভাবে কুরআন মজিদও যদি একে রাত দিন তেলাওয়াত করতে থাকে তবে তা অন্তরে রক্ষিত থাকে আর যদি কোরআন তেলাওয়াত না করে তাহলে তার অন্তর থেকে কোরআন বের হয়ে যায়।

উপরোক্ত রাবী থেকে আরো একটি হাদীছ বর্ণিত যে, মানুষ খারাপ উটের মত। যার উপর কোন আরোহীই আরোহনের উপযোগী নয়।

উটের বিভিন্ন প্রকার:

☆الارجية। ঐ উটকে বলা হয় যাকে বনী আরহব গোত্রের প্রতি সম্পর্কযুক্ত করা হয়। এ গোত্র হায়দানের একটি শাখা। শাইখ ইবনে সালাহ বলেন ارجية ইয়ামনী উটকে বলা হয়। ☆الشذقمية : নোমান ইবনে মানজারের এক অতি সুন্দর উটের নাম ছিল। এ জন্য এ জাতীয় উটকে সেদিকে সম্পর্কযুক্ত করা হয়। ☆العيدية : বনু আল আইদ এর দিকে একে সম্পর্কযুক্ত করে একে العيدية বলা হয়। কেফায়ার রচয়িতার মতে মোহরা গোত্রের একটি শাখা। ☆المجدية : ইয়মনী উটকে বলা হয় যা সৌন্দর্যের জন্য খ্যাত। ☆الشدينة : একটি একটি তারকা ও শহরের প্রতি সম্পর্কযুক্ত করে বলা হয়। ☆المهرية ইবনে সালাহ বলেন, উটের ঐ প্রকারকে বলা হয় যেগুলো গোত্রের পিতা মেহরা ইবনে হিদান এর দিকে সম্পর্ক করা হয়। ইমাম গজালী বলেন, مهرية উটের নিম্ন প্রকারকে বলা হয়। কিন্তু একথা সঠিক নয়। কিছু কিছু আভিধানিক বলেন এগুলো আদ এবং ছামূদ সম্প্রদায়ের উটদের যে প্রজাতি

গুলো রক্ষিত ছিল সেগুলোরই এক প্রকার।

কিন্তু কিছু উটের অন্যান্য নামও হয়ে থাকে। এ নাম এ জন্য নির্ধারণ করা হয়ে থাকে যে, বিভিন্ন উটের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার গুণাগুন পাওয়া যায়। কিছু ভাল হয় কিছু হয় খারাপ। যেমন কোন কোন উটকে العيس এ জন্য বলে যে, তাদের আচার আচরণে খুব কঠোরতা পাওয়া যায়। এমনিভাবে হালকা পাতলা গঠনের উটকে شلال এবং গৃহ্লীর উটকে يعملة বলে। যে সমস্ত উটের মন মেজাজ অত্যন্ত কঠোর হয় এগুলোকে বলে وحناء দ্রুতগামী উটকে ناحية হালকা পাতলা গঠনের উটকে عوجاء লম্বা শরীর বিশিষ্ট উটকে شمردلة এবং উত্তম প্রকার উটকে هجان বলে। যে সমস্ত উটের কোঁজ বড় হয় এদেরকে كوما আর হালকা পাতলা গড়নের উটকে বলা হয় حرف আবার কখনো কখনো লম্বা শরীর বিশিষ্ট উটকে বলা قوداء এবং দ্রুতগামী উটকে বলা হয় شملیل যেমন কবি কা'ব বিন যুহাইর বলেন-

حرف ابوها اخوها من مهجنة ☆ وعمها وخالهاقوداء شملیل

সে উটের পিতা ও শরীর হালকা পাতলা সাদা এবং বংশের আদরের হয় তার চাচা ও মামারা পর্যন্ত আদরের হয়। আর তাদের গলা হয় উঁচু ও দ্রুতগামী।

গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়:

আবু আলী আল কালী (রহঃ) আবু সাইদ থেকে বর্ণনা করেন যে, ابوها এবং اخوها দ্বারা কবির উদ্দেশ্য হল সে উটের পিতা এবং ভাই উভয়ই ভদ্র। কিন্তু কারো কারো মতে, ابوها ও اخوها এমনি ভাবে মামা এবং খালু দ্বারা উদ্দেশ্য হল পিতা, ভাই, চাচা ও মামা এ চারের সম্পর্ক এক উটের মধ্যেই পাওয়া যায়। আরব দেশে এ ধরনের উটই উত্তম বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। এই সম্পর্কটায় তাও একত্রে আসে যে পূর্ণ যৌবনের উট। যে কিনা আপন মায়ের সহিত সঙ্গম করে যে বাচ্চা হয় তা সঙ্গমকারী উটের পিতার সম্পর্কের সহিত জন্ম হওয়ার বাচ্চার কারণে ভাই হয়ে যায়। এমনিভাবে (মায়ের সহিত সঙ্গমকারী উট) যার প্রথম পিতার বাচ্চা তার সম্পর্কে সঙ্গমকারী) উট চাচা ও হয়। এবং মামও হয়। এজন্য মায়ের সঙ্গে সঙ্গমকারী উটের ভাই হওয়া প্রথমে প্রমাণিত হয়। সাহাবী হযরত কাব (রাঃ) এর উত্তম কথার মধ্যে এও আছে যে,

لوكنت اعجب من شی لا عجبنی ☆ سعی الفتی وهو مخبوء له القدر

يسعى الفتى لامور ليس يدركها☆ فالنفس واحدة والهم منتشر
والمرء ماعاش ممدو دله امل☆ لا تنتهى العين حتى ينتهى الاثر

যদি আমার কোন বস্তু পছন্দ হয় তাহলে যুবক মানুষের প্রচেষ্টা যা তার ভাগ্যে লিখা হয়েছে। যুবক মানুষ এমন কাজের জন্য চেষ্টা করে যা সে অর্জন করতে পারে না। এর কারণ, প্রাণতো শুধু একটাই কিন্তু উদ্দেশ্য ভিন্ন। মানুষ যতদিন জীবিত থাকে তার কামনা-বাসনা বৃদ্ধি পেতেই থাকে। চক্ষু ততদিন পর্যন্ত স্থায়ী থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত তার চলা ফেরা ক্ষান্ত না হয়। অর্থাৎ মৃত্যু অবধি।

প্রাণীবিদদের মতে, উট রাগান্বিত হলে কাউকেই রেহায় দেয় না। সে অবস্থায় উট অত্যন্ত হিংস্র হয়ে উঠে। নিজের মুখ দিয়ে ঝাগ মারতে থাকে ছটফট করতে থাকে। এতই ক্রোধান্বিত হয় যে, সে ঘাস পর্যন্ত কম খায়। ভীতিজনক আওয়াজ করতে থাকে। উটের রাগের সময় মুখ দিয়ে পেট থেকে এক ধরনের লাল চামড়া উদগীরন করে দূরে নিক্ষেপ করতে থাকে।

উটের স্বভাব ও চরিত্র:

উটের স্বভাব হল সে সারা বছর একবার সঙ্গম করে। কিন্তু তার সঙ্গম খুব বেশী দীর্ঘায়ূ হয়ে থাকে। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে সে বেশ কয়েকবার বীর্যপাত ঘটায়। ফলে সে সঙ্গম শেষে অত্যন্ত দূর্বল হয়ে পড়ে। উষ্ট্রী তিন বছর পর গর্ভবতী হয়। এজন্য উটনীকে حِقّة বলে। আর এ জন্যই উটনী حِقّة والى হয়ে যায়। প্রাণীবিদদের মতে উট অতি হিংসাপরায়ন প্রাণী। কিন্তু সে আবার ধৈর্যশীল। তবে অন্যের উপর আক্রমণ করতে খুবই দক্ষ।

আল মানক্বিক রচয়িতা লিখেছেন, উটের বৈশিষ্ট হল সে তার মায়ের সাথে সঙ্গম করে না। এ ব্যাপারে একটি ঘটনাও আছে যে, জনৈক লোক উটনীকে কাপড় দ্বারা ঢেকে দিয়ে তার যুবা বাচ্চাকে মায়ের প্রতি ছেড়ে দেয়। বাচ্চাটি গিয়ে তার মায়ের উপর উঠে গেল। পরে যখন সে জানতে পরল যে, ইহা তার মা, তখন বাচ্চাটি (কামড়ে) তার নিজের পুরুষাঙ্গ কেটে ফেলল। এরপর থেকে উটটি ঐ ব্যক্তির সঙ্গে বৈরীতা পোষণ করতে আরম্ভ করে। সে বাচ্চাটি একদিন সুযোগ পেয়ে লোকটিকে নিহতও করে। এরপর সে নিজে নিজে আত্মহত্যা করে বসে।

উট এমন এক প্রাণী যার কোন পিত্ত থলি হয়না। এ কারণেই সম্ভবত সে

অতি ধৈর্যশীল হয়। উটের মধ্যে আনুগত্যের নজির অহরহ। ابـــوايـــوب হল উটের উপনাম। উটের কলিজায় এমন কিছু বস্তু পাওয়া যায়, যা পিতের মতই। সম্ভবত এগুলো একধানের চামড়া হবে যার মধ্যে শ্লেষা লাগানো থাকে। উটের চামড়ার বৈশিষ্ট হল, এর চামড়ার সুরমা যদি চোখে ব্যবহার করা হয় তাহলে চোখের ছানি পড়া ভাল হয়। উট কর্তিত বৃক্ষকেও মজা করে খেয়ে ফেলে। হজম করতে তার সময় লাগে না। অর্থাৎ দ্রুত হজম করে ফেলে। তার পাকস্থলী অত্যন্ত শক্তিশালী হয়। পাথরসম শক্ত বস্তুকেও সে হজম করতে পারে। এ কথাও সত্য যে, তার আটা হজম করতে কষ্ট হয়। আরবদের মধ্যে একটি আশ্চার্যের ব্যাপার লক্ষ্য করা যায় যে, যখন কোন উটের প্যাঁচড়া হয় তখন সুস্থ উটকেও দাগ দেয়া হয়। যাতে সেটিরও কোন অসুখ না হয় এবং যাতে করে প্যাচড়ার উট সুস্থ হয়ে যায়। কবি নাবেগা বলেন:

وحملتنى ذنب امرى وتركته ☆ كذا العر يكوى غيره وهو راتع

কোন মানুষের ভুলে আচরণ আমাকে উত্তেজিত করে তুললে আমি তাকে ছেড়ে দেই (মাফ করে দেই) এর প্রতিশোধ অন্যের কাছ থেকেই নিয়ে থাকি। এমনি করে খোস প্যাচড়া বিশিষ্ট উটের কারণে অসুস্থ উটকে লোহা গরম করে দাগ দেয়া হয়। এ বিষয়ে অন্য এক কবি বলেন:

غيرى جنى وانا المعاقب ☆ فكاننى سيابة المتندم

পাপ করল এক লোক আর সাজা দেয়া হল আমাকে। পাপীদের ইঙ্গিতেই আমাকে শাস্তির নিশানা বানানো হল।

আবু উবায়দ কাশিম ইবনে সালাম এধরনের কাজকে অস্বীকার করেছেন। কিছু আলেমও এ কথা বলেছেন।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন বনী ফুজারাহ'র কয়েকজন লোক নবী করীম (সাঃ) এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বলল যে, আমার স্ত্রী এমন এক সন্তান প্রসব করেছে যে সে অত্যন্ত কাল। একথা শুনে নবী (সাঃ) বললেন তোমার নিকট কয়কটি উট আছে? সে বলল হ্যাঁ আছে। রাসূল (সাঃ) আবার জিজ্ঞেস করলেন কোন রঙ্গের? সে বলল ছাই রঙ্গের। এ কথা শুনে নবী করিম (সাঃ) বললেন বেস! এইতো চাই। লোকটি আবার জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা বলুনতো উটগুলোর মধ্যে কাল রঙ্গের উট কেন হল? নবী (সাঃ) বললেন তোমর

ছেলেও এমন কোন কারণে কালো হয়েছে যে কারণ সে টেনে এনছে অর্থাৎ ছেলেটির পূর্ব পুরুষদের কেউনা কেউ কালো ছিল। যার সঙ্গে ছেলেটির সম্পর্ক রয়েছে।

উটের শরয়ী হুকুম:

উটের গোস্ত হালাল। এ ব্যাপারে পবিত্র কোরআনে রয়েছে احلت لكم بهيمة الانعام তোমাদের জন্য গৃপালিত চতুস্পদ জন্তু হালাল করা হয়েছে। কিন্তু নবী করিম (সাঃ) এর পূর্বে হযরত ইয়াকুব (আঃ) এর ব্যাপারে কথা আছে যে, তিনি নিজের জন্য উটের গোস্ত ও দুধ হারাম করে নিয়ে ছিলেন। তার নিজের মতামত এবং নিজে নিজেই এর মালিক ছিলেন। অভিজ্ঞগণ বলেন, হযরত ইয়াকুব (আঃ) গ্রামাঞ্চলে বসবাস করতেন। তার সাইটিকা বাত রোগ হয়েছিল। সম্ভবত হযরত ইয়াকুব (আঃ) এর উটের গোস্ত ও দুধ এ অবস্থায় ক্ষতির কারণ ছিল। তাই তিনি (স্বাস্থ্যগত কারণে) নিজের জন্য তা বর্জন করতে অবিচল ছিলেন।

হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর শরীয়ত যেহেতু চিরস্থায়ী এবং প্রত্যেক নবীর শরীয়তে বিধানগত এবং দ্বৈত মতামত রয়েছে সেহেতু উটের গোস্ত খাওয়ার ব্যাপারে নবী করীম (সাঃ) থেকে দু'ধরনের মতামত পাওয়া যায়। আর সে জন্য উম্মতে মোহাম্মদীর মধ্যে দু ধরণের মতামত পাওয়া যায়। যেমন কেউ অজু করল অতঃপর সে উটের গোস্ত খেল। এখন তার অযু বাকী থাকল না কি ভেঙ্গে গেল? এ ব্যাপারে অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের মতামত হল তার অযু ভঙ্গ হয় নি। উপরোক্ত মতামতকে সমর্থন করেছেন, সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে খোলাফায়ে রাশেদীন (রাঃ), হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ, উবাই ইবনে কা'ব, আবু ত্বালহা আনসারী, আবু উমামা বাহেলী এবং আমের ইবনে রবিয়া (রাঃ) প্রমূখ মনীষিগণ। আর এই মতামতকে সমর্থন করেছেন সমস্ত তাবেয়ীন , ইমাম মালেক (রহঃ) ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) ইমাম শাফেয়ী ও উনাদের সমস্ত ছাত্রগণ। অন্যান্য উলামায়ে কেরাম বলেন যে, উটের গোস্ত খাওয়ার পর উযু ভঙ্গ হয়। এ মতামত ائمه اربعه এর মধ্যে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) ইসহাক (রহঃ) ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া , হাফিজ ইবনে খুজাইম (রহঃ) এবং ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) এর ছাত্রদরে মধ্যে হযরত ইমাম বায়হাকী (রহঃ) সমর্থন

করেছেন। অন্য এক বর্ণনায় ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) এমতকে সমর্থন করেছেন।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) থেকে উটের ব্যাপারে জায়েয এবং জায়েয দু'ধরণের মতামত পাওয়া যায়। উটের দুধের ব্যাপারে আহমদ (রহঃ) এর ছাত্র থেকে দু'ধরনের মতামত রয়েছে। উট রাখার স্থানে নামাজ পড়া মকরুহ।

বারা ইবনে আজিব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করিম (সঃ) কে উটের গোশত খাওয়ার পর উযু থাকা না থাকার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন যে, তোমরা অযূ করে নিবে। আবার ছাগলের গোস্ত খেয়ে অযূর ব্যাপারে নবী করীম (সঃ) কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন ছাগলের গোশত খেয়ে তোমরা অযূ করবে না।

নবী করীম (সাঃ) এর কাছে উটের বাথানে নামাজ আদায়ের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলো, তিনি (সঃ) বললেন তোমরা উটের বাথানে নমায আদায় করবে না। কারণ শয়তানের ঠিকানা। এই মাসআলাটি বকরী থাকার স্থানে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি (সঃ) বলেন যে, সেখানে তোমরা নামায পড়তে পার। করণ বকরী বরকতময়।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মুগাফফাল থেকে বর্ণিত এক হাদীছে নবী করীম (সাঃ) বলেন, উটকে শয়তান থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

উটের যাকাতের বিভিন্ন মাসআলা:

পাঁচটি উট হলে যাকাত ওয়াজিব হয়। তাই কারো পাঁচটি উট থাকলে এর জন্য একটি বিচরণকারী বকরী যাকাত দেওয়া ওয়াজিব। অর্থাৎ যে বকরী মাঠে চড়ে বেড়াতে ও ঘাস খেতে পারে। এমনিভাবে প্রতি ১টি উটে ২টি বকরী যাকাত প্রদান করতে হবে। প্রতি ১৫টিতে ৩টি বকরী , ২০টিতে ৪টি বকরী যাকাত ওদয়া ওয়াজিব। ২৫টি উটের উপর একটি পূর্ণ একবছরের বাচ্চা, ৩৬টি হলে একটি দুই বছরের বাচ্চা, ৪০টি হলে একটি ৩ বছরের বাচ্চা ৬১টি হলে একটি ৪ বছরের جزعة বাচ্চা, ৭৬টি হলে দুটি ২বছরের বাচ্চা, ৯১টি হলে ২টি তিন বছরের বাচ্চা- আর ১২১টি হলে তিনটি ২বছরের বাচ্চা যাকাত দেয়া ওয়াজিব। এর থেকে যাকাতের হিসাব আবার নতুন করে গননা আরম্ভ করতে হবে। যেমন প্রতি ৪০ উটের বেশী হলে একটি ২বছরের বাচ্চা এবং ৫০টি উট হলে একটি

তিন বছরের বাচ্চা ওয়াজিব হবে। যে সমস্ত বকরী উটের যাকাতে প্রদান করা হয় তা আবার ২ বছর বয়সের হওয়া আবশ্যক। অথবা একবছর বয়সের দুম্বা দেওয়া ওয়াজিব।

মাসআলাহ:

ইমাম মুতাওল্লী (রহঃ) বলেন, কোন ব্যক্তি মৃত্যুর আগে অসিয়ত করলেন যে, আমার মৃত্যুর পর একটি উট দিয়ে দিবে। সুতরাং তার মৃত্যুর পর অংশীদারগণ নর বা মাদা যেকোন একটি উট দিলেই অসিয়্যত পুর্ণ হয়ে যাবে। কিন্তু যদি মৃতের অংশীদাররা অসিয়্যতকৃত ব্যক্তিকে ১ বছরের বাচ্চা প্রদান করে তাহলে গ্রহীতার তা নেয়া দরকার নেই।

উট সম্পর্কে প্রবাদ ও উদাহরণ:

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সাঃ) এরশাদ ফরমান, মানুষ অসংখ্য উটের মত। যাদের মধ্যে কেউই আরোহীর উপযোগী নয়। অর্থাৎ মানুষের মধ্যে ভাল মানুষের অভাব আছে। আযহারী বলেন উক্ত হাদীছের মর্ম হল মুসলিম ও তিরমিযী সঠিক অর্থে দুনিয়া থেকে বিরত থাকা এবং পরকালের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার মত লোক খুব কম যেমনিভাবে আরোহীর উপযোগী লোক কম।

আরবরা বলেন থাকেন "তারা তৃপ্তিভরে গালী দেয় এবং উট নিয়ে চলতে থাকে"। কোন কোন মনিষী বলেন যে, এ দৃষ্টান্তটি সর্ব প্রথম কা'ব ইবনে যুহাইর ইবনে আবু সালাম ব্যবহার করেন এবং তা সে সমস্ত পুরুষের বেলায় বলা হয় যারা বাজে কথা, পরশ্রী কাতরতা এবং বাকপটু ছাড়া আর কিছু নয়। শুধু মুখের কথা আছে কিন্তু কাজের বেলায় কিছুই নেই।

দ্বিতীয় উদাহরণ:

আরবরা বলে থাকেন ماهكذا ياسعد نورد الابل ছায়াদ, এমন করে উটকে পানি পাক করিওনা অর্থাৎ লেনদেন তেমন করে সম্পাদন করোনা। এই উদাহরণটি সে সমস্ত পুরুষের জন্য বলা হয়- যে সঠিক কাজ করে না। এ উদাহরণটি হযরত আলী (রাঃ) ব্যবহার করেছেন, যা বায়হাক্বী (রাঃ) এর বর্ণনায় আছে।

তৃতীয় উদাহরণ:

يا ابلى عودى الى مبارك হে আমার উট তোমার সীমানায় ফিরে যাও। ঐ সকল লোকের বেলায় বলা হয়, যে লোক এমন বস্তু থেকে দূরে সরে যায় যে বস্তু তার জন্য অতি প্রয়োজন। এর সাথে তার কল্যাণেরও নীতি জড়িত থাকে।

চিকিৎসায় উপকারিতা ও গুণাগুন:

ইমাম ইবনে যুহাইর সহ কতিপয় মনিষী বলেন, যদি উটের দৃষ্টি সোহাইল তারকার উপর পড়ে যায় তখন সে মারা যায়। উটের গোশত তেমনি এক বছরের ভেড়া বা পাহাড়ী ভেড়া হোক এদের গোশত মন্দ এবং পরিত্যাজ্য। উটের পশম পুড়ে ছাই করে প্রবাহিত রক্তের মধ্যে নিক্ষেপ করলে রক্তকে দুভাগে বিভক্ত করে ফেলে। যদি উটের শরীরের কীট কোন প্রেমিকের জামাতে বেঁধে দেয়া হয় তাহলে প্রেমিক মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হবে। কোন নেশাগ্রস্ত যদি উটের প্রশ্রাব পান করে তাহলে তার আর নেশা থাকবে না। যৌন শক্তির সাথে উটের গোশতের সম্পর্ক বেশি রয়েছে। এমনিভাবে সঙ্গমের পর শরীরে সজীবতা ও শান্তি আনে। প্লীহা রোগেও উটের গোশত বেশ উপকারী। বানঝা কোন নারী ঋতুশ্রাব থেকে পবিত্র হওয়ার পর যদি উটের রানের হাড়ের মগজ বের করে তুলা অথবা পশমের কাঠিতে লাগিয়ে তাদের লিঙ্গে বেধে সহবাস করলে তার সন্তান হবে।

উট সংক্রান্ত স্বপ্নের তাবীর:

স্বপ্নের ব্যাখ্যাদাতা কিছু কিছু আলেমে দ্বীন লিখেন যে, স্বপ্নে কেউ দেখল যে, সে উটের বাথানের মালিক হয়ে গেছে। তাহলে এর ব্যাখ্যা হবে জনগণের বিচারক নিযুক্ত হবে। সে দীর্ঘদিন এ পদে থাকারও সম্ভাবনা রয়েছে। স্বপ্নে দেখলো যে, সে ছাগল পালের মালিক হয়ে গেছে অথবা সে কোন বকরী অথবা উটের মালীক হয়ে গেছে তাহলে সে বিচারক মনোনীত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কেউ দেখল যে, সে অনেক উটের মালিক হয়ে গেছে তাহলে এর তাবীর হল সে তার বংশে নিজ ধর্মে এবং আকীদা বিশ্বাসে মান মর্যাদার অধিকারী হবে। এ জন্য পবিত্র কোরআনে উল্লেখ রয়েছে: افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت "তারা কি উটের প্রতি লক্ষ্য করে না, যে কিভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে?" স্বপ্নে উট দেখলে ব্যাখ্যা হবে সে কোন একটি বড় কাজের দায়িত্ব পাবে। পবিত্র কোরআন

বলছে: ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل فى سم الخياط "তারা কখনোই বেহেশতে প্রবেশ করবে না যতক্ষণ না উট সূচের ছিদ্র পথে প্রবেশ করে।" অন্য আয়াতে আছে : انما ترمى بشرركالقصر كانه جمالات صفر "সে আঙ্গারা বর্ষিত হবে যেমন বড় বড় মহল, যেন কালো কালো উট"। যদি কেউ স্বপ্নে দেখে যে, সে চতুস্পদ জন্তু যেমন মহিষ ইত্যাদিকে মাঠে নিয়ে চরাচ্ছে- এর ব্যাখ্যা হবে সে সামান্য ছোট খাট লেনদেনে সহযোগিতা দিয়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে বড় ধরনের নিয়মাত অর্জন করবে। এ জন্য পবিত্র কোরআনে উল্লেখ রয়েছে: والانعام خلقها لكم فيها رف ء ومنافع ومنها تأكلون "তিনিই চতুস্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন- আর এতে রয়েছে তোমাদের চলার বাহন আর রয়েছে অনেক উপকার এবং কোন কোনটি তোমরা খাও।" কেউ স্বপ্ন দেখল যে, সে আরবী উট চরাচ্ছে, এর তাবীর হবে, তাকে আরব সম্প্রদায়ের অভিভাবক নিযুক্ত করা হবে। কেউ দেখল যে, শহরে শুধু উট আর উট। ব্যাখ্যা হবে সে শহরে কলেরা, মহামারী ছড়িয়ে পড়বে এবং যুদ্ধবিগ্রহের সম্ভাবনা রয়েছে।

ইমাম জাইলয়ী (রহঃ) বলেন, কেউ স্বপ্নে দেখল যে, সে উটের মালিক হয়েছে, এর ব্যাখ্যা হবে, সে সম্মান ও মর্যাদার সাথে প্রচুর ধন-সম্পদের মালিক হবে। অন্য একজন ব্যাখ্যা কারক বলেন যে, কেউ স্বপ্নে দেখল যে, সে উটের গোশত খেয়েছে, এর ব্যাখ্যা হবে, লোকটি কঠিন রোগাক্রান্ত হবে।

ইবনে সীরীন (রহঃ) বলেন- স্বপ্নে উটের গোশত খাওয়াতে কোন অনিষ্টের কারণ নেই। পবিত্র কোরআনই এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ।: والانعام خلقها لكم فيها رف ء ومنافع ومنها تأكلون

(বাকী আলোচনা باب الجيم এর অধীনে আসাবে ইনশাআল্লাহ)

ابابيل

(৩) আবাবীল পাখী

ابابيل এর বহুবচন ابالة । কিন্তু আবু উবায়দুল কাসিম ইবনে সালাম বলেন, ابابيل শব্দের এক বচন হয়না এর অর্থ - দল, গোষ্ঠী, দলে দলে পাখী।

আভিধানিকদের কেউ কেউ বলেন, এর একবচন ابول - عجول এর ওজনে আসে। কারো মতে دنانير ও ابيال- دينار এর ওজনে আসে।

ইমাম ফারেসী (রহঃ) বলেন এর এক বচন ابّالة তাশদীদ সহকরে হয় বলে শুনা গেছে, কিন্তু নাহুশাস্ত্র বিদ ফাররা তশদীদ ব্যতীত ابالة বলে উল্লেখ করেছেন।

পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে: وارسل عليهم طيرا ابابيل "আর (আপনার প্রভূ) তিনি তাদের উপর প্রেরণ করেছেন ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী।

আয়াতটির ব্যাখ্যায় তাফসীর কারকগণের মধ্যে এ ব্যাপারে মত পার্থক্য দেখা যায় যে,এখানে কোন্ ধরনের পাখী উদ্দেশ্য? সাঈদ ইবনে যুবাইর (রাঃ) বলেন ابابيل দ্বারা সেসব পাখী উদ্দেশ্য যারা আকাশ ও যমীনের মাঝামাঝি তাদের বাসা বানায়। তারা বাচ্চাও জন্ম দেয়। অন্যান্য পাখীর মত এদের ঠোঁটও আছে কুকুরের বাহুর মতই এদর বাহু। হযরত ইকরামা (রাঃ) বলেন, এগুলো এমন পাখী যারা সাগর থেকে উত্থিত হয় এবং এদের মাথা হিংস্র জন্তুর ন্যায় হয়ে থাকে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ابابيل সে সব পাখী যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা আসহাবে ফীল বা হস্তী বাহিনীর উপর বিজয়ী করে পাঠিয়েছিলেন। (মিশরে উৎপন্ন প্রক প্রকার গাছের পাতা যে পাতা থেকে তৈল তৈরী করা হয়। পাখীগুলো ছিল সে পাতা রঙ্গের)।

কেউ কেউ বলেন পাখীগুলো বাদুড়ের ন্যায়। হযরত উবাদাহ বিন সামিত (রঃ) বলেন পাখীগুলো চড়ই পাখীর মত ছিল। তিনি বলেন পাখীগুলো خطاف পাখী (যে পাখী ছোঁ মেরে নিয়ে যায়)-র সাদৃশ্য ছিল। سنونو পাখীর নাম। (এ পাখী বর্তমানে কাবা ঘরে অবস্থান করে।) এর বহুবচন سنونة আসে।

কৃষ্টানদের পাদ্রীদেরকেও ابيل বলে। ইহুদীরা হযরত ঈসা (আঃ) কে ابيل الابيلين বলে থাকে। যেমন এক আরবী কবির কবিতায় দেখা যায়:

اما ودماء مائرات تخالهاء☆ على قناة العزى وبالنسر عندما

"তোমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, রক্ত সাগরের উত্তাল তরঙ্গের শপথ যা তোমাকে উযযা ও নসরের খোপার উপর দু' ভাইয়ের রক্তে রঙ্গীন দেখা যাচ্ছিল।"

وما سبح الرهبان فى كل بيعة☆ ابيل الابيلين عيسيبن مريما

"আর সে সমস্ত স্তুতির কসম যা পাদ্রীরা প্রত্যেক আস্তানায় পাঠ করে থাকে।"

لقد ذاق منا عامر يوم لعلع ☆ حساما ماهز بالكف صمما

"আমের যুদ্ধের দিন আমাদের পক্ষ থেকে সেই তরবারীর স্বাদ আস্বাদন করেছিল। যখন সে হাতে নিয়ে নড়াচড়া করে তাখন গর্দান উড়িয়ে দিতে থাকে।"

اٰلة যের দ্বারা পড়ে অর্থ হবে -লাকড়ী অথবা ঘাসের বোঝা। আর اٰلة বালা-মুসীবত অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

اتان

(৪) গাধী

اتـــان হামজা ও তা' এ যবরসহ পড়তে হবে এর অর্থ গাধী। কিন্তু গাধী এর জন্য تـاء تـانيث – اتـانة ব্যবহৃত হয় না। যেমন ثـلاث –اتن (তিনটি গাধী) عـنـاق এবং عـنـق (বকরীর বাচ্চা) ব্যবহৃত হয়। অত্যধিক ব্যবহারের জন্য اَتَنٌ – اُتُنٌ বলা হয়ে থাকে।

মুহাম্মদ ইবনে সালাম বলেন, আমার কাছে এক কুরাইশী বর্ণনা করেছেন, একদা খালিদ ইবনে কুশাইরী যিনি ইরাকের আমীর ছিলেন তিনি শিকার করার জন্য বেরোলেন। ঘটনাক্রমে তিনি তার সাথীদেরকে ছেড়ে দিয়ে একা রয়ে গেলেন। এমতাবস্থায় তিনি দেখতে পেলেন যে, গ্রামের সামনে এক আরবী লোক মোটাসোটা ও দুর্বল একটি গাধীর উপর সওয়ার হয়ে আসছেন। তার সাথে এক বৃদ্ধা মহিলাও রয়েছে। গ্রাম্য আরোহীর নিকট কুশাইরী বললেন যে তুমি কোন্ গোত্রের লোক? সে বলল, আমি এক অতি সম্মানী ও গৌরবময় গোত্রের লোক। আমি এমন ঘরের সন্তান যার মান মর্যাদা ও সম্মান পৈতৃক সূত্রে প্রাপ্ত। কুশাইরী (রঃ) বললেন মুযার সম্প্রদায়ের সাথে তোমার কোন সম্পর্ক আছে কি? আচ্ছা বলতো তুমি কি এ গোত্রের কোন শাখার সহিত সম্পর্ক রাখ? লোকটি জবাব দিল সে গোত্রের এমন শাখার সাথে আমার সম্পর্ক আছে যারা ঘোড়ায় চড়ে বর্শা নিক্ষেপে পারদর্শী এবং মেহমান এলে তাদের সাথে আলীঙ্গন করে। কুশাইরী বললেন, মনে হয় তুমি আমের গোত্রের সহিত সম্পর্ক রাখ। কিন্তু তার কোন শাখার লোক। গ্রাম্য লোকটি জবাব দিল আমি একজন সম্মানিত সরদার এবং নিজ গোত্রের সহিত সুসম্পর্ক বজায় রাখে এমন গোত্রের লোক। কুশাইরী (রঃ) বললেন তাহলে তো বুঝা গেল তুমি জাফর গোত্রের লোক। (কিন্তু

এটিতো অত্যন্ত বড় গোত্র) তাহলে এ গোত্র কোন শাখার সাথে সম্পর্ক রাখে? গ্রাম্য লোক বলল, আমি সে শাখার সূর্য চন্দ্র এবং সেনা নায়ক গোত্রের উপযুক্ত ব্যক্তিত্ব। কুশাইরী বললেন, তুমিতো দেখি একজন বিশিষ্ট লোক। এখন বলুন আপনি এখানে কেন এসেছেন? সে লোক বলল যুগের আবর্তন বিবর্তন এবং প্রতিনিধিত্বের প্রমাণের জন্য। কুশাইরী আবার জিজ্ঞেস করলেন যে, আপনি এ উদ্দেশ্য দ্বারা কি আশা করেন? গ্রাম্য লোক বলল তোমাদের সে আমীরকে যার সম্পদের উথানে সুরাইয়া তারকা পর্যন্ত পৌছেছে। অথচ তার সম্প্রদায় তাকে ফেলে দিয়েছে। কুশাইরী আবার জিজ্ঞেস করলেন যে, তার কাছে আপনার যাওয়ার উদ্দেশ্য কি? তিনি বললেন আমি তার বাপ দাদার কাছ থেকে ধন-সম্পদ নিতে এসেছি। আবার কুশাইরী (রঃ) বললেন এ পর্যন্ত আপনি আমার প্রশ্নের জবাব যতটা দিলেন এর থেকে প্রতীয়মান হল যে, এর ধারাবাহিকতার উপর ভিত্তি করে কিছু কবিতা ও পাঠ করতে পারবেন।

গ্রাম্য লোকটি সাথের মহিলাকে উদ্দেশ্য করে বলল যে, তুমি কিছু কবিতা শুনাও। মহিলাটি বলল তুমি আমাকে অনেক তিরস্কার, প্রশংসাও নিন্দা করে অনেক কষ্ট দিয়েছ। আচ্ছা আজ ছেড়ে দাও গ্রাম্য লোকটি বলল- না কবিতা শুনাও।

মহিলা কবিতা বলতে শুরু করল।

اليك ابن عبد الله بالجدار قلت☆ بنا البيد عيس كالقسى سواهم

"হে ইবনে আব্দুল্লাহ! প্রান্তরকে প্রান্তর অতিক্রম করে অতি কষ্টে তোমার কাছে এসেছি, উট আটকে গেল আর তার কোমরে ভাজ পড়ে গেল।"

عليها كرام من ذوابة عامر☆ اضربهم جدت السنين العوارم

উটের উপর সওয়ার হয়ে বনী আমেরের সেই ভদ্রলোক আগমন করলেন যে আত্মম্ভরী ভিক্ষুকের মত অভাবের বছর অতি কষ্টে পৌছল।

يردن امرا يعطى على الحمد ماله☆ وهانت عليه فى الثناء الدراهم

সে এমন ঘরের উদ্দেশ্য করে চলে, যে প্রশংসায় পঞ্চমুখ আর দান খয়রাত করা তার ধর্ম।

فان تحط ماتهوى فهذا ثناؤنا☆ وان تكن الاخرى فما ثم لائم

যদি তুমি আমাকে পুরুস্কৃত করতে তাহলে আমার পক্ষ থেকে তোমাকে ধন্যবাদ দিতাম। আর যদি না-ই বা দাও তাহলে কোন নিন্দার কথা নয়।

কুশাইরী (রঃ) বললেন ওহে আল্লাহর বান্দী! তোমার কবিতাতো খুবই সুন্দর কিন্তু তুমি এতই দুর্বল গাধীর উপর আরোহী হয়ে এসেছো এবং ইহাই বুঝতেছে যে, তুমি খাকী রঙ্গের উটের উপর বসে আছ, এবং তুমি তোমার কবিতায় মানুষের এমন কিছু গুণাগুনের বর্ণনা করেছ যা তোমার কথা বার্তায় প্রকাশ পায়নি। গ্রাম্য লোকটি বলল ওহে ভাতিজা! আমি যে অপমানকারীর প্রশংসায় কষ্ট সহ্য করেছি। তা আমার জন্য কবিতায় ভুল প্রশংসার চেয়ে আরো বেশী কষ্ট হয়েছে। আবার কুশাইরী (রঃ) বললেন, তুমি কি খালিদ বিন আব্দুল্লাহ আল কুশাইরীকে চিন? গ্রাম্য লোকটি জবাব দিল আমি তাকে চিনি না। তিনি (কুশাইরী) বললেন আমিই খালিদ বিন আব্দুল্লাহ আলকুশাইরী। গ্রাম্য লোকটি বলল, আল্লাহর কসম তুমিই কি খালেদ? তিনি বললেন হ্যাঁ তুমি যার নিকট প্রশ্ন করতেছ তিনিইতো খালিদ বিন আব্দুল্লাহ আল কুশাইরী। আমি তোমাকে এমন বস্তু দেব যার প্রতিদান তুমি দিতে পারবে না। এবার গ্রাম্য লোকটি বলল হে উম্মে জাহাশ তুমি তোমার গাধার দিক পরিবর্তন করে দাও। কুশাইরী মহিলাকে বললেন না না তুমি এরকম করো না। তুমি এবং তোমার স্বামী এখানেই অপেক্ষা করতে থাক। গ্রাম্য লোকটি বলল আল্লাহর কসম কখনোই নয়। (এখানে দাড়িয়ে থাকব না) আমি তাকে কোন কিছু শুনিয়ে ধন সম্পদ নিব? এতটুকু বলেই গ্রাম্য লোকটি গাধীকে ফিরিয়ে অন্য দিকে চালিয়ে দিল। কুশাইরী বললেন এরকম কাজ তার বাপ দাদারাও করত।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (সঃ) এরশাদ ফরমান- যে লোক পশমের পোশাক পরিধান করল এবং বকরীর দুধ দোহন করল, আর গাধীর উপর আরোহণ করল তার মধ্যে তিল পরিমাণও অহংকার নেই। বায়হাকী এ ধরনের বিষয়ের বর্ণনা আব্দুর রহমান ইবনে সা'দ এর জীবনীতেও করেছেন। অন্য এক বর্ণনায় হযরত জাবের (রাঃ) এবং হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীছ, নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করেন- নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অহমিকা এবং অহংকার থেকে মানুষ নিরাপদ হওয়ার প্রমাণ, বকরীকে তার নলায় বেধে দোহন করা, পরিবার পরিজনের সাথে একত্রে বসে আহার করা ইত্যাদি।

জারারাহ ইবনে আমর আন নখফী (রাঃ) ৯ম হিজরীর কাছাকাছি রজব মাসের মাঝা মাঝি সময়ে নবী করিম (সাঃ) এর দারবারে উপস্থিত হয়ে বললেন যে হে আল্লাহর নবী (সঃ) পথি মধ্যে আমি একটি স্বপ্ন দেখে ভীত হয়ে পড়েছি। নবী (সঃ) জিজ্ঞেস করলেন তুমি কি দেখেছ? জারারাহ বললেন স্বপ্নে দেখি যে, আমি আমার পরিবার পরিজনের নিকট একটি গাধী রেখে চলে আসি। গাধীটি একটি লাল রঙ্গের বাচ্চা প্রসব করেছে, কালোর মধ্যে আকর্ষনীয় লাল। আমি আরো দেখলাম যে, মাটি থেকে অগ্নি স্ফুলিংগ উঠে আমার ছেলে ও আমাকে আড়াল করে ফেলেছে। আগুন থেকে আওয়াজ আসতেছিল যে, আমার রশ্মি চক্ষুস্মান এবং অন্ধ উভয়কেই জালিয়ে দেবে। নবী করীম (সাঃ) তাকে এই তাবীর করে দিলেন যে, তুমি কি তোমার ঘরে একজন উত্তম চরিত্রের বাদী রেখে এসেছো? লোকটি বলল জি হ্যাঁ হে আল্লাহর রসূল! নবী করিম (সাঃ) বললেন সে তোমার সন্তান জন্ম দেবে। লোকটি বললেন হে আল্লাহর রাসূল সে কালোর মধ্যে আকর্ষণীয় লাল রং কোথা হতে জন্ম গ্রহণ করল? নবী করিম (সাঃ) বললেন আরো কাছে এসো। সে আরো কাছে এলো। এর পর নবী করিম (সঃ) বললেন তোমার পিতার ধবল কুষ্ঠ রোগ ছিল। তুমি কিন্তু এ ব্যাপারটা গোপন রাখছ। হযরত যারারাহ (রাঃ) বললেন আল্লাহর কসম যে সত্তা আপনাকে সত্য নবী করে প্রেরণ করেছেন। ইতিপূর্বে আপনি ছাড়া আর কেউ একথা বলেনি। যারারাহ (রাঃ) বললেন আপনি সত্যই বলেছেন। নবী করিম (সাঃ) বলেন- দেখ তুমি যে আগুন দেখলে এর ব্যাখ্যা এই যে, তাহলো একটি ফিতনার আকৃতি যা আমার পরে প্রকাশিত হবে। যারারাহ (রাঃ) বলেন সে ফিতাটি কি? নবী করীম (সাঃ) বললেন মানুষ তাদের নেতাকে হত্যা করবে। পরস্পর ঝগড়া ফ্যাসাদে লিপ্ত হবে। আর তাই হবে মূল ব্যাপার। তাদের আঙ্গুলের মাঝখানে এক মুমেনের রক্ত অন্য মোমেনের সামনে এমনভাবে প্রবাহিত হবে যেমন তা পানির চেয়ে অধিক সস্তা। পাপীরা একে ভাল মনে করবে। সে ফিতা তোমাকে না পেলে তুমি তোমার ছেলেকে অবশ্যই দেখবে। হযরত যারারহ (রাঃ) বললেন হে আল্লাহর নবী (সঃ) আপনি দোয়া করুন যেন আমি সে ফিতানা না দেখি। এরপর নবী (সঃ) তার জন্য দোয়া করলেন। উলামায়ে কেরাম লিখেন-সে ফিতনার দ্বারা উদ্দেশ্য হল ফিতনায়ে উছমান (রাঃ)। যে ফিতনায় হযরত উছমান (রাঃ) কে শহীদ করা হয়েছিল।

প্রবাদ বাক্য :

আরবগণ বলেন كان حمارا فاستتان অর্থাৎ সে গাধা ছিল গাধী হয়ে গেছে। استتان অর্থ হল صار اتانا অর্থাৎ সে গাধী হয়ে গেছে। অর্থাৎ শক্তিশালী ছিল দূর্বল হয়ে গিয়েছে। সম্মানিত ছিল আপমানিত হয়ে গিয়েছে। এই দৃষ্টান্তটি সে ব্যক্তির বেলায় বলা হয় যে প্রথমে সম্মানিত ছিল, পরবর্তীতে সে অপমানিত হয়ে গেছে।

স্বপ্নের ব্যাখ্যা:

স্বপ্নে গাধী দেখার ব্যাখ্যা হল, আর্থিক সাহায্যকারী চুড়ান্ত উপকারী সন্তান সন্ততিতের কাছে সে শান্তি পাবে।

اخطب

(৫) গাধা বিশেষ

اخطب - احمر এর ওজনে আসে। কারো মতে এটি এক প্রকার صرد নামক পাখী। কবি বলেন-

ولا انثنى من طيرة عن مريرة☆ اذا الاخطب الداعبى على الدوح صرصرا

"রাগের কারণে আমি আমার দৃঢ় প্রত্যয় থেকে প্রত্যাবর্তন করব না। যতক্ষণ আখত্বব কোন বড় গাছের উপর বসে অন্ককে আওয়াজ দিতে থাকবে।"

اخطب এমন গাধীকে বলে যার পিঠ হয় সবুজ। নাহ্বীদ ফাররা বলে خطاء এমন সব গাধীকে বলে যাদের পৃষ্ঠদেশে কাল কাল ডোর হয় এবং গাধাকে বলা হয় اخطب।

أُخَيْضِر

(৬) এক ধরনের মৌমাছি

ইবনে সাইদাহ বলেন اخيضر সবুজ রঙ্গের মৌমাছি যেগুলো কালো রঙ্গের মাছির সমান হয়ে থাকে।

اخيل

(৭) ছোট আকারের পাখী বিশেষ

সবুজ রঙ্গের পাখীকে اخيل বলা হয়। এদের ডানার উল্টা পিঠে

চমকপ্রদ রং হয়ে থাকে। পাখীটির নামা اخيـــل রাখার কারণ হলো, এর পীঠে অলংকার জাতীয় বস্তু হয়ে থাকে। যা দেখতে খুবই চিত্তাকর্ষক। কোন কোন আভিধানিক বলেন- সবুজ রঙ্গের হুদহুদ পাখীকে اخيـــل বলা হয়। হুদহুদ কবুতর জাতীয় পাখীর চেয়ে বড়। একে شـقـرق এবং شـرقـرق ও বলা হয়। اخيل কে যদি نـكـره হিসেবে ব্যবহার করা হয় তাহলে مـنـصـرف পড়তে হবে। নাম বাচক বিশেষ্য ব্যতীত যদি একে নাকারাহ হিসেবেই ব্যবহার করা হয় তাহলে مـنـصـرف হবে। কিন্তু কোন কোন নাহুবিদ বলেন معـرفه ও نـكـره উভয়টি ব্যবহার করার অনুমতি আছে। উভয় অবস্থাতে এটি غيـر مـنـصـرف থাকবে। এজন্য তারা التـخـيل মাছদার থেকে এর صـفـت হিসেবে গন্য করেন এবং নীচের কবিতাতে এরূপ ব্যবহারের প্রচলন দেখা যায়।

ذرنى وعلمى بالاموزى وشيمتى ☆ فما طائرى فيها عليك باخيلا

"আপনি আমাকে ছেড়ে দিন এবং যাবতীয় ব্যপার আমাকে বলতে থাকুন। কারণ আমার অভ্যাস হলো, আমি আপনার ব্যাপারে খারাপ চিন্তা করব না।"

ارىد

(৮) বিষধর সাপ বিশেষ

এ সাপ কাউকে দংশন করলে চেহারা মেটে রং এর হয়ে যায়। এ সম্পর্কে আব্দুল মালেক ইবনে উমাইর বলেন যে, একদা আমি মুগীরা ইবনে শো'বার কবরের পাশে যিয়াদকে দন্ডায়মান দেখেছি সে এই কবিতা আবৃত্তি করছিল:

انت تحت الاحجار حزما وعزما ☆ وخصيما الد ذا معلاق

"পাথরের নীচে লাকড়ীর বোঝার মত বীর। কঠিন আক্রমনকারী এবং ঝগড়াটে দুশমন।"

حية فى الوجار اربد لايت ☆ مع منه السليم نفث الراقى

"সরুপথে এক বিষধর সাপ আছে যার ফুস ফুস শব্দ থেকে ওঝা পর্যন্ত নিরাপদ নয়।"

যিয়াদ বলেন আমিও যার সাথে বৈরীতা প্রদর্শন করি সম্পূর্ণরূপেই

বৈরীতা করে থাকি। আর যার সাথে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হই তার সাথে শেষ পর্যন্ত একত্রেই থাকি।

ارخ
(৯) নীল গাই

ইবনে দুরস্তুইয়া লিখেন যে, ارخ দু'বছর বয়সের এমন যোগ্যতা সম্পন্ন গাইকে বলা হয় যার সাথে এখনো যৌন মিলন হয়নি। এর বহুবচন اراخ، اروخ এবং إراخ ইত্যাদি আসে।

বিদ্যান লোকেরা বলেন, মজিনা গোত্রের এক লোক মক্কার রাস্তায় এরকম কবিতা আবৃত্তি করতে শুনা গিয়েছে :

ايام عهدى مى فيك كانما☆ ارخ يرود بروضة مثقال

"আমার জীবনের দিনগুলো তোমার সাথে এমনভাবে অতিবাহিত হয়েছে যেমনি গোর খোদা পাখী ঘন জঙ্গলে থাকে।"

ইমাম জাওহারী লিখেন যে, জঙ্গলী গাইকে ارخ বলে কিন্তু صاحب المغرب বলেন জঙ্গলী গাইয়ের বাচ্চাকেই ارخ বলা হয়।

ارضة
(১০) ঘুন পোকা

(কিতাব ও কাঠ অনিষ্টকারী এক প্রকার সাদা পোকা)

ارضة এমন একটি ছোট প্রাণী যা অর্ধেক মশুর ডালের মতাই হয়ে থাকে। লাকড়ী ইত্যাদি খেয়ে থাকে। একে سرفة ও বলা হয়। (অভিধানে এর অর্থ লিখা হয়েছে ঘুন) লাল রঙ্গের শরীর এবং কাল রঙ্গের মাথা বিশিষ্ট। ছোট ছোট খড় কুটা একত্র করে নিজের শ্লেষা দ্বারা বাসা বেঁধে এর ভিতর প্রবেশ করে মরে যায়)। ইহা যমীনের এমন একটি কীট যার সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেছেন ক্ষুদ্র প্রাণীটির শৈল্পিক কর্ম যেহেতু যমীনেই সেহেতু একে যমীনের দিকেই সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে যে কারণে একে دابة الارض বলা হয়।

ইমাম ক্বাযবিনী (রহঃ) বলেন, উই পোকার এক বছর বয়প্রাপ্ত হলেই এর শরীরে লম্বা লম্বা পাখা গজায়। এর সাহায্যে সে উড়তে আরম্ভ করে। একে

যমীনের কীট دابة الارض ও বলা হয়। এই কীটই হযরত সুলায়মান (আঃ) এর মৃত্যু সংবাদ জ্বিনদেরকে জানিয়েছিল। পিপিলিকা এই কীটের দুশমন। পিপিলিকা এদের পিছু পিছু আসতে থাকে এবং এদের ধরে নিয়ে গর্তে প্রবেশ করে। কিন্তু পিপিলিকা যদি এদের সামনে আসে তাহলে এদের সাথে পিপিলিকা মোটেও কুলিয়ে উঠতে পারে না। এ সময় পিপিলিকার সাথে তাদের ধস্তধস্তি হয়।

ঘুন পোকার বৈশিষ্ট:

ঘুন পোকা মাকড়সার জালের মত খড় কোটা দিয়ে অতি মনোরম ঘর তৈরী করে। ঘরটির নীচ দিয়ে সে বোনন করে উপর দিয়ে চলা ফেরা করে। ঘরটির কোন এক পাশ দিয়ে একটি ছোট ছিদ্র রাখা হয়। তার ঘরটি হয় একটি সিন্দুকের মত এই থেকেই বলা হয়

تعلم الاوائل بناء النواويس على موتاهم

"যে বড় বড় বুযুর্গ ব্যক্তিগণ কবরস্থানে দালান মৃত ব্যক্তিদের জন্য তৈরী করা শিখিয়েছে"

হাদীস শরীফে আছে, কুরাইশরা যখন জানতে পারল যে, বাদশাহ নাজ্জাশী হযরত জাফর ইবনে আবু তালিবের (রাঃ) এবং তার সঙ্গী সাথীদের সহিত সৌজন্য মূলক আচরণ করেছেন --তখন কুরাইশদের এটি অপছন্দনীয় হলো। ফলেশ্রুতিতে তারা নবী (সাঃ) ও তার সাহাবীদের উপর আরো বেশী ক্রোধান্বিত হয়ে উঠল। কোরাইশরা বনী হাশিমকে রেখে পরস্পরে একটি চুক্তি করল যে, এখন থেকে মুসলমানদের সাথে আর কারো বিবাহ সাদী হবে না। আর না কোন বেচাকেনা, লেনদেন করা হবে এবং মিল মহব্বত থাকবে। বর্ণিত আছে কোরাইশদের এই চুক্তিনামা লিখেছিল বাগীজাহ ইবনে আমের নামে এক ব্যক্তি। তার হাত বিকলাঙ্গ হয়ে গিয়েছিল। চুক্তিপত্র লিখার পর একে কাবা ঘরে ঝুলিয়ে রাখা হল এবং বনী হাশিমকে (আবু তালিবের গুহায়) বন্দী করে রাখা হল। ঘটনাটি ঘটেছিল মহররম মাসের প্রথম দিকে নবুওয়তের ৭ম বছরে।

চুক্তিটিকে সকলেই শ্রদ্ধার সাথে পালন করতে থাকে। নবী করিম (সাঃ) এর দাদা আব্দুল মোত্তালিব এই অবস্থায়ও জানবাজী রেখে হুজুর (সঃ) এবং তার অনুসারীদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষ করতেন। এদিকে কুরাইশরা বনী

হাশিমের জন্য আহার্য ও পানীয় বস্তু সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিল। কোরাইশরা এতে আরো কঠোরতা আরোপ করল যে, তারা দল বেধে একটি নির্দিষ্ট সময় বের হত। শেষ পর্যন্ত কুরাইশরা এই বয়কটে তাদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করল। এই বয়কট তিন বছর পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। এর পর মহান রাব্বুল আলামীন তার হাবীব (সঃ) কে ব্যাপারটি জ্ঞাত করেন। যার মধ্যে কুরাইশদের জোর জবরদস্তির কথা এবং এই জাতীয় কঠোর বিধি-নিষেধের উপর কাজ করার অঙ্গীকার হয়। চুক্তিপত্রে আল্লাহর নামটি ব্যতীত বাকী অংশ উই পোকা খেয়ে শেষ করে দেয়। পরবর্তীতে আবু তালিব কুরাইশ নেতৃবৃন্দকে জানালেন যে, তোমাদের চুক্তিনামা তো উইপোকা খেয়ে শেষ করে ফেলেছে। কুরাইশরা যখন তাদের চুক্তিনামা দেখল তখন ঘটনাও তাই ঘটল যা নবী করিম (সঃ) তাদেরকে উতিপূর্বে বলেছিলেন। কুরাইশরা অবরুদ্ধ লোকদেরকে গুহা থেকে বের করে আনল । (বুখারী)

উবাই ইবনে কা'ব বর্ণনা করেন, নবী করিম (সাঃ) একদা একটি মুথা খেজুর বৃক্ষের পাশে নামায আদায় করতে ছিলেন। নবী (সাঃ) একে মিম্বর বানালেন। মুথা খেজুর বৃক্ষটি নবী করিম (সঃ) কে এতই মহব্বত করতে লাগল যে, উটনী যেমন তার বাচ্চাকে মুহাব্বত করে। হুজুর (সঃ) মুথাটির উপর তার পবিত্র হাত রাখা মাত্রই সে তার নিজ স্থানে থেমে গেল। আবার যখন সেজদার জায়গা পরিবর্তন হয়ে গেল তখন উবাই ইবনে কা'ব সে মুথাটি তার বাড়ীতে নিয়ে সংরক্ষণ করলেন। মুথাটি যখন পুরোনো হয়ে গেল তখন একে উই পোকা খেয়ে ফেলল এবং ঝাঁজরা হয়ে গেল। (ইবনে মাজা)

শরয়ী হুকুম:

ঘুনপোকা পুতি গন্ধময় সে কারণে তা খাওয়া হারাম। কাজী হুসাইন (রহঃ) বলেন- যদি কোন স্থানে ঘুনপোকা ঘর তৈরী করে এবং মাটির টিবি উঠায় তাহলে সে মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করা জায়েয। মাটিতে ঘুন পোকার শ্লেষা মিশ্রনের কারণে তায়াম্মুম করা নাজায়েয হবে না। এ জন্য ঘুন পোকার শ্লেষা পাক। এ জন্য ঘুনপোকার শ্লেষা যুক্ত মাটি ঘরের পবিত্র মাটির মতই। কিন্তু উই পোকাতে খাওয়া লাকড়ী অথবা কিতাবের অবশিষ্টাংশের উপর তায়াম্মুম করা জায়েয হবে না। কারণ এগুলো মাটি নয়। আর তায়াম্মুম শুধু মাটিতেই জায়েয।

প্রবাদ ও উদাহরণ:

আরবীরা বলে থাকে: هـواكل من ارضه "সে ব্যাক্তি ঘুন পোকার চেয়ে বেশী খায়।" এই কথাটি ঐ ব্যক্তির বেলায় বলা হয় যে খুব বেশী আহার করে।

هـو اصـنـع مـن ارضـه - "সে লোক ঘুন পোকার চেয়েও অধিক কোশলী"। এটি ঐ লোকের বেলায় বলা হয়ে থাকে যে তার নিজের কাজে পূর্ণ দক্ষ।

স্বপ্নের তাবীর:

স্বপ্নে কেউ ঘুন পোকা দেখলে এর ব্যাখ্যা হবে, সে ব্যক্তি বিদ্যাবুদ্ধিতে পাকা হবে, তর্কে দক্ষ হবে।

ارقم

(১১) গোখরা সাপ

ارقـــم গোখরা সাপকে বলা হয়। যার গায়ে সাদা ও কাল ডোর দাগ এমন ভাবে অঙ্কিত থাকে যা দেখলে মনে হয় যে এর গায়ে কিছু লিখা আছে অথবা কোন প্রকার নকশা বানানো হয়েছে।

বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি কোন মানুষের হাড় ভেঙ্গে আমিরুল মু'মিনীন হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) এর দরবারে বদলা নেয়ার জন্য এল। খলিফা উমর (রাঃ) কোন কারণে বদলা নিতে অস্বীকৃতি জানালেন। লোকটি বলল যে, ব্যাপারটি একদম গোখরা সাপের মত হয়ে গেল। উভয় অবস্থাতেই শুধু ক্ষতি আর ক্ষতি। যদি আপনি সাপকে ছেড়ে দেন তাহলে তার পক্ষ থেকে যেকোন সময় ছোবল মারার ভয় আছে। আর যদি একে মেরেও ফেলেন তাহলেও ক্ষতির আশংকা আছে। ইবনুল আছীর বলেন, বর্বর যুগে মানুষের এ বিশ্বাস ছিল যে, সাপ মারলে জ্বিনজাতি এর বদলা নেয়। যে কোন সময় সাপ হত্যাকারী পাগল হয়ে যাবে অথবা মৃত্যু বরণ করবে। তাহলে তো ব্যাপারটি এরকমই হয়ে গেল যে, যেমন কোন ব্যক্তির উপর অন্য বস্তুর প্রভাব পড়ল এবং একে দূর করার কোন ব্যবস্থা জানা নেই- তাহলে তো উভয় অবস্থায়ই ক্ষতি হবে। একেতো হাড় ভেঙ্গে গেল আবার এর উপর কেছাছও নেই।

কারো কারো মতে- গোখরা সাপ হল যার দেহে লাল ও কাল উভয়

রংএর দাগ কাটা থাকে। ইমাম মালেক (রঃ) এর মাযহাবে গোখরা সাপকে উদারহণ দিয়ে বলা হয়:

كانون اذهب برده كانو ننا☆ ما بين سادات كرام خذق

"আগুনের পাত্র তার শীতলতা শেষ করে দিল। আমাদের অগ্নিপাত্র বড় বড় সম্মানী লোকের মাঝখানে রাখা হয়েছে।"

يالرقم حمر البطون ظهور ها☆ سود تلغلغ باللسان الازرق

"সে অগ্নিপাত্রটি গোখরা সাপের মত, যার পেটে লাল রঙ্গের চিহ্ন এবং পীঠে সাদা কাল ডোরা কাটা রং এর তীক্ষ্ণতা এবং সে গোল পাকিয়ে থাকে।"

ارنب

(১২) খরগোস

ارنب খরগোস। এর বহু বচন ارانب আসে। এটি اسم جنس নারী পুরুষ উভয় লিঙ্গের বেলায় ارنب শব্দই ব্যবহৃত হয়। এটি এমন একটি প্রাণী যা বকরীর ছোট বাচ্চার মতই হয়ে থাকে। যার উভয় হাত অর্থাৎ সম্মুখের দুপা ছোট এবং পেছনের উভয় পা তুলনামূলক লম্বা হয়ে থাকে। খরগোস জিরাফের ন্যায় পেছনের পায়ে ভর করে চলে। জাহেয বলেন যে, তোমরা যখন ارنب বলো তখন পুরুষ খরগোসই উদ্দেশ্য হবে। যেমন عقاب (ঈগল) বলায় পুরুষ ঈগল উদ্দেশ্য হয়ে থাকে هذا العقاب ব্যবহার করবে। নাহ্‌বিদ মাবরাদ বলেন عقاب (ঈগল) শব্দ নারী পুরুষ উভয়য়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। উভয় শব্দে ইসমে ইশারার মাধ্যমে বিবেচনা করতে হবে। যেমন ارنب এ ব্যবহার করা হয়।

পুরুষ খরগোসকে আরবী ভাষায় خزن বলা হয়। এর বহুবচন خزان যেমন صردان– صرد অন্য লুগাতে এর বহুবচন اخزة পাওয়া যায় এবং পুরুষ খরগোসের জন্য عكرشة ব্যবহার করা হয়। আর খরগোসের বাচ্চার জন্য خرنق ব্যবহার করা হয়। ছোট বাচ্চার জন্য ক্রমানুসারে তিনিট শব্দ ব্যবহৃত হয়। এথমটি خرنق ২য়টি سخلة তৃতীয়টি ارنب। পুরুষ খরগোসের এক প্রকার এমন হয়ে থাকে যে, তার শরীরের এক অংশে হাড় দ্বিতীয় অংশে গোস্তের মিশ্রন থাকে। এ জাতীয় খরগোস শৃগালের মধ্যেও পাওয়া যায়। পুরুষ খরগোস যে কোন সময় স্ত্রী খরগোসের সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হয়ে পড়ে। কারণ এর মধ্যে যৌন শক্তি প্রবল। গর্ভাবস্থায়ও পুরুষ খরগোস সঙ্গম করে। এই প্রাণীটির মধ্যে

অত্যাশ্চার্য বিষয় হল, সে এক বছর পুরুষ থাকে এবং দ্বিতীয় বছর নারীতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। فسبحان القادر على كل شى

একটি খরগোস ও বান্দীর আশ্চার্য ঘটনা:

ইবনে আছীর ৬১৩ হিজরী সনের ঘটনাসমুহের বর্ণনায় একথা উল্লেখ করেছেন যে, আমার এক বন্ধু খরগোস শিকার করে। যখন তিনি খরগোসের প্রতি মনোযোগ সহকারে দেখতে ছিলেন তখন বুঝতে পারলেন যে, এর আলাদা বিশিষ্ট অঙ্গ আছে। আর আছে লজ্জাস্থান। অতএব মানুষ যখন এর পেট চিড়ে দৃশ্য দেখল তখন উভয় বস্তু একত্র হওয়ার কারণ বিদ্যমান ছিল। ইবনে আছীর (রহঃ) এতে বিস্মিত হয়ে ২য় ঘটনা বর্ণনা করল যে, আমার প্রতিবেশীর এক মেয়ে ছিল। তার নাম ছুফিয়া। তার বয়স যখন ২৫ বছর হল তখন তার মধ্যে পুরুষাঙ্গ বের হল। তার পর তার দাড়ীও গজাল। এতে করে তার মধ্যে উভয় লিঙ্গই একত্র ছিল।

খরগোসের কতিপয় বৈশিষ্ট:

খরগোসস চোখ খোলা রেখেই ঘুমায়। শিকারী এসে যখন দেখে তার চোখ খোলা তখন সে মনে করে যে, সে জেগে আছে। এ কারণে সে ব্যর্থমনরথ ফিরে যায়। খরগোসের ব্যাপারে প্রসিদ্ধি আছে যে, সে সমুদ্র দেখলে মৃত্যু বরণ করে। এ জন্য তাদেরকে প্রায় সমুদ্র এলাকায় পাওয়া যায়। ইমাম দামিরী বলেন একথা সত্য নয়। আরবগণ খরগোসের ব্যাপারে এমতামত পেশ করেন যে, খরগোসের ঋতুস্রাব হওয়ার কারণে জিনেরা এদের কাছ থেকে দূরে থাকে। জনৈক কবি বলেন :

وضحك الارانب فوق الصفا☆ كمثل دم الحرب يوم اللقا

"সাফা পাহাড়ে খরগোসের হায়েজের রক্ত এমনভাবে প্রবাহিত হল যেমন ভাবে যুদ্ধের মাঠে রক্ত প্রবাহিত হয়।"

উপদেশ:

চারটি প্রাণী এমন আছে যেগুলোর ঋতু স্রাব হয়। যেমন (১) নারী লোক (২) গন্ডার (৩) বাঁদুর এবং (৪) খরগোস। কোন কোন আলেম বলেন কুকুরনিরও ঋতুস্রাব হয়। জাবের বিন হুয়াইরিছ আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সঃ) খরগোসের ব্যাপারে বলেন এদের ঋতস্রাব

হয়। ইবনে মুঈন জাবের বিন হুয়াইরিছ এর ব্যাপারে বলেন যে, তাঁর সম্পর্কে জানি না। কিন্তু ইবনে হাব্বান তাকে বিশ্বস্থ রাবী হিসেবে গন্য করেন। একটি মাত্র হাদীছই তার থেকে প্রসিদ্ধ। ইবনে ওমর থেকে অন্য এক হাদীছ বর্ণিত আছে যে, হুজুর (সাঃ) এর নিকট একটি খরগোস আনা হলে নবী (সাঃ) একে খেলেনও না আবার বাধাও দিলেন না। (বায়হাকী) সম্ভবত নবী করীম (সাঃ) এর এই খেয়াল ছিল যে, খরগোসের স্রাব হয় এবং সে গোস্ত ইত্যাদি খেয়ে থাকে। জাবর কাটে, পায়খানও (বিষ্টা দেয়) করে আবার তার পায়ের নীচে এবং চোয়ালের ভিতরের অংশে কেশও থাকে।

খরগোসের শরয়ী বিধান:

উলামাদের ঐক্যমতে খরগোসের গোস্ত হালাল। কিন্তু এক বর্ণনায় মাকরুহ। এই বর্ণনার বর্ণনাকারী হলেন ইবনে উমর (রাঃ) এবং ইবনে আবু লায়লা। আমরা এই বর্ণনা থেকে প্রমাণ পেশ করি যে, তাদের একদল আনাস বিন মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। একদা আমরা মাররুজ্জাহরান নামক স্থানে শিকারের জন্য একটি খরগোসকে অনুসরণ করলাম। আমি দৌড়ে গিয়ে একে ধরে ফেললতে সক্ষম হলাম। একে আবু তালহার নিকট নিয়ে গেলাম। আবু তালহা একে জবাই করলেন এবং তার একটি পাছা ও দুটি রান রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নিকট পাঠালেন। নবী করীম (সাঃ) একে কবুল করলেন। (বোখারী, মুসলিম, তিরমিযী)

বুখারী শরীফের এক বর্ণনায় আছে নবী করীম (সাঃ) এগুলো কবুল করে তা আহার করলেন। আরেক বর্ণনায় আছে আমি একজন মক্তিশালী যুবক ছিলাম। আমি একটি খরগোস শিকার করলাম এবং তার গোশত রান্না করলাম। হযরত আবু ত্বালহা আমাকে দিয়ে খরগোসের একটি রান নবী করীম (সাঃ) এর খিদমতে প্রেরণ করেন। অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, নবী করীম (সাঃ) কে খরগোস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি তা হালাল বলেছেন।

মুহাম্মদ ইবনে সাফওয়ান (রাঃ) দু'টি খরগোস শিকার করে এদেরকে জাবাই করলেন। এসময় নবী করীম (সাঃ) তাশরীফ আনলেন এবং নবী (সাঃ) এদের খেতে আদেশ করলেন।

দ্বিতীয় দলের প্রমান: যে সমস্ত উলামায়ে কেরাম খরগোসের গোশত

মাকরুহ বলেছেন যেমন ইবনে আবু লাইলা এবং তার সমর্থক আরো অনেকেই। তিনি এই হাদীছ দলীল হিসেবে পেশ করেন যে, হাব্বান ইবনে জুয (রাঃ) বলেন আমি একদা নবী করীম (সাঃ) কে জিজ্ঞেস করলাম যে, আপনি খরগোসের ব্যাপারে কি বলেন? তখন নবী করীম (সাঃ) বললেন আমি তা খাবও না আবার একে হারামও বলি না। আমি আবার বললাম হুযুর এরকম কেন? হুজুর (সাঃ) এরশাদ করলেন; আমার বিশ্বাস যে, তার (খরগোসের) ঋতুস্রাব হয়। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম গন্ডারের হুকুম কি? নবী (সাঃ) বললেন গন্ডার আবার কে খায়? (তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযীর ধারনা মতে, এই হাদীছের সনদ শক্তিশালী নয়। আবার ইবনে মাজাহ সে হাদীছকে আবু বকর ইবনে আবু শাইবাহ থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু একে গন্ডারের সহিত শৃগাল এবং গুইসাপ এর সম্পর্ক আছে।

অন্য বর্ণনায় আছে যে, আমি নবী করীম (সাঃ) কে মেষ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি (সাঃ) বললেন এগুলো কোন মানুষই খায় না যার মধ্যে সামান্যতম উপকার আছে।

ইমাম দামিরী (রহঃ) বলেন এমন কোন দূর্বল হাদীছ নেই যার মধ্যে খরগোস হারাম হওয়ার ব্যাপারে দলীল আছে। কিন্তু উপরোক্ত দুটি বর্ণনা থেকে শুধু এপর্যন্ত পাওয়া যায় যে, খরগোস দূর্গন্ধযুক্ত হতে পারে তবে খাওয়া যাবে।

উদাহরণ ও প্রবাদ :

আরবরা খরগোস দ্বারা উদাহরণ দিয়ে থাকেন যে, اقطف من واطعم اخاك من كلية الارنب "খরগোসের প্লীহা নিয়ে তোমার ভাইকে খাইয়ে দাও।" এ রকম আরো একটি উদাহরণ-اطعم اخاك من عقنقل الضب "তোমার ভাইকে গুইসাপের আতুড়ী খাইয়ে দাও।" এ দুটি উদাহরণ আরবগণ সহানুভূতি ও সাহায্য সহযোগিতা করার সময় বলে থাকে। في بيته يوتى الحلم তার ঘরেই মীমাংসা করা হয়। এই উদাহরণটি আরবগণ পশু থেকে নিয়েছে। এ ব্যাপারে একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা রয়েছে। একদা এক খরগোস একটি খেজুর কুড়িয়ে পেল। আর শৃগাল একে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। ঝগড়া করে উভয়ে গুইসাপের কাছে গেল। খরগোস অভিযোগ করে বলল হে আবুল হাসান (এটি খরগোসের উপাধি) গুই সাপ বলল سميعا دعوت (শ্রবণকারীকেই ডেকেছ)

আমরা উভয়েই তোমার নিকট মীমাসার উদ্দেশ্যে এসেছি। গুই সাপ বলল عادلا حكيما (ন্যায় বিচারকের কাছেই এসেছ) আবার খরগোস বলল তুমি আমাদের নিকট এসো। গুইসাপ বলল فى بيته يوتى الحكم (বিচারালয়েই মীমাংসার জন্য আসতে হয়) খরগোস বলল যে, আমি একটি খেজুর পেয়েছি -গুইসাপ বলল حلوة فكليها (খেজুর তো মিষ্টি সুতরাং তা খেয়ে ফেল) খরগোস বলল শৃগাল একে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। গুই সাপ বলল لنفسه يعى الخير (নিজের জন্যই উত্তম কাজ করে থাকে) খরগোস বলল অতঃপর আমি তাকে এক থাপ্পর মারলাম। গুই সাপ বলল بحقك اخذت (তুমি তোমার অধিকার আদায় করেছ) খরগোস বলল অতঃপর সেও আমাকে থাপ্পর মারল। গুই সাপ বলল حرا انتصر لنفسه (স্বাধীন ব্যক্তি নিজেকেই সাহায্য করে) এবার খরগোস বলল তুমি আমাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। গুই সাপ বলল قد قضيت আমি মীমাংসা করলাম। গুইসাপ এ পর্যন্ত যত কথা বলল এ সমস্ত সবই দৃষ্টান্ত হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে।

আরেকটি ঘটনা:

আদ্দি ইবনে ইরত্বাহ আদালতের প্রধান বিচারপতি সুরাইহ এর নিকট এলেন। আদ্দি বললেন আপনি কোথায় আছেন? বিচারপতি সুরাই বলেন بينك وبين الحائط তোমার এবং দেয়ালের মাঝখানে। আদ্দি বললেন আমি একটি মামলা নিয়ে এসেছি। আপনি দয়া করে শুনুন। বিচারপতি বললেন لاستماع جلست (শুনার জন্যই তো বসেছি) আদ্দি বললেন আমি এক মহিলাকে বিয়ে করেছি। বিচারপতি বললেন بالوفاة والبنين (স্ত্রীর সহিত ভাল আচারণ এবং সন্তান সন্ততি হউক) আদ্দি বললেন আমার শ্বশুরালয়ের লোকেরা আমাকে এ শর্ত বেধে দিল যে, তুমি একে (স্ত্রীকে) বাইরে নিয়ে যেতে পারবে না। বিচারপতি বললেন اوف لهم بالشرط (তুমি এদের শর্ত পূর্ণ কর) আদ্দি বললেন আমি তাদের ঘর থেকে নিয়ে যেতে চাই। বিচারপতি বললেন حفظه الله (আল্লাহ হাফেজ)। আদ্দি বললেন এখন আপনি মীমাংসা করে দিন। বিচারপতি বললেন قد فعلت (বিচার করে দিলাম) আদ্দি বললেন কিভাবে বিচার করলেন? বিচারপতি বললেন على ابن امك (তোমার মায়ের ছেলের উপর) আদ্দি বললেন কার সাক্ষাতে? বিচারপতি বললেন بشهادة ابن اخت خالك (তোমার খালার বোনের ছেলের স্বাক্ষ দেয়াতে)

বিচারপতি সুরাইহ এর জীবন কথা:

সুরাইহ ইবনুল হারছ কাইস আল কিন্দি। হযরত উমর (রাঃ) তাকে কুফার বিচারপতি নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি বিচারক হিসেবে ৭৫ বছর পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। এত দীর্ঘ সময় মাত্র তিন বছর ছাড়া বিচারকের আসনেই সমাসীন ছিলেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাঃ) এর সময়কালে যে সকল ফিতনা ফ্যাসাদ উদ্ভাসিত হয়েছিল এ ঘটনার সুত্র ধরে হজ্জাজ বিন ইউসুফ তার নিকট অব্যাহতি তলব করলেন। তিনি সত্তরই অব্যাহতি দিয়ে দিলেন। এরপর থেকেই তিনি আর কখনো দুই ব্যক্তির মধ্যে বিচার মীমাংসা করেন নি। এর পর তিনি ইন্তেকাল করেন। কাজী সুরাইহ তখনকার যুগে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের মধ্যে গণ্য ছিলেন। বিশেষতঃ তিনি বিচার কার্যে অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন। তার মুখমন্ডলে গোঁফ দাড়ি গজায়নি। সম্মানী ব্যক্তিবর্গের মধ্যে এরূপ চারজন লোক অতিবাহিত হয়েছেন যাদের মুখে বার্ধক্যের ছাপ আসার পরও চুল গজায়নি। তারা হলেন (১) আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাঃ) (২) ক্বাইস ইবনে ছাদ ইবনে উব্বাদ (রাঃ) আহনাফ ইবনে কায়স ও (৪) বিচারপতি সুরাইহ(রহঃ)।

ইবনে খাল্লিকান (রহঃ) বলেন বিচারপতি সুরাইহ এর একজন সন্তানই ছিল। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে এই রোগেই ইন্তিকাল করেন। ইন্তিকালের পূর্বে তার ছেলে অত্যন্ত চিন্তিত ছিলেন। কিন্তু ভীতি হননি। এ অবস্থা দেখে কোন ব্যক্তি তার ছেলেকে জিজ্ঞেস করল একি আপনার পিতার অসুস্থতার পূর্বে আপনাকে অত্যন্ত চিন্তিত মনে হচ্ছিল এবং আপনার মধ্যে আনন্দের কোন চিহ্নও পরিলক্ষিত হয়নি আর এখন এ অবস্থা কেন?

ছেলে বলল সে সময় (আব্বার মৃত্যুর সময়) ঘাবড়ানো আমার পিতার জন্য দয়া এবং করুণা ছিল। কিন্তু ভাগ্যের লিখা যখন ঘটেই গেল তখন একে আমি বরণ করেই নিলাম এবং সন্তুষ্ট চিত্তে তা মেনে নিলাম। তাদের সম্পর্কে ইমাম ইবনুল ফারজ আল জওজী (রহঃ) একদা একটি ঘটনা বর্ণনা করেন, যিয়াদ হযরত মোআবিয়া (রাঃ) এর নিকট পত্র লিখেন যে, হে আমীরুল মু'মিনীন আমি আপনার বাম হস্তের জন্য ইরাককে পদানত করে রেখেছি এবং দক্ষিণ হস্তকে আপনার আনুগত্য ও অধীনতার জন্য মুক্ত করে দিলাম। সে জন্য

আপনি আমাকে হজ্জাজ বিন ইউসুফের অভিভাবক বানিয়ে দিন। সে যুদ্ধের সময় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) জীবিত ছিলেন এবং মক্কাতেই স্থায়ী বসবাস করতে থাকেন। যিয়াদের এই আবেদনের সংবাদ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) পর্যন্ত পৌঁছে গেলে তিনি যিয়াদের জন্য বদ দোয়া করেন- যে হে আল্লাহ আপনি আমাদের সবাইকে যিয়াদের ডান হস্ত থেকে রক্ষা করুন। এই বদ দোয়ার ফলাফল হল যিয়াদের ডান হস্তে প্লেগ রোগ হয়ে যায় এবং সমস্ত চিকিৎসকগণ ঐক্যমত পোষণ করেন যে, তার ডান হস্ত কর্তন করতে হবে। যিয়াদ চিকিৎসকগণের এ মতামত নিয়ে বিচারপতি সুরাইহ এর সাথে পরামর্শ করলেন (যে আমার এ রোগ হয়েছে আর চিকিৎসগণ এ পরামর্শ দিয়েছেন) বিচারপতি সুরাইহ পরামর্শ দিলেন যে, আপনি হাত কাটাবেন না কারণ রিযিকতো বন্টিত এবং মৃত্যু তো নির্ধারিত হয়েই আছে। আমার নিকট খারপ মনে হচ্ছে যে, আপনি যতদিন জীবিত থাকবেন ততদিন হাত কাটা অবস্থায় থাকবেন। আপনি যখন হাত কাটাবেন এবং তখন যদি আপনার মৃত্যু এসে যায় তাহলে কিয়ামতের মাঠে আল্লাহর সম্মুখে হাত কাটা অবস্থায়ই উপস্থিত হবেন। তা কিন্তু ভাল হবে না। এ জন্য আল্লাহ পাক যখন আপনাকে হাত কাটার ব্যাপারে প্রশ্ন করবেন যে তুমি কেন হাত কাটলে? তখন আপনি এ জবাব দেবেন নিয়তী এবং আল্লাহর হুকুমের ভয় এবং আপনার সাথে সাক্ষাত না করার ভয়ে এ রকম করেছি। ইতিহাসে বর্ণি যে, এই দিনই যিয়াদের মৃত্যু ঘটে। অধিকাংশ মানুষই যিয়াদের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল। বিচারপতি সুরাইহ এর এ ধরনের পরামর্শ দেয়ার কারণে জনগণ তাকে গালমন্দ করতে লাগল। তিনি জনগণকে জবাব দিতেন যে, যিয়াদতো শুধু আমার সাথে পরামর্শ করেছেন। তিনি যদি আমার সাথে পরামর্শ না করতেন এবং পরামর্শ দাতাকে আমানতদার হিসেবে শরীয়ত অনুসরণ না করতেন তাহলে আমিও তাই চাইতাম যে, যিয়াদের এক হাত আজ এবং কাল কাটা যেত। এর পর পর প্রতি দিনই সব অঙ্গ এক একটি করে কাটা যেত। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আবুল ফাতাহ আল-বস্তী তার দীর্ঘ কবিতায় বলেন

لاتستشر غير ندب حازم فطن☆ قد استوت منه اسرار واعلان

"সতর্কবান এবং জ্ঞানী লোক ছাড়া অন্য কারো সাথে পরামর্শ করা উচিত নয়, কারণ তার কাছে ভিতর এবং বাইর এক সমান।

فللتدابير فرسان اذا ركضوا☆ فيما ابووا كما للحرب فرسان

"আর তদবীরের জন্য ঘোড় সওয়ারও হয় যখন সে এতে পা রেখে ফিরে আসে যেমনিভাবে যুদ্ধের মাঠে ঘোড় সওয়ার হয়।"

ঐতিহাসিক ইবনে খাল্লেকান লিখেছেন যে, বিচারপতি কাজী সুরাইহ এর কাছে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ সাকাফীর ব্যাপার জিজ্ঞাসা করা হলো যে তিনি কি মুমিন ছিলেন? এর জবাবে বিচারপতি সুরাইহ বলেছিলেন সে তাগুত (শয়তানের) উপর বিশ্বাস আর আল্লাহর সাথে কুফরী করত। বিচারপতি সুরাইহ ৭৯/৮০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। ইন্তিকালের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ১২০ বছর।

চিকিৎসা ক্ষেত্রে খরগোসের উপকারীতা:

জাহিজ লিখেন, আরবদের এই বিশ্বাস ছিল যে, কেউ খরগোসের টাখনু শরীরে পরিধান করলে তার উপর কোন বদ নজর এবং যাদুর প্রভাব পতিত হবে না। জিন খরগোসের কাছেও যায় না কারণ তাদের ঋতুস্রাব হয়। কোন ব্যক্তি রোগ থেকে মুক্তি পাবার পর শরীরের কোন অঙ্গে কম্পন রোগ হল। সে ভুনা করে খরগোসের মগজ খেলে আশাতীত ফল পাবে। কোন লোক যদি দুটি ছোলা বুটের পরিমান খরগোসের মগজ অর্ধ রিতিল এর ছয় ভাগের এক অংশ সমান গাভীর দুধসহ ব্যবহার করে তাহলে বার্ধক্যের ছাপ আসবে না। খরগোসের পাকস্থলী ক্যান্সার রোগে ব্যবহার করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

নোট: انفحہ এমন ছাগল ছানা যে এখনো দুধ পান করে। তার পেট থেকে এমন একটি বস্তু বের হয় এবং কাপড়ে একে মিশিয়ে ফেলা হয়। আবার বস্তুটি পনীরের মত গাঢ় হয়।

নোট : سرطان এক প্রকার ফোড়ার নাম যার মধ্যে কাকড়ার ঠ্যাং এর মত রগ দেখা দেয়। ইংরেজীতে এ রোগকে ক্যানসার বলে। (মিসবাহুল লুগাত)

কোন মেয়ে লোক পুরুষ খরাগোসের পাকস্থলী ভক্ষণ করলে তার ছেলে সন্তান হবে আর স্ত্রী খরগোসের পাকস্থলী খেলে মেয়ে সন্তান জন্ম নিবে। কোন রমনী যদি খরগোসের বিষ্ঠা কোমরে ঝুলিয়ে রাখে তাহলে সে গর্ভবতী হবে না।

বাক্বরাত (একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক) লিখেন যে, খরগোসের গোশত গরম-ঠান্ডা হয়ে থাকে। এর গোশত পেটকে পরিস্কার করে এবং প্রশ্রাব খোলাসা

করে। যে খরগোসকে কুকুর শিকার করে তা উত্তম খরগোস বলে বিবেচিত হয়। এ ধরনের খরগোস অতি মোটা মানুষের স্বাস্থ কষ্ট দূর করতে বেশ উপকারী। তবে এর ব্যবহারে ঘুম একদম বিনষ্ট করে দেয় এবং পিত্ত বৃদ্ধি পায় তা নিরাময়ের জন্য চিকিৎসকগণ ভিজা মসলা পরামর্শ দেন। অবশ্য উল্লেখিত কাজ নরম মেজাজের মানুষের জন্য অত্যন্ত উপকারী। খরগোসের মগজ ভূনা শুল মরিচের সহিত একত্র করে খেলে কম্পন রোগে বেশ উপকার হয়। কোন কোন খরগোসের গোস্ত শুষ্ক হয়। এ জন্য এদেরকে এমন স্থানে ছেড়ে দেয়া হয় যেখানে পানিতে ঘাস পাতা জন্মায় যে কারণে এদের গোশতে অধিক শুষ্কতা সৃষ্টি হয়। শুষ্কতার সম্পর্ক সে সব খরগোসের হয় না যাদেরকে শুধু ঘরেই রাখা হয়।

ইমাম যাকারিয়া কাযভিনী (রহঃ) বলেন, যদি এক দানিক (সাড়ে সাত রতি) মগজ দুই যব পরিমাণ কর্পুর মিশিয়ে কাউকে পান করানো হয় তাহলে ঐ ব্যক্তিকে যে কেউ দেখবে সেই ভালবাসবে। এমন ব্যক্তিকে যদি কোন নারী দেখে তাহলেও তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়বে। এমনকি তার সাথে মিলনের জন্যও আবেদন নিবেদন করতে থাকবে। খরগোসের রক্ত যদি কোন নারী লোক পান করে তাহলে সে আর কখনো গর্ভবতী হবে না। কেউ যদি খরগোসের রক্ত ধবল রোগে এবং মুখের দাগে লাগায় তাহলে আল্লাহর রহমতে ধবল রোগ মুখের দাগ চলে যাবে। যদি কোন মেয়ে লোক খরগোসের মগজ সামান্য আহার করে এবং কিছু অংশ তার লজ্জাস্থানে মালিশ করে সহবাস করে তাহলে আল্লাহর রহমতে মেয়ে লোকটি গর্ভবতী হবে। খরগোসের মগজ যদি শিশুর দাঁতের মাড়িতে লাগনো হয় তাহলে শীঘ্রই শিশুর দাত উঠবে। খরগোসের রক্তে সুরমা বানিয়ে চোখে লাগালে চোখে চুল গজাবে না। হাকিম মেহেররাছ বলেন, যদি খরগোসের পিত ঘি এবং মেয়েলোকের স্তনের দুধ একত্রে মিশিয়ে সুরমা হিসেবে ব্যবহার করে তাহলে চোখের ফুল ছানি পড়া এবং অন্যান্য রোগ বিদূরিত হবে।

খরগোসের রক্ত শরীরের কাল দাগে লাগালে ইনশাআল্লাহ তা দূর হয়ে যাবে। বিছানাতে প্রশ্রাব করা যদি কারো অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায় তাহলে খরগোসের গোশত কয়েক দিন খেলে এ অভ্যাস থাকবে না।

প্রখ্যাত দার্শনিক এরিষ্টটল বলেন, খরগোসের পাকস্থলি সিরকাতে

মিশিয়ে ব্যবহার করলে সাপের বিষের জন্য বিশেষ উপকার হয়। যব পরিমাণ তা পান করলে খুব সহজ প্রসব হবে। খরগোসের যকৃতকে ঔষধি গাছের সাথে মিশিয়ে যখমে ব্যবহার করলে লোহা দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হলেও তা নিরাময় হবে। এরূপ করলে শরীরে কোথাও কাটা ফুটলে তা বের হয়ে যাবে। মুখমন্ডলের দাগে অথবা দাদ-ছুলি ইত্যাদিতে লাগালে ভাল ফল পাওয়া যাবে। খরগোসের লেদা গোসলখানায় ধৌত করে এর গন্ধ নিলে শুধু বায়ুর-দুর্গন্ধ বের হবে। খরগোসের চর্বি কোন মহিলার বালিশের নীচে রাখা হলে সে মহিলা ইচ্ছা করে গোপন কথা ফাস করে দেবে। কেউ যদি খরগোসের দাত গলায় বেঁধে রাখে তাহলে তার দাঁতের যাবতীয় ব্যথা বিদূরিত হবে এবং দাঁত দীঘস্থায়ী হবে।

খরগোস সংক্রান্ত স্বপ্নের ব্যাখ্যা:

স্বপ্নে খরগোস দেখা, এমন সুন্দরী মহিলার লক্ষণ যে মহিলা ভালবাসার কোন পাত্রী নয়। খরগোস জবাই করতে স্বপ্নে দেখলে এর ফলাফল হবে, স্বপ্নদেখা ব্যক্তির স্ত্রী বিয়োগ ঘটবে অথবা সে স্ত্রী থেকে পৃথক হয়ে যাবে। স্বপ্নে কেউ দেখল যে, সে রান্না করা খরগোসের গোশত খেয়েছে, এর ব্যাখ্যা হবে যে, গায়েব থেকে তার রিযিক আসবে। কেউ স্বপ্নে দেখল যে, সে খরগোস শিকার করছে অথবা কেউ তাকে খরগোস উপহার দিয়েছে অথবা সে খরগোস ক্রয় করেছে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে, সে প্রচুর পরিমাণে রিযিক পাবে। আর যদি সে ব্যক্তি অবিবাহিত হয় তাহলে ব্যাখ্যা হবে সে সত্বরই বিয়ে হবে। সে বিবাহিত হলে সন্তান লাভ করার লক্ষ্যণ। এও ব্যাখ্যা হয় যে, সে নিজ বিরোধী শক্তির উপর বিজিত হবে।

ارنب بحرى

(১৩) সামুদ্রিক খরগোস

ইমাম কাযবিনী (রহঃ) বলেন, ارنب بحرى তথা সামুদ্রিক খরগোস এমন এক প্রাণী যার মাথা খরগোসের ন্যায় কিন্তু তার দেহ মাছের ন্যায়। ইবনে সিনা (বু আলী ইবনে সীনা) বলেন এটি বিষধর প্রাণী। ঝিনুক থেকে যার জন্ম হয়। এটি এমনই বিষধর প্রাণী যদি কেউ একে ভক্ষণ করে সাথে সাথে মারা যায়।

শরয়ী বিধান:

সামুদ্রিক খরগোসের গোশত বিষাক্ত হওয়ায় তার গোশত খাওয়া শাস্ত্র বিশারদগণ হারাম ঘোষণা করেছেন। সুতরাং তাঁরা এই প্রাণীকে এই বিধান থেকে আলাদা করেছেন যে, ماكل شبهه فى البراكل شبهه فى الخ "যে স্থলের প্রাণী খাওয়া বৈধ সে রূপের সামুদ্রিক প্রাণীও খাওয়া বৈধ। এই প্রাণীটি আকার আকৃতিতে স্থলের খরগোসের সাদৃশ্যপূর্ণ। তথাপি বিষাক্ত হওয়ায় তা হারাম হবে।

ارويۃ

(১৪) পাহাড়ী বকরী

ارويۃ হামজাতে পেশ ও যের উভয়ই পড়া যায়। راء তে সাকিন واو এ যের এবং ياء তে তাশদীদ পড়তে হবে। এই শব্দটি পুরুষের জন্য বলা হয়। আর মাদীর জন্য وعولى ব্যবহৃত হয়। এর স্ত্রী থেকে ও একটি শব্দ মেয়ে লোকের জন্যও বলা হয়ে থাকে। এর পুংলিঙ্গ এবং স্ত্রী লিঙ্গ উভয়ের বহুবচনের জন্যই اراوى এবং اراوى اراو ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। মূলত: افعولۃ – ارويۃ এর ওজনে আসে। কিন্তু সরফীগণ দ্বিতীয় واو কে ياء দ্বারা পরিবর্তন করে واو এর মধ্যে মিলিয়ে দিয়েছেন। واو কে ياء এর সাথে সম্পর্ক রেখে যেরএ রূপান্তরিত করেছে। এজন্য ثلاث اراوى افاعيل এর ওজন অনুযায়ী ব্যবহার করেছেন। কিন্তু যখন এর অনেক অনেক ব্যাখ্যা করা হয় তখন اروى হামজাকে যের দিয়ে افعل এর ওজন মোতাবিক সরফীদের বিপরীত ব্যবহার করা হয়। কোন কোন অভিধানবেত্তা اروى পাহাড়ী ছাগলকে বলেছেন।

হাদীছে পাহাড়ী বকরীর আলোচনা:

হাদীস শরীফে আছে যে, এহরাম অবস্থায় নবী (সঃ)কে পাহাড়ী বকরী হাদিয়া দেয়া হয়েছিল। অন্য একটি হাদীছে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর বলেন ওহুদ যুদ্ধের সময় আমি পাহাড়ে এমনিভাবে আশ্রয় নিয়ে ছিলাম যেমনিভাবে পাহাড়ী বকরী পাহাড়ে থাকে। এরপর আমি নবী করীম (সাঃ) এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে দেখলাম যে, তিনি (সাঃ) কতিপয় সাহাবীদের মজমায় উপস্থিত আছেন তখন তার উপর এ আয়াত অবতীর্ণ হয়:

وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل

"মুহাম্মদ রাসূল ব্যতীত আর কিছুই নন, তাঁর পূর্বে অনেক রাসূল অতিবাহিত হয়ে গেছেন।

আরেক হাদীছে আমর ইবনে আউফের দাদা থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম (সাঃ) এরশাদ ফরমান নিঃসন্দেহে (ইসলাম) হেজাজের দিকে এমনভাবে সংকোচিত হয়ে চলে আসবে যেমনিভাবে সাপ তার গর্তে সংকোচিত হয়ে প্রবেশ করে এবং ইসলাম হেজাযে এমনভাবে শিকড় গাড়বে যেমনভাবে পাহাড়ী বকরী পাহাড়ের চূড়ায় বসবাস করে। সুতরাং দরিদ্রদের জন্য সুসংবাদ যে আমার সুন্নতকে সুন্দর করবে যাকে আমার পরে লোকেরা অসুন্দর করে ফেলেছিল। (তিরমিযী)

আরেকটি হাদীছে আছে, হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, হযরত ইউনুস (আঃ) কে ছায়াহীন মরু প্রান্তরে ফেলে দেয়া হলে আল্লাহ পাক সেখানে লাউ গাছ সৃষ্টি করে দেন। হযরত ইউনুস (আঃ) এর (দুধের) জন্য একটি জঙ্গলী বকরীর ব্যবস্থা করে দেন। বকরীটি স্থলে চরে তার নিকট এসে পা উঠিয়ে দিত। হযরত ইউনুস (আঃ) সে দুধ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পান করতেন। দেখতে দেখতে তার শরীর গোশতে পরিপূর্ণ হয়ে যায়।

ইবনে আতিয়া (আবু মুহাম্মদ আব্দুল হক ইবনে আবু বকর ইবনে গালিব ইবনে আতিয়াহ গারনাত্বী (রহঃ) বলেন যে, আল্লাহ পাক হযরত ইউনুস (আঃ) এর প্রশান্তির জন্য লাউ গাছের ছায়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। এমনিভাবে তার প্রতিপালনের জন্য সকাল সন্ধ্যা একটি পাহাড়ী বকরী এসে দুধ পান করাত। এমনিভাবে আল্লাহ পাক হযরত ইউনুস (আঃ) এর উপর অনুগ্রহ করেছিলেন। নানাবিদ খাদ্য লাউ থেকে পাওয়া যেত। তার সন্তুষ্টির জন্য চিত্তাকর্ষক বস্তু তৈরী থাকত।

ইবনে জওজী (রহঃ) হযরত হাসান (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন وفديناه بذبح عظيم আর আমি তাকে মহান কোরবানী দ্বারা পুরস্কৃত করলাম। আল্লাহ পাক হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর খেদমতে পাহাড়ের উপত্যকা থেকে একটি পাহাড়ী বকরী প্রেরণ করেছিলেন। হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) এর বর্ণিত হাদীছে আছে যে, তিনি এক ব্যক্তির সাথে তর্ক বিতর্ক করতে ছিলেন এক পর্যায়ে তিনি বিজয়ী হয়ে

গেলে তিনি বলেন পাহাড়ী বকরী এবং উটপাখী উভয়ই একত্রে এসে গেল। সম্ভবত তিনি এ উদ্দেশ্য নিতে চাইলেন যে, উভয় ব্যক্তি উল্টা পাল্টা কথার মধ্যে নিমজ্জিত ছিল। এ জন্য পাহাড়ী বকরী পাহাড় চুড়ায় বসবাস করে আর উটপাখী নরম এবং সুন্দর মনোরম এলাকায় থাকে।

পাহাড়ী বকরীর কতিপয় গুণাগুন:

নিজ বাচ্চার প্রতি অতি ভালবাসা ও আদরের বৈশিষ্ট পাহাড়ী বকরীর মধ্যে বিদ্যমান। যদি কোন শিকারী তার কোন বাচ্চার উপর আক্রমন করে শিকার করে ফেলে তাহলে অন্য বাচ্চা দৌড়ে পালিয়ে যায়। তারা একসাথে বসবাস করতে ভাল বাসে। এই প্রাণীটির মধ্যে পিতা মাতার প্রতি সদ্ব্যবহারের নজির পাওয়া যায়। যেমন বাচ্চাদের পিতামাতা যা কিছু খায় তাই বাচ্চারা পিতামাতার নিকট নিয়ে আসে। এদের পিতা মাতারা যখন বার্ধক্যে উপনীত হয় তখন বাচ্চারা চিবিয়ে পিতামাতাকে খাইয়ে দেয়।

বুযুর্গ বলেন পাহাড়ী বকরীর দু শিং-এ দুটি ছিদ্র থাকে। এ ছিদ্র দিয়ে তারা শ্বাস -নিশ্বাসের কাজ চালায়। কোন কারণে এ দুটি ছিদ্র বন্ধ হয়ে গেলে তারা মৃত্যু বরণ করে।

পাহাড়ী কবরীর শরয়ী বিধান:

উলামায়েকেরামের সর্বসম্মত মতে পাহাড়ী বকরী খাওয়া জায়েয।

উদাহরণ ও প্রবাদ :

পাহাড়ী বকরীর উদাহরণ দিয়ে আরবগণ বলেন: انما فلان كبارع الاروى "পাহাড়ী ছাগলের রাতের মত।" এজন্য পাহাড়ী চাগল পাহাড় এবং পাহাড়ের চূড়ায় বসবাস করে। তাই এরা মানুষের দেখার বাইরে থাকে। মানুষ একে খুব কমই দেখতে পারে। এরই প্রেক্ষিতে বলা হয় ব্যক্তির দ্বারা কখনো কখনো দয়া মায়া ভালবাসা ইত্যাদি পাওয়া যায়। এ ব্যক্তির বেলায়ই এ উদাহরণ ও প্রবাদটি প্রযোজ্য। এমনি ভাবে বলা হয়, تكلم فلان فجمع بين الاروى والنعا "অমুক ব্যক্তি এরকম কথাবার্তা বলল যে কারণে পাহাড়ী ছাগল এবং উট পাখী এসে একত্রিত হয়ে গেল"। অর্থাৎ দুই বিপরীত প্রাণী একত্রিত হয়ে গেল। এরূপও বলা হয়, مايجمع بين الاروى النعام "অমুক ব্যক্তি এমন কথাবার্তা বলল যে, পাহাড়ী ছাগল ও উট পাখী উভয়েই একত্রে এসে গেল।"

দুইটি বিপরীত মূখী প্রাণী একত্রিত হয়ে গেল। এই উদাহরণটি ঐ সময় ব্যবহার করা হয় যখন দু'টি কঠিন স্বভাবের প্রাণীর যৌন মিলন ঘটে। উদাহরণটি দিয়ে তাই বুঝানো হয় যে, ভাল-মন্দ কিভাবে একত্রিত হয়?

ফায়দা:

সায়ীদ ইবনে যায়েদ ইবনে আমার ইবনে নাফিল যারা পৃথিবীতে জীবিত থাকাকালীনই বেহেশতের সুসংবাদ প্রাপ্ত হয়েছেন তিনি সে ভাগ্যবান ১০ জনের একজন। মুসলিম শরীফে উল্লেখ রয়েছে যে, اردى بينت اوليس সায়ীদ ইবনে যায়েদের (রাঃ) সঙ্গে লেনদেনে তিক্ততা সৃষ্টি হয়। অতঃপর মদীনা শরীফের হিরা অঞ্চলের বসবাসরত মারওয়ান ইবনে হাকামের নিকট বিচার দায়ের করল اوليس অভিযোগ করল যে, সায়ীদ ইবনে যায়েদ আমার প্রাপ্য দিচ্ছে না। এবং তিনি আমার যমীনের কিছু অংশ নিজের অধিকারে নিয়ে গিয়েছেন। হযরত সায়ীদ ইবনে যায়েদ বললেন যে আমি সে মহিলার উপর কি করে জুলুম করতে পারি। আমার কাছে নবী করীম (সাঃ) এর সেই হাদীছ রয়েছে। নবী করীম (সাঃ) এরশাদ ফরমান: যদি কোন ব্যক্তি কারো অর্ধ হাত পরিমান জমি জোর করে দখল করে নেয় তাহলে তাকে কিয়ামতের দিন সাত জমি পরিমাণ শৃংখল পরানো হবে। একথা বলেই তিনি জমি ছেড়ে দিলেন এরপর তিনি মরওয়ান ইবনে হাকামকে বললেন আপনি মহিলার লেনদেনকে বুঝিয়ে দিন এবং মহিলা থেকে আমাকে রক্ষা করুন। তারপর তিনি সে মহিলার জন্য এই বদ দোয়া করলেন, اللهم ان كانت كاذبة فاعم بصرها "হে আল্লাহ ! এই মহিলা যদি মিথ্যাবাদীনি হয় তাহলে তাকে অন্ধ করে দিন।" وجعل قبرها فى بئرها "আর তার সমাধি কূপে পরিণত করে দিন।" সে মহিলা তৎক্ষণাত অন্ধ হয়ে যায়। সেই সময়ই বন্যা এসে তার জমির সীমানা স্পষ্ট করে দেয়। তাকে আল্লাহ পাক অন্ধ করে দেয়ার পর তার এই অবস্থা হয়ে ছিল যে, দেয়াল খুঁজে খুঁজে হাতড়িয়ে চলত এবং একথা বলত যে, আমার উপর সায়ীদ বিন যায়েদ বিন আমর বিন নাফিলের বদ দোয়া লেগেছে। সে এমনি ভাবে চলতে চলতে (একদিন) কূপে পড়ে মারা গেল।

কেউ কেউ বলেন মহিলাটি সায়ীদ ইবনে যায়েদের নিকট তার জন্য ভাল দোয়ার আবেদন করলো তিনি বলেছিলেন আল্লহ পাক আমাকে যে বৈশিষ্ট দান

করেছেন তা আমি কোন অবস্থাতেই ফেরত নিতে পারিনা।

মদীনাবাসীগণ কারো জন্য বদদোয়া করলে বেশীর ভাগই একথা বলে اعماه الله كما اعمى اروى "হে আল্লাহ তুমি তাকে অন্ধ বানিয়ে দাও, যেমন অন্ধ বানিয়েছিলেন اروى কে।" সুতরাং মদীনাবাসীগণ اردى দ্বারা সে মহিলাই মনে করে থাকেন। পরে মুর্খ লোকরাও বলতে শুরু করল: اعماه الله كما اعمى اروى কিন্তু جهـا الاروى দ্বারা সেই পাহাড়ী ছাগল বুঝে নিতে লাগলেন যে, অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এজন্য তাদের এ ধারনা ছিল যে, এই পাহাড়ী ছাগল অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু পূর্বোক্ত ঘটনাই সত্য।

চিকিৎসাক্ষেত্রে পাহাড়ী ছাগলের উপকারিতা:

কোন দ্রুত কাজ সম্পাদনকারী, দৌড় ঝাপকারী, অবসাদ গ্রস্ত ব্যক্তি, এবং শরীরে অসুস্থতা অনুভবকারী ব্যক্তি পাহাড়ী বকরীর শিং এবং খুর পিষে তৈলে মিশিয়ে সমস্ত শরীরে, গোড়ালীতে মালিশ করলে তার স্বস্তি ফিরে আসবে। অবসাদ এমন ভাবে দূর হবে যেন সে কোন কাজই করেনি।

اساريع

(১৫) শুয়া পোকা

اساريع হামজার উপর যবর। এর একবচন اسروع এবং يسروع সে সমস্ত লাল কীটকে বলে যা তরী-তরকারী বা সব্জিতে হয়ে থাকে। এরা তরকারীরর উপরের সিক্কা উঠিয়ে ভিতরে গিয়ে বাসা বাধে। ইবনে সুকীত বলেন মূলত يسروع এর ياء এর উপর যবর। কিন্তু বাক্যের মধ্যে يفعول এর ওজনে ব্যবহৃত হয় না। যদি অভিধানবিদগণ বলেন যে, اساريع সেই কীটকে বলে যাদের রং লাল ও সাদা হয়ে থাকে। এগুলো সাধরণত তাতানো মাটিতে থাকে। এগুলোক নারী লোকের আঙ্গুলের সহিত তুলনা করা হয়। কোন কোন আলেম বলেন اساريع – شحمة الارض নামীয় কীটকে বলে। উর্দূভাষায় যেগুলোকে কেঁচু বলে। বিশুদ্ধ কথা হলো কেচুকে اساريع বলা হয় না।

আল কিফায়া নামক কিতাবে উল্লেখ আছে যে, اساريع সে সমস্ত কীটকে বলা হয় যাদের শরীর হয় লম্বা এবং এগুলো বালিতে থাকে। এদেরকে নারী লোকের আঙ্গুলের সাথে তুলনা করা হয়। এ কীটের অপর নাম نبات النقاوز । আদবুল কাতিব নামক কিতাবেও এই কথার সমর্থন পাওয়া যায় যে,

اساريع নরম এবং উজ্জল সাদা বর্ণ হয়। যাদের নারী লোকের আঙ্গুলের সাথে তুলনা করা হয় এবং এর বহুবচন اسروع

ইমাম মালেক (রহঃ) এর লিখিত কিতাব المنتظم الموجز فيما يهزم ولا يهمز এ লিখা হয়েছে যে, يسروع সে সব কীটকে বলে যারা তরীতরকারীতে হয়ে থাকে। তারা সবজীর খাল উঠিয়ে এর ভিতরে বাসা বাঁধে। ইবনে সুকীতও এমত পোষণ করেছেন।

ইমাম দামিরী (রহঃ) বলেন, ইবনে সুকীত এর পক্ষ থেকে যা পরিস্কার ভাবে বর্ণিত হয়েছে তা এরকম নয়। বরং তা এরকম যে, كتاب الاصلاح المنطق এর মধ্যে লিখেছেন যে, শুয়পোকা সে সব কীটকে বলা হয় যারা বালিতে বসবাস করে এবং এগুলো সজীর খাল উঠিয়ে ভিতরে বাসা বাঁধে। এতে বুঝা যায় যে, ইবনে সুকীত এখানে চামড়ার আলোচনা করেননি বরং বালির আলোচনা করেছেন। এ জন্য ইহা অধিকতর কিয়াসের দাবী রাখে। মূলত তরিতরকারীর চামড়ার আলোচনা ছিল এবং বালির কথা ভূলের কারণে হয়েছে।

এ কীট সম্পর্কে শরিয়তের বিধান:

এ সমস্ত কীট খাওয়া হারাম। কারণ এগুলো حشرات الارض কিড়া-মাকড় ইত্যাদির মধ্যে গন্য।

চিকিৎসায় উপকারিতা:

এ কীটকে সামান্য পিশে কাটাছেড়ার মধ্যে লাগিয়ে দিলে সত্বর এর ফল পাওয়া যায়। ইমামা রাযী (রহঃ) লিখেছেন শুয় পোকা কে ধৌত করে শুকিয়ে খুব মিহি করে পিসে তিলের তৈলে মিশিয়ে পুরুষাঙ্গে লাগালে তা খুব মোটা হয়।

স্বপ্নের ব্যাখ্যা:

স্বপ্নে এই কীট দেখলে এর ব্যাখ্যা হবে যে কোন এমন মানুষ প্রকাশ্যভাবে খোদাভীরু এবং পরহেজগার মনে হয় কিন্তু সে ব্যক্তি অবস্থা এবং তার কার্যকারিতা মানুষের নিকট গোপন থাকবে না সে হবে চোর এবং ডাকাত। ধন-সম্পদ কিছু কিছু চুরি করে নিয়ে যাবে। তাবীর কারকগণ বলেন يسروع হরিদ্রা রঙ্গের কীট। যেগুলো আঙ্গুরের লতা এবং সুগন্ধি ইত্যাদিতে পাওয়া যায়।

اسفع

(১৬) চিল

চিল একটি শিকারী পাখী। এদের রং হয় আকর্ষণীয় লাল কাল। কেউ কেউ বলে اســـفـــع সেই কাল তিলকে বলে যা মেয়ে লোকের উভয় গালে হয়ে থাকে। একটি ছহীহ হাদীছে উল্লেখ আছে فـقـامت امرأة سفعاء الخدين এমন একজন মেয়ে লোক দন্ডায়মান হল যার উভয় গালে কাল তিল ছিল। আবার কবুতরকেও سـفـاع বলে। অথবা এর দ্বারা কবুতরীর জন্য صـفـت ব্যবহার করা হয়। এজন্য কবুতর অথবা কবুতরী তার ঘাড়ের রং কাল আকর্ষণীয় লাল হয়ে থাকে। ইবনে যুহরী বলেন মিশর দেশে অন্যান্য প্রাণীদের মত এগুলোও পাওয়া যায়। তার ক্রম বিকাশের শেষ মঞ্জিল বড়জোড় টিকটিকির ন্যায়।

الاسقنقور

(১৭) টিক্‌টিকি সাদৃশ এক প্রকার প্রাণী

ইবনে বখতিশো বলেন, এটি ডাঙ্গার এক প্রকার কুমীর যার গোশত গরম হয়। লবন মিশিয়ে এর গোশত এক মিসকাল পরিমাণ খাওয়া গেলে যৌনশক্তি বৃদ্ধি করে এবং প্লিহার শীতলতা দূর করে। এর যাবতীয় কষ্ট দূর করে দেয়। ইবনে যুহাইর বলেন যে, এটি মিশরে পাওয়া যায় এমন এক প্রকার প্রাণী। তা বড় হতে হতে শেষ পর্যন্ত ছোট টিকটিকির মত হয়। রাতে ভয় পাওয়া ব্যক্তি এর চোখ খুলে শরীরে মালিশ করলে এই রোগ থেকে মুক্তি পাবে। তবে পাগলের ক্ষেত্রে তা কার্যকর হবে না। এরিষ্টটল নিজ সুপ্রসিদ্ধ কিতাব "আল হায়ওয়ানুল কবীর" এ লিখেছেন যে, তা পান করলে মর্দামী শক্তি বৃদ্ধি পায়। শির ছাড়া অন্যান্য দেশে ক্ষিধা জাগিয়ে তোলে, খাদ্য বৃদ্ধি করে। ভারতীয় রাষ্ট্র প্রধানদের উপঢৌকন দেয়ার জন্য তা সবচেয়ে যথেষ্ট মনে করা হয়। কারণ তারা একে সোনার ছুরী দ্বারা জবাই করে এবং এর ভিতর মিশরীয় লবন ভরে তাদের বাড়ীতে নিয়ে যায়। এরপর পরিমাণমত যখন সে লবনকে ডিম অথবা গোশতের সহিত ব্যবহার করে তখন এদের আশাতীত উপকার হয়।

(এর বিস্তারিত আলোচনা باب السين এর আসবে।)

কুমীর স্থলে ডিম দেয়। এর ডিম যদি পানিতে চলে যায় এবং এতে বাচ্চা হয় এ থেকে কুমীর আর যদি স্থলে জন্ম গ্রহণ করে তা এক প্রকার ছোট টিকটিকি হয়।

اسود سالخ

(১৮) কাল সাপ

اسود سالخ বিশেষ ধরনের কাল সাপকে বলা হয়ে থাকে। একে سالخ এ জন্য বলা হয় سلخ يسلخ অর্থ উঠানো। প্রতি বছরই সেই তার খোসা উঠিয়ে ফেলে। এক বচনের জন্য اسود سالخ আসে। চাই তা পুংলিঙ্গ বা স্ত্রী লিঙ্গ হউক না কেন। স্ত্রীলিঙ্গের জন্য سالخة ব্যবহৃত হয় না। এর দ্বিবচন اسودان سالخ আসে। ইমাম আসমাঈ এবং আবু যায়েদ বলেন — سالخ صفت এর ছিগাতে, দ্বিবচন ব্যবহৃত হবে না। কিন্তু ইবনে দুরীদ এর দ্বিবচন ব্যবহারের পক্ষে মত দিয়েছেন। আমাদের নিকট আসমাঈ এর মত প্রাধান্য পাবে। এর বহুবচন اساود سالخ অথবা سوالخ আসে।

কাল সাপ থেকে নিরাপদ থাকার দোয়া:

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বলেন- হুজুর (সাঃ) ভ্রমনে যাওয়ার পর সেখানে রাত হয়ে গেলে এই দোয়া পাঠ করতেন-

يـاارض ربـى وبك الله اعوذ بالله من شرك وشرما فيك وشرما خلق فيك وشر ما يدب عليك ، واعوذ بالله اسود ومن الحية والعقرب ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد (نسائى)

"হে যমীন! আমার ও তোমার রব আল্লাহ। আল্লাহর নিকট তোমার ক্ষতি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। তোমাতে যত সৃষ্ট আছে তার অনিষ্ট থেকেও আর সে অনিষ্ট থেকেও যা তোমার মধ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। সাপ বিচ্ছু থেকেও আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি, জ্বিন থেকেও ইবলিস শয়তানসমূহ থেকেও আশ্রয় প্রার্থনা করি। ساكن البلد অর্থ জ্বিন জাতি এবং والد অর্থ ইবলিস ও শয়তান সমূহ।"

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হাদীছে নবী করীম (সাঃ) নামায রত অবস্থায়ও সাপ বিচ্ছু মেরে ফেলতে আদেশ করেছেন।

ইবনে হিশাম সাপের উল্লেখ করে কবিতা আবৃত্তি করেছেন যে,

مابال عينك لاتنام كانما☆ كحلت اما قيها بسم الاسود

" তোমার চোখের কি হল যে, সে ঘুমায় না, মনে হচ্ছে তুমি চোখের

মনিতে সাপের বিষ লাগিয়েছো।"

حنقا على سبطين حلا يثربا☆ اولادهم يعقابيو ماسودد

"মদীনাবাসীদের যারা সন্তান সন্ততির প্রতি বিদ্বেষ পরায়ন তাদের উচিত হবে, তারা যেন কিয়ামত দিবসের শাস্তির অপেক্ষা করে।"

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) তার কবিতায় এভাবে বর্ণনা করেছেন।

والشاعر المنطق اسود سالخ☆ الشحر منه لعابة ومجاجه

"অধিকাংশ কবি বিষাক্ত কাল সাপ। আর কিবাতাই সে সাপের বিষাক্ত ফেনা।"

وعداوة الشعراء داء معضل☆ ولقد يهون على الكريم علاجه

"কবিদের বৈরীতা এক দুরারোগ্য ব্যধি। কিন্তু এর চিকিৎসা অভিজাত ব্যক্তিগণের জন্য অতি সহজ।"

কতিপয় বিচ্ছিন্ন ঘটনা :

আব্দুল হামিদ ইবনে মাহমুদ বলেন, একদা আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আববাসের দরবারে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় জনৈক লোক এসে বলতে লাগল যে, আমরা হজ্জাজের নিকট যাচ্ছিলাম। আমরা صـــفـــاع নামক স্থানে পৌছলে আমাদের এক সাথীর ইন্তিকাল হয়। আমরা তার জন্য একটি কবর খনন করলাম। কবরের ভিতরে দেখলাম একটি কাল সাপ সমস্ত কবরটা সে দখল করে আছে। এরপর আমরা আরো একটি কবর খনন করলাম এতেও সেই একই অবস্থায় পরিলক্ষিত হল। সেই সাপটিই আবার এল এবং সমস্ত কবরটাই তার নিজ দখলে নিয়ে নিল। আমরা তৃতীয় কবর খনন করার পর দেখলাম সে একই অবস্থা । শেষ পর্যন্ত আমরা তাকে কবরস্থ না করেই আপনার দরবারে হাজির হলাম। এখন আপনি বলুন আমরা কি করতে পারি। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বললেন এটি তার সেই আমল যা সে দুনিয়াতে থাকাবস্থায় করত। অতএব তোমরা গিয়ে একে কোন মতে গোরস্থ কর। কারণ তোমরা যদি সমগ্র যমিনটাও খনন কর তাহলে তাই পাবে।

সে লোক বলল, শেষ পর্যন্ত আমরা তাকে সাপের সাথেই কবরস্থ করে দিয়েছি। ভ্রমন থেকে প্রত্যাবর্তনের পর আমি তার স্ত্রী কাছে তার কর্মকান্ড

সম্পর্কে জানতে চাইলে সে বলল আমার স্বামী খাদ্য বিক্রি করত। প্রতিদিন রাতের বিক্রিতব্য খাদ্য থেকে কিছু কিছু রেখে দিত। যে পরিমান খাদ্য সে পারিবারিক প্রয়োজনে রেখে দিত সে পরিমান গমের ভূষি খাদ্যের সাথে মিশিয়ে দিত। আল্লাহ পাক এজনই হয়ত তাকে এ ধরনের শাস্তি দিয়েছেন।

ইমাম তিবরানী (রহঃ) তার কিতাব المعجم الاوسط এবং ইমাম বায়হাকী (রহঃ) নিজ কিতাব كتاب الدعوات الكبير তে হযরত ইকরামা (রাঃ) এর ছনদে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর বর্ণনা উল্লেখ করেন, তিনি বলেন নবী করীম (সাঃ) প্রাকৃতিক প্রয়োজনে অনেক দূরে গমন করতেন। একদা হুজুর (সাঃ) পায়ের মৌজা খুলে রেখে দিয়ে প্রয়োজনে যান। সেখান থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি (সাঃ) একটি মৌজা পরিধান করলেন। এ মুহূর্তে একটি পাখী এসে অপর মৌজাটি ছো মেরে নিয়ে গিয়ে অনেক উর্ধে উঠে ঘুরতে লাগল। এ মুহূর্তে সেই মৌজা থেকে একটি কালো রঙ্গের সাপ মাটিতে পতিত হল। নবী করিম (সাঃ) তা দেখে এরশাদ করলেন এটি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বড় অনুগ্রহ। নবী করীম (সাঃ) এই দোয়া পাঠ করলেন।

اللهم يمشى انى اعوذبك من شرمن يمشى على بطه ومن شر من يمشى على رجلين ومن شر من يمشى على اربع.

"হে আল্লাহ ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, পেটের উপর ভর করে চলে এমন সব জন্তুর ক্ষতি থেকে এবং সে সবের ক্ষতি থেকে যারা দু পায়ের উপর ভর করে চলে (মানুষ জ্বিন) এবং তার ক্ষতি সমূহ থেকে যে চারপায়ে চলে (হিংস্র প্রাণী)।"

ছদকাহ্ আপদ-বিপদ দূর করে:

সালিম ইবনে আবুল জায়াদ বর্ণনা করেন যে, হযরত সালেহ (আঃ) এর কওমে এমন এক লোক ছিল যে মানুষকে খুব কষ্ট দিত। জনগণ হযরত সালেহ (আঃ) এর নিকট তার বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে বলল যে আপনি তার জন্য বদ দোয়া করুন। হযরত সালেহ (আঃ) তাদেরকে জবাব দিলেন যাও তোমরা এ অত্যাচার থেকে নিরাপদে থাকবে। লোকটি দৈনিক লাকড়ী সংগ্রহ করত। লোকটি আজও সে ইচ্ছায় ঘর থেকে বের হল। সেদিন লোকটির সাথে দুটি পাতলা রুটি ছিল। সে একটি খেল এবং অপরটি দান করে দিল। এরপর সে

জংগলে গিয়ে লাকড়ী সংগ্রহ করে নিরাপদে বাড়ীতে প্রত্যাবর্তন করল। তার তেমন কিছু হলনা। হযরত সালেহ (আঃ) এর কাছে লোকেরা বলল সেতো লাকড়ী সংগ্রহ করে নিরাপদেই ফিরে এসছে, তার তো কিছু হয়নি। হযরত সালেহ (আঃ) আশ্চর্য হলেন এবং তাকে ডেকে এনে জিজ্ঞেস করলেন, আজ তুমি কি আমল করেছ? সে বলল আমি আজ প্রতি দিনের মত লাকড়ী সংগ্রহের জন্য বের হই এবং আমার নিকট দুটি রুটি ছিল। একটি দান করে দিই এবং অপরটি নিজে ভক্ষণ করি। হযরত সালেহ (আঃ) বললেন, চায় লাকড়ীর বোঝা খুলতো। লোকেরা সে লাকড়ীর বোঝা খুলল। দেখা গেল লাকড়ীর বোঝাতে একটি কাল সাপ বৃক্ষের ডালের মত পড়ে আছে। আর তার দাঁত একটি ডালে দাবিয়ে পড়ে আছে। হযরত সালেহ (আঃ) বললেন তোমার এ দানের কারণে আল্লাহ পাক তোমাকে রক্ষা করেছেন।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) (নবী করীম (সাঃ থেকে) বর্ণনা করেন যে, একদল লোক হযরত ঈসা (আঃ) এর কাছ দিয়ে যাচ্ছিলো - হযরত ঈসা (আঃ) আগে বেড়ে বললেন আল্লাহর ইচ্ছা হলে তাদের মধ্য হতে একজনের মৃত্যু হবে। লোকেরা তাকে অতিক্রম করে চলে গেল। তারা যখন সন্ধ্যা বেলা ফিরতে ছিল তখন তাদের সাথে লাকড়ীর বোঝা ছিল এবং এদের কেউই মৃত্যুবরণ করল না। হযরত ঈসা (আঃ) বললেন তোমরা বোঝা নামাও। যার মৃত্যু হওয়ার কথা ছিল তাকে বলল তোমার বোঝা খোল। সে বোঝা খুলতেই এর ভিতর থেকে একটি কাল সাপ বেরিয়ে এল। হযরত ঈসা (আঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন তুমি আজ কি আমল করেছ? সে লোক বলল, নাতো তেমন কোন কাজ করিনি। হযরত ঈসা (আঃ) বললেন ভাল করে চিন্তা করে দেখ কি কাজ করেছ। এবার সে বলল আমি তো তেমন কোন ভাল কাজ করিনি তবে আমার নিকট একটি রুটির টুকড়া ছিল। এক ভিখারী আমার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল এবং সে আমার নিকট কিছু চাইল আমি তখন তাকে কিছু রুটি দিলাম । হযরত ঈসা (আঃ) বললেন তোমার এই আমলের বদৌলতে আল্লাহ পাক তোমাকে রক্ষ করেছেন।

اصرمان

(১৯) কাক ও ব্যঘ্র

ইবনে সুকীত বলেন, কাক এবং মেষকে এজন্য اصرمان বলা যেহেতু

এরা মানুষ থেকে পৃথক এবং দূর থাকে। اصرمان এর প্রয়োগ রাত ও দিন এর উপরও হয়ে থাকে। কারণ এগুলো পরস্পর থেকে পৃথক এবং বিচ্ছিন্ন হয়। যেমনিভাবে কাক ও মেষের জন্য اصرمان শব্দের ব্যবহার করা হয় তেমনিভাবে রাতও দিনকে একত্রে বুঝানোর জন্য اصرمان শব্দ ব্যবহার করা হয়।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) অধিকাংশ সময় একথা বলতেন যে, এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে বলুন যে সারা জীবন কখনো নামাজ আদায় করেনি। অথচ বেহেশতে প্রবেশ করেছে। লোকেরা যদি না জানে তাহলে নবী করীম (সাঃ) কে জিজ্ঞাসা করলেই তিনি বলে দিবেন যে, সে লোকটি হল اصيرم بن عبد الاشهل। আমের ইবনে সাবিত বলেন যে, আমি মাহমুদ ইবনে লবীদ এর কাছে জিজ্ঞেস করলাম যে, তার এ ঘটনা কিভাবে? তখন তিনি বলেন যে, সে ইসলামকে অস্বীকার করত। কিন্তু যখন উহুদ যুদ্ধের সময় হল এবং হুজুর (সাঃ) উহুদ এর উদ্দেশ্যে বের হলেন তখন اصيرم এর ইসলাম সম্পর্কে পূর্ণমাত্রায় ধারণা জন্মাল। এবং সে ইসলাম গ্রহণ করে তরবারী হাতে নিয়ে জিহাদের জন্য বের হয়ে পড়লেন এবং জিহাদ করতে লাগলেন। যুদ্ধাবস্থায় এক পর্যায়ে তিনি শহাদাত বরণ করলেন। সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) তাঁর শহীদ হওয়ার ব্যাপারে নবী করীম (সাঃ) কে অবহিত করলেন। নবী করীম (সাঃ) বললেন সে জান্নাতী।

اصلة

(২০) অতি বিষাক্ত সাপ বিশেষ

اصل এর তিনটি অক্ষরেই যবর। এর বহুবচন اصل হয়। ইবনে আম্বারী লিখেন, এটি একটি ক্ষুদ্র শরীর এবং বড় মাথা বিশিষ্ট সাপ। এই সাপের বৈশিষ্ট হল ঘোড় সওয়ারকে লাফ দংশন করে এবং হত্য করে। কেউ কেউ বলেন এটি একটি অতিমাত্রায় ক্ষতিকারক সাপ। তার একটি মাত্র পা হয়ে থাকে। সে পা দ্বারা সে দাড়ায়, ঘোরে এবং লম্ফ দেয়।

ইমাম আসমায়ীর কবিতা :

يارب ان كان يزيد قد اكل ☆ لحم الصديق عللا بعد نهل

"হে পরওয়ারদেগার যদি ইয়াযিদ বন্ধুর গোশত খুব হালি ঠাট্টা করে খায়"

فاقدر له اصلة من الصل ☆ كيساء كاقرصية او خف جمل

"তবে তার উপর বিষধর সাপের মধ্য থেকে কোন এক বিষধর সাপকে লেলিয়ে দিন যা হাতী অথবা উটের দলিত মথিত হওয়ার মত তার উপর ঝাপিয়ে পড়ে এবং তাকে পিষে দেয়।"

জাহিজ (রহঃ) আরবদের কথা বর্ণনা করেন, মরুচারীরা বলেন যে সাপ যেখানে যায় সেখানেই তার বিষ ঢালে। এমন বুঝায় যে, তার এভাবে দংশন করা এবং প্রত্যেক বস্তু মুলোচ্ছেদ করার কারণে এর নাম হয়েছে اصلع।

দজ্জাল চিহ্নিত করা:

হাদীস শরীফে দাজ্জালকে চিহ্নিত করার বর্ণনা এভাবে এসেছে, তার মাথা সাপের (اصلع) মত হবে। কেউ কেউ বলেন সে সাপের চেহারা মানুষের চেহারার মতই যথেষ্ট বড় হবে। কিছু লোকে অবশ্য বলেছেন তার চেহারা এরকম তখনই হবে যখন তার বয়স ১০০০ হাজর বছর হবে। সে সাপের একটি বৈশিষ্ট হল যদি কোন মানুষকে দেখেই ফেলে তাহলে সে মানুষটিকে না মেরে সে ক্ষান্ত হয়না।

اطلس

(২১) কাল রং এর নেকড়ে

এটি কাল ছাই রঙ্গের এক প্রকার নেকড়ে। এ ধরনের রং বিশিষ্ট সব প্রাণীকে اطلس বলে। কামিয়াত কর্তৃক মুহাম্মদ বিন সুলায়মান হাশেমীর প্রশংসায় রচিত কবিতায় اطلس এর উল্লেখ করেছেন:

تلقى الامان على حياض محمد ☆ ثو لا محزقة وذئب اطلس

"মুহাম্মদ এর দরবারে রক্ষিত মৌমাছি এবং কাল ছাই রঙ্গের নেকড়ে পর্যন্ত আশ্রয় চায়।"

لاذى تخاف ولا لهذا اجرأة☆ تهدى الرعية ما ستقام الريس

"তা এমন আশ্রয় যেখানে জনগণ ভীত সন্ত্রস্ত হয় কিন্তু তার বীরত্ব নেই। যখন আমীরও অপারগতা প্রকাশ করল সে প্রজার পথ নির্দেশক নেতৃত্ব গ্রহণ করল।" জাওহারী (রহঃ) এই কবিতা থেকে প্রমাণ দিলেন যে, সম্প্রদায়ের নেতাদের জন্য যেভাবে قيم শব্দ ব্যবহার করেন এমনিভাবে رئيس শব্দও ব্যবহার করা হয়।

اطوم

(২২) সামুদ্রিক কচ্ছপ

اطوم – انـوق এর ওজনে আসে। اطوم সামুদ্রিক কচ্ছপকে বলা হয়। আল্লামা জাওহারী (রহঃ) বলেন এটি সামুদ্রিক কচ্ছপ। কারো কারো মতে একে পুরো চামড়ার মাছ বলেছেন। উটের চামড়ার মত যার চামড়া হয়ে থাকে। এ চামড়া দ্বারা উট চালকের জন্য মৌজা তৈরী করা হয়। কেউ কেউ একে জিরাপ বলেছেন এবং কেউ কেউ একে গাভী বলেছেন। ইবনে সাইদাহ (রহঃ) বলেন একে اطـــوم এজন্য বলা হয় যে, এটি মাছের সাদৃশ্যই হয়ে থাকে যখন এর চামড়া পুরো এবং শক্ত হয়।

اطيش

(২৩) পাখী বিশেষ

ইবনে সাইদাহ বলেন اطيـش একটি পাখী। اطيـش এর আভিধানিক অর্থ হল হালকা বুদ্ধা এবং বোকা। ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)ও এর অর্থ তাই বলেছেন। তিনি বলেন ما رأيت افقه من اشهبا لو لا طيش فيه

"যদি আশহুব এর মধ্যে হালকা জ্ঞান ও বোকামী না হত তাহলে তার মত বড় ফকীহ আমি আর দেখতাম না।"

আশহুবের পরিচয়?

তিনি আশহুব ইবনে আব্দুল আজিজ ইবনে দাউদ। তিনি মিশরের অধিবাসী মালেকী মাজহাবের একজন বড় ফকীহ। তার জন্ম তারিখ সম্পর্কে বলা হয়, যে বছর হযরত ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) জন্ম গ্রহণ করেন সে বছর তিনিও জন্ম গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ উভয়ের জন্ম ১৫০ হিজরী সনে। ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) এর ১৮ দিন পর তিনি ইন্তেকাল করেন।

ইবনে আব্দুল হাকিম বলেন আমি নিজেই শুনেছি যে, মশহুব ইমাম শাফেয়ীর (রহঃ) মৃত্যুর জন্য বিভিন্নভাবে দোয়া করেছে। ইমাম শাফেয়ীর নিকট যখন তার ব্যাপারে আলোচনা হত তখন তিনি বলতেন:

تمنى رجال ان اموات وان امت☆ فتلك سبيل لست فيها باوحد

"মানুষ আমার মৃত্যু কামনা করে এবং আমি যদি মৃত্যু বরণ করি তাহলে

মৃত্যু এমন একটি পন্থা যা থেকে আমি ব্যতিক্রম নই বরং প্রত্যেককেই এই পথের যাত্রী হতে হবে।"

فقل الذى يبغى خلاف الذى مضى ☆ تهيأ الاخر مثلها فكانقد

"তুমি তাকে বলে দাও যে, অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে (অর্থাৎ যা ভাগ্যে লিখা আছে এবং যা কোন অবস্থাতেই পরিবর্তন হওয়ার নয়।) বিপরীতপন্থা অন্বেষণ করছে যে, সে মৃত্যু যেভাবে হউক এবং বিপদাগমন তৈরী করে। কারণ মৃত্যুতো একটি আদিষ্ট ব্যাপার।" (সে তো এসেই গেছে)

শাইখ ইবনে হাকীম (রহঃ) বলেন, ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) এর ইন্তিকাল হওয়ার পর আশহুর তার (শাফেয়ী) পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে একটি গোলাম ক্রয় করে নেয়। ইমাম আশহুর (রহঃ) এর ইন্তেকালের ১ মাস পর আমিও তার পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে একটি গোলাম ক্রয় করে নিলাম।

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ):

শাইখ ইবনে আব্দুল হাকিম বলেন, ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) যখন মায়ের গর্ভে জন্ম নিলেন তখন তার মা স্বপ্ন দেখেন যে, মোশতারী তারকা তার রেখা থেকে বের হয়ে মিশরে গিয়ে ফেটে পড়ে। সে শহরে এবং প্রত্যেক রাজ্যে ভেঙ্গে হয়ে পড়ে গেল। স্বপ্ন শুনে উলমায়ে কেরাম এই ব্যাখ্যা প্রদান করেন যে, সে মহিলা এমন একজন আলেমের জন্ম দেবেন যার বিদ্যায় সমগ্র মিশরবাসী উপকৃত হবে। এর পর সমগ্র রাজ্যের লোকেরা তার থেকে উপকৃত হবে। সমস্ত উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে ঐক্যমত যে, ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) সংযমী, খোদাভীরু, আমানতদারী ও সততা ইত্যাদিতে নির্ভরযোগ্য ও আস্থাশীল ব্যক্তিত্ব। উসূলে ফিকাহ সম্পর্কে যে সকল উলামায়ে কেরামের কথা আসে ইমাম শাফেয়ী এদের মধ্যে অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব। শরয়ী মাসআলা ইজতিহাদ করতে আরম্ভ করলেন। তার অবস্থা ছিল এ রকম যে, কোন ব্যক্তি যদি তার সামনে তাজা খেজুর প্রদর্শন করতেন তাহলে তিনি বলতেন যে, ভাই আপনি কতইনা উত্তম সুন্দর কাজ করলেন। কিন্তু দ্বীনি ইলমের সম্পদ আপনার এ সম্পদের চেয়ে অধিক বেশী প্রিয়। তা বলে তিনি আর খেজুর খেতেন না।

একদা ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) একটি দাসী ক্রয় করলেন। রাতে তিনি লেখা পড়ার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। দাসী তার সাক্ষাৎ পাবার আশায় দাঁড়িয়ে

অপেক্ষা করতে লাগল। কিন্তু এদিকে তার কোন মনোযোগ নেই। একদিন দাসী তাকে বিক্রেতার নিকট গিয়ে অভিযোগ করল যে, তুমি আমাকে এক পাগলের হাতে বিক্রি করে জেলের কষ্টে ফেলে দিয়েছ। দাসীর এই অভিযোগের খবর যখন ইমাম শাফেয়ী অবগত হলেন তখন তিনি বললেন যে, ভাই পাগল তো সে ব্যক্তিই হয় যে ব্যক্তি বিদ্যার সম্মান ও বড়ত্ব অনুভভ করে না। একে ধ্বংস করে এর পর আরাম আয়েশে কাজ করে বিদ্যা থেকে হাত গুটিয়ে নেয়।

তিনি ছিলেন একজন ভদ্র, সাহসী, সম্মানী এবং দানশীল ব্যক্তি। তার উপর কোন মানুষের কোন বস্তুরই দাবী ছিল না। তিনি ধন সম্পদ গুদামজাত করতেন না। তার গুনাবলী ছিল অসংখ্য। কিন্তু তিনি নিজের জন্য যথেষ্ট মনে করতেন। ১৫০ হিজরী সনে তিনি গাজা নামক স্থান জন্ম গ্রহণ করেন। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) যেদিন পরলোক গমন করেন সেদিন ইমাম আবু হানিফা জন্মগ্রহণ করেন।

কারো কারো মতে ইমাম শাফেয়ী (রঃ) আসকালানে অথবা ইয়ামনে জন্মগ্রহণ করেন। ঐতিহাসিক ইবনে খাল্লেকান বলেন যে, বিশুদ্ধ কথা হল ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) আসকালানে জন্ম গ্রহণ করেন। এর পর তিনি গাজা থেকে মক্কা শরীফ ছয় বছর বয়সে প্রত্যাবর্তন করেন। এভাবে তিনি ১৯১ হিজরী সনে মিশর চলে যান। কিন্তু কারো তিনি ২০১ হিজরী সনে মিশর গমন করেন।

প্রসিদ্ধ কথা হল তিনি মিশরের "কেরাফাহ" নামক স্থানে জীবন অতিবাহিত করেন, ৫৪ বয়সে ইন্তেকাল করেন।

الاغثر

(২৪) জলজ পাখী

ইবনে সাইদাহ বলেন الاغثر এক ধরনের জলজ পাখী যার ঘাড় লম্বা এবং শরীরে খুব বেশী পালক হয়ে থকে।

الافال والافائل

(২৫) উটে বাচ্চা

افائل افال উটের ছোট ছোট বাচ্চাকে বলা হয়। যাকে بنت محاض (উটের এক বছরের বাচ্চা) বলে। এর নর বাচ্চার জন্য افيل এবং মাদী বাচ্চার

জন্য افيلة ব্যবহৃত হয়।

الافعى
(২৬) সর্প

মাদী সাপকে الافعى এবং নর সাপকে افعوان বলা হয়। হামজা ও আইনে পেশ । ইমাম যুবাইদী (রহঃ) বলেন সাদা কালো ডোরা কাটা সাপকে افعى বলে। যার মুখ বড় এবং ঘাড় ছোট হয়। কিন্তু এদের মধ্যে কোন কোনটি দুশিং বিশিষ্টও হয়। এদের উপনাম ابوحيان –او يحى এই সাপগুলো ১০০০বছর জীবিত থাকে। এ ধরনের সাপ অত্যন্ত সাহসী এবং কাল রঙ্গের হয়ে থাকে। মানুষকে তারা লাফ দিয়ে আক্রমন করে। এ সাপগুলো অন্যান্য সাপ থেকে ভয়ংকর ক্ষতিকারক। সিজিস্তানের সাপ এসাপগুলোর মতই ক্ষতিকারক।

একটি বিস্ময়কর ঘটনা:

ইবনে শোবরামাহ (রঃ) সাপ সম্পর্কে একটি বিস্ময়কর ঘটনা বর্ণনা করেছেন। একদা একটি সাপ এক নাবালেগা বালিকার পায়ে ছোবল মারে। বিষের তীব্রতায় তার কপাল ফেটে যায়।

আরেকটি ঘটনা: শবীব ইবনে শোবাহ খলীফা মানছুরের দরবারে উপস্থিত হলো। খলীফা শবীবকে উদ্দেশ্য করে বললেন হে শবীব, তুমি কি কখনো সিজিস্তান গিয়েছ? আমার ধারনা যে সেখানে অনেক সাপ রয়েছে। শবীব বলল, হ্যাঁ, আমি সিজিস্তান গিয়েছি। এবার খলীফা বললেন, তাহলে সেখানকার সাপ সম্পর্কে কিছু বলো। শবীব বলল, সিজিস্তানের সাপের বৈশিষ্ট হল এদের ঘাড় হালকা পাতলা এবং লেজ ছোট, মুখ বড়, রং মেটে আকর্ষণীয় কাল রং সাদা সাদা দাগ বিশিষ্ট হয়। যে কারণে এদের তিল চিহ্ন পড়ে গেছে। বড় সাপগুলো মৃত্যু পর্যন্ত পৌছে আর ছোট ধরনের সাপগুলো তরবারীর মত বিনাশক।

বৈশিষ্ট:

ইমাম কাযভিনী (রহঃ) বলেন افعى ছোট লেজ বিশিষ্ট ভয়ংকর ও অসভ্য প্রকৃতির সাপ। এ সাপের বৈশিষ্ট হল এর চোখ দৃষ্টিহীন হয়ে যায়, তবে কিছু দিন পরই পূণরায় তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসে। এর চোখ সব সময়ই খোলা থাকে। শীত এলেই এ সাপ ৪ মাসের জন্য মাটির নীচে লুকিয়ে যায়। বের হলে একে

দেখা যায়না। গুয়ামুড়ি গাছ খোজ করে এতে তার চোখকে ঘষামাজা করে। এতে করে এর চোখ দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন হয়ে।

আল্লামা যমখশরী (রহঃ) বলেন افعى এর ব্যাপারে প্রসিদ্ধি আছে যে, এরা ১০০০ বছর বয়সে পদার্পন করার পর দৃষ্টিহীন হয়ে পড়ে। আল্লাহ পাক তার অন্তরে একথার উদ্রেক করেন যে, নিজের চোখকে গোয়ামুড়ির ভিজা পাতা দ্বারা ঘষে নাও। সে যখন এ পাতা দ্বারা চোখ ঘষে তখন তার চোখে আলো সৃষ্টি হয়। কোন কোন সময় এমনও হয় যে, এ সাপ এত দূরের জংগলে চলে যায় যে সেখান থেকে গ্রাম পর্যন্ত পৌছতে তিন দিনের দূরত্ব অতিক্রম করতে হয়। তবে সাপটি যখন অন্ধ হয়ে যায় তখনই কেবল এত দূর চলে যায়। এর কারণ হল- এত দীর্ঘ ভ্রমনে কোথাও হয়ত কোন বাগানে গোয়া মুড়ি গাছের সহিত ঘষা লেগেও যেতে পারে। সুতরাং সে ঐ গাছে তার চোখ ঘষতে থাকে। এতে করে তার দৃষ্টি শক্তি ফিরে আসে। এই সাপের আরো বৈশিষ্ট হল এর লেজ কেটে পড়ে যায়। আবার নতুন করে গজায়। যখন এর চোয়ালের বিষ দাত পড়ে যায় তখন আবার তিন দিন পরই গজিয়ে উঠে। এই সাপের ব্যাপারে বড় চমৎকার কথা বলো এ ধরনের সাপকে কেটে টুকড়া টুকড়া করে দিলেও তিন দিন পর্যন্ত নড়াচড়া করতে থাকে। এই সাপ মানুষের ভয়ংকর শত্রু। কিন্তু জংগলী গাভী এ সাপ ভক্ষণ করে হজম করে ফেলে।

একটি ঘটনা বিশেষ। এক উটনী নিজ বাচ্চাকে দুধ পান করাচ্ছিল। এ মুহুর্তে এ ধরনের সাপ এসে উটনীর ঠোঁটে ছোবল বসাল। দেখা গেল উটনীর পূর্বেই তার বাচ্চার মৃত্যু হল। এই সাপের অসুস্থতায় যাইতুনের পাতা খেয়ে সুস্থ হয়। এদের মধ্যে কোন কোন সাপ পরস্পরে মুখ মিলিয়ে সঙ্গ করে। কখনো কখনো এমন হয় যে, যখন পুরুষ সাপ নারী সাপের সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হয় তখন অজ্ঞান হয়ে যায়। আবার কোন কোন সময় এমন হয় যে, নারী সাপ পুরুষ সাপের যৌনাঙ্গে ছোবল মারে। তখন পুরুষ সাপটি মরে যায়। ইমাম জাওহারী (রহঃ) বলে كشيش الافعى সে আওয়াজকে বলে যা সাপের চামড়া থেকে বের হয়, মুখ থেকে নয়। কবি বলেছেন:

كان صوت شخبها المفرفض ☆ كشيش افعى ارمعت لعض

فهى تح بعضها ببعض

"তার ফোটা ফোটা রক্তের আওয়াজ এমন যেমন কাল নাগের আওয়াজ হয়। সে যখন ছোবল মারতে যায় তখন সে নিজের এক অংশ দ্বারা অপর অংশে ঘর্ষণ করে।"

আরেকটি ঘটনা:

শাইখ আবুল হাসান আলী ইবনে মুহাম্মদ আল মাজিনুচ্ছাগীর আসসোফী বলেন, একদা আমি তবুকের কোন এক গ্রামে গিয়েছিলাম। আমার খুব পিপাসা হলে আমি একটি কূপের নিকট এলাম। হঠাৎ আমার পা ফসকে গেল। আমি কূপে পড়ে গেলাম। দেখতে পেলাম কূপের একটি নির্দিষ্ট স্থানে সুন্দর মনোরম জায়গা। আমি স্থানটি পরিষ্কার করে সেখানে বসে গেলাম। এমন সময় আমি ঝন ঝন আওয়াজ শুনতে পেলাম। এতে আমি সাবধানতা অবলম্বন করলাম। দেখতে পেলাম একটি কাল রঙ্গের সাপ আমার উপর পড়ে গিয়ে এদিক ওদিক ঘুরতে লাগল। আমি নিরব বসে থাকলাম। এমন সময় সে তার লেজে পেঁচিয়ে আমাকে কূপ থেকে বের করে দিল। এরপর সে লেজ গুটিয়ে চলে গেল।

জাফর খুলদী বলেন, একদিন আমি আবুল হাসান আলমুযীনের কাছে কিছু পাওয়ার আকাংখা নিয়ে গেলাম। তার নিকট আরজ করলাম জনাব আমাকে কিছু সৎ উপদেশ দিন। তিনি বলেন তোমার নিকট থেকে যদি কোন বস্তু হারিয়ে যায় বা বিলুপ্ত হয়ে যায় এমনিভাবে যদি তুমি এ কামনা করে যে, আল্লাহ তাআলা তোমার সাক্ষাৎকার কারো সহিত করাবেন তাহলে তুমি এ দোয়া পড়ঃ

ياجامع الناس يوم لاريب فيه ان الله لايخلف الميعاد اجمع بينى وبين كذا

এর বদৌলতে আল্লাহ্ পাক তোমাকে সাক্ষাৎ করিয়ে দিবেন অথবা সে বস্তু তুমি পেয়ে যাবে। জাফর খুলদী বলেন আমার অভিজ্ঞতা হল এই যে, যে কেউ এই দোয়া পড়ে কিছু চেয়েছে, দোয়া কবুল হয়েছে। শাইখ আবুল হাসা (রহঃ) ৩৮২ হিঃ তে মক্কা মুকাররামায় ইন্তিকাল করেন।

الحارية নামে এক ধরনের সাপ افعى সাপেরই এক প্রকার।

মহিলা কবি নাবেগা যুবইয়ানীর কবিতায় আছে:

الحارية قد صغرت من الكبير☆ مهزؤة الشدقين حولا النظر

"হারিয়া সাপ ছোট বড় হয়ে থাকে। তার উভয় চোঁয়াল খোলা যা

দর্শককে অন্ধ করে দেয়।”

দৃষ্টান্ত ও প্রবাদ :

আরবগণ افعى সাপকেও দৃষ্টান্ত স্বরূপ ব্যবহার করে থাকেন। বলা হয়ে থাকে هو اظلم من افعى সে আফআ সাপ থেকেও অধিক জুলুম করল।

وانت كالافعى اللعى لاتحتفر☆ ثم تحجى مبادرا فتحتجر

“তুমি কাল সাপের মত (জালেম) সে কখনো (গর্ত) খুঁড়েনা। আবার সে তঠাৎ করে যে কোন গর্তে প্রবেশ করে।

অতএব যে গর্তকে সাপ তার ঘর বানাতে চায় সে গর্তের প্রাণী অন্য কোথাও গর্ত করে এবং এই গর্ত সাপের জন্য ছেড়ে দিয়ে চলে যায়।”

(২) আরবগণ এও বলেন যে,

تحككت الحقوب بالافعى

“শিক্তরা আফআ সাপকে সাজা দিতে তৈরী হয়ে গেছে।” এই দৃষ্টান্ত তখনই ব্যবহার করে যখন নিজের চেয়ে অধিক শক্তিশালী ব্যক্তির সাথে মোকাবেলা অথবা কথাবার্ত বলে।

(৩) আরো বলা হয় যে,

رماه الله تعالى بافعى حارية

“আল্লাহতাআলা সে افعى حارية সাপের মাধ্যমে ধ্বংস করে দেবেন।” বদ দোয়াটি তখনই করা হয় যখন কোন বিষয়বস্তু উদঘাটন করা হয়। আল্লা পাক অমুকের উপর ভয়ানক দুশমনকে বিজয়ী করবেন (তাড়াতাড়ি ধ্বংস হবার বদ দোয়া এই জন্য افعى حارية সে সাপ যা দংশনে যখন তখন মানুষ মৃত্যু বরণ করে।

(৪) এমনও বলেন যে : من لسعته افعى من جر الحبل يخان

“যখন আফআ সাপ ছোবল দেয় তখন তার অবস্থা এমন হয় যে, সে রশি কাটতে ভয় করে।” একথা তখন বলা হয় যখন মানুষের কোন কঠিন বিপদ আসে, তখন আর তার কোন জিনিসের জ্ঞান-বুদ্ধি থাকে না। এই অর্থে শাইখ সালেহ ইবনে আব্দুল কুদ্দুস (রহঃ) কবিতা পাঠ করেন:

المر يجمع والزمان يفرق☆ ويظل يرقع والخطوب تمزق

"মানুষ একত্র করে আর সময় একে ছিনিয়ে নেয়। মানুষ গড়ে আর ভাগ্য দিন ও রাতকে টুকড়া টুকড়া করে দেয়।"

ولا يحادى عاقلا خير له☆ من ان يكون له صديق احمق

"যদি কেউ বুদ্ধিমান মানুষের সাথে দুশমনী রাখে তাহলে ইহা তার জন্য ভাল হবে যে, তার কোন নির্বোধ বন্ধু হওয়া।"

فار بانفسك ان تصادقا احمقا☆ ان الصديق على الصديق مصدق

"যদি কেহ বুদ্ধিমানের সহিত বৈরীতা রাখে তাহলে তা তার জন্য ভাল হবে বন্ধু বন্ধুর স্বীকৃতি দেয়।"

وزن الكلام اذا انطقت فانما☆ من ينشتشار اذا استشير فيطرق

"মানুষের চরিত্র যখন ভাল হয় তখন তার নিকট থেকে পরামর্শ গ্রহণকারীও রাস্তা পেয়ে যায়।"

حتى يحل بك واد قلبه☆ فيرى ويعرف مايقول فينطق

"শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক উপত্যকাতেই তার অন্তর নেমে যায় তখন সে খুব চিন্তা ফিকির করে কথা বলে।"

لا الطينك ثاويا فى غزبة☆ ان الغويب بكل سهم يرشق

"বিদেশে থাকার কারণে আমি তোমাকে ভালবাসি না আর ভিনদেশী লোকেরা তীর সোজা লক্ষ্যে লাগে।"

ماالناس الاعاملان فعامل☆ قد مانت من عطش وآخر يغرق

"মানুষ সাধারণত দুপ্রকার আমল করে থাকে, এ জন্য তুমিও আমল কর যে দুনিয়াকে চাইল তো মরে গেল হয়ত সে ধনী হয়ে গেল।"

والناس فى طلب المعاش وانما☆ بالجدير زق منهم من يرزق

"মানুষ পার্থিব অর্জনে এবং রিজিক অন্বেষণকারীকে কঠোর প্ররিশ্রমের মাধ্যমেই রিযিক দেয়া হয়"

لم يرزقون الناس حسب عقولهم☆ الفيت اكثر من ترى يتصدق

"মানুষকে তার জ্ঞানানুপাতে রিযিক দেয়া হয়ে থাকে তো তুমি অধিকাংশ লোককে এমন দেখবে সে সদকা দিচ্ছে।"

لكنه فضل العليك عليهم☆ هذا عليه مرسع ومضيق

"কিন্তু তাদের উপর আল্লাহ পাকের ইহা বড় করুণা। যে রিযিক ওদের উপর সংকোচিত করে রেখেছেন এবং প্রশস্ততা ও করে রেখেছেন।"

واذا الجنازة والعروس تلاقيا☆ ورأيت مع نوائح يترقوق

"আর যাকে কোন সময় কাল সাপ ছোবল দিয়েছে সে যেন টানা রশি।"

سكته الذى تبع العروس مبهتا☆ ورأيت من تبع الجنازة ينطق

"বর ও নব বধুর পেছনে যে চলে সে ক্লান্ত হয়ে চুপ হয়ে গেল- আর তুমি দেখবে যে ব্যক্তি জানাযার পেছনে গিয়ে ছিল সে কথা বলছে।"

واذا مرو لسعته افعى مره☆ تركته حين يجر حبل يفرق

"যাকে একবার কোন সময় কাল সাপ ছোবল দিয়েছে সে তো টানা রশি ছেড়ে পৃথক হয়ে যায়।"

بقى الذين اذا يقولوا يكذبوا☆ ومضى الذين اذا يقولوا يصدقوا

"যখন সে কথা বলে তখন মিথ্যা বলে এমন মানুষ জীবিত আছে আর সে লোক অতীত হয়ে গিয়েছে যে সত্য কথা বলত।"

শাইখ সালেহ আব্দুল কুদ্দুস (রহঃ) এর আরো কিছু চিত্তাকর্ষক কবিতা:

ما يبلغ الا حداء من جاهل☆ ما يبلغ الجاهل من نفسه

"কোন মুর্খ লোক শত্রুকে যত না ক্ষতি করতে পারে তার চেয়ে বেশী সে নিজের ক্ষতি করে। (মূর্খতা বশতঃ)"

والشيخ لايترك اخلاقه☆ حتى يوارى فى نرى رمسه

"বৃদ্ধ লোক তার স্বভাব পরিবর্তন করতে পারে না, যতক্ষণ সে নিজের কবরের ভিজা মাটির মধ্যে না যায়।"

واذا ارعوى عاد الى جهله☆ كذى الصننى عاد الى نكسه

"যখন সে বিরত থাকে তখন সে মূর্খতার দিকে ফিরে যায় এমনিভাবে কৃপণ লোক তার অসুস্থতার দিকে প্রত্যাবর্তন করে।"

وان من ادبته فى الصباء☆ كالعود يسقى الماء فى غرسه

"যদি কেউ তাকে বাল্য কালে শিক্ষা দেয়। যেমন কাঠ (গাছ) লাগানোর

সময় পানি দ্বারাই সিঞ্চন করে।”

حتى تراه فى مورتانا ضرا☆ بعد ذلذى ابصرت من يبه

“শেষে তুমি একে পাতা বিশিষ্ট সবুজ দেখবে । অথচ তুমি একে শুস্ক দেখছ।”

শেখ সালেহ এর হত্যাঘটনা:

والشيخ لايترك اخلاقه এই কবিতা এবং এর পর والاشعرية এ দুটি কবিতাই আব্দুলকুদ্দুস এর হত্যার মূল কারণ হয়ে দাড়ায়। ঘটনা হল, খলিফা মাহদী সালেহ ইবনে আব্দুল কুদ্দুস এর উপর নাস্তিকতার অভিযোগ আনয়ন করেছিলেন। হযরত সালেহ এর নামে যখন গ্রেফতারী পরওয়ানা জারী করা হল যে, তাকে হাজির হতে হবে। তখন তিনি নিজেই খলিফার দরবারে হাজির হয়ে নিজের বক্তব্য পেশ করলেন। খলিফা তখন তাকে অভিযোগ থেকে নিস্কৃতি দিয়ে দিলেন। এরপর তাকে গভর্ণর হওয়ার জন্য প্রস্তাব করেন। কিন্তু তিনি সে পদ নিতে অস্বীকার করলেন। খলিফা তাকে জিজ্ঞেস করলেন প্রাথমিক এদুটি কবিতা الشيخ لا يترك اخلاقه কি আপনার নয়? জবাবে তিনি বললেন অবশ্যই আমার কবিতা হে আমিরুল মুমিনীন। খলীফা বললেন আপনি আপনার অভ্যাস পরিবর্তন করবেন না? একথা বলে খলীফা তাকে হত্যার নির্দেশ করলেন। অতঃপর তাকে শুলিতে চড়িয়ে হত্যা করা হয়। এই ঘটনাটি ঘটেছিল ১৯৭ হিজরী।

নিম্নবর্ণিত ভাল কবিতাগুলোও সালেহ বিন আব্দুল কুদ্দুস (রহঃ) এর:

اذا لم لا تستطعشيئا ندعه☆ وجازه الى ما تستطيع

“কোন কাজ করার ক্ষমতা যখন তুমি রাখনা তখন একে ছেড়ে দাও এবং তুমি সামনে বাড় সে বস্তুর দিকে যা তোমার ক্ষমতা ও মুঠোয় এসে যায়।”

ومن لم يقف عند النتهاء قدره☆ تقاصون عنه فسيحان اتحخطا

“যে ব্যক্তির শক্তি সামর্থ শেষ হয়ে যাবার সময় ক্ষান্ত হয়না তাহলে তার থেকে উদ্দিপনা কমে যায়।”

সালেহ বিন আব্দুল কুদ্দুস:

সালেহ বিন আব্দুল কুদ্দুস (রহঃ) একজন দার্শনিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

খলীফা মাহদী তাকে নাস্তিকতার অভিযোগে হত্যা করেন। তিনি বসরা শহরে ওয়াজ নসীহত করতেন। তার থেকে খুব কম হাদীসই বর্ণিত আছে। তাও আবার নির্ভরযোগ্য নয়। কেউ কেউ বলেন যে, কোন ব্যক্তি তাকে স্বপ্নে দেখেন যে, তিনি বলেন আমাকে আমার আল্লাহর সামনে হাজির করা হয়েছে। তার কাছে আমার কোন জিনিসই অদৃশ্য নয়। আল্লাহ্ পাক আমার উপর দয়া করেছেন। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করলেন- তোমার উপর যে বস্তুর অভিযোগ আনা হয়েছে তা মিথ্যা ও বানোয়াট। কোন কোন কবি প্রদীপ ও মোম এর প্রশংসায় উপমা দিয়ে বলেন:

وقنديل كان الضوء منه ☆ محيا من هويت اذا تجلى

"প্রদীপ জ্বললে এমন মনে হয় যেমন তোমার প্রেমিক যেন ঠাট্টা করছে।"

اشار الى الدجى بلسان افعى ☆ نفى ذيله فرقادولى

"সে কাল সাপের মুখের মত তাড়াতাড়ি করে। যে সামান্য পরেই লেজ গুটিয়ে ভেগে দাঁড়িয়ে যায়।"

افعوان

(২৭) পুরুষ সাপ

যে প্রকারের সাপের বির্ণনা পূর্বে করা হয়েছে افـــعـــوان সেই প্রকারের পুরুষ সাপকে বলে। এই সাপও অধিক কাল রং এর হয়ে থাকে এবং অত্যন্ত সাহসী। লম্ফ দিয়ে এ সাপ ও মানুষকে আক্রমন করে। তার উপাধিও ابوحيان এ يـــحـــى সেও প্রায় এক হাজার বছর জীবিত থাকে। আরববাসীর নিম্নবর্ণিত কবিতা স্ববিষয়ে কতই না সুন্দর:

صرمت حيالك بعد وملك زينب ☆ والدهر فيه يغير وتقلب

"হে যয়নব! তুমি সাক্ষাতের পর ভালবাসাকে বিচ্ছিন্ন করে দিলে। আর যুগ এর মধ্যে প্রায়াই সংশোধন এবং পরিবর্তন আনয়ন করছে"

واستنفرت لما راتك وطالما ☆ كانت تحن الى لقا ك وترغب

"আর সে প্রেমস্পদ যখনই তোমাকে দেখে তখনই সে পালাতে থাকে। এ ছাড়া ইতিপূর্বে সে তোমার সাথে মিলনের আকাংখা এবং ইচ্ছা করত।"

وكذلك وصل الغانيات فانه ☆ بيلقعه وبرق خلب

"এমনিভাবে গায়করা এসে গেছে সে শূন্য মাঠে অলসতা দেখাচ্ছে এবং বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে।"

فدع الصباع فلقد عداك زمانه☆ وازهد فعمرك مر منه الاطيب

"তুমি এখন বাল্যকালকে ছেড়ে দিয়ে যুগকে তোমার শত্রু করে নিলে? আর দুনিয়ার দিকে ভ্রুক্ষেপ করো না কেন না তোমার মূল বয়স চলে গেছে।"

ذهب الشباب فما له من عودة☆ واتى الشيب فان منه المهرب

"যৌবন তো চলে গিয়েছে তা আর দ্বিতীয়বার আসবে না। আর এসে গেছে বার্ধক্য এর থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না।"

دع عنك ماقد كان فى زمن الصبا☆ اذكر ذنوبك وابكها يامذنب

"যা ছিল বাল্যাকলের মনগড়া কথা তা এখন ছেড়ে দাও । হে পাপী পাপকে স্মরণ করে কাঁদো।"

واذكر مناقشاة الحساب فانه ☆ لابد يحصى ما جنيت ويكتب

"হিসাব কিতাবের লেনদেনকে ভূলে যেওনা। এজন্য তুমি যে পাপ করেছো সে সবকে দৈনিক হিসাবের খাতায় লিখে রাখ।"

لم ينسه المدكان حين نسيته☆ بل اثبتاه وانت لاه تلعب

"তুমি যদিও ভুলে যাও কেরামন কাতেবীন ভূলে নাই। বরং তারা কলম চালাচ্ছে আর তুমি সংকোচহীন এবং খেলায় মেতে আছ।"

والروح فيك وديعة اورعتها☆ ستودعا بالرغم منك وتسلب

"তোমার ভিতরে প্রাণ রেখে দেয়া হয়েছে। তাকে অচিরেই তোমার নিকট থেকে জোর করে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে।"

وغوروردينك اللتى تسعى لها☆ دار حقيقتها متا يذهب

"তোমার দুনিয়াদারী যে কারণে তুমি সম্মানী ইহা ধোকা মাত্র। ইহা একটি ঘরের মতই। যার মূল কথা আগমন প্রস্থান মালের চেয়ে বেশী কিছু নয়।"

والليل فاعلم والنهار كلاهما☆ انفاسنا فيها تعدو تحسب

"স্মরণ রেখো, রাত দিন আমরা যে শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করি তা কিন্তু গণনা করা হয়।"

وجميع ماخلقه وجسمصته☆ حقا يقيمنا بعد موتك ينهب

"আর যে সমস্ত বস্তু তুমি একত্র করেছ আর যা ত্যাগ করেছ বিশ্বাস কর মৃত্যুর পর তুমি তা চিনতে পারবে।"

تبا لدار لايدوم نعيمها☆ وشيرها عما قليل يغوب

"সে ঘর ধ্বংস হয়ে যাবে যার ন্যায় সব সময় থাকবে না। চিত্তাকর্ষক অট্টালিকা অচিরেই শেষ হয়ে যাবে।"

فاسمع هديت نصبحته اولا كها☆ برنصوح للانام هامجرب

"আমি তোমাদেরকে যে উপদেশ দিচ্ছি তা শ্রবণ কর। তোমরা তো উপদেশের চেয়েও আরো বেশী কিছুর মুখাপেক্ষী। এটি সৃষ্টির জন্য মঙ্গল এবং পরীক্ষিত ব্যবস্থাপত্র।"

صحب الزمان اهله مستبصرا☆ ورای الامور بما تؤب وتعقب

"যুগ তো সাথেই আছে আর যুগ দর্শক দেখেছেন মানুষ এই বিস্ময়তা দেখেছে যা এখন ধ্বংসশীল।"

لاتامن الدهر الخون فاته☆ مازال قد ما للرجال يؤدب

"তুমি খেয়ানতকারী যামানা থেকে নিরাপদ থাক, কারণ এ সমস্ত মানুষের প্রত্যেক পদে বিভিন্ন উপদেশ দেয়া হচ্ছে।"

وعواقب الايام فی عصائنها☆ مضض يزل له الاعنوالانجب

"যুগের ফলাফল হল ষড়যন্ত্র। একটি বিপদের মত। যার সামনে ভদ্র সম্মানিত লোকও মাথা নত করে।"

فعليك تقوى الله فالزمها تفز☆ ان التتی عوالعهن الاهيب

"আল্লাহকে ভয় করা তোমার আবশ্যকীয় কর্তব্য, তাঁর উপর দৃঢ় থাক তাহলে সফলকাম হবে। আর খোদাভীরু লোকই আলোকিত ও সম্মানিত হয়।"

واعمل بطاعته تند من الرضا☆ ان المطيع له لدينه مقرب

"তুমি তাঁর (আল্লাহর) আনুগত্য কর তাঁর সন্তুষ্টি পাবে। নিশ্চয় অনুগত লোকেরাই আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে।"

واقنع ففی بعض القناعة راحة☆ والياس مما فات فهو المطلب

"তুমি অল্পে তুষ্ট হওয়ার জীবন গড়, কারণ অল্পে তুষ্টিতেই শান্তি আছে। ধ্বংসশীল বস্তুর থেকে নিরাশ হওয়াই (নিজের) উদ্দেশ্য হওয়া চাই।"

فاذا طمعت كسيت ثوب مذلة ☆ فلقد كسى ثوب المذلة اشعب

"তুমি যখন লোভী হতে থাকবে তখন অসম্মানী হয়ে যাবে। আর যে অপমানের জুব্বা পরিধান করে সে তোমাকে চিন্তিত রাখবে।"

وثوق من عذر النساء وخيانة ☆ فجميعهن مكاية لك تنصب

"তুমি নারীর ছলনা এবং খেয়ানত থেকে নিজেকে বাচাও। কারণ তোমাদেরকে ধোকাবাজীতে ফাঁসানোর জন্যই এদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে।"

لاتامن الانثى حياتك انها ☆ كالافعوان يراع منه الانيب

"নারী থেকে কখনো তুমি নিরাপদ থাকতে পারবে না। কারণ তারা হল কাল নাগের মত, যাদেরকে মোটামোটা দাতওয়ালারাও ভয় পায়।"

لاتامن الانثى زمانك كله ☆ يوما ولو حلفت يمينا تكذب

"এমনিভাবে তুমি সারা জীবনেও নারী থেকে নিরাপদ থাকতে পারবে না। কারণ এদের ব্যাপারে তোমরা শপথ করলেও মিথ্যুক হয়ে যাবে।"

تغوى يلين حديثها وكلامها ☆ واذا سطت فهى الصقيل الاشطب

"সে তার চিত্তাকর্ষক কথার মাধ্যমে উত্তেজনা সৃষ্টি করে, সে যখন বিজয়ী হয়ে যায় তখন সে চমক সৃষ্টি করে দীর্ঘস্থায়ী সুন্দরী হয়ে যায়।"

وابداعدوك بالتقصمه ولتكن ☆ منه زمانك خائفا تترقب

"শত্রুকে প্রথমে সালাম কর, এরপর আর বিশ্বাস করোনা বরং ভয় করো যদি খুব তাড়াতাড়ি পুরস্কার নিতে চাও।"

واحذره ان لا قيته مبتهاً ☆ فالليث يبدونا به اذ يغضب

"যদি দেখ সে (নারী) তোমার সাথে কূট কৌশলের আশ্রয় নিয়ে কথাবার্তা বলে, তাহলে তার হাত থেকে পরিত্রাণের জন্য চেষ্টা কর, কারণ সিংহ যখন ক্রোধান্বিত হয় তখন সে সুচাঁলো দাত বের করে।"

ان العدوان تقادم عهده ☆ فالحقد باق فى الصدور مغيب

"যদিও যুগ অনেক দীর্ঘ হয়ে অতিবাহিত হয় তবু দুশমন দুশমনই থাকে,

আর শত্রুতামী, ঈর্ষা বুকের মধ্যে অবশিষ্ট ও গোপন থেকেই যায়।”

واذا الصديق لقيته متملعتا☆ فهو الدود حقه يتضنب

“যখন তুমি চাটুকার বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ কর বুঝে নিও সে আসলে তোমার শত্রু, এর থেকে বেঁচে থাকবে।”

لاخيرنى ودامرى متملعتا☆ فهو العدود حقه يتجنب

“চাটুকার লোকের বন্ধুত্বে কোন উপকার নেই, কারণ তার কথা মধুর বটে কিন্তু তার অন্তর নারীর অগ্নি শিখার মত।”

يلقاك يحلف انه بك واثق☆ واذا بها توارى عنك فهو العقرب

“সে তোমার সাথে নিজেই বিশ্বাসের কসম করে আকৃষ্ট করে, কিন্তু সে যখন তোমার থেকে পৃথক হয়ে যায় তখন সে বিচ্ছু হয়ে যায়।”

يطيك من طرف اللسان حلاوة☆ يروع منك كما يروغ الثعلب

“সে তোমার সাথে মুখ দ্বারা মধুর কথা বলবে বটে, কিন্তু পরে সে শৃগালের মত কম কম এসে চলে যাবে।”

وصل الكرام وان رموك يجفوة☆ فالصفح عنهم بالتجاوز اصرب

“ভদ্রের সাথে ভাল আচরণ কর, যদিও সে মন্দ মনে হয়। এরপর তুমি কৌশলে কাজ আদায় কর।”

واخترقرينك ماصطقينه تفاخرا☆ ان القارين الى المقارن ينسب

“তুমি বন্ধুদের জন্য ভাল এবং উপযুক্ত গৌরবান্বিত বন্ধু যাচাই কর কেননা বন্ধু বন্ধুত্বের দিকে ধাবিত হয়।”

يبش بالترحيب عند قدومه☆ ويقام عند سلامه ويقرب

“তার আগমনের সময় মানুষ তাকে স্বাগতম জানায় আর তার সালাম ও দোয়ার সময় মানুষ নিকটেই দাঁড়িয়ে যায়।”

واخفض جناحك الاقارب كلهم☆ بتذلل واسمع لهم ان اذنبوا

“তুমি সকল আপন জনদের সাথে বিনম্র আচরণ করবে, যদিও সে কোন সময় অপরাধ করে বসে তাহলে (চক্ষু লজ্জায়) এড়িয়ে যাও।”

ورع الكذوب فلايكن لك صاحبها☆ ان الكذوب يشين حرا يصحب

"মিথ্যক ব্যক্তিকে তোমার সঙ্গী করো না, কারণ মিথ্যক ব্যক্তি পূণ্য এবং স্বাধীন চরিত্রকে ত্রুটিপূর্ণ করে দেয়।"

وزن الكلام اذا انطقت ولاتكن ☆ ثرثاره فى كل ناد يخطب

"কথা বলার সময় ভারসাম্যপূর্ণ কথা বলবে, প্রত্যেক মজলিশে বাজে কথা এবং বেশী গল্প গুজব করো না।"

واحفظ لسانك واحترز من نفطه ☆ فالمرأ يسلم باللسان ويعطب

"তুমি জিহবার হেফাজত কর, অধিক কথা বলো না, কারণ জিহবা দ্বারা মানুষ নিরাপদ থাকে, আবার ধ্বংস হয়।"

والسرفاكتمه ولاتنطق به ☆ ان الزجاجة كسرها لا يشعب

"গোপন কথাকে সাঁচে ঢালা পাত্রে আটকে রাখ, প্রকাশ করো না কেননা শিশা ভেঙ্গে গেলে তা আর জোড়া লাগে না।"

كذالك سرا المرء ان لم يطم ☆ نشرتة السنة تزيد وتكذب

"এমনিভাবে মানুষের গোপন কথাকে যদি গোপনের মত না রাখা হয় তাহলে লোকেরা লবন মরিচ মিলিয়ে বলতে থাকবে এবং উল্টা পাল্টা বলে বেড়াবে।"

لاتحتصرص فالحرس ليس بزائم ☆ فى الرزاق بل يشقى الحريص ويتعب

"তুমি কখনো লোভ করোনা কেননা এতে রিযিক বর্ধিত হয়না, বরং লোভী ব্যক্তির ভাগ্য পূর্বের মতই থাকে বরং সে আরো অবসন্ন হয়ে যায়।"

يطل ملهوقاير دم تحليلا ☆ والرزق ليس بحيلة يستجلب

"তার মন হয়ে উঠে বিরক্তিকর এবং বাহানা করতে থাকে আর বাহানা করে রিযিক অর্জন করা যায় না।"

كم عاجز فى الناس ياتى رزقه ☆ رغدا ويحرم كيس ويجنيب

"কিছু কমজোর লোকের রিযি খুব বেশী মিলে আর জ্ঞানী লোকেরা বঞ্চিত ও নিস্কর্মা হয়ে যায়।"

وارع الامانة والخيانة فاجتنب ☆ واعدل ولا تظلم يطب لك مكسب

"আমানতের হেফাজত কর, খেয়ানত করো না, ইনসাফ করবে কখনো

জুলম করবে না। একথা তোমার জন্য উপকারী হবে।”

واذا اصابك نكبة فاصبر لها☆ من ذرائيت مسلما ولا يكتب

“যে সময় তুমি কোন বিপদাপদে পড়ে যাবে তখন ধৈর্যের আঁচল ছেড়ে দিওনা। তুমি কতজন মুসলমানকে দেখেছ যে, তাদের দুঃখ কষ্ট আসেনই?”

واذا رميت من الزمان بريبة☆ اونالك الامر الاشق الاصعب

“যখন যুগ তোমাকে চাঞ্চল্য ও অবিশ্বাসের মধ্যে ফেলে দেয়, অথবা তোমাকে কোন কঠিন ব্যাপারে ফেলে দেয়।”

فاضرع لربك انه ادنى لمن☆ يدعو من حبل الوريد واقرب

“তাহলে তুমি তোমার প্রভূর দরবারে বিনীত নিবেদন কর। কেননা যে তাকে ডাকে তিনি শাহ রগের চেয়েও আরো অধিক কাছে আছেন।”

كن ما استطعت عن الانام بمعزل☆ ان الكثير من الورى لايصحب

“তুমি চূড়ান্ত সময় পর্যন্ত সৃষ্টি থেকে পৃথক থাক কেননা অধিক লোকের সহিত মিল রাখা যায় না।”

واحذر مصاحبة اللئيم فانه☆ يعدى كما بعدى الصحيح الاجوب

“তুমি দুর্ভাগা লোকের সংশ্রব থেকে বেচে থাকবে কারণ তার সংশ্রব লেগে যায় যেমন লেগে যায় খাজলী সুস্থতার সহিত।”

واحذر من المظلوم سهما صائبا☆ واعلم بان دعائه لا يحجب

“মজলুমের আর্তনাদ থেকে বেচে থাক কথাটি এজ্য স্মরণ রাখবে যে, তার দোয়া নিরর্থক হয় না এবং ফেরত যায় না।”

واذا رأيت الرزق عن ببلدة☆ وخشبت فيها ان يضيق المذهب

“যখন তুমি দেখবে যে, রিযিক কোন শহরে দুষ্প্রাপ্য হয়ে গিয়েছে আর তোমার এই ভয় হয় গেছে যে, তা শেষ হয়ে যাবে।”

فارحل فارض الله واسعة القضا☆ طولا وعرضا شرقها والمغرب

“তাহলে (জেনে রেখ) আল্লাহর যমীন প্রশস্ত দৈর্ঘ্য-প্রস্ত, -পূর্ব-পশ্চিম যেখানে ইচ্ছা চলে যাও।”

فلقد نصحتك ان قبلت نصيحتى☆ فالنصح اعلى ما يباع ويرهب

"যদি আমার উপদেশ ভাল লাগে তাহলে গ্রহণ কর কারণ উপদেশ বিক্রীত এবং দান বস্তু থেকে দামী হয়।"

নাজ্জারের ছেলেদের বুদ্ধিমত্তা:

আবুল ফারাজ আব্দুর রহমান ইবনুল জাওযী একটি ঘটনা লিখেন যে, নাজ্জার ইবনে মায়াদের ৪টি ছেলে ছিল। মুযার, আয়দ, রবিয়া ও আনমার। মৃত্যুর কাছাকাছি হলে নাজ্জার তার স্থাবর অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি তার চার ছেলের মধ্যে স্টন করে দিলেন। তিনি সম্পদ বন্টনের ব্যাপারে এক অসাধারণ পদ্ধতি গ্রহণ করেন। তার চার ছেলেকে ডেকে তিনি বললেন যে, এই যে লাল টুপিটি আছে এবং এ জাতীয় যত মালামাল আছে এগুলো হল মুযার এর। এই তালিযুক্ত পোশাকাটি এবং এর অনুরূপ মালামাল রাবিয়া-এর। এই চাকর এবং এই জাতীয় মালামাল মায়াদের। আর এই (১০ হাজার টাকার) শলিটি এবং এ জাতীয় মালামাল আনমার তোমাকে দিয়ে যাচ্ছি। অসিয়্যত করার সময় শেখ নাজ্জার এই তাকিদ দেন যে, তোমাদের মধ্যে যদি কোন প্রকার জটিলতা অথবা কোন লেনদেনে ঝগড়ার সৃষ্টি হয় তাহলে তোমরা সত্বর আফয়ী ইবনে আফয়ী আল জরহামী এর কাছে গিয়ে মীমাংসা করবে।

নাজ্জার এর ইন্তেকালের পর তাদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হল। শেষে এই মামলা নিয়ে নাজরানের বাদশাহ আফয়ী এর নিকট যাবার সিদ্ধান্ত নিল। তারা সবাই একই সাথে যাচ্ছিল । হঠাৎ করে মুযার দেখল যে, একটি উট ঘাস খাচ্ছে। তখন মুযার বলল উটনি অন্ধ। টেরা চোখ এবং তার বুক খুব মশৃণ। আয়াদ বলল আরে না না এর লেজ কাটা। আর আনমার বলল আরে না না সে হল ভীতু ধরনের। তারা কিছু দূর যেতে না যেতেই হঠাৎ করে এক লোকের সাক্ষাত ঘটল। তারা সে লোককে উটের আকৃতি প্রকৃতি সম্পর্কে মীমাংসা করে দেওয়ার কথা বলে বলল উটটি কেমন? সবাই নিজ দেখার বর্ণনা করল। মুযার বলল বেস আমার নিকট টেরা চোখ এবং বক্ষ হালকা পাতলা মনে হল। লোকটি আবার বলল সেও সত্য বলছে। আয়াদ বলল ভাই সেতো লেজ কাটা। লোকটি হ্যাঁ বলে তার কথা সমর্থন করল। আনমার বলল সে শুধু বিদঘুটে ধরনের। লোকটি বলর তাইতো একথাও সত্যি। উটের এ সমস্ত গুণাগুন শুনার পর লোকটি বলল ভাইসব।! এ সমস্ত গুনাগুনের অধিকারীতো আমার উটও। তোমরা আমার উটের

সাংবাদটি বলতো একে কোথায় দেখেছো? একথা শুনে তারা শপথ করে বলল যে, আমরা কোন উট দেখি নাই। অস্বীকৃতির কারণে লোকটি তাদের পিছু ধরল। ওদের পেছনে সে জোঁকের মত লেগে থাকল। শেষে তারা নাজরানে এসে সেখানের শাসক আফয়ী ইবনে আফয়ী আল জুহামী এর দারবারে উপস্থিত হল। সেও লোকটিও বাদশার দরবারে বিচার দায়ের করে বলল বাদশাহ্ নামদার তারা আমার উটকে দেখেছে। অধিকন্তু এর গুণও বর্ণনা করেছে অথচ তারা এর সন্ধান দিচ্ছে না যে আমার উটটি কোথায় আছে? এমন সময় তাদের সব ভাই সমস্বরে বলে উঠল, বাদশাহ্ নামদার আমরা তার উট দেখি নাই। বাদশাহ্ বললেন তোমরা যদি উট নাই দেখে থাক তাহলে উটের গুণাগুণ বর্ণনা করলে কিভাবে? যার সঠিক প্রমাণ উটকেই বুঝায়। সর্ব প্রথম মুযার বর্ণনা দিয়ে বলল আমি উটকে এভাবে দেখেছি। কিন্তু সে তার একদিকে ঘাস বাদ দিয়ে চরতে ছিল। আমি বুঝে নিলাম যে, উট অন্ধ। রবিয়া বলল যে, আমার নিকট তার এক হাতে একে ত্রুটিপূর্ণ বলেই মনে হল। তাই আমার অনুমান সে টেরা এবং বক্ষ হালাকা পাতলা হওয়ার কারণে সঙ্গমের সময় নিস্ফল হয়ে যায়। আয়াদ বলর আমি বিষ্ঠা পড়ে থাকতে দেখে বুঝতে পারলাম যে সে লেজ কাটা। যদি তার লেজ লম্বাই হত তাহলে তার বিষ্ঠা ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ত। আনমার বলল সে মাঠে চড়ার সময় ঢালু যমির দিকে যেতে থাকল। এতে আমি বুঝে নিলাম সে ভীতু ধরনের।

নাজরানের বাদশাহ কথিত উটের মালিককে বললেন ভাই, তারা আপনার উট দেখেনি। আপনি নিজে গিয়ে খোঁজ করুন। বাদশাহ আবার তাদের দিকে ফিরে বললেন আচ্ছা বলুন তো আপনারা কারা? আমি আপনাদের ব্যাপারে কিছুই জানি না। তারা নিজেদের পরিচয় দিল। বাদশাহ শুনে তাদেরকে স্বাগত জানালেন এবং বললেন ভাই আপনারা ব্যাপারটি নিয়ে আমার নিকট সত্বরই এসে গেছেন। আমারও ধারনা তাই। বাদশাহ তাদের রাখলেন এবং তাদের জন্য খানাপিনার আয়োজন করলেন। তারা খানা খেল এবং পানীয় পান করে তৃপ্ত হয়ে গেল। এরপর মুযার বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ পূর্বক বলল ভাই অদ্যকার শরাব খুব ভাল। এরকম আমি কখনোই দেখিনি। কিন্তু তা কবরস্থানের নয় তো? এ ভাবে রাবিয়া বলল আজকের মত আমি আর এত ভাল গোশত কখনো খাইনি। তবেতো কুকুরের দুধ প্রাণীকে পান করানো হয় নাই? আয়াদ

বলল আজকের মত আমি কোন মানুষকেই রাতে অধিক ভ্রমনকারী দেখিনি। কথা হল সে তার পিতার ছেলে নয় তো যার দিকে তাকে সম্পর্ক করা হয়? আনমার বলল আজকের মত আমি আর এত ভাল রুটি কখনো খাই নাই। কথা হল সে আটার খামীর কোন ঋতুবতী রমনী করেনি তো?

বাদশাহ আফয়ী তাদের কাছে একজন প্রতিনিধি পাঠালেন। সে প্রতিনিধি তাদের কথাবার্তা শুনতে ছিল। প্রতিনিধি তাদের সম্পূর্ণ আলোচনা সম্পর্কে আফয়ী কে অবগত করলেন। নাজরানের বাদশাহ এসব লোকের কথার সত্যতা নিশ্চিত করতে শরাবদাতাকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, তুমি কি রকম শরাব বানিয়েছ সত্য সত্য বল। কি ঘটনা? সে বলল এগুলো এমন আঙ্গুর দ্বারা বানানো হয়েছে যে আঙ্গুরের গাছ আপনার পিতার কবরের উপর লাগানো হয়েছে। এই আঙ্গুরের শরাব আমি আপনাকে এ জন্য দিয়েছি যে, এর চেয়ে ভাল শরাব আমার নিকট আর ছিলনা। এভাবে গোশত ওয়ালাকেও ডেকে জিজ্ঞেস করলেন যে, তুমি এমন গোশত কোত্থেকে দিয়েছ? ঘটনা কি সত্য সত্য বল? সে বলল আমি আপনাকে এমন বকরীর গোশত কেটে দিয়েছি যাকে আমি কুকুরের দুধ পান করিয়ে ছিলাম। গোশতের জন্য এর চেয়ে মোটা বকরী আমার নিকট আর ছিল না। আফয়ী অন্দর মহলে প্রবেশ করে সে দাসীর নিকট গেলেন, যে রুটি বানিয়ে ছিল। তাকে জিজ্ঞেস করা হল যে, তুমি কিভাবে রুটি বানিয়েছ। ঘটনা কি? সে বলল আমি সে সময় ঋতু অবস্থায় ছিলাম মাসিকের রক্ত ঝরতে ছিল।

আফয়ী মায়ের নিকট গিয়ে বললেন, তারা আমার পিতা সম্পর্কে জানতে চায় যে তিনি কেমন ছিলেন? মা তাঁকে বললেন, প্রথমে এক বাদশাহর সাথে আমার বিয়ে হয়েছিল। তার কোন সন্তানাদি ছিল না। বাদশাহর ইন্তিকালের পর বাদশাহী অন্যের হাতে চলে যাবার ভায়ে আমি এমন একজন লোকের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুললাম যে আমার নিকট আসা যাওয়া করত। সেখানে এ সমস্ত সন্তানাদির জন্ম। আফয়ী এসকল ঘটনার সত্যতা যাচাই করার পর তিনি এ এদের কথাবার্তা ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষনে হতবম্ভ হয়ে পড়লেন। এদের কাছে এ সমস্ত ঘটনার ব্যাখ্যা চাইলেন যে, তোমরা এ ঘটনা কিভাবে জানালে? কি করে তোমরা এর মূল তত্ত্বে পৌছে গেলে?

মুযার শরাবের নিগুঢ় তথ্য প্রকাশ করল যে, এটি এমন আঙ্গুর দিয়ে

তৈরী করা হয়েছে যার গাছ কবরের উপর লাগানো হয়েছিল। শরাবের বৈশিষ্ট হল পান করার পর সমস্ত প্রকার বেদনা, ক্লেশ , চিন্তা ইত্যাদি দূরীভূত হয়ে যায়। মস্তিস্কে স্থিতিশীলতা অনুভূত হয়। কিন্তু এই শরাব তো সম্পূর্ণ নিজের বৈশিষ্টের বিপরীত। আমরা যখন পান করলাম তখন আমাদের বেদনা, ক্লেশ কিছুই দূর হয়নি। বরং তা আরো সতেজ হতে লাগল।

রাবিয়া বলল যে, আমি গোশতের রহস্য বলতে পারি যে, এমন বকরীর গোশত ছিল যে বকরী কুকুরীর দুধ পান করেছিল। তা এজন্য অবগত হলাম যে, প্রত্যেক প্রকার গোশতের বৈশিষ্ট হল, চর্বি গোশতের উপরে থাকে, কিন্তু কুকুরের গোশত এর বিপরীত। কুকুরের গোশতের চর্বি থাকে গোশতের ভিতরের অংশে। আমরা যখন গোশত খেলাম তখন সমস্ত গোশত এর বিপরীত ছিল। এ জন্য আমি বুঝতে পারলাম যে, ইহা এমন বকরীর গোশত ছিল যে বকরী কোন কুকুরী দুধ পান করেছিল।

আয়াদ বলল যে, তার পিতার অন্তীম বাণী ছিল যে, সে যে পিতার সহিত সম্পর্ক যুক্ত মূলত সে তার পিতা নয়। এটি এভাবে বুঝা গেল যে, সে যে খাদ্য পাকিয়ে আমাদের নিকট পাঠিয়েছে কিন্তু সে আমাদের সহিত খানা খায় নাই। এতে করে তার চরিত্রের নমুনা করা যায় যে, তার পিতাতো এরকম ছিলনা আর না ছিল তার এরকম চরিত্র।

আনমার বলল এই রুটিতে ঋতুবর্তী রমনীর হাতে খামীর করা হয়েছিল। তা আমি এভাবে বুঝলাম যে, যখন কোন রুটি বানানো হয় তখন তা খবার সময় টুকরা টুকরা হয়ে যায়। এতে আমি বুঝে নিলাম যে, কোন ঋতুবর্তী রমনী আটার খমীর করেছে।

প্রতিনিধি লোকটি এ এদের কথাবার্তা আফয়ীকে অবগত করলে আফয়ী বললেন ভাইসব! এখানে তোমাদের কি কাজ? ঘটনা কি? তারা নিজ নিজ ঘটনা বর্ণনা করল যে, আমাদের পিতা মৃত্যুর পূর্বে এরকম ইচ্ছা পোষণ করে ছিলেন। কিন্তু বন্টনের ব্যাপারে আমাদের মধ্যে মত বিরোধ দেখা দিল। আমাদের পিতা এ কথা বলেছিলেন যে, কোন ব্যাপারে যখন তোমাদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি তা নিরসন কল্পে আপনার শরণাপন্ন হতে। এর পর তারা তাদের নিজ নিজ ব্যাপার আফয়ী এর সামনে পেশ করল। আফয়ী জবাবে বললেন, যে মালামাল লাল

টুপির অন্তর্ভূক্ত ইহা মুযার এর। এর উদ্দেশ্য হল তার ভাগে সমস্ত স্বর্ণমুদ্রা এবং উট ইত্যাদিও আসবে। এ জন্য দীনার লাল রঙ্গের হয়ে থাকে। উটও লাল রঙ্গের হয়ে থাকে। যাকে উত্তম সম্পদের মধ্যে গণ্য করা হয়। আরবগণ একে অত্যন্ত ভালবাসে। তালিযুক্ত পোশাক এবং এজাতীয় সম্পদের অর্থ হল অন্যান্য প্রাণী জাতীয় মালামাল এবং ঘোড়া ইত্যাদিও রবিয়ার ভাগে পড়বে। এজন্য কোন কোন ঘোড়াও কাল হয়ে থাকে। আর যে সমস্ত মালামাল সেবকের অনুরূপ যত মালামাল আছে এর অর্থ হল দ্রুতগামী প্রাণী চিত্রল ঘোড়া ইত্যাদি আয়াদের ভাগে প্রাপ্ত হবে। আফয়ী এভাবে আনমার এর জন্য টাকা পয়সা ও জমা জমি ইত্যাদিরও মীমাংসা করে দিলেন। এ মীমাংসা শুনে সবাই চলে গেল। (এ ব্যাপারে আরো বিস্তারিত পরে আলোচনা করা হবে ইনশা আল্লাহ)

ইবনুত তিলমীয সম্পর্কে আলোচনা:

ইতিহাসবিদ ইবনে খাল্লেকান ইবনুততিলমীয এর জীবনী লিখতে গিয়ে বলেন যে, তিনি নাসারা (খৃষ্টান) এবং চিকিৎসকদের সাধুতাকে সম্মান করতেন। তার এবং প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ওয়াহীদুয যামান এর মধ্যে অসন্তোষ ও বিরোধীতা ছিল। হাকীম হিবাতুল্লাহ প্রাথমিক জীবনে ইহুদী ছিলেন। তিনি শেষ জীবনে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তার ব্যাপারে আছে যে, তার রোগ হয়েছিল। তাই তিনি তার শরীরে আফয়ী সর্প লাগিয়ে রাখতেন। সাপের যখন খুব ক্ষুধা অনুভব হত তখন তার শরীরে বেশী বেশী ছোবল দিত। তিনি এই চিকিৎসার মাধ্যমে রোগ থেকে মুক্তি পান। পরবর্তীতে সাপের বিষের প্রতিক্রিয়াতে তার দৃষ্টি শক্তি লোপ পায়। ইবনুত তিলমীয তার ব্যাপারে নিম্ন কবিতায় রচনা করেন:

لنا صديق يهودى حماقته ☆ اذا تكلم تتبدو فيه من فيه

"আমার এক ইহুদী বন্ধু আছে, সে কথা বললে নিজ বোকামী প্রকাশ হয়ে পড়ে।"

يتيه والكلب اعلى منه منزلة ☆ كانه بعد لم يخرج من التيه

"সে হতভম্ব হয়ে ঘোরতে থাকে, প্রকৃত পক্ষে তার চেয়ে কুকুরও উত্তম। সে বিমুঢ়তা থেকে এর পরেও সে বের হয়ে আসে না।"

খৃষ্ট সরদার ও বিজ্ঞ চিকিৎসক ইবনুত তিলমীয অত্যন্ত বিনম্র ও বিনীত ব্যক্তি ছিলেন। আর হেবাতুল্লাহ বড় গৌরবী ও অহমিকাপূর্ণ ব্যক্তি ছিল। এ

দুজনের ব্যাপারে দুজনের ব্যাপারে بـديع الاسطر لابى কয়েকটি কবিতা পাঠ করেন:

ابوالحسن الطيب ومقتفيه☆ ابو البركات فى طرق نقضى

"শায়খ আবুল হাসান ডাক্তার এবং বিচারক ছিলেন। আর তার পক্ষাবলম্বনকারী আবুল বারাকাত উভয়ে ছিলেন পরস্পর বিরোধী।"

فهذا بالتواضح فى الثريا☆ وهذا بالتكبير فى الحفيض

"এই আনুগত্য ও নম্রতার কারণে সপ্তর্ষী মন্ডলে পৌঁছলেন। আর এই অহংকারের কারণে স্বল্প শিক্ষিত রয়ে গেলেন।"

আবুল হাসান ইবনুত তিলমীয ميـــــزان তথা পল্লার ব্যাপারে একটি আশ্চর্য ধরনের এবং দুস্প্রাপ্য কথা বলেছেন যে,

ماواحد مختلف الاسماء☆يعدل فى الارض وفى السماء

"কোন বস্তুই বিভিন্ন নামে নয় যা আকাশ ও যমীনে সমানে সমানে এবং সামতা করে।"

يحكم بالقسط بلاء رياء☆ اعمى يرى الارشاد كل راء

"যে ব্যক্তি লৌকিকতা ব্যতীত ন্যায় ভিত্তিক মীমাংসা করে সে অন্ধ হলেও প্রত্যেক বস্তুকে নিয়মতান্ত্রিক ভাবে চিন্তাভাবনা করে।"

اخرس لامن علة وداء☆ يغنى عن التصريح بالايماء

"সে বোবাও , কিন্তু কোন কারণ ছাড়া এবং অসুস্থতার বোবা, যা ইশারা করেই নিকাদ করে অপ্রতিরোধ করে লয়।"

يجيب ان راه ذوامتراء☆ بالرفع والحفص عن النداء

"যদি কোন সন্দেহভাজন লোক আপীল করে তাহলে সে উঠে এবং ঝোঁকে জবাব দেয়।"

يضمح ان علق فى الهراء

সে পরিস্কার প্রকাশ হয়ে পড়ে যদি তাকে বাতাসে লটকিয়ে দেয়া হয়।

নোট :"বিভিন্ন নাম" যা কবিতায় বর্ণিত হয়েছে এতে অনেক অর্থবোধক শব্দ রয়েছে لا بـ الاسطر। দিক দর্শন যন্ত্র, প্রত্যক্ষকরণের হাতিয়ার ইত্যাদি।

আর সে বাক্যগুলোর এটিই অর্থ হয় يعدل فى الارض وفى السماء সে আকাশ ও যমীনে সমান ওযন করে। ميـــزان নামে ও বিভিন্ন বই পুস্তক আছে যেমন আরবী ব্যাকরণে ميزان الكلام ,

ছন্দ জ্ঞানে ميزان الشعر আর মানতিকে ميزان المعانى ইত্যাদি।

الاسترلاب হামযাতে যবর سين এ জযম এবং طاء এ পেশ। যার অর্থ হল ميزان الشمس (দিক দর্শন যন্ত্র)। কারণ ইউনানী ভাষায় اسطر এর অর্থ ميزان এবং لاب এর অর্থ شمس হয়ে তাকে। হাকীম بطليموس এ যন্ত্র আবিস্কার করেন।

ভাগ্যবান এ ব্যক্তি মিশরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ইসকান্দরিয়ার নিকট ইন্তিকাল করেন। তিনি ভূগোলে সুপন্ডিত এবং ইতিহাসে বিজ্ঞ ও পারদর্শী ছিলেন। এযন্ত্রটি নির্মাণের ব্যাপারে একটি বিস্ময়কর ঘটনা আছে। যা কলেবর বৃদ্ধির কারণে বাদ দেয়া হয়েছে।

ابن التلميذ নানা বিদ্যায় বিদ্যান ও সুপন্ডিত একজন স্মৃতি শক্তি সম্পন্ন জ্ঞানী আলেম। কিন্তু এতসব জ্ঞান-গরিমা থাকা সত্বেও তিনি ইসলাম থেকে বঞ্চিত থাকেন। এটি আল্লাহর পাকের মহা দান যাকে তিনি ইচ্ছা করেন তাকে সঠিক পন্থায় পরিচালিত করেন। আর যাকে ইচ্ছা তিনি বঞ্চিত রাখেন। ومـــن يضلله فلا هادى له আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে خاتمه بالخير করুন এবং তাওহীদে খালেস এর উপর অবিচল রাখুন। ইবনুতত্বিলমীযের ইন্তিকাল ৫৬০ হিঃ হয়েছে।

চিকিৎসা ক্ষেত্রে কালো সাপের উপকারিতা:

আফয়ী বা কালো সাপের রক্ত দিয়ে সুরমা বানিয়ে চোখে লাগালে চোখের আলো বৃদ্ধি পায়। এই সাপের কলিজা শুকিয়ে গলায় বেধে রাখলে কোন যাদুর প্রভাব পড়বে না। কারো দাঁতের মাড়িতে কোন অসুখ হলে তার দাঁতের মাড়িতে বেধে দিলে ব্যথা দূর হয়ে যাবে। কোন মহিলা যদি এর বাম চোয়ালের হাড় তার বাম উরুতে বেঁধে রাখে তাহলে সে আর গর্ভবতী হবে না। ইমাম কাযবিনী বলেন, কারো যদি জ্বর আসে তাহলে কালো সাপের কলিজা বেধে রাখলে ইনশাআল্লাহ জ্বর সেরে যাবে। সাপের চর্বি কাপড়ে মেখে দিলে সব রকম পোকা মাকড়ের আক্রমন থেকে নিরাপদ থাকা যায়। কোন স্থানে চুল

ফেলে দিয়ে সে স্থানে এর চর্বি মেখে দিলে আর কোন দিন চুল গজাবে না। যদি কেউ মুখে নিশাদল গলিয়ে এই সাপ অথবা যে কোন সাপের মুখে থুথু মারে তাহলে সাপ মরে যাবে। এর চামড়া যদি শিরকার সহিত মিশিয়ে রান্না করা হয় এবং মুখে নিয়ে কুলকুচা করে তাহলে মাড়ি ও দাঁতের স্থায়ী উপকার হবে।

এ সাপের চামড়া যদি কেউ মাটির সাথে মিশিয়ে পিশে সুরমা করে চোখে লাগায় তাহলে চোখের জ্যোতি বৃদ্ধি পাবে। যদি কারো পার্শ্ব রোগ হয় অথবা চোখে সাদা ফুল পড়ে তাহলে এই সাপের চর্বি মালিশ করলে এবং সুরমা হিসাবে ব্যবহার করলে আল্লাহর রহমতে উভয় রোগের খুবই উপকার হবে।

যে কোন সাপের পিত বিষক্রিয়া নষ্ট করার বেলায় দ্রুত কার্যকর। বুকরাত লিখেছেন কেউ যদি এই সাপের গোশত খেয়ে ফেলে তাহলে যাবতীয় রোগ তেকে মুক্ত থাকবে।

একটি কাহিনী:

আমর ইবনে ইয়াহইয়া আল উলুবি বলেন যে, একদা আমাদের কাফেলা মক্কা মোকাররমার রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। এমতাবস্থায় কাফেলার একজনের পান্ডু রোগ দেখা দিল। আমরা যেতে যেতে দেখতে লাগলাম আরব বেদুঈনের উটের পালে একজন উক্ত পান্ডু রোগী আছে। ভ্রমন শেষে আমরা কুশ নগরীতে প্রত্যাবর্তন করলাম। সেখানে গিয়ে দেখলাম যে লোকটি উটে চড়ে চলে এসেছিল সে সম্পূর্ণ সুস্থ। আমরা তার অবস্থা দেখে বললাম যে, ভাই কি খবর দিনাতিপাত কেমন করছেন? কিভাবে সুস্থ হলেন? সে জবাব দিল ভাই আমাকে নিয়ে যখন আরব বেদুঈন আমার গন্তব্যে যেতে লাগল তারা সামান্য কিছু দূর গিয়েই আমাকে একা রেখে চলে এলো। আমার এতই ভয় হচ্ছিল যে, আমি মৃত্যু কামনা করতে ছিলাম। একদিন আমি দেখলাম যে, কাল সাপ ঐ লোকেরা এদের মাথা ও লেজ কেটে ভুনা করে খেতে আরম্ভ করল। তখন আমার মনে এই ধারনা এল যে, খেতে খেতে হয়ত তাদের অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। এ জন্য এদের কোন ক্ষতি হচ্ছে না। যদি আমি খাই তাহলে তো মরেই যাব। ঠিক আছে আমি তা খাবই এবং চিরদিনের জন্য শান্তিতে ঘুমোতে পারব এবং যাবতীয় বিপদাপদ থেকে মুক্তি পেয়ে যাব। আমি তাদেরকে বললাম যে ভাই আমার ক্ষিধে পেয়েছে। কিছু খেতে দিন। এদের মধ্যে একজন লোক আমার দিকে একটি সাপ ছুড়ে মারল।

সাপটি খেয়ে আমি মুহূর্তের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার দেখলাম আমার সারা শরীর ঘামে প্লাবিত। শরীরের অবস্থারও পরিবর্তন হতে লাগল। ভোর হবার কাছাকাছি সময়ে আমি নিজেকে খুব ক্লান্ত বোধ করলাম এবং আমার পেট অত্যন্ত হালকা হয়ে গেল। এর পর আমার ক্ষুধা পেল। কিছু খাওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হল। সেখানে কারো নিকট চেয়ে খানা খেয়ে এদের পাশে দাড়ালাম। শেষে বুঝতে পারলাম যে, আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গিয়েছি। এখন আর কোন কষ্ট নেই। এর পর আমি আমার সঙ্গীদের নিয়ে কূফায় চলে এলাম।

الاقهبان

(২৮) হাতী ও মহিষ

الاقهبان হাতী এবং মহিষকে বলা হয়ে থাকে। روبة নিজেই নিজের প্রশংসা করে বলেন

ليث يدق الاسد الهموسا☆ والاقهبين الفيل والجاموس

"হিংস্র বাঘ সিংহকে খটখট করে। এমনিভাবে হাতী মহিষকেও খট খট করে।"

الاملول

(২৯) প্রাণী বিশেষ

ইবনে সায়দা বলেন এটি উট পাখীর মত অথবা কবুতরের মত এক প্রকার প্রাণী।

الانس

(৩০) মানুষ

انس মানুষকে বলা হয়। এর একবচন انسى আসে এবং বহুবচন اناسى এমনিভাবে যদি انسان কে একবচন ধরে নেয়া হয় তাহলে এর বহুবচন اناسى হবে। (অর্থাৎ ن এর পরিবর্তে ياء হবে) যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন واناسى كثير

এমনিভাবে انسانية – صارفة এর ওজনে এবং انسان আসে। صاقلة انسان এর প্রয়োগ নারীর উপরও করা হয়। স্ত্রীলিঙ্গ হওয়ার কারণে انسان এ

تاء تانيث লাগিয়ে انسانة বলা হয় না। কিন্তু সাধারণ লোকেরা انسانة বলায় ও পৃথক করা হয় না।

مولدين এর কিবতায় انسانة এর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। ইমাম জাওহারী বলেন কোন কোন আরবী কবি انسانة ব্যবহার করেন।

انسانة فتانة☆ بدر الدجى منها حجل

সে এক ফেতনাবাজ নারী যাকে দেখে চন্দ্র পর্যন্ত লজ্জা পায়।

اذا زنت عينى بها☆ فبالدموع تغتسل

আমার দৃষ্টি যখন তার সহিত ব্যাভিচার করে তখন চোখের জলে স্নান করে নেই।

الانسان

(৩১) মানুষ

হযরত আদম (আঃ) এর সন্তান তথা সকল প্রকার মানুষের উপর الانسان শব্দের প্রয়োগ হয়। এর বহুবচন হয় الناس

ইমাম জাওহারী (রহঃ) বলেন, মূলত انسان – فعلان এর ওজনে আসে, যদি تصغير (ক্ষুদ্রতা বাচক বিশেষ্য) বানানো হয় তাহলে ياء বর্ধিত করে انسيان বলা হয়। যেমনিভাবে رجل এর تصغير - رجيل আসে। ইলমে সরফবিদগণ বলেন انسان এর মূল হল انسيان - افعلان এর ওজনে। কিন্তু অধিক ব্যবহারের কারণে ياء কে تخفيفا বিলুপ্ত করে এবং تصغير বানানোর সময় ياء তার নিজস্ব স্থানে চলে আসবে। এ জন্য تصغير এর শব্দকে বর্ধিত করা হয় না। تصغير তার মূল অক্ষরের প্রতিই প্রত্যাবর্তন করে।

ইলমে সরফবিদগণ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের (রাঃ) এর কথাকে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করে থাকেন। তিনি (আব্বাস (রাঃ) বলেন انسان কে الناس এ জন্য বলা হয় যে, তাদের নিকট থেকে আল্লাহ তাআলা প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন কিন্তু তা তারা ভূলে গিয়েছে। আর الناس এর মধ্যে মূল শব্দ اناس পরে তাকে হালকা বা সহজপাঠের জন্য ناس করা হয়েছে সুতরাং পবিত্র কোরআনে উল্লেখ আছে- لقد خلقنا الانسان فى احسن تقويم

"আমি মানুষকে সুন্দর অবয়বে সৃষ্টি করেছি।"

এর রহস্য হল, এর শারীরিক অঙ্গ সৌষ্ঠবকে, মাঝামাঝি রূপে এবং সম পরিমাণে সৃষ্টি করা হয়েছে। এ জন্য আল্লাহ পাক প্রত্যেক বস্তুকেই তার অবয়বে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু মানুষকে নয়। মানুষের চেহারাকে মধ্যমাকৃতিতে সমরূপে অন্যান্য অঙ্গ সৌষ্ঠবের অনুরূপ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ পাক মানুষকে একটি মিষ্টভাষী এবং সহজবোধ্য জিহবা দান করেছেন। যার দ্বারা তারা পরস্পর কথা বলে। এমনিভাবে তাকে হাত এবং তাতে আঙ্গুল দান করেছেন। যার সাহায্যে সে প্রত্যেক বস্তুকে শক্ত করে ধারণ করতে পারে। এমনি ভাবে তার আকল সুবিবেচনা ও বুদ্ধি দান করে মহা নেয়ামতে পুরস্কৃত করেছেন। যার দ্বারা সে স্রষ্টার আনুগত্যের বিপরীত করে না। এর সাথে সাথে তিনি খাদ্যের রীতিনীতি দান করেছেন। সুতরাং এমন বিষয়াদির একটি বর্ণনা বর্ণিত হয়েছেঃ

হযরত আবু মুযাইনাহ (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) এর সাহাবাদের মধ্যে এমন দুব্যক্তি ছিলেন, যারা পরস্পর সাক্ষাৎ হলে পরস্পরকে সুরাতুল আসর না শোনানো পর্যন্ত পৃথক হওয়ার নামও নিতেন না। (ত্বিবরানী)

একটি তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা:

ইবনে আতিয়া বলেন, পবিত্র কোরআন মাখলূক বা সৃষ্টি নয়। তার প্রমাণ হল পবিত্র কোরআনে কিতাবুল্লাহ শব্দটি, কোরআনের ৫৪৫ স্থানে রয়েছে। কিন্তু পবিত্র কোরআনের কোন জায়গায় خلق শব্দ ব্যবহার করা হয়নি। অধিকন্তু এর প্রতি কোন প্রকার ইশারাও করা হয় নাই। কিন্তু পবিত্র কোরআনে মানুষের আলোচনা এক তৃতীয়াংশে ১৮বার উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ এর সঙ্গে প্রত্যেক জায়গায়ই সৃষ্টি করার বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। অতএব পবিত্র কোআনে মানুষ এবং কোরআনের আলোচনা এই পন্থায়ই হয়েছে। কিন্তু উভয়ের আলোচনা আলাদা আলাদাভাবে হয়েছে। আল্লাহ পাক বলেন:

الرحمن علم القرآن خلق الانسان

"আল্লাহ পাক কোআন শিখিয়েছেন, মানুষ বানিয়েছেন।"

মালেকী মাযহাবের অনুসারী কাজী আবু বকর ইবনে আরাবী বলেন আল্লাহ পাক সমগ্র সৃষ্টিতে মানুষ ব্যতীত অন্য কোন সৃষ্টিকে اشـــــــرف المخلوقات তথা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠতম তৈরী করেননি। মানুষ ছাড়া অন্য কোন সৃষ্টিকে এরকম উত্তম পন্থায়ও সৃষ্টি করেন নি। এ জন্য আল্লাহ পাক মানুষকে জীবিত,

জ্ঞানী, ক্ষমতাবান বানিয়েছেন। এরই সাথে বাক শক্তি ও শ্রবন শক্তি, দর্শন শক্তি, বিচার শক্তি এবং বিজ্ঞতা ইত্যাদি অগনীত নেয়ামত দান করেছেন। আর এ সমস্ত বৈশিষ্টাবলী আল্লাহা তাআলারও। হাদীছ শরীফে আছে

ان الله تعالى خلق آدم على صورته

"নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক আদমকে তার আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন"

তাৎপর্যপূর্ণ একটি ঘটনা:

ইবনুল আরাবী তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেছেন যে, মুসা ইবনে ঈসা আল হাশেমী তার স্ত্রীকে খুবই ভালবাসতেন। একদা তিনি তার স্ত্রীকে বললেন তুমি যদি রৌপ্য থেকে অধিক সুন্দররী না হও তাহলে তোমাকে তিন তালাক। এতদ শ্রবনে তার স্ত্রী স্বামী থেকে পর্দা করে চলতে আরম্ভ করলেন এবং বললেন যে, আমাকে তালাক দেয়া হয়েছে। এমতাবস্থায় ঈসা আল হাশেমীর পরক্ষে রাত কাটানো অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে পড়ল। প্রভাতে খলিফা মনসুর আগমন করলেন ইবনুল আরাবী মানসূরকে এ ব্যাপারটা অবগত করলেন। মানসুর একথা শুনে সমস্ত ফকীহগণকে তলব করে তাদের সকাশে এই মাসআলাটি উপস্থাপন করলেন। মাত্র একজন ফকীহ ব্যতীত সকলেই তালাক পতিত হওয়ার পক্ষে রায় দিলেন। ঐ এক ফকীহ বলেন এর উপর তালাক পতিত হয় নি। এর প্রমাণ স্বরূপ আল্লাহ পাকের এই এরশাদ উপস্থাপন করলেন

لقد خلقنا الانسان فى احسن تقويم

"আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি সুন্দর অবয়বে।"

একথা শুনে মানসুর বললেন, হ্যাঁ আপনার ব্যাখ্যা সত্য বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। খলিফা মনসুর এই মাসআলার উপর ভিত্তি করে সমাধান দিয়ে দিলেন। এই জবাব ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) থেকেও বর্ণিত আছে।

ইমাম দামিরী (রহঃ) বলেন মুসা ইবনে ঈসা এর ঘটনার উপর আমার আপত্তি হল তিনি মনসূরের যুবরাজ ছিলেন। পরবর্তীতে মনসূরের ছেলে মাহদীর কারণে মুসা ইবনে ঈসা আল হাশেমীর যুবরাজ প্রত্যাহার করে নেন। এদিকে ইমাম শাফেয়ীর জন্ম হয় ১৫০ হিজরী সানে। উপরোক্ত ঘটনা উক্ত সানের পূর্বেকার বলে লিখা আছে। ঐতিহাসিক ইবনে খাল্লেকান এর মতানুযায়ী খলিফা মানসুরের ইন্তিকাল ১৫৮ হিজরী সানে হয়েছে। এ জন্য এই মাসাআলাতে ইমাম

শাফেয়ীর ফতোয়া প্রদানের রায়টি বুঝে আসে না।

সাবের ও শাকের তথা ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ পরায়ন:

আল্লামা দামিরী (রহঃ) বলেন, আমার ভাল ভাবেই স্মরণ আছে যে, নিম্নোক্ত ঘটনা ইমাম যমখশরী (রহঃ) পবিত্র কোরআনের আয়াত يستفتونك فى النساء এর তাফসীরে করেছেন যে, ইমরান ইবনে তিহান আল খারেজী অত্যন্ত কুচকুচে কাল ছিল। কিন্তু তার স্ত্রী ছিল খুব সুন্দরী একদিন তার স্ত্রী অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে তার স্বামীকে দেখতে ছিলেন। তিনি الحمد لله পড়লেন। তার স্বামী বলল ব্যাপার কি? স্ত্রী বলল আমি সে কথারই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যে, তুমি এবং আমি উভয়েই বেহেশতে যাব। স্বামী বললেন তা কিভাবে? স্ত্রী বললেন আমি যে রকম তোমার সুন্দরী স্ত্রী জুটেছি তেমনিভাবে আল্লাহর শোকরিয়া আদায় কর। অনুরূপ তোমার মত আমার স্বামী পাওয়াতে আমি ধৈর্য ধারণ করেছি। আল্লাহ তাআলা ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞপরায়নদের জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ইবনে জাওযী সহ কতিপয় মনিষী বলেন, ইমরান ইবনে হিতান খারেজী সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। এই সে ব্যক্তি যে হযরত আলী (রাঃ) কে আব্দুর রহমান ইবনে মুলজিম বর্তৃক হত্যা করার কারণে তার প্রশংসা করে বলেছিল :

يا ضربة من تقى ما اداد بها☆ الا ليبلغ من ذى العرش رضوانا

"ওহে এমন লোক হন্তা, যে ব্যক্তি নিজের ইচ্ছাকে হেফাজত করেছেন সম্মুখ পানে গিয়ে চল আরশের মালিকের পক্ষ থেকে সংবাদ শুনাও।"

انى لا ذكره يوما فاحسبه☆ اوفى البرة عند الله ميزانا

"আমি যেদিনই তাকে স্মরণ করি আল্লাহর দরবারে সৃষ্টি জগতের মধ্যে তাকেই অধিক চরিত্রবান মনে করি।"

اكرم بقوم بطون الارض اقبرهم☆ لم يخلطوادهم بضياو عدوانا

" এবং বংশের মধ্যে তাঁর বংশকেই সবেচেয়ে বেশী সম্মানী মনে করি। আর তার সমাধী আমার নিকট নীচু যমীনে সে সমস্ত লোকের চেয়ে বেশী ফুটন্ত মনে হয় যারা তাদের দ্বীনকে বিদ্রোহ এবং অত্যাচারে ধ্বংস করে নাই।"

হযরত আলী (রাঃ)কে শহীদকারীর এহেন প্রশংসামূলক এই কবিতাগুচ্ছ

আবুততাবীব তিবরী পর্যন্ত পৌছলে তিনি এর জাবে নিম্ন কবিতা বলেন:

انى لا برأمما انت قائلة☆ فى ابن ملجم الملعون بهتانا

"ইবনে মুলজিমের ব্যাপারে অপবাদ আরোপ করেছ এ বিরোধীতা আমি করি।"

انى لاذكره يوما فالعنه☆ دينا والعن عمران بن خطانا

"যেদিনই এটি আমি স্মরণ করতাম সে দিনই তাকে অপবাদ দিয়ে অভিসম্পাৎ করতাম। আবার ইমরান ইবনে হিতানকেও অভিশাপের নিশানা বানাতাম।"

عليك ثم عليه الاهر متصلا☆ لعائن الله اسراراواعلانا

"যুগের শেষ পর্যন্ত তোমার উপর এবং এতে প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য উভয় অবস্থায়ই তোমার উপর আল্লাহর অভিসম্পাৎ হউক।"

فانتم من كلاب النار جاء لنا☆ نحن الشريعة برهانا وتبيانا

"তুমি দুযখের কুকুর। কারণ তোমার ব্যাপারে আমাদের কাছে শরীয়তের প্রকাশ্য প্রমানাদি এসে গেছে।"

শেখ তিবরী (রহঃ) শেষের কবিতায় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর হাদীছ الخوارج كلاب النار খারেজীরা দোযখের কুত্তা এর প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন। (কিতাবুল আযকিয়া)

একটি বিশেষ ঘটনা:

আলী ইবনে নসর ইবনে আহমদ একজন ফকীহ এবং মালেকী মাযহাবে বিশ্বাসী খোদভীরু লোক ছিলেন। তার ছেলে শেখ আব্দুল ওয়াহহাব একজন প্রসিদ্ধ আলেম ছিলেন। তাঁর জীবনের একটি ঘটনা হল যে, তার প্রতিবেশীর একটি তুরকী গোলাম ছিল। গোলাম ও তার মা আমার ঘরে প্রায়ই আসা যওয়া করত। আলী ইবনে নসর বলেন- আমি (গোলম) ছেলেকে একজন সৎ ও বুদ্ধিমান মেয়ের সাথে বিয়ে দেই। সুতরাং তারা দুই বছর পর্যন্ত ভাল করেই সুখের সংসার করছিল। একদিন ছেলেটি আমার কাছে এ অভিযোগ দায়ের করল যে, হুজুর যে মহিলার সাথে আমাকে বিয়ে দিয়েছেন তার একটি সন্তান হয়েছে। আমার অভিযোগ হল সন্তান জন্মের পর থেকে অদ্যবধি সে আমাকে

দেখায় নাই। আমি সন্তান দেখানোর কথা বলি, তাকে এ ব্যাপারে তাকিদও করি, কিন্তু আমার স্ত্রী আমাকে ফিরিয়ে দেয়। দেখতে দেয় না। এজন্য আমি আপনার সকাশে উপস্থি হয়েছি। আপনি দয়া করে আমার শাশুরীকে বলে দিন যেন আমি সন্তান দেখে প্রশান্তি লাভ করতে পারি। তিনি তার শ্বাশুরীকে অনুরোধ করলেন। সে খুব তাড়াতাড়ি পর্দা করল এবং আলোচনা হল:- সে বলল, হুজুর তার সন্তানকে দেখতে এ জন্য নিষেধ করা হয় যে, বাচ্চাটি চিত্রল, মাথা থেকে নাভী পর্যন্ত সাদা, সমস্ত শরীর কাল হয়ে জন্মগ্রহণ করেছে। আমরাও চিন্তিত আছি। ছেলের এ অবস্থা পিতা শুনার সঙ্গে সঙ্গেই চিৎকার করে বলতে লাগল আমার ছেলে আমার ছেলে। অর্থাৎ আমার ছেলে দাও আমার ছেলে দাও আমার ছেলেকে দেখতে দাও। অতঃপর সে বলতে লাগল আমার দাদাও অবিকল এ রঙ্গের ছিল। এ জন্য আমার কোন বিরক্তি ও অসন্তুষ্টি নেই। তার স্ত্রী একথা শুনার পর অত্যন্ত খুশী হল। তার সমস্ত চিন্তার অবসান ঘটল এবং সে তার স্বামীকে সন্তান দেখাল। (তারীখে বাগদাদী)

হাকীম ইবনে বখতীশু' (যার অর্থ عبد المسيح) এর লিখিত কিতাব كتاب الحيوان কে মানুষের প্রকারভেদ দিয়ে আরম্ভ করেছেন। তিনি তাও লিখেছেন যে, যেহেতু মানুষ সমস্ত প্রাণীদের মধ্যে সংযত প্রকৃতির অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ইত্যাদির মধ্যে পূর্ণাঙ্গ এবং অনুরূপ রুচি সম্মত ও অনুভূতির মধ্যে লাজুক প্রকৃতির এবং পরামর্শ দানে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন হয়, সমগ্রসৃষ্টির উপর এক শক্তিশালী প্রশাসকের ভূমিকায় কাজ করে, এ জন্য আল্লাহ্ তাআলা জ্ঞানের দৌলতের মাধ্যমে পুরস্কৃত করে সমস্ত বস্তুর উপর শ্রেষ্ঠ এবং পদমর্যাদাশীল করে বানিয়েছেন। মূলতঃ মানুষ জাগতিক শাসকের উপযোগী। এজন্য বিজ্ঞগণ মানুষের উপর عالم اصغر সংযোজন করেছেন।

দৈনন্দিন আমল ও ওযীফা

শেখ শিহাবুদ্দীন আহমদ আল বাওনী (রহঃ). আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রঃ) থেকে বর্ণনা করে বলেন যে, অভাবী ব্যক্তি বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবারে রোজা রাখবে। জুমার দিন ভাল করে গোসল করে জুমআর নামাযে যাবার সময় এই দোয়া পড়লে আল্লাহর রহমতে তার প্রয়োজন পুরা হবে। আমলটি পরীক্ষিত:

اللهم انى اسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم الذى لا اله الا ১-১০

هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم واسألك باسمك بسم الرحمن الرحيم الذى لا اله الا هو الحى القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم الذى مرأت عطمته السموات والارض واسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم اللذى لا اله الا هو عنت له الوجوه وخشعت له الابصار ووجلت القلوب من خشية ان تصلى على محمد وعلى آل محمد وان تغطينى مسلتى وتقضى حاجتى وتسميها ان جمتك يا ارحم الراحمين.

ইবাদতে প্রশান্তি ও বিভিন্ন বিষয়ে বরকতের জন্য:

যদি কোন ব্যক্তি জুমার নামাযের পর পাক পবিত্র অবস্থায়:

محمد رسول الله احمد رسول الله ৩৫ বার লিখে নিজের কাছে রেখে দেয় তাহলে আল্লাহ পাক ইবাদত বন্দেগীতে মনোযোগ বৃদ্ধি করবেন এবং সর্বপ্রকার বরকত দান করবেন। আবার শয়তানের ভয় ও ক্ষতি থেকেও রক্ষা পাওয়া যাবে।

নবী করীম (সাঃ) এর দর্শন লাভ:

উল্লিখিত আমল যদি কেউ দৈনিক সূর্য উদিত হওয়ার সময় অনুসন্ধানী নজরে দেখে এর সাথে দরুদ শরীফ পড়তে থাকে তাহলে আল্লাহ তাআলা নবী করীম (সাঃ) এর দীদার নসীব করবেন। এটিও পরীক্ষিত আমল।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ পাককে স্বপ্নে ৯৯ বার দর্শন লাভ করেছেন। তাঁর অন্তরে একটি কথা জাগরুক হল যে, আমি যদি ১০০ বার দেখতে পেতাম তাহলে আল্লাহ তাআলার দরবারে একটি সাওয়াল করতাম। অতএব তার এই শেষ আকাংখাটি পূর্ণ হয়ে গলে তিনি আল্লাহ তাআলাকে বিনম্রভাবে জিজ্ঞেস করেন যে, হে আল্লাহ! তোমার বান্দা কিয়ামত দিবসে কোন জিনিস দ্বারা মুক্তি লাভ করবে? তখন আল্লাহ তাআলা এরশাদ ফরমান, যে ব্যক্তি সকাল সন্ধ্যা তিনবার এই দোয়া পাঠ করবে সে কিয়ামতের দিন নাযাত পাবে।

سبحان الابدى الا بد سبحان الواحد الاحد، سبحان الفرد الصمد سبحان من رفع السماء بغير عمد سبحان من بسط الارض على ماء جمد سبحانه لم يتخذ صاحبته ولا ولد سبحانه لم يلد ولم يولد

ولم يكن له كفوا احد۔

ঈমান রক্ষা :

ইমাম আহমদ (রহঃ) প্রায় সময় বলতেন, যদি কেউ ফজরের নমায এবং সকাল এর মাঝখানে ৪০ বার এই দোয়া পঠ করবে তাহলে যেদিন মানুষের অন্তর মরে যাবে সেদিন আল্লাহ পাক তার অন্তরকে জীবিত রাখবেন।

يا قيوم يا بديع السموات والارض يا ذو الجلال والاكرام يا الله لا اله الا انت اسألك ان تحيى قلبى بنور معرفتك يا ارحم الراحمين

সিররুল আসরার ঈমানের হিফাজতের জন্য হাদীস শরীফের একটি ব্যবস্থা পত্র উল্লেখ আছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন হুজুর (সাঃ) এরশাদ ফরমান যে ব্যক্তি এই ইচ্ছা পোষণ করে যে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামত পর্যন্ত তার ঈমান হিফাজত রাখুন, তাহলে তার এই কাজ করা উচিত যে, প্রতিদিন মাগরিবের সুন্নত আদায়ের পরে দুই রাকাত নামাজ পড়বে। প্রত্যেক রাকাআতে সূরা ফাতেহা এবং সূরাতুল ফালাক এবং সূরাতুন্নাস এবং আবার এই নিয়মে দুই রাকাআত নামায পড়ে সালাম ফিরাবে। তাহলে আল্লাহ পাক তার ঈমানের হিফাজত করবেন। রাবী বলেন ইহা অত্যন্ত উপকারী।

ইমাম নাফসী হাদীছটি দীর্ঘ সনদে বর্ণনা করেন এবং এও বলেন এই সমস্ত সূরার সাথে সূরা ইখলাস এর পূর্বে সূরাতুল ক্বদরও পড়ে নিবে। সালাম ফিরিয়ে ১৫বার سبحان الله পড়ে নীচের দোয়া পড়লে ঈমান বিলুপ্তি থেকে আল্লাহ পাক রক্ষ করবেন। এটিই উত্তম

اللهم انت العالم مااردت بهاتين الركعتين اللهم اجعلهما لى ذخرا يوم لقائك اللهم احفظ دينى فى حياتى وعند مماتى وبعد وفاتى

নেক অভ্যাসসমূহ:

কোন কোন জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তির কাছে এই প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, মানুষের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট অভ্যাস কোনটি। তাঁরা বলেন সর্বোৎকৃষ্ট অভ্যাস হল ধর্ম পরায়নতা। আবার তাদেরকে জিজ্ঞাস করা হয় যে, কোন ব্যক্তি দুটি অভ্যাস একত্রে বানাতে চায়। তাহলে দ্বিতীয়টি কি হবে? জবাবে বললেন ধর্মপরায়নতা

এবং ধন সম্পদ হবে। আবার প্রশ্ন করা হল যদি কেউ তিনটি গুণাগুনের অধিকারী হতে চায়? জবাবে বলা হল ধর্ম পরায়নতা, ধন সম্পদ এবং হায়া শরমের যোগ্যতা থাকা চাই। আবার প্রশ্ন করা হল যদি কেউ ৪টি অভ্যাস বানাতে চায়? তারা উত্তর দিলেন ধর্মপরায়নতা, ধন-সম্পদ লজ্জাশীলতার সাথে সাথে উত্তম চরিত্রও হওয়া চাই। আবার তাকে প্রশ্ন করা হল যদি কারোর পাঁচটি অভ্যাসের ইচ্ছা থাকে? তারা জবাব দিলেন ধর্ম পরায়নতা, ধন-সম্পদ, লজ্জাশীলতা, উত্তম চরিত্রের সাথে দানশীলতা হওয়া উচিত। যদি কারো মধ্যে এই সকল অভ্যাস ও নেক বৈশিষ্ট একত্র হয়ে যায়- তবে সে খোদাভীরু ও ওলীর গুণাগুণ সম্বলিত মানুষে পরিণত হয়ে যায়। অভিশপ্ত শয়তান তাকে ভয় পায়। তিনি তাও বলেন মোমিন ব্যক্তি, ভদ্র, বিনম্রস্বভাব এবং দায়ালু হয়ে থাকে। তাঁরা অভিশাপ দাতা, মিথ্যুক, হিংষুক, ঈর্ষাপরায়ন এবং অহংকারী হয় না। এর সাথে চারিত্রিক পবিত্রতা দুনিয়ার প্রতি অনাগ্রহতা, দাণশীল অন্তর, পরের জন্য একনিষ্ট এবং উপকারী একজন মর্যাদাবান এবং অনন্য ব্যক্তি হয়ে থাকে। তার যবান স্বাধীন এবং সে নিরর্থক সময়ও নষ্ট করে না। সে ভবিষ্যতে শুধু ভাল ভাল কাজ করারই আশা করে এবং অতীত কালের জন্য অনুশোচনা করে । তাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে আল্লাহর স্মরণে মাশগুল রাখে। তার ইচ্ছাকে কখনো ভুলের দিকে পরিচালিত করে না। অনুরূপ সে তার বন্ধুকেও কখনো অগ্রাহ্য করে না এবং অন্য কোন গর্হিত কাজের যোগান দাতা হয় না। শত্রুর অধিকারকেও বিনষ্ট করার চেষ্ট করে না। সে সব সময় অন্যের সাহায্যে লিপ্ত থাকে। অন্যের সাথে সখ্যতা এবং বিপদাপদে, অভাব অনটনে তার ভাইদের সাথে উত্তম আচরণ করে। সুতরাং এ সমস্ত প্রশংসানীয় গুনাবলী এবং একত্ববাদের আকীদায় দৃঢ়তা প্রতিটি মানুষের মধ্যে থাকা আবশ্যক।

ইসমে আযম কোনটি ?

হযরত ইব্রাহীম ইবনে আদহামের সংশ্রবে একজন একত্ববাদী লোক থাকতেন। সে একদিন ইবনে আদহামকে বললেন যে, জনাব আপনি আমাকে একথা বলে দিন যে, ইসমে আজম কি? এর বৈশিষ্ট হল যার উসিলায় দোয়া করলে আল্লাহ্ তাআলা দোয়া কবুল করে পুরস্কৃত করে থাকেন। এমনি ভাবে একে উসিলা করে আল্লাহ তাআলার নিকট কোন কিছু চাইলে তা পাওয়া যায়। তখন ইবনে আদহাম (রহঃ) বললেন তুমি সকাল সন্ধ্যা এই দোয়া পড়লে এবং

এ জন্য কোন ব্যক্তি এর উসিলায় দোয়া করলে আল্লাহ্ পাক তাকে সঠিক হেফাজত ও সংরক্ষণ করে থাকেন। আতংকগ্রস্থ লোকের নিরাপত্তা হয়। এমনিভাবে কোন ব্যক্তি যদি এর উসিলা করে দোয়া করে তবে দ্রুত কবুল করা হয়। দোয়াটি এই:

يـامن له وجه لا يبلى ونور لا يطفى واسم لاينسى وبـاب لا يغلق وستـر لا يهتك وملك ويفنى اسأك واتوسل اليك بجاه محمد صلى الله عليه وسلم ان تقضى حـاجتى وتطينى مسئلتى.

উলামায়ে কেরাম লিখেছেন যে, ইসমে আজমের বৈশিষ্ট হল এর উসিলা করে দোয় করলে কবুল হয়ে থাকে। এরপর যদি আল্লাহ তাআলার নিকট কোন কিছু চাওয়া হয় তাহলে তিনি আশা পূর্ণ করেন। ইসমে আজম হল এই

لااله الا انـت سبـحانك انى كنت من الظالمين. اللهم انى اسئلك بـانـى اشهـد انك انت الله الا احد. اللهم انى اسئلك بان لك الحمد لااله الا انـت الحنان المنان بديع السماوات والارض ياذا الجلال والاكرام. يا حى يا قيوم

ইমাম নববী (রহঃ) এর নিকট কেউ প্রশ্ন করেছিল যে, ইসমে আজম কি? আর তা পবিত্র কোরআনের কোন স্থানে আছে? তিনি বললেন ইসমে আজমের ব্যাপারে অনেক হাদীছ বর্ণিত আছে। অতএব বর্ণনামতে হযরত আবু উমামা (রাঃ) বলেন হুজুর (সাঃ) ইরশাদ ফরমান ইসমে আজম পবিত্র কোরআনের তিনটি সূরাতে উল্লেখিত আছে, সূরা গুলো হলো সূরা বাক্বারাহ, আলে ইমরান এবং সূরা ত্বাহা।

কোন কোন বিদ্যান ব্যক্তি বলেন , সূরা বাকারায় আয়াতুল কুরসী

هو الحى القيوم

অনুরূপ পবিত্র কোরআনের অন্য স্থানেও আছে। যেমন সূরা আলে ইমরানের প্রথমেই এবং সূরা ত্বাহা-র মধ্যে রয়েছে ইসমে আজম

وعنت الوجوه للحى القيوم দোয়া থেকে নিরাশ হওয়া নিষেধ:

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, নিঃসন্দেহে নবী করীম (সাঃ) এরশাদ ফরমান, বান্দার দোয়া (কবুলিয়তের শর্ত পূরনের পর)

কবুল করা হয়ে থাকে যতক্ষণ সে কোন পাপ অথবা হঠকারিতা না করে। আরজ করা হল হে আল্লাহর রসূল (সাঃ) তাড়াহুড়ার অর্থ কি? হুজুর (সাঃ) বললেন দোয়াকারী বার বার বলতে থাকে যে আমি দোয়া করছি অর্থাৎ আমি অধিক দোয়া করি কিন্তু তা আমি কবুল হতে দেখি নাই। অতঃপর সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং দোয়া ছেড়ে দেয়।

যাদের দোয়া কবুল হয়ে থাকে?

কিংকর্তব্য বিমূঢ় এবং অত্যাচারিত ব্যক্তির দোয়া কোন বাধা নিষেধ ছাড়াই কবুল হয়ে থাকে। এতে কোন কাফের অথবা পাপীকে নির্দিষ্ট করা হয় নাই। অর্থাৎ তারাও যদি মজলুম হয় তাদের দোয়াও কবুল হয়। পিতার দোয়া তার ছেলের জন্য, অনুগত ছেলের দোয়া পিতামাতার জন্য কবুল হয়ে থাকে। অন্যায় পরায়ন বাদাশাহ এবং পূণ্যবান লোকের দোয়াও ফিরিয়ে দেয়া হয়না। সফরের সময় মুসাফিরের দোয়া, ইফতারের পূর্বে রোজাদারের দোয়াও কবুল হয়ে থাকে। এমনিভাবে সেই মুসলমানের দোয়াও কবুল হয়ে থাকে যে কারো সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে না অথবা সে কারো উপর কোন অত্যাচার করে না অথবা দোয়া করার পর নৈরাশ্য জনক কোন শব্দ মুখ দিয়ে উচ্চারণ না করে। যেমন আমি দোয়া করি কিন্তু কবুল হয় না।

দোয়া-দরূদ ওজিফা:

ইমাম দামিরী (রহঃ) বলেন আমার শায়খ ইয়াফয়ী (রহঃ) বলেন, যদি কেউ খায়ের বরকতের আকাংখী হয় অথবা প্রয়োজন পূরণ অথবা চিন্তা ভাবনা দূর করতে চায়, অথবা জালেমের জন্য বদ দোয়া করতে চায় তাহলে সে এ আমল করবে। কেউ পবিত্রতার সহিত এশার নামাজের পর এক আসনে বসে يـــالـطيف ১৬৬৪ বার কোন কমবেশী না করে পড়লে ইনশাআল্লাহ এ আমল সবধরনের গোপনীয়তা উম্মুচিত হয়ে যায়। এই আমল করার পন্থা হল পড়তে পড়তে যখন ১২৯ বার পড়বে তখন এখানে তসবীহ পড়া বন্ধ রেখে ১২৯ বার يـالطيف পড়বে ان شـاء الـله এতে তার উদ্দেশ্য হাসিল হবে। কারণ لطيف এর মধ্যে حـرف تهجى এর সংখ্যা ل–ط–ى–ف এর একত্রে ১২৯ হয়। আবার যখন ১২৯ কে ১২৯ দ্বারা গুণ করা হয় তখন হয় -১৬৬৪১। এর পরে নিজের উদ্দেশ্যের নাম করে দোয়া করবে। তাহলে পূর্ণ হবে। কিন্তু খিয়াল রাখতে

হবে যে, যখন ১২৯ বার পড়া হবে তখন এই আয়াতও পড়তে হবে। আয়াত এই: لاتدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير

জীবনে উন্নতি ও রিযিক বৃদ্ধির জন্য:

কেউ উন্নতি-অগ্রগতি ও রিযিকের প্রশস্ততার প্রত্যাশী হলে প্রত্যেক নামাযের পর একশত বার এই আয়াত পড়বে।

لاتدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير

তার পর এই দোয়া :

الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوى العزيز

অন্ধকার থেকে বাঁচার জন্য:

কেউ যদি অন্ধকার থেকে বাঁচতে চায় তাহলে এ দোয়া পড়বে:

لاتدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير

অতঃপর ইসমে আজম পড়বে। সবশেষে এই দোয়া পড়বে

اللهم وسع على رزقى، اللهم عطف على خلقك، اللهم كما صنت وجهى عن السجود لغيرك فصنه عن ذل السوال لغيرك برحمتك يا ارحم الراحمين

বিশেষ বৈশিষ্ট ও ওজীফা:

শেখ আবুল হাসান সাজলী (রহঃ) বলেন, যদি কেউ নিম্নোক্ত প্রশংসনীয় গুণাবলী দ্বারা নিজেকে সৌন্দর্য মন্ডিত করে তাহলে দুনিয়া ও আখেরাতে তার সৌভাগ্য নসীব হবে। কাফেরকে বন্ধু বানাবে না, আর মুমেনকে দুশমন বানাবে না। দুনিয়া থেকে কৃচ্ছতা ও খোদা ভীতি অর্জন করে অবসর গ্রহণ কর। এমনিভাবে দুনিয়াতে সব সময় নিজেকে মৃত্যু বরণকারী মনে কর। আল্লাহ তাআলার একত্ববাদ ও রাসূলের রেসালতের স্বীকৃতি দাও। নিজে নেক আমলের অভ্যাস গড় আর কিছু কিছু জিকিরের কাজও রাখবে। এই দোয়া পড়তে থাকবে।

امنت بالله وملائكته وكتبه ورسله وقالو سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير

বুযুর্গ ব্যক্তি বলেছেন যদি কেউ নিম্নোক্ত প্রশংসনীয় গুণাবলীকে গ্রহণ করে তাহলে আল্লাহ পাক দুনিয়াতে ও আখেরাতে চারটি জিনিসের জিম্মাদারী

নিবেন। জগতে কথা ও কাজে সত্যবাদী আমলে একনিষ্টতা , প্রচুর রিযিক এবং ক্ষতি থেকে বাচার জিম্মাদারী নিবেন। পরকালে বিশেষ মাগফিরাত, আল্লাহর নৈকট্য লাভ, বেহেশতে প্রবেশ এবং উচ্চ মর্যাদা লাভ হবে। কেউ যদি কথা-কর্মে সত্যবাদী হতে চায় তাহলে সূরা কদর যেন নিয়মিত পড়ে। অথবা তার রিযিক আরো বেশী বৃদ্ধি চায় তাহলে সে যেন নিয়মিত বেশি বেশি সূরা ফালাক পড়ে। যদি কেউ দুশমনের দুশমনি থেকে নিরাপদে থাকতে চায় তাহলে সূরা নাস পড়ার যেন অভ্যাস করে।

অগ্রগতি উন্নতি ও রিযিকের জন্য আরো কতিপয় আমলঃ

কেউ তার রিযিকে অগ্রগতি উন্নতি চায় তাহলে সে যেন সূরা ওয়াকিয়া ও সূরা ইয়াসীন নিয়মিত পাঠ করে। যদি ইহা পাঠ করে তাহলে আরো ভাল। ইনশাআল্লাহ তার উন্নতি অগ্রগতি এবং আয় রোজগার বৃষ্টির মত হবে।

بسم الله الرحمن الرحيم الملك الحق المبين وهو نعم المولى ونعم النصير

কেউ যদি বেশী বেশী ইস্তিগফার পড়ে তাহলেও তার রিযিকে উন্নতি অগ্রগতি হবে।

দূশ্চিন্তা ও ভয়-ভীতি থেকে বাঁচার জন্য:

যদি কোন ব্যক্তি কাউকে ভয় পায়, তাহলে এই দোয়া পড়লে ইনশাআল্লাহ ভয়-ভীতি দূর হয়ে যাবে।

اعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقله ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وان يحضرون

অথবা এই দোয়া পড়বে:

توكلت على الحى الذى لا يموت ابدا والحمد لله الذى لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك فى الملك ولم يكن له ولى من الذل وكبره تكبيرا

আসমানের দরজা খোলার জন্য:

কেউ যদি অবগত হতে চায় যে, দোয়া কবুলের জন্য আকাশের দরজা কখন খোলা হয়? তাহলে কলমা শাহাদাতের পর আজানের জবাব দিতে হবে।

এ ব্যাপারে পবিত্র হাদীছে উল্লেখ আছে যে, যখন কোন বিপদাপদ, অথবা মহামারী ইত্যাদি আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয় তখন মোআজ্জিনের আযানের জবাব দেয়া উচিত। তাহলে আল্লাহ পাক মুসীবত থেকে নিরাপদ রাখবেন।

দূশ্চিন্তা থেকে নিরাপদ হওয়ার আমল:

কোন লোক যদি দূশ্চিন্তা ও দূর্ভাবনায় পতিত হয় অথবা ভয়-ভীতি লেগেই থাকে তাহলে এ দোয়া পাঠ করতে থাকলে ইনশাআল্লাহ পাক তাকে এসকল বালা মুসিবত থেকে রক্ষা করবেন।

اللهم انى عبدك وابن عبدك وابن امتك ناصيتى بيدك راض فى حكمك عدل فى قضائك اسئلك بكل اسم سميت به نفسك اوانزلته فى كتابك اوعلمته احدا من خلقك اواستأثرت به فى علم الغيب عندك ان تجعل القرآن ربيع قلبى ونور صدرى وجلاء حزنى وزهاب همى وغمى فيذهب عنك همك وغمك وحزنك۔

রোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার আমল :

কেউ যদি চায় যে, আল্লাহ পাক তাকে নানা প্রকার রোগ থেকে মুক্ত রাখুন। এমনকি সে ছোটখাট পাপ থেকে এবং পাগলামী ইত্যাদি থেকে মুক্তি পেতে চায়, তাহলে এ দোয়া পাঠ করতে থাকবে। তাতে আল্লাহর রহমতে মুক্ত থাকতে পারবে।

لاحول ولا قوة الا بالله العلى العظيم

বিপদাপদে ছাওয়াব অর্জন করার আমল :

কারো যদি ইচ্ছা হয় যে, সে বিপদাপদ ও পরীক্ষায় নিপতিত হওয়ার সাথে সাথে ছাওয়াব দরকার তাহলে সে এই দোয়া পড়ে নিবে-

انا لله وانا اليه راجعون۔ اللهم عندك احتسبت مصيبتى فاجرنى فيها وابدلنى خيرا منها۔

অথবা

حسبنا الله ونعم الوكيل توكلنا على الله وعلى الله توكلنا۔

ঋণ পরিশোধ করতে পারার আমল :

চিন্তা ভাবনা ও ঋণ মুক্তির জন্য এই দোয়া সকাল সন্ধ্যা পড়লে অনেক উপকার হবে। (তবে ঋণ পরিশোধ করার প্রবল ইচ্ছা অন্তরে রাখতে হবে -আল-হাদীছ)

اللهم انى اعوذ بك من الهم والحزن واعوذ بك من العجز والكسل واعوذ بك من الجبن والبخل واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.

চেষ্টা সাধনা:

কারো প্রতি বদনজর (খারাপ দৃষ্টি) দেয়া থেকে বেঁচে থাকলে আল্লাহ্ পাক তার ইবাদত, চেষ্টা সাধনায় ভয়ভীতি ও একাগ্রতার শক্তি দেবেন। অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা থেকে বাঁচিয়ে ইলম ও হিকমতের শক্তি দান করবেন। রাতে (নফল) নামায দিনে রোজা এবং তাহাজ্জুদ পড়ার দ্বারা ইবাদতের স্বাদ পাওয়া যায়। টট্টা-তামাশা ত্যাগ করলে এবং কম হাসালে মর্যাদা, মাহাত্ম এবং খোদায়ী সম্পদে সম্পদশালী হওয়া যায়। দুনিয়ার প্রতি অনাগ্রহ সৃষ্টি করতে পারলে মুহাব্বতে ইলাহীর দৌলতে সম্পদশালী হওয়া যায়। অন্যের দোষ-ত্রুটির অনুসন্ধান থেকে বিমোখতা অবলম্বন করতে পারলে নিজের আত্মাকে বিশুদ্ধ করার ক্ষমতা অর্জিত হয়। এ জন্যই অন্যের ছিদ্রান্বেষণ করা মোনাফিকীরই একটি শাখা। যেমন সুধারণাই ঈমানের শাখা। আল্লাহর সত্ত্বার চিন্তা ভাবনা করলে আল্লাহ ভীতির পুরস্কার পাওয়া যায় এবং মোনাফেকী থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব হয়।

অন্যের প্রতি মন্দ ধারনা থেকে বেছে থাকতে পারলে আল্লাহ্ পাক সর্বপ্রকার বিপদাপদ থেকে রক্ষা করবেন। সাধারণ মানুষ থেকে বিশ্বাস দূর করে একমাত্র আল্লাহ তাআলার উপর নির্ভরশীল হলে সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

চির সুখী হওয়ার জন্য আমল :

প্রতিদিন ৪০ বার لا اله الا انت يا حى يا قيوم পাঠ করলে অন্তর জীবিত হয়। আল্লাহ্ পাক এতে শক্তি দেন। কেউ যদি কামনা করে যে, কিয়ামতের দিন নবী করীম (সাঃ) এর দীদার নসীব হউক, তাহলে সূরা اذا الشمس كورت، اذا السماء انفطرت، اذا السماء انشقت বেশী বেশী পড়তে হবে।

কিয়ামত দিবসে অধিক পিপাসা থেকে মুক্তি :

যদি কোন ব্যক্তি কামনা করে যে, আল্লহ পাক কিয়ামতের দিন অধিক পিপাসা থেকে মুক্ত রাখবেন তাহলে সে যেন বেশী বেশী রোজা রাখে।

কবরের আযাব থেকে মুক্তির জন্য:

কেউ যদি আশা করে যে, আল্লাহ পাক তাকে কবর আযাব তেকে মুক্তি দিন তাহলে সে যেন অপবিত্র ও হারাম বস্তু থেকে মুক্ত থাকে। আর মনচাহী তথা মনের চাহিদামত কাজ যেন ত্যাগ করে। ইনশাআল্লাহ কবর আযাব থেকে মুক্তি পাবে।

প্রশংসনীয় গুণাবলী :

অল্পে তুষ্ট এবং স্বল্প বস্তুতে সন্তুষ্ট মানুষ সম্পদশালী হতে পারে। স্বজাতীর কারো উপকার করলে এবং তাদের সুখ শান্তি দিলে সমস্ত মানুষের চেয়ে ভাল এবং উত্তম বলে বিবেচিত হয়। যদি কেউ ইবাদত বন্দেগীতে অগ্রগামী হতে চায় তাহলে সে হাদীছের উপর আমল করা একান্ত কর্তব্য। হাদীছটির বিস্তারিত হল, জনাব রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ ফরমান, কেউ আমার কাছ থেকে একথা শিখে নেয় এবং এর উপর আমলকারী হয়- অথবা এমন কোন ব্যক্তিকে শিখাবে যে আমল করতে থাকে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন হে আল্লাহর নবী (সাঃ) এভাবে শিখতে চাই। অতএব নবী (সাঃ) আমার হাত ধরে সে পাঁচটি বস্তুর গণনা করে দিলেন। তুমি আল্লাহ তাআলার নিষিদ্ধকৃত বস্তু থেকে অবশ্য বিরত থাকবে। ইনশাআল্লাহ সমস্ত লোক থেকে অধিক বেশী আবেদ ও জাহেদ হয়ে যাবে। আর আল্লাহ পাক তোমার ভাগ্যে যা কিছু লিখেছেন তার উপর সন্তুষ্ট থাক। তাহলেই তুমি সবার চেয়ে বেশী সম্পদশালী ও ধনবান হবে। তোমার পাড়া প্রতিবেশীর সাথেও সৌজন্যমূলক আচরণ করবে, তাহলে তুমি একজন নিখাঁদ মুমিন হয়ে যাবে। তুমি নিজের জন্য যা পছন্দ করবে অপরের জন্যও তা পছন্দ করবে। এ কাজে মানুষ প্রকৃত অর্থে মুসলমান হয়ে যায়। অধিক হাসা-হাসী থেকে বিরত থাকবে। এতে মানুষের অন্তর মরে যায়। তুমি যদি প্রকৃত মানুষ হতে চাও তাহলে আল্লাহর ইবাদত এভাবে করবে যেন কমপক্ষে তুমি আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছ। উত্তম চরিত্রই মানুষকে পূর্ণ ঈমানদার বানিয়ে দেয়।

অন্যের প্রয়োজন পুরন করলে আল্লাহ পাক সে বান্দাকে ভালবাসতে থাকেন। এ জন্য আল্লাহ তাআলা যখন কাউকে ভালবাসতে চান তখন অতি জরুরীভাবে কোন বুযুর্গ লোককে তার দিকে ফিরিয়ে দেন। আল্লাহ তাআলার ফরজ আদায়ের মাধ্যমে মানুষ তাঁর (আল্লাহর) অনুগত বলে বুঝা যায়। অপবিত্র থেকে পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যমে আল্লাহ পাকের সাথে মিলিত হয়ে যায়। পবিত্র জুমা বারে গোসল করার মাধ্যমেও পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হয়। এ ধরনের মানুষ আল্লাহ পাকের সহিত এ অবস্থায় মিলিত হবে যেন তার আর কোন পাপই নেই।

আল্লাহ তাআলার কোন সৃষ্টির উপর জুলুম না করলে হেদায়াতের আলোসহ কিয়ামতের দিন তার হাশর হবে। অন্ধকারে আলো নসীব হবে। অধিক ইস্তেগফারে পাপের বোঝা হালকা হয়। আল্লাহর উপর নির্ভরশীল হওয়ার কারণে আল্লাহ পাক তাকে শক্তিশালী এবং পূর্ণপাক-পবিত্র জীবন কাটালে আল্লাহ পাক রিযিকের মধ্যে প্রশস্থতা দান করেন। সৃষ্টি আল্লাহ তাআলার জন্য রাগ ও ক্রোধকে পৃথক করে দেয়ার কারণে আল্লাহ অসন্তুষ্টি থেকে নিরাপদ হয়ে যায়। হারাম বস্তু থেকে বেঁচে থাকলে এবং সুদ থেকে দূরে থাকলে আল্লাহ পাক দোয়া কবুল করে থাকেন। লজ্জাস্থানের হিফাজত এবং যবানকে নিয়ন্ত্রণে রাখার মাধ্যমে আল্লাহ পাক সৃষ্টির সামনে বদনাম ও অসম্মান থেকে রক্ষা করবেন। মানুষের ত্রুটি বিচ্যুতি গোপন রাখার কারণে আল্লাহ তাআলাও তার ত্রুটি বিচ্যুতি গোপন রাখবেন। এ জন্য আল্লাহ তাআলা দোষ ত্রুটিমুক্ত আর তিনি ত্রুটি গোপনকারীকে পছন্দ করেন। অধিক ইস্তেগফার, বীনিয়, নম্র নিঃসঙ্গতায় পূণ্য করাতে আল্লাহ তাআলা গোনাহ সমূহ ক্ষমা করবেন। নম্রতা, ভদ্রতা এবং উত্তম চরিত্র, বিপদাপদ এবং কষ্ট ক্লেশে ধৈর্যধারণ করার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা অগণিত ছাওয়াব দ্বারা পুরুস্কৃত করেন। হিংসা, কৃপণতা ও চরিত্রহীনতা থেকে বেঁচে থাকতে পারলে আল্লাহ তাআলা বড় বড় পাপ থেকে মুক্ত রাখেন। আত্মীয়তার বন্ধন ঠিক রাখা, দান-খায়রাত গোপনে দেয়ার কারণে আল্লাহ পাকের ক্রোধ এবং গোস্বা থেকে নাজাত পাওয়া যায়।

ঋণ পরিশোধের জন্য আরেকটি আমলঃ

কারো ঋণ যদি পরিশোধের ক্ষমতা না থাকে তাহলে নীচের দোয়া পড়বে। এ দোয়ার বরকতে আল্লাহ তাআলা তাকে ঋণ আদায় করার শক্তি

সামর্থ প্রদান করেন। নবী করীম (সাঃ) এক বেদুইনকে ঋণ পরিশোধের জন্য এ দোয়া শিখিয়ে দিয়েছিলেন- দোয়াটি নিম্নরূপ:

اللهم اكفنى بحلالك عن حرامك واغننى بفضلك عن من سواك

হাদীছে আছে যদি কারো উপর ওহুদ পাহাড় পরিমাণ ঋণ চেপে থাকে তাহলে এই দোয়া পড়লে আল্লাহ তাআলা তা আদায় করতে পারার ব্যবস্থা করে দিবেন। দোয়াটি নিম্ন রূপ:

اللهم فارج الكرب اللهم كاشف الهم اللهم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والاخرة ورحيمهما اسألك ان ترحمنى فارحمنى رحمة تغنينى بها عمن سواك.

বিপদাপদ থেকে বাঁচার আমল:

কেউ যদি বিপদাপদে পতিত হয় তাহলে এই দোয়া পড়লে আল্লাহ পাক তা থেকে মুক্ত করবেন:

بسم الله الرحمن الرحيم لاحول ولاقوة الا بالله العلى العظيم

জালিম সম্প্রদায় থেকে বাঁচার আমল:

হাদীছ শরীফে উল্লেখ আছে কেহ যদি কোন অসভ্য জালিম সম্প্রদায়ের কারণে চিন্তিত হয়ে পড়ে তবে সে এই দোয়া পড়লে ইনশাআল্লাহ তাদের দুষ্টামী থেকে মুক্ত থাকবে। দোয়াটি এই:

اللهم انى نجعلك فى نحورهم ونعوذبك من شرورهم

অথবা

اللهم اكفنا هم كامشئت انك على كل شئ قدير

রাষ্ট্রপরিচালকে ভয় থেকে বাঁচার জন্য:

কেউ যদি কোন বাদশাহ বা প্রেসিডেন্টের কারণে ভীত হয়ে পড়ে তাহলে সেএই দোয়া পড়বে:

لااله الله الحليم الكريم رب السموات السبع ورب العرش العظيم
لا اله الا انت عزجائك وجل ثنائك لا اله الا انت

একটি হাদীছে আছে যদি দয়ামায়াহীন বাদশাহ হয় তার কাছে আসা যাওয়ার ভয় আছে অথবা সে বাদশাহ অত্যাচারী হয় তার নিকট আসা যাওয়ার সময় এই দোয়া পড়বে:

الله اكبر الله اكبر اعز من خلقه جميعا الله اعزمما اخاف واهنه والحمد لله رب العالمين

ইসলামের উপর অবিচল থাকার জন্য:

হাদীছ শরীফে আছে কেউ ধর্মের উপর দৃঢ়পদ থাকতে চায়লে সে এ দোয়া পড়বে:

اللهم ثبت قدمى على دينك

কল্যাণ ও বরকতের আমল:

سوره الم نشرح এবং سوره كافرون নিয়মিত পাঠ করলে আল্লাহ তায়ালা খায়ের বরকত এবং রিযিকে প্রশস্থতা দান করেন।

মানুষের কাছ থেকে দোষ-ত্রুটি গোপনের জন্য:

মানুষের কাছ থেকে নিজ দোষ - ত্রুটি গোপন রাখতে হলে এই দোয়া

اللهم استر نى بسترك الجميل الذى سترته نفسك فلا عين تراك

ক্ষুৎ পিপাসা আয়ত্বে রাখার আমল:

কেহ যদি ক্ষুৎ পিপাসা আয়ত্বে আনতে চায় তাহলে سوره لايلاف قريش নিয়মিত পড়তে হবে। ইহা পরীক্ষিত।

ব্যবসা-বানিজ্যে উন্নতি অগ্রগতির আমল:

ব্যবসা বাণিজ্যে উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য سوره شعراء লিখে দোকানে ঝুলিয়ে দিলে ইনশা'ল্লাহ এতে লাভবান হবে এবং বেচা কেনার জন্য মানুষ বেশী পরিমাণে আসতে থাকবে।

ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার আমল:

দোকানে অথবা কোন কাজে ক্ষতি বা লোকসান হতে থাকলে سورة القصص লিখে ঝুলিয়ে দিলে ইনশাআল্লাহ ক্ষতি এবং ধ্বংস থেকে নিরাপদে থাকবে।

সহজ মৃত্যু এবং নিরাপদের আমল:

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন আমি নবী করীম (সাঃ) কে বলতে শুনেছি, তিনি এরশাদ করেছেন, যে প্রতি ওয়াক্ত নামাযের পর আয়াতুল কুরসি পাঠ করে তার আত্মা আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ বের করবে না (এটি সহজ মৃত্যু এবং নিরাপত্তার দিকে ইঙ্গিত বহন করে) বহযরত আবু নাঈম বলেন আমি হযরত মারুফ আল কারখী (রাঃ) এর কাছে শুনেছি যে, ইহুদীরা যখন হযরত ঈসা (আঃ) কে হত্যা করার জন্য একত্রিত হয় তখন আল্লাহ তাআলা তাঁর সাহায্যার্থে হযরত জিব্রাঈল (আঃ) কে প্রেরণ করেন। তিনি বাহুভ্যান্তরে নিম্নের দোয়া লিখে দিয়েছিলেন: এমন সময় আল্লাহ পাক হযরত জিব্রাইল (আঃ) কে আদেশ করেন যে, আমার বান্দাকে আমার নিকট সযত্নে নিয়ে এসো।

দোয়াটি এই:

اللهم انى اعوذ باسمك الاحد الاعزاوادعوك اللهم باسمك الكبير المتعال اللذى ملاء الاركان كلها ان تكشف عنى ضرما امسيت واصبعت فيه

মাথা ব্যথা উপশমের আমল:

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেন, বনী উমাইয়ার কোন এক গোত্রের লোকেরা রৌপ্যের একটি কৌটা পেয়েছিল। যার উপর লেখা ছিল شفاء من كل داء কিন্তু কোটার ভিতরে নিম্নোক্ত দোয়া লিখা ছিল। কারো যদি তীব্র মাথা ব্যথা হত তাহলে তার আর ডাক্তারের কাছে যেতে হত না। বরং এ দোয়া পাঠ করে দম করলেই তা ভাল হয়ে যেত। দোয়াটি কয়েকবার পরীক্ষা করা হয়েছে।

দোয়াটি এই:

بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وبالله ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم اسكن ايها الوجع سكنتك بالذى يمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه ان الله بالناس لرؤف الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم ، بسم الله وبالله ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم اسكن ايها الوجع سكنتك بالذى يمسك السموات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكها من احد من بعده انه كان حليما غفورا

আরেকটি পরীক্ষিত আমল:

কারো মাথা ব্যথা হলে নিম্নের হরফগুলো সাদা কাগজে লিখে ব্যথা স্থানে চাপ দিয়ে ধরে রাখবে ইনশাআল্লাহ ব্যথা দূর হবে। د م ه م ل ه

কোন কোন আলেম লিখেছেন যে, বনী উমাইয়ার ধনাগারে ৪ কোনা বিশিষ্ট একটি স্বর্ণের ঢাল ছিল এবং এতে কর্পূর, মিশক আম্বর দ্বারা ভরপুর ছিল। এতে হীরা জমরযদ পাথরের বোতাম লাগানো ছিল। কারো তীব্র মাথা ব্যথা হলে ব্যথাস্থানে সে ঢাল রেখে দিলে মাথা ব্যথা দূর হয়ে যেত। একদা লোকেরা সে ঢাল খুলে ফেলে দেখল যে, তাতে লিখা রয়েছে:

بسم الله الرحمن الرحيم ذلك تخفيف من ربكم ورحمة بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا، بسم الله الرحمن الرحيم واذا سالك عبادى عنى فانى قريب اجيب دعوة الداع اذا دعان بسم الله الرحمن الرحيم الم تر الى ربك كيف مد الظل ولوشاء لجعله ساكنا بسم الله الرحمن الرحيم وله ماسكن فى الليل والنهار وهو السميع العليم

আরেকটি আমল:

মাথা ব্যাথা হলে নীচের অক্ষরগুলো কোন তখতায় অথবা পাকা জায়গায় লিখে পেরাক দ্বারা চেপে ধরে এই দোয়া পড়বে

الم تر الى ربك كيف مد الظل ولوشاء لجعله ساكنا وله ما سكن فى الليل والنهار وهو السميع العليم

এটি পড়তে পড়তে যদি মাথা ব্যথা হালকা হয়ে যায় তাহলে পেরেক খুব জোরে চাপ দিয়ে ধরে রাখবে। পূর্ণ উপশম না হলে ২ অক্ষর থেকে অন্য অক্ষরে পেরেক স্থানান্তর করতে থাকবে। ইনশাআল্লাহ ব্যাথা দূর হয়ে যাবে। অক্ষর গুলো হলো ا ح م ا ح ع ح ك ك ا ح কিন্তু চাপ দিয়ে ধরে রাখার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন পেরেকটি আলোতে থাকে।

নীচের কবিতার মাধ্যমে অক্ষরগুলো একত্রে লিখা হয়েছে:

انى حملت اليك كل كريمة☆ حوّراء عن حظ المتيم ماحنت

"তুমি যেভাবে চাইবে সেইভাবে আমি তোমার কাছে সব পবিত্র

জিনিসকে তাবিজ বাঁধার জন্য উপস্থাপন করব”

ناوائل الكلمات منها مقصدى☆ لصداع رأسى يافتى قد جرحت

“হে যুবক আমার উদ্দেশ্য হল এই সমস্ত প্রাথমিক বাক্য সমূহ দ্বারা মাথা ব্যাথা দূরীভূত করা।”

চিকিৎসায় মানুষের উপকার:

হাকিম জালিনুস বলেন মানুষের চুল আগুনে পুড়ে গোলাবজলে মিশ্রি করে নারীর মাথায় রাখলে প্রসব বেদনার সময় সহজে প্রসব হয়ে যাবে।

শরীরে ধবল রোগ বা সাদা দাগ দেখা দিলে মানুষের বীর্য খুব উপকারী মানুষের ধাতু মাটিতে পড়লে এক ধরনের বিষাক্ত পোকার জন্ম হয়। মানুষের মুখের থুথু সাপের জন্য বিষ স্বরূপ। কেউ সাপের মুখে থুথু দিলে সাপটি তৎক্ষণাত মরে যাবে। রাতে যদি প্রবল বাতাস হয় তাহলে মানুষের শরীরের তৈল দিয়ে বাতি জালালে বাতাসের বেগ বন্ধ হয়ে যাবে।

মহিলাদের মাথার লম্বা চুল সমুদ্রে নিক্ষেপ করলে তা সর্পে পরিণত হয়ে যায়। নেশাজাতীয় বস্তুর সাথে মেয়ে লোকের দুধ মিশিয়ে সুরমা বানিয়ে ব্যবহার করলে চোখের সাদা পর্দার জন্য বেশ উপকার হয়। শিশুর চোখ নীল বর্ণ হলে ৪০ দিন পর্যন্ত শিশুটিকে কোন হাবশী রমনীর দুধ পান করালে শিশুর চোখ সাদা হবে। শিশুর প্রস্রাব শুকনা আঙ্গুর গাছের সাথে মিশিয়ে একত্র করে ক্ষতস্থানে রাখলে তা ভাল হয়ে যাবে। ১ বছরের শিশুর দাত গলায় বেধে দিলে মহিলা গর্ভবতী হবে না।

হাকীম জালিনুস বলেন মানুষের পিত বিষাক্ত। কারো চোখ সাদা হয়ে গেলে মানুষের পিত চোখে সুরমা হিসেবে ব্যবহার করলে চোখ ভাল হয়ে যায়।

হাকীম ইবনে মাভীশাহ বলেন কোন নারী লোকের হাতে যদি কোন অসুখ হয় তাহলে শিশুর নাভী (যা প্রথমে কাটা হয়) কেটে হাতে রাখলে ব্যাথা চলে যাবে। নবজাতক শিশুর হাড় হালকা পিষে মুছাব্বরের সাথে মিশিয়ে নাকসির রোগে ব্যবহার করলে (এর শ্বাস টেনে গন্ধ নিলে) উপকার হয়। কারো চোখে যদি ফুল পড়ে তাহলে মানুষের পেট থেকে যে পোকা বের হয় তা পিশে সুরমা হিসেবে ব্যবহার করলে চোখের ফুল পড়া বন্ধ হয়ে যায়। মানুষের

পায়খানা শুকিয়ে হালকা করে পিষে মধু এবং শিরকাতে মিশিয়ে শরীরে কোন স্থান পঁচে গেলে তাতে লাগালে তা ভাল হবে। মানুষের চুল বেধে লটকিয়ে রাখলে অর্ধকপাল ব্যথার জন্য বিরাট উপকার হয়। তাবিজ করে গলায় বাঁধলে হাপানী রোগেরও উপকার হয়।

কুকুরের কামড়ে আঘাত প্রাপ্ত স্থানে মানুষের চুল সিরকাতে ভিজিয়ে লাগালে ভাল হয়ে যায়। মানুষের রক্ত মেথীর আঁটি সাজার (এক প্রকার ঘাস) এর পানিতে মিশিয়ে, রক্ত, পুঁজ এবং মদ্যপদের ক্ষতস্থানে ব্যবহার করলে বেশ উপকার হয়। কোন মেয়ে লোকের হায়েজের এক টুকরা কাপড় নৌকার পেছনের অংশে বেধে দিলে নৌকার ভিতর বাতাস যাবে না।

মেয়ে লোকের নাভীর বেদনা হলে হায়েজের কাপড় পুড়িয়ে সামান্য ছাই এবং ধনিয়া পিষে উভয়টিকে ঠান্ডা পানিতে মিশিয়ে নাভীর চতুর্দিকে প্রলেপ দিলে উপশম হবে। নেফাসের ক্ষেত্রেও এই ঔষধ কার্যকর। ভূমিষ্ট হওয়ার সময় কোন শিশু পায়খানা করলে সে পায়খানা শুকিয়ে চোখের ছানী পড়াতে সুরমা হিসেবে ব্যবহার করলে উপকার হবে।

শিশুদের খতনাহকৃত চামড়া শুকিয়ে পিষে মেশক, গোলাব ইত্যাদিতে মিশিয়ে ধবল কুষ্ট রোগে লাগালে উপশম হবে। উপরোক্ত দুটি রোগে এ ঔষধ ব্যবহারের ফলে থেমে যাবে। কর্তিত চামড়াকে জালিয়ে পিষে ধবল কুষ্ঠ রোগীকে খাওয়ালে সুস্থ হয়ে যায়। শুলবেদনা হলে ছোলা বুট পরিমাণ পায়খানা ঠান্ডা পানির সাথে ভাল করে মিশিয়ে পান করলে উপকার হবে। মানুষের প্রথম পায়খানা বের হলে তা গরম হয়। তা যদি পুরাতন মদের সাথে মিশিয়ে কোন অসুস্থ প্রাণীকে খাওয়ানো হয় তাহলে সুস্থ হয়ে যায়।

উভয় হাত পায়ের ময়লা ধৌত করে ভালবাসার মানুষকে পান করিয়ে দিলে তার সাথে ভালবাসা সৃষ্টি হবে। কারো সাথে ভালবাসা স্থাপন করতে হলে নিজের জামার পকেট ধৌত করে পান করিয়ে দিলে তার সহিত অত্যন্ত ভালবাসা সৃষ্টি হবে। কোন মৃত মানুষের কয়েক বছরের পুরানো মাথার খুলি কোন মিনারে রেখে দিলে সেখানে এত বেশী কবুতর একত্রিত হবে যে, সে মিনারটি সংকীর্ণ হয়ে যাবে। যদি কারো অর্ধাংগ রোগের সম্ভাবনা দেখা দেয় তাহলে কৃষ্ণকায় হাবশী মেয়ের দুধের সাথে ঘি ও পদ্মফুল একত্র করে নাক দ্বারা নস নিলে

ইনশআল্লাহ সুস্থ হয়ে যাবে। তা থেকে ১ রতি পরিমাণ খাবে।

ঘাসের সাথে মাটি খাওয়াতে কোন পশুর পেটে অসুখ হলে কোন নাবালেগ শিশুর প্রশ্রাবের সহিত কাশুম (খাস খাস গাছের ছাল) হালকা করে বেটে পশুকে খাওয়ালে পশু সুস্থ হয়ে যাবে। কোন পুরুষ যদি এ আকাংখা করে যে, অমুক মহিলার সহিত আমি ছাড়া আর অন্য কেহ মেলামেশা করবে না। তাহলে উক্ত মহিলা চিরুনীর চুল অথবা তার অন্য কোন চুল আগুনে পুড়িয়ে ছাই করে সঙ্গমের সময় উক্ত ছাই নারীর লজ্জাস্থানে রেখে সঙ্গম করলে মেয়েটি এমন আরাম বোধ করবে যে, সে আর অন্য কোন পুরুষ তলব কারবে না। এটি পরীক্ষিত পদ্ধতি।

কোন ব্যক্তি যদি বীর্য সামান্য পারদে একত্র করে তিনদিন পর্যন্ত নাক দ্বারা নস টানে তাহলে অর্ধাংগ রোগ ভাল হয়ে যাবে। কোন পশুর চোখ যদি শুভ্র বর্ণের হয়ে যায় তাহলে মানুষের পায়খানাকে (হালকা করে) খনিজ লবন একত্র করে সামান্য চিরতা মিশিয়ে পাতলা করবে। তারপর এই ঔষধ উক্ত প্রাণীর চোখে ফুঁকে ফুঁকে লাগিয়ে দিলে চোখ ভাল হয়ে যাবে। চোখ লাল হয়ে গেলে অথবা চোখ ফুলে বা ফোসকা পড়ে গেলে কোন নাবালেগ শিশুর প্রশ্রাব পাত্রে রেখে গরম করে নিবে। তারপর তুলায় কাঠিতে ভিজিয়ে চোখে রাখলে চোখ ভাল হয়ে যাবে। মানুষের বীর্য গরম হয়ে থাকে। তা কোন ধবল রোগীকে লাগালে তা ভাল হয়। কারো চোখে সাদা ছানি পড়লে প্রশ্রাব কোন তামার পাত্রে রেখে এমনভাবে জ্বাল দিতে থাকবে। কিছুক্ষণ পর তা গাঢ় হয়ে উঠলে একে ঠান্ডা করে খাবার লবন মিশিয়ে পাতলা করে নিবে। তারপর জাফরানের পানির সাথে ঘেটে সোডা মিশিয়ে আগুন জ্বালিয়ে দিবে।এতে করে ঐ পাত্রে রৌপ্যের মত ঘুরতে থাকবে এর পর একে ঢিলা বানিয়ে পানি এবং মেশক ঢেলে পাথরের উপর রেখে দিবে। এরপর একে সুরমা বানিয়ে চোখে লাগালে উপকার হবে। কারো চোখে যদি কোন আঘাত লাগে তবে কোন কাল রঙ্গের নারীর দুধ নিয়ে তাতে জাফরান এবং কমলার রস মিশিয়ে চোখে ফোটন দিলে চোখ ভাল হবে।

নারীর স্তনের বোটাকে ঠিক রাখতে হলে মেয়ে লোকের প্রথম হায়জের রক্ত স্তনের বোটনে মাখলে তা শক্ত থাকবে ঝুলে পড়বে না। হায়েজের খুন গরম ও পাতলা থাকে। কারো চোখে লালিমা দেখাদিলে অথবা ফোসকা পড়ে গেলে

হায়েজের রক্ত কোন কাপড়ে লাগিয়ে চোখে দিলে উপকার হবে। কোন মহিলা মোটা হতে চায়লে মাছরাঙ্গা অথবা হংসীর চর্বিকে সামান্য পাতলা করে সোহাগা এবং কালজিরা ইত্যাদি মেথীর আঁটিতে একত্রিত করে রীঠা পরিমাণ বানিয়ে নিবে। তারপর একটি কাল মোরগকে সাতদিন পর্যন্ত নিয়মিত উক্ত ঔষধ খাওয়াবে। পরে মুরগীটি যবাই করে এর চামড়া ছিলে ফেলে দিয়ে যে কেউ এর গোশত অথবা ঝোল খাবে সেই এমন মোটা হবে যে তাকে দেখলেই মনে হবে যে তার মধ্যে শুধু চর্বি আর চর্বিই আছে। মোটা হওয়ার জন্য এর চেয়ে ভাল একটি ব্যবস্থা হল মানুষের পিত সামান্য আটার সাথে মিশিয়ে পানিতে এমনভাবে ডুবিয়ে রাখবে যেন আটা ফুলে যায়। তারপর একে সাত দিন পর্যন্ত কোন কাল মোরগকে খাওয়াবে। সে মোরগকে জবেহ্ করে যে-ই খাবে সেই আশাতীত মোটা হয়ে যাবে।

কোন মহিলা তার দুধ বন্ধ করতে চায়লে সামান্য মেথী বেটে পানিতে মিশিয়ে স্তনে প্রলেপ দিলে দুধ বন্ধ হয়ে যাবে। কোন মহিলা তার দুধ বৃদ্ধি করতে চায়লে চিরতা (তেঁতো ঔষধ বিশেষ) স্তনে লাগালে আল্লাহর রহমতে দুধ বৃদ্ধি পাবে। এটি পরীক্ষিত। যদি কেউ চায় করে যে, তার একটি সুদর্শন ছেলে হউক তাহলে সে একটি সুন্দর ছেলের ছবি বানিয়ে এমন স্থানে টানিয়ে রাখবে যাতে স্ত্রী সঙ্গম করার সময় তা দেখতে পায়, তাহলে আশা করা যায় ঐ ছবির মতই সন্তান হবে। (আমলটি হতে পারে মনের আবেগই বটে)

হাকীম জালিনুসের মতে, কারো মাড়ির দাঁতে ব্যথা হলে কোন মৃত মানুষের মাড়ির দাঁত গলায় বেঁধে রাখলে ব্যাথা চলে যাবে। মানুষের মাড়ির দাঁত এবং হুদ হুদ পাখীর ডান রানের হাড্ডি একত্র করে কোন ঘুমন্ত মানুষের মাথার নীচে রেখে দিলে সে আর ঘুম থেকে জাগবে না। ঘুমে বিভোর থাকবে। কোন কিছু খাওয়ার পূর্বে পোকা মাকড়ের দংশিত স্থানে মানুষের থুথু লাগিয়ে দিলে উপকার হয়। দাদ মেছতায়ও এটি বেশ উপকারী। মেয়ে লোকের স্তনের দুধ মধুতে মিশিয়ে পান করলে মুত্র থলির পাথর ভেঙ্গে চুরমার যায়। কাউকে পাগলা কুকুর কামড় দিলে ঐ স্থানে থুথু লাগালে উপকার হয়।

কেউ কেউ বলেন কুকুর কর্তৃক কামড় মারা ব্যক্তি যদি সুস্থ মানুষের রক্ত পান করে তাহলে সে সাথে সাথে ভাল হয়ে যায়। যেমন - কোন কবি বলেন

احلامكم لسقام الجهل شافية☆ كما دمائكمن تبرى من الكلب

"তোমাদের নিদ্রা রোগ মুর্খতার জন্য উপকারী এমনিভাবে তোমাদের রক্ত কুকুরের কামড়ের জন্য বেশ উপকারী।

মানুষের পরিত্যক্ত নখ পিষে কাউকে খাইয়ে দিলে সে ভালবাসতে থাকবে। রিষাক্ত প্রাণী কামড় দিলে প্রশ্রাব পান করলে উপকার হয়। আঙ্গুলে কোরী রোগ হলে এর উপর পেশাব করে দিলে বেশ উপকার পাওয়া যায়। পায়ের সমস্ত রোগের জন্য তা আরামদায়ক। কোন ঘা'য়ে যদি পোকা লেগে যায় তাহলে পুরাতন পেশাব এতে লাগিয়ে দিলে এরকম অনেক রোগ দূর হয়ে যায়। মানুষের কামড় অথবা বানরের কামড়েও বেশ উপকার হয়। কারো যদি রক্তঝরা যখম হয়ে যায় তাহলে এতে পেশাব করে দিলে তখনই রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে যাবে। উহা পরীক্ষিত। মানুষের ঘাম চাকতিতে আটা পেশার সময় যে ধুলাবালি হয় তা যদি একত্র করে ফোলা বা ফোসকা পড়া স্তনে প্রলেপ দেয় তাহলে উপকার হবে। বীর্য মধু মেখে টনসিলে লাগিয়ে দিলে ইনশাআল্লাহ ভাল হয়ে যাবে।

কোন ব্যক্তির পায়খানা, প্রশ্রাব বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে ব্যথা আরম্ভ হয় অথবা শোল বেদনা হয় তাহলে কারো পায়খানা এক চনাবুট পরিমাণ নিয়ে মদের সিরকার সাথে মিশিয়ে পান করালে উপকার হয়। যদি পায়খানা গরম হয় তাহলে ঘোড়ার বদহজমী হলে তার উপকার হয়। কারো শরীরের কোথাও কেটে গেলে তাড়াতাড়ি সেখানে তা লাগিয়ে দিলে সত্বর উপকার হয়। কারো কানের ছিদ্র দিয়ে যদি কোন পোকা প্রবেশ করে তাহলে কোন রোজাদার ব্যক্তির লালা ফুটা ফুটা করে কানে দিলে, পোকা বেরিয়ে আসবে। রোজাদারের মুখের লালা চাউলের সাথে মিশিয়ে অর্শ রোগে লাগিয়ে দিলে ভাল হয়। কোন লোকের যদি শোল বেদনার কষ্ট অনুভব হতে থাকে তাহলে কোন শিশুর সামান্য নাভী কেটে আংটির পাথরের নীচে রেখে পরিধান করতে থাকলে আল্লাহর রহমতে শোল বেদনা থাকবে না।

ইমাম ইবনে যোহার বলেন শোল বেদনার জন্য আরো একটি উত্তম ব্যবস্থা হল যে শিশু মায়ের গর্ভ থেকে দাঁত নিয়ে জন্ম গ্রহণ করেছে তার দাঁত যদি স্বর্ণ বা রোপার আংটির পাথরের নীচে রেখে দেয়, শর্ত হল আংটির নগ

(উপরের অংশ) স্বর্ণ বা রোপার হতে হবে তাহলে সে আংটি পরিধানকারীর শোল বেদনা থাকবে না।কোন মহিলা যদি কোন পুরুষের চুল ধোপ দেয় তাহলে উক্ত মহিলার রেহেমের যাবতীয় রোগ দূর হয়ে যাবে। যদি কোন মহিলার প্রথম সন্তান হবার পর নেফাসের রক্ত সারা শরীরে মেখে দেয় তাহলে ঐ মহিলা জীবনেও গর্ভ ধারণ করবে না। এমনিভাবে প্রথম সন্তান জন্মের পর যদি ঐ শিশুর দাঁত থাকে আর সে দাঁত যদি মহিলার আংটির নগের নীচে পরিধান করে তাহলে সেও আর জীবনে গর্ভবতী হবে না। নারীর ঘাম খোস প্যাঁচরার জন্য বিশেষ উপকারী।

মানুষের পেশাব যদি আঙ্গুরের ছাইয়ে মিশিয়ে ক্ষতস্থানে লাগানো হয় তৎক্ষণাত রক্ত বন্ধ হয়ে যাবে। যদি কারো দাঁড়ি না গজায় তাহলে কালজিরা ও শুকনা ঘাসের ছাই পুরাতন যাইতুনের তৈলে মিশিয়ে মালিশ করলে দাঁড়ি গজাবে। কারো শরীরে যদি শ্বেত-ধবল অথবা প্রকাশ্য কোন দাগ থাকে অথবা কাউকে যদি পাগলা কুকুরে কামড় দেয় তাহলে হায়েজের রক্ত উক্ত স্থানসমূহে লাগালে এই তিনটি রোগই দূর হয়ে যাবে।

ইমাম কাজবিনী লিখেছেন, কারো ''নাকছির'' নাক দিয়ে রক্ত পড়া হলে একটি কাপড়ে তার রক্তে নাম লিখে উভয় চোখের সামনে রেখে দিলে রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে যাবে। শরীরে দাদ হলে বা শ্বেতী রোগ হলে কিংবা অন্য যে কোন সাদা দাগ দেখা দিলে মানুষের বীর্য সেখানে লাগিয়ে দিলে উক্ত রোগ দূর হয়ে যাবে। কিন্তু যদি বীর্যের মধ্যে যাহরুল গবীরা (এক প্রকার ফুল) শুকিয়ে একত্রিত করে সে মেয়েকে পান করিয়ে দিলে স্ত্রী তাকে অত্যন্ত ভালবাসবে। প্রথম হায়েজের রক্ত স্তনে মাখলে তার স্তন বড় হবে না।

বন্ধাত্ব পরিচয় করার উপায়:

কতিপয় চিকিৎসাবিদ বলেন, মেয়েদের বন্ধাত্ব পরিচয়ের পন্থা হল, সামান্য তুলাতে একটি রসুন নিয়ে তার লজ্জাস্থানে সাত ঘন্টা রেখে দিলে পরে যদি তার মুখে রসুনের গন্ধ বের হয় তাহলে তার চিকিৎসা ঔষধ দ্বারা করলে সন্তান হবে। কিন্তু যদি কোন গন্ধ না বের হয় তাহলে চিকিৎসার অনপোযোগী মনে করতে হবে। ইমাম রাজির দর্শন মতে এটি পরীক্ষিত আমল।

স্বপ্নের ব্যাখ্যা:

কেউ যদি কোন মানুষ স্বপ্নে দেখে তাহলে দর্শক বাস্তব পক্ষেই সে নির্দিষ্ট ব্যক্তিকেই দেখে। হউক সে নারী কিংবা পুরুষ দর্শক ও দর্শিতের একই নাম তা মতই। কিন্তু আজানা অচেনা লোককে দেখলে বুঝতে হবে সে শত্রু।

স্বপ্নে বৃদ্ধ লোক দেখলে সৌভাগ্যের লক্ষণ। কখনো কখনো বৃদ্ধ লোককে দেখলে বন্ধুত্বের ব্যাখ্যাও দেওয়া হয়। কেউ বৃদ্ধকে দুর্বল দেখা অথবা ছোট মুখের মানুষ দেখা অকল্যাণের আলামত। স্বপ্নে মধ্যবয়সী এমন লোক যার মধ্যে বার্ধক্যের কোন ছাপ নেই চুল দাড়ী সাদা হওয়ারও কোন লক্ষণ নেই এরকম দেখলে সৌভাগ্যের নিদর্শন। স্বপ্নে কেউ বালেগ লোককে দেখা সুবংবাদ এবং শক্তির চিহ্ন। কেউ একটি খুব সুন্দর শিশু দেখলো এই অবস্থায় যে সে এমন শহরে প্রবেশ করছে যে শহরটি অবরোধ করা হয়েছে অথবা এমন শহরে প্রবেশ করছে যেখানে কলেরা অথবা দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে তাহলে এর তাবীর হবে, এই শহরের অবরোধ তুলে নেয়া হবে অথবা কলেরা ও দুর্ভিক্ষ থেকে শহরবাসী মুক্তি পাবে। কেউ স্বপ্নে দেখল যে, শহরে বৃষ্টি হচ্ছে অথবা ভুমি থেকে পানি বের হচ্ছে, এর ব্যাখ্যা হবে, শহরবাসীর নিরাপত্তা আসবে। শহরে কোন ফেরেশতা প্রবেশ করতে দেখা খোশ খবরীর আলামত। কোন অসুস্থ ব্যক্তি স্বপ্নে দেখলো যে, দাঁড়ি-গোঁফ বিহীন এক ছেলে তাকে গ্রেফতার করেছে অথবা দর্শকের ঘাড়ে আক্রমণ করেছে। তাহলে এর ব্যাখ্যা হবে মৃত্যুর ফেরেশতা (আযরাইল) । কেউ লাল হলদে রং এর যুবক স্বপ্নে দেখল। এর ব্যাখ্যা হবে সে কৃপণ, লোভী, দুশমন। স্বপ্নে কেউ তুর্কী যুবক দেখল, এর ব্যাখ্যা হবে যে, সে এমন একজন শত্রু যার হাত থেকে বাঁচার কোন উপায় নেই। কেউ স্বপ্নে এক দূর্বল ও কৃষ্ণকায় যুবক দেখল, এর ব্যাখ্যা হবে সে দুর্বল শত্রু। বাদামী রঙ্গের যুবক দেখলে এর ব্যাখ্যা হবে দর্শকের কোন সম্পদশালী দুশমন হবে। সাদা রঙ্গের যুবক দেখার ব্যাখ্যা হবে সে হবে ধর্মের শত্রু।

রমনীকে স্বপ্নে দেখা:

কোন নারীকে স্বপ্নে দেখার ব্যাখ্যা হবে দুনিয়া। কেউ কোন নারীকে সুন্দরী অবস্থায় দেখল, তার ব্যাখ্যা হবে ভাল জিনিষ আর যদি বদ সূরতে দেখে তাহলে তা খারাপ বস্তু। যেনাকারী মহিলাকে স্বপ্নে দখা কল্যাণ ও মঙ্গলের

লক্ষণ। হুজুর (সাঃ) এরশাদ ফরমান : আমি মে'রাজের রজনীতে এক বৃদ্ধা মহিলাকে দেখলাম যার উভয় হাত ছিল খোলা। নবী (সাঃ) তাকে বললেন আমি তোকে তিন তালাক দিলাম। নবী (সাঃ) এর দেখা মেয়ে লোক দ্বারা উদ্দেশ্য হল দুনিয়া। কেহ স্বপ্নে অন্ধকার রাত দেখলে এর ব্যাখ্যা হল কাল রঙ্গের নারী আর স্বপ্নে দিন দেখলে অর্থ হবে সুন্দরী নারী। কেউ স্বপ্নে দেখল যে, তার সম্মুখে কৃষ্ণ বর্ণের নারী এসে চলে গেল পরবর্তীতে সে আবার সুন্দরী হয়ে আগমন করল। এর ব্যাখ্যা হল অন্ধকার দূরীভূত হয়ে প্রভাতের আলো জেগে উঠবে। কোন বিচারক মহলিাকে দেখলে ব্যাখ্যা হবে কাল রঙ্গের নারী , অত্যাচারী এবং অসভ্যর অবয়বে আসে অথবা সে ঘরের মধ্যে অত্যাচারী হয়ে আসে অথবা সে হারাম মালের অবয়বে আসে।

কোন মেয়ে লোক যদি কোন অচেনা অজানা যুবতী কে স্বপ্নে দেখে তাহলে মূলত দর্শিতা যুবতী দর্শিকা যুবতীর শত্রু। কিন্তু কোন যুবতী মহিলা যদি বৃদ্ধা মহিলাকে স্বপ্নে দেখে তাহলে ব্যাখ্যা হবে সে মহিলার ভাগ্য ভাল সুপ্রসন্ন। আবার কোন কোন সময় নারীকে স্বপ্নে দেখলে সে বছরটি শষ্য শ্যামল ও শান্তিময় হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। এ জন্য যদি কেহ মোটা তাজা নারী লোক স্বপ্নে দেখে তাহলে সে বছরটাই হবে শষ্য শ্যামল শান্তিময়। আর যদি সে হালকা পাতলা হয় তাহলে বছরটি হবে দুর্ভিক্ষের। মেয়ে লোককে বছর দ্বারা এজন্য তুলনা করা হয় যে, মেয়ে লোককে ২টি বস্তু দ্বারা তুলনা করা হয়ে থাকে।

প্রথমত: নারী লোক জমা-জমির ক্ষেতির মত। তাই পবিত্র কুরআনে বলেছেন

نسائكم حرث لكم فاتوا حرثكم ان شئتم (بقرة) (তোমাদের নারী তোমাদের যমীর মতই)

সুতরাং তোমাদের যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে সেখানে কর্ষণ কাজ কর। দ্বিতীয়ত: জমি যেভাবে ফসল উৎপাদন করে নারীও সেবাবে সন্তান জন্ম দেয়। স্বপ্নে যদি কেউ জমি অথবা বোরকা পরিহিতা নারী স্বপ্নে দেখে তাহলে এর ব্যাখ্যা হবে- দর্শক দারিদ্রতায় নিপতিত হবে। কিন্তু কোন মহিলাকে বোরকাহীন দেখলে মূলত তা হল দুনিয়া। নারীরা সাধারণত সুন্দরী এবং সাজ সজ্জাধারিনী হয়। এই জাতীয় মেয়ে লোক স্বপ্নে দেখতে মনোযোগী হলে মূলত দুনিয়ার

প্রতিই মনোযোগী হওয়ার নামান্তর। আর যদি ওদের দিকে মনোযোগী না হয় তাহলে দুনিয়ার দিকে মনোযোগী না হওয়ারই নামান্তর।

স্বপ্নে কেহ খারাপ আকৃতির লোক দেখল তা কঠিন লেনদেনের ইঙ্গিত। আর যদি সে কাল রঙ্গের লোক দেখে তাহলে তা হবে দূর্ভাগ্যের লক্ষণ। যদি কেউ অজানা নপুংসক লোক স্বপ্নে দেখে তাহলে এর ব্যাখ্যা হবে, দর্শিত ব্যক্তি একজন ফেরেশতা এবং দর্শককে তার কামভাব থেকে মুক্ত করার জন্য উক্ত ফেরেশতা দেখা দিয়েছেন। স্বপ্নে যদি কেউ দেখে যে, সে নিজেই নপুংসক হয়ে গিয়েছে অথবা নিজেকে সে দেখল যে, নপুংসকের মত তাহলে ব্যাখ্যা হবে যে, সে অপমানিত ও অসহায় হয়ে পড়বে।

খ্রীষ্টানদের কথা হলো, কোন ব্যক্তি নিজেকেই দেখল যে, সে নপুংসক হয়ে গিয়েছে। তাহলে এর ব্যাখ্যা হবে যে, সে ইবাদত বন্দেগীতে উচ্চ মর্যাদা লাভ করবে। অথবা সে ক্ষমা এবং পবিত্রতার সুসংবাদ পাবে।

কেউ স্বপ্নে দেখল, তার হাতে কারো মাথা রয়েছে, এর ব্যাখ্যা হবে সে লোক একহাজার স্বর্ণ মুদ্রা অথবা ১০০ স্বর্ণ মুদ্রা অথবা ১০০ রৌপ্য মুদ্রা পাবে। যদি কেউ স্বপ্নে কর্তিত মাথা দেখে তাহলে এটি ঘটনার সাথে জড়িত লোকেরই মস্তক হবে। কেউ যদি দেখে, সে কারো মাথা থেকে গোশত খেয়েছে, তার চুল হাতে নিয়েছে তাহলে এর ব্যাখ্যা হবে সে কোন ধনি লোকের কাছ থেকে ধন সম্পদ প্রাপ্ত হবে।

কেউ যদি স্বপ্নে আপন মুখমন্ডল মন্দ দেখে তাহলে ব্যাখ্যা হবে তাকে কোন নেতৃত্ব দেয়া হবে। স্বপ্নে দেখল যে, সে নিজে নিজে তার গর্দান আলাদা করে ফেলেছে। এর ব্যাখ্যা বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। যেমন সে গোলাম হলে আযাদ হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত। চিন্তিত থাকলে তার চিন্তামুক্ত হওয়ার আভাস। অসুস্থ হলে সুস্থতা ফিরে পাবে। সে যদি চাকরীরত কর্মচারী অথবা কর্মকর্তা হয় তাহলে সে তার মালিকের থেকে পৃথক হয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত।

কেউ স্বপ্নে দেখল যে, সে নিজ মাথা পাথর দ্বারা বিখন্ড করছে। এর ব্যাখা হবে, সে এশার নামায ভূলে গিয়েছিল। কেউ স্বপ্ন দেখল যে, তার মুখাবয়ব কুকুরের মত হয়ে গিয়েছে অথবা ঘোড়া অথবা গাধা, উট, খচ্চর ইত্যাদির মত হয়ে গেছে, অথবা দেখল যে, তার চেহারা চতুস্পদ জন্তু অথবা

মহিষের মত হয়ে গিয়েছে যা মানুষের কাজে নিয়োজিত থাকে। তাহলে এর ব্যাখ্যা হবে সে কষ্ট-ক্লেশ থেকে বেঁচে যাবে। এজন্য সমস্ত প্রাণী কস্ট ক্লেশ বহনকারী হয় এবং মানুষের সেবা শূশ্রুষা করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। কেউ স্বপ্নে দেখল যে, তার চেহারা পাখির মত হয়ে গিয়েছে, ব্যাখ্যা হবে, সে অনেক বেশী ভ্রমন করবে। কেউ দেখল যে, তার মাথায় তার হাতে এসেছে এবং তার মাথার স্থানে অন্য কারো মাথা স্থাপন করা হয়েছে তাহলে এর ব্যাখ্যা হবে স্বপ্ন দ্রষ্টা কোন ভূল কাজে সংশোধনের চেষ্টা করবে। কেউ স্বপ্নে দেখল যে, সে এমন এক প্রাণীর কাঁচা গোশত কেয়েছে যার ছবি সে বানাতে পারবে না তাহলে স্বপ্ন দ্রষ্টার হায়াত বৃদ্ধি হবে। স্বপ্নে কারো মুখমন্ডল দেখা অথবা মাথা দেখা মাতব্বরীর আলামত। কেউ দেখল যে, সে কোন মানুষের গোশত খাচ্ছে, তার ব্যাখ্যা হল স্বপ্ন দ্রষ্টা সে ব্যক্তির গীবত করছে। কেউ দেখল যে, সে নিজেকে নিজে খেয়ে ফেলছে, তাহলে এর ব্যাখ্যা হবে, সে চোগলখোর।

কোন কোন স্বপ্ন ব্যাখ্যাতা বলেন, যদি কেউ স্বপ্নে কাঁচা গোশত খেতে দেখে, তবে এর ব্যাখ্যা হবে তার ধন সম্পদে ক্ষতি এবং লোকসান আসবে। স্বপ্নে রান্নাকৃত গোশত খেতে দেখলে এর ব্যাখ্যা হবে তার ধন সম্পদের পরিবর্তন আসবে। যদি কোন মেয়ে লোক স্বপ্নে দেখে যে, সে অন্য একজন মেয়ে লোকের গোশত খেয়ে ফেলছে তাহলে এর ব্যাখ্যা হবে তারা পরস্পরের সঙ্গম করবে। কিন্তু স্বপ্ন দর্শিকা নারী যদি দেখে যে তার গোশত সে নিজেই খাচ্ছে, তাহলে এর ব্যাখ্যা হবে যে, সে ব্যভিচারে লিপ্ত রয়েছে। যদি কেই স্বপ্নে জীর্ন শীর্ণ গাভীর গোশত দেখে তাহলে এর ব্যাখ্যা হবে, সে অসুস্থ হয়ে পড়বে। স্বপ্নে বিভিন্ন প্রকার গোশত ইত্যাদি দেখা বিভিন্ন প্রকার জন্তু জানোয়ারের দিকেই ইঙ্গিত বহন করে। সুতরাং সাপের গোশত দেখার অর্থ হল শত্রুর ধন দৌলত প্রাপ্ত হবে। কিন্তু যদি গোশত কাঁচা দেখে তাহলে গীবত করার দিকেই ইঙ্গিত। কোন হিংস্র জন্তুর গোশত দেখার অর্থ হল কোন বিচারকের পক্ষ থেকে তার ধন-সম্পদ আসবে। স্বপ্নে যদি রক্তক্ষয়ী হিংস্র জন্তু অথবা পাখী এবং শুকরের গোশত দেখে তাহলে হারাম খানা পাবার আলামত।

انسان الماء

(৩২) সমূদ্রের মানুষ

এগুলো জলের মানুষ। স্থলের মানুষের সাদৃশ্য হয়ে থাকে। পার্থক্য এই, জলের মানুষের লেজ আছে। শেখ কাযবিনী বলেন, একদা জলের মানুষ আমাদের বাদশাহ মোকাদ্দার এর যুগে পানি থেকে বের হয়ে এসেছিল। কোন কোন দার্শনিক বলেন রোম সাগরে জলের মানুষ কোন কোন সময় এই ধরনের আকৃতির দেখা দেয়। এদের সাদা দাঁড়িও হয়। মানুষ একে শাইখুল বাহার" বলে থাকে। সুতরাং জনগণ যখন এদেরকে দেখে তখন সে শষ্য-শ্যামলতা ইত্যাদির সুসংবাদ দেয়।

গল্প:

কেউ কেউ বলেন যে, একজন সামুদ্রিক মানুষকে বাদশাহর দরবারে আনা হলে বাদশাহ এদের অবস্থা জানতে চাইলেন। এরপর বাদশাহ জলজ মানুষের সহিত একজন মেয়ে লোককে বিয়ে দিলেন। তাদের ঘরে একটি ছেলে জন্ম নিল। সে তার পিতা-মাতার কথাবার্তা বুঝত। একদা বাদশাহ ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করলেন যে, তোমার পিতা কি বলছেন? ছেলেটি বলল যে, আমার আব্বু বলতেছেন সমস্ত প্রাণীর লেজ হয় তাদের পেছনে কিন্তু আমি দেখি ওদের লেজ মুখের মধ্যে। (এ ব্যাপারে বানাতুল মা-এ আলোচনা হবে)

শরয়ী বিধান:

হযরত লাইস ইবনে সাদ এর কাছে সামুদ্রিক মানুষের ব্যাপারে জিজ্ঞাস করা হলে তিনি বলেন সামুদ্রিক মানুষ কোন অবস্থাতেই খাওয়া জায়েয নয়।

الانقد

(৩৩) সজারু

ن নুন অক্ষরে সাকিন, ق ক্বাফ এবং د দাল অক্ষরে যবর দিয়ে পড়া হয়। অর্থ সজারু।

দৃষ্টান্ত এবং প্রবাদ বাক্য:

আরববাসী বলেন فلان بليل انقد অমুক ব্যক্তি সজারুর মত রাত কাটাল। অর্থাৎ সে শুয়ে কাটায়নি। এ জন্য যে, সজারু সারা রাত ঘুমায় না।

জেগে থাকে। বিস্তারিত باب قاف এ আসবে।

আবুল ফজল আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ময়দানী নিশাপুরী (রহঃ) লিখেছেন انقد - معرفة এর মধ্যে লাম এবং আলিফ আসবে না। এই শব্দটিকে انقذ এ জন্য বলা হয় যে, সে সারা রাত ঘুমায় না, জেগে থাকে। এরকমও কেউ লিখেছেন انقد - نقد থেকে উচ্চারিত হয়েছে এজন্যও একে انقد বলে যে, যার দাঁতে এবং মাড়িতে ব্যাথা হয়। অতএব এমন ব্যক্তি সারা রাত চলাফেরা করে রাত ভর ঘুমায় না।

মাড়রি ব্যথার জন্য তাবিজ:

কারো দাঁতের মাড়িতে ব্যথা হলে, নিচের বাক্যসমূহ লিখে পরিধান করলে ব্যথা দূর হয়ে যাবে। আমলটি পরীক্ষিত

وضرب لنا مثلا ونسى خلقه قال من يحيى العظام وهى رميم قل يحيها الذى ان شأها اول مرة وهو بكل خلق عليم محو صيه سمه ولها ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم جهكر طكفوم طسم طس طسم حم حم حم حم امكن ايها الوجع بالذى سكن له مافى الليل والنهار وهو السميع العليم اليقس تقس قامسقص ن البهر بهر هرا اوراب

মাড়ির ব্যথার জন্য আরেকটি আমল হল যখন মাড়ির ব্যথা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে নীচের অক্ষরগুলো কোন প্রাচীরে লিখে অসুস্থ ব্যক্তিকে বলবে যে তোমার আঙ্গুল মড়িতে রাখ। তারপর একটি পেরেক প্রথম অক্ষরে রেখে আস্তে আস্তে চাপ দিবে। চাপ দেয়ার সময় এই দোয়া পড়বে।

ولوشاء لجعله ساكنا وله ماسكن فى الليل والنهار وهو السميع العليم

আবার পেরেকটি চেপে ধরার সময় জিজ্ঞেস করবে যে, ব্যথা ভাল হয়েছে? যদি বলে ভাল হয়েছে তাহলে পেরেকটি আরো জোরে চাপ দিয়ে ধরবে। কিন্তু যদি বলে এখনো ব্যথা ভাল হয়নি তাহলে পেরেকটি ২য় অক্ষরে চাপ দিবে। এভাবে বলতে থাকবে এবং পেরেকটি অক্ষর পরিবর্তন করে ধরে চাপ দিতে থাকবে। এভাবে সমস্ত অক্ষর শেষ হয়ে যাবে। যে অক্ষরে এসে ব্যথা ভাল হয়েছে সে অক্ষরটিতে পেরেকটি খুব জোরে চাপ দিবে। কোন না কোন অক্ষরে এসে ব্যথা ভাল হবেই ইনশাআল্লাহ। এর সঙ্গে সঙ্গে একথাও খেয়াল

রাখতে হবে যে ع - ح এবং অক্ষরে পেরেকটি ঠিক মাঝ বরাবর ধরবে। অন্যান্য অক্ষরের নীচে পেরেকটি রাখবে। ইহা একটি পরীক্ষিত আমল। অক্ষরগুলো হলো ح . ب . ر . ص . ﻻ . و . ع . م . ﻻ এই পরীক্ষিত আমলটি কোন কোন উলামায়ে কেরাম কবিতা আকারে বলে দিয়েছেন:

وللفرس فاكتب فى الدار مفرقا☆بما جمعه حبر صلاء وعملا

মাড়ির ব্যথার জন্য কোন প্রাচীরে পৃথক পৃথক করে লিখ, যেন আলো অকত্র করে দিল।

ومره على الوجوع يجعل اصبعا☆ وضع انت مسما راعلى الحرف اولا

এরপর যার মাড়িতে ব্যথা হয়েছে সে ব্যথিত স্থানে আঙ্গুল রাখবে। সর্ব প্রথম অক্ষরটিতে পেরেকটি রাখ।

ودق خفيفا ثم سله ترى به☆ سكونا نعم ان قال بلغه موصلا

ধীরে ধীরে পেরেকটি চাপ দাও এবং জিজ্ঞেস কর আরাম পাচ্ছ কি?

وان قال لا فانقله ثانى حرفه☆ وفى كل حرف مثل ماقلت فافعلا

যদি বলে আরাম হয়নি তাহলে পেরেকটি উঠিয়ে দ্বিতীয় অক্ষরে ধরে পূর্বের ন্যায় আমল কর।

وفى سورة الفرقان تقرأ ساكنا☆ كذا اية الانعام فاتل موتلا

সূরা ফুরকানের আয়াত পাঠ কর। অনুরূপ সূরা আনয়ামের আয়াতও পাঠ কর।

وتترك ذاالمسمار فى الحيط مثبتا☆ هدى الدهر فالاسقام تذهب البلا

আর পেরেকের মাথা দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত বৃত্তের মধ্যে উল্লেখিত নিয়মে চেপে ধরে রাখ তাহলে মাড়ির ব্যথা ও অন্যান্য কষ্ট দূর হয়ে যাবে।

فخذها اخى كنز الديك مجربا☆ ذخيرة اهل الفضل مزخيرة الملاء

হে মোর ভাই! আমলটি পরীক্ষিত। এটি সংরক্ষণ কর। তোমার কাছে তা গুপ্ত ভান্ডারের ন্যায় থাকবে।

اصبر اذاناب خطب وانتظر فرجا☆ ياتى به الله بعد الريب والياس

যখন তুমি রাত দিনের বিবর্তনের থাবায় বিমর্ষ হয়ে যাবে তখন তার সে

প্রশস্ততার (সুস্থতার) অপেক্ষা করতে থাক। নিরাশা ও অনির্ভরতার পর আল্লাহ পাক প্রশান্তি দেবেন।

ان اصطبار ابنه العنقود اذ حبست☆ فى ظلمة القار اداها الى الكاس

যদি রাতের আঁধারে প্রতিরোধের সজারো ধৈর্য ধারণ করে। তাহলে তারও আশার পিয়ালা প্রাপ্ত হয়।

من يرزق الصبر نال بغتيه☆ والاحظتة السعود فى الفلك

যে লোক নিজ প্রবৃত্তিকে দমন করতে পারে সে লক্ষ্য অর্জনে সফল হতে পারে। আর তার মাথার উপরে থাকে শুধু উন্নতি আর বিকাশ।

ان اصطبار الزجاج حين بدا☆ للسبك ادناه من فم الملك

বোতল ঢালার সময় যে ধৈর্য ধারন করতে পারল তার ধৈর্যের সুফল হল তাকে বাদশাহর ঠোট পর্যন্ত পৌছে দেয়।

وصاحب لاامل الدهر صحبته☆ يسعى لانفعى ويسعى معى مجتهد

ইহা (মাড়ি) আমাদের এমন এক সাথী যার সান্নিধ্যে থেকে সময়ের কোন আশা করা যায় না। অথচ আমাদের উপকারের নিমিত্তে একজন প্রচেষ্টাকারীর ন্যায় আপ্রাণ চেষ্টা করে।

لم القه مذتصاحبنا غذوقعت☆ عينى عليه افترقنا فرقه الابد

যখন থেকে সে আমার সাথী হল (তখন থেকে) আমি তার সাথে সাক্ষাৎ করিনি। (কিন্তু যখন) আমার দৃষ্টি তার প্রতি পড়ল তখন আমরা উভয়েই চির দিনের জন্য পৃথক হয়ে গেলাম।

الانكليس

(৩৪) বাইঙ্গ মাছ

الانكليس এমন একটি মাছকে বলে যা দেখতে সাপের ন্যায়। এ মাছ নিষিদ্ধ আহার গ্রহণ করে। আরবী ভাষায় এর আরেক নাম হল الجرى এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা باب الجيم এ الجرى তে হবে। এ ধরনের মাছকে مارماهى (সর্প মৎস) বলা হয়। এর আলোচনাও সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ে আসবে)

এ ব্যাপারে বোখারী শরীফে আছে এ মাছের ব্যাপারে অন্য এক হাদীছে এভাবে এসেছে: হযরত আলী (রাঃ) এর হাদীছে উল্লেখ আছে যে, নবী করীম

(সাঃ) হযরত আম্মার (রাঃ) কে বাজারে পাঠলেন। নবী (সাঃ) তাকে বলেদিলেন দেখো সর্প মাছ কিনে এনো না। এই হাদীছ থেকে বুঝা যায় যে, নবী করীম (সাঃ) সর্প মাছ অপছন্দ করতেন। কিন্তু এই হাদীছ দ্বারা এ মাছ হারাম সাব্যস্ত হয় না।

বানান ভেদে শব্দটির দুটি রূপই পাওয়া যায় انكلس ও انقلس (আলিফ ও লাম অক্ষরে যবর কেউ কেউ অবশ্য الف ও لام এ বের পড়েছেন) ইমাম যমখশরী বলেন কোন কোন শব্দ বিশারদ এর অন্য নাম ثعلق (লম্বা কাটা বিশিষ্ট) বলেছেন। ইবনে সাইদাহ বলেছেন এটি এমন এক প্রকার মাছকে বলে যার আকৃতি অন্যান্য সাধারণ মাছের মতই। কিন্তু পার্থক্য শুধু হল মাছটি লেজের নিকট ব্যাংগের মত পা আছে কিন্তু হাত নেই। এ মাছ বসরাহ'র সমুদ্রে পাওয়া যায়।

الانن

(৩৫) পাররার ন্যায় পাখী বিশেষ

হালকা কাল রং এর এক প্রকার পাখী। আবার এই পাখীর গলায় হাসুলীও আছে। পাখীটির উভয় পা-লাল এবং ঠোট কবুতরের ঠোটের ন্যায়। পার্থক্য শুধু এই যে, এ পাখীর ঠোট কাল রং এর। সে আওয়াজ করার সময় আহাজারীর আওয়াজের মত اوه - اوه শব্দ শুনা যায়।

الانيس

(২৬) জলজ পাখী

এই পাখীকে تيرانداز الانيسه বলে। الانيس সেসব পাখীকে বলা হয় যেগুলোর দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। আওয়াজ উটের মত হয়। তার বসবাস সমুদ্র এলাকাতে, যেখানে পানি ও ঘণ বৃক্ষ থাকে। এ পাখীর রং অত্যন্ত চমৎকার এবং চিত্তাকর্ষক হয়ে থাকে। পাখীর বৈশিষ্ট হল বসবাসের জন্য তারা হরেক রকম বাসা বাঁধে।

হাকীম এরিষ্টটল বলেন, এ পাখী অখিল ও কাকের সাথে সঙ্গমের ফলশ্রুতিতে জন্মগ্রহণ করে। এর রং উজ্জ্বল। এই পাখী মানুষের সাথে ভালবাসা রাখে। এর মাঝে শিষ্টচার ও শিক্ষনীয় অনেক কিছু রয়েছে। আওয়াজ হয় আশ্চর্য ধরনের হয়। আবার কোন কোন সময় ঘুঘুর মত মিষ্টি আওয়াজও করে। কখনো

কখানো থেমে থেমে ঘোড়ার মত হ্রেষা ধ্বনিও করে। এই পাখী গোশত এবং নানা জাতীয় ফল খায়।

শরয়ী বিধান:

এ পাখী পবিত্র এবং স্বস্থ্যসম্মত হওয়ার কারণে খাওয়া হালাল। কিন্তু তা আবার হারাম হওয়ারও মাসআলা বের হয়। কারণ সে গোশত খায়। এছাড়া সে অখিল এবং কাকের মিলনে জন্ম গ্রহণ করে।

الانوق

(৩৭) ঈগল

সামান্য কাল রং এর পাখী। মাথায় চটি হয়। অথবা সে পাখীকে বলে যার ঠোট হয় হলদে রং এর। তার মাথায় আদৌ লোম নেই। কোন কোন বিশবজ্ঞ বলেন এই পাখীর চারটি অভ্যাস অত্যন্ত সুন্দর। ১. সে তার ডিমকে তা দেয়। ২. ছানাকে হেফাজত এবং প্রতিপালন করে। ৩. ছানাকে প্রীতি ভালবাসা শিক্ষা দেয়। সবচেয়ে উত্তম অভ্যাস হল। ৪. সে তার স্বামী ব্যতীত অন্য কাউকে তার সহিত মিলনের সুযোগ দেয় না।

দৃষ্টান্ত ও প্রবাদ :

আরবগণ বলেন: ابعد من بيض الانوق ঈগলের ডিমের চেয়ে অনেক দূরে। هو اغرمن بيض الانوق - ঈগলের ডিমের চেয়েও বেশী দূর্লভ। এদুটি উদাহরণ সে বস্তুর জন্য দেয়া হয় যার অর্জনস্থল অসম্ভাব্য। এই জন্য যে, ঈগলের ডিম পর্যন্ত পৌছতে পারে না। কেননা সে পাহাড়ের চূড়ায় এবং দূর্গম স্থানে ডিম পাড়ে। এই সমস্ত জিনিসের কারণে সে বোকাও বটে। যেমন কোন কবি বলেন:

وذات اسمين والالوان شتى ☆ وتحمق وهى كيسة الحويل

নাম তার ২টি, রং তার হরেক। আর সে ঝুলন্ত থলির মত বোকা।

অন্য এক শায়ের বলেন:

وكنت اذا استودعت سراكتمته ☆ كبيض انوق لاينال لها وكر

যে সময় আমি কোন গোপন রহস্যকে গচ্ছিত রাখি তখন প্রকাশ হতে দেয় না। যেমনিভাবে ঈগলের ডিম প্রাপ্তির জন্য তার বাসা পর্যন্ত পৌছা যায় না।

জনৈক লোক হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ) এর কাছে আবেদন করল যে, আপনার মা হিন্দাকে আমার নিকট বিয়ে দিন। হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ) বললেন, ভাই আমার মা'তো এখন বন্ধা হয়ে গিয়েছে। তার বিবাহ ইত্যাদির কোন প্রয়োজন নেই। লোকটি বলল আপনি যদি বিয়ে না দেন তাহলে এর পরিবর্তে আমাকে অমুক ক্রটির অভিভাবক (অনুমতি) বানিয়ে দিন। তখন হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ) এ কবিতা আবৃত্তি করেন-

طلب الابلق العقوق فلما☆ اعجزته اراد بيض الانوق

সে নর উটকে গর্ভবতী বানাতে চায় যা অসম্ভব। হয়ত সে ঈগলের ডিমের অন্বেষণ করছে।

দৃষ্টান্তে পারদর্শী উলামায়ে কেরাম বলেন এই কবিতায় জানার বিষয় হল, লোকটি এমন বিষয়ের আবেদন করল যা ঘটে যাওয়ার স্থানই বটে। লোকটি যখন অকৃতকার্য এবং সম্ভাব্য বস্তু অর্জন করতে নিরাশ হয়ে গেল তখন সে এমন বস্তুর আবেদন করল যাকে নাগাল পাওয়ার অনুমতি দেয়া হল। কিন্তু তাও অর্জন অসম্ভব।

ইমাম দামিরী (রহঃ) বলেন, হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ) এর ব্যাপারে আবেদনকৃত ঘটনা ভুল। কারণ হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ) এর শ্রদ্ধেয়া আম্মা ১৪ হিঃ ইন্তেকাল করেছেন। যে বছর হযরত আবুবকর (রাঃ) এর শ্রদ্ধেয় আব্বাজন আবু কাহাফা এর ইন্তেকালের দুর্ঘটনা ঘটেছিল। এ জন্য যে পর্যন্ত এ দৃষ্টান্তের সম্পর্ক আছে তা সে প্রবাদের শেষ পর্যন্ত তা সঠিক মনে হয়। যাকে ঐতিহাসিক ইবনে আছীর (রহঃ) নেহায়াতে উল্লেখ করেছেন। ঘটনাটি নিম্নরূপ:-

জনৈক লোক হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ) এর কাছে আবেদন করল যে, জনাব, আপনি আমার অংশ নির্ধারণ করে দিন। তখন মোয়াবিয়া (রাঃ) বললেন ঠিক আছে। আবার লোকটি বলল আমার ছেলের প্রতিও লক্ষ্য রাখুন। তিনি (রাঃ) বলেন অসম্ভব। আবার লোকটি বলল আমার বংশধরদের জন্য হওয়া চাই। হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ) নেতিবাচক জবাব দিলেন। এর পর হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ) প্রবাদ হিসেবে একটি কবিতা আবৃত্তি করেন-

طلب الابلق العقوق فلما☆ اعجزته اراد بيض الانوق

সে নর উটকে গর্ভবতী বানাতে চায় কিন্তু যখন তাহল না, তখন সে

আবার ঈগলের ডিমের আকাংখী হল।

العقوق গর্ভবতী উটকে বলে। ابلق পুরুষ উটকে বলা হয়। আর পুরুষ উট কখনো গর্ভবতী হয় না সেটা অসম্ভব। এরপর তিনি বলেন সে নর উটের গর্ভ কামনা করে। بيض الانوق (ঈগলের ডিম) এই দৃষ্টান্ত অর্জনে অনোপযুক্ত এবং অসংশ্লিষ্ট বস্তুর আবেদন এর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

আল্লামা ইমাম সুহাইলী আওয়াইলর রাওযীতে বর্ণনা করেছেন الانوق পুরুষ ঈগলকে বলে। সুতরাং এভাবে দৃষ্টান্ত ارادبيض الانوق (অমুক ব্যক্তি ঈগলের ডিম অন্বেষণ করল) এজন্য ব্যবহার করা হয় যা অর্জন করা অসম্ভব। কারণ ঈগল পাখী পাহাড়ের চূড়ায় এমন স্থানে ডিম পাড়ে যেখান থেকে ডিম অর্জন আদৌ সম্ভব নয়। একেই আবুল আব্বাস মুহাম্মদ বিন ইয়াযিদ ইবনে আব্দুল আকবার শিমালী ''কামিল'' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ইমাম সুহাইলী (রহঃ) এ কথার উপর অস্বীকৃতির মনোভাব পোষণ করে। ইমাম খলীল ইবনে আহমদ আল বসরী নাহবী এর কথাও বর্ণনা করেছেন। খলীল নাহবী বলেন الانوق পুরুষ ঈগলকে বলে। আর এ অর্থই অধিকতর মনোপুত। কারণ নর কখনো ডিম পাড়ে না। সুতরাং যে ব্যক্তি ঈগলের ডিমের অন্বেষণকারী হয় সে অসম্ভবকে অর্জন করতে সময় ব্যায় করে। তখন তা এমনই হয়ে যায়। যেমন কোন ব্যক্তি গর্ভবতী নর উটকে পাওয়ার ইচ্ছা করল।

ইসমাঈল আলক্বালী আল বাগদাদী (৯০১-৯৬৭) লিখেছেন الانوق এর ব্যবহার عقاب হয়। নর-নারী উভয়ের উপরই বর্তায়। (عقاب এবং امالى এর শরয়ী হুকুম باب الراء এর আসবে)

ইমাম সুহাইলী (রহঃ) এর জীবনী:

ইমাম সুহাইলীর পূর্ণ নাম, আব্দুর রহমান ইবনে সুহাইল আল খাসয়ামী। তিনি সুপ্রসিদ্ধ ইমাম এবং অত্যন্ত সম্মানিত আলেম ছিলেন।

ইমাম আবু খাত্তাব ইবনে দাহিয়া বলেন, আমাকে ইমাম সুহাইলী কয়েকটি কবিতা শুনিয়েছেন। তিনি বলেছেন এই কবিতার উসিলায় যদি কেউ আল্লাহর কাছে দোয়া করে তাহলে আল্লাহ তাআলা অবশ্যই কবুল করেন। আর 'য় তাও আল্লাহ পাক দান করেন। কবিতা গুলো নিম্নরূপ:

يامن يرى مافى الضمير ويسمع ☆ انت المحلد لكل ما يتوقع

হে মহান সত্তা যিনি অন্তরের কথাও দেখেন, শুনেন আপনিই সে অস্তিত্ব যা কাংখিত বস্তুকে দান করে থাকেন।

يا من يرجى للشدائد كلها☆ يامن اليه المشتكى والمفزع

হে ঐ সত্ত্বা যার থেকে পিদাপদ, কষ্ট, ক্লেশে ভরসা পাওয়া যায়, হে ঐ সত্ত্বা যার দরবারে ভীত সন্ত্রস্ত ও পেরেশান অবস্থায় মুক্তি পাওয়া যায়।

يامن خزائن رزقه فى قول كن☆ امنن فان الخير عنك اجمع

হে সে সত্ত্বা যা كـــــن কথার মাধ্যে খাদ্য ভান্ডার প্রস্তুত আছে আপনি করুণার ব্যবস্থা করেছেন, এ জন্য যাবতীয় মঙ্গল আপনার নিকটই বিদ্যমান আছে।

مالى سوى فقرى اليك وسيلة☆ فبالافتفار اليك فقرى ارفع

দারিদ্রতা এবং উপোস ব্যতীত আপনার খেদমতে আমার কোন ওসীলা নেই, তাই আমি আমার দারিদ্রতা ও ক্ষুৎ পিপাসা আপনার প্রতি মুখাপেক্ষীতার মাধ্যমে দূর করি।

مالى سوى قرعى لبابك حيلة☆ فلئن رددت فاى باب اقرع

আপনার দরবারে আমার খটখট আওয়াজ করা ব্যতীত আর কোন উপায় নাই। আপনি যদি ফিরিয়ে দেন তাহলে কার দরবারে আওয়াজ করব?

ومن الذى ادعو واهتف باسمه☆ ان كان فضلك عن فقيرك يمنع

হে সত্ত্বা যার নাম নিয়ে আমি ডাকি এবং আওয়াজ করি, আপনার অনুকম্পা আমার মুখাপেক্ষীতার বহু উর্ধ্বে।

حاشا لجودك ان تقنط عاصيا☆ فالفضل اجزل والمواهب اوسع

পবিত্রতা বর্ণনা করছি আপনার অনুগ্রহ ও দানের যদি কোন পাপীকে নিরাশ করে দেয় তবে আপনার দয়া অনুকম্পা অনেক। আপনার নিয়ামত প্রশস্ত (আপনার দান হতে যদি কোন পাপী নিরাশ হয়ে যায় তবে আল্লাহর পানাই চাই।)

الاوزة

(৩৮) বড় হাঁস বা জল কুক্কুট (মাছরাঙ্গ, ভোঁদড়)

الف এ যের এবং واو এ যবর পড়তে হবে। অর্থাৎ জল কুক্কুট বা রাজ হাস। এক বচনের জন্য اوزة এবং বহুবচন نون ও واو এর সংমিশ্রনে اوزون আসে। আবু নাওয়াস এর পরিচয়ে বলে-

كانما يصنون من ملاعق ☆ صررة الاقدم فى المهارق

আবু নাওয়াস সম্পর্কে কিছু কথা:

আবু নাওয়াস আব্বাসীয় যুগের একজন যবরদস্ত কবি। তাঁর ব্যাপারে বিস্ময়কর ও চিত্তাকর্ষক ঘটনা প্রসিদ্ধ আছে। তিনি মাদক দ্রব্যের ব্যাপারেও ভাল ভাল কবিতা লিখেছেন। তার নাম আল হাসান ইবনে হানী ইবনে আব্দুল আউয়াল।

ইতিহাসবিদ ইবনে খাল্লেকান লিখেছেন মামুন আবু নাওয়াস দুনিয়ার ব্যাপারে এমন আশ্চর্য ও বিরল কবিতা গেয়ছেন যা দুনিয়া নিজেও বলতে পারেনি।

الاكل حتى هالك وابن هالك ☆ وذو نسب فى الهالكين عريق

স্মরণ রেখ প্রত্যেক প্রাণীই ধ্বংসশীল এবং মৃত্যু বরণকারীর সন্তান। পিতৃমাতৃকুল বংশ মৃত্যু বরণকারীর মধ্যে অধিক সম্মানী।

اذا امتحن الدنيا لبيب تكشف ☆ له عن عدو فى ثياب صديق

যখন কোন বুদ্ধিমান লোক দুনিয়াকে পরীক্ষা করে তবে তার নিকট বন্ধবেশী দুশমনের মূল অবস্থা প্রকাশ হয়ে পড়ে।

আল মামুন বলেছেন যে ব্যক্তি গভীর অর্থবোধক ও দুস্প্রাপ্য ধরনের কবিতা বলে সে আবু নাওয়াস ব্যতীত আর কে হতে পারে? আবু নাওয়াস আল্লাহ তাআলার সাথে কতটুকু সম্পর্ক রাখেন তার নমূনা স্বরূপ কয়েকটি কবিতা উল্লেখ করা যায়:

تكثر مااستطعت من الخطايا ☆ فانك بالغ ربا غفورا

খুশিমত তুমি অগনিত পাপ করেছো, তবে (জেনে রাখ) তুমি (নিরাশ হয়োনা) ক্ষমাশীল আল্লাহর নিকট পৌঁছে যাবে।

ستبصران وردت عليه عفوا☆ وتلقى سيدا ملكا كبيرا

যদি তুমি তার দরজায় পৌঁছে যাও তবে শীঘ্রই ক্ষমা ও সম্মানের উপস্থিত (নিজেকে) করলে। আর মহান দয়ালু বাদশাহর এর সাথে সাক্ষাত করবে।

تعض ندامة كفيك مما☆ تركت مخافة النار الشَرورا

আপন হাতে অনুতাপকে পিষে দিবে সে সমস্ত নিন্দনীয় বস্তুর কারণে যা তুমি জাহান্নামের কারছে ছেড়েছ।

মোহাম্মদ বিন নাফে লেখেন, আবু নাওয়াসের ইন্তিকলান্তে আমি স্বপ্নে ডাকতে দেখলাম। হে আবু নাওয়াস! তিনি বললেন ইহা উপনামে ডাকার সময় নয়। আমি বললাম ঠিক আছে হে আল হাসান ইবনে হানী। তিনি উত্তর দিলেন বলুন কি বলতে চান? আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম আল্লাহ তাআলা আপনার সথে কি রূপ ব্যবহার করেছেন? তিনি বললেন আল্লাহ পাক আমাকে মৃত্যুর পূর্বে রচিত কবিতাগুলোর কারণে ক্ষমা করে দিয়েছেন। কবিতাগুলো আমার বালিশের নীচে রক্ষিত আছে। মুহাম্মদ বিন নাফে বলেন আমি স্বপ্ন থেকে জাগ্রত হলাম এবং সোজা তার বাড়ীতে চলে এসে ঘরের মানুষদেরকে বললাম ভাই, মৃত্যুর পূর্বে আবু নাওয়াস কিছু কবিতা রচনা করেছিলেন সেগুলো কোথায়? ঘরের লোকেরা বলল আমরা তো জানি না। তবে এটুকু মনে পড়ে যে, সে সময় তিনি কলম-কাগজ হারিয়ে ফেলেন এবং কিছু লিখা ছিল। কিন্তু কোথায় আছে তা আমাদের জানা নেই। মুহাম্মদ বিন নাফে বলেন, তা জানার পর আমি ঘরে গেলাম এবং তার বালিশ উঠিয়ে দেখলাম কাগজের একটি অংশে নিম্নের কবিতাগুলো লিপিবদ্ধ আছে।

يارب ان عظمت ذنوبى كثرة☆ فلقد علمت بان عفوك اعظر

হে আল্লাহ! আমার পাপ যদিও অধিক কিন্তু আমি জানি আপনার তার চেয়েও অধিক।

لان كان لايرجوك الامحسن☆ فمن ذالذى يدعو ويرجو الجرم

আপনার নিকট যদি শুধু পূণ্যবানরাই আশা করে তবে সে কোন সত্ত্বা আছে যে পাপীরা তার নিকট আশা করে দোয়া করবে?

ادعو رب كما امرت تضرعا☆ فاذا رددت يدى فمن ذير حم

পরওয়ারদিগার! তোমার হুকুম অনুযায়ী বিনীত হয়ে দোয়া করছি যদি তুমি ফিরিয়ে দাও তবে কে দয়া করবে?

مالى اليك وسيلة الا الرجال☆ وجميل عفوك ثم انى مسلم

আপনার কাছ পর্যন্ত পৌছার জন্য আপনার অনুগ্রহ ছাড়া আর কোনই মাধ্যম নেই তার পরেও আমি আত্মসমর্পণকারী।

আবু নাওয়াস এর জীবদ্দসায় কাছে তার বংশ পরিচয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন আমার চরিত্র আমার বংশধর থেকে অনেক দূরে। তার ইন্তেকাল ১৯৪ হিঃতে হয়।

রাজ হাসের কতিপয় বৈশিষ্ট:

হাঁস ভাল সাতার কাটতে জানে। ছানা ডিম থেকে বের হয়েই সাতার কাটতে পারে। সে ডিম দেয়ার নর হাঁস সামান্য সময়ের জন্যও তার কাছ থেকে পৃথক হয় না। পূর্ণ একমাস শেষে ডিম থেকে ছানা বের হয়ে আসে।

হাসান বিন কছির তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, (তার পিতা হযরত আলী (রাঃ) এর খেলাফত পেয়েছেন) একদিন হযরত আলী (রাঃ) ফজরের নামায আদায় করতে বের হচ্ছিলেন। তিনি দেখলেন যে, একটি হাস নিজ চেহারাতে থাপ্পর মারছে। তিনি বললেন তাকে তার অবস্থায় ছেড়ে দাও। কারণ সে বিলাপ করছে। তিনি যখন সামনে অগ্রসর হলেন তখন ইবনুল মুলজিম তাঁর এর উপর আক্রমণ করে বসে। আমার পিতা বলেন, আমি যখন হযরত আলী (রাঃ) কে বললাম, হে আমীরুল মূ'মিনীন! আমাকে এবং সে هـــرادى (ইবনে মুলজিম هـرادى গোত্রের লোক ছিলেন) কে ছেড়ে দিয়ে প্রতিশোধ নিন। আপনি সামনে আসবেন না। فلا تقم لهم ثاغية☆ ولا لاغية ابدا তাদের জন্য কোন বকরী ও দাঁড়াবে না আর না কোন উট অর্থাৎ এদের কোন সাহায্যকারী হবে না।

হযরত আলী (রাঃ) বললেন. তোমরা এই আশা পোষণ করো না, তবে একে বন্দী কর। আমি যদি মৃত্যুবরণ করি তবে একে হত্যা করো আর তা না হলে আঘাতের বিনিময় আঘাতের মাধ্যমে কর। (احمد)

হযরত আলী (রাঃ) এর শাহাদাত বরণ:

ইতিহাসবিদ ইবনে খাল্লিকান লিখেছেন, একদা কয়েকজন খারেজী লোক সমবেত হয়ে আসহাবে রাহওয়ানদের ব্যাপারে আলোচনা করতে লাগল যে, তারা উপস্থিত হয়ে যাবার পর আমরা জীবিত থেকে কি করব? সুতরাং আব্দুর রহমান ইবনে মুলজিম, আল বরক ইবনে আব্দুল্লাহ, আমর ইবনে বকর আত তামিমী এই তিনজনে পরস্পর অঙ্গকার করল যে, একই তারিখে এই সকল মহাপুরুষদেরকে হত্যা করতে হবে।

বদনসীব আব্দুর রহমান ইবনে মুলজিম বলল আমি একাই আলীর (রাঃ) জন্য যথেষ্ট। একাই কাজ সম্পন্ন করতে পারব। আল-বরক ইবনে আব্দুল্লাহ বলল, আমি একাই মোয়াবিয়ার জন্য যথেষ্ট। আমার বিন বকর বলল আমিও আমর বিন আস এর কাছ থেকে প্রতিশোধ নিতে একাই যথেষ্ট।

তারা নিজ নিজ তরবারী হাতে উঁচিয়ে ১৩ই রমজান আক্রমন করতে একমত হল। আব্দুর রহমান ইবনে মুলজিম এই হীন উদ্দেশ্যে কুফাতে এলো। অকস্মাত ক্বাতাম নামে এক মহিলার সাথে তার দেখা হলো। যার পিতা ও ভাই নাহরাওয়ানের দিন হযরত আলী (রাঃ) এর হাতে নিহত হয়েছিল। মুলজিম সে নারীকে বলল আমি তোমাকে বিয়ে করতে ইচ্ছুক। মেয়েটি বলল আমি রাজী, তবে কয়েকটি শর্তে আছে। তা হল মহর হবে তিন হাজার দিরহাম। খাদেম হিসেবে একটি ছোট গোলাম ও হযরত আলী (রাঃ)কে হত্যা করতে হবে। এ হলো আমার শর্ত। যদি মেনে নাও তবে আমি রাজী অন্যথায় নয়। ইবনে মুলজিম বলল আমি কিভাবে হযরত আলীকে হত্যা করব? এটুকু শক্তিতো আমার নেই। মেয়টি বলল ধোকা দিয়ে হত্যা করবে। যদি তুমি তাকে হত্যা করতে পার এবং তুমি বেচে যাও তবে সাধারণ জনগণ কে তার ক্ষতি থেকে তুমি মুক্তি দিতে পারবে। তোমার পরিবার পরিজন নিয়েও তুমি শান্তিতে বসবাস করতে পারবে। যদি তুমি নিহত হও তাহলে বেহেশতে প্রবেশ করবে। তুমি তো এমন স্থান পেয়ে যাবে যেখানের নিয়ামত রাজি কখনো শেষ হবার নয়। আর তুমি এরকম স্থানেরই আকাংখী। এতে ইবনে মুলজিম বলল আমিতো এ উদ্দেশ্যেই কুফা শহরে আগমন করেছি। একথা বলেই ইবনে মুলজিম হত্যার উদ্দেশ্যে দরজার সম্মুখে উৎপেতে বসে থাকল। যে স্থান দিয়ে হযরত আলী (রাঃ) নামাযে গমন

করতেন। হযরত আলী (রাঃ) যখন ফজরের নামায আদায় করতে আসতেছিলেন সে (মুলজিম) সুযোগ বুঝে প্রকাশ্যে আক্রমণ করে বসল।

হযরত আলী (রাঃ) বললেন কাবার রবের কসম আমিত সফল হয়ে গেছি। তোমরা একে বন্দী করো। একথা শুনে ইবনে মুলজিম মানুষের উপরও আক্রমণ করে বসল। লোকেরা তাকে ছেড়ে দিল। এমন সময় মুগীরা ইবনে নোওফল ইবনে হারছ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব একটি চাদরের ফাঁসে তাকে বন্দী করে মাটিতে ফেলে দিল এবং তার বুকের উপর চড়ে বসলেন। ওলামায়ে কেরাম বলেন, এ ঘটনার পর হযরত আলী (রাঃ) শুক্র, শনি দু'দিন জীবিত ছিলেন। এরপর তার প্রাণকে আল্লাহর হাতে সপে দিলেন। انا لله وانا اليه راجعون পরবর্তীতে হাসান ইবনে আলী (রাঃ) ইবনে মুলজিমকে হত্যা করে ফেলেন। জনগণ যখন তা জ্ঞাত হওয়ার পর একত্রিত হয়ে ইবনে মুলজিমের মরদেহ মাটিতে মিশিয়ে ফেলল।

খারেজী আল বরক ইবনে আব্দুল্লাহ তার মিশনে গেল। সে হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ) উপর আক্রমণ করল বটে কিন্তু কার্যকর আঘাত লাগেনি। তার পাছায় আঘাত লাগে। হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ) এর ব্যাপারে ঐতিহাসিকগণ বলেন তার পাছা ছিল বড় তাই তার প্রজনন রগ কেটে যায়। এর প্রভাবে পরবর্তীতে তার কোন সন্তান হয়নি। হত্যাকারী আল বরক বিন আব্দুল্লাহকে গ্রেফতার করা হলে তাকে বলা হয়েছিল তোমার জন্য নিরাপত্তা এবং সুসংবাদ। এই রাতেই হযরত আলী (রাঃ) এর উপর আক্রমণ করা হয়েছিল শেষ পর্যন্ত এই সুসংবাদ চতুর্দিকে প্রচার হয়ে গেল। হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ) তাঁর হত্যাকারীর হাত পা দেহ থেকে পৃথক করে ছেড়ে দিলেন। পরে জানা যায় যে, সে বসরার চলে গেছে এবং সেখানেই বাসিন্দা হয়। কিছু দিন পর যিয়াদ বিন উবাইয়াহ (মোয়াবিয়া (রাঃ) এর যুদ্ধে তিনি ইরাকের প্রতিনিধি ছিলেন) সংবাদ পেলেন যে, সে হত্যাকারীর সন্তান হয়েছে। তা শুনে তিনি তাকে হত্যা করে। তাঁর অভিমত ছিল "এই কমবখত -এর সন্তান হবে আর আমিরুল মু'মিনীনের সন্তান হবে না তা হতে দেয়া যায় না।"

হযরত মায়াবিয়া (রাঃ) একথার উপর তার জন্য একটি বিশাল মহল নির্মানের আদেশ করেন। (বর্ণনাটি গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না)

সে খারেজীদের তৃতীয় আমর বিন বকর আততামিমী আমর বিন আসের ঘাতক ছিল। কিন্তু আক্রমণ করার পরিকল্পিত সময়ে তাঁর (আমরের) পেট ব্যথা আরম্ভ হলে তিনি ঐ দিন মসজিদে যেতে পারেন নি। তার অনুপস্থিতি বনুসাহাম গোত্রের খারেজা নামে এক লোক ইমামতি করেন। আমর বিন বকর তার উপরই মারাত্মক আক্রমণ করে বসে। যার ফলশ্রুতিতে তার জীবন বাতি নিভে যায়। হত্যাকারীকে গ্রেফতার করা হয়। তাকে পাকড়াও করে যখন আমর বিন আস (রাঃ) এর কাছে নীত হল তখন উপস্থিত জনতা হত্যাকারীর কাছে প্রশ্ন করল যা হযরত আমর বিন আস এর দরবারে খেলাফতের সূচনার উপর কথা বলছিল।

প্রশ্ন ছিল যে, তুমি কি আমর বিন আসকে হত্যা করেছ? সে বলল না বরং আমি খারিজাহ নামে এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছি। এমন সময় হযরত আমর বিন আস (রাঃ) বললেন তুমিতো আমর বিন আসকে হত্যা করতে চেয়েছিলে কিন্তু আল্লাহ তাআলা খারেজার ইচ্ছা করলেন। এর পর আমার বিন আস তাকে হত্যা করে ফেলেন। বলা হয়ে থাকে যে, যখনই হযরত আলী (রাঃ) এর হত্যাকরী আব্দুর রহমান ইবনে মুলজিমকে দেখেন তখন তিনি আলী আমর বিন মা'দী কারুবা এর কবিতা দ্বারা উপমা দিয়ে বলেন

اريد حياته ويريد قتلى ☆ عزيزك من خليلك من مراد

আমি তার জীবন চাই আর সে আমাকে হত্যা করতে চায়। তোমাদের বিশ্বাস ঘাতক বন্ধু মুযার গোত্রের লোক।

কেউ কেউ বলেন হযরত আলী (রাঃ) কে তাও বলা হয়েছিল আপনার এই কবিতা দ্বারা বুঝা যায় যে, আপনি ইবনে মুলজিমকে পূর্ব থেকে জানতেন। এবং তার ইচ্ছা সম্পর্কেও জানতেন। তবে আপনি আগেই তাকে কেন হত্যা করলেন না। হযরত আলী (রাঃ) বললেন আমি আমার হত্যাকারীকে কিভাবে হত্যা করব? যে সময় উম্মুল মু'মেনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) এর নিকট হযরত আলী (আঃ) এর শাহাদাতের সংবাদ পৌছে যায় তখন এই কবিতা পাঠ করেন:

فالقت عصاها واستقر بها النوى ☆ كما قر عينا مالا ياب المسافر

সে অবসন্ন দেহে তার লাঠির উপর ভর দেয়। আর বিরহ বেদনা তার প্রকৃতিতে স্থায়ী হয়েগেছে। যেমনি মুসাফির ভ্রমণ শেষে ফিরে এসে প্রশান্তির নিশ্বাস নেয়।

হযরত আলী (রাঃ) এর পবিত্র সমাধি:

হযরত আলী (রাঃ)ই প্রথম আমিরুল মুমিনীন যার সমাধি সাধারণ লোকদের দৃষ্টি থেকে একে বারে গোপন। কোন কোন বিদ্যান লেখেন যে, তার সমাধিকে গোপন রাখার জন্য তিনি অসিয়্যত করে গেছেন। কারণ তিনি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বুঝতে পেরেছিলেন যে, খেলাফত উমাইয়া গোত্রের হাতে চলে যাবে। সে সমস্ত লোকদের ব্যাপারে তিনি আশংকা করছিলেন যে, তাঁরা তার মরদেহকে বিকৃতি করে ফেলবে। তার সমাধির অবস্থান সম্পর্কে যথেষ্ট মত পার্থক্য আছে। এখন প্রশ্ন হলো তাঁর কবর কোথায়?

কারো কারো মতে তাঁর কবর কুফার জামে মসজিদের কোন এক নির্জন কোনে রয়েছে। কেউ বলেছেন ভাঙ্গা দালানে, আবার কেউ বলেছেন জান্নাতুন বাকীতে। কিন্তু একথা বুঝে আসে না। কেউ বলেছেন তার সমাধি নাজাফে রয়েছে। বর্তমানে এর জিয়ারত সাধারণ হয়ে গিয়েছে। এই উম্মতে মোহম্মদিয়ার পাত্রকে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় এর মধ্যে আমীর ও খলীফা বানিয়ে সমান করে ফেলেছে এবং বিক্ষিপ্ত কুড়ে ঘরকে একত্র করার উত্তম পন্থা অবলম্বন করেছে। যদিও কোন কোন প্রতিকূলতার কারণে কোন কোন খলীফার পদচ্যুতির পালাও এসেছে। এজন্য আশু বুঝা যায় খেলাফতের কোন কোন ধারায় কিছু আলোকপাত করা।

ইতিহাসবিদগণ বলেন এই উম্মতের প্রত্যেক খলীফাকে সিংহাসন থেকে বিদায় করা হয়েছে। এজন্য সমস্ত খলীফার সামান্যতম পরিচিতি জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত, কর্মকান্ড খেলাফত কাল এবং পদচ্যুতির কারণ বর্ণনা করা হবে।

নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর জীবন চরিত:

এই উম্মতের পথপ্রদর্শক হিসেবে সর্ব প্রথম আল্লাহ তাআলা যামানায়ে ফাতরাতের পর জনাব রাসূলুল্লাহ (সাঃ)কে প্রেরণ করেন। সুতরাং তিনি তার রাসালাতকে উম্মত পর্যন্ত পৌছিয়েছেন। এবং এর হকও যথাযথভাবে আদায় করেছেন। আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ পর্যন্ত করেছেন। উম্মতকে কল্যাণ ও মঙ্গলের শিক্ষা দিয়েছেন। প্রকৃত মালিকের দরবারে তিনি কেঁদেছেনও। বিনীতভাবে কেঁদেছেন। সবশেষে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব যথারীতি পালন করে তার প্রাণকে প্রাণ দাতার কুদরতী হাতে অর্পন করে উত্তম বন্ধুর সাথে মিলিত

হয়েছেন।

নবী করীম (সাঃ) সারা বিশ্বে সর্বশেষ্ঠ, সমগ্র নবীদের মধ্যে তিনি (সাঃ) সর্বোৎকৃষ্টতম দয়ার আঁকড়, মুত্তাকীদের কাতারের সর্বপ্রথম ব্যক্তি। আল্লাহ পাকের গুণ-গানের আওয়াজকে বুলন্দকারী, শাফায়াতে কুবরার মালিক। মাক্বামে মুহমুদ থেকে মাথা উঁচু করে সাকিয়ে কাউছার পর্যন্ত, কিয়ামতের দিন হযরত আদম (আঃ) সহ সমস্ত মোমিন তার (সাঃ) পতাকা তলে জড়ো হবেন। সমস্ত উম্মত থেকে তাঁর উম্মতই শ্রেষ্ঠ। তাঁর সাহাবাগণ (রাঃ) নবীগণের পরেই শ্রেষ্ঠতম। তাঁর মতাদর্শ ও মতবাদ সমস্ত মতাদর্শ ও মতবাদ থেকে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম। আর খোদার পরেই তিনি সমগ্র সৃষ্টি জগতে সর্ব শ্রেষ্ঠ। আল্লাহ তাআলা তাঁকে (সাঃ) সত্য মোজেযা, পূর্ণ বৃদ্ধিমত্তা, শ্রেষ্ঠ বংশধর সৌন্দর্যে সর্বোৎকৃষ্ট করেছেন। বীরত্ব ও সাহসিকতা, সুখ্যাতি, সহিষ্ণুতা তাঁর মূল প্রতিকৃতি। নিখূত আমল, স্বকীয়তা এবং খোদাভীতি, উল্লেখ যোগ্য নিয়ামতের সম্পদাদি, সৃষ্টি জগতের মধ্যে সবচেয়ে অনুধাবন যোগ্য ও সারগর্ভ বক্তৃতা, চারিত্রিক ভূমিকায় কীর্তিমান পুরুষ এবং সমস্ত সৌন্দর্যের ও গুণাবলীর সংমিশ্রণে সৃষ্টি করেছেন। যেমন কোন কাবি বলেন:

لم يخلق الرحمن مثل محمد☆ ابدا وعلمى انه يخلق

আল্লাহ পাক মুহাম্মদ (সাঃ) কে যেভাবে সৃষ্টি করেছেন কখনো কাউকে এভাবে সৃষ্টি করেননি। আর আমার সম্পূর্ণ একীন যে, কখনো কাউকে এভাবে সৃষ্টি করবেন না।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, হুজুর (সাঃ) যতক্ষণ ঘরে অবস্থান করতেন ততক্ষণ ঘরের মানুষদের খেদমত করতেন, তার নিজের কাপড় চোপড় নিজেই ঠিক ঠাক করতেন। জুতা ঠিক করতেন। নিজেকে নিজেই সজ্জিত করতেন। যে উট পানি আনা নেয়ার কাজ করত একে তিনি নিজেই খাদ্য দিতেন, ঘর ঝাড়ু দিতেন। উট বাঁধতেন। খাদেমদের সাথে একত্র বসে আহার করতেন। এমনকি আটা খামীর করতে খাদেমকে সাহায্য করতেন। বাজার থেকে নিজে বহন করে মালামাল নিয়ে আসতেন। তিনি (সাঃ) প্রায়সই গম্ভীর থাকতেন, চিন্তায় ডুবে থাকতেন। আরাম আয়েশে কখনো সময় কাটাতেন না।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম (সাঃ) এর সুন্নত সম্পর্কে

জিজ্ঞাসা করলে তিনি (সাঃ) বলেন, মা'রেফাত আমার পুঁজি, ভালবাসা আমার রীতি, আকাংখা আমার ভূষণ। আল্লাহর জিকির আমার প্রেম, দুঃখ আমার বন্ধু, ইলম আমার হাতিয়ার, ধৈর্য আমার চাদর, আল্লাহর সন্তুষ্টি আমার গণিমত। ভ্রমণ আমার বৈশিষ্ট। কৃচ্ছতা আমার নীতি, বিশ্বাস আমার শক্তি, সততা আমার মুক্তি, আনুগত্য আমার ভদ্রতা, জিহাদ আমার অভ্যাস, আর আমার চোখের প্রশান্তি নামাযেই রয়েছে।

নবী করীম (সাঃ) এর সহিষ্ণুতা, দানশীলতা, বীরত্ব, লজ্জাশীলতা, স্নেহ-ভালবাসা ও সহানুভূতি ন্যায়নীতি, সৌজন্যবোধ, মাহাত্ম, ধৈর্য, প্রভাব বিশ্বস্থতা এবং অন্যান্য প্রশংসনীয় গুণাবলী এত বেশী ছিল যা গণনা করে শেষ করার সম্ভব নয়। উলামায়ে কেরাম তার (সাঃ) জীবনী রেসালতকাল, যুদ্ধকাল, চরিত্র এবং অলৌকিকতা ইত্যাদি বিষয়ের উপর অসংখ্য কিতাব রচনা করেছেন। প্রত্যেকটি বিষয়ের উপর যদি কিতাব লিখা হয় তাহলে কিতাবের ঠিকি লেগে যাবে।

দ্বীনের পরিপূর্ণতা ও নিয়ামতের পূর্ণতার পর রবিবারে অর্ধ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর ১১হিঃ ১২ই রবিউল আওয়াল হুজুর (সাঃ) ইন্তিকাল করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর। নবী করীম (সাঃ)কে গোসল দেয়ার সৌভাগ্য হযরত আলী (রাঃ) এর হয়েছিল। অতঃপর উম্মুল মূমেনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) এর হুজরাতে চিরদিনের জন্য আড়াল করে দেয়া হল।

প্রথম খলিফা - হযরত আবু বকর (রাঃ):

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর ইন্তেকালের পর হযরত আবু বকর (রাঃ)কে খলীফা বানানো হয়। কারণ নবী করীম (সাঃ) এর মৃত্যু শয্যায় তাঁকেই ইমামতির জন্য প্রতিনিধি করা হয়েছিল। তিনি ছিলেন নবী করীম (সাঃ) এর নিকটাত্মীয় এবং গারে হেরার সাথী। তিনি ছিলেন নবী করীম (সাঃ) এর দেহরক্ষী ও মন্ত্রী। অন্তরঙ্গ বন্ধুর মধ্যে তাঁকে গণ্য করা হয়। সমস্ত মানুষের মধ্যে উত্তম মানুষ ছিলেন। যে দিন নবী করীম (সাঃ) এর তিরোধান ঘটে সেদিন সাকিফা বনুসাদে বায়আত করা হয়। এই ঘটনা অতি দীর্ঘ হওয়ার কারণে আমরা এখানে বিস্তারিত আলোচনা থেকে বিরত থাকলাম। খলীফা হয়েই তিনি অনেক উত্তম উত্তম কাজ সম্পাদন করেন।

খুব শিগ্গীর ইয়ামাম জয় করে ফেলেন। পার্শবর্তী দেশ ইরাক এবং অন্যান্য দেশেও ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ছিলেন উত্তম কর্মবীর পতাকাবাহী, আল্লাহর ইবাদতকারী। খোদভীরু, গাম্ভীর্য, সহনশীল, ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ, দয়া-মায়ার আঁকড়। তিনি ছিলেন এক স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব। রাসূল (সাঃ) এর ইন্তিকালের পরপরই এক সুর-গোল আরম্ভ হয়ে যায়। মানুষ ইসলাম ত্যাগ করতে থাকে। যাকাত অস্বীকারকারী জন্ম নেয়। হযরত আবু বকর (রাঃ) সমস্ত সাহাবাদের একত্রি করে, পরামর্শ নেন। যাকাত অস্বীকারকারী এবং ধর্মত্যাগীদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য ব্যাপক আলোচনা চলছিল। সকল সাহাবা ঐক্যমতে পৌছতে পারলেন না। বরং বিরোধিতা করতে লাগলেন। এই মুহূর্তে হযরত ওমর (রাঃ) উঠে দাঁড়িয়ে বললেন মহামান্য খলীফা! আপনি এদের বিরুদ্ধে কিভাবে যুদ্ধের ফয়সালা দিবেন, অথচ নবী করীম (সাঃ) এর হাদীছ আপনার সম্মুখেই রয়েছে?

নবী করীম (সাঃ) এরশাদ ফরমান আমাকে লোকদের সাথে যুদ্ধ করতে সে পর্যন্ত আদেশ করা হয়েছে যে পর্যন্ত না তারা কালমা তাওহীদের স্বীকৃতি দেয়। যে স্বীকার করবে তার জান-মাল আমার পক্ষ থেকে নিরাপদ থাকবে। কিন্তু ইসলামের অধিকার অবশিষ্ট থাকবে এবং এদের হিসাব নিকাশ আল্লাহর হাতে ন্যাস্ত। হযরত আবু বকর (রাঃ) বললেন আমি ঐ সমস্ত লোকদের সাথে অবশ্যই জিহাদ করব যারা নামায-রোজার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করতে চায়। কারণ মালের হক্ব যাকাত প্রদান করা। আল্লাহর কসম নবী করীম (সাঃ) এর যুগে একটি বকরীর বাচ্চা যা যাকাত হিসেবে দেয়া হত তাও যদি এখন দিতে কেউ অস্বীকার করে আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। একথা শুনে হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, আল্লাহ পাক হযরত আবুবকর (রাঃ) কে যুদ্ধের জন্য তার অন্তর খুলে দিয়েছেন। আমি এখন বুঝতে পারছি যে, তাই সত্য। এক বর্ণনায় আছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) আবু বকর (রাঃ) কে বলেন এই মুহূর্তে আপনি জনগণের সহিত সৌজন্যমূলক আচরণ করুন। তখন আবুবকর বললেন

اجبار فى الجاهلية وخور فى الاسلام

(হে ওমর) জাহেলী যুগে তুমি যখন মুসলমান ছিলেনা তখন তুমি ছিলে কঠোর অন্তরের, আর ইসলাম গ্রহণের পর এতই কাপুরুষ হয়ে গেলে? হে ওমর!

অহীর ধারা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। দ্বীন পূর্ণতা অর্জন করেছে। আমার জীবনে দ্বীনে কোন প্রকার দূর্বলতা আসেনি। আমি দূর্বলতাকে সহ্য করতে পারব না। একথা বলেই তিনি যুদ্ধের জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। কতিপয় ঐতিহাসিক বলেন জনাব রাসূলুল্লাহ (সাঃ) উছামা ইবনে যায়েদের বাহিনীকে ৭ (সাত) শত নওজোয়ান সৈন্য দ্বারা সজ্জিত করে সিরিয়ার উপকণ্ঠে প্রেরণ করেছিলেন। এ বাহিনী যখন যিখাসাব নামক স্থানে পৌছল তখন নবী করীম (সাঃ) এর ইন্তেকাল হয়ে গেল। একদিকে আরবের কোন কোন এলাকার লোক ধর্মত্যাগী হতে লাগল তখন সাহাবায়ে কেরাম একত্রিত হলেন। তারা সবাই পরামর্শ ক্রমে হযরত আবুবকর (রাঃ) কে বললেন এই মুহূর্তে উসামার বাহিনীকে ফেরত নিয়ে আসুন। তখন তিনি জবাব দিলেন সে জাতের কসম যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই যদি উম্মুহাতুল মোমিনীনদের পায়ে কুকুর আছড়াতে থাকে তবু আমি উসামার সৈন্যবাহিনী ফেরত আনবনা। যে বাহিনী রাসূল (সাঃ) নিজে সজ্জিত করে প্রেরণ করেছেন। এ বন্ধন কখনোই খোলা হবেনা যা নবী (সাঃ) নিজ হাতে বেঁধে দিয়েছেন।

কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) বলেছিলেন স্মরণ রেখো এ বাহিনী ফেরত না আনার কারণে যদি হিংস্র জানোয়ার আমকে খেয়ে ফেলে তবু ফেরত আনব না।

হযরত আবুবকর (রাঃ) উসামার (রাঃ) বাহিনীকে আদেশ দিলেন যে, সৈন্য বাহিনী নিয়ে চলে যাও। যদি তোমরা হযরত ওমর (রাঃ) কাছ থেকে অতিরিক্ত অনুমতি প্রাপ্ত হও তাহলে তাঁরও অনুগত্য করবে। এ জন্য আমার নিকট তার একটি বিশেষত্ব আছে। আমি তাকে ভালবাসি এবং আমার কাছে তার মতামতের বিশেষ গুরুত্ব আছে। আমি তার সাহায্য সহযোগিতা কামনা করি। হযরত উসামা (রাঃ) বললেন আমি তাঁর (ওমরের) সহিত সাক্ষাৎ করেছি। এর পর উসামা রওয়ানা হয়ে গেলেন। সৈন্য বাহিনী যখন কোন বিশ্বাস ঘাতক গোষ্ঠীর কাছ দিয়ে যেত তখন তারা বলত, ভাই সে সমস্ত মুসলমানদের কাছেতো সাহসী সৈন্যবাহিনী রয়েছে। যদি এমনই শক্তিশালী না হয় তাহলে এই নাজুক পরিস্থিতিতে যুদ্ধের মাঠে আসবে না। উসামার সৈন্যরা রোমীয়দের সাথে যুদ্ধ করল এবং রোমীয়রা পরাজিত হল। বিরুদ্ধবাদীরা এবং শত্রুরা অনেকেই নিহত হল। শেষ পর্যন্ত এই বাহিনী বিজয় এবং গণিমতের মাল নিয়ে প্রত্যাবর্ত

করল।

উম্মুল মূমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) বলেন আমার শ্রদ্ধেয় পিতা (আবুবকর (রাঃ) ধর্ম ত্যাগীদের ধর্ম অস্বীকারের দিন প্রকাশ্য তরবারী নিয়ে তার বাহনের উপর আরোহী হয়ে বের হয়ে পড়লেন। হঠাৎ করে হযরত আলী (রাঃ) আগমন করলেন। তিনি আমার পিতার বাহনের লাগাম টেনে ধরলেন এবং বললেন আমি আপনাকে সে কথাই বলতে চাই যে কথা নবী (সাঃ) ওহুদের দিন আপনাকে বলেছিলেন। আপনি আপনার তরবারী খাপে ভরে নিন। আপনি আমার কারণে বিরক্তি প্রকাশ করবেন না। আল্লহার কসম আপনার কারণে আমি যদি কোন কষ্ট দিয়ে থাকি তাহলে আপনার পরে ইসলাম এর নিয়মনীতি কখনো ঠিক হবে না।

ইবনে কুতাইবাহ (রাঃ) বলেন কিছু কিছু লোক ব্যতীত আরব জাহানের সবাই ধর্মত্যাগী হয়ে যায়। তখন হযরত আবুবকর (রাঃ) তাদের সাথে জিহাদ করলেন। শেষ পর্যন্ত তারা ফিরে এলো। ইয়ামামা বিজয় হল। সেখানে নবুয়োতের দাবীদার মুসায়লামাতুল কাজ্জাবকে হত্যা করা হল। এর পর সুনআয় বসবাসকারী আসওয়াদ আনসী মিথ্যুককেও তলোয়ার দ্বারা দিখন্ডিত করে দেয়া হল।

আবু রেজা আল আত্তারী বলেন, আমি মদীনা মুনাওয়ারায় গিয়ে দেখলাম সমস্ত মানুষ একত্রিত হচ্ছে। সেখানে দেখলাম এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির মাথায় চুম্বন করছে। আর একথা বলছে যে, আমি আপনার জন্য উৎসর্গিত হয়ে গেলাম। আল্লাহর কসম এই মুহূর্তে যদি আপনি না থাকতেন তাহলে আমরা সবাই ধ্বংস হয়ে যেতাম। আমি জনতাকে জিজ্ঞেস করলাম চুম্বনকারী লোকটি কে? জনতা জবাব দিল তিনি হলেন ওমর (রাঃ) যিনি হযরত আবুবকর (রাঃ) এর কপালে চুম্বন করছিলেন। আর ধর্ম ত্যাগীদের বিরুদ্ধে জিহাদে বিজিত হওয়ায় মোবারকবাদ দিচ্ছিলেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, যখন নবী করীম (সাঃ) এর ইন্তিকাল হল তখনই আরবগণ ধর্মত্যাগী হতে লাগল। জনগণের মধ্যে কপটতায় ছেয়ে গেল। আর আমার আব্বাজান ধৈর্যের ময়দানে সুদৃঢ় ছিলেন। এমনিভাবে যদি তিনি কোন পাহাড়ের উপর অবস্থান করতেন তাহলে পাহাড়ও চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যেত।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন সে সত্ত্বার কসম যিনি ব্যতীত ইবাদতের উপযোগী কেউ নন। যদি (তখন) আবু বকুর সিদ্দিক (রাঃ) কে খলীফা বানানো না হত তাহলে আল্লাহর ইবাদত করা হত না। এই কথা হযরত আবু হোরায়রা তিনবার উচ্চারণ করেছেন। বিজ্ঞজনেরা অভিমত পেশ করেন যে, হযরত আবুবকর (রাঃ) নম্র প্রকৃতির লোক ছিলেন। তার অসুখ বিসুখ হলে তিনি ঔষধ ব্যবহার করতেন না। এতে করে আল্লাহর উপর তার ভরসা এবং বিশ্বাস প্রকাশ পেত। সাহাবায়ে কেরাম সেবার জন্য এগিয়ে আসতেন এবং আবেদন করতেন যে, আমরা আপনার চিকিৎসার জন্য ডাক্তার ডেকে আনি। যাতে আপনাকে দেখে শুনে ভাল করে চিকিৎসা করতে পারেন। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, এমতাবস্থায় হযরত আবু বকর (রাঃ) আমার দিকে তাকালেন। তখন জনতা বলল তিনি কি বলতে চাচ্ছেন? তখন আবু হোরায়রা (রাঃ) জবাব দিলেন যে, তিনি একথা বলছেন যে, আমি যা চাই তাই ঘটে গেছে।

হযরত আবুবকরের ইন্তিকাল ও খেলাফতের সময়সীমা:

তিনি (রাঃ) মঙ্গলবার ২২শে জমাদাচ্ছানী ১৩ হিঃ মাগরিব ও এশার মাঝামাঝি সময়ে উন্তিকাল করেন। ৬৩ বছর বেঁচে ছিলেন। তার মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে বলা হয় নবী করীম (সাঃ) এর ইন্তিকালে তাঁর অন্তর বিচ্ছেদের ঘাত প্রতিঘাতে জর্জরিত ছিল। তাঁকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর ডান পার্শ্বে হযরত আয়েশা (রাঃ) এর হুজরায় কবর দেয়া হয়। তিনি ২ বছর ৩ মাস ৮ দিন খেলাফতের পদে অধিষ্টিত ছিলেন।

হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) এর খেলাফত:

হযরত আবু বকর (রাঃ) এর পর হযরত ওমর (রাঃ)কে ফলীফা নির্বাচিত করা হয। রাষ্ট্র পরিচালনার বাগডোর তাঁর উপর ন্যাস্ত করা হয়। যে দিন হযরত আবুবকর (রাঃ) এর ইন্তিকাল করেন সে দিনই হযরত আবুবকরের (রাঃ) ওসিয়ত অনুসারে হযরত ওমরের (রাঃ) নিকট বায়আত গ্রহণ করা হয়। প্রথম খলীফার ন্যায় তিনিও প্রশংসনীয় গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন। অভ্যাস, আধ্যাত্মিকতা, ধৈর্য ইত্যাদিতে যুগের সেরা ছিলেন। আটার রুটি খেতেন, কাঁচা রঙ্গের কাপড় পরিধান করতেন। তাঁর আমলে অসংখ্য যুদ্ধ করেছেন, অগণিত রাজ্য হস্তাত হয়েছে। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যাকে আমিরুল মু'মিনীন উপাধি দেয়া

হয়। তিনি প্রথম কাতারের মুহাজিরদের অর্ন্তভুক্ত ছিলেন। তিনি উভয় কিবলাহ (বায়তুল মোকাদ্দিস এবং বায়তুল্লাহ) এর দিকে নামায আদায়ের সৌভাগ্য লাভ করেন।

ইসলামের সকল যুদ্ধ বিশেষ করে "বাইআতুর রিদওয়ান" এবং বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে মর্যাদাবান হওয়ায় ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি পায়। নবী করীম (সাঃ) এর ইন্তিকালের সময় তাঁর উত্তম কর্মের জন্য নবী করীম (সাঃ) এর আত্মা খুশী হন। তাঁকে বেহেশতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছিল। তাঁর গুণাবলী অসংখ্য ছিল। তার মার্যাদার জন্য এটুকুই যথেষ্ট যে, তিনি নবী করীম (সাঃ) এর দরবারে মন্ত্রীর মর্যাদা অর্জন করেছিলেন। পরে উম্মতে মুহাম্মদী এর খেদমতে ২য় খলীফা হিসেবে মনোনীত হন। তাঁর ইন্তিকাল হয় শাহাদতের মাধ্যমে। খোদদ্রোহী এবং বেওকুফ অথবা নির্বোধ ব্যতীত তাঁর সাথে বৈরীতা কে বা রাখতে পারে?

হযরত ওমর (রাঃ) এর প্রসিদ্ধ কাজসমূহ:

হযরত ওমরই প্রথম খলীফা যিনি রাতে ঘুরে ফিরে (প্রজাদের) প্রহরী হিসেবে কাজ করতেন। রাতে নিয়মিতভাবে দ্বীন-দুনিয়ার জিম্মাদারীর জন্য সেবা যত্ন করতেন। তিনি প্রজাদের চুপিচুপি দেখে যেতেন। আল্লাহ পাক তাঁকে শান শওকত দ্বারা পুরস্কৃত করেছিলেন। আল্লাহ ভীতির কারণে প্রজাদের ব্যাপারে এতই ভয় করতেন যে, তিনি রাস্তায় চলা ফেরা পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছিলেন। তাঁর নিকট এই সংবাদ পৌছল যে, জনগণ তাঁর প্রভাব প্রতিপত্তি ও দাপটে ভয় পাচ্ছে। সে কারণে একদিন তিনি জনগণকে একত্রিত করলের এবং সে মিম্বরে এসে বসলেন যে মিম্বরে হযরত আবুবকর (রাঃ) তাশরীফ রাখতেন। হামদ ও ছানার পর প্রজাদের উদ্দেশ্যে বললেন হে জনসাধারণ! আমি জানতে পেরেছি যে, আমার কঠোরতার কারণে প্রজারা ভয় পাচ্ছে। তিনি তাও বললেন যে, মানুষও বলছে যে, ওমর নবী করীম (সাঃ) এর যুগের সুযোগ সুবিধার ব্যাপারে কঠোরতা করছেন। এমনিভানেভাবে প্রথম খলীফা হযরত আবুবকরের (রাঃ) যুগেও কঠোরতা দেখা গিয়েছিল। সুতরাং সে অবস্থার পরিবর্তন কি ওমরই দ্বিতীয় খলীফা এবং আমীরুল্ল মুমিনন? তিনি বলেন খোদার কসম যে ব্যক্তি তা বলছে সে সত্য বলছে। আমি নবী করীম (সাঃ) এ সাথে সার্বক্ষণিক একজন

গোলাম ছিলাম। নবী করীম (সাঃ) এর তিরোধানের সময় তিনি আমার উপর সন্তুষ্ট ছিলেন। আল্লাহর শুকর এ ব্যাপারে আমি একজন সৌভাগ্যশালী। নবী করীম (সাঃ) এর ইন্তিকালের পর হযরত আবুবকর (রাঃ) কে খলীফা নির্বাচিত করা হল তখনও আমি গোলাম ও খাদেমের মতই ছিলাম। আমার কঠোরতা তার নম্রতার মধ্যে একত্রিত হয়ে যায়। বেশীর ভাগ সময় আমি তরবারী কোশ মুক্ত করে ফেলতাম আর আবুবকর তা খাপে পুরে দিতেন। আমি এখন তোমাদের রক্ষক ও খলীফা। জেনে রেখো আমার কঠোরতায় আরো কিছু সংযোজন হল, কিন্তু আমার কঠোরতা শুধু জালেম এবং সে মুসলমানদের উপর যারা বাড়াবাড়ি করে। আমার ভদ্রতা ও নম্রতা ধর্মপরায়ন মুসলমানদের জন্য, সংযত-শান্ত মুসলমানের জন্য। আপনাদের সাথে আমার ব্যবহার হবে যদি কেউ কারো উপর অত্যাচার-অবিচার করে তাহলে অত্যাচরীকে ডেকে তার এক গাল মাটিতে রেখে অপর গালে পা রেখে অত্যাচারের স্বীকৃতি দিবে।

হযরত ওমর (রাঃ) আরো বলেন হে লোক সকল, তোমাদের প্রয়োজনেই তা ব্যায় করা হবে। আমার দায়িত্ব হবে তোমাদের ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা। আমার অবস্থা হল আমি যখন তোমাদের সৈন্য বাহিনীতে প্রেরণ করব তখন তোমাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে আমার অনুভূতি থাকা। যে পর্যন্ত না তোমরা নিরাপদে ফিরে আসবে সে পর্যন্তই এই দায়িত্ব আমার কাঁধে চেপে থাকবে। সর্বশেষ আমি নিজের জন্য এবং তোমাদের জন্য আল্লাহর নিকট প্রর্থনা করতে থাকা।

হযরত সায়ীদ ইবনে মুসাইয়াব (রাঃ) বলেন, আল্লাহর কসম! হযরত ওমর (রাঃ) তাঁর কৃত প্রতিশ্রুতি যথাযথভাবে পালন করেছিলেন। যেখানে কঠোরতার প্রয়োজন হত সেখানে তিনি ঐ অবস্থায় কাজ করে ফেলতেন। আর যেখানে নম্রতার প্রয়োজন হত সেখানে নম্র-ভদ্র হয়ে কাজ আদায় করতেন। তিনি নিজে নিজেকে জিম্মাদার মনে করতেন। কোন কোন সময় পর্দাশীল মহিলার নিকটও যেতেন। বিশেষ করে যে সমস্ত নারীদের স্বামী সফরে থাকত। তিনি বলতেন বান্দা ওমর হাজির। আপনাদের কোন জিনিষের প্রয়োজন নেইতো? কোন কিছু কেনা কাটার প্রয়োজন হলে বাজার থেকে আমি নিজে এনে দেব। কারণ একথা আমার ভাল লাগে না যে, তোমরা অন্য কারোর সাথে সম্পর্ক রেখে প্রতারিত হও। নারীরা তাঁদের নিজ নিজ দাসীদেরকে তাঁর কাছে

পাঠিয়ে দিতেন, আর তিনি বাজারে এমন অবস্থায় প্রবেশ করতেন যে, দাসীরা তাঁর পেছনে পেছনে এতবেশী গমন করত যে, তাদের গণনা করা সম্ভবপর হত না। তিনি তাদের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় করে দিতেন। এদের কারো কাছে যদি টাকা পয়সা না থাকত তবে তিনি নিজের পকেট থেকে দিয়েই আসবাব পত্র কিনে দিতেন।

একদা হযরত ত্বালহা (রাঃ) কোন কাজে রাত্রবেলায় বের হলেন। তিনি দেখলেন মহামতি ওমর (রাঃ) একটি ঘরে প্রবেশ করলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি বের হলেন। সকালে সে ঘরে হযরত ত্বলহা এলেন যে ঘরে ওমর (রাঃ) প্রবেশ করেছিলেন। হযরত তালহা (রাঃ) ঘরের লোকদের জিজ্ঞেস করলেন যে, ওমর (রাঃ) রাতে তোমাদের ঘরে কেন প্রবেশ করেছিলেন? তারা জবাব দিল যে, তিনি রাতে আমাদের ঘরে প্রবেশ করে আমাদের কাজ করে দেয়ার জন্য চুক্তি করে গেলেন যে, তিনি আমাদের সংশোধন ও আত্মশুদ্ধি করবেন আর আমাদের পেরেশানীকে বিদূরিত করবেন।

ইতিহাসে রয়েছে হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) যখন সিরিয়া থেকে মদীনা শরীফ আগমণ করলেন তখন তিনি জনগণ থেকে পৃথক থাকলেন। এতে করে প্রজাদের অবস্থা স্বচক্ষে পর্যবেক্ষণ সম্ভব হবে। তাঁর কোন প্রকার কষ্ট শিষ্ট নেই। বেশ আরামেই আছেন। একদিন তিনি একটি কুড়ে ঘরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। যে ঘরে একজন বৃদ্ধা মহিলা অবস্থান করতেন। মহিলা বললেন হে অমুক, ওমর ফারুক (রাঃ) এত সময় কি করছে? তিনি (ওমর (রাঃ)) জবাব দিলেন ওমর তো আজ কাল মদীনায় থাকেন, সিরিয়া থেকে মদীনায় চলে গেছেন। বৃদ্ধা বললেন ওমর ফারুককে জানিয়ে দিও আল্লাহ্ পাক তাঁকে যেন পুরস্কৃত না করুন। হযরত ওমর (রাঃ) নিজে বলেছেন, বৃদ্ধার এ ধরনের জবাব বোধ হয় এ জন্য দিয়ে ছিলেন যখন থেকে ওমর (রাঃ) কে আমিরুল মু'মিনীন নিযুক্ত করা হয়েছিল, তখন থেকে ওমরের পক্ষ থেকে বৃদ্ধার জন্য কোন সাহায্য, হাদিয়া তোহফা ইত্যাদি পৌছে নি। আর না কোন নগদ অর্থ। ওমর (রাঃ) বললেন তোমার অবস্থাতো ওমর (রাঃ) জ্ঞাত নন। আর তুমি যে এখানে বসবাস কর তাও ওমর জানে না।বৃদ্ধা বললেন হায় হায়! সোবহানাল্লাহ! কাকে আমিরুল মু'মিনীন বানানো হল? হায় হায়! সোবহানাল্লাহ! কাকে আমিরুল মু'মিনীন বানানো হল? পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের সবইতো তার প্রজা, আর প্রজাদের খবর তিনি জানবেন না

কেন? একথা শুনার পর হযরত ওমর (রাঃ) কাঁদতে আরম্ভ করলেন এবং বলতে লাগলেন হে ওমর তুমি এতটুকু সজাগ নও যে, এক বৃদ্ধার খবর পর্যন্ত রাখতে পারল না? মনে হয় তুমি সবার চেয়ে বেশী নাদান আর প্রত্যেক মানুষই তোমার চেয়ে বেশী বুদ্ধিমান। পরবর্তীতে ওমর (রাঃ) তাকে বললেন হে আল্লাহর বান্দী এ সংকীর্ণতা ও অপরাগতা ওমরের কাছ থেকে কত দাম দিয়ে ক্রয় করতে চাও? কারণ আমি দোযখবাসী না হওয়ার অধিকতর উপযোগী।

বলল: (ওমর!) তোমার উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। আমার সাথে কেন তুমি মশকারা করছ? ওমর বলেন, আমি ঠাট্টা করছিনা। তিনি তার কাছ থেকে ২৫ দিরহামে ক্রয় করলেন। খাদেম মাখদুমের মধ্যে এই আলোচনা চলছিল এমন সময় হযরত আলী ইবনে আবু তালিব ও আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) আগমন করলেন। তাঁরা বললেন السلام عليكم হে আমিরুল মুমিনীন সালাম শুনা মাত্র বৃদ্ধা লজ্জায় এবং অনুশোচনায় মাথায় হাত রেখে বলতে লাগল এখন কি হবে? স্বয়ং আমিরুল মু'মিনীনের সম্মুখেই থেকে কি বলে ফেলেছি। ওমর বললেন না না কিছুই না। এরপর তিনি কিছু লিখার জন্য কাগজ চাইলেন কিন্তু কাগজ না পাওয়ায় তিনি তার তালি দেয়া জামা থেকে এক টুকরা ছিড়ে লিখলেন:

بسم الله الرحمن الرحيم ওমর (রাঃ) এ বৃদ্ধার অত্যাচারের সে দিন থেকে, যেদিন থেকে তাকে অভিভাবক বানানো হয়েছে সে দিন পর্যন্ত ২৫ দিনার দ্বারা অত দিনের জন্য ক্রয় করা হয়েছে। এ ঘটনার সময় হযরত আলী ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) উপস্থিত ছিলেন। সেসময় আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরকে ডাকা হল। এই লেখা তার হাতে সোপর্দ করে এই অসিয়ত করলেন যে, আমার ইন্তিকাল হলে কাফিনে দিয়ে দিও। এই অবস্থায়ই আমি আমার প্রভুর সাথে সাক্ষাৎ করতে চাই। এ ধরনের অসংখ্য ঘটনা আছে।

একটি বিস্ময়কর ঘটনা:

আল ফাজায়েল বর্ণনা করেছেন, হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাছ কাদেসিয়াতে থাকাকালীন একটি আদেশ নামা লিখে পাঠালেন, যাতে এই নির্দেশ দেয়া ছিল যে, আনসারগণ (রাঃ)কে ইরাকের হালওয়ান এলাকাতে পাঠিয়ে দাও। তাহলে তারা চতুর্দিকেই আক্রমণ করতে পারে। সাদ বিন আবি

ওয়াক্কাস (রাঃ) আদেশ মোতাবেক নজলা আনসারীকে ৩০০ শত ঘোড় সওয়ারসহ পাঠিয়ে দেন। তারা হালওয়ান এলেন এবং আশ পাশের এলাকাতে আক্রমণ আরম্ভ করে দিলেন। যার ফলে তাদের কাছে কিছু লোক বন্দী হল এবং কিছু গণিমতের মাল হস্তগত হল। এরপর তারা পিছু হটতে লাগলেন। এমন সময় আসরের সময় চলে যেতে লাগল এবং সূর্য ডুবে যেতে লাগল। নাজলা আনসারী গনিমতের মালামাল এবং বান্দীদেরকে পাহাড়ের চুঁড়ায় রেখে দেয়ার আদেশ করলেন। তারপর নজলা আনসারী আজান দিলেন এবং বললেন الله اكبر الله اكبر পহাড় থেকে একজন উত্তরদাতা উত্তর দিল ভাই তুমিতো আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণা করলে। এরপর নজলা আনসারী বলেন اشهد ان محمدا رسول الله আবার কে যেন বলল, হে নজলা! কেমন নিষ্ঠাপূর্ণ বাক্যই না বললে! নজলা আসারী বললেন حى على الصلوة কে যেন বলল মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ তো তিনি যার সুভাগমন বার্তা হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম (আঃ) আমাকে দিয়েছেন। আর তার উম্মতের শেষে কিয়ামত সংগঠিত হবে। আবার নজলা আনসারী বললেন حى على الفلاح অদৃশ্য থেকে আওয়ায আসল যে ব্যক্তি নামায আদায় করল এবং সে ক্ষেত্রে নিয়মানুবর্তিতা রক্ষা করল তার জন্য বেহেশতের সুসংবাদ। নজলা আনসারী বললেন الله اكبر الله اكبر আওয়ায এলো যে ব্যক্তি আল্লাহর আহবানে সাড়া দেবে সে কৃতকার্য হবে। লোকটি বলল, হে নজলা আনসারী এই সমস্ত বাক্য যে তুমি নিষ্ঠার সাথে বললে এ কারণে তোমার উপর দোযখের আগুন হারাম করা হয়েছে।

আযান শেষ করে নজলা আনসারী বললেন, আল্লাহ পাক তোমার উপর রহম করুন। আপনি কে? ফেরেশতা না কি, কোন জ্বিন, না আল্লাহর বান্দাদের কোন কাফেলা যার আওয়াজ আমি শুনতে পেলাম? দয়া করে দেখা দিন। কারণ এ দল মুহাম্মদ (সাঃ) এর দ্বিতীয় খলীফা ওমর বিন খাত্তাব (রাঃ) প্রেরণ করেছেন। এটুকু বলতেই পাহাড় ফেটে একজন মানুষ বেরিয়ে এল। মনে হল তিনি দলপতি। মাথার চুল এবং দাঁড়ি সাদা। তার গায়ে ছিল পশমের তৈরী তালি দেওয়া আল খেল্লা। এসেই তিনি সালাম করলেন। নজলা (রাঃ) সালাম দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন আপনি কে? তিনি বললেন আমি রযীন ইবনে বুরসুমুলা, হযরত ঈসা (আঃ) আমাকে ওসিয়ত করেছিলেন এবং তিনি এ পাহাড়ে দাঁড়িয়ে আপনার আগমন পর্যন্ত আমার দীর্ঘায়ূর জন্য দোয়া করেছিলেন। এজন্য দ্বিতীয়

খলীফা হযরত ওমর ইবনে খাত্তাবকে আমার সালাম জানাবেন এবং বলবেন যে, সত্য ও বৈধ কাজই যেন তিনি করেন। আল্লাহর নৈকট্য হাসিলের জন্য নিজেকে যেন তৈরী করেন। কারণ কিয়ামত অতি সন্নিকটে। তার কাছে একথাও বলে দিবেন যে, নিম্ন লিখিত বৈশিষ্টসমূহ যখন উম্মতে মুহাম্মদীয়ার মধ্যে পাওয়া যাবে তখন মনে করতে হবে যে, উম্মতে মুহাম্মদীয়ার পরিসমাপ্তি ঘটে গেছে। যেমন এক পুরুষ অপর পুরুষের উপর বেপরোয়া হয়ে উঠেবে। এক মহিলা অপর মহিলার উপর বেপরোয়া হয়ে উঠেবে। তারা নিজের কাজ ছেড়ে অন্যের কাজে লেগে যাবে এমনিভাবে অন্য মালিককে গ্রেফতার করবে। ব্যবসা বানিজ্য, লেন-দেন, মামলা-মোকাদ্দমার এমন অবস্থা হবে যে, বয়োজ্যাষ্ঠরা ছোটদের প্রতি আর ছোটরা বড়দের স্নেহ, মায়া-মমতা, ভক্তি থাকবে না। মানুষ সৎ কাজের আদেশকে বেমালুম ভুলে যাবে। এর প্রতি মোটেও মনোযোগ দিবে না, আর না অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকবে। আলেমগণ পার্থিব অগ্রগতির জন্য জ্ঞানার্জন করবে। গরম বৃষ্টি হবে। সন্তান সন্ততি-মাতাপিতার প্রতি রাগান্বিত হবে অবাধ্য হবে। মানুষ মসজিদের মিনারকে উচু থেকে উচু করবে। পবিত্র কুরআনকে পশ্চাদে ফেলে রাখবে। তথা তেলাওয়াত করবে না। মসজিদসমূহকে খুবই কারুকার্য মন্ডিত করবে, দালানগুলোকে অত্যন্ত শক্ত করে বানানো হবে। প্রবৃত্তির বাধ্য হয়ে যাবে। দ্বীনকে দুনিয়া দ্বারা বিক্রি করবে। আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। আল্লাহর হুকুম বিরোধী কাজ করবে। ব্যাপকভাবে সুদ খাবে, সম্পদশালীকে সম্মান করা হবে। ফকীরকে মান দেয়া হবে না। মানুষ ঘর থেকে বের হলে তার চেয়ে বেশী সম্মানী লোকে সালাম করলে জবাব দিবে। অনুপযুক্তরা ভাল ভাল পদের অধিকারী হয়ে যাবে। কিয়ামত সম্পর্কে এতটুকু সংবাদ দিয়ে সে ব্যক্তি অদৃশ্য হয়ে গেল।

এ সকল ঘটনা নজলা আনসারী (রাঃ) হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাসকে লিখে জানালেন। আর তিনি খলীফা ওমর (রাঃ) কে অবগত করেন। হযরত ওমর (রাঃ) এর উত্তরে পত্র দিয়ে জানালেন যে, আপনি নজলা আনসারী (রাঃ)সহ আনসার ও মুহাজিরীনদের নিয়ে সে পাহাড়ে গমন করুন। আবার যদি তার সাথে সাক্ষাৎ হয় তবে তাকে আমার সালাম জানাবেন। উপদেশ মোতাবেক সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) রওয়ানা হরলেন। সে সময় তার সাথে ৪০০০ হাজার আনসার মুহাজির ও তাদের সন্তানরা পর্যন্ত ছিল। যখন তিনি এ পাহাড়ে

পৌছলেন এবং ৪০ দিন সেখানে অবস্থান করলেন এবং আযান দিতে থাকেন কিন্তু কোন উত্তর পাওয়া যায়নি। উল্লেখিত বিষয়সমূহ লিখে আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রাঃ) কে জানালেন।

হযরত ওমর (রাঃ) এর কিছু উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড:

তিনিই সর্বপ্রথম ইতিহাসের গোড়া পত্তন করেন। এ পদক্ষেপ সম্ভবত ১৬ হিঃ সনে হয়েছিল। এ বছর বায়তুল মাকদ্দাস বিজয় হয়। এ বছরই হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস জয় করতে করতে মিশর এবং কূফা পর্যন্ত পৌছে যান। তিনিই (ওমর (রাঃ) প্রথম ব্যক্তিত্ব যিনি রেজিষ্টার খাতা এবং শহরের অনুমোদন দেন।

আল্লাহ পাক হযরত ওমরের (রাঃ) হাতে মুসলমানদের অনেক বিজয় দিয়ে পুরস্কৃত করেন। যেমন দামেস্ক, রোম, ক্বাদেসিয়া হামাস, হালাওয়ান, আররেক্কাহ, আররেহা, হিরান, বুসান, ইয়ারমুক, আহওয়াজ, কায়সারিয়া, মিশর, তশবর, নিহাওয়ান্দ, রাই এবং এর আশপাশ এলাকা ইসপাহান, পারস্য শহর, ইস্তাখার, হামদান, তাওয়াইবাহ, আনাবারলিস ইত্যাদি দেশ তাঁর খিলাফত আমলে মুসলমানদের হস্তগত হয়।

তাঁর চাবুক হজ্জাজ বিন ইউসুফের তরবারীর চেয়েও অধিক ভীতিজনক ছিল। রোম ও পারস্য রাজা বাদশাহগণ সবসময় তার ভয়ে ভীত- বিহবল থাকতেন। এর পরও তিনি অতি বিনম্রভাবে জিন্দেগী কাটাতেন। তার পোশাক, আসাক, বিনম্র ব্যবহার, বিনয় শিষ্টাচার ইত্যাদি খলীফা হওয়ার পূর্ব থেকেই ছিল। খলীফা হওয়ার বাসস্থানেরও কিঞ্চিত পরিবর্তন আসেনি। ভ্রমনে বা নিজ বাড়ীতে থাকাকালীন তিনি একাই চলতেন। কোন সঙ্গী বা দেহরক্ষী রাখার প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করেননি কোন সময়। পদমর্যাদার কারণে বসবাসের রীতিতে কোনই পরিবর্তন আসেনি। কোন মুসলমানকে কখনো কটু কথা বলেননি। আবার কাউকে সত্য বলা থেকে বিরতও থাকেননি। তার ন্যায় বিচারে কোন গরীব মানুষ নিরাশ হননি আর না কোন ভদ্র ব্যক্তিকে অত্যাচার ও লোভের কারণে বাড়াবাড়ি করতে হয়েছে। তিনি আল্লাহর আদেশ-নিষেধ কার্যকর করতে কখনও কাউকে ছাড় দেননি। বায়তুল মালের ব্যাপারে বরাবরই তাকে সাধারণ জনগনের ন্যায়ই মনে করা হত। তিনি প্রায়ই বলতেন ওহে লোক

সকল তোমাদের ধন-সম্পদকে আমি অনাথদের মালের মতই মনে করি। যেমন আমাকে অনাথদের অভিভাবক বানানো হয়েছে। আমি যদি সম্পদশালী হই তাহলে (মনে করো) পবিত্র মালেই হয়েছি। আর যদি আমার কোন প্রয়োজন পূর্ণ করি তাহলে হালাল উপার্জন থেকেই করি। এর থেকে তার উদ্দেশ্য হল আমার প্রাপ্য যা এসেছে তাই আমি খেয়েছি। অবিচার করে কারো মাল-ধন-সম্পদ আমি কিছুই খাইনা এবং অর্জনও করিনা।

মুজাহিদ বলেন, একদা জনগণ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের কাছে আমিরুল মু'মিনীন হযরত আবু বকর (রাঃ) এর আলোচনা করল। এর পর হযরত ওমরের (রাঃ) আলোচনা করতে লাগল। হযরত ওমরের (রাঃ) প্রসঙ্গ এলে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ভীষণভাবে কাঁদতে লাগলেন। অধিক কাঁদার কারণে তিনি বেহুশ হয়ে গেলেন। মুজাহিদ বলেন, আল্লাহ পাক হযরত ওমর (রাঃ) এর উপর রহম করুন। তিনি নিয়মিত কোরআন তেলাওয়াত করতেন এর উপর আমল করতেন। আল্লাহ তাআলার হুকুমের উপর আমল করে বিচার করতেন বরং হদ জারি করতে গিয়ে কাউকে চুল পরিমাণও পরওয়া করতেন না। মুজাহিদ বলেন, আমি হযরত ওমর (রাঃ) কে তাঁর ছেলের বিচার করতে দেখেছি।

দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর (রাঃ) এর শাহাদাতঃ

হযরত ওমর (রাঃ) ২৩ হিজরীতে শাহাদাত বরণ করেন। মুগীরা ইবনে শো'বার এক গোলাম তাঁকে হত্যা করেছি। তার নাম ছিল আবু লুলু ফিরোজ। ঘটনাছিল এই, হযরত মুগীরা (রাঃ) তাকে দিয়ে চাক্কী বানাতেন। এর পারিশ্রমিক স্বরূপ তাকে দৈনিক ৪ দিরহাম প্রদান করতেন। একদিন হযরত ওমরের (রাঃ) সাথে আবু লুলুর সাক্ষাৎ হলে সে হযরত ওমরের কাছে অভিযোগ করল যে, আমার মুনিব মুগীরা আমার উপর অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে। আপনি তার সাথে আলোচনা করে আমার কাজ হালকা করে দিন। হযরত ওমর (রাঃ) তাকে উপদেশ দিয়ে বললেন, তুমি আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমার মুনিবের সাথে সৎব্যবহার কর। এটুকু বলতেই আবু লুলু রাগান্বিত হয়ে গেল। সে যেতে যেতে বলতে লাগল, কি আশ্চর্যের কথা ন্যায় বিচার আমাকে ছাড়া অন্যান্য লোকদের সাথে করা হয়। বাস! আবু লুলু এই দিন থেকেই হযরত ওমরকে (রাঃ) হত্যা

করার দৃঢ় সংকল্প করল। সে দু'ধারী একটি মারাত্মক খঞ্জর বানাল। আর আমিরুল মুমিমনীনকে হত্যা করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠল। একদিন হযরত ওমর (রাঃ) ফজরের নামায আদায়ের জন্য বের হলেন। ওমর বিন মাইমুন বলেন, আমি নামায পড়তে ছিলাম। আমার এবং ওমরের মাঝখানে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসই শুধু অন্তরায় ছিলেন। এমন সময় ওমর (রাঃ) তাকবীর বললেন কিছুক্ষণ পরই শুনা গেল সে সময় তার উপর নেযার ব্যবহার করল, তখন তিনি বলতে লাগলেন আমার উপর কুকুর আক্রমণ করেছে। হত্যা করার পর সে কমবখত ছুরীসহ পলায়ন করল। সে দুধারী তলোয়ার যা ডান বাম দিয়ে প্রবেশ করলে মানুষকে আহত করতে সক্ষম হয়। তলোয়ারটি আনুমানিক ২৩ জন লোককে আহত করেছিল। এতে সাতজন লোক শহীদ হয়। কেউ ৯ জনের কথাও বলেছেন। জনৈক মুসলমান তাকে দেখার পর তার উপর একটি চাদর ছুড়ে মারল। ঘাতক বুঝতে পারল যে, তাকে আটক করা হবে, তাতে সে তলোয়ার চালিয়ে দিল। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, আল্লাহ তাকে (আবু লুলুকে) ধ্বংস করুন। আমি তো তাকে ভাল পরামর্শই দিয়ে ছিলাম। এর পর তিনি বললেন আল্লাহর শুকর যে আমি কোন মুসলমানের হাতে নিহত হচ্ছিনা। আবু লুলু ছিল একজন অগ্নি পুজক। কেউ বলেছেন সে খ্রীষ্টান ছিল ।

শাহাদাতের তারিখ ও খেলাফত কাল:

হযরত ওমরের (রাঃ) শাহাদাতের ঘটনা ২৪হিঃ জিলহজ্জ মাসে সংঘটিত হয়েছে। আহত হওয়ার পর তিনি একদিন একরাত জীবিত ছিলেন। এর পর তিনি আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যান। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন) ইন্তিকালের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর। অনুমতিক্রমে তাঁকে হযরত আয়েশার (রাঃ) হুজরা মোবারকে দাফন করা হয়। যখন হযরত ওমরের (রাঃ) ইন্তেকাল হল তখন ভূপৃষ্ঠে অন্ধকারে ছেয়ে যায়। শিশুরা বলতে লাগল হায় হায় আম্মা কিয়ামত এসে গেছে। তখন মা বলতেন না কিয়ামত নয় হযরত ওমরের (রাঃ) ইন্তেকাল হয়েছে।

মুহাম্মদ বিন ইসহাক বলেন, হযরত ওমরের খেলাফতের সময়কাল ছিল ১০ বছর ৬মাস ৫ রাত। কোন কোন আলেম বলেছেন ১৩দিন।

তৃতীয় খলীফা হযরত উছমান গণী (রাঃ) এর খেলাফত:

ইসলামের ২য় খলীফ হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) এর পর হযরত উছমান (রাঃ) খলীফা নির্বাচিত হন। হযরত ওমরের (রাঃ) ইন্তেকালের তিনদিন পর বিবেকবান ব্যক্তিবর্গের পরামর্শক্রমে তার বাইয়াত এর উপর সকলেই ঐক্যমত পোষণ করেন। তিনি ছিলেন নবী করীম (সাঃ) এর চাচাত ভাই। বিজ্ঞ আলেমদের মতানুসারে ২৪ হিঃ প্রথম দিনেই খেলাফতের বাইআত করা হয়।

ইতিহাসবিদগণ বলেন, বর্বর যুগ ও ইসলাম যুগ উভয়যুগে তার নাম উছমান-ই ছিল। উপনাম ছিল আবু ওমর ও আবু আব্দুল্লাহ। কিন্তু প্রথম উপনামই খ্যাত ছিল। তাঁকে উমাইয়া ইবনে আব্দে শামস এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত করে বলা হয়ে থাকে। তার বংশধারা নবী করীম (সাঃ) এর সাথে আবদে মনাফ পর্যন্ত গিয়ে মিলিত হয়েছে। তাকে জিন্নুরাইন (দু' নূর বিশিষ্ট) বলা হত। কোন কোন উলামায়ে কেরাম এর কারণ স্বরূপ বলেছেন, তিনি নবীকরীম (সাঃ) এর দু কন্যা (রুকাইয়া ও উম্মে কুলছুম) ব্যতীত কোন মহিলাকে বিয়ে করেননি। তাদের পরেও তিনি অন্য কোন মহিলাকে বিয়ে করেন নি। সে জন্য জিন্নুরাইন বলা হত।

কেউ কেউ বলেছেন, যেহেতু হযরত ওছমান যখন জান্নাতে প্রবেশ করবেন তখন দু'বার নূরের আলোচ্ছটা প্রকাশিত হবে। সে কারণে তাকে জিন্নুরাই বলা হয়। কারো কারো মতে তিনি বেতর নামাযে পূর্ণ কোরআন খতম করতেন। যেহেতু পবিত্র কোরআন একটি নূর এবং বেতর নামাযও একটি নূর। আবার কেউ কেউ বলেছেন তিনি প্রথম মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত এবং উভয় কিবলার দিকে নামায পড়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। তিনি ২ বার হিজরতও করেছেন। (মদীনা ও হাবশা) এজন্য তাকে জিন্নুরাইন কলা হয়।

তাঁকে বদর যুদ্ধ ও বাইয়াতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে গণ্য করা হয়। অথচ তিনি এ দুটির কোনটিতে সরাসরি শরীক ছিলেন না। বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ না কারার কারণ হল তার বিবি রুকাইয়া বিনতে মুহাম্মদ (সাঃ) অসুস্থ ছিলেন। তাই জনাব রাসুলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর সেবা শুশ্রূষা করতে রেখে যাওয়ার কারণে যুদ্ধের অনুমতি দেননি। তবে বলা হয় যে তাঁকে যুদ্ধ লব্ধ সম্পদে একজনের অংশ ও এক শহীদের সওয়াবও দেয়া হয়। বাইয়াতে রিজওয়ানে অংশগ্রহণ না করার কারণ হল তাঁকে ব্যতীত কোন ব্যক্তি যদি মদীনাতে বেশী

মর্যাদার অধিকারী হত তাহলে হুযূর (সাঃ) তাঁকেই ওছমানের স্থলে পাঠিয়ে দিতেন। বাইয়াতের সময় নবী করীম (সাঃ) তাঁর ডান হাত মোবারকের দিকে ইশারা করে বলে ছিলেন ইহা উছমানের হাত। তাঁর মান মর্যাদার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, নবী করীম (সাঃ) এর ইন্তেকালের সময় তাঁর উপর তিনি (সাঃ) সন্তুষ্ট ছিলেন। দুনিয়াতে থাকতেই তাঁকে বেহেশতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছিল। বেশ কয়েক বার নবী করীম (সাঃ) তাঁর জন্য বিশেষ দোয়া করে ছিলেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য কার্যাদী:

তিনি একজন সম্পদশালী এবং প্রাচুর্যবান, নম্র মেজাযের, দয়ালু এবং মহানুভব সাহাবী ছিলেন। তাঁকে খলীফা নির্বাচিত করার পর তাঁর নম্রতা ও ভদ্রতা আরো বৃদ্ধি পায়। প্রজা সাধারণের সাথে তাঁর স্নেহ মমতা আরো বেশী বেশি হয়। সাধারণ মানুষকে তিনি ভাল ভাল আহার দিতেন। কিন্তু নিজে সিরকাহ এবং যাইতুনের তৈল ব্যবহার করতেন। সৈন্য বাহিনীকে তিনি সব সময় ৯৫০ টি উটের মালামাল দ্বারা তৈরী রাখতেন। বস্তা বোঝাই মালামাল এবং সাজ সরঞ্জাম সহ দেয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে আরো অতিরিক্ত ৫০টি উট মিলিয়ে ১০০০ পূর্ণ করেন।

হযরত কাতাদাহ (রাঃ) বলেন, হযরত উছমান (রাঃ) ১০০০ হাজার উট এবং ৫০টি ঘোড়াকে মালামাল দিয়ে বোঝাই করেন। ইমাম যহুরী (রহঃ) বলেন ৯৫০টি এবং ৪০টি ঘোড়া দ্বারা সাহায্য করা হয়েছিল। হুজাইফা ইবনে ইয়ামান বলেন যে, হুজুর (সাঃ) হযরত উছমান (রাঃ) কে সৈন্যদের যুদ্ধ ফান্ড তৈরী করার জন্য প্রেরণ করেন। তিনি ১০ হাজার স্বর্ণমুদ্রা হুজুর (সাঃ) এর খেদমতে প্রেরণ করেন। তখন হুযুর (রাঃ) আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে হযরত উছমানের হাতে চুমু খেয়ে বলেছিলেন, হে উছমান! কিয়ামত পর্যন্ত ইচ্ছায় অনিচ্ছায় যা কিছু কর আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন। এক বর্ণনায় আছে যে, হুযূর (সাঃ বলেছেন আজকের দিনের পর উছমান (রাঃ) যা কিছুই করুক না কেন এগুলো তার জন্য ক্ষতিকারক হবে না। তিনি রাওমাহ কুপ ২৫ হাজার স্বর্ণ মুদ্রা দ্বারা ক্রয় করে তা সাধারণ মানুষের জন্য ওয়াকফ করে ছিলেন। এ ধরনের কাজ তাঁর অগণিত। বিস্তারিত বর্ণনা করতে গেলে এতেই পৃথক পুস্তক তৈরী হবে।

ইবনে কুতাইবাহ (রাঃ) বলেন, হযরত উছমানের খেলাফত কালে

ইসকান্দারিয়া, সাবুর, তিবরিজ, রোম উপকূল, উস্তখার, প্রথম প্যারিস, প্যারিসের শেষ খুজিস্তান, তিবরিস্তান, কিরমান, সিজিস্থান, আল-আসবিয়াহ, আফ্রিকা, পারস্যের দুর্গ, জর্দানের উপকূলীয় এলাকা এবং মরো ইত্যাদি দেশ বিজয় করেন। মদীনা মুনাওয়ারা যখন আবাদ হয়ে যায় এবং ইসলামের দূর্গে পরিণত হয়, ধন দৌলতে পরিপূর্ণ হয়, বড় বড় রাজ্য থেকে যখন কর আদায় হয়ে আসতে শুরু হয় তখন প্রজাগণ ধন-সম্পদ ও পশুসম্পদ ও ঘোড়া আধিক্যতার কারণে অহংকারী হয়ে উঠে। আর যখন তারা বড় বড় রাজ্য জয় করে ফেলল তখন তারা খুবই আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠল। তারা আমীরুল মু'মিনীনের ক্ষতি করতে নিমগ্ন হয়ে পড়ল। কারণ হযরত উছমানের কাছেও ঢের সম্পদ ছিল। তার নিকট ছিল ১০০০ হাজার গোলাম। তিনি তার নিকটজনদেরকে ধন-সম্পদ দ্বারা প্রচুর সহায়তা করেন। জনগণ তার ছিদ্রান্বেষণ করতে লাগল। কেউ কেউ এমনও বলতে লাগল যে, তিনি খেলাফতের অনুপযুক্ত। তাই তাকে হটিয়ে দেয়া দরকার। তারা বেশ কয়েকদিন তার বাড়ী ঘেরাও করে রাখল। এতেই বুঝা যায় যে, তারা কত অত্যাচারী ও সন্ত্রাসী ছিল। তিন ব্যক্তি তার বসত ঘরে প্রবেশ করে তাঁকে হত্যা (যাবই) করে ফেলল। তাঁর সম্মুখে কোরআনে করিম খোলা ছিল। তিনি কোরআন পাঠে মগ্ন ছিলেন। তিনি ছিলেন বৃদ্ধ লোক। নবী রসূলগণের পরেই তাঁকে বেশী কষ্ট দেয়া হয়েছে। যারা তাঁকে হত্যা করেছে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে অবশ্যই জিজ্ঞেস করবেন। ৩৫ হিঃ ১৮ই জিলহজ্জ জুম্মাবার এই ঘটনা ঘটে।

হযরত উছমানের (রাঃ) গুণাবলী:

হযরত ওছমানের (রাঃ) গুণাবলী অসংখ্য রয়েছে, কয়েকটি এখানে আলোচনা করা হল। নবী করীম (সাঃ) তাঁকে জীবিত থাকাকালীনই বেহেশতের সুসংবাদ প্রদান করেন। হুযূর (সাঃ) হযরত ওছমানের ব্যাপারে বলেছেন যাকে দেখে ফেরেশতারা পর্যন্ত লজ্জা পেত আমি তাকে দেখে কেন লজ্জিত হব না? তাঁর শহীদ হওয়ার ব্যাপারে নবী করীম (সাঃ) ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন। সুতরাং তা ঘটেও গেল। তিনি ইন্তিকাল করার পর মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য দেখা দেয়। জনগণের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করে। তাঁর হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য মানুষ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকে। শেষ পর্যন্ত এ ঘটনার জের ধরে ৯০ হাজার মুসলমান নিহত হল। ঐতিহাসিক ইবনে খল্লিকান লিখেছেন তিনি যখন

খেলাফতের জন্য বাইয়াত গ্রহণ করলেন তখন আবুজর গিফারীকে (রাঃ) তিনি নজদের এক মরুভূমি এলাকায় নির্বাসনে পাঠিয়ে দেন। কারণ তিনি এবং তাঁর মত লোকেরা সাধারণকে দুনিয়া থেকে একদম আলাদা থাকার অনুপ্রেরণা দিতেন।

মতানৈক্য ও ঝগড়ার উৎপত্তি:

হযরত উছমান (রাঃ) আব্দুল্লাহ ইবনে আবু মিসরাহ কে মিশরের হাকেম নিযুক্ত করেছিলেন। নিকটাত্মীয় এবং প্রতিবেশীদেরকে খুব বেশী ধন সম্পদ দ্বারা সুখী করে দেন। একারণেই মানুষের উত্তেজনা প্রজ্জলিত হয়ে উঠল। ৩৫ হিজরী সন থেকেই এ ঘটনার সুত্রপাত হয়। মালিকুল উশতার আন নখয়ী ২০০ খুফী, ১৫০ জন বসরী এবং ৬০০ মিশরী নিয়ে মদীনা মনোয়ারা এসে এ আওয়াজ দিল যে, হযরত ওছমান (রাঃ) কে খেলাফতের আসন থেকে বিতাড়িত করতে হবে। এ সমস্ত লোক যখন একত্রিত হয়ে গেল তখন খলীফা উছমান (রাঃ) মুগীরাহ ইবনে শো'বা আমর ইবনে আস (রাঃ) কে নিয়ে কোরআন ও সুন্নাহর দিকে আহবান করতে লাগলেন। কিন্তু তারা এমনই নিষ্ঠুর হয়ে গেল যে, এ সকল মহারতিদের আহবানের পাত্তাই দিল না এবং তাদের কথাবার্তা শুনতে অস্বীকার করে বসল। পরবর্তীতে হযরত আলীকে (রাঃ) তাদের কাছে প্রেরণ করা হল। যাতে তারা তাদের সংকল্পের পরিবর্তন করে। হযরত আলী (রাঃ) নিজেই এ কথার যামানত নিলেন যে, হ্যাঁ এখন হযরত উছমান (রাঃ) কিতাবুল্লাহ এবং সুন্নাতে রাসূলের হুকুম মোতাবিক আমল করবেন। এদিকে হযরত আলী (রাঃ) কে তারা কারণ বানিয়ে হযরত উছমান (রাঃ) থেকে একথার প্রতিশ্রুতি নিলেন এবং তাদেরকে স্বাক্ষী বানালেন যে, আমাদের দাবী যামীন বুঝা গেল। মিশরীয়রা এ দাবী করল যে, আব্দুল্লাহ ইবনে আবু মিসরাহকে সরিয়ে মোহাম্মদ বিন আবু বকরকে মিশরের বিচারক নিযুক্ত করতে হবে। সুতরাং মিশরীয়দের এ দাবী হযরত উছমান (রাঃ) মেনে নিলেন এবং মুহাম্মদ বিন আবু বকরকে মিশরের বিচারক নিযুক্ত করলেন। এ দাবী পুরণ হওয়ার পর সমস্ত দল উপদল নিজ নিজ শহরে ফিরে গেল। মিশরীয় কাফেলা যখন আইলা নামক স্থানে পৌছল তখন তারা হযরত উছমানের একজন বিচক্ষণ ব্যক্তিকে চলে যেতে দেখল। তল্লাশী করে দেখাগেল তার কাছে হযরত উছমানের একখানা চিঠি যার মাধ্যে তাঁর সীল রয়েছে। সে চিঠি হযরত উছমানের পক্ষ থেকেই লিখা। তার

মধ্যে লিখাছিল এ চিরকুট উছমানের পক্ষ থেকে আব্দুল্লাহ ইবনে আবু মিসরা মিশরের বিচারকের নামে। মুহাম্মদ বিন আবুবকর যখন অমুক অমুক লোক নিয়ে আসবে তখন এদের হাত পা কর্তন করে খেজুর বৃক্ষে ঝুলিয়ে দিবে'' এ সংবাদ যখন খুফী, বসরী এবং মিশরীদের কাছে পৌছল তখন তারা সকলেই পুনরায় ফিরে এলো। তারা যখন হযরত উছমানের কাছে এসে এ ব্যাপারে তাকে জানাল তখন তিনি কছম করে বললেন যে, এই কাজ আমি তো করিইনি এমনকি আমার হুকুমে লিখাও হয় নাই। তারা বলল এখন আপনার জন্য অন্য কোন পন্থা বাকী নেই। তার কাছ থেকে খেলাফতের আংটি ছিনিয়ে নেয়া হল। তাঁর বিশেষ বাহনের উট নজীবও নিয়ে গেল। এর কোন খোজ নেই। অবস্থা তার (রাঃ) প্রতিকূলে চলে গেল। এখন তাকে খেলাফতের আসন ছাড়তে হবে মর্মে দাবী করা হলো।

যদি তিনি এ দাবী মানতে অস্বীকৃতি জানান তবে সকলেই তাকে অবরোধ করবে। শেষ পর্যন্ত তারা হযরত উছমানের (রাঃ) ঘর অবরোধ করে ফেলল। এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী ছিল মুহাম্মদ বিন আবুবকর। এই অবরোধ শাওয়ালের শেষ দিকে হয়েছিল আর তা এতই কঠোর ছিল যে, পানীয় জল পর্যন্ত তারা রুখে দিয়েছিল।

আবাসস্থলে অবরোধ:

হযরত উসামা আল বাহেলী বলেন, হযরত উছমান (রাঃ) কে যখন অবরোধ করা হয় তখন আমি তার ঘরেই ছিলাম। হযরত উছমান (রাঃ) বলেছিলেন ভাই তোমরা অবরোধ করে আমাকে কেন হত্য করতে চাও? আমি নবী করীম (সাঃ) এর নিকট শুনেছি যে, তিনি এরশাদ ফরমান তিন জায়গা ব্যতীত মুসলমানের রক্ত ঝরানো জায়েয নেই। প্রথমত: মুসলমান হওয়ার পর মুরতাদ হয়ে গেলে, দ্বিতীয়ত: বিয়ে করার পর কেউ ব্যভিচারে লিপ্ত হলে। তৃতীয়ত: কোন মুসলমানকে অন্যায়ভাবে হত্যা করলে। সুতরাং এই তিনের যে কোন একটি পাপ করলে তাকে হত্যা করা বৈধ। আল্লাহর কসম! যেদিন থেকে আল্লাহ পাক আমাকে হেদায়াত দিয়ে ভূষিত করেছেন, সেদিন থেকে আমি দ্বীন ছাড়া অন্য কোন আদর্শ মানি নি, আর না জাহেলী যুগে এবং ইসলাম গ্রহণের পর যেনার কাজে লিপ্ত হই, আর না কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছি। তাহলে

কেন আমাকে হত্যা করতে চাও?

অবরোধ কালে হযরত আলী (রাঃ) এর সাহায্য:

সদ্দাদ বিন আওস বলেন যে দিন আবরোধ শক্তিশালী হয়ে গেল সে দিন হযরত উছমান ঘর থেকে বের হয়ে হুজুর (সাঃ) এর পাগড়ী মোবারক ও তার নিজের তরবারীর বাট ফেলে দিলেন। ছেলে হাসান (রাঃ) এবং আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) মুহাজির এবং আনসারদের একদল ছিলেন। তারা এসে অবরোধকারীদেরকে ধমকিয়ে বিক্ষিপ্ত করে ফেলেন। কিছুক্ষণ পর তারা হযরত উছমান (রাঃ) এর নিকট যান। হযরত আলী তাকে সালাম দিয়ে বললেন হে আমীরুল মুমিনীন! হজুর (সাঃ)এ ব্যাপারটিও ছাড়েননি যতক্ষণ না আক্রমণকারীদের ধ্বংস করে দেন। আল্লহর শপথ! আমার দৃষ্টিতে কওম এমনই উত্তেজিত যে, তারা আপনাকে পদচ্যুত করে ছাড়বে। এজন্য আপনি আদেশ করুন তাহলে আমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করব এবং আপনার পক্ষ থেকে তারা বর্শা হয়ে আবির্ভূত হবে। হযরত উছমান (রাঃ) বললেন, আলী সাহেব আল্লাহর কসম যদি কারো জিম্মা আল্লাহর হক বেরিয়ে আসে, অথবা সে যদি একথা স্বীকার করে যে, তার উপর আমার হক আছে যে কারণে সিংগা লাগানো পরিমান রক্ত প্রবাহিত করে, তাহলে এর জন্যও মোটেও প্রস্তুত নই। দ্বিতীয় বার হযরত আলী তাই বললেন যে, যদি আপনি আমাকে আদশে করেন তাহলে ওদের সাথে যুদ্ধ করব। কিন্তু এবারও প্রথমোক্ত জবাবই দিলেন।

হযরত উছমান (রাঃ) এর প্রতি আক্রমণ:

সদ্দাদ বিন আউস বলেন, এ ঘটনা চলা কালীন আমি হযরত আলী (রাঃ) কে দেখলাম যে তিনি দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসছেন আর বলছেন যে, আল্লাহর কসম আমি আমার যাবতীয কৌশলই প্রয়োগ করেছি। এসময় হযরত আলী (রাঃ) মসজিদে প্রবেশ করলেন। তখনই দুস্কৃতিকারীরা হযরত উছমানের উপর আক্রমণ করে বসে। হযরত ওছমান (রাঃ) তখন নিজ ঘরে কোরআন তেলাওয়াত করতে ছিলেন। মুহাম্মদ বিন আবু বকর তাঁর (উছমানের) দাঁড়ি ধরে টান মারল। তখন তিনি বললেন ভাতিজা দাড়ি ছেড়ে দাও। তুমি আমার সাথে এমন আচরণ করতে পারলে? তোমার পিতা যদি তা দেখতেন তাহলে তিনিও তা অত্যন্ত খারাপ মনে করতেন। একথা শুনে মুহাম্মদ দাঁড়ি ছেড়ে দিয়ে সেখান

থেকে চলে গেল। এরপর বাত্তার ইবনে আয়াজ এবং সাওদান ইবনে হামরান উভয়েই নিজ নিজ তরবারী দ্বারা আক্রমণ করল। হযরত ওছমানের (রাঃ) দেহ মোবারক থেকে রক্ত ঝরতে লাগল। রক্তের ছিটা কোরানের নিম্ন আয়াতে গিয়ে পড়ল।

فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم

"অচিরেই আল্লাহ পাক তার পক্ষ থেকে প্রতিশোধ নিবেন। তিনি সব কিছু শোনেন ও দেখেন।"

এদের আক্রমনের পর পূনরায় ইমরান ইবনে হুমুক হযরত উছমানের বুকের উপর চড়ে তাঁকে মারতে লাগল। তিনি শহীদ হয়ে গেলেন। সর্বশেষ ইমরান ইবনে সাবী তার পেটের উপর ইচ্ছামত পদদলিত করে এতে তাঁর উভয় পাজরের হাড় ভেঙ্গে যায়।

কাব বিন হাজরাহ বলেন, নবী করীম (সাঃ) এরশাদ ফরমান, অচিরেই একটি মারাত্মক ফিতনা দেখা দিবে। এরপর এক ব্যক্তি একটি চাদর গায়ে জড়িয়ে আসলে নবী করীম (সাঃ) বললেন, এ ব্যক্তি সেদিন সত্যের উপর অবিচল থাকবে। দেখা গেল লোকটি ছিলেন হযরত উছমান (রাঃ) । ইমাম তিরমিযি (রহঃ) বলেন "সেদিন হক্কের উপর থাকে" এর মর্মার্থ হল সে হেদায়াতের উপর থাকবে। ইমাম তিরমিযি এ হাদীছকে হাসান এবং সহীহও বলেছেন। ইবনে আবুল মাহদী বলেন, হযেত উছমানের (রাঃ) কাছে এমন দু'টি বৈশিষ্ট ছিল যা হযরত আবু.বকর সিদ্দিক ও ওমরের (রাঃ) নিকটও ছিলনা। এক. নিজকে এতই নিয়ন্ত্রিত রেখেছিলেন যে, অত্যাচরিত হওয়ার পর তাকে শহীদও করা হল। দুই. সমস্ত মানুষকে পবিত্র কুরানের উপর একত্রিত করেছিলেন।

শাহাদাত বরনের তারিখ:

আল মাদায়েনী বলেন, হযরত উছমান গণী (রাঃ) এর শাহ্যদাত বুধবার আসরের নামাযের পরে সংঘটিত হয়। শনিবার জোহেরের পূর্বে কাফনের পর দাফন করা হয়। কেউ কেউ বলেছেন জুমাবারই দাফন করা হয়। সম্ভবত ১৮ই জিলহজ্জ ২৫ হিঃ সনে এ ঘটানা সংগঠিত হয়। আল মাহদী বলেন, তাশরীকের দিনগুলোর মাঝামাঝিতে তাকে শহীদ করা হয়। এরপর তিনদিন পর্যন্ত তাকে

দাফন করা হয়নি। জানাযার নামাযও পড়া হয় নি। আলেমগণ বলেছেন জুবায়ের ইবনে মুতইম তার জানাযাতে ইমামতি করেন। রাতেই তাঁকে দাফন করা হয়।

হযরত ওছমা(রাঃ)কে অবরোধ করে কত দিন রাখা হয়েছিল এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেছেন ২০ দিনেরও বেশী , কেউ বলেছেন ২৯ দিন। ইমাম ওয়াকেদী (রহঃ) ২৯ দিনের মতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। কিন্তু যুবাইর ইবনে বাকার বলেছেন ৮০ দিন পর্যন্তই এই অবরোধ চলছিল।

হযরত ওছমানের (রাঃ) খেলাফতকাল:

তিনি (রাঃ) ১২দিন কম ১২ বছর খেলাফতের আসনে সমাসীন ছিলেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। এটি মুহাম্মদ বিন ইসহাকের মত। কেউ কেউ বলেছেন তার খেলাফতকাল ছিল ১১ বছর ১১মাস ৪দিন। আর তার বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। আবার কারো মতে ৮৩ বছর। কিছু কিছু ঐতিহাসিক বলেছেন তাঁর বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। এছাড়া আরো বেশ কিছু মতামত রয়েছে।

চতুর্থ খলীফ হযরত আলী ইবনে আবি তালিবের (রাঃ) খেলাফত:

ইসলামের তৃতীয় খলীফা আমিরুল মু'মিনীন হযরত উছমান গণী (রাঃ) এর শাহাদাতের পর হযরত আলী (রাঃ) কে খলীফা নির্বাচিত করা হয়। হযরত উছমান (রাঃ) কে যেদিন শহীদ করা হয় সেদিনই হযরত আলী (রাঃ) থেকে খেলাফতের বাইয়াত নেয়া হয়। হযরত আলীর (রাঃ) বংশপরম্পরা হুজুর (সাঃ) এর দাদা আব্দুল মুত্তালিব পর্যন্ত গিয়ে মিলেছে। তাঁকে হাশেমীয়দের সাথে সম্পর্কযুক্ত করা হয়। এ জন্য তাকে আল কোরাইশী আল হাশেমীও বলা হয়। তিনি ছিলেন নবী করীম (সাঃ) এর চাচাত ভাই। জাহেলী ও ইসলাম যুগে তার নাম আলীই ছিল। উপাধি আবুল হাসান, আবু তোরাব। নবী করীম (সাঃ) নিজেই নামটি রাখেন। নবী করীম (সাঃ) এর সাথে তাঁর অত্যন্ত প্রগাঢ় সম্পর্ক ছিল। তিনি সাত বছর বয়েসেই ইসলাম গ্রহণ করেন। কারো কারো মতে ৯ বছর বয়সে, কারো মতে ১০ বছর বয়সে, আবার কারো মতে ১৫ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তবুক অভিযান ছাড়া ইসলামের সবকটি যুদ্ধেই তিনি অংশগ্রহণ করেন। গাযওয়ায়ে তবুক-এর সময় নবী করীম (সাঃ) তাঁকে ঘর-বাড়ী

দেখা-শুনার দায়িত্ব দিয়ে রেখে গিয়ে ছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত জ্ঞানী। মদীনার দিকে হিজরত করার সময় নবী করীম (সাঃ) তাঁকেই নিজ বিছানায় রেখে চলে গিয়েছিলেন। তিনি তিন দিন পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করে নবী করীম (সাঃ) এর নিকট মানুষের গচ্ছিত আমানত ফেরত দেন। এরপর তিনি হিজরত করে মদীনায় চলে যান। কম বয়সী লোকদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন এবং সর্বপ্রথম নামায আদায় করেন।

হুযূরে পাক (সাঃ) এর দুলালী মা ফাতেমা (রাঃ) ছিলেন তাঁর সহধর্মিনী। বিয়েতে জাহীজ হিসেবে নবী করীম (সাঃ) রেশমের একটি চাদর, খেজুরের ছাল ভর্তি চামড়ার একটি বালিশ। দুটি চাক্কি, একটি চমড়ার ছোট থলে, দুটি লোটা দিয়েছিলেন। দুনিয়াতেই তাঁকে নবী করীম (সাঃ) বেহেশতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। তাঁর অনেক কীর্তি রয়েছে। শুধু এতটুকুই যথেষ্ট যে নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন - انا مدينة العلم وعلى بابها

"আমি হলাম বিদ্যার শহর আর আলী হল সে শহরের দরজা।"

দুঃসাহসী পয়গাম্বর কে কে?

প্রখ্যাত পাঁচ জন পয়গাম্বরকে দুঃসাহসী পয়গম্বর বলা হয়ে থাকে। তাঁরা হলেন (১। হযরত নূহ (আঃ) ২। হযরত ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ (আঃ) ৩। হযরত মুস (আঃ) ৪। হযরত ঈসা (আঃ) ৫। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)

মায়ের গর্ভ থেকে খতনাসহ জন্মগ্রহণকারী কয়েকজন পয়গাম্বর:

কবি আল আহবার (রাঃ) বলেন, যারা মায়ের গর্ভ থেকেই খতনা অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁরা হলেন মোট ১৩ জন: ১। আবুল বাশর হযরত আদম (আঃ) ২। হযরত শীষ (আঃ) ৩। হযরত ইদ্রিস (আঃ) ৪। হযরত নূহা (আঃ) ৫। হযরত শাম (আঃ) ৬। হযরত লুৎ (আঃ) ৭। হযরত ইউসুফ (আঃ) ৮। হযরত মুসা (আঃ) ৯। হযরত শোয়াইব (আঃ) ১০। হযরত সুলাইমান (আঃ) ১১। হযরত ইয়াহইয়া (আঃ) ১২। হযরত ঈসা (আঃ) ১৩। শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)

মুহাম্মদ বিন হাবীব আল হাশিমী বলেন, খতনাসহ মায়ের পেট থেকে জন্মগ্রহণকারী পয়গম্বর হযরাতের সংখ্যা ১৪ । তাঁরা হলেন:

১। আবু বাশর হযরত আদম (আঃ) ২। হযরত শোয়াইব (আঃ) ৩।

হযরত নূহ (আঃ) ৪। হযরত হুদ (আঃ) ৫। হযরত সালেহ (আঃ) ৬। হযরত লূৎ (আঃ) ৭। হযরত ইউসুফ (আঃ) ৮। হযরত মুসা (আঃ) ৯। হযরত সুলাইমান (আঃ) ১০। হযরত যাকারিয়া (আঃ) ১১। হযরত ঈসা (আঃ) ১২। হযরত হানযালা ইবনে সাফওয়ান (আঃ) যিনি আসহাবে রা'ছ এর নিকট প্রেরিত হয়েছিলেন।১৩ শীষ (আঃ) ১৪। শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)।

হুযূরে পাক (সাঃ) এর ওহী লেখকগণ:

১। হযরত আবুবকর (রাঃ) ২। হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) ৩। হযরত ইউছমান গণী (রাঃ) ৪। হযরত আলী (রাঃ) ৫। হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) তিনি সর্ব প্রথম কাতেবে ওহী ছিলেন। ৬। হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত আল আনসারী (রাঃ) ৭। মোয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রাঃ) ৮। হযরত হানযালা (রাঃ) ৯। হযরত খালিদ বিন সাঈদ ইবনুল আস (রাঃ)

নবুয়াতের ইতিহাস সংরক্ষণকারী সাহাবায়ে কেরাম:

১। ইবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) ২। মা'আজ বিন জাবাল (রাঃ) ৩। আবু যায়েদ আনসারী (রাঃ) ৪। আবুদ্দারদা (রাঃ) ৫। যায়েদ ইবনে ছাবিত (রাঃ) ৬। উছমান ইবনে আফফান (রাঃ) ৭। তামিমুদ্দারী (রাঃ) ৮। উবাদাহ ইবনে ছামিত (রাঃ) ৯। আবু আইয়ূব আসারী (রাঃ)।

হুযূর পাক (সাঃ) এর সামনে গরদান উগিয়েছেন এমন কতিপয় সাহাবী :

১। ইবাই ইবনে কাব (রাঃ) ২। মাআজ ইবনে জাবাল (রাঃ) ৩। আবু আইয়ূব আনসারী (রাঃ) ৪। আবুদ্দারদা (রাঃ) ৫। মিকদাদ ৬। আসেম ইবনে আবুল আফলাহ (রাঃ)।

হুযূর (সাঃ) এর দেহরক্ষীগণ:

১। সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) ২। সা'দ বিন মাআজ (রাঃ) ৩। উব্বাদ বিন বিশর (রাঃ) ৪। আবু আইয়ূব আনসারী (রাঃ) ৫। মোহাম্মদ বিন মাসলামা (রাঃ)।

নিম্ন আয়ত নাযিল হওয়ার পর নবী (সাঃ) তাঁর নিরাপত্তার চিন্তা ভাবনা ত্যাগ করেন: والله يعصمك من الناس

"আল্লাহ পাক আপনাকে মানুষের কবল থেকে রক্ষা করবেন।"

নবুওয়াত যুগে সম্মানিত ফক্বীহ সাহাবা (রাঃ) গণ:

১। হযরত আবু বকর (রাঃ) ২। হযরত ওমর (রাঃ) ৩। হযরত উছমান (রাঃ) ৪। হযরত আলী (রাঃ) ৫। আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) ৬। উবাই ইবনে কাআ'ব (রাঃ) ৭। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) ৮। মাআজ বিন জাবাল (রাঃ) ৯। আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ) ১০। হযরত হুজাইফা (রাঃ) ১১। হযরত যায়েদ বিন ছাবিত (রাঃ) ১২। হযরত সালামান (রাঃ) ১৩। হযরত আবুদ্দরদা (রাঃ) ১৪। হযরত আবু মুসা আশআরী (রাঃ) প্রমূখ।

মদীনা মুনাওয়ারার সম্মানিত মুফতী তাবেয়ীগণ:

১। সাঈদ ইবরন মুসাইয়িব ২। আবু বকর ইবনে আব্দুর রহমান ইবনুল হারস। ৩। কাসিম ৪। উবায়দুল্লাহ ৫। ওরওয়াহ ৬। সুলায়মান ৭। খারিজা (রাঃ) প্রমুখ।

দুগ্ধপান অবস্থাতে যারা কথা বলেছেন:

তাদের সংখ্যা ৪ জন ১। সাহেবে জারীজ, যিনি প্রকাশ্যে ব্যবিচারের নিষেধাজ্ঞা জারী করেন। ২। হযরত ইউসুফ (আঃ) এর সাক্ষী যিনি জুলায়খা থেকে রক্ষা করেন। ৩। ইবনে মাশত্বাহ যিনি ফেরাউনের কুফুরীকে ভয় করে ছিলো। ইবনুল মাশতাহ সে ব্যক্তি যিনি ফেরআউনকে দুধ পান করিয়েছিলেন। ৪। হযরত ঈসা (আঃ) যনি তাঁর মায়ের পবিত্রতার সাক্ষ্য দেন।

মৃত্যুর পরেও যারা কথা বলেছিলেন:

তাদের সংখ্যা ৪ জন ১। হযরত ইয়াহইয়া (আঃ) তার কওমের লোকেরা যখন তাঁকে জবাই করেছিল। ২। হাবিবে নাজ্জার তিনি বলেছিলেন يالیت قومی يعلمون হায় আমার সম্প্রদায় যদি জনত। ৩। হযরত জাফর তাইয়ার , তিনি বলেছিলেন فلا تحسبن الذين قتلوا فی سبيل الله امواتا যারা আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয় তাঁদেরকে মৃত মনে করো না। ৪। হযরত হুসাইন ইবনে আলী (রাঃ) তিনি শহীদ হওয়ার বলেছিলেন سيعلم الذين ظلموا ای ينقلبون জালেমরা অচিরেই জানতে পারবে তিনি কিভাবে প্রতিশোধ নেন।

মায়ের গর্ভে নির্ধারিত সময়ের অতিরিক্ত অবস্থানকারীগণ:

১। সুফিয়ান ইবনে হাইয়ান। তিনি মায়ের গর্ভে ৪ বছর ছিলেন। ২। মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে হাসান - যাহহাক ইবনে মুজাহিম। তিনি ১৬ মাসেরও বেশি মায়ের গর্ভে ছিলেন। ৩। ইয়াহইয়া ইবনে আলী ইবনে জাবের আল বগবী। ৪। সুলাইমান আযযাহাক তিনি দু'বছর মায়ের পেটে থাকেন।

নমুরূদ নামে যারা বাদশাহ ছিলো:

নমুরূদ নামে বাদশাহি ছিল ৬ জন। ১। নমরূদ ইবনে কিনআন ইবনে হাম ইবনে নূহ (আঃ) , যিনি সমগ্র জগতের বাদশাহ ছিলেন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) যুগে যে নমরূদ ছিল সে ঐ ব্যক্তিই। ২। নমরূদ ইবনে কোস ইবনে কিনআন ইবনে হাম ইবনে নূহ। সে ছিল ছাহেবুন্নাসওয়ার (মাদকাশক্ত) তার ঘটনা প্রসিদ্ধ। ৩। নমরূদ ইবনে মাশ ইবনে কিনআন ইবনে হাম ইবনে নূহ (আঃ) । ৪। নমরূদ ইবনে সানজার ইবনে নমরূদ ইবনে কোস ইবনে কিনআন ইবনে হাম ইবনে নূহ (আঃ) ৫। নমরূদ ইবনে সারো ইবনে উরগো ইবনে মালিখ। ৬। নমরূদ ইবনে কিআন ইবনে মাসাদ ইবনে নাক্কাত্ব।

মিশরের ফিরাউনগণ:

এদের সংখ্যা তিন জন। ১। প্রথম ফিরআউন সেনান ইবনুল আশয়্যাল ইবনে আলওয়ান ইবনুল আমিদ ইবনুল আমলিক। তিনি হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর যুগে ছিলেন। ২। দ্বিতীয় ফেরাউন রাইয়্যান ইবনুল ওয়ালীদ সে ছিল হযরত ইউসুফ (আঃ) এর যুগে। ৩। তৃতীয় ফিরআউন ছিল ওয়ালীদ ইবনে মাসআব। সে হযরত মূসা (আঃ) এর যুগের।

চার মাযহাবের ইমামগণ:

১। সুফিয়ান ছওরী (রহঃ) ২৭-১৬১ হিঃ) ২। ইমাম মালেক ইবনে আনাস (রহঃ) (৯০-১৭৯ হিঃ মদীনায় ইন্তেকাল করেন) ৩। ইমাম আজম আবু হনীফা নূ'মান ইবনে ছাবিত (রহঃ) ৮০-১৫০ হিঃ বাগদাদে ইন্তিকাল করেন। ৪। ইমাম শাফেয়ী আবু আব্দুল্লাহ ইবনে ইদ্রীস (রহঃ) ১৫০-২০৪ হিঃ মিশরে ইন্তিকাল করেন। ৫। ইমাম আহম্মদ ইবনে হাম্বল উপাধি আবু আব্দুল্লাহ ১৬৪-হিঃ বাগাদে ইন্তেকাল করেন।

সম্মানিত মুহাদ্দিসীনে কেরাম:

১। ইমাম আবু আব্দুল্লাহ আল বুখারী (রহঃ), জন্ম ১৩ই শাওয়াল, ১৯৪হি: জুমাবার, ইন্তিকাল ২৫৬হিঃ ঈদুল ফিতরের রাত। ২। ইমাম মুসলিম নিশাপুরী (রহঃ) ৬৬১ হিঃ ২৫ রজব ইন্তিকাল করেন। বয়স হয়েছিল ৫৫ বছর। ৩। ইমাম আবু দাউদ বসরী (রহঃ) ইন্তিকাল ২৭৫ হিঃ শাওয়াল মাসে। ৪। ইমাম আবু ঈসা আত তিরমিযী। ইন্তিকাল ২৬৭ হিঃ ১৩ই রজব। ৫। ইমাম আবুল হাসান দারে কুতনী জন্ম ৩০৬ হিঃ, ৩৮৫ হিঃ জিলকদ মাসে বাগদাদে ইন্তিকাল করেন। ৬। আবু আব্দুর রহমান আন নিসায়ী ২০৩ হিঃ ইন্তিকাল।

হযরত আলী (রাঃ) এর কাছে জনসাধারণের বাইয়াত:

ঐতিহাসিকগণ লিখেন, হযরত উছমান গণী (রাঃ) কে দৃস্কৃতিকারীরা শহীদ করার পর জনগণ হযরত আলী (রাঃ) এর দরজায় গিয়ে কড়া নাড়তে থাকে। এমন কি কোন কোন লোক দুশ্চিন্তায় পড়ে তার ঘরে প্রবেশ করে বলতে লাগল, আমিরুল মুমিনীন হযরত উছমান গণী (রাঃ) কে তো শহীদ করে ফেলেছে। এখন আমাদের তো একজন নেতার প্রয়োজন। আমাদের জানা মতে আপনার চেয়ে উপযুক্ত কোন ব্যক্তি এ পদের জন্য যোগ্য নয়। একথা শুনে হযরত আলী (রাঃ) তাদের দাবী প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু জনগণ তা বলতেই থাকে। এক পর্যায়ে তিনি বললেন যদি তোমরা আমার নেতৃত্ব ও খেলাফত কামনাই কর তাহলে জেনে রেখো আমি ঘরের মধ্যে গোপনীয় বায়আত করবোনা। তিনি একথা বলতে ছিলেন আর এদিকে জনগণ মসজিদে এসে জড়ো হতে লাগল। তারপর তালহা, যুবাইর, সাদ বি আবি ওয়াক্কাস এবং অন্যান্য নেতৃস্থানীয় সাহাবা কেরাম (রাঃ)ও এসে উপস্থিত হলেন। সর্ব প্রথম হযরত তালহা বাইআত হলেন। এরপর অন্যান্যরা বাইয়াত হতে সিদ্ধান্ত নিলেন। এভাবে সমস্ত লোক বাইআত নিতে ঐক্য মত হল। কিন্তু এদের মধ্যে একদল লোক বাইয়াত নিতে বিলম্ব করতে লাগল। তাদেরকে হযরত আলী (রাঃ) বাইয়াত নিতে জোর করলেন না। কোন কোন লোক বাইআতে বিলম্বকারীদের বলতে লাগল তারা সত্য থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে। কিন্তু বাতিলের দায়িত্ব গ্রহণ করেনি। এমনিভাবে সিরিয়াবাসী ও হযরত মাআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান হযরত আলীর (রাঃ) বাইআত নিতে অস্বীকার করেন। এখান থেকেই পরস্পর

(আলী ও মাআবিয়া) এর মধ্যে মতপার্থক্যের সূচনা হয় এবং সিফফীনের যুদ্ধেরও উপকরণ তৈরী হয়।

কিছু কিছু লোক হযরত আলীর দল থেকে বের হয়ে যায় এবং তারাই পরবর্তী খারেজী নামে পরিচিত। এই খারেজীরা হযরত আলী (রাঃ)কে হত্যা করার ষড়যন্ত্রের সূচনা করে। (আল্লাহ পাক তাদের সঠোর শাস্তি দিন।) এই খারেজীরাই মুসলমানদের ঐক্যে ফাটল ধরিয়ে মতপার্থক্যের সূচনা করে। হযরত আলী (রাঃ) তাদেরকে বুঝানোর জন্য সম্ভব সব চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। বরং তারা যুদ্ধসাজে সজ্জিত হতে থাকে। নিহরাওয়ান এর নিকটবর্তী স্থানে এদের সাথে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে তাদের কতিপয় লোক ব্যতীত প্রায় সকলেই নিহত হয়।

হযরত আলী (রাঃ) এর ব্যাপারে হযরত উমর (রাঃ) এর পরামর্শ:

হযরত উমর (রাঃ) আহত হবওয়ার পর বলেছিলেন, যদি সে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিত্ব কে তোমাদের খলীফা এবং অভিভাবক বানিয়ে নাও তাহলে তোমরা অতি উত্তম কাজই করবে। হযরত ওমর (রাঃ) একথা দ্বারা হযরত আলী (রাঃ) কেই বুঝিয়ে ছিলেন। সুতরাং হলও তাই । আল্লাহর কাসম ! তিনি জনগণকে সুপথে পরিচালিত করার জন্য সম্ভব সব ধরনের প্রয়াসই চালিয়েছেন।

হযরত আলী (রাঃ) এর আখলাক ও কৃতিত্ব:

তিনি প্রজা সাধারণের উপর অত্যন্ত দয়াপরবশ ও বিনয়ী ছিলেন। খোদাভীরু ও সংযমী ছিলেন। ধর্মীয় ব্যাপারে তিনি ছিলেন আরো বেশী সংযমী। একমুষ্টি যবের আটা পানিতে ছেড়ে দিয়ে তিনি পান করতেন। খারেজীরা নিজেরাই দল থেকে বেরিয়ে এমন বিশ্বাসে উপনীত হল যে, তারা হযরত আলীকে আল্লাহ মানতে শুরু করল। সুতরাং তিনি এদেরকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করে জালিয়ে দেন। কোন ব্যক্তি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞেস করল যে হযরত আলী (রাঃ) কি নিজে সিফফীন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন? জবাবে তিনি বলেছিলেন আমি হযরত আলীকে দেখেছি যে, তিনি হাতে তরবারী পা পর্যন্ত লৌহ বর্ম পরে যুদ্ধ করেছেন।

আদ্দুররাতুল গাওয়াস নামক কিতাবে আছে যে, হযরত আলী (রাঃ) এর বীরত্বের ব্যাপারে অনেক কথাই প্রসিদ্ধ আছে। তিনি যখন কোন প্রতিদ্বন্দ্বির

সম্মুখে যেতেন তখন ব্যূহ বেধ করে অনেক দূর এগিয়ে যেতেন। উপর দিয়ে আক্রমন করলে নীচ পর্যন্ত তরবারী বের হয়ে আসত। তার শাহাদাতের ঘটনা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। ইবনে মুলজিম তাকে হত্যা করে। ৮০ হিঃ ১৭ই রমজান এই হত্যাকান্ড ঘটেছিল। আব্দুর রহমান ইবনে মুলজিম তার উপর একাই আক্রমণ করে। খঞ্জর মাথার মগজ পর্যন্ত প্রবেশ করেছিল। যে কারণে তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন। দুই দিন পর তিনি ইন্তেকাল করেন। হযরত আলী (রাঃ) এর শাহাদাতের পর লোকেরা হত্যাকারীকে পাকড়াও করে ইচ্ছামত গণ ধুলাই করেন এবং কঠোর শাস্তি প্রদান করেন। সমাকালীন সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বোত্তম। তাঁর অসংখ্য গুণাবলী রয়েছে। হাফেজ জাহবী (রহঃ) তাঁর সমস্ত গুণাবলী একত্রিত করেছেন। উলামায়ে কেরাম বলেছেন সে সময় ঘাতক ইবনে মুলজিম তাঁকে কার্যকর আঘাত হানে তিনি তখন তার দুই ছেলে হাসান ও হুসাইন (রাঃ) কে ডেকে দীর্ঘ নসীহত করেন যার শেষে এও বলেছেন হে বনী মোত্তালিব তোমরা মুসলমানের রক্তে মিশ্রিত হইওনা। তোমরা বলবে আমিরুল মুমিনীনকে হত্যা করা হয়েছে। আমার হত্যাকারী ব্যতীত আমাকে কেউ হত্যা করেনি। তোমরা একে ধীরে ধীরে শাস্তি দিও। কিন্তু আকৃতি বিকৃতি ঘটাবে না। কারণ আমি নবী (সাঃ) কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন তোমরা চেহারা বিকৃত করা থেকে বিরত থাক।

হযরত আলী (রাঃ) ইন্তিকাল হয়ে যাওয়ার পর হযরত হাসান (রাঃ) ইবনে মুলজিমকে হত্যা করেন। তার হস্তপদ কর্তন করে আগুনের দন্ড গরম করে তার চোখ ফুঁটা করে দেয়া হয়। কিন্তু এত সব হওয়ার পরও না তার ভয় অনুভূত হয় না কোন কথা মুখ থেকে বেরোয়। সর্বশেষ যখন তার জিহ্বা কটাতে লাগল তখন সে আহজারী করতে লাগল। মানুষ তাকে জিজ্ঞেস করল এখন আহাজারী করছিস কেন? সে জবাব দিল আমি মৃত্যু কে ভয় করি না, তবে আমি ভয় করছি যে, আমার একটি মুহূর্ত আল্লাহর স্মরণ থেকে যেন বাদ না পড়ে। এর পর জিহবা কেটে ফেলা হলে তার মৃত্যু হয়। বর্ণিত আছে জনাব রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত আলীকে বলেছেন হে আলী! পূর্বেকার লোকদের মধ্যে কে সবচেয়ে বেশী দুর্ভাগা ছিল? হযরত আলী বললেন আল্লাহ ও রাসূলই ভাল জানেন। তখন নবী করীম (সাঃ) এরশাদ ফরমান যারা হযরত সালেহ (আঃ) এর উটের কুঁজ কেটে দিয়েছিল। নবী করীম (সাঃ) আবার বললেন পরবর্তীতে কারা বেশী দুর্ভাগা?

তিনি বললেন আল্লাহ তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। এবার নবী করীম (সাঃ) বললেন, যে ব্যক্তি তোমাকে এখানে মারবে যে কারণে ইহা ভিজে যাবে। এ কথা বলেই নবী (সাঃ) তার দাঁড়ীতে ধরলেন। হযরত আলী (রাঃ) বলেন আমি ইচ্ছা করলে পূর্বেই এই কমবখতকে বুঝে নিতাম। পূর্বে তাঁর শাহাদাতের বিস্তারিত বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে।

তাঁর বয়স এবং খেলাফত কাল:

৫৭ অথবা ৫৮ বছর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন। কতিপয় আলেমের বিচার বিশ্লেষণ মতে তিনি ৬৩ অথবা ৬৮ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। ইবনে জারীর আততিবরীতে লিখেছেন ইন্তিকালের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর আরেক মতে ৬৩ বছর। খেলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন ৪ বছর ৯ মাস। খলীফা হওয়ার পর তিনি মদীনাতে অবস্থান করেন ৪ মাস। এরপর তিনি ইরাক চলে যান। তার শাহাদাতের ঘটনা ঘটেছিল কুফাতে। হযরত ওমর (রাঃ) ন্যায় হযর আলীর (রাঃ) এর খেলাফতের সময়কাল নিয়েও বিভিন্ন মত রয়েছে।

ইবনে আলী (রাঃ) হযরত হাসান (রাঃ) এর খেলাফত :

হযরত হাসান (রাঃ) ইসলামের খুব স্বল্পকালীন খলীফা। হযরত আলী (রাঃ) এর পরেই তাকে খলীফা নির্বাচিত করা হয়। তাঁর উপনাম আবু মুহাম্মদ, উপাধি যাকী। তার মাতার নাম ফাতেমাতুজ্জাহরা (রাঃ) তাঁর পিতার ইন্তিকালের পর তিনি খেলাফতের বাইআত গ্রহণ করেন। এরপর তিনি মাদায়েন চলে যান। সেখানেই তিনি স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। একদা কোন এক সংবাদদাতা সংবাদ দিল যে, কায়েসকে হত্যা করা হয়েছে। তাই আপনি সত্তর চলুন। হযরত হাসান (রাঃ) কায়েসকে সেনাপতি নিযুক্ত করেছিলেন। তার পূর্ণ নাম কায়েস ইবনে সাদ ইবনে উবাদা (রাঃ) সংবাদ শুনে হযরত হাসান (রাঃ) বেরিয়ে পড়লেন। আল জুরহুল উছদী তাকে আক্রমণ করে বসল। (আল্লাহ পাক তাকে কঠোর শাস্তি দিন) হযরত হাসান (রাঃ) এর সাথে যেতে থাকল। হঠাৎ করে সে হযরত হাসান (রাঃ) এর উরুতে খঞ্জর বসিয়ে দিল। হযরত হাসান তখন বললেন তুই গতকাল আমার পিতাকে হত্যা করেছিস আর আজ আমাকে হত্যা করতে চাস। শুধু মাত্র এই জন্য যে, ন্যায় বিচারের পরিবর্তে বিশৃংখলা চাস এবং অন্যায় বিচার এবং চরমপন্থীদের সাথে থাকতে চাস। আল্লাহর কসম কিছু দিনের মধ্যেই

এর ফল ভোগ করবি। এরপর তিনি কয়েকটি শর্ত সাপেক্ষে হযরত আমীর মোয়াবিয়াকে লিখিত ভাবে খেলাফত হস্তান্তর করেন। হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ) এর জবাবও দেন। তিনি ২৫ শে রবিউল আওয়াল হযরত মোয়াবিয়র (রাঃ) কাছে বাইআত গ্রহণ করেন। উদ্দেশ্য ছিল উম্মতে মুহাম্মদিয়াকে বিক্ষিপ্ত অবস্থা থেকে ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ করা। এ পদক্ষেপেই নবী করীম (সাঃ) এর বভিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়। হুজুর (সাঃ) এরশাদ ফরমান সে আমার কন্যার ছেলে (নাতী) সর্দার। অচিরেই তার দ্বারা আল্লাহ পাক একটি সন্ধি করাবেন। আরেক বর্ণনায় এভাবে আছে: অচিরেই আল্লাহপাক তাঁর (হাসানের) দ্বারা মুসলমানদের দুই দলের মধ্যে একটি বিরাট শান্তিচুক্তি সম্পাদন করাবেন। হযরত হাসান (রাঃ) খেলাফত হস্তান্তর করাতে অনেকেই মন্তব্য করেছেন যে, তিনি হযরত মোয়াবিয়া থেকে এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা গ্রহণ করেছেন। কেউ বলেছেন জমাদিউল উলা মাসে আজরাহ নামক স্থানে এক হাজার আশরাফীর বিনিময়ে আবার কারো মতে ৪০০ শত দেরহামের বিনিময়ে তিনি খেলাফত হস্তান্তর করেছেন। কিছু লোক অবশ্য বলেছেন যে, হযরত হাসান খেলাফত হস্তান্তর করার সময় এই শর্তারোপ করছিলেন যে, বায়তুল-মাল থেকে তার খরচ মিটানোর পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করতে হবে এবং হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ) এর পর তাঁকেই খলীফা নিযুক্ত করতে হবে।

হযরত মোয়াবিয়া এই শর্ত মেনে নেন। এর পরই হযরত হাসান নিজে নিজেই অব্যহতি নেন। শাসন দন্ড মোয়াবিয়ার হাতে ছেড়ে দেন এবং তাঁর সাথে পূর্ণ সন্ধি করে নেন। এরপর উভয়েই একই সাথে কূফায় প্রবেশ করেন।

মুসলিম জাতির শাসনে বাগডোর একক খলীফার হাত থেকে চলে যাবার কারণে সে বছরের নাম রাখা হয়েছিল عام الجماعة বা একত্রিত করনের বছর।

শা'বী বলেন, যে দিন হযরত হাসান স্বেচ্ছায় খেলাফতের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে হযরত মোয়াবিয়ার (রাঃ) সাথে সন্ধি করেছিলেন সে দিন আমি কাছেই ছিলাম। তিনি হামদ ও ছানা পাঠ করার পর বলেন, সবচেয়ে বুদ্ধিমান হল স্পষ্টাভাষী এবং সবচেয়ে বোকা হল পাপী ব্যক্তি। যে কারণে আমি ও মোয়াবিয়া যুদ্ধ করেছিলাম। যদি ঘটনা তার উপযোগী হয় তাহলে তাই আমার জন্য উপযোগী। আর যদি আমি তার দাবীদার হয়ে থাকি তাহলে আমার অধিকার

আমি তাকে হস্তান্তর করছি। আর এ পদক্ষেপ শুধু জনগণের মাঝে সৌহার্দ সৃষ্টি করা এবং জনগণকে খুন-খারাবী থেকে মুক্ত কারার মানসেই। আমি এও জানি একথা তোমাদের জন্য বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। তবে এ উত্তেজনা কয়েকদিনই স্থায়ী হবে। কিছু দিন পরেই নিভে যাবে। এরপর তিনি মদীনাতে চলে আসেন এবং সেখানে বসবাসের সিদ্ধান্ত নেন। সে সময় কিছু কিছু লোক তাঁকে তিরস্কারের পাত্র বানিয়ে ছিল। তিনি জবাব দিতেন যে, আমি তিনটি বস্তুর মধ্যে তিনটি ভালবেসেছি। ১। বিশৃংখলার মোকাবেলায় ঐক্য। ২। খুনাখুনির মোকাবেলায় উম্মতে মুহাম্মদীর রক্তের নিরাপত্তা। ৩। আগুনের মোকাবেলায় সম্ভ্রম। হযরত আবুবকর (রাঃ) বলেন আমি নবী করীম (সাঃ) কে দেখেছি যে, তিনি মিম্বরের উপর আরোহন করেছেন এবং তার কোলে হাসান (রাঃ)কে বসিয়েছেন। তিনি কখানো উপস্থিত জনতাকে দেখছেন আবার কখনো তাঁকে দেখে বলছেন এই আমার ছেলে (নাতী) (আরদের নিয়ম হল সব ছেলেকেই তারা ছেলে সম্বোধন করে) সর্দার এবং আশা করা যায় যে, সে মুসলমানদের দুইটি বড় দলের মধ্যে সন্ধি এবং মৈত্রী স্থাপন করবে। হযরত হাসান (রাঃ) বলতেন আল্লাহর কাছে আমার লজ্জা হয় যে, আমি তার ঘরে পায়ে হেটে নাগিয়ে তার সাথে সাক্ষাত করব? এর পর থেকে তিনি মদীনা থেকে মক্কায় বিশ বার পায়ে হেটে গিয়েছেন। তাঁর সাথে অনেক ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন লোকও অংশগ্রহণ করেছেন। এভাবে তিনি তাঁর ধন সম্পদ থেকে দুই বার দান খয়রাত করেন এবং তিনবার আল্লাহর রাস্তায় সম্পদ বন্টন করেন। এমনকি একটি জুতা আল্লাহর রাস্তায় দিয়ে অন্যটি ফেরত দিলেন।

ইবনে খাল্লেকান বলেন, হযরত হাসান (রাঃ) যখন অসুস্থ হয়ে পড়েন তখন মারওয়ান ইবনে হাকাম হযরত মোয়াবিয়াকে সংবাদ দেন যে, হাসান (রাঃ) অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তখন হযরত মোয়াবিয়া বলেছিলেন তার মৃত্যুর সংবাদটা সত্বর আমাকে দিও। হযরত হাসান (রাঃ) এর ইন্তেকালের সংবাদ শুনে হযরত মোয়াবিয়া অতি উচ্চ আওয়াজে তকবীর ধ্বনি দিয়েছিলেন। যা আল-হাদরা পর্যন্ত শুনা গিয়েছিল। এই তাকবীর শুনে সিরীয়া বাসীরাও উচ্চ আওয়াজে তাকবীল ধ্বনি দিয়েছিল। এ অবস্থা দেখে ফাখনাহ বিনতে কুরাই মোয়াবিয়াকে বলেছিলেন আল্লাহ তাআলা আপনার চোখে শৈত্য দিন। কি করণে আপনি এ তাকবীর উচ্চস্বরে বললেন? মোয়াবিয়া বললেন হাসান বিন আলীর

ইন্তেকাল হয়েছে। ফাখনাহ বললেন কি হাসান বিন আলীর ইন্তেকালে আপনি তকবীর দিলেন? মোয়াবিয়া বললেন তার ইন্তেকালে আমি আনন্দিত হয়ে তাকবীর দেইনি বরং আমার অন্তরের প্রশান্তির জন্য তাকবীর ধ্বনি দিয়েছি। এ মুহূর্তে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) আগমন করলেন। হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ) তাকে বললেন, কোন খবর জানেন কি? আহলে বাইয়াতে দুর্ঘটনা ঘটে গিয়েছে। তিনি বললেন নাতো কিছুই জানি না। কি হয়েছে? তবে আমি আপনার তাকবীর শুনেছি এবং অন্য যেকোন সময়ের তুলনায় খুব আনন্দ দেখাচ্ছে আপনাকে। মোয়াবিয়া বললেন হাসানের ইন্তিকাল হয়েছে। একথা শুনে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস বললেন আল্লাহ পাক হযরত হাসানকে রহম করুন। এই দোয়া তিনি তিনবার উচ্চারণ করেছেন। এরপর আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস বললেন, হে মোয়াবিয়া! হাসানের গর্তে আপনার গর্ত ভরবে না আর না তার জীবন আপনার জীবনের সাথে যোগ হবে। হযরত হাসানের ইন্তিকালে আমি অত্যন্ত কষ্ট পেয়েছি। ইতিপূর্বে নবী (সাঃ) ইন্তিকালেও এর চেয়ে বেশী কষ্ট পেয়েছিলাম। আল্লাহ পাক এই অনাকাংখিত ঘটনার ক্ষতিপূরণ দিয়ে ধৈর্য ধরার তৌফীক দিন। এখন তাঁর পরে আল্লাহ তাআলাই আমাদের খলীফা।

হযরত হাসান বিন আলীকে (রাঃ) কে বিষ প্রয়োগ:

বিষের প্রভাবেই হযরত হাসান ইন্তিকাল করেছিলেন। মিকদামা বিনতে আসাত নাম্নী জনৈকা মহিলা ছিল তাঁর বিষ প্রয়োগকারিনী। বিষ তাকে এতই প্রভাবিত করেছিল যে, তাঁর নীচ থেকে প্রত্যহ একটি করে রক্তের চিলমচি উঠাতে হত। তিনি নিজেই বলতেন যে, আমাকে কয়েক বার বিষ প্রয়োগ করা হয়েছে। কিন্তু এখন যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে তা আর কখনো হয়নি। হযরত হাসান তাঁর ভাই হোসাইন (রাঃ) কে অসিয়ত করেন যে, অনুমতি নিয়ে আমাকে নানা জানের পাশে দাফন করানো ব্যবস্থা করবে। অন্যথায় বাকীউল গারক্বদ-এ দাফন করিও। তাঁর ইন্তিকালের আকস্মিক ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর তাঁর ভাই হোসাইন (রাঃ) ও সমস্ত চাকর নওকররা তাঁকে দাফনে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তাকে হুজুর (সাঃ) এর পাশেই দাফন করা হবে- তা দেখে মরওয়ান ইবনে হাকাম যে সেদিনই মদীনার গভর্ণর ইমাইয়াদের অভিভাবক হয়ে এসেছিল সে হযরত হোসাইনের সে ইচ্ছা থেকে বাধা প্রদান করেছিল।

তাঁর ইন্তিকালের তারিখ:

রবিউল আওয়াল ৪৯ হিজরীতে হযরত হাসান (রাঃ) ইন্তিকাল করেন। কেউ বলেছেন ৫০ হিঃ সনে তিনি ইন্তিকাল করেছেন। তার নামাযে জানাযায় ইমামতি করেছিলেন হযরত সাঈদ ইবনে আস (রাঃ)। এরপর তাঁকে তাঁর আম্মা ফাতেমা (রাঃ) এর পাশে দাফন করা হয়। কারো মতে তাঁকে বাকীউল গারক্বদ -এ দাফন করা হয়। আলী যায়নুল আবেদীন এবং তাঁর ছেলে মুহাম্মদ আল বাকের এবং পৌত্র জাফর ইবনে মোহাম্মদ সাদেকও এখানে সমাধিস্থ হন। মনে হয় এ চার মহাপুরুষ একই কবরেই আরম করছেন।

হযরত হাসানের (রাঃ) খেলাফতকাল:

হযরত হাসান (রাঃ) ৬ মাস ৫দিন, কারো মতে একদিন কম ৬ মাস খেলাফতের দায়েত্বে ছিলেন। সম্ভবত এ সময়সীমা খেলাফতে রাশেদার পূর্ণতা ছিল। যার ব্যাপারে নবী করীম (সাঃ) বলেছিলেন এর পর থেকে খেলাফত, নবুওতের ধারা, সাম্রাজ্যে পরিবর্তিত হয়ে যাবে। এরপর থেকে ভূপৃষ্ঠে জুলুম নির্যাতনের আধিক্য বৃদ্ধি পাবে। বাস্তবেও তাই হল। যা ছিল নবী করীম (সাঃ) ভবিষ্যদ্বানী। ইন্তিকালের সময় হযরত হাসান (রাঃ) বয়স মোবারক হয়েছিল ৪৭ বছর।

হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ) এর খেলাফত:

ঐতিহাসিকগণ বলেন, হাসান (রাঃ) স্বেচ্ছায় অপসারিত হলে পুরো ইসলামী দুনিয়ার খেলাফত মোয়াবিয়ার (রাঃ) হাতে চলে আসে। সমগ্র রাজ্য এককভাবে তাঁর হয়ে পড়ে। সিরীয়গণ তাঁর কাছে বাইয়াত হল বটে কিন্তু ইরাকীরা তাঁকে স্বীকার করল। এরপর হাসান (রাঃ) আমিরে মোয়াবিয়ার সাথে সন্ধি করেন। এরপর থেকে সমস্ত মানুষ ঐক্যমতে পৌছে। মোয়াবিয়ার জন্ম হয় মিনায়, বৈপিত্রীর ভাইয়ের বাড়ীতে। তিনি তাঁর পিতা আবু সুফিয়ানের পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেন। হুজুর (সাঃ) এর সোহবতের সৌভাগ্য লাভ করেন। কাতেবে ওয়াহীর মর্যাদা লাভ করেন। তিনি তাঁর ভাই ইয়াজিদ ইবনে আবু সুফিয়ান এর সৈন্য বাহিনীতে ছিলেন। এরপর ইয়াজিন বিন আবু সুফিয়ান দ্বিতীয় খলীফা ওমর (রাঃ) এর যুগে দামেস্ক এলাকার গভর্ণর নিযুক্ত হন। মৃত্যুর কাছাকাছি হলে তার ভাই মোয়াবিয়াকে খলীফা ও স্থলাভিষিক্ত বানিয়ে যান।

হযরত ওমর (রাঃ) ৪০ হিঃ সনে পূর্ব পদেই বহাল করে নেন। সে থেকে হযরত মোয়াবিয়া একাধারে বিশ বছর সিরিয়ার গভর্ণর ছিলেন। খেলাফতে ফারুকী ও খেলাফতে উসমানী এই দু'যুগেই এ পদে তাঁর বিশ বছর পূর্ণ হয়।

এরপর তিনি হযরত আলী (রাঃ) এর যুগে এক অংশের খলীফা হিসাবে আবির্ভূত হন। শেষ পর্যন্ত হযরত হাসান (রাঃ) মোয়াবিয়ার নিকট খেলাফত হস্তান্তর করেন। পরবর্তীতে তাঁর খেলাফতের উপরই সকল লোকের ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর থেকে তিনি উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের বিভিন্ন রাজ্যে প্রেরণ করতে থাকেন।

এ ঘটনা সংঘটিত হয় ৪১ হিজরী সনে। এ কারণে এ বছরটির নাম রাখা হয় "ঐক্যের বছর"। কারণ সমস্ত উম্মতে মোহাম্মদী বিক্ষিপ্ত ও মতপার্থক্যের শিকার হওয়ার পর এ ঘটনার মধ্য দিয়েই এ বছর ঐক্যের সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ হয়। নবী করীম (সাঃ) এর যুগে এক মহিলা নবী করীম (সাঃ) এর সাথে আলাপকালে মোয়াবিয়ার নিকট বিয়ে বসার ইচ্ছা প্রকাশ করলে নবী করীম তাকে বলেছিলেন, মোয়াবিয়া সেতো মুখাপেক্ষী। তার কাছে কোন ধন সম্পদ নেই। এর ১১বছর পর মোয়াবিয়া সিরিয়ার গভর্ণর হন। এরপর ৪০ বছরান্তে তিনি ইসলামী দুনিয়ার খলীফা হন।

হযরত মোয়াবিয়ার শারীরিক গঠন ও তাঁর বংশ:

হযরত মোয়াবিয়ার (রাঃ) চেহারায় কমনীয়তা, ভীতি, মাহাত্ম-মর্যাদা ইত্যাদি পরিলক্ষিত হত। উত্তম ধরনের পোশাক পরিচ্ছেদ পরতেন। শ্রেষ্ঠ ঘোড়ায় আরোহন করতেন। দানে অভ্যস্ত, অধীনস্থদের সাথে মিশুক এবং এদেরকে সম্মানের চোখে দেখতেন। হযরত মোয়াবিয়ার বংশধারা নবী করীম (সাঃ) এর বংশধারার সাথে আবদে মুনাফ পর্যন্ত গিয়ে মিলিত হয়েছে। উমাইয়া ইবনে আবদে শামস এর দিকে সম্পর্ক যুক্ত করে তাকে উমবী বলা হয়। তার খেলাফত থেকে মুররাহ ইবনে নওফল আল আশজায়ীকে বহিস্কার করা হয়েছিল এবং সে কূফাতে চলে গিয়েছিল। তার খেলাফতে প্রথম বহিস্কৃত ব্যক্তিই সে। এরপর মোয়াবিয়া (রাঃ) কূফাবাসীকে লিখে জানান যে, জেনে রেখ তোমাদের উপর আমার অধিকার রয়েছে। তোমাদের উচিত তার সাথে মোকাবেলা করা। কূফাবাসীগণ তার সহিত যুদ্ধ করে তাকে হত্যা করে। মোয়াবিয়া (রাঃ) ই প্রথম

ব্যক্তি যিনি গ্রামাঞ্চলের গোড়াপত্তন করেন। চৌকিদারী প্রথার প্রচলন করেন। পর্দার প্রতি অতি যত্নশীল এবং তিনি প্রথম খলীফা যিনি তার আশপাশের অংশীদারদের ভয় করতেন। তিনি পানাহার, পরিধান ইত্যাদিতে আরাম আয়েশের বস্তুর ব্যাবহারেরও সূচনা করেন।

তিনি অত্যন্ত ধৈর্যশীল ছিলেন। ইন্তেকালের সময় কাছাকাছি হলে পরিবারের সকল লোক একত্রিত হল। তিনি বললেন, তোমরা কি আমার পরিবারের লোক নও? তারা বললেন কি বলেন! আমরা সকলেইতো আপনার পরিবারের লোক। তিনি বললেন, তোমরা আমার জন্য অনেক বিরক্ত হয়েছ। আমিও তোমাদের জন্য অনেক কষ্ট সহ্য করেছি। যা কিছু আয় রোজগার করেছি তা তোমাদের জন্যই করেছি। পরিজনেরা বলল সত্যিই বলেছেন। তিনি বললেন আমার আত্মা পায়ের দিক থেকে বের হচ্ছে। তোমরা একে ফিরিয়ে আনতে চাও ফেরাও দেখি। পরিবারের লোকেরা বলল আমরা এর ক্ষমতা রাখি না। একথা বলেই তারা কাঁদতে থাকল। তা দেখে তিনিও কাঁদতে আরম্ভ করলেন। এর পর তিনি বললেন, আমার ইন্তিকালের পরে কাউকে দুনিয়ার কাজে ব্যস্ত করা চাইনা। ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, তিনি যখন অত্যন্ত দূর্বলতা অনুভব করতে লাগলেন তখন লোকেরা বলতে লাগল তিনি আর বাচবেন না। হযরত মোয়াবিয়া বললেন আমার চোখে ভাল করে সুরমা লাগিয়ে দাও। মাথায় তৈল লাগিয়ে দাও। লোকেরা তাই করল। মুখমন্ডলে তৈল লাগান হল। এর পর একটা গদি বিছানো হল। এতে তিনি হেলান দিয়ে বসলেন। লোকেরা অনুমতিক্রমে পালা করে তাকে দেখতে আসতে লাগল এবং সালাম দিয়ে দিয়ে বসতে লাগল। অনেকে তাঁকে দেখে যখন চলে যেত তিনি এ কবিতা বলতেন:

وتجلدى للشامتين اريهم☆ انى لريب الدهر لا اتضعضع

"আমি আনন্দিত লোকদেরকে দেখছিল তোমরা ওদের ব্যাপারে ধৈর্য ধরো, অন্যথায় আমি যুগের ঘূর্ণনের সাথে ঝুঁকব না।"

واذا لمنية انشبت اطفارها☆ الفيت كل تيمته لاتنفع

"আর মৃত্যু যখন তার নখর থাবা মারে তখন আমি সব ধরনের তাবিজকেই অকার্যকর পেয়েছি।"

তিনি ওসিয়ত করলেন যে, (মৃত্যুর পর) আমার নাকে হুজুর (সাঃ) এর

নখ রেখে দিও এবং আমার কাপড়েই আমাকে কাফন দিও।

হযরত মোয়াবিয়ার (রাঃ) ইন্তিকাল এবং খেলাফতকাল:

হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ) ৬০ হিঃ সনে রজবের মাঝামাঝি সময়ে দামেস্কে ইন্তিকাল করেন। কোন কোন আলেম বলেছেন তিনি রজবের শুরুর দিকে ইন্তিকাল করেন। তাঁর ছেলে ইয়াজিদ দামেস্কে থাকার কারণে নিজ পিতার ইন্তিকালের সময় উপস্থিত থাকতে পারেন নি। এ কারণে তাঁর নামাযে জানাযায় ইমামতি করেন আযযাহহাক আলফিহরী। তাঁর বয়স নিয়ে উলামায়ে কেরামের মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেছেন তিনি ৮০ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। কেউ বলেছেন ৮৫ বছর, আবার কেউ ৭৫ বছরও বলেছেন। কিছু কিছু উলামায়ে কেরাম বলেছেন ৮৮ বছর, আবার ৯০ বছরের মতও অনেকে ব্যক্ত করেছেন। খেলাফতের দায়িত্ব প্রাপ্তির পর ১৯ বছর ৩ মাস ৫ দিন তিনি খেলাফতের দায়িত্বে ছিলেন। ৪০ বছর পর্যন্ত গভর্ণর ও খলীফা হিসেবে তিনি ছিলেন। এর মধ্যে ৪বছর হযরত ওমর (রাঃ) এর গভর্ণর ছিলেন।

ইয়জিদ ইবনে মোয়াবিয়ার খেলাফত:

হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ) এর ইন্তিকালের পর তাঁর ছেলে ইয়াজিদ খেলাফতের আসনে সমাসীন হন। হযরত মোয়াবিয়ার ইন্তিকালের দিনই তাঁর নিকট জন সাধরাণ বাইয়াত নেয়। এজন্য হযরত মোয়াবিয়া জীবিত থাকাকালীনই ইয়াজিদকে ভাবী খলীফা মনোনীত করেন। তাঁর পিতা ইন্তিকালের সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন না। তিনি ছিলেন হামাসে। ইন্তিকালের সংবাদ শুনে সরাসরি পিতার কবরের পাশে চলে যান। এর পর তিনি দামেস্কে "দারে সালতানাত আল খায়রাতে" চলে আসেন এবং পদস্থ কর্মকর্তা কর্মচারী ও সাধারণ জনগণের কাছ থেকে তার বাইয়াত নেন। এরপর সমগ্ররাজ্যে বাইয়াতের পত্র পাঠান। এতে করে সাধারণ লোকও বাইয়াত নেয়। কিন্তু হযরত হোসাইন (রাঃ) ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাঃ) বাইয়াত নিতে অস্বীকৃতি জানান। তাঁরা দুজন ইয়াজিদের কর্মচারী ওলীদ ইবনে উক্ববাহ ইবনে আবু সুফিয়ান থেকে লুকিয়ে থাকেন। শেষ পর্যন্ত তাঁরা দুজন বাইয়াত গ্রহণ না করার ক্ষেত্রে অটল থাকেন। শেষে একদিন এমন এলো যে, হযরত হোসাইন (রাঃ) কে কারবালায় শহীদই করা হল।

হযরত হোসাইন (রাঃ) এর হত্যাকরী কে ছিল?

হযরত হোসাইন ইবনে আলী ইবনে আবু তালেবের (রাঃ) হত্যাকারী ছিল শিমার ইবনে জিল জওশন। কেউ কেউ বলেছেন, সেনান ইবনে আনাস নখরী। বিজ্ঞ মনিষীগণ বলেছেন, শিমার ইবনে জিল জওশন হযরত হোসাইনের মাথায় বল্লম নিক্ষেপ করেছিল। সেনান ইবনে আনাস বল্লম মেরে তাঁকে ঘোড়া থেকে নীচে ফেলে দিয়েছিল। এর পর খাওলা ইবনে ইয়াযিদ আল আসবাহী সামনে এসে মাথা কাটতে চাইলে তার হাতে কম্পন আরম্ভ করল। এই মুহূর্তে তার ভাই শিবল ইবনে ইয়াজিদ এসে মাথা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে ভাই খাওলা ইবনে ইয়াজিদের হাতে তুলে দিল। এই বাহিনীর পরিচালক ছিল উবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদ ইবনে উমাইয়া। ইয়াজিদ তাকে সেনাপতি বানিয়ে পাঠিয়ে ছিল।

ঐতিহাসিকগণ লিখেন, ইবাউদুল্লাহ ইবনে যিয়াদই হোসাইন (রাঃ) এবং তাঁর সাথী মহিলাদিগকে নিজের জন্য একাকার করে ফেলে। মূলতঃ তারা যে উবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদকে বিশ্বাস করেছিল সে বিশ্বাস ঘাতকতা করেছিল। এর পরই সে তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের নমূনা দেখাল যেমন মহিলাদিগকে সে বন্দীনী করে ফেলল। শিশুদেরকে সে হত্যা করে। যে আলোচনাতে দেহ শিউরে উঠে এবং শরীরের লোম খাড়া হয়ে যায়। অন্তর আঁতকে উঠে। ইয়াজিদ সে দিন শিমার বিন জিল জওশন এর সাথে তার সাথীদের নিয়ে দামেস্কে ছিল। হত্যাকান্ড ঘটিয়ে তারা সবাই রওয়ানা হয়ে গেল। রাস্তায় এক গির্জায় এসে তারা বিশ্রাম নিচ্ছিল। হঠাৎ গির্জার এক দেয়ালে এই কবিতা লিখা দেখে সবাই চমকে গিয়েছিল।

اترجوامه قتلت حسينا☆ شفاعة جده يوم الحساب

"যারা হোসাইন (রাঃ) কে হত্যা করল কিয়ামতের দিন তার নানা জানের সুপারিশের ব্যাপারে তুমি আশা কর?"

তারা রাহেবকে জিজ্ঞেস করল এই কবিতা কে লিখেছে এবং কখন লিখেছে? সে জবাব দিল তোমাদের নবীর আগমনের ৫০০ বছর আগেই লিখা হয়েছে। কেউ বলেছেন আসলে ঘটনাটি সে রকম নয় বরং একটি দেয়াল ফেটে তার থেকে অপবিত্র হাতের তালু বের হয় সে হাতের তালুর রক্তেই তা লিখা হয়েছিল। এরপর সে বাহিনী দামেস্কে চলে এসে ইয়াজিদের সাথে সাক্ষাৎ করল।

তারা হোসাইন (রাঃ) এর কর্তিত বিচ্ছিন্ন মস্তক ইয়াজিদের সামনে ছুড়ে মারে। শিমার বিন জিল জওশন বলল যে, আমিরুল মু'মিনীন এ লোকটি ৮ জন আহলে বাইত এবং ৪০ শিয়াসহ বর্শা নিয়ে আমাদের উপর আক্রমণ করলে আমরাও আক্রমণ করি। যুদ্ধের পূর্বে আমি তাকে প্রস্তাব করেছিলাম, তুমি আব্দুল্লাহ ইবনে যিয়াদের নিকট চল অথবা আমাদের সাথে যুদ্ধ কর। কিন্তু সে যুদ্ধকে প্রাধান্য দিয়ে বর্শা নিক্ষেপ করতে লাগল। মোটামুটি কথা হল সূর্য উঠার সময় আমরা তাকে ঘিরে ফেলি। যখন তরবারী উঠা নামা করতে লাগল তখন তাঁর বাঁচার আকুতি জানাল যেমনি ভাবে কবুতর শিকারীর নিকট বাচার আকুতি জানায়। ব্যাস উট জবাই করতে যতটুকু সময় লাগে অথবা ক্বইলুলাহ পরিমান সময়ের মধ্যেই ওদের কাবু করে ফেলি। এই দেখুন আপনার সামনে তার মৃতদেহ কাপড় দ্বারা আবৃত করা আছে। গন্ড দেশ রক্তে রঞ্জিত। এর উপর বাতাস বইছে এবং শকুন চিল উড়ছে।

এসব দেখে ইয়াজিদের চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে গেল। তিনি বলতে লাগলেন তাঁকে হত্যা করা ব্যতীতই আমি তোমাদের উপর সন্তুষ্ট ছিলাম। ইবনে মারজানার উপর আল্লাহর লানত বর্ষিত হোক। আল্লাহর কসম আমি যদি তোমাদের জায়গায় থাকতাম তাহলে তাকে ক্ষমা করে দিতাম। তিনি আবার বললেন আবু আব্দুল্লাহর উপর আল্লাহর রহম করুন। অতঃপর তিনি এ কবিতা পাঠ করেন:

يغلقن ها ما من رجال اعزة☆ علينا وهم كانوا اعق واظلما

"যে ব্যক্তি আমার উপর প্রভাব ফেলতে চায় সে নিজে তার মাথার খুলি ফেঁটে দেয়। এই অবস্থায় সে অত্যাধিক অত্যাচারী হয়।

এরপর এয়াজিদ অবশিষ্ট শিশুদের ব্যাপারে বলেন এদেরকে আমার পরিবারের মহিলাদের কাছে পাঠিয়ে দাও। ইয়াজিদের নিয়ম ছিল যখনই সে খানা খেত তখন আলী ইবনে হোসাইন এবং তার ভাই ওমর ইবনে হোসাইনকে নিয়ে খানা খেতেন এবং তাদেরকে শান্তনা দিতেন। পরবর্তীতে শিশুদিগকে আলী ইবনে হোসাইনের সাথে ২৩ জন ঘোড় সোয়ারসহ মদীনায় পাঠিয়ে দেন।

নবী করীম (সাঃ) এর ইন্তিকাল থেকে হযরত হোসাইন (রাঃ) এর শহীদ হওয়ার দিন পর্যন্ত পূর্ণ ৫০ বছর অতিবাহিত হয়েছিল। ঐতিহাসিকগণ বলেন,

হযরত হোসাইন (রাঃ) যখন কারবালা প্রান্তরে পৌছেন তখন মানুষকে জিজ্ঞেস করেছিলেন এটি কোন স্থান? মানুষেরা বলেছিল এটি কারবালা। তখন তিনি বলেছিলেন এ যমীন কারব এবং বালা। তিনি তাও বলেছিলেন যে, আমার পিতা যখন জঙ্গে সিফফীন থেকে এ যমীনের উপর দিয়ে অতিক্রম করেছিলেন তখন তার সাথে আমিও ছিলাম। হঠাৎ করে তিনি এখানে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং এই জায়গা সম্পর্কে লোকদের কে জিজ্ঞেস করলেন। লোকেরা বলল কারবালা এবং আমার আব্বা বলেছিলেন, এখানে কাফেলা থামবে এবং রক্ত ঝরবে। লোকেরা এখানে আসবে এবং এদের সাজ সরঞ্জামসহ এই মাঠে অবতরণের আদেশ করা হবে। ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) বলেন ইমাম হোসাইন (রাঃ) এর শাহাদাত ৪০ হিঃ সনে সংগঠিত হয়।

হাফেজ ইবনে বার " বুহজাতুল মাজালিস ওয়া ইনসুল মাজালিস" কিতাবে লিখেছেন যে, হযরত জাফর সাদেক (রাঃ) এর কাছে কেউ প্রশ্ন করলেন, স্বপ্নের তাবীর কত দিন পর্যন্ত স্থায়ী হয়? তিনি বললেন ৫০ বছর পর্যন্ত। এ জন্য নবী করীম (সাঃ) একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন যে, আমার নাতী হোসাইনকে সাদা কাল রং এক কুকুর রক্তে রঞ্জিত করবে। তিনি এই স্বপ্নের ব্যাখ্যায় বলেছিলেন আমার নাতী ফাতেমার প্রিয় ছেলে হোসাইনকে হত্যা করা হবে। হযরত হোসাইনের হত্যাকারী কুত্তা শিমার বিন জিল জওশনই। সে ছিল ধবল রোগী। তা থেকে অনুমিত হয় যে, স্বপ্নের ফলাফল স্বপ্ন দেখার ৫০ বছর পরও সংঘটিত হতে পারে। আবার এ বছরই মক্কাতে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইরের খেলাফতের পতাকা উড্ডীন হয়। জনগণ ইয়াজিদকে হীনমন্যতার অভিযোগে অভিযুক্ত করে। জনসাধারণের কাছে এহেন সংগত কারণে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাঃ) কে সাহায্য করার সুযোগ হয়। হেজাজবাসীও তেহামাবাসী তার বাইয়াত গ্রহণ করলেন। এই সংবাদ যখন ইয়াজীদ অবগত হলেন তখন তিনি আল হোসেন ইবনে গাইরুচ্ছুকুনী এবং রূহ ইবনে যানবাহ ইবনে যাজামীকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করেন। তাদের সাথে সৈন্যও প্রেরণ করেন। এদের সেনাপতি মনোনীত করা হয় মুসলিম ইবনে উকবাহ আল মারবিকে। সৈন্যদের বিদায় দেবার সময় ইয়াজিদ কিছু উপদেশ দেন। দেখো মুসলিম ইবনে উকবাহ সিরীয়বাসী তাদের শত্রুর সাথে আলোচনা করার পূর্বে চিন্তা করে তোমরা প্রথমেই মদীনা অবরোধ করবে। যদি তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে চায়

তাহলে তোমরাও যুদ্ধ করবে অন্যথায় যুদ্ধের চিন্তা করবে না। এ ব্যাপারে যদি তোমরা সফল হয়ে যাও তাহলে তোমরা এদেরকে তিন দিন পর্যন্ত সুযোগ প্রদান করবে।

এ সকল উপদেশ শুনার পর মুসলিম ইবনে উকবাহ রওয়ানা হয়ে হাররা নামক স্থানে পৌছে। এদিকে মদীনা বাসীও তৈরী হয়ে যায়। তারাও সৈন্য সমাবেশ ঘটান। এই সৈন্যের সেনাপতি হলেন আব্দুল্লাহ ইবনে হানজালা। মুসলিম ইবনে উকবারহ এদেরকে তিনবার তার আনুগত্য করার আহবান জানায়। কিন্তু কোন উত্তর পাওয়া যায় নি। এরপর প্রচন্ড যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধে সিরীয়রা বিজয়ী হয়। আব্দুল্লাহ ইবনে হানজালা শহীদ হন। তার সাথে ৭০০ শত আনসার ও মুহাজিরও শহীদ হন। এরপর মুসলিম ইবনে উকবাহ মদীনার অভ্যন্তরে চলে আসে। সে তিন দিন পর্যন্ত সাধারণ লোকদেরকে হত্যা করার অনুমতি প্রদান করে।

নবী করীম (সাঃ) এরশাদ ফরমান যে লোক আমার হেরেম (মদীনা) তে যুদ্ধ করা এবং রক্তের ঝরানোকে হালাল মনে করে তার উপর আমার ক্রোধ এবং নিন্দা বর্ষিত হবে। মুসলিম বি উকবাহ মক্কা শরীফে আক্রমণ করার জন্য। নিজ বাহিনীকে নির্দেশ দেয়। এদিকে পূর্ণ ঘটনা লিখে ইয়াজিদকে জানানো হয়। মুসলিম ইবনে উকবাহ যখন ইয়ারসী নামক স্থানে পৌছে তখন তার মৃত্যু ঘটে। সেনাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করে হোসাইন ইবনে নমীর আসসুকুফী। সে দ্রুত মক্কায় এসে হাজির হয়। এদিকে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর কাবা ঘরকেই তার কিল্লা হিসেবে গ্রহণ করেন। তিনি সমস্ত সৈন্য নিয়ে কাবা ঘরেই আশ্রয় নেন। অপর দিকে আল হোসেন আবু কবাইছ পাহাড়ে মিন জানিক ক্ষেপনাস্ত্র -এর মাধ্যমে বাইতুল্লাহর প্রতি আঘাত হানে।

এহেন অবস্থায় ইয়াজিদ ইবনে মোয়াবিয়ার মৃত্যুর খবর শুনা যায়। সে দিনই আল হোসেন আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইরের সহিত সন্ধি করার চেষ্টা করে। আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর তা মেনে নেন এবং বায়তুল্লাহর দরজা খুলে দেন। উভয় দলের সৈন্যরা একত্রিত হয়ে তাওয়াফ করেন। একদিন আল হোসেন এশার নামাযের পর কাবা ঘর তাওয়াফ করছেন এমন সময় সে দেখল যে, আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর সামনে দন্ডায়মান আছেন। আল হোসেন তখন হাত ধরে চুপি চুপি

বলতে লাগল যে, আপনি আমার সাথে সিরিয়াতে চলুন। আপনি যেতে রাজী হলে আপনার বাইয়াত মেনে নেয়ার জন্য আমি জনসাধারণকে তৈরী করব। এর জন্য তারা অপেক্ষমান আছে। আমার কাছে আপনিই খেলাফতের অধিক হক্বদার মনে হয়। আমি আপনাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি তার বিপরীত হবে না। একথা শুনে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর তার হাত টেনে নিয়ে আসেন এবং খুব জোরে জোরে বলতে থাকেন কখনো তা হবে না। হেজাজীদের মোকাবেলায় ১০ জন শিরীয়ার সাথে যুদ্ধ করব। আল হোসেন বলল আপনার ব্যাপারে তারা এ ধারণা রাখে যে, আপনি আরবের নেতা, তা ভুল। আমি আপনার সাথে চুপি সারে কথা বলছি আর আপনি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। এ আলোচনার পর আল হোসেন তার দলবল সহ সিরীয়াতে চলে যায়।

ইয়াজিদের মৃত্যু:

৩৯ বছর বয়সে ৬৪ হিজরী রবিউল আওয়াল মাসেই ইয়াজিদ ইবনে মোয়াবিয়া ইন্তিকাল করেন। বাবুসসগীরায় তাকে কবরস্ত করা হয়। তিনি ৩ বছর ৯ মাস পর্যন্ত শাসন কার্য পরিচালনা করেন। কিন্তু তার ত্রুটিপূর্ণ শাসনের জন্য ইমাম গাযযালী এবং আল কিয়াল হেরাসী এর মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

ইয়াজিদের ছেলে মোয়াবিয়ার শাসন:

ইয়াজিদের ইন্তিকালের পর তার ছেলে মোয়াবিয়া খেলাফতের আসনে সমাসীন হন। তিনি পিতার তুলনায় অত্যধিক সৎ ছিলেন। দ্বীনদারী এবং বিবেকবান ইত্যাদি গুণের অধিকারী ছিলেন। যে দিন তাঁর পিতার ইন্তিকাল হয় সেদিনই তার কাছ থেকে বাইয়াত নেয়া হয়। মোয়াবিয়া বিন ইয়াজিদ ৪০ দিন মসনদে ছিলেন। কোন কোন ঐতিহাসিক লিখেছেন ৫ মাস খেলাফতের দায়িত্বে ছিলেন। এর পর ইচ্ছা করেই এ গুরু দায়িত্ব ছেড়ে দেন। উলামায়ে কেরাম লিখেন, তিনি স্বেচ্ছায় মসনদ ছেড়ে দেয়ার সময় মিম্বরে আরোহন করেন এবং দীর্ঘ সময় নির্বাক বসে থাকেন। কিছুক্ষণ পর দরুদ ও আল্লাহর প্রশংসা করে তিনি বলেন হে লোক সকল! রাজত্ব ও শাসক হওয়ার ইচ্ছা আমার নেই। কারণ এটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। আপনারা আমার প্রতি সন্তুষ্টও নন। আমি এবং আপনারা একে অপরকে অনেকবার পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়েছে। কিন্তু ভাগ্যে যা ঘটার তা ঘটবেই। আমার দাদা আমিরে মোয়াবিয়া (রাঃ) আগে বেড়েই

ঝগড়া করেছেন। আসলে খেলাফতের অধিকারী কে? ঝগড়া কার সহিত করেছেন, যিনি নবী করীম (সাঃ) এর অতি কাছের আত্মীয়, মান মর্যাদা এবং ইসলামে তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের কারণে অভিজাত মুহাজিরীনদের মধ্যে সবচেয়ে সাহসী বীর, অত্যন্ত জ্ঞানী ও ভদ্র, চাচাত ভাই, নবী (সাঃ) এরও জামাতা। নবী করীম (সাঃ) এর ছোট মেয়ে ফাতেমার স্বামী বানাতে যাকে নির্বাচিত করেছেন। এই উম্মতের যুবকদের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং জান্নাতী যুবকদের নেতা হাসান এবং হোসাইন (রাঃ) এর সম্মানিত পিতা।

আপনারা ভাল ভাবেই জাননে যে, আমার দাদা মোয়াবিয়া (রাঃ) এমন ব্যক্তির ব্যাপারেও বিরোধিতা করেছেন আর আপনারাও তার সাথে ছিলেন। শেষ পর্যন্ত আমার দাদা সমগ্র জগতের মালিক হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু নির্ধারিত সময় যখন চলে এলো মৃত্যু তাকে গ্রাস করে ফেলল। আর তিনি তার কর্ম নিয়ে কবরে চলে গেলেন। কবরে তাকে একাই দাফন করা হয়েছে। তিনি যা করেছেন এর প্রতিফল তিনি পেয়ে গেছেন। এরপর খেলাফত আমার পিতা ইয়াজিদের কাছে আসে। তিনিও তোমাদের পরিচালনার ব্যবস্থা করেগেছেন। তিনি আর পাপের ও অনর্থক ব্যয়ের কারণে খেলাফতের মোটেও উপযুক্ত ছিলেন না। তিনি পার্থিব চাহিদায় ডুবে গিয়েছিলেন। পাপের দায়দায়িত্ব নিয়েছিলেন। আল্লাহর হুকুমের তোয়াক্কা করতেন না। যে কেউ আওয়লাদে রাসূলের সম্মান করত তিনি তার পিছু লেগে যেতেন। শেব পর্যন্ত মৃত্যু এসে তাকে নিয়ে গেল। অনেক কম সময় তিনি বেচে ছিলেন। মৃত্যুর পর তার নিদর্শনাবলী শেষ হয়ে গেছে। তার কর্ম নিয়ে তিনি জগত থেকে বিদায় নিয়েছেন। কবরের বন্ধু হয়ে গিয়েছেন। নিজেই নিজের সর্বনাশা কর্মকান্ডে ডুবে গিয়েছিলেন। তিনি যা করেছেন তার প্রতিফল পেয়ে গেছেন। এরপর তিনি সে সময়েই লজ্জিত ও অপদস্ত হয়ে পড়েছেন যখন তওবা অনুতাপ ইত্যাদির সময় অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে। আমিও তার দুঃখ বেদনার অংশীদার হলাম। অফসোস, তিনি যা বলেছেন ও করেছেন এবং তার ব্যাপারে যা কিছু বলা যায়, ব্যাখ্যা করা যায় এর জন্য।

এসকল বক্তব্য প্রদানের পর মোয়াবিয়া ইবনে ইয়াজিদ দীর্ঘক্ষণ কাঁদলেন। উপস্থিত লোকেরাও কাঁদলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি আবার বললেন, এখন আমি তোমাদের তৃতীয় অভিভাবক যার উপর অনাস্থাদানকারী লোক বেশী। আমি তোমাদের বোঝা নিব না, আর না আল্লাহ পাক আমাকে তা

বুঝিয়েছেন যে, আমি তোমাদের খেলাফতের অধিকারী অথবা ভারী আমানতের হক্বদার। তোমাদের খেলাফতের আমানত অতীব গুরুত্বপূর্ণ।খ এর হেফাজত কর এবং যাকে ইচ্ছা তাকে এর হকদার বানাও এবং তাকে এই আমানত হস্তান্তর কর।

এই খেলাফতের এই ভারি দায়িত্ব আমি আপন ঘাড় থেকে নামিয়ে দিলাম। এখন আমি দায়িত্বমুক্ত। واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

তাঁর এ বক্তব্য প্রদান কালে মরওয়ান ইবনে হাকাম মিম্বরের নীচে বসা ছিলেন। তিনি বললেন এটিই হযরত ওমর (রাঃ) এর নিয়ম ছিল। তখন মোয়াবিয়া ইবনে ইয়াজিদ বললেন তুমি আমাকে আমার দ্বীন থেকে সরাতে চাচ্ছ। আমাকে ধোকায় ফেলতে চাচ্ছ। আমি তোমাদের খেলাফতের স্বাদ গ্রহণ করে ফেলেছি। এর তিক্ততা আমি কিভাবে সহ্য করব? তুমি আমার নিকট ওমর ফারুকের মত মানুষ নিয়ে এসো। তিনি পরামর্শ কমিটিকে একটি কাঠামোর রূপ দিয়েছিলেন এবং তিনি এমন ভূমিকা রেখেছিলেন যে, কোন নিছক অত্যাচারী পর্যন্ত টু শব্দটি করতে পারেনি। আর না তাঁর প্রতি সামান্যতমও সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছিল। আল্লাহর কসম খেলাফত যদি গনিমতের মালামাল হত তাহলে আমার আব্বা এর স্বাদ আস্বাদন করেছেন। তিনি তার পাপের অবস্থায় স্বাদ ভোগ করেছেন। আর যদি খেলাফত মন্দ বস্তু হয় তাহলে এর লাভ লোকসান আমার আব্বার নিকট পৌছে গেছে। তাই যথেষ্ট। এতটুকু বলেই মোয়াবিয়া বিন ইয়াজিদ মিম্বার থেকে নেমে গেলেন। এমন সময় সকল আত্মীয় স্বজন তাকে ঘিরে ধরল। মোয়াবিয়া ইবনে ইয়াজিদ কাদতেছিলেন। অবস্থা দেখে তার আম্মা বলতে লাগলেন: হায় যদি আমি তখন ঋতু অবস্থায় থাকতাম এবং তোমার অবস্থা আমি না জানতাম! মায়ের কথা শুনে মোয়াবিয়া ইবনে ইয়াজিদ বললেন আমার ভাগ্যে যা ছিল তাই হয়েছে। তিনি আরো বললেন আমার রব যদি আমার সাথে করুণা না করেন তাহলে আমি ধ্বংস হয়ে যাব।

অবস্থা দেখে উমাইয়া বংশের লোকেরা মাআবিয়া ইবনে ইয়াজীদের গৃহ শিক্ষক ওমর আল-মাকসুদকে বলল আপনিতো সব দেখলেন, সব কিছু শুনলেন। এসব আপনিই তাকে উপদেশ দিয়েছেন, এবং তার মধ্যে এ ধরনের কথা বলার উত্তেজনা সৃষ্টি করেছেন। খেলাফতের দায়িত্ব মুক্তির জন্য আপনিই

পরামর্শ দিয়েছেন। আলীর মহব্বত ও তার সন্তানদের প্রতি ভালবাসার জযবা তার অন্তরে আপনি সৃষ্টি করেছেন। আমরা তাকে খেলাফতে উৎসাহিত করেছি আর আপনি এর প্রতি উত্তেজিত করেছেন। শেষ পর্যন্ত মোয়াবিয়া এসব বললেন এবং দীর্ঘ বক্তব্য দিলেন। গৃহশিক্ষক বললেন আল্লাহর কসম আমি এরকম কিছু তাকে বলিনি। তিনি নিজেই তো হযরত আলী (রাঃ) ও তাঁর সন্তানদের ভালবাসেন এবং তাদের প্রতি পূর্ব থেকেই দূর্বল ছিলেন। কিন্তু উমাইয়ারা তার কথা মেনে নেয়নি। তাকে ধরে জীবিতই দাফন করে ফেলে। এমনিভাবে তিনি নির্মম মৃত্যুর শিকার হন।

মোয়াবিয়া ইবনে ইয়াজিদের মৃত্যু তারিখ:

খেলাফতের দায়িত্ব ছেড়ে দেয়ার পর মোয়াবিয়া ইবনে ইয়াজিদ ৪০ অথবা ৭০ রাত বেচে ছিলেন। এর পর তিনি ইন্তিকাল করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ২৩ বছর। অন্য মতে তিনি ২১বছর আবার কারো মতে ১৮ বছর জীবিত ছিলেন।

মারওয়ান ইবনে হাকামের খেলাফত:

মোয়াবিয়া ইবনে ইয়াজিদের পর খলীফা নির্বাচিত করা হয় মারওয়ান ইবনে হাকামকে। তার বংশপরম্পরা হল মারওয়ান ইবনে হাকাম ইবনে আবু আস ইবনে উমাইয়া ইবনে আবদে শামস ইবনে আবদে মান্নাফ। জাবিয়া নামক স্থানে তার বাইয়াত নেয়া হয়। এর পর খুব তাড়াতাড়ি তিনি সিরিয়াতে চলে যান। তার গোত্রের লোকেরা তাকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তার আনুগত্য করার আশ্বাস দেয়। তার শাসনামলে খুব সামান্যই যুদ্ধ বিগ্রহ হয়। মিশরীয়রাও তার আনুগত্য স্বীকার করে। মারওয়ানকে ইবনে ত্বারীদ বলা হয়। কারণ নবী করীম (সাঃ) তার পিতাকে ত্বায়েফে নির্বাসন দিয়েছিলেন। পরে তৃতীয় খলীফা হযরত উছমান গণি (রাঃ) এর খেলাফত আমলে তাঁকে ফেরত নিয়ে আসা হয়।

মারওয়ানের মৃত্যু:

৬৫ হিঃ সনে মারওয়ান মৃত্যু বরণ করেন। স্ত্রীর সাথে তাঁর সম্পর্ক ভাল ছিল না। স্ত্রীকে প্রায়সই গালগালাজ করতেন। তাই তার স্ত্রী তাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। একদিন ঘুমন্ত অবস্থায় তার স্ত্রী একটি বড় বালিশ দ্বারা তার নাক মুখ

চেপে ধরে এর উপর বসে যায়। দাসীকেও এর উপর বসায়। এমনিভাবে তাঁর মৃত্যু ঘটে। মারওয়ান বাল্যকালেই নবী করীম (সাঃ) এর খেদমতে চলে গিয়েছিলেন। তিনি কয়েক বার মদীনার প্রতিনিধিত্ব করেন। হযরত তালহা (রাঃ) এর মত লোকের মধ্যে তাকে গণ্য করা হয়ে থাকে। হযরত তালহাকে নবী করীম (সাঃ) জীবিত থাকাবস্থায়ই বেহেশতের সুসংবাদ দেন। মারওয়ান হযরত উছমান গণি (রাঃ) এর পেশকার ছিলেন। এই কারণে তিনি বিপদ মুহূর্তেও অত্যন্ত কঠোর ছিলেন যার তুলনা বিরল।

মরওয়ানের খেলাফতকাল:

তারওয়ান ইবনে হাকাম শুধু দশ মাস খেলাফতের দায়িত্বে ছিলেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। অন্য এক বর্ণনায় আছে আব্দুর রহমান ইবনে আওফ বলেন, নবী করীম (সাঃ) এর যুগে কারো কোন সন্তান হলেই তাকে নবী (সাঃ) এর নিকট নিয়ে যেতো। হুজুর (সাঃ) এ শিশুর জন্য দোয়া করতেন। একদিন মরওয়ান ইবনে হাকাম নবী (সাঃ) কাছে গেলে তিনি (সাঃ) বলেন সে কাপুরুষ এবং কাপুরুষের ছেলে অভিসপ্ত এবং অভিসপ্তের ছেলে। এধরণের হাদীছ আমর ইবনে মুররাহ থেকেও বর্ণিত আছে। এক সময় হাকাম ইবনে আলেহাস অনুমতি নিয়ে নবী করীম (সাঃ) এর খেদমতে যেতে চাইলে নবী করীম (সাঃ) তার আওয়াজেই তাকে চিনে ফেলেন এবং বলেন তাকে অনুমতি দেয়া হল এবং ঐ সমস্ত লোকদেরও অনুমতি দেয়া হল যারা তাদের মেরুদন্ড থেকে জন্ম নিয়েছে। তাদেরকে জানিয়ে দাও তাদের উপর আল্লাহর লানত তবে এদের মধ্যে যারা মুমিন তারা নয়। তারা সংখ্যায় খুব অল্প হবে। অধিকাংশ লোক দুনিয়ালোভী হবে। তাদের পরকালকে বিনষ্ট করবে, তারা হবে ধোকাবাজ। তাদের প্রাপ্য এই জগতেই দিয়ে দেয়া হবে। কিন্তু পরকালে তাদের ভাগ্যে কিছুই থাকবে না।

মরওয়ানের ছেলে আব্দুল মালেক এর খেলাফত:

মারওয়ান ইবনে হাকাম ইন্তিকাল করার পর তাঁর ছেলে আব্দুল মালেক খেলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। মারওয়ানের ইন্তিকালের দিনই তাঁর খেলাফতের বাইয়াত গ্রহণ করা হয়। আব্দুল মালেক সে ব্যক্তি যে ইসলাম গ্রহণ করেই আব্দুল মালেক হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি প্রথম বাদশাহ যিনি স্বর্ণ রূপার মুদ্রাকে ইসলামী নিয়ম মোতাবেক খুদাই করেন। অন্যথায় স্বর্ণ

মুদ্রাগুলো রোমীয় এবং রৌপ্য মুদ্রাগুলোতে প্যারিসের নকশা খুদাই করা ছিল।

ইমাম দামিরী বলেন এ কারণে আমি ইমাম বায়হাকীর কিতাব "কিতাবুল মাহাসিন ওয়াল মাসায়ী" তে ইমাম কুসাই এর বরাতে পেয়েছি, তিনি বলেছেন, একদিন আমি হারুনুর রশীদের দরবারে গেলাম। দেখলাম যে, বাদশাহ আগমন করেছেন। তাঁর সামনে সম্পদের পাহাড় জমে গেল। একটি থলের ভিতর এত আশরাফী ছিল, আশরাফীর চাপে থলেটি ফেটে যাচ্ছিল। এমন সময় বাদশা হুকুম করলেন যে, এই থলের আশরাফী নির্দিষ্ট খাদেমের মধ্যে বিতরণ করে দাও। আমি দেখলাম যে বাদশাহর হাতে একটি স্বর্ণ মুদ্রা যার লিখিত নকশাটি চমকাচ্ছিল। নকশাটি বাদশাহ বার বার দেখতে ছিলেন এবং বার বার তিনি বলছিলেন- কুশাই-ই জানে যে, এ স্বর্ণ-রূপার মুদ্রায় কে নকশা একে ছিলেন। কুশাই বললেন জি হ্যা জনাব। আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ান এর প্রবর্তক। বাদশাহ বললেন, এর কারণ কি তা জানা দরকার। কুশাই বলল জনাব আমি অতটুকুই জানি; বিস্তারিত আমার জানা নেই। বাদশাহ বললেন আমার জানা আছে। শুন! এ উৎকীর্ণ মুদ্রার প্রবর্তক ছিল রোমীয়রা। আর মিশরীয়রা ছিল অতি কমাংশই খৃষ্টধর্মে বিশ্বাসী। এজন্য মিশরের বাদশাহ রোমের করতল গত ছিলেন। আর রোমীয়দের ধর্ম ছিল খৃষ্টধর্ম। এজন্য রোমের বাদশাহ তার মাযহাবেরই নকশা খুদাই করেন। যেমন তাদের নকশায় পিতা মাতা এবং রূহ ছিল। এই নিয়ম চলতে ছিল। তা ইসলামের শুরু লগ্ন থেকেই চালু আছে। শেষ পর্যন্ত খলীফা আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ানের শাসনামলে এর সংশোধন করে এ রোমীয় নকশার পরিবর্তন সাধান করা হয়। আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ান অত্যন্ত ধীশক্তি সম্পন্ন লোক ছিলেন। তিনি একদিন এই নকশার মুদ্রা দেখে খুব গভীরভাবে চিন্তা করলেন। চিন্তা করে এর আরবী অনুবাদ করার আদেশ জারী করলেন।

আরবী অনুবাদ করার পর তিনি যখন তা বুঝতে পেলেন তখন তাঁর কাছে এ ব্যবস্থা অপছন্দ হল। আব্দুল মালেক বললেন এই নিয়ম আমাদের আদর্শে মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়। রোমীয় নকশা বাসন কোসন ও কাপড়ে যা পাওয়া যায় তা আমাদের আদর্শে অগ্রহণযোগ্য। যদিও মিশরে তা তৈরী হয়ে রোমের শাসন ব্যবস্থায় প্রচলিত হয়। এই নকশা শুধু এ সবের মধ্যেই সীমিত ছিলনা, বরং পর্দা ইত্যাদিতেও এ নকশা অঙ্কিত হয়েছিল। এ কাজ অত্যন্ত উচুমানের শর্তে অংকন

করা হয়েছিল। প্রচার প্রসার হয়েছিলও এমনভাবে যা সমগ্র জগতে এর প্রচলন শুরু হয়ে যায়। সুতরাং আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ান তার মিশরের গভর্ণর আব্দুল আজিজ ইবনে মারওয়ানকে পত্র দিয়ে জানিয়ে দিলেন যে, রোমীয় নকশাকৃত সমস্ত মুদ্রা, কাপড়, পর্দা ইত্যাদি ধ্বংস করে ডিজাইনে পারদর্শীদেরকে উপদেশ দাও যে, রোমীয় নকশা পরিহার করে এই সমস্ত বস্তুতে ইসলামী নকশা কলমা তাওহীদ, আশহাদু আল লাইলাহা ইল্লাহু অঙ্কন করা হোক। এমনিভাবে আব্দুল মালেক এর যুগ থেকেই এর প্রচলন শুরু হয়। আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ান কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, নিজ নিজ এলাকা থেকে রোমীয় নকশাকৃত যাবতীয় মুদ্রা আটক করে ফেল। এই আদেশ জারির পর যদি কারো কাছে এই মাদ্রা পাওয়া যায় তাহলে তাকে শস্তি দেয়া হবে। অথবা জেলে রাখা হবে। এর পর থেকে আব্দুল মালেক কাপড়, মুদ্রা এবং পর্দায় তাওহীদের চিত্র ছেপে সমগ্র রাজ্যে এর প্রচলন ঘটান। তিনি এ প্রকার চিত্রের কিছু বস্তু রোম সম্রাটের এলাকাতেও প্রেরণ করেন। এই প্রথা প্রচলনের সংবাদ সমগ্র রোমেও প্রচারিত হয়। রোমে এ চিত্রের অনুবাদ করে বাদশাহর খেদমতে পাঠনো হলে বাদশাহ তা অপছন্দ করেন এবং অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হন।

রোমের বাদশাহর পক্ষ থেকে আব্দুল মালেকের নামে পত্র:

এসব অবস্থা দেখে রোমের বাদশাহ আব্দুল মালেকের নিকট সত্বর পত্র লিখলেন যে, মিশরে নির্মিত কাপড়ে অংকিত চিত্রাবলী রোমের জন্য তৈরী করা হয়। অনেক দিন থেকেই আমাদের এ ব্যবস্থা চালু হয়ে আসছে। এখন আপনি তা বাতিল ঘোষণা করেছেন। যদি এ ব্যবস্থা আপনার পূর্বের খলীফাগণ চালু করে থাকেন তাহলে তারা ভাল কজই করেছিলেন। কিন্তু আপনি তা উচিত করেন নি। আপনি যদি উচিত করে থাকেন, তাহলে তারা ভুল করেছেন। সে জন্য আপনি এই দু'টি কথার যে কোন একটি গ্রহণ করতে পারেন। আমি আপনার খেদমতে কিছু উপহার সামগ্রি প্রেরণ করছি যা আপনার জন্য মানানসই হবে। কিন্তু আপনার নতুন চিত্রাংকনকে অহেতুক মেনে নিয়ে আমাদের চিত্রাবলীকে ঠিক রাখুন এবং এসবই বহাল রাখার আদেশ জারী করুন। আপনার নিকট কৃতজ্ঞ থাকব। আর আমার উপহার গ্রহণ করুন। আমি আপনার জন্য অনেক মূল্যবান উপহার পাঠিয়েছি।

আব্দুল মালেকের পক্ষ থেকে এ পত্রের জবাব:

আব্দুল মালেক ইবনে মরওয়ান এই পত্র পাঠ করার পর পত্র বাহককে বললেন, যাও এই পত্রের কোন জবাব দেয়া হবে না। আমার নিকট এর কোন গরুত্ব নেই। তার উপহার সামগ্রীও ফেরৎ নিয়ে যাও।

চিঠি এবং উপহার সমগ্রী নিয়ে দুত ফেরৎ যাওয়ার পর বিস্তারিত ঘটনা তাকে জানাল। রোমের বাদশাহ উপহার সামগ্রী আরো বৃদ্ধি করে আব্দুল মালেকের নিকট আবার দূত প্রেরণ করলেন। দুতকে তিনি বলেদিলেন যে, আমার আশা যে তিনি এখন উপহার সামগ্রীর সম্মান দেখাবেন এবং গ্রহণ করবেন। কিন্তু মনে হয় তিনি তা গ্রহণ করবে না এবং আমার পত্রের জবাবও দেবেন না। এজন্য আমি উপহার সামগ্রী বাড়িয়ে আবার প্রেরণ করলাম। আশা করি তিনি রোমীয় চিত্রাবলীর অনুমতি প্রদান করবেন।

এবারও আব্দুর মালেক ইবনে মরওয়ান রোমের বাদশাহর পত্র পড়ে রেখে দিলেন এবং তার পাঠানো উপহার সমাগ্রী ফেরৎ দিলেন। আবার রোমের বাদশাহ পত্র লিখলেন। এবার তাতে লিখলেন যে, আপনি আমার পত্র ও উপহারকে অবজ্ঞা করলেন। আমার জবাব দেয়ার প্রয়োজনীয়তা মনে করেননি। প্রথমে ভেবেছিলাম যে, আমার দেয়া উপহার কম পাঠানো হয়েছে। তাই আমি আরো বেশি করে পাঠালাম। এগুলো আপনার নিকট আবার প্রেরণ করলাম। এখন আমি তৃতীয় বারের মত এগুলোর সাথে আরো বৃদ্ধি করে পাঠালাম। আমি ঈসা ইবনে মারইয়ামের কসম করছি যে, আপনি চিত্রাবলীর ব্যাপার দ্বিতীয়বার চিন্তাভাবনা করবেন এবং পূর্বের মত থাকার মনোভাব ব্যক্ত করবেন। আমি আমার রাজ্যে স্বর্ণ রূপার মুদ্রাকে আপনার রাজ্যের মতই চালাচ্ছি। আর আপনার জানা আছে যে, আমার রাজ্যে এই পন্থায়ই চলে। ইসলামে এ প্রথা প্রচলন ছিলনা না এর অনুমোদন দেয়।

আর যদি তা আপনি না মানেন তাহলে আপনার নবীর ছবি একে দিন। আমার আশা যে আপনি যখন এ পত্র পাঠ করবেন তখন ঘামে ভিজে যাবেন। এ জন্য আমি যা বলি তা আমল করবেন এবং আপনাদের সেখানে আমাদেরই চিত্রাবলী বহাল রাখবেন। এতে করে পরস্পরের সম্পর্ক আরো বৃদ্ধি পাবে। আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ান পত্র পাঠ করে আরো রাগান্বিত হলেন এবং

সম্পর্ক আরো তিক্ত হল। তিনি বললেন আমি আব্দুল মালেক ইসলামে সবচেয়ে বেশী হতভাগা হয়ে জন্ম গ্রহণ করেছি। কারণ সে কাফেরটার গালি গালাজ থেকে হয়ত আমি নবী করীম (সাঃ) এর খেলাফ রাগান্বিত হয়েছি। যে ব্যক্তি আমাদের নবীকে গালী দেয় সে বেশী দিন জীবিত থাকবে না। সমগ্র আরব জাহানে রোমীয় মুদ্রা দ্বারা লেনদেন যা চলতেছিল তা আরব মুদ্রাকে এরকম উচ্ছেদ করা উচিত মনে করছি না।

মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে হোসাইন এর পরামর্শ:

আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ান বড় বড় মনিষীদের একত্রিত করে তাদের নিকট এব্যাপারে পরামর্শ চাইলেন। কিন্তু কেউই এমন কোন পরামর্শ দিতে সক্ষম হলেন না যার উপর আমল করা যায়। কিন্তু রূহ ইবনে যানা নামে এক ব্যক্তি বললেন, একথা আমার বুঝে এসেছে যে, একমাত্র লোকের কাছ থেকে সামান্য কিছু পরামর্শ গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয় হবে। আপনারা কি তার কথার মূল্যায়ন করতে প্রস্তুত আছেন? আব্দুল মালেক বললেন, বলুন সে লোক কে? তিনি বললেন আহলে বাইতের একজন বিজ্ঞ আলেম বাক্বির। আব্দুল মালেক বললেন আপনি ঠিক বলেছেন। আব্দুল মালেক মদীনার গভর্ণরের নিকট পত্র লিখে জানালেন যে, এক ব্যক্তি মোহাম্মদ বিন আলী বিন হোসাইনকে আমি চিহ্নিত করেছি। আপনি তাঁকে এক লক্ষ দিরহাম তার প্রস্তুতির জন্য দিন এবং তিন লক্ষ দিনার তার খরচের জন্য এবং তার সাথীবর্গসহ এখানে আসার ব্যবস্থা করুন।

মোহাম্মদ ইবনে আলী আসা পর্যন্ত রোম সম্রাটের দুৎকে বন্দী করা হল। মোহাম্মদ বিন আলী তাশরীফ আনার পর তিনি তাকে বিস্তারিত জানালেন। মোহাম্মদ ইবনে আলী এই পরামর্শ দিলেন যে, এটি তো কোন মন্দ কথা নয়, কারণ দুটি প্রস্তাবের মধ্যে একটি কার্যকর হবে প্রথমতঃ আল্লাহ তাআলা তাকে ছেড়ে দিবেন না যে নবী করীম (সাঃ) এর ব্যাপারে অশোভন কথা ব্যবহার করেছে। ২য়তঃ একটি ব্যাখ্যা আমার বুঝে আসছে যে, এখন আপনি প্রকৌশলীদের ডেকে স্বর্ণ - রূপার সাঁচ তৈরী করে ফেলুন। সে মুদ্রায় তাওহীদের চিত্র একে দেয়া হবে। এক পিঠে থাকবে لا اله الا الله অন্য পিঠে محمد الرسول الله এর চিত্র খুদাই করা থাকবে। আর মুদ্রার মাঝ অংশে থাকবে মুদ্রা

তৈরীর সন এবং যেখানে এ মুদ্রা তৈরী হয়েছে সে শহরের নাম। অতঃপর ৩০ দিরহাম ওযনের তিনি তরীকায় নির্ধারণ করবে ১০টি মুদ্রা ১০ মিসকালের, ১০টি মুদ্রা ৬ মিছকালের এবং ১০টি মুদ্রা ৫ মিছকাল ওজনের তৈরী করবেন। এভাবে এই সমস্ত মুদ্রা ২১ মিছকালের হবে যা ৩০ দিরহামের সমান হবে। আবার যদি এগুলোকে ৭ মিছকালে বন্টন করা হয় এবং প্রতিটির সাথে শিশা গলিয়ে দেয়া হয় তাহলে কম বেশী হওয়ার ভয় থাকবে না। এভাবে মুদ্রার ওজন ১০ মিছকাল সমান হবে। আর দিনারের ওজন সাত মিছকাল সমান হবে। এভাবে সে যুগের দিরহামের প্রচলন হয়ে গেল যাকে বাগলিয়া বলা হত। এজন্য হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) এর খেলাফত কালে খচ্চরের মাথার একটি নমুনা বানানো হয়েছিল যে মুদ্রাকে 'কাছরুইয়া বলা হত। এর উপরের অংশে ছিল বাদশাহর ছবি এবং সিংহাসনের ছবি। সে মুদ্রায় ফার্সী ভাষায় লিখা ছিল খোর বখুশ ইসলামী যুগের পূর্বে দিরহামের ওজন ছিল এক মিসকাল। আবার কোন কোন মুদ্রার ওজন ছিল ৬ মিছকাল, দশ মিছকাল, পাঁচ মিছকাল। তা ছিল হালকা পাতলা ওজনের। এতে ফার্সী নাকশা অঙ্কিত ছিল।

মোহাম্মদ ইবনে আলীর পরামর্শক্রমে আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ান কাজটি করে ফেললেন। আব্দুল মালেক মোহম্মদ ইবনে আলীকে এও বললেন যে, আপনিই এ মুদ্রার ব্যাপার সমস্ত ইসলামী রাজ্যে পত্র দিয়ে জানিয়ে দিন। সমস্ত মানুষ যেন আমার তৈরী করা মুদ্রায় ব্যবসা বাণিজ্যে লেনদেন, বেচা-কেনা করে। যে ব্যক্তি এর বিরোধী কোন কাজ করবে এ অপরাধে তাকে হত্যাও করা যাবে। এও আপনি লিখে দিন যে, ইতিপূর্বে যে সমস্ত মুদ্রা প্রচলিত ছিল সেগুলো একত্র করে সম্রাজ্যের বরাবরে প্রেরণ করে দিবে।

খলীফা আব্দুল মালেক এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি আঞ্জাম দিয়ে রোম সম্রাটের দুতকে এই বলে ফেরত পাঠিয়ে দেন যে, রোম সম্রাটকে বলে দিও তুমি যে পদক্ষেপ নিয়েছিলে তা আল্লাহ তাআলার নিষিদ্ধ। আমি সকল গভর্নরের কাছে এই আদেশ পাঠিয়ে দিয়েছি যে, পূর্বের সকল মুদ্রাকে অচল ঘোষণা করে দাও। এসকল মুদ্রা একত্র করে নতুন মুদ্রা তৈরীর জন্য পাঠিয়ে দাও। বিষয়টি সম্পর্কে রোম সম্রাট অবগত হলে সভাসদগণ সম্রাটকে বললেন ইতিপূর্বে দূতের মাধ্যমে আরব সম্রাটকে যে ধমক দিতেন এর উপর আমল করুন। সম্রাট জবাব দিলেন যে, ভাইসব আমি তো সে ভাবেই শক্ত করে ধমকিয়ে ছিলাম। ভয় ভীতি দিয়ে

কাজ উদ্ধা করা যায় না। সে আমার ধমকিতে কাজ করেনি। এখন আমি এছাড়া আর কি করতে পারি? আমাদের রাজ্যেতো আমাদের নিয়ম নিয়ম অনুযায়ী মাল ও মুদ্রা চলছেই। মুসলমানরা আমাদের মুদ্রা গ্রহণ করবে না।

মোট কথা হল রোম সম্রাটের কোন জোর-জবরদস্তি হুমকি-ধমকি খাটেনি। এ ঘটনা বর্ণনা করে হারুনুর রশীদ অন্যান্য কর্মচারীদের দিকে দেখার জন্য একটি মুদ্রা ছুড়ে মারেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাঃ):

কিছু দিনের মধ্যেই আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর খেলাফতের পতাকা বস্তৃত করে ফেলেন। এতে ইয়ামনী, ইরাকী, হারামাইনের অধিবাসীগণকে বাইয়াত করে নেন। আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাঃ) ইরাক এবং তার আশপাশের এলাকার জন্য তার ভাই মাসআব ইবনে যুবাইরকে প্রতিনিধি করে পাঠিয়ে দেন। সে সময় উম্মতে মুহাম্মদী (সঃ) এর মধ্যে বেশ অনৈক্য দেখা দেয় এবং সে সময়ই উম্মতে মুহাম্মদীতে দুই খলীফার নেতৃত্ব দেখা যায়। এর মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইরই উপযুক্ত ব্যক্তি ছিলেন। আব্দুল মালেক প্রয়োজনীয় কাজগুলো করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর শহীদ হয়ে যান। একদা আব্দুল মালেক দামেস্ক থেকে ইরাকের দিকে এগিয়ে আসছিলেন। তখন প্রতিনিধি মাসআব ইবনে যুবাইর ইতিপূর্বে আব্দুল মালেক ও তার সৈন্য বাহিনীকে প্রয়োজনীয় উপদেশ দিয়ে ছিলেন। সৈন্যরা অপমান করে তাদেরকে প্রতিহত করলেন। মাসআব তার কয়েকজন সাথী নিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগলেন। প্রচন্ড যুদ্ধ হল। মাসআব ইবনে যুবাইর অত্যন্ত সাহসী ও বীরত্ব দেখাচ্ছিলেন। শেষ তক তিনি শহীদ হন। যুদ্ধের পর আব্দুল মালেক খুরাসান ও ইরাকে নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। এ যুদ্ধের পর আব্দুল মালেক সে দুটি যুদ্ধে তার ভাই বশীর ইবনে মারওয়ানকে তার প্রতিনিধি করে প্রেরণ করেন। এরপর আব্দুল মালেক আবার দামেস্কে ফিরে গেলেন।

হজ্জাজ ইবনে ইউসুফের অবরোধ:

দিন কয়েক পর আব্দুল মালেক হজ্জাজ ইবনে ইউসুফ আস-সাকাফী কে এক বিরাট সৈন্য বাহিনীসহ আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইরের সাথে যুদ্ধ করার জন্য পাঠান। হজ্জাজ খুব দ্রুত সেখানে গিয়ে হযরত যুবাইরকে অবরোধ করে

ফেলেন। চার দিক থেকেই তার রাস্তা বন্ধ করে দেন এবং আবু কুবাইস পাহাড়ে একটি ক্ষেপনাস্ত্র মোতায়ন করেন। সাহসী ও যুদ্ধবাজ সৈন্যদের অবরোধের ভিতর দিয়েই আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর যুবকদের সাথে বীরত্ব এবং সাহসিকতার পরিচয় দিতে থাকেন। একাই তিনি বিরোধী বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করে তাদের পশ্চাদাপসরণ করছিলেন। প্রতিপক্ষের অধিকাংশই মসজিদের দরজা থেকে পিছু হটে যাচ্ছিল। এ যুদ্ধ এবং অবরোধ ৪ মাস ব্যাপী ছিল। শেষ পর্যন্ত তার উপর এক মারাত্মক আক্রমণ তথা মসজিদের একটি মিনার তার উপর পতিত হয়। এতে তিনি তঠাৎ করে মারাত্মকভাবে আহত হন। এহেন আহতাবস্থায় শত্রুরা সুযোগ বুঝে তার মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। হজ্জাজ তার শবদেহকে অপমানিত করে শুলীতে চড়িয়ে দেয়।

খলীফা হওয়ার পূর্বে আব্দুল মালেক ইবাদতকারী, আলেম ও ফকীহ ব্যক্তি ছিলেন। তার লম্বা মুখমন্ডল, হালকা পতালা গড়ন, স্বর্ণের তারের বাধা দাত, অত্যন্ত বুদ্ধিমান লোক ছিলেন। কারো উপর তিনি নির্ভর করতেন না। গুরুত্বপূর্ণ কাজ অন্যের উপর ছেড়ে দিতেন না। জাকজমক ও আত্মম্ভরিতাকে পছন্দ করতেন।

ইবনে খাল্লেকান লিখেছেন যে, আব্দুল মালেক বাদশাহ ছিলেন তাই তার একটা চরিত্রও ছিল। তার এই চরিত্র অধীনস্ত সমস্ত গভর্ণরদের মধ্যেও বিস্তার লাভ করেছিল। আরাকে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ আসসাকাফী খুরাসানে আল মাহলুব ইবনে আবু হাফরাহ, মিশরের হিশাব ইবনে ইসমাঈল প্রাচ্যদেশে মুসা ইবনে নুসাইর, ইয়ামনে হাজ্জাজের ভাই মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ, জাজিরাতে মুহাম্মদ ইবনে মারওয়ান প্রমূখ অত্যাচারী, অহংকারী এবং খুনী প্রকৃতির ছিল।

জনৈক মনোবিজ্ঞানীর ভবিষ্যদ্বানী:

ইবনে খাল্লেকান বলেন যে, জনাব মুহাম্মদ এবং তার পিতা আলী ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস উভয়ে একদা আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ানের দরবারে উপস্থিত হন। এমতাবস্থায় খলীফার কাছে একজন মনোবিজ্ঞানী বসে ছিলেন। আব্দুল মালেক মনোবিজ্ঞানীকে বলেন, আপনি কি এদের ব্যাপারে কিছু বলতে পারবেন? মনোবিজ্ঞানী বলল, এদের সম্পর্কে আমার জানা নেই। তবে আমার মনে হয় এ যুবক যার ঔরসে তার জন্ম তার পৃষ্টদেশ থেকে এমন

ফেরাউন জন্ম গ্রহণ করবে যে সমগ্র পৃথিবীর শাসক হয়ে বসবে। আমাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা তাকেই সে হত্যা করবে। একথা শুনে আব্দুল মালেকের চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে গেল। আব্দুল মালেক বললেন সত্যি বলছেন। ইতিপূর্বে (ইলিয়া) জেরুজালেমের পাদ্রী ও তাই বলেছিলেন যে, এদের পৃষ্ট থেকে ১৩ জন বাদশাহ জন্ম নিবে। তিনি এদের গুণা গুণও বর্ণনা করেছেন।

আব্দুল মালেক মুত্যু শয্যায় থাকা কালীন তার ছেলে ওয়ালীদকে ডেকে নাকি এই উপদেশ দিয়ে ছিলেন যে, শোন ওয়ালীদ! আমি এটি পছন্দ করিনা যে, যখন আমার লাশ কবরে রাখবে তখন তুমি চিন্তিত লোকদের মত কাঁদতে থাকবে। বরং তুমি তখন কাপড় চোপড় পরিধান করে তৈরী হয়ে যাবে। চিতা বাঘের চামড়া পরিধান করে দাঁড়িয়ে যাবে। তোমার বাইয়াতে কেউ মাথা ফেরাতে চাইলে তুমি তাকে মৃত্যু ঘাটে পাঠিয়ে দিও।

আব্দুল মালেক এর উপাধি ছিল "মসজিদের কবুতর"। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর তার এই নাম দিয়ে ছিলেন। কারণ খেলাফতের দায়িত্বভার তার দিকে প্রবর্তিত হওয়ার সময় মসজিদে তিনি কোরআন তেলাওয়াতে রত ছিল। এ অবস্থা দেখে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর তাঁকে মসজিদের কবুতর উপাধি দেন। নামটি সে সময় দ্রুতই প্রচার হয়ে যায়। এর পর আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর তাকে সালাম করে বললেন, এখন আমি তোমার কাছ থেকে পৃথক থাকব। কোন কোন আলেম বলেন একদা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরের কাছে জিজ্ঞেস করা হল যে, যদি নবী করীম (সাঃ) এর সমস্ত সাহাবা (রাঃ) যমীন থেকে বিদায় হয়ে যান তাহলে আমরা কার কাছে মাসআলা জানব? তিনি বলেছিলেন নওজোয়ান আব্দুল মালেক নামে এক ব্যক্তির কাছে জিজ্ঞেস করবেন।

আব্দুল মালেক বিন মরওয়ানের মৃত্যু:

তিনি ৮৬ হিঃ শাওয়াল মাসে ইন্তিকাল করেন। তার বয়স সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেছেন ৬৩ বছর, কেউ বলেছেন ৬০ বছর। তিনি ইন্তিকালের সময় ১৭ জন সন্তান রেখে যান। এদের মধ্যে ৪ জন খেলাফতের অধিকারী হন। তিনি ২১ বছর ১৫ দিন খিলাফতের মসনদে সমাসীন ছিলেন। এর ৮ বছর আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইরের খেলাফত নিয়ে তার সাথে যুদ্ধ হয়। পরে অবশ্য পূর্ণ রাজ্য তাঁর দখলে চলে আসে। শেষ পর্যন্ত তিনি আল্লাহ পাকের প্রিয়

পাত্র হয়েছেন।

আব্দুল্লাহ ইবেন যুবাইর এর খেলাফত:

আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর স্বল্পকালীন খলীফা ছিলেন। তাঁকে করে শহীদ করা হয়।

আগেই বর্ণনা করা হয়েছে যে, মোয়াবিয়া ইবনে ইয়াজিদ ইবনে মোয়াবিয়া স্বেচ্ছায় খেলাফত অব্যহতি নেন। তাহলে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর কি করে স্বল্পকালী খলীফা হন? আবার এও উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত হোসাইন (রাঃ) ও স্বেচ্ছায় দায়িত্ব মুক্ত হয়ে যান। উপরোক্ত দুটি ব্যাপার যদি ধারনা হিসেবেও ধরে নেয়া হয় তাহলে হযরত যুবাইর (রাঃ) স্বল্পকালীন খলীফা হতে পারেন না। ৬৪ হিঃ ২৩ শে রজব মক্কাতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর থেকে বাইয়াত নেয়া হয়েছিল। সময়টা ছিল ইয়াজিদ ইবনে মোয়াবিয়ার। যা ইতিপূর্বে আলোচনায় এসেছে। আহলে ইরাক, আহলে মিশর এবং সিরীয়দের অংশ বিশেষ তার বাইয়াত গ্রহণ করে। আবার তিনি যুদ্ধ বিগ্রহের পর মরওয়ানের বাইয়াত নেন। ইরাকীরা শেষ পর্যন্ত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইরের সাথেই ছিলো। আনুমানিক এ ঘটনা ঘটে ৭১ হিঃ সনে। যে সনে আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ান তার ভাই মাসআব ইবনে যুবাইরকে হত্যা করেছিল। এর পাশাপাশি কুফার মহলও ধ্বংস করে দেয়া হয়ে ছিল।

জানার মত একটি ঘটনা:

একদা আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ান সে ভাঙ্গা প্রাসাদে বসেছিলেন এবং তার সামনে মাসআব ইবনে যুবাইরের কর্তিত শির রাখা হয়। তখন আব্দুল মলেক ইবনে উমাইর আরজ করলেন যে, আলমপনা! ইতিপূর্বে আমি এবং আব্দুল্লাহ ইবনে যিয়াদ এই মহলেই বসছিলাম। আমাদের সামনে হযরত হোসাইনের কর্তিত শির আনা হয়েছিল। আবার অন্য একদিন আমি এবং মুখতার ইবনে আবু উবাইদ এই মহলেই বসাছিলাম। সে সময় উবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদের কর্তিত শির আমাদের সামনে আনা হল। আবার আমি এবং মাসআব ইবনে উমাইর এখানে বসাছিলাম তখন আমাদের সামনে মুখতার ইবনে আবু উবাইদের কর্তিত শির আনা হয়। এখন আপনার সাথে বসলাম, এখন মাসআব ইবনে যুবাইরের কর্তিত শির আনা হল। মহামান্য খলীফা! এ মহলের এদরবার

কক্ষ থেকে আমি আল্লাহর কাছে পানা চাই। একথা শুনেই আব্দুল মালেক হতচকিত হয়ে একদম দাঁড়িয়ে গেলেন এবং এ মহলটি ভেঙ্গে ফেলার আদেশ দেন।

মাসআব ইবনে যুবাইর:

তিনি প্রশস্থ অন্তরের লোক ছিলেন, ছিলেন বীর পুরুষ। পূর্ণিমার চাঁদের মত অত্যন্ত সুন্দর লোক। যখন মাসআব ইবনে যুবাইরকে হত্যা করা হয় তখন তাঁর আত্মমর্যাদা নীচু হয়ে যায়। মাসআবের অনুসারীদের তার নিকট বাইয়াত নেবার প্রস্তাব করণে সবই তৈরী হয়ে যায়। তারা আব্দুল মালেকের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে। এর পর আব্দুল মালেক কুফাতে প্রবেশ করেন। এ আলোচনাই ইরাকে হচ্ছিল এবং তার হুকুম মোতাবেকই কাজ চলছিল। শিরিয়া ও মিশর তার শাসনাধীন চলে আসল।

হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের অবরোধ:

৭৩ হিজরী সনে হজ্জাজ বিন ইউসুফ আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইরকে অধীনস্ত করার জন্য বাহিনী নিয়ে মক্কায় গমন করে। ক্ষেপণাস্ত্রের সাহায্যে কাবা ঘরে পাথর নিক্ষেপ করা হয়। হাজ্জাজ তার মিশনে সফল হয়। আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইরকে গ্রেফতার করে হত্যা করা হয়। তার মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে উল্টাভাবে শূলিতে ঝুলিয়ে দেয়া হয়। কয়েকদিন পর সেখান থেকে নামিয়ে ইহুদীদের কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। কতিপয় ঐতিহাসিক লিখেন যে, হাজ্জাজ বলেছিল আব্দুল্লাহর মা আসমা বিনতে আবুবকর যতক্ষণ আমার নিকট ক্ষমা না চাইবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার লাশ শূলি থেকে নামানো হবে না। এ অবস্থায় অনেকদিন চলে গেল। একদিন তার মা আসমা বিনতে আবু বকর সে পথ ধরে যাচ্ছিলেন। তিনি তাঁর ছেলের ঝুলন্ত লাশ দেখেই বলতে লাগলেন এখনও তার মস্তক উন্নত। হাজ্জাজ একথা অবগত হওয়ার পর তার লাশকে নামানোর আদেশ করে এবং তার মায়ের নিকট পাঠিয়ে দেয়া হয়। তার মা তাঁকে দাফনের ব্যবস্থা করেন।

আব্দুল্লাহ বিন জুবায়েরের খেলাফতকাল:

হেজাজ ও ইরাকসহ তাঁর খেলাফত কাল ৯ বছর ২২ দিন। এরপর তাকে হত্যা করা হয়। তার বয়স হয়েছিল মোট ৭৩ বছর অথবা অন্য মতানুসারে ৭২

বছর।

ওয়ালিদ ইবনে আব্দুল মালেকের খেলাফত:

আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ানের ইন্তিকালের পর তাঁর পুত্র ওয়ালিদ খলীফা মনোনীত হন। এ উদ্দেশ্যেই তাকে পূর্ব থেকে গভর্ণর বানানো হয়েছিল। সে ছিল চরিত্রহীন, লম্পট, ধুর্তদের কাতারে প্রধান। তার বিদ্যা-বুদ্ধি ছিল কম। সে তিন দিনে কোরআন খতম করত। এব্রাহীম ইবনে আবি আবলাহ বলেন ওয়ালীদ ইবনে আব্দুল মালেক রমজান মাসে ১৭ বার কোরআন শরীফ খতম করত। কোন কোন সময় থলে ভর্তি টাকা পয়সা গরীব মিসকীনদের মধ্যে বন্টন করত। কোন কোন আলেম বলেন ওয়ালীদ ইবনে মালেকের ব্যাপারে প্রসিদ্ধ কথা হল সে বলত সমকামিতার ব্যাপারে যদি কোরআন না বলত তাহলেতো আমার খবরই ছিল না যে, সমকামিতা কি? অন্য সে কেহও সমকামিতা করত। যেদিন তার পিতা আব্দুল মালেক ইন্তিকাল করেন সেদিন ওয়ালীদ বাইয়াত নেয়। বাইয়াত নিয়ে সে ঘরে না গিয়ে সরাসরি মিম্বরে আরোহন করে এই সমস্ত শব্দাবলী উচ্চারণ করে।

الحمد لله وانا لله وانا اليه راجعون والله المستعان على مصيبتنا باامير المؤمنين والحمد لله على ما انعم به علينا من الخلافة قوموا فبايعوا

পিতার ইন্তিকালে তিনি শোক জাতীয় শব্দাবলী উচ্চারণ করেন। তিনি আল্লাহ পাকের সাহায্যের আশা করেছেন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন এবং লোকদিগকে তার খিলাফতের দিকে উৎসাহিত করেন।

ওয়ালিদ ইবনে আব্দুল মালেকের কৃতিত্ব:

ইবনে আসাকির (রহঃ) বলেন, ওয়ালীদ ইবনে আব্দুল মালেক সিরীয়দের কাছে একজন শ্রেষ্ঠ ও উত্তম শাসক হিসেবে বিবেচিত হতেন। তিনি অসংখ্য শ্রেষ্ঠ ও উত্তম কাজ করেছেন। দামেস্কে অনেক মসজিদ নির্মান করেন। কুষ্ঠ রোগীদের জন্য ভাতার ব্যবস্থা করেন। অন্যের নিকট হতে হাত পাতা নিষেধ করা হয়েছিল। চলতে ফিরতে অপরাগ লোকদের জন্য কর্মচারী নিয়োগ করেন। অন্ধদের জন্য পথ প্রদর্শক নিযুক্ত করেন। হাফেজে কোরআনগণকে অনুদান এবং উপঢৌকন দিতেন। জনগণের সাথে উদারতা ও বদান্যতার সম্পর্ক

রাখতেন। এছাড়াও তিনি ঋণ গ্রস্থদের বোঝা হালকা করে দিতে চেষ্টা করতেন। উমাইয়াদের জন্য জামে মসজিদ নির্মাণ করেছেন। ইহুদী খৃষ্টানদের ইবাদতখানা তিনি ধ্বংস করেছেন। এ সমস্ত যাবতীয় উন্নয়নমূলক কাজ ৮৬ হিঃ জিলকদ মাসে হয়। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন যে, ওয়ালীদ ১২ হাজার জামে মসজিদে মর্মর পাথর সংযোজন করতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু কাজগুলো সমাপ্তির পূর্বেই তিনি ইন্তিকাল করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ভাই সুলাইমান ইবনে আব্দুল মালেক এই কাজ সম্পন্ন করেন। এ সকল মসজিদ নির্মাণে আনুমানিক ৪০০ সিন্ধুক অর্থ ব্যায় হয়। প্রতিটি সিন্ধুকে ২৮ হাজার দিরহাম ছিল। এমনিভাবে তিনি বায়তুল মোকাদ্দাসে বড় বড় পাথর স্থাপন করেন। মসজিদে নববী নির্মাণ করেন। মসজিদে নববীকে এত প্রশস্ত করেন যে, নবী করীম (সাঃ) হুজরাও এর অন্তর্ভুক্ত করেনেন। এ ছাড়া ওয়ালীদ ইবনে আব্দুল মালেকের অনেক উন্নয়ন মূলক কাজ ও কৃতিত্ব রয়েছে।

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ বলেন, যখন আমি ওয়ালীদ ইবনে আব্দুল মালেককে তার কবরে রাখলাম তখন দেখলাম তিনি কাফনের ভিতরে অস্থির অবস্থায় আছেন এবং তার হাত উল্টিয়ে ঘাড়ের সহিত বাধা হয়েছে।

ওয়ালীদের বিজয়াভিযানসমূহ:

ওয়ালীদের শাসনমালে ইসলামের বড় বড় বিজয় অর্জিত হয়েছে। যেমন সিন্ধু, হিন্দুস্থান, স্পেন ইত্যাদি দেশ জয় করেন। এছাড়াও তিনি আরো বহু দেশ জয় করেন। ওয়ালীদ ইবনে আব্দুল মালেক উন্নতমানের সওয়ারে আরোহন করতেন। এ সমস্ত সওয়ারী ভ্রমন, যুদ্ধ ইত্যাদিতে অনবর্ত কাজ করত।

আলকামা ইবনে সাফওয়ান আহমদ ইবনে ইয়াহইয়া থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম (সাঃ) এরশাদ ফরমান বছরের ১২টি দিবস থেকে নিজেকে রক্ষা করে চলবে। কারণ এ ১২ দিন তোমাদের ধন সম্পদ ধ্বংস করে দেয়। পর্দা উম্মোচন করে দেবে। আমি বললাম এগুলো কোন কোন দিন? নবী করীম (সাঃ) বললেন, দিনগুলো হলো ১২ ই মহররম, ১০ই সফর, ৪ঠা রবিউল আওয়াল, ১৮ই রবিউচ্ছানী, ১৮ ই জামাদিউচ্ছানী, ১২ রজব, ১৭ই শাওয়াল, ১৪ই রমজান, ২রা শাওয়াল, ১৮ই জিলক্বদ এবং ৮ই জিলহজ্ব। (হাদীছটি জয়ীফ)

ইমাম দামিরী বলেন যে, ওয়ালীদ ইবনে আব্দুল মালেক কর্তৃক বায়তুল

মোকাদ্দাসে বড় বড় পাথর লাগানোর যে কথা বলা হয়েছে তা ঠিক নয়। কারণ একাজ তার পিতা আব্দুল মালেক ফেতনায়ে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইরের যুগে করেছিলেন। যে সময় আব্দুল মালেক শিরীয়াবাসীকে হজ্জে বাধা প্রদান করেছিলেন। আর কোথায় আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর? এসমস্ত লোকদের থেকে বায়আত নেয়া হয়নি। তখন সমস্ত লোক আরফাতের দিন বড় বড় পাথরে দাঁড়িয়ে ছিল। শেষ পর্যন্ত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর শহীদ হয়ে যান। (কিছু পরেই এর উপর বিস্তারিত আলোচনা আসবে।)

ওয়ালদি ইবনে আব্দুল মালেকের ইন্তিকাল:

তিনি ১৫ই জামাদিউল উখরা ৯৬ হিজরী সনে মারওয়ানের ঘরেই ইন্তিকাল করেন। তাঁর বয়সের ব্যাপারেও ওলামায়েকেরামের মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেছেন ৪৬ বছর কেউ বলেছেন ৪৮ বছর আবার কারো মতে ৫০বছর। ইন্তিকালের সময় তিনি ১৪ জন সন্তান রেখে যান। বাবুচ্ছাকীর নামক স্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। হযরত ওমর বিন আব্দুল আজিজ তাকে দাফন করেন। তিনি ৯ বছর ৮ মাস শাসন করেন, কেউ বলেছেন ১০ বছর।

সুলাইমান ইবনে আব্দুল মালেকের খেলাফত:

ওয়ালীদ এর পর তাঁর ভাই সুলাইমান ইবনে আব্দুল মালেক ক্ষমতায় আসেন। কারণ পিতা তারা দু' ভাইকে ভাবী সম্রাট মনোনীত করেছিলেন। ভাই ওয়ালীদের ইন্তিকালের দিনই সুলাইমান খেলাফতের বাইয়াত নেন। ওয়ালীদের ইন্তিকালের সময় সুলায়মান রামাল্লাতে ছিলেন। তিনি খলীফা হওয়ার পর দামেস্ক চলে যান। উমাইয়া জামে মসজিদের অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করার প্রতি তিনি মনোনিবেশ করেন। সে সময় সুলাইমানের ভাই মুসলিমকে (৯৭ হিঃ) রোম যুদ্ধে প্রেরণ করেন। তিনি কুস্তুনতুনিয়াতে প্রবেশ করে সেখানেই থাকেন।

উত্তম চরিত্রের নিদর্শন:

একদিন সুলাইমানের দরবারে একজন সাধারণ লোক আগমন করে বলতে লাগল হে আমীরুল মুমিনীন انشدك الله والاذان অর্থাৎ আমি আপনাকে আল্লাহর আযানের কসম দিচ্ছি। একথা শুনে সুলায়মান বললেন আমি انشدك الله এর অর্থ বুঝলাম কিন্তু الاذان এর অর্থ বুঝলাম না। তখন লোকটি জবাব দিল اذان অর্থ আল্লাহর কথাকে আমি বুঝতে চাইছি। আর তাহল- فاذن

موذن بينهم ان لعنة الله على الظالمين সুলায়মান বললেন আচ্ছা বল, তোমার দুঃখ কি? তোমার উপর কি রকম অত্যাচার হচ্ছে। সে লোক বলল আমার অমুক জমি আপনার কর্মচারী জোর করে দখল করে রেখেছে। একথা শুনে সুলায়মান সিংহাসন থেকে নীচে নেমে এলেন। তিনি তার মুখমন্ডল মাটিতে রেখে শুয়ে পড়লেন। তিনি বললেন খোদার কসম ! যতক্ষণ পর্যন্ত যমীন ফেরত দানের ব্যাপারে আমি কোন পত্র না লিখব ততক্ষণ পর্যন্ত এভাবেই থাকব। খলীফা এ অবস্থাতেই ছিলেন। আর এদিকে লেখক দ্রুত গভর্নরের নামে একটি পত্র লিখলেন, অমুকের জমি ফেরত দাও। কারণ খলীফা সুলায়মান ইবনে আব্দুল মালেক যখন কোরআনের এই আয়াত শুনলেন, যার মধ্যে আল্লাহর নিয়ামতের আলোচনা ছিল, তখন তিনি ভয় পেয়ে গেলেন যে, কোথায় না জানি আল্লাহর অভিশাপ পড়ে যায়।

সুলায়মান ইবনে আব্দুল মালেকের কৃতিত্ব:

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, সুলায়মান হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের জেলখানা থেকে কম করে হলেও তিন লক্ষ বন্দীকে মুক্ত করেছিলেন। সুলায়মান তার চাচাত ভাই ওমর ইবনে আব্দুল আজীজকে পরামর্শদাতা নিয়োগ করেন এবং এয়াজীদ ইবনে আবু মুসলিমকে হাজ্জাজের প্রধানমন্ত্রী বানিয়েছিলেন। ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ তখন সুলায়মানকে বলেছিলেন যে, জনাব আমি আপনার নিকট বিনীত আরজ করছি যে, হাজ্জাজের কর্মকান্ড ইয়াজীদের প্রধান মন্ত্রীত্বের সাথে মিলাবেননা।

সুলায়মান এসময় ওমর বিন আব্দুল আজীজকে বলেছিলেন যে, হে ওমর! আমি তাকে জাগতিক ব্যাপারে কোন দিনই আত্মোৎসর্গ হিসেবে পাইনি। ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ বলেছিলেন, হে আমীরুল মুমিনীন শয়তানও এ ব্যাপারে অত্যন্ত পবিত্র। কিন্তু শয়তান সমগ্র জগতকে বিপথগামী করেছে। তাঁদের আলোচনার পর সুলায়মান তার ইচ্ছা থেকে বিরত থাকেন। ইয়াজীদের কাছ থেকে সামনে সম্রাট বানানোর পরিকল্পনা ফিরিয়ে নেন।

কিতাবুল কামিলে আবুল আব্বাস লিখেছেন, একদা ইয়াজীদ সুলায়মান ইবনে আব্দুল মালেকের দরবারে আগমন করল সুলায়মান তাকে দেখে বলল আল্লাহ তাআলা ঐ ব্যক্তিকে ধ্বংস করুন যে ব্যক্তি তোমাকে সুযোগ বা প্রশ্রয়

দিয়েছে। আর যে তোমাকে তার আমানতের অংশীদার বানিয়েছে। সে বলল হে আমীরুল মুমিনীন আপনি এভাবে বলবেন না। সুলায়মান বললেন কেন বলবনা? সে বলল আপনিতো আমাকে দেখছেন, সব কথা বার্তা লেনদেন আমার দিকে প্রত্যাবর্তন করে তাহলে আপনি আমাকে বিশ্বাস করতেন, মন্দ বলতেন না। এমনকি মন্দ কিছু বলবেন এমন শক্তিও আপনার হত না। সুলায়মান বললেন হাজ্জাজ কি এরপর জাহান্নামে চলে যায় নি? সে বলল হে আমীরুল মুমিনীন এ ধরনের কথা হাজ্জাজ বিন ইউসুফের ব্যাপারে বলবেন না। সুলায়মান বললেন কেন? সে বলল হাজ্জাজ মিম্বরে দাঁড়িয়ে আপনাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়েছেন। এমনকি তার ভাষণ অত্যাচারী, অহংকারী লোকেরা পর্যন্ত মনোযোগসহ শুনেছে। হাজ্জাজ কিয়ামত দিবসে আপনার পিতার ডানদিকে এবং ভাইয়ের বাম দিকে মিলে মিলে উত্থিত হয়ে আসবে। তারা যেখানেই যাবে হাজ্জাজও সে দিকের যাত্রী হবে।

সুলায়মানের চরিত্র :

তিনি ছিলেন মিষ্টভাষী, কথায় ফটো এবং শিষ্টাচার। ন্যায় বিচারের মূর্তপ্রতীক, জেহাদের জন্য উম্মত্ব, আরবী ভাষায় অত্যন্ত পারদর্শী। দ্বীনদারী, ভদ্রতা, কুরআনের অনুসারী, ইসলামের ফরজ ওয়াজিব রক্ষাকারী। তিনি নিজ জীবনকে সংগ্রামের মধ্যেই কাটাতেন। তবে তিনি অধিক সম্ভোগেও পারদর্শী ছিলেন। ইবনে খাল্লেকান লিখেছেন যে, সুলায়মান প্রত্যহ ১০০ রিতিল সিরীয় খাবার হজম করতে পারতেন।

সুলায়মানের কৃতিত্ব:

সুলায়মান খলীফা হয়ে সর্ব প্রথম যে কাজটী করেন তাহলো ওয়াক্তের প্রারম্ভে নামায পড়ার আদেশ জারী করেন। নচেৎ বনী উমাইয়ারা শেষ ওয়াক্ত পর্যন্ত নামায আদায় করতেন। ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সীরীন বলেন, সুলায়মান খেলাফতের আসনে সমাসীন হওয়ার পরই দুটি উত্তম কাজ সম্পন্ন করেন। প্রথমত: নামাজকে নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করার শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। দ্বিতীয়তঃ তার শাসনের শেষ পর্যন্ত তিনি শ্রেষ্ঠ খলীফা হিসেবে পরিগণিত এবং তার স্থলাভিষিক্ত তৈরী করে যান। সে স্থলাভিষিক্ত ছিলেন ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ। মাফজাল প্রমূখ বর্ণনা করেন যে, একদিন সুলায়মান জুমাবার হাম্মাম

খানা থেকে গোসল সেরে বের হয়ে আসেন। সবুজ রঙ্গের পোশাক পরলেন, সবুজ রঙ্গের পাগড়ী পরলেন, সবুজ বিছানায় বসলেন এবং চারদিকে সবুজ রঙ্গের জিনিষপত্র স্থাপন করলেন। এরপর তিনি তার রূপ-ভঙ্গিমা দর্পনে দেখলেন। তাকে খুব সুন্দরই দেখাচ্ছিল। তিনি প্রফুল্ল চিত্তে বলতে লাগলেন আমাদের নবী (সাঃ) আল্লাহর রাসূল ছিলেন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত প্রথম খলীফা আবু বকর সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) নম্র স্বভাবের লোক ছিলেন। ২য় খলীফা হযরত ওমর (রাঃ) সত্য-মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী ছিলেন। উছমান (রাঃ) শরম-হায়ার আকড় ছিলেন। আলী (রাঃ) ছিলেন বীর বাহাদুর, নির্ভীক। মোয়াবিয়া ছিলেন ধৈর্যশীল, ইয়াজিদ ছিলেন ধৈর্যে অভ্যস্থ, আব্দুল মালেক ছিলেন রাজনীতির উত্তম পরামর্শদাতা, আর ওয়ালীদ ইবনে আব্দুল মালেক ছিলেন অত্যাচারী ও অহংকারী। আর আমি হলাম এক নওজোয়ান বাদশাহ। এ কথা বলে তিনি জুমার নামাযের জন্য মসজিদে চলে যান। তিনি দেখলেন ঘরের আঙ্গিনায় এক দাসী এই কবিতা গুন গুন স্বরে আবৃত্ত করছে:

انت نعم المتاع لوكنت تبقى ☆ غير ان لا بقاء للانسان

"আপনি শ্রেষ্ঠ সম্পদ যদি সব সময় থাকতেন কিন্তু মানুষের জন্য অবশিষ্ট ও স্থায়ী বলতে কিছুই নেই।"

ليس فيما بدالنا منك عيب ☆ عبابه الناس غير انك فانى

"আমাদের জন্য আপনি কি করলেন তাতে কোন দোষ নেই, লোকের আপনার জন্য পাগল , এছাড়া আর কোন দোষ বের করেনি।"

সুলায়মান জুমার নামায আদায়ান্তে যখন ঘরে ফিরলেন তখন দাসীকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন আমি জুমার নামাযের যাবার সময় তুমি কি বলতে ছিলে, কি গাইতে ছিলে? সে বলল নাতো আমি কিছুই গাইতে ছিলাম না বরং এমনিতেই কিছু আমার মুখ দিয়ে বের হচ্ছিল? সুলায়মান বললেন ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তুমিতো আমাকে মৃত্যুর সংবাদ দিচ্ছিলে। এরপর এক জুমা ও যেতে পারেনি সুলায়মান ইন্তিকাল করেন।

সুলায়মানের ইন্তিকাল ও তার শাসনকাল:

কেউ কেউ বলেছেন, সুলায়মান মিম্বরে আরোহন করে খুৎবাহ দেন। তার আওয়াজ ছিল বিকট, দুর থেকে শুনা যেত। তারপর হঠাৎ জ্বর এলো।

এমতাবস্থায়ও তিনি খুৎবা দিতে থাকলেন। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল তাঁর খুৎবা শ্লথ হতে চলছে। এমনকি তখন তার কাছের লোকেরাও শুনতে পাচ্ছিলে না। ক্ষনিক পর তিনি আকস্মিকভাবে যমীনে পড়ে গেলেন। এ ঘটনার এক সাপ্তাহ পরেই তিনি ইন্তিকাল করেন। ইবনে খাল্লেকান বলেন তার জ্বর আসাতে সে রাতেই ইন্তিকাল করেছেন। ঐতিহাসিকদের অনেকে বলেন সে সময় তার নিমুনিয়া হয়েছিল। তার ইন্তিকাল ১০ই সফর ৯৮ হিজরী সনে হয়েছে। কিছু লোক অবশ্য বলেছেন তার ইন্তিকাল নামাযে ওয়াবিক তাফসিরাইন এলাকাতে হয়েছে। মোট ৩৯ বছর বয়স পান। কারো মতে তিনি বয়স পেয়েছেন ২৫ বছর। সিংহাসনে ছিলেন মোট ২ বছর ৮ মাস।

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ (রাঃ) এর খেলাফত:

সুলায়মান এর পর ইসলামী খেলাফতের আরে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব আবু হাফস ওমর বিন আব্দুল আজীজ (রহঃ) সিংহাসনে আরোহন করেন। সুলায়মানের ইন্তিকালের সেদিনই তাঁর কাছে সকলেই বাইয়াত নেন। কারণ সুলায়মান আগে ভাগেই তাঁকে স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করে রেখেছিলেন। তার মায়ের নাম উম্মে আসেম। যিনি আসেম ইবনে ওমর ইবনে খাত্তাবের মেয়ে ছিলেন। মায়ের দিক থেকে হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) তাঁর নানা ছিলেন।

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ ছিলেন প্রখ্যাত তাবেয়ী। তিনি সাহাবী হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) এবং সাঈব ইবনে ইয়াজীদ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। আবার তাঁর কাছ থেকে অসংখ্য বর্ণনাকারী হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি ৬১ হিঃ তে জন্ম গ্রহণ করেন। ইমাম আহমদ (রহঃ) বলেন একমাত্র হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ ব্যতীত অন্য কোন তাবেয়ীর বর্ণনা দলীল হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে না। ত্বকাতে ইবনে সাদে রয়েছে ওমর ইবনে কায়েস বলেন, যখন ওমর ইবনে আব্দুল আজীজকে খলীফা নিযুক্ত করা হয় তখন তিনি একটি আওয়াজ শ্রবন করেন। আওয়াজ দাতা কে তা জানা যায়নি। সে আওয়াযে যা বলা হয়েছে তা নিম্নরূপ:

من الان قطابت وقرقرارها☆ على عمر المهدى قام عمودها

"এখন থেকে সময় এবং অবস্থানের স্থান ভাল হয়ে গেছে আর এর স্তম্ভ পথ প্রদর্শক ওমরের কারণে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল।

হযরত ওমর বিন আব্দুল আজীজ ছিলেন খোদাভীরু, পুত পবিত্র, আবেদ ও জাহেদ এবং সত্যবাদী। খলীফাদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম মেহমান খানা এবং যাত্রী ছাউনী ইত্যাদির প্রবর্তন করেন এবং মুসাফিরদের জন্য উত্তম ব্যবস্থা করেন। তিনিই প্রথম খলীফা যিনি জুমার খুৎবাতে হযরত আলী (রাঃ) এর স্থানে ان الله يامر بالعدل والاحسان সংযোজন করেন। অন্যথায় উমাইয়াগণ শুধু হযরত আলীর নাম সংযোজন করেছিলেন। বিভিন্ন লোক বলেছেন:

وليت ولم تسبب عليا ولم تخف☆ مربيا ولم تقبل صقالة مجرم

"তুমি অবসর নিয়েছো হযরত আলী (রাঃ) এর ভাল মন্দের ব্যাপারে কোন মুরুব্বিকে ভয় পাওনি, আর না কোন পাপীর কথার মূল্যায়ন করেছ।"

وصدقت القول الفعال مع الذى☆ اتيت قاصى راضيا كل مسلم

"যে সমস্ত ফলপ্রদ বাণী তুমি সাথে নিয়ে এসেছ এগুলো তুমি সত্যে পরিণত করলে। সুতরাং এতে সকল মুসলমানই সন্তুষ্ট।"

نما بين مشرق فى الارض ولغرب كلهما☆ منادينا دى من فصيح واعجم

"পূর্ব পশ্চিমের সর্বস্থানেই নির্বাক এবং বাক শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিকে আহবান করা হচ্ছে।"

يقول امير المؤمنين ظلمتنى☆ باخذك دينارى واخذك درهمى

"সে বলছিল আমার উপর দিনার ও দিরহাম চাপিয়ে অবিচার করেছেন।"

فاربح بها من صفقة المبايع☆ واكرم بها من بيعة ثم اكرم

"তুমি ইয়াযীদের কাছ থেকে সুবিধা ভোগ কর, সে বাইয়াত থেকে নিজেও উপকৃত হও এবং অন্যকেও মর্যাদাবান হওয়ার সুযোগ করে দাও।"

খেলাফতের আসনে উপবিষ্ট হয়েই তিনি গভর্নরদের প্রতি বিভিন্ন আদেশ জারী করেন। যেমন কোন বন্দীকে ডান্ডাবেরী লাগানো যাবে না, এতে নামাযের ব্যাঘাত ঘটবে। তিনি বসরার গভর্নরের আদ্দি ইবনে আরতাত এর নিকট লিখেন যে, তুমি ইবাদতের জন্য চারটি রাত বেছে নিবে। এ কারণে আল্লাহ তাআলা তাঁর রহমত নাযিল করবেন। ১। রজবের প্রথম রাত ২। ১৫ই শাবান ৩-৪। দুই ঈদের রাত। অন্যান্য গভর্নরকেও তা জানিয়ে দিবে। কোন মজলুম ব্যক্তি যদি সাহায্যের

আবেদন করে যথা শিগগীর তাকে সাহায্য করবে। আল্লাহ পাক তোমাকে যে শক্তি সাহস প্রদান করেছেন তাতে তুমি আল্লাহ পাককে ভয়ও করবে। অন্যথায় তার কাছে উপস্থিতি এবং কঠিন শাস্তির জন্য প্রস্তুত থেকো।

মুহাম্মদ ইবনে মারওয়াজি এর বরাত দিয়ে কোন কোন ইতিহাসবিদ লিখেছেন যে, ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ যখন খলীফা ওলীদ ইবনে আব্দুল মালেকের কাফন দাফন সম্পন্ন করলেন তখন তিনি যমীনে একটি কম্পন ভাব অনুভব করলেন। তিনি বললেন, আমার কাছে কম্পন অনুভূত হচ্ছে কেন? লোকেরা বলল ইহা কম্পন নয় বরং খেলাফতের গুরুভার। যা আপনার সম্পূর্ণ কাছাকাছি হয়ে আছে। খেলাফতের জন্য আপনি এতে আরোহন করবেন। তিনি বললেন ভাই কোথায় আমি আর কোথায় খেলাফত! এর সাথে আমার কি সম্পর্ক? এই মুহূর্তে লোকেরা ওমর বিন আব্দুল আজীজের সোয়ারীর কাছাকাছি এসে গেছে। তার জন্য সোয়ারী কাছে নিয়ে এল। তিনি আরোহন করলেন। এ মহূর্তে শহর কতোয়ালকে বললেন, কতোয়াল সাহেব এরকম করবেন না এবং আমার আগে যাবেন না। আমার আর আপনার মধ্যে পার্থক্য কোথায়? আমি তো মুসলমানদের একজন নগন্য খাদেম মাত্র। একথা শুনে সমস্ত লোক একত্রে চলতে লাগল। সম্মুখে মসজিদ। তিনি মসজিদে এসে মিম্বরে বসে পড়লেন। আল্লাহর হামদ ও নবী (সাঃ) এর দরূদ পড়ে তিনি বলতে লাগলেনঃ হে লোক সকল! আমার পরামর্শ ছাড়া এবং আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাকে খলীফা বানানো হয়েছে। কোন মুসলমানের অনুমতি অথবা সাধারণ লোকের দাবী ছাড়াই আমাকে খলীফা নির্বাচন করা হয়েছে। এ জন্য আমি খেলাফতের দায়িত্ব মুক্ত। আপনাদের ইচ্ছামত আমাকে ব্যতীত যে কোন একজনকে খলীফা বানিয়ে নিন। একথা শুনার পর সমস্ত মুসলমান হৈ হোল্লুড় আরম্ভ করল। না না বলে ধ্বনি তুলল। এক সকলেই বলে উঠল তা কখনো হতে পারে না। আমরা আপনাকেই খলীফা হিসেবে মেনে নিয়েছি। কিছুক্ষণ পর জনসাধারণ শান্ত হলে তিনি বললেন :

হে লোক সকল! আল্লাহকে ভয় করুন। আমি আপনাদের আল্লাহ তাআলাকে প্রকৃতভাবেই ভয় করার উপদেশ দিচ্ছি। কারণ আল্লাহকে ভয় করলে প্রত্যেকেই পুরস্কৃত হবে। আল্লাহ ভীতির চেয়ে আর কোন ভাল জিনিস নেই। যা কিছু করবে তা পরকালের জন্য করবে। কারণ যে ব্যক্তি পরকালের জন্য কাজ করে আল্লাহ পাক জগতে সে বান্দার জন্য যেথষ্ট। পরকালেও তাকে

যথেষ্ট সহায়তা করা হবে। যে ব্যক্তি তার আভ্যন্তরীন অবস্থা পরিশুদ্ধ করবে আল্লাহ পাক তার বাহ্যিক অবস্থা পরিশুদ্ধ করে দেবেন। মৃত্যুকে বেশী বেশী স্মরণ করবে। মৃত্যুর জন্য সর্বক্ষণ প্রস্তুত থাকবে। কারণ মৃত্যু এমন বস্তু যা সমস্ত স্বাদ-আস্বাদকে বিষন্ন করে দেয়। আমি কসম করে বলছি কারো উপর অন্যায় অবিচার করা হবে না। আর না কারো অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হবে। কাউকে মন্দ কাজে উৎসাহিত করব না। হে লোক সকল! যে ব্যক্তি আল্লাহ্ পাকের আনুগত্য স্বীকার করে তার জন্য আল্লাহ্ পাকের ইবাদত করা অতি জরুরী হয়ে পড়ে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ পাকের নাফরমানী করবে তার জন্য আল্লাহ্ পাকের ইবাদত করা জরুরী নয়। আপনারা আমার সেই হুকুমই তামিল করবেন যাতে আল্লাহ্ পাকের অনুমোদন রয়েছে। অন্যথায় আমার হুকুম মান্য করার কোন প্রয়োজন নেই। এটুকু বলার পর তিনি মিম্বর থেকে নেমে এলেন এবং দারুল খিলাফা'র দিকে প্রস্থান করেন।

তিনি ঝূলন্ত পর্দা সম্পর্কে বলতেন, এসব উঠিয়ে ফেল। এই কারুকার্য খচিত কাপড়গুলো সরিয়ে নাও এবং এগুলো বিক্রি করে সমুদয় টাকা কোষাগারে জমা করে দাও। একথা বলেই তিনি কায়লুলাহ বা আহারান্তে দুপুরের বিশ্রামের জন্য ঘরে প্রবেশ করেন। এমুহূর্তে তাঁর ছেলে আব্দুল মালেক উপস্থিত হয়ে বললেন, আব্বাজন এখন আপনি কি করছেন? তিনি বললেন বেটা কাইলুলাহ্ করার ইচ্ছা করছি। ছেলে বললেন আপনি কাইলুলাহ্ করার ইচ্ছা করেছেন আর জুলুম-নীপিড়ন ও অত্যাচার লাগামহীন হয়ে উঠেছে এসব দূর করতে চেষ্টা করেন নি। ওমর বিন আব্দুল আজীজ বললেন প্রিয় বৎস! গত রাত তোমার চাচা সুলায়মানের কাফন দাফনে কেটেছে। সরা রাতই জেগে থাকতে হয়েছে। জোহরের নামায আদায় করার পর বিষয়টিতে হাত দেব। ছেলে বলল হে আমীরুল মুমিনীন জোহর পর্যন্ত বিশ্রাম ও নিরবতার জন্য ঘুমানো, আপানর জন্য জায়েয।

ওমর বললেন বৎস! আমার কাছে আসো। ছেলে কাছে এলে পিতা ছেলের কপালে চুমু খেয়ে বললেন, আল্লাহর শোকর যিনি আমার পীঠ থেকে এরূপ বের করেছেন যে দ্বীনের ব্যাপারে আমাকে সহায়তা করছে।

এর পর তিনি কাইলুলা না করেই ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

ঘোষককে ডেকে বললেন তুমি মানুষের মধ্যে ঘোষণা করে দাও যে, কারো উপর কোন অত্যাচার হতে থাকলে সে যেন খলীফার দরবারে হাজির হয়ে বিস্তারিত অবগত করে বিচার প্রার্থনা করে। তা নিরসনের চেষ্টা করা হবে।

কিছুসময় পর হামাসের জনৈক জিম্মি লোক অভিযোগ দায়ের করল যে, মহামান্য খলীফা! আপনার পিতা পিতৃসুলভ ভালবাসায় গভর্ণর বানিয়ে দিয়েছেন। আপনার পিতার ধ্বংস ছাড়া আর কিছু থাকলে তা কি? শহজাদা আব্বাস ইবনে ওয়ালীদ আমার জমি জোর করে দখল করে রেখেছে। সে সময় শাহাজাদা আব্বাসও উপস্থিত ছিলেন। খলীফা বললেন, কি আব্বাস তোমার বিরুদ্ধে এ অভিযোগ কি সত্য? আব্বাস বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন খলীফা ওয়ালীদই তো আমাকে এ যমীন দান করেছিলেন। আমার নিকট লিখিত প্রমাণও আছে। খলীফা জিম্মীর দিকে ফিরে বললেন, জিম্মী এখন তোমার কি উত্তর? তার কথা সত্য বলে মনে হয়। জিম্মী বলল হে আমীরুল মুমিনীন! কোরআন মজীদ এর কি মীমাংসা করে? এ কথা শুনে আমীরুল মুমিনীন ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ বললেন, আল্লাহর কিতাব পবিত্র কোরআন সত্য, পূত পবিত্র। যা ওয়ালীদের লিখিত দস্তাবেজের চেয়েও অধিক সত্য এবং অনুসরণীয়। তারপর আব্বাসের দিকে ফিরে খলীফা বললেন, আব্বাস! তুমি তার যমিন ফেরত দিয়ে দাও। আব্বাস যমীন ফেরৎ দিল।

এরপর থেকে তাঁর কাছে কোন মামলা দায়ের করলে তিনি তা দ্রুত নিস্পত্তির চেষ্টা করতেন। সর্বপ্রকার অবিচার-নিপীড়ন নিরসন করতে চেষ্টা করেন। তাঁর কাছে গরীবরাও মামলা দায়ের করতে পারার সুযোগ করে দেন। কয়েক দিন পর খারেজী সম্প্রদায় হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজের ভাল চিন্তাধারা, উত্তম কাজ-কর্ম এবং ন্যায়-নীতির বাস্তবতার উপরা অবগত হয়ে পরামর্শ করে বলল যে, এই ন্যায় পরায়ন খলীফার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা আমাদের জন্য মোটেও সমীচীন হবে না।

জিম্মীর মামলার প্রতিক্রিয়া:

শাহজাহান ওমর ইবনে ওয়ালীদ জানতে পারলেন যে, খলীফা ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ ভাই আব্বাস ইবনে ওয়ালীদের কাছ থেকে নিয়ে জমিটি জিম্মীকে দিয়ে ফেলেছেন। তারপর তিনি খলীফার কাছে এই মর্মে চিঠি লেখেন

যে, আপনি জমিটি ফেরত দিয়ে আমার পিতা ও দাদার উপর দোষ চাপিয়েছেন এবং তাদেরকে দোষী সাব্যস্ত করেছেন। আপনি তাদের উপর বৈরীতার প্রমাণ স্বরূপ তাদের চরিত্রের উপর আক্রমণ করেছেন। তাদের কর্মকান্ডের বিরূপ কোন কাজ করলে পরবর্তীতে লোকেরা তাদের সন্তানদের উপর বিভিন্ন দোষক্রটি চাপাবে। কোরাইশ গোত্রের ধন সম্পদ আপনি জোর করে নিয়ে বায়তুল মালে জমাও করেছেন। এমন করলে খেলাফতের মসনদে আপনি কত দিন টিকে থাকতে পারবেন?

খলীফা ওমর বিন আব্দুল আজীজের জবাব:

ওমরে ইবনে ওয়ালীদের পত্র পাঠ করে খলীফা ওমর বিন আব্দুল আজীজ নিম্ন পত্রটি লিখেন:

এই পত্র আল্লাহর বান্দা ওমর ইবনে আব্দুল আজীজের পক্ষ থেকে ওমর ইবনে ওয়ালীদের নামে। হামদ ও ছানার পর বললেন, তোমার পত্র হস্তগত হয়েছে। ওমর বিন ওয়ালীদ! তুমি তো সে ব্যক্তি যার মায়ের নাম বানানা, যে আরাম আয়েশের দাসী ছিল। হামাসের বাজারে ঘোরা ফেরা করত। দোকানে প্রবেশ করত, যাক তার ব্যাপারে আল্লাহই ভাল জানেন। তাকে জুবিয়ান বায়তুলমালের টাকা দিয়ে খরীদ করে তোমার পিতাকে হাদিয়া হিসেবে দিয়েছিল। এর ঘরে তোমার মত দুরাচার সন্তান জন্ম নিয়েছে। এরপর তুমি বড় হয়েছ এবং এখন তুমি জালেম এবং অহংকারী রূপ গ্রহণ করেছ। আমি তোমাকে এজন্য জালেম বলছি যে, আমি তোমাদের জন্য এমন সম্পদ অবৈধ ঘোষণা করেছি যে সম্পদে আত্মীয়-স্বজন, গরীব লোক ও বিধবা মহিলাদের অধিকার ছিল। আমার চেয়ে অধিক অত্যাচারী ও দুশ্চরিত্রতো সে ব্যক্তিরাই ছিল যারা তোমার মত একজন বোকা লোককে মুসলিম বাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত করে ছিলেন। তুমি তো তোমার মতামতের মাধ্যমে ঐ সকল লোকের মধ্যে বিদ্রোহী অধিনায়ক হিসেবে গণ্য। তোমার পিতা পিতৃ শোলভ মনোভাব নিয়ে তোমাকে গভর্নর বানিয়েছেন। তোমার পিতার ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই নেই। কারণ কিয়ামত দিবসে তার বিরুদ্ধে অনেক বিচারপ্রার্থী হবে। সে সংকটময় মুহূর্তে কিয়ামতের মাঠে কিভাবে পার পাবেন? আমার চেয়েও অধিক জালেম সে ব্যক্তি রক্তারক্তি এবং মানুষের হারাম মাল লুট পাট করার জন্য হাজ্জাজ বিন ইউসুফকে গভর্নর

নিযুক্ত করেছিলেন। আমার চেয়েও জালিম তো সে ব্যক্তি যে কিনা মিশরের গভর্নর কুরাত নামের এক গ্রামের লোক। যে ছিল লোভী স্বার্থপর। যে নাকি হাসি তামাসা, মদ, গান-বাজনা ইত্যাদিতে সর্বাত্মক সহযোগিতা করত। আমার চেয়ে অত্যাচারী তো সে ব্যক্তি যে গালিয়াতুল বারীরাহকে যুদ্ধ লব্ধ সম্পদ হিসেবে ভাগ করে নিয়েছে।

হে বানার ছেলে কতইনা পরিতাপের কথা! হাসের দুই কণ্ঠনালী যদি মিশে যেত এবং গনীমত তার প্রকৃত প্রাপককে দেয়া হত তাহলে তোমার বংশের লোকদের জন্য মুক্তির কোন সুরাহা অবশ্যই হত। তুমি কিন্তু আমাদেরকে সঠিক পথে চালাতে চাও। কিন্তু তোমার অবস্থা হল, সঠিক পন্থা এবং সত্য কথাকে পশ্চাদে রেখে দাও। নাহকের দাসত্ব কর। এখন তোমার কাজে মনোযোগ কর। তোমার উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালন কর আর রাজ্যের টাকা পয়সা গরীব দুঃখী এবং বিধবা মহিলাদের জন্য খরচ কর। কারণ প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তোমার দায়িত্ব রয়েছে। আল্লাহর দয়া সে ব্যক্তির উপরই হয় যে সরল সঠিক পথের যাত্রী হয়। আল্লাহর রহমত ও দয়া জালেমদের ভাগ্যে জুটেনা।

হৃদয়বিদারক ঘটনা:

ওমর ইবনে আব্দুল আজীজের খেলাফত কালে একদা দেশে মারাত্মক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। প্রজারা খুব চিন্তিত হয়ে পড়ে। এমন সময় আরবের এক প্রতিনিধি দল খলীফার দরবারে আগমন করে। এদের মধ্যে একজনকে কথা বলার জন্য মনোনীত করে খলীফার সামনে পাঠানো হয়। লোকটি বলল হে আমীরুল মুমিনীন আমরা একটি মারাত্মক সমস্য নিয়ে সুদূর আরব এলাকা থেকে আপনার কাছে এসেছি। বায়তুল মালের ব্যাপারে আপনাকে কিছু প্রশ্ন করতে চাই। জনাব! বায়তুল মালের টাকা পয়সাতো আল্লাহ পাকের। নয়ত তার বান্দাদের অথবা আপনার নিজের। যদি আল্লাহ পাকের হয় তাহলে তিনি ধনী, নির্ভিক, আর যদি সৃষ্টি জগতের হয় তাহলে আপনি সাহায্য করুন, এগুলোর কোন একটি না হয়ে যদি আপনার ব্যক্তিগত সম্পদ হয়ে থাকে তাহলে আমাদের পরামর্শ হল আপনি আমাদেরকে মালগুলো সদকা করে দিন। সদকাকারীকে আল্লাহ পাক উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করেন।

এসব কথা শুনে খলীফার চোখ অশ্রুতে ভেসে উঠে। তিনি বলেন তাই

হবে যা তোমরা চাও। একথা বলেই তিনি এদের প্রয়োজন পূর্ণ করার আদেশ দেন। এদের প্রয়োজন পূরণ হয় এমন সম্পদ তাদের দেওয়ার পর প্রতিনিধি দলে নেতৃত্ব দানকারী লোকটি দরবার থেকে চলে যায়। খলীফা বললেন হে অমুক! তুমি যেভাবে মানুষের প্রয়োজন আমার কাছ পর্যন্ত পৌছালে সেরকম ভাবে আমার প্রয়োজনও আল্লাহর দরবার পর্যন্ত পৌছে দিও। আর গরীব দুঃখীরা যাতে আরো উন্নতি লাভ করতে পারে সে উদ্দেশ্যে আমার জন্য দোয়া করো। একথা শুনে ঐ লোকটি দোয়া করল যে, হে আল্লাহ্ ওমর ইবনে আব্দুল আজীজের সাথে আপনার প্রিয় বান্দাদের মত আচরণ করুন।

দান প্রতিদান শেষ হতে না হতেই আকাশে এক খন্ড মেঘ দেখা যায় এবং হলদে রেঙ্গের বৃষ্টি হতে আরম্ভ করল। এই বৃষ্টি হতে একটি প্রকান্ড শিলাখন্ড ভেঙ্গে টুকড়া টুকড়া হয়ে যায় এবং এ থেকে একটি চিরকুট বের হয়ে আসে। এতে লিখা ছিল এই চিরকুট ওমরে ইবনে আব্দুর আজীজের জন্য মহা শক্তিধর বল প্রয়োগকারীর পক্ষ থেকে দোযখের আগুণ থেকে মুক্তির সনদ পত্র।

ওমর ইবনে আব্দুল আজীজের (রহঃ) চরিত্র ও কৃতিত্ব:

রেজা ইবনে হায়াত বলেন, মানুষের মধ্যে ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ সবচেয়ে বেশী সম্মানী, বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী ছিলেন। তার চালচলনে ছিল আভিজাত্যের সমাবেশ এবং তিনি ছিলেন মহানুভব। পোশাক পরিচ্ছেদ ছিল সাদা ধবধবে এবং উত্তম রূপে পরিপাটি করতেন। তিনি খলীফা নিযুক্ত হওয়ার পর তাঁর পাগড়ী, পাঞ্জাবী, মৌজা, চাদর, আলকেল্লা ইত্যাদির মূল্য নির্ধারণ করা হয়। দেখা যায় তার এ সকল পোশাকের সামগ্রীক মূল্য ছিল ১২ দিরহাম।

ইবনে আসাকির লিখেন, খলীফা ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ নিকটাত্মীয়দের উপর কঠোরতা আরোপ করেন। আত্মীয়তার কারণে যে সকল লোক বিভিন্ন ফায়দা লুটত তাদের উপর তিনি কিছু বাধ্যবাধকতা করেন। এমনকি তাদের ধন সম্পদ পর্যন্ত তিনি নিয়ে নেন। তাতে আত্মীয়-স্বজন প্রতারণা করে তাঁকে বিষ প্রয়োগ করে।

একদিন তিনি বিষ প্রয়োগকারী খাদমকে ডেকে বললেন, তোমার ধ্বংস হউক, আমাকে বিষ প্রয়োগ করলে কেন? একাজ করতে তোমাকে কেউ বাধ্য করেছিল? সে বলল এ কাজ আঞ্জাম দেয়ার জন্য আমাকে এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা

দেয়া হয়েছিল। তিনি বললেন স্বর্ণ মুদ্রাগুলো কোথায় আছে? এগুলো আমার কাছে নিয়ে এসো। সে এগুলো খলীফার সামনে পেশ করল। তিনি এগুলো বায়তুল মালে জমা দেয়ার নির্দেশ দিয়ে বললেন সত্বর তুমি এমন স্থানে চলে যাও যেখানে কেউ তোমার কোন খোঁজ পাবে না।

খলীফার স্ত্রী ফাতেমা বিনতে আব্দুল মালেক বলেন, যেদিন থেকে তাঁকে খলীফা নিযুক্ত করা হয় সেদিন থেকে তাঁর ফরজ গোসল হয়না আর না তার স্বপ্ন দোষ হয়েছে। তিনি সারাদিন প্রজাদের কাজে ব্যস্ত থাকতেন। মজলুমদের সেবায় নিয়োজিত থাকতেন। রাত কাটাতেন ইবাদত বন্দেগীতে।

মুসলিম ইবনে আব্দুল মালেক বলেন: মৃত্যু শয্যায় শায়িত অবস্থায় খলীফার সেবা করার জন্য আমি তার নিকট এলাম। দেখলাম তিনি একটি পুরাতন ময়লাযুক্ত কাপড় পরে আছেন। আমি তাঁর স্ত্রীকে বললাম খলীফার জামাটা পরিস্কার করে দিন। স্ত্রী বললেন ইনশাআল্লাহ অবশ্যই করব। কয়েক দিন পর আমি আবার সেবা করার জন্য এলাম। তখনও দেখলাম তার গায়ে সে জামাটিই রয়েছে। আমি বিবি ফাতেমাকে বললাম আমি আপনাকে খলীফার জামা ধৌত করার কথা বলিনি? মানুষ তার সাথে দেখা সাক্ষাত করতে আসে। বিবি বললেন আল্লাহর কসম এই জামাটি ব্যতীত খলীফার আর কোন জামা নেই। খলীফা কবিতা আবৃত্তি করতে ছিলেন:

نهارك يا مغرور سهوو وغفلة☆ وليلك نوم والردى لازم

"হে অবাধ্য! দিন কাটে তোমার ভুলে, রাত কাটে ঘুমে আর তোমার প্রয়োজন মন্দ জিনিষের।"

يغرك مايفنى وتفرح بالمنى☆ كما غر لاللذات فى النوم حالم

"ধ্বংসশীল জিনিসই তোমাকে ধোকা দিচ্ছে আর তুমি আগ্রহ ভরে একে স্বাগত জানাচ্ছ। যেমনিভাবে শয়নকারী ঘুমের স্বাদে ধোকা খায়।"

وشغلك فيما سوف فكرة غبه☆ كذلك فى الدنيا تعيش البهائم

"তোমার অতি কাছের কাজটিকে তুমি প্রতারণা মনে করেছ, জগতে যেমন জন্তুরা জীবন কাটায়।"

ইমাম দামিরী বলেন, ওমর বিন আব্দুল আজীজের কল্যাণমূলক কাজ

অসংখ্য। তাঁর ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে হলে سيرة العرين والحلية পাঠ করা যায়।

তিনি হামাস এ মৃত্যু রোগে আক্রান্ত হন। ইন্তিকালের কাছাকাছি সময় তিনি বলেন হে লোক সকল তোমরা বস। সমস্ত লোক বসে বসল। তিনি বললেন হে বিশ্ব প্রভূ আমি তোমার সে বান্দা যাকে তুমি ওলী বানিয়েছ এর পরিচালনার ব্যাপারে আমার যথেষ্ট ত্রুটি ছিল। তুমি যদি আমাকে কোন কাজে বিরত রাখতে চেয়েছ আমি এর বিরোধিতা করেছি। এরপর কালমায়ে শাহাদাত পাঠ করতে করতে চির বিদায় হয়ে যান।

ওমর ইবনে আব্দুল আজীজের ইন্তিকাল:

তাঁর ইন্তিকালের তারিখ নিয়ে ওলামায়েকেরামের মতভেদ আছে। কেউ বলেন, তিনি ৫ অথবা ৬ই রজব, কারো মতে তিনি ১০১হিঃ ২রা রজব ইন্তিকাল করেন।

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ সুন্দর, সুদর্শন এবং হালকা পাতলা গড়নের ছিলেন। মুখ মন্ডলে অত্যন্ত সুন্দর দাড়ী ছিল। কিন্তু তাঁর চেহারায় ঘোড়ার খুড়ের আঘাত ছিল। ভদ্রতা, নম্রতা, খোদভীতি, ভালবাসা, ন্যায়-নীতি ইত্যাদির সমাবেশ ছিল তাঁর মাঝে। তার আমলে দ্বীন পুনরুজ্জীবন লাভ করে এবং নব যৌবনে পদার্পন করে। তিনি তাঁর নানা ওমর ইবনে খাত্তাবের মতই জীবন পরিচালনা করেন। প্রথম খলীফা হযরত আবুবকর (রাঃ) যত দিন ক্ষমতায় ছিলেন তিনিও ততদিন ক্ষমতায় ছিলেন। তাঁর সমাধি দীরে সামআনে অবস্থিত।

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেন খোলাফায়ে রাশেদীন পাঁচ জন: ১। আবুবকর (রাঃ) ২। ওমর (রাঃ) ৩। ওছমান (রাঃ) ৪। আলী (রাঃ) এবং ৫। ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ (রাঃ)। হাফেজ ইবনে আসাকির লিখেছেন যে, যখন তার লাশ দীরে সামআনে আনা হয় তখন এক অন্ধ লোক এসে এক চিরকুটে লিখা পড়ছিল যে,

بسم الله الرحمن الرحيم، براءة من الله العزيز الجبار لعمر بن عبد العزيز من النار

আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ওমর ইবনে আব্দুল আজীজের জন্য জাহান্নাম থেকে মুক্তির পয়গাম দেয়া হল।

লোকেরা চিরকুটটি তাঁর কফিনে দিয়ে দেয়। তিনি ২ বছর ৫ মাস শাসন করেন।

ইয়াজিদ ইবনে আব্দুল মালেকের শাসনকাল:

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজের পর তারই ভাতিজা ইয়াজিদ ইবনে আব্দুল মালেক সিংহাসনে আরোহন করেন। চাচা ওমর বিন আব্দুল আজীজের ইন্তিকালের পরই ইয়াজিদ বিন আব্দুল মালেক জনগণকে বাইআত করান। কারণ খলীফা সুলায়মান তাকে ভাবী খলীফা মনোণীত করেছিলেন। তাকে যখন তিনি শাসক মনোণীত হওয়ার পর জনসাধারণকে বললেন, আপনারা ওমর বিন আব্দুল আজীজের মত জীবন যাপন করুন। লোকেরা ৪০ দিন পর্যন্ত তার জন্য শোক পালন করেন। কয়েকদিন পরই দামেস্ক থেকে ৪০ জন বৃদ্ধ লোক আগমন করলেন। তারা এসে খলীফার কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলেন যে, খলীফাদের জিম্মায় না কোন প্রকার হিসাব কিতাব আর না পরকালের কোন হিসাব আছে। ইয়াজিদ তাদের কুটজালে ফেঁসে গেলেন।

ইয়াজিদ ইবনে আব্দুল মালেক একজন সুস্থ সাবলীল এবং শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। চেহরায় ছিল কমনীয়তা। কোন কোন ঐতিহাসিক লিখেন তিনিই সে ইয়াজিদ যিনি নাফরমানী কাজে প্রসিদ্ধ ছিলেন। কিন্তু এ বর্ণনা ভুল। নাফরমান ছিল তার ছেলে ওয়ালীদ। যার আলোচনা একটু পরেই আসছে।

হাফেজ ইবনে আসাকির বলেন, এয়াজিদ ইবনে আব্দুল মালেক তার ভাই সুলায়মানের শাসনমালে হাব্বাবাহ নামের এক দাসী উছমান ইবনে সহলের কাছ থেকে ৪০০০ হাজার দিনার মূল্যে ক্রয় করেছিলেন। তিনি এই দাসীকে ভালবাসতেন। এ সংবাদ তার ভাই সুলায়মানের কাছে পৌছলে তিনি বলেন, হে ইয়াজিদ তুমি কি চাও যে, আমি তোমার উপর কোন বাধ্য বাধকতা আরোপ করি? ইয়াজিদ একথা জানার পর ভয়ে সে দাসী বিক্রি করে দেন। এয়াজিদ ইবনে আব্দুল মালেককে যখন শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয় তখন একদিন তার স্ত্রী বললেন আমীরুল মু'মিনীন আপনার অন্তরে কোন জিনিষের আকাংখা আছে? ইয়াজীদ জবাব দিলেন হ্যাঁ আছে। বিবি জিজ্ঞেস করলেন কি? তিনি বললেন হাব্বাবা নামীয় দাসী। তাকে আমি ক্রয় করেছিলাম। ভইয়ের ভয়ে আমি বিক্রি করে দিয়েছি। সে দিন তার বিবি সে দাসীকে ক্রয় করে গোপনে রেখেছিলেন।

বিবি দাসীকে সাজগোজ করিয়ে একটি পর্দার আড়ালে বসিয়ে রেখে ছিলেন। কিছুক্ষণ পর বিবি আবার প্রশ্ন করলেন যে, আপনার অন্তরে কোন খাহেশ আছে কি? তিনি জবাব দিলেন হ্যাঁ আছে। তাহল ঐ হাব্বাবা দাসীর ভালবাসা। ইতিপূর্বেও আমি তোমাকে তাই বলেছিলাম। তার বিবি পর্দা সরিয়ে বললেন, এই দেখুন আপনার হাব্বাবা। তার বিবি তাকে দাসীর নিকট রেখেই চলে গেলেন। তিনি সুস্থ হতে থাকেন। এমন কি দাসী ইয়াজীদের জ্ঞান বুদ্ধির উপর প্রাধান্য বিস্তার করে ফেলল। যে কারণে ইয়াজীদ বেশী দিন সিংহাসনে টিকতে পারেননি।

একদিন ইয়াজীদ বললেন, কোন কোন লোক বলেন যে, বাদশাহী যুগের পুরা একটি দিনও তিনি আরামে কাটাননি। আমি তার এই কথাকে মিথ্যা বলে প্রমাণ করতে চাই। তিনি আরাম আয়েশে গা ভাসিয়ে দেন এবং হাব্বাবার সাথে স্বামী স্ত্রীর মত বসবাস করতে থাকেন। সব বস্তুতেই বাধ্যবাধকতা আরোপ করলেন। ইয়াজিদ এমনই সুখ সাগরে নিমজ্জিত ছিলেন যে, একদিন হাব্বাবাহ আনার খাচ্ছিল। খেতে খেতে সে হাসতে আরম্ভ করল। হঠাৎ করে আনারের দানা তার গলায় আটকে গেল এবং হাব্বাবাহর মৃত্যু হয়ে গেল। হাব্বাবাহর ইন্তিকালে ইয়াজিদের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠল। জ্ঞান বুদ্ধি নিঃশেষ হয়ে গেল। আরাম আয়েশের মান অতি নিম্নতর হয়ে গেল। খেলাফতের নেশা চলে গেল। হাব্বাবার প্রতি এতই আকৃষ্টি হয়ে পড়েছিলেন যে, মৃত্যুর পরও তাকে কয়েকদিন দাফন না করে রেখে দিয়েছিলেন। তাকে চুম্বন করতেন। জিহবা দিয়ে চাটতেন। এমনিভাবে তার মরদেহ পছে দুর্গন্ধ হয়ে উঠে। এরপরই তাকে দাফনের ব্যবস্থা করা হয়। পরে কবর থেকে আবার তার লাশ পুনরায় উত্তোলন করা হয়।

এ ঘটনার পর ইয়াজিদ প্রায় ১৫ দিনও জীবিত ছিলেন না। তার ফুসফুস ব্যধিতে আক্রান্ত হয়েছিল। কবি বলেন

فان تسل عنك النفس اوتدع الهوى☆ فبالبأس تسلو عنك لا بالتجد

"যদি তোমরা কাছে অন্তর প্রশ্ন করে অথবা নাফসের ইচ্ছা জাগে তাহলে তা ধৈর্যের কারণে নয় বরং নিরাশ হয়ে প্রশ্ন করে।"

وكل خليل زار نى فهو قائل☆ من اجلك هاذا هالك اليوم اوغد

"সকল বন্ধুই আমাকে দেখেছে, বলেছেন তোমার কারণেই ইহা আজ বা

কাল ধ্বস হবে।”

ইয়াজিদ ইবনে আব্দুল মালেকের ইন্তিকাল :

আলবালাক্কাস্ত আরবিলে ইয়াজিদ ইবনে আব্দুল মালেক ইন্তিকাল করেন। কারো কারো জাওয়ান এলাকায় তিনি ইন্তিকাল করেছেন। সেখান থেকে লাশ নিয়ে দামেস্কের বাবুল এবং বাবুছ্ছাগীর এর মাঝখানে দাফন করা হয়। তিনি ১০৫ হিঃ ২৫শে শাবান তারিখে ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ২৯ বছর। কেউ বলেছেন ৩৮ বছর। 8 বছর ১মাস ক্ষমতায় ছিলেন।

হিশাম ইবনে আব্দুল মালেকের শাসন:

ইয়াজীদ ইবনে আব্দুল মালেকের ইন্তিকালের পর হিশাম ইবনে আব্দুল মালেক সিংহাসনে আরোহন করেন। ইয়াজিদের ইন্তিকালের দিনই তিনি শাসনদন্ড হাতে নেন। ইয়াজিদ তার ভাই হিশামকেই নির্বাচিত করেন। হিশামের হাতে রাজত্ব আসার সময় তিনি রাসাফা নামক স্থানে ছিলেন। তাকে খেলাফতের সুসংবাদ দেয়া হয় এবং সভাসদগণ কৃতজ্ঞতার সেজদাহ্ আদায় করেন। সংবাদ পেয়ে তিনি তাড়াতাড়ি দামেস্কে আগমন করেন।

মাসআব আযযুবাইরী বলেন জনগণ থেকে শুনা গেছে, আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ান স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, তিনি মেহরাবে ৪বার পেশাব করেছেন। এরপর তার পা দ্বারা পদদলিত করেন। এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা সায়িদ ইবনে মাসয়াবকে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বলেন আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ানের ঔরষে ৪টি সন্তান জন্মগ্রহণ করবে এবং প্রত্যেকজনই খলীফা হবেন। এদের সর্বশেষজন হিশাম। হিশাম ছিলেন অনুভূতি প্রবন, রাজনীতিবিদ, সুন্দর, মোটাসোটা এবং ট্যারা চোখা। কাল খেজাব ব্যবহার করতেন। তাছাড়াও তিনি ছিলেন পরিশ্রমী, বিচারক, ধৈর্যশীল, লোভ লালসাহীন। তিনি খেলাফতের প্রচলিত নিয়ম একটা নির্ধারিত সীমা পর্যন্ত ঠিক রেখেছিলেন। তিনি অধিক ধন সম্পদ জমা করতেন ব্যায় করতেন কম। প্রকাশ থাকে যে, তিনি এত ধন সম্পদ জমা করেছিলেন যে, ইতিপূর্বে আর কেউ এত ধন-দৌলত জমা করেননি। হিশামের ইন্তিকালের পর ওয়ালীদ ইবনে ইয়াজিদ তাঁর সমস্ত ধন সম্পদ দখল করে নেয়। যার কারণে তাঁর কাফন দাফনের ক্ষেত্রেও কষ্ট করতে হয়েছিল। রবিউছছানী ১২৫ হিজরীতে রসফাহ্ নামক স্থানে তিনি ইন্তিকাল করেন।

ইন্তিকালের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৩ বছর। কারো মতে ৫৪ বছর।তিনি ১৯ বছর ৯ মাস রাজত্ব করেন। কারো মতে তাঁর রাজত্বকাল ২০ বছর।

ওলীদ ইবনে ইয়াজিদ ইবনে আব্দুল মালেক এর শাসনামল:

হিশাম ইবনে আব্দুল মালেকের পর তাঁর ভাতিজা ওয়ালীদ ইবনে ইয়াজিদ ক্ষমতায় আসেন। তার পিতা ওয়ালীদ মৃত্যুর নিকটবর্তী হলে হিশামকে এই শর্তের উপর ক্ষমতা দেয়া হয় যে, হিশামের পর তার ছেলে ওয়ালীদ ক্ষমতার উত্তরাধিকারী করবে। হিশামের ইন্তিকালের পর ওয়ালীদের কাছ থেকে বাইয়াত নেয়া হয়। ইয়াজিদের চাচা হিশামের ইন্তিকালের দিন ইয়াজিদ রাবীতাহ নামক স্থানে ছিলেন। চাচার অসন্তুষ্টির কারণে তিনি দূরে থাকতেন। ওয়ালীদ ধর্মীয় ব্যাপারে ছিলেন অলস, মদ্যপ এবং পাপ ও দুষ্টুমীর ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ। ওয়ালীদ সুশীল না হওয়ায় হিশাম তাকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন। ওয়ালীদ ব্যাপারটি জানতে পেরে পালিয়ে যান। তিনি স্থায়ীভাবে কোথাও বসবাস করতেন না। যে রাত শাসন ক্ষমতার ঢংকা পরিবর্তন হয়ে সকাল বেলা ওয়ালীদের কাছে পৌছার কথা, সে রাত ওয়ালীদ অত্যন্ত ব্যস্ত সময় কাটান। সে তার ব্যস্ততা এবং চাঞ্চল্যতা সাথীবর্গদের অবহিত করে এবং সে বলতে লাগল তোমরা আমাকে সাওয়ারীতে আরোহন করিয়ে এত দ্রুত চলতে থাকে, যেন আমার চঞ্চলতা প্রশান্তিতে পরিবর্তন হয়ে যায়। তারা দু'মাইল চলতে না চলতেই তার হত্যার ইচ্ছা এবং মাসানীয় পত্র ব্যাপারে আলোচনা করছিল। কিছুক্ষন পর তারা কোন মানুষ আগমন অনুভব করল।

লোকটি বুঝতে পারল যে, আমরা কোন ছায়ার সন্ধান করছি। সে শান্ত হল। কিন্তু ওয়ালদি তার সাথীদের বললেন আরে ভাই মনে হয় সে হিশামের পিয়ন হবে। আল্লাহ করুন, এতে শুধু ভালই থাকুক। ডাক যখন তাদের নিকটবর্তী হল তখন আগন্তুক লোকটি ওয়ালীদকে দেখে চিনে ফেলল। তাড়াতাড়ি সে হাটতে লাগল এবং কাছে এসে ভদ্রলোকের মত দাঁড়িয়ে গেল। ওয়ালীদ অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়ল। ওয়ালীদ বলল তোমার অমঙ্গল হোক, ওয়ালীদ কি মৃত্যুবরণ করেছে? তখন সংবাদবাহক বলল জি হ্যাঁ। সে একটি পত্র দিল। ওয়ালীদ তা পড়তে থাকল। পত্রটি পড়ে দ্রুত দামেস্কের দিকে রওয়ানা হয়েযায় এবং সিংহাসনের অধিকারী হয়।

একবছর শাসন করতে না করতেই দামেস্কবাসী তার পাপাচারে কারণে তাকে অপসারণের সংকল্প করে। কারণ ওয়ালীদ পাপাচারে এমনভাবে সীমা লংঘণ করেছিল যে, কাফের-নাস্তিকদেরকেও ছাড়িয়ে যায়।

ওয়ালীদের বিলাসিতা:

হাফেজ ইবনে আসাকির লিখেন, ওয়ালীদ মদ্য পান এবং বিলাসিতায় ডুবে গিয়েছিল। পরকালের কোন ভয় তার ছিল না। গান-বাদ্য, খেল-তামাশা, ইত্যাদিই ছিল তার দৈনন্দীন রুটিন। তার আশপাশে সবসময় সারিন্দা, ঢোল, দফ, বেহালা ইত্যাদিই থাকত। সে আল্লাহ নিষেদজ্ঞাকে টুকরা টুকরা করে ফেলল। এ কারণে তাকে ফাসেকই বলা হচ্ছিল। তবে ওয়ালীদ উমাইয়া গোত্রে বাকপটুতা, সাহিত্য জ্ঞান, নাহু, হাদীছ ইত্যাদিতে পারদর্শী ছিল। সে আবার দানশীলও ছিল। মদ্যপান, ধর্ম সংগীত, বিলাসিতা, ধর্মীয় দুর্বলতা ও উদাসীনতায় তার তুলনা সে নিজেই ছিল।

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন একদা ওয়ালীদ মদ পানে উন্মত্ত হয়ে দাসীর সাথে সঙ্গম করতে ছিল। মুয়াজ্জিন বার বার তাকে সংবাদ দিচ্ছিল। সে এত মদ পান করেছে যে, দাসী ছাড়া সে ইমামতি পর্যন্ত করতে পারছে না। শেষ পর্যন্ত দাসীর কাপড় তাকে পরানো হলে পরে সে ইমামতি করে।

কথিত আছে, ওয়ালীদ মদের একটা হাউজ তৈরী করেছি। মদের নেশা হলে সে হাউজ থেকে মদ পান করত। অত্যন্ত বেশী মদ পান করত। এমনকি মদের কারণে তার সমস্ত শরীরে নেশার প্রভাব পড়ত। তখন সে বের হয়ে পড়ত। ইমাম মওরিদী লিখেছেন যে, একদিন ওয়ালীদ কোরআন শরীফ দ্বারা ভবিষ্যৎবাণী করতে চাইলে কোরআনের এই আয়াত বেরিয়ে আসে।

واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد

"পয়গাম্বরগণ ফয়সালা চাইতে লাগলো এবং পত্যেক অবাধ্য হঠকারী ব্যর্থ হল।" এটি পাঠ করার পর ওয়ালীদ পবিত্র কোরআনকে ছিড়ে ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলে। এর পর সে এই কবিতা পাঠ করে:

اتو عد كل جبار عنيد ☆ فها انا ذاك جبار عنيد

"তুমি কি অবাধ্য হঠকারীকে ধমকাচ্ছ। তাহলে আমি একজন মস্ত বড় অবাধ্য হঠকারী।"

اذا ماجئت ربك وم حشر ☆ فقال يارب مزقنى الوليد

"কিয়ামতের দিন যখন আমি তোমার রবের কাছে আসব তখন বলো হে আল্লাহ ওয়ালীদ আমাকে ছিড়ে টুকড়া টুকড়া করে দিয়েছে।"

এর পর ওয়ালীদ বেশী দিন জীবিত থাকেনি। তাকে বিপজ্জনক অবস্থায় হত্যা করা হয়। মাথা কেটে তার মহলে ঝুলিয়ে রাখা হয়। এর পর শহরের মূল ফটকে ঝুলিয়ে রাখা হয়।

এধরনের আরো অনেক ঘটনা ইতিহাসের কিতাবে উল্লেখ আছে। হাদীছে বর্ণিত আছে যে, এ উম্মতে ওয়ালীদ নামে এক ব্যক্তি এমন হবে যে, সে ফেরআউন থেকেও নিকৃষ্টতর। সমস্ত উলামায়ে কেরাম এই হাদীছের উদ্দেশ্য ওয়ালীদ ইবনে ইয়াজিদকেই বলেছেন।

ওয়ালীদ ইবনে ইয়াজীদের হত্যা:

দামেস্কবাসী যখন ওয়ালীদের সিংহাসনচ্যুত করল তখন জনগণ তার চাচার ছেলের কাছে বাইয়াত নিল। যার নাম ছিল ইয়াজিদ ইবনে ওয়ালীদ ইবনে আব্দুমালেক। তিনি সিংহাসনে আরোহন করেই ঘোষণা করলেন যে ব্যক্তি ওয়ালীদের মস্তক এনে দিতে পারবে তাকে এক লক্ষ দেরহাম পুরুস্কার দেয়া হবে। সে দিন ওয়ালীদ ছিল আল বুহরাহ নামক স্থানে। ইয়াজিদের সৈন্যরা ওয়ালীদকে অবরোধ করল এবং তাকে হত্যার দারপ্রান্তে এসে গেল। ওয়ালীদ এদেরকে ফিরিয়ে দিলো। কিন্তু নিজে বিরত থাকল না। লোকেরা ওয়ালীদের মহলে প্রবেশ করল। ওয়ালীদ বলল এ দিনটি ঠিক ওছমানের দিনের মত। লোকেরা বলল, না না এর চেয়ে আরো ভয়ানক। এতটুকু বলেই শরীর থেকে মাথাটা আলাদা করে ফেলা হল। কর্তিত মস্তক সমগ্র দামেস্কে ঘুরানো হলো। এরপর তার ঘরেই তার মাথাটাকে ঝুলিয়ে দেয়া হল। এরপর শহরের কেন্দ্রস্থলে ঝুলিয়ে দেয়া হল। ওয়ালীদ নিহত হওয়ার সংবাদ শহরে ছড়িয়ে পড়লে সমগ্র শহর অস্থিতিশীল হয়ে উঠে। শত্রুরা কোন সহায়তা করেনি। এরপর আর কোন কথা বর্তা হয়নি। ১৪৬ হিঃ সনের রজব মাসে এই হত্যাকান্ড ঘটে। সর্ব সাকুল্যে সে এক বছর সিংহাসনে ছিল। কারো কারো ১ বছর ২ মাস ছিল।

উমাইয়াদের মধ্যে ওয়ালিদ সবচেয়ে বেশী লাবন্যময় ছিল। শক্তিশালী এবং ভাল কবি ছল। কিন্তু সেই সঙ্গে সে ছিল পাপাচারী। প্রজারা তার

পাপাচারের কারণে বিদ্রোহী হয়ে গিয়েছিল। চাচাত ভাই ইয়াজিদ ইবনে আব্দুল মালেক তার প্রতিদ্বন্দ্বি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল। ইয়াজিদ দামেস্ক অধিকার করে নেয়। একদা ওয়ালীদ মোবার নামক স্থানে শিকার করতে গিয়েছিল। সুযোগ পেয়ে ইয়াজিদ কিছু সৈন্য নিয়ে ওয়ালীদের পিছু ধরল। সৈন্যরা তাকে অবরোধ করল শহরের দেয়াল পর্যন্ত লোক একাকার হয়ে গেল। অতঃপর ওয়ালীদকে হত্যা করা হল। তার পর কর্তিত মস্তক একটি বর্শার ফলকে ঢুকিয়ে শহরের গেইটে ঝুলিয়ে দেয়া হয়।

ইয়াজিদ ইবনে ওয়ালীদ ইবনে আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ানের শাসনামল:

ওয়ালীদ নিহত হওয়ার পর ইয়াজিদ ইবনে ওয়ালীদ ইবনে আব্দুল মালেক সিংহাসনে আরোহন করেন। চাচাত ভাই ওয়ালীদকে যেদিন সিংহাসনচ্যুৎ করা হয় সে দিন তিনি খেলাফতের বাইয়াত গ্রহণ করেন। সম্ভবত ইয়াজিদ ইবনে ওয়ালীদই প্রথম খলীফা যার মা ছিল দাসী। উমাইয়া বংশের মাহাত্ত্বের জন্য ইয়াজিদ ইবনে ওয়ালীদেরও হেফাজত করা হত। উমাইয়া যখন বুঝতে পারল যে, তাদের খেলাফতের বাগডোর দাসী প্রজন্মের হাতে থাকবে না তখনই তারা এর সংরক্ষণে মনোযোগ দিল। শেষ পর্যন্ত উমাইয়াদের শক্তি ওয়ালীদ ইবনে ইয়াজিদ পর্যন্ত অবশিষ্ট রইল। তাদের তাও ধারণা ছিল যে, উমাইয়াদের শক্তি নিঃশেষ হয়ে আসছে।

ইয়াজিদ ইবনে ওয়ালীদকে ইয়াজিদে নাকেসও বলা হত। কারণ তিনি ক্ষমতায় এসেই মানুষের দান খয়রাতের উপর বাধ্য বাধকতা আরোপ করে ছিলেন। যত টাকা হিশামের আমলে দেয়া হত অত টাকা ধার্য করেছিলেন। কোন কোন ঐতিহাসিক তাকে নাকেস বলার কারণ এই উল্লেখ করেছেন যে; ইয়াজিদের পায়ের আঙ্গুলে ক্ষত ছিল। সম্ভবত মারওয়ান ইবনে মুহাম্মদ সর্বপ্রথম তাকে ইয়াজিদে নাকেস বলে ডেকেছেন। ইয়াজিদ ইবনে আব্দুল মালেক যখন সিংহাসনে আরোহন করেছিলেন তখন রাজ্যে বিশৃংখল অবস্থা বিরাজ করছিল।

বিভিন্ন আলেম বলেন ইয়াজিদ ইবাদত, কোরাবানী, কোরআন শরীফের অনুসরণ এবং হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজের পদাঙ্ক অনুসরণ

করেছিলেন। এমনভাবে খোদভীতি দ্বীনদারীতে তখনকার সময়ে তাঁর তুলনা তিনি নিজেই ছিলেন। কিন্তু ভাগ্যে যা আছে তা ঘটবেই। তিনি বেশী দিন জীবিত ছিলেন না। আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে পরপারে চলে যান।

ইন্তিকাল এবং শাসন কাল:

ইয়াজিদ ইবনে ওয়ালীদের ইন্তিকাল হয় ১২৬হিঃ ১৮ই জমাদিউছ ছানী। তিনি ৪০ অথবা ৪৬ বছর বেচে ছিলেন। প্রায় সাড়ে ৫ মাস ক্ষমতায় ছিলেন।

ইব্রাহীম ইবনে ওয়ালীদের খেলাফত:

ইয়াজিদ ইবনে ওয়ালীদের ইন্তিকালের পর লোকেরা তার ভাই ইব্রাহীম ইবনে ওয়ালীদের বাইয়াত গ্রহণ করেন। এজন্য তার ভাই ইয়াজিদ ইবনে ওয়ালীদ তাকে স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করে ছিলেন। কিন্তু ইব্রাহীম রাজত্ব ঠিকমত চালাতে পারেননি। এজন্য তার খেলাফত দ্যুদুল্যমান ছিল।

মারওয়ান ইবনে হাকাম ইব্রাহীমকে হত্যা করে শুলিতে চড়িয়ে দেয়। ইব্রাহীম মাত্র ২ মাস ১০ দিন শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু মারওয়ান ইবনে মুহাম্মদ আল হামার আজারবাইজানের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধিত্ব করছিলেন। তিনি যখন শুনতে পেলেন যে, জনগণ ইব্রাহীমের নিকট আনুগত্যের শপথ নিচ্ছে, তখন তিনি আজারবাইজান থেকে প্রত্যাবর্তন করেন এবং জনগণ কে তার প্রতি আনুগত্য করার জন্য আহবান করতে থাকেন। এর কিছু দিন পরই তিনি সিরিয়াতে চলে আসেন। এর আগেই ইব্রাহীম ইবনে ওয়ালীদ তার দুই ভাই বশীর এবং সরওয়ারকে তার সহায়াতার জন্য তৈরী রেখেছিলেন। এতে উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে মারওয়ান ইবনে মুহাম্মদ জয়ী হন। সেখান থেকে মারওয়ান যাত্রা করে মারজেওযারা'র দিকে চলে যান। সেখানে সুলায়মান ইবনে হিশাম বিন আব্দুল মালেক তার সঙ্গে কথাবার্তা বলেন, কিন্তু বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। খলীফা ইব্রাহীম ইবনে ওয়ালীদ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করে তা দামেস্কের দিকে সৈন্য পরিচালনা করেন। তবে তাঁর সৈন্যরাই তাকে ধোকা দিয়ে অপমানিত করে। অথচ ইব্রাহীম তার সেনা বাহিনীর জন্য ধন ভান্ডারের যাবতীয় কিছু খুলে দিতেন। কিন্তু তা ছিল গোপন। শেষে লোকেরা মারওয়ানের কাছেই বাইয়াত হতে শুরু করে। আর মারওয়ানও জনগণের আস্থা অর্জন করেন। শেষ পর্যন্ত কিছু দিন পরই প্রচারিত হয় যে, তার শাসন ক্ষমতা পরিবর্তন হয়ে গেছে। তাই তিনি

স্বেচ্ছায় শাসন ক্ষমতা থেকে পদত্যাগ করেন।

মারওয়ান ইবনে মুহাম্মদের শাসনামল:

খলীফা ইব্রাহীম ইবনে ওয়ালীদের হত্যাঘটনার পর মারওয়ান ইবনে মুহাম্মদ ক্ষমতায় আসেন। তারই শাসনামলে আবু মুসলিম খুরাসানী আতাম প্রকাশ করেন। কুফাতে তিনি রক্ত পিপাসু হিসেবে আবির্ভূত হন। সাফফাহ্‌র কাছে পৃথক বাইয়াত গ্রহণ করা হয়। এমন সময় সাফফাহ্‌র চাচা আব্দুল্লাহ ইবনে আলী ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) মারওয়ান ইবনে মুহাম্মদ এর সাথে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হন। মসূলে উভয়ের মধ্যে প্রচন্ড যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে মরাওয়ান পরাজিত হন। অধিকাংশ সৈন্যকে হত্যা করা হয় এবং অসংখ্য সৈন্য সমুদ্রে ঝাপ দিয়ে প্রাণ হারান। যারা বেঁচে ছিলেন তাঁদেরকেও আব্দুল্লাহ ইবনে আলী জর্দান নদী পর্যন্ত পশ্চদ্ধাবন করেন। সেখানে উমাইয়াদের ৮০ হাজারের বেশী সৈন্য সমাবেশ ঘটায়। মাঠ কানায় কানায় ভরে যায়। শেষ পর্যন্ত তাদেরকেও হত্যা করা হয়। পরবর্তীতে আব্দুল্লাহ ইবনে আলী তাদেরকে ঘেষ্টিতে যাবার আদেশ করেন। তাদের বসার বিছানায় বিচ্ছু রেখে দেয়া হয়। এরপর স্বয়ং আব্দুল্লাহ এবং তার সঙ্গীরা এর উপর বসে যায়। তারপর খানা পাকানো হয়। সবাই খাওয়া দাওয়া করে। এ অবস্থায় তাদের নীচে থেকে আহজারীর আওয়াজ আসতে শুরু করে। এ অবস্থা দেখে আব্দুল্লাহ ইবনে আলী বলতে লাগলেন আজকের দিন কারবালার মতই বরং তার চেয়েও আরো বেশী যন্ত্রনাদায়ক।

সাফফাহ তার চাচা সালেহ ইবনে আলীকে আসসামাওয়াত এর পথে বের করে দেন। তিনি গিয়ে আব্দুল্লাহ ইবনে আলীর নিকট পৌছে যান। তারপর তিনি যুদ্ধের জন্য দামেস্কে অবতরণ করেন। তিনি শক্তির জোরে তা জয় করে নিতে সক্ষম হন। তা তিন দিন পর্যন্ত দখল করে রাখেন। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস শহরের দেয়াল পাথর দ্বারা উড়িয়ে দেন। সুযোগ বুঝে মারওয়ান মিশরে পালিয়ে যায়। বুঝা যায় সালেহ ইবনে আলীই তাকে পশ্চাদ্ধাবন করেন। শেষ পর্যন্ত মারওয়ানকে সূয়ীত গ্রামে হত্যা করা হয়। সালেহ ইবনে আলী হাবশাহ পর্যন্ত যাওয়ার ইচ্ছা করেন। কিন্তু এর পূর্বেই তিনি উদ্দেশ্যপূর্ণ করে ফেললেন। মারওয়ানকে হত্যা করার সময় সে বলছিল যে আমাদের রাজত্ব শেষ হয়ে গেছে। মারওয়ান ইবনে মুহাম্মদ অত্যন্ত সাহসী নির্ভীক এবং শান্ত প্রকৃতির লোক

ছিলেন। গৌর বর্ণের লোক ছিলেন। মুখে ছিল ঘন দাঁড়ী। বিচক্ষণ ও জ্ঞানী। তিনি নিহত হওয়ায় বিশৃংখলা অবস্থা বিরাজ করছিল। রাজত্ব টুকরা টুকরা হয়ে হল। মারওয়ানের হত্যার ঘটনা ঘটেছিল ১৩৩ হিঃ। তিনি ৫৬ বছর জীবিত ছিলেন। ঐতিহাসিকগণ বলেন তিনি ৮ বছর রাজত্ব করেন। কারো কারো মতে তিনি ৫ বছর ২ মাস ১০দিন রাজত্ব করেছেন। তিনি উমাইয়াদের সর্বশেষ শাসক।

উমাইয়া শাসনামলে ১৪ জন শাসক অতিবাহিত হন। প্রথম খলীফা হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এবং সর্ব শেষ খলীফা মারওয়ান ইবনে মুহাম্মদ আলজদী আল হামার। এই বংশ ৮০ বছর রাজত্ব করেন। যা প্রায় ১০০০ মাসের মতো। উমাইয়া শাসনের অবসানে হাসান (রাঃ) এর ভবিস্যদ্বাণী সত্যে পরিনত হয়ে যায়। একবার তাকে বলা হয়েছিল যে, আপনি খেলাফতকে উমাইয়াদের হাতে ছেড়ে যাচ্ছেন। তিনি বলেছিলেন:

ليلة القدر خير من الف شهر

মারওয়ান সিংহাসনে আরোহন করার পরপরই রাজ্যের নিয়ম কানুন উলট পালট হয়ে যায়। সব কয়জন শাসককেই পদুচ্যুত করা হয়। তারা মাদের মেয়াদ পূর্ণ করতে পারেননি। অপসারিত শাসক ওয়ালীদ ইবনে ইয়াজীদের পর উমাইয়া বংশে মাত্র তিনজনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এর পরই উমাইয়াদের শাসন বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

তিন জন হলেন: ১। ইয়াজিদ ইবনে ওয়ালীদ ইবনে আব্দুল মালেক ২। ইব্রাহীম ৩। মারওয়ান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মারওয়ান ইবনে হাকাম। এরপর থেকেই শাসন ক্ষমতা আব্বাসীয় বংশে চলে যায়।

আব্বাসীয় খেলাফত

খলীফা আবুল আব্বাস সাফফাহ:

ঐতিহাসিকগণ বলেন, আব্বাসী বংশের সর্বপ্রথম খলীফা আবুল আব্বাস সাফফাহ। তার পূর্ণ নাম আবুল আব্বাস আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস আল হাশেমী। ১৩২ হিঃ ১৩ই রবিউল আওয়াল তারিখে তিনি সিংহাসনে আরোহন করেন। তাঁর মন্ত্রী ছিলেন আবু সালমা আল হাফস আল খালাল। তাঁর মাধ্যমেই উযীর নিয়োগের প্রথা আরম্ভ হয়। এরপর থেকেই এই নিয়ম চালু হয়ে আসছে। এরপরও যে কেউ এ পদে আসতো

তাকেও উযীর বলা হত। এ ধারাবহিকতা চলতে থাকে সাহেব ইবনে উব্বাদ পর্যন্ত। তাকে সাহেব নামে এজন্য ডাকা হত যে তিনি ইবনুল আমীদ এর সমসাময়িক ছিলেন। উযীর বা মন্ত্রী নিয়োগের এ ধারা বর্তমান পর্যন্ত চলে আসে। ইমামুল ফারজ বলেন একদিন সাফফাহ খুৎবাহ দিচ্ছিলেন, হঠাৎ করে তার হাত থেকে লাঠি মাটিতে পড়ে যায়। তাতে তিনি অমঙ্গল মনে করেন। এ জন্যে তা উঠিয়ে ধৌত করে দিলে তিনি খুশী হয়ে এই কবিতা আবৃত্তি করেন:

فالقت عصاها واستقر بها النوى ☆ كما قرعينا بالاياب المسافر

"সে ক্লান্ত হয়ে স্বীয় লাঠিতে ভর দিয়েছে, আর বিরহ বেদনা তার প্রকৃতিতে আপনরূপ নিয়েছে। মুসাফির যেমন ভ্রমন শেষে শান্তির নিশ্বাস ফেলে।"

ইবনে খাল্লেকান বলেন, একদা তিনি আয়না দেখে বলেন হে আল্লাহ সুলায়মান ইবনে আব্দুল মালেক যেভাবে দোয়া করেছিলেন সেভাবে আমি দোয়া করব না। বরং আমি এ আবেদন করব যে, হে আল্লাহ! আপনার আনুগত্যের জন্য এত দীর্ঘ জীবন দান করুন যার মধ্যে আপনার মেহেরবানী প্রচুর থাকে। একথা শেষ করার পরই একজন গোলাম অন্য একজন গোলামের কাছে বলছিল যে, আমার আর তোমার মধ্যে মৃত্যুর মাত্র ২ মাস ৫ দিন ব্যবধান। একথা শুনে সাফফাহ তাদের কথা বার্তা একটি কুলক্ষণ মনে করলেন এবং তিনি পড়লেন

حسبى الله ولا حول ولا قوة الا بالله عليه توكلت واليه استعنت.

গোলামদের আলোচনা মতে ২ মাস ৫ দিন মাত্র অতিবাহিত হল, সাফফার জ্বর আসল। অত্যন্ত কঠিন জ্বর। বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে তারই আবাদকৃত শহর আম্বারে ইন্তিকাল করেন। ৩২ বছর ২ মাস জীবিত ছিলেন। ৪ বছর ৯ মাস ক্ষমতায় ছিলেন। সাফফাহ ছিলেন সাদা সুন্দর ব্যক্তি তার মুখমন্ডলে ঘণ ঘণ দাড়ি ছিল।

আবু জাফর মানসুরের খেলাফত:

সাফফাহ পর নিজ ভাই আবু জাফর মানসুর সিংহাসনে আরোহন করেন। তার পূর্ণ নাম আবু জাফর আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ আল মনসুর। ভাই সাফফাহ ইন্তিকালের সময় মনসুর যখন জানতে পারলেন যে, তার খেলাফতের দায়িত্ব নিতে হবে তখন তিনি বলেন আল্লাহর ইচ্ছ হলে আমার আচরণ জনগণের সাথে

খুব উত্তম হবে। সমস্ত মানুষ তার বাইয়াত গ্রহণ করেন। জনগণকে নিয়ে তিনি হজ আদায় করেন। হজ্ব থেকে প্রত্যাবর্তন করে হাশিমিয়া নামক স্থানে পৌছে মানুষের কাছ থেকে তার বাইয়াত গ্রহণ করেন। এরপর তিনি আবার হজ্ব করেন। হজ্বের ইচ্ছায় যখন তিনি মক্কার কাছাকছি পৌছলে সেখানে তিনি দেখতে পেলেন যে, দেয়ালে এ কবিতা লিখা:

انا جعفر وحانت وفانك وانقضت☆ سنرك وامر الله لابد واقع

"আমি আবু জাফর ! তোমার মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হয়েছে। তোমার জীবন পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। আর আল্লাহর হুকুম অবশ্য আসবে।"

ابا جعفر هل كاهن او منجم☆ لك اليوم من ريب المنية دافع

"আবু জাফর কি জ্যোতিষী না গনক। আজ তোমাকে মৃত্যুর থাবায় সোপর্দ করব।"

মনসুর এ কবিতা দেখার পর মৃত্যু সম্পর্কে তার পূর্ণ বিশ্বাস জন্ম নিল। ৩ দিন পর তাঁর ইন্তিকাল হল। মৃত্যুর পূর্বে স্বপ্নে কোন বুযুর্গ ব্যক্তিকে এই কবিতা পড়তে শুনেছেন:

كانى بهذا القصر قد باد اهله☆ وعرى منه اهله ومنازله

"যেমন আমি এমন এক মহলে আছি যে, এর বাসিন্দা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। আর মহলের স্থান বাসিন্দা থেকে খালি।"

وصار رئيس القم من بعد بهجة☆ الى جدث تبسنى عليه جنادله

সে কয়েক দিন আনন্দে থাকার পর কওমের সর্দার হয়ে গিয়েছে। এর পর তাকে বড় বড় পাথর দ্বরা নির্মিত কবরে দাফন করা হয়েছে। "

খলীফা মনসুর ১৫৮ হিঃ বীরে মাইমুনাতে ইন্তিকাল করেন। স্থানটি মক্কা থেকে কয়েক মাইল দূরেই অবস্থিত । তিনি এহরাম অবস্থায় ইন্তিকাল করেন। ৬৩ বছর জীবিত ছিলেন। ২১ বছর ১১মাস ১৪ দিন সিংহাসনে ছিলেন। মনসুরের মায়ের নাম ছিল বরবরিয়াহ।

মনসুর খিলাফতের দীর্ঘ সময়ের শাসক ছিলেন। বাদামী রং এর হালকা পাতলা গড়নের লোক। মুখমন্ডলে হালকা দাড়ী ছিল। প্রশস্ত ললাট। চোখ দেখলে বুঝা যেতো যেমন দুজন লোক কথা বলছে। তার চোখ ছিল তীক্ষ্ণ এবং নির্ভীক।

এছাড়াও মনসুর ছিলেন প্রভাবশালী জাকজমকপূর্ণ। বুদ্ধিমান, কবি, তীক্ষ্ণ মেধা সম্পন্ন, বীর, ফকীহ ও ভাল আলেম ছিলেন। জ্ঞানী-গুণিদের যথেষ্ট কদর করতেন। মানুষ তাকে ভয় করত। অথচ তাঁর আচরণ ছিল ভদ্র। ধর্মকর্ম ভালই করতেন কিন্তু কৃপণ ছিলেন। তবে প্রয়োজনের সময় তিনি কৃপণতা আমলে আনতেন না।

মাহদীর খেলাফতামল:

মনসুরের শাসনের পর তার ছেলে মাহদী সিংহাসনে আরোহন করেন। তারপূর্ণ নাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ মাহদী বিল্লাহ। ওয়ালীদ ইন্তিকাল করার পর বাগদাদে তার কাছ থেকে বাইয়াত গ্রহণ করা হয়। ১১ ই জিলহজ্ব আবার সাধারণ জনগণের কাছ থেকে তার উপর বাইআত নেয়া হয়। উছ্বজনা গ্রামে তাঁর ইন্তিকাল হয়।

বলা হয়ে থাকে, তিনি একটি শিকারকে পশ্চাদ্ধাবন করছিলেন। তাঁর ঘোড়া হঠাত করে উচু নীচু স্থানে হোচট খেয়ে পড়ে যায়। আর মাহদীর দেহে মারাত্মক আঘাত লাগে। তাতে তাঁর ইন্তিকাল হয়। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন তাঁর দাসী তাঁকে বিষ খাইয়ে হত্যা করে। কারো কারো মতে সপত্নীর হিংসায় খাদ্যের সহিত বিষ মিশ্রিত করেছিল। আর তিনি হাত বাড়িয়ে খেয়ে ফেলেন। এতে তাঁর মৃত্যু ঘটে। মুহাম্মদ আল মাহদী ১৬৯ হিঃ ২২ ই মুহররম ইন্তিকাল করেন। তাঁর লাশ বহন করার মত কোন বস্তু না থাকায় একটি দরজায় উঠিয়ে আখরোট বৃক্ষের নীচে দাফন করা হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল সাড়ে বিয়াল্লিশ বছর। কেউ বলেছেন ৪৩ বছর। প্রায় ১০ বছর এক মাস সিংহাসনে ছিলেন।

আল মাহদী সচ্চরিত্রবান, দানশীল, সুদর্শন এবং প্রজা বৎসল শাসক ছিলেন। বর্ণিত আছে যে, মনসুরের কোষাগারে এক আরব মৃতের সম্পদ ৬০ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দান করেন। পৈতৃক সূত্রে পাওয়া অঢেল টাকা পয়সা মাহদী প্রজাদের মধ্যে বন্টন করে রাজ্যের উন্নতি করে ছিলেন। তিনি এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা শায়ের বা কবিদের মধ্যে বিতরণ করেছিলেন।

মুসা আল মাহদীর খেলাফত:

মুহাম্মদ আল মাহদীর পর তার ছেলে মুসা আল মাহদী সিংহাসনে

আরোহন করেন। তাঁর পিতার ইন্তিকালের দিন তিনি তিবরিস্থানে সেনাপতির দায়িত্বে ছিলেন। আসবজান গ্রামে তার কাছ থেকে শপথ নেয়া হয়। হারুনুর রশীদ মুসার নামে একটি শোকবাণী লিখেন। এর সহিত খেলাফতেরও একখানা পত্র লিখেন। কয়েকদিন পর মুসা ডাক ঘোড়ায় চড়ে বাগদাদ চলে আসেন জনগণ তার সাথে সাক্ষাৎ করে এবং তার হাতে বাইআত গ্রহণ করে। মুসার পর ভাবী সম্রাট হারুনুর রশীদের পক্ষ থেকে অপসারনের ব্যাপারে একটি চুক্তি করেছিলেন। কিন্তু পরে সে চুক্তি পূর্ণ হবার আগেই তাঁর ইন্তিকাল হয়।

১৭০ হিঃ ১৪ই রবিউল আওয়াল তিনি প্রায় ২০ বছর ৯ মাস বয়সে ইন্তিকাল করেন। তিনি ১ বছর ৪৫ দিন ক্ষমতায় ছিলেন।

হারুনুর রশীদের শাসনকাল:

মুসা আল মাহদীর পর তার ভাই হারুনুর রশীদ সিংহাসনে সমাসীন হন। তাদের পিতা আল মাহদী পূর্বে এ দুভাইকে স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করে যান। যে রাতে মুসা ইন্তিকাল করেন সে রাতেই তাঁর এক ছেলে জন্ম গ্রহণ করে। তার নাম রাখা হয় শমুন। আব্বাসীয়দের জন্য এ রাতটি ছিল অত্যন্ত আশ্চর্যের। ইতিপূর্বে এধরনের ঘটনা আর কখনো ঘটেনি। কারণ একদিকে এক খলীফার মৃত্যু অপর দিকে অন্য একজনের জন্ম। হারুনুর রশীদ খলীফা হয়ে ইয়াহিয়া ইবনে বরমককে উযীর মনোনীত করেন।

একটি বিস্ময়কর ঘটনা:

হারুনুর রশীদ খলীফা হয়েই এক বিস্ময়কর ঘটনার সম্মূখীন হন। যে সময় মুসা আল মাহদীকে খলীফা নিযুক্ত করা হয় সে সময় তার পিতার আংটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন যে, তা কোথায় আছে? তিনি জানতে পারলেন যে, আংটিটি হারুনুর রশীদের কাছে। মাহদী আংটিটি চাইলে হারুনুর রশীদ তা দিতে অস্বীকার করেন। মাহদী হারুনকে বার বার তাকীদ করতে থাকেন। তারা দু'ভাই একদিন বাগদাদের সেতুর উপর দিয়ে যাচ্ছিল। এমন সময় হারুনুর রশীদ মুসা আল মাহদীর গলা চেপে ধরেন এবং আংটিখানা দজলা নদীতে নিক্ষেপ করেন। মুসা আল মাহদীর ইন্তিকাল হলে হারুনুর রশীদ খলীফা নিযুক্ত হন। হারুন রশীদ ডুবুরীকে নির্দেশ দিলেন তা তুলে দেয়ার জন্য। খুঁজতে যেয়ে প্রথম অঙ্গুরীটি পেয়ে যায়। প্রথম অঙ্গুরী পাওয়া দ্বারা বুঝা গেল হারুনুর রশীদ হচ্ছে পরবর্তী

খলীফা। যখন সুলতান সালাহ উদ্দীন ইউসুফ ইবনে আইয়ূবী বানবাস দুর্গ জয় করেন তখন তিনি সে দূর্গকে ধন দৌলত ও লোক দ্বারা ভরে ফেলেন। এরপর তিনি দামেস্কে চলে আসেন। তার হাতে ইয়াকুতের নগ (বিশিস্ট আংটির পাথর) লাগানো ছিল। যার মূল্য এক হাজার দিরহাম। বানবাসের ঘণ বৃক্ষে তা হরিয়ে যায়। কিছু দূর যেতেই তার আংটির কথা স্মরণ হয় এবং কয়েকজন লোক সেখানে তালাশ করার জন্য পাঠিয়ে দেন। হারিয়ে যাওয়ার স্থানও তিনি তাদের নির্দিষ্ট করে বলেদেন। তারা তা পেয়ে যায়।

হারুনুর রশীদের উদারতার একটি ঘটনা:

হারুনুর রশীদ যদিও এক বিশাল সাম্রাজ্যের খলীফা ছিলেন তথাপি তাঁর ছিল আল্লাহ ভীতি। তাঁর ব্যাপারে ইমাম মুহাম্মদ ইবনে জাফর লিখেছেন একদা এক খারেজী হারুনুর রশীদের দল থেকে বেরিয়ে যাবার ইচ্ছা করল। হারুনুর রশীদের সমর্থক এক যুবক তার সাথে যুদ্ধ করে যাবতীয় মালামাল ছিনিয়ে নিল। এরপর খারেজী লোকটি বেশ কয়েক বার সৈন্য পরিচালনা করে। যুদ্ধে সে পরাজিত হয়। তাকে গ্রেফতার করে হারুনুররশীদের সামনে আনা হলে হারুন তাকে জিজ্ঞেস করেন, বল তোমার সাথে আমি কি রূপ আচরণ করতে পারি? জবাব দিল আপনি আমার সাথে এমন ব্যবহারই করবেন যেমনি আপনি আল্লহর দরবারে দাড়াবেন। তার কথা শুনে হারুন তাকে ক্ষমা করে দেন। সে দরবার থেকে বের হতে দেখে সভাসদগণ বললেন, মহামান্য খলীফা এই ব্যক্তি আপনার সৈন্যদের সাথে যুদ্ধ করেছে, আর আপনি তাকে ক্ষমা করে দিলেন? এ ব্যাপারে আপনি পুনর্বিবেচনা করুন। অন্যথায় এ ধরনের ঘটনা ঘটলে দুষ্ট লোকেরা সুযোগ পেয়ে যাবে। হারুন বললেন, বেশ তাহলে একে ফিরিয়ে আন। খারেজী লোকটি বুঝতে পারল যে, সবাই তার বিরুদ্ধে কথা বলছে। সে বলল মহামান্য খলীফা, আপনি এদের কথা মানবেন না। কারণ যদি আল্লাহ পাক আপনার ব্যাপারে মানুষের কথা মানতেন তাহলে আপনি চোখের পলকে খলীফা হতে পারতেন না। হারুনুর রশীদ বললেন, তুমি সত্যি বলছ। এর পর তাকে আরো বেশী পুরস্কারে ভূষিত করেন।

হারুনুর রশীদের পরলোক গমন:

খলীফা হারুনুর রশীদ ১৯৩ হিঃ ৭ই জমাদাচ্ছানী শনিবার ইন্তিকাল

করেন। মৃত্যু কালে তাঁর বয়স হয় ৪৭ বছর। কেউ বলেছেন ৪৫ বছর। ২৩ বছর ১ মাস সিংহাসনে ছিলেন। কারো কারো মতে তিনি ২৩ বছরই ক্ষমতায় ছিলেন।

তিনি ছিলেন বদান্য, বীর, গাজী, দুঃসাহসী এবং পরিশ্রমী লোক। তাঁর শরীর ছিল মোটা-তাজা সুদর্শন, পা ছিল লম্বা। বার্ধক্যের কাছাকাছি হলে তাঁ দাড়ী প্রায় সাদা হয়ে গিয়েছিল। তিনি খেলাফতের আসনে বসেই প্রত্যেক রাতে ১০০ রাকাআত নফল নামায আদায় করার নিয়ম করে নিয়েছিলেন। প্রতিনিদ তাঁর সম্পদ থেকে এক হাজার দিরহাম সদকা করতেন। ফিক্বহ্ শাস্ত্রে তাঁর যথেষ্ট পারদর্শিতা ছিল।

আহমদ আমীনের শাসনামল:

হারুনুর রশীদের পর তাঁর ছেলে আহমদ আমীন ক্ষমতায় আসেন। ক্ষমতায় এসেই তিনি মামুনুর রশীদকে খুরাসান এলাকার গভর্ণর নিয়োগ করেন। আহমদ আমীনের হাতে শাসন দন্ড আসার সময় তিনি বাগদাদেই ছিলেন। তাই শাহী পোশাক ও আংটি বাগদাদেই পাঠানো হয়।

এরপর সাধারণ মানুষ আহমদ আমীনের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন। এরপরই সমস্ত রাজ্যে বাইয়াতের ধারা ব্যাহত থাকে। হারুনুর রশীদের ইন্তিকালের পর ফজল বিন রবী সৈন্যবাহিনীর মধ্যে নারায়ে তাকবীর দেন। এবং বাগাদদের দিকে কুচকাওয়াজ করতে করতে যেতে থাকেন। ফজল হারুনুর রশীদের ওসিয়্যতের বিরুদ্ধে কাজ করেন। এ সংবাদ যখন মামুন জানতে পারলেন তখন ফজলের প্রতি তিনি রাগান্বিত হন। তিনি ফজলের নিকট হারুনের একটি পত্র প্রেরণ করেন। যার মধ্যে ফজলের প্রতিশ্রুতি লিখা ছিল। তাতে বিদ্রোহ করতে নিষেধ ছিল। বরং সাহায্য সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতিই উল্লেখ ছিল। কিন্তু ফজল এসবের কিছুই মূল্যায়ন করেনি। এতেই আমীন ও মামূনের মধ্যকার দূরত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে।

ইমাম কুসাই এর বর্ণিত ঘটনা ঃ

ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) বর্ণনা করেন, নাহু শাস্ত্রের ইমাম কুসাই (রহঃ) বলেন হারুনুর রশীদের দু'ছেলে আমিন ও মামুনকে শিক্ষা দেয়ার জন্য আমাকে গৃহশিক্ষক নিয়োগ করা হয়। এদের শিক্ষা দীক্ষার ব্যাপারে আমি খুব কড়া নজর রাখতাম। এরা আমার কাছে জবাবদিহি করতে হত। বিশেষ করে আমি

আমিনকে বেশী শাসন করতাম। কয়েকদিন পর খলীফার বিবি যুবায়দা খালিসাহ নাম্নী এক দাসীকে আমার নিকট প্রেরণ করেন। দাসী এসে বলল যে, বেগম যুবায়দা আপনাকে সালাম জানিয়েছেন এবং বলেছেন যে, আমার ছেলে আমীনের সাথে নম্র ব্যবহার করবেন। কারণ সে আমার কলিজার টুকরা ও চোখের তারা। আমিও তাকে ভালবাসি ও উদার ব্যবহার করে থাকি। ইমাম কূসাই বললেন যে, মুহাম্মদ আমীনতো তার পিতার স্থলাভিষিক্ত হবে। দুর্বল করে তাকে গড়ে তুললে চলবে না। দাসী খালিসাহ বলল মহামান্য বেগম এজন্য আমীনের প্রতি দূর্বল যে, মামুনের জন্মের রাত তিনি স্বপ্নে দেখেন যে চার জন মহিলা এসে তাকে ঘিরে ফেলেছে। স্বপ্নে সম্মুখের মহিলাটি বলছে এছেলে বুদ্ধিমান বাদশাহ হবে। কিন্তু তার বয়স অতি অল্প হবে। দাম্বিক, অদূরদর্শী হবে। আর সে হবে উদাসীন। রাজত্বের ব্যাপারে তার কোন আগ্রহ থাকবে না। পেছনের মহিলাটি বলল সে হবে নির্লজ্জ অপব্যায়ী, নীতিজ্ঞানহীন। ডান দিকের মহিলাটি বলল সে হবে অহংকারী, পাপী, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী, চক্ষুলজ্জাহীন বাদশাহ। বাম দিকের মহিলা বলল সে হবে গাদ্দার, রাজ্য ধ্বংসকারী। এ স্বপ্ন শুনে খলীফাহ কাঁদতে আরম্ভ করল এবং বলতে লাগল ইমাম সাহেব কি ভাগ্য নিয়ে সে জন্ম গ্রহণ করল। সুতরাং বেশী সময় যেতে পারেনি। মামুনুর রশীদ আমিনকে পদচ্যুত করল এবং তাহের ইবনে হুসাইন হারসামা ইবনে হুসাইনকে সাথে নিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। যুদ্ধের ময়দান থেকে ফিরে এসে কয়েকদিন পরই বাগদাদে আমিনকে অবরোধ করা হল। আক্রমণ পাল্টা আক্রমণ চলল। অবস্থা বেশামাল হয়ে উঠল। শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থান বিরান হতে লাগল। বদমাশ এবং ধোকাবাজরা লুটপাট আরম্ভ করল। এ অবরোধ এক বছর স্থায়ী ছিল। আমিনের অবস্থা অত্যন্ত নাজুক হয়ে পড়ল। তার অধিকাংশ সাথীবর্গ পালিয়ে গেল। এ সময় তাহের সাধারণ লোকের কাছে পত্র লিখে তাদেরকে ভয় দেখাল যে, তারা আমাদের সহায়তা করবে। তার আনুগত্য না করলে বিপদ আছে। লোকেরা বলল ঠিক আছে খলীফা আমীনকে অপসারণ করা হউক। এর থেকে মুহাম্মদ আমীনের সঙ্গী সাথীরা বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল। এরপর তাহের জাফরের শহর অবরোধ করল। আহার্যের বস্তুতে বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করল। লোকেরা ক্ষুৎ পিপাসায় মৃত্যুবরণ করতে লাগল। এ ঘটনা মুহাম্মদ আমিন অবগত হওয়ার পর তিনি হারসামা ইবনে উয়াইনাকে পাঠিয়ে নিরাপত্তা

চাইলেন। এবং বলে দিলেন যে আমি নিজেই তোমাদের নিকট আসছি। বিস্তারিত অবস্থা যখন তাহের অবগত হলেন তখন তার বিশ্বাস হলনা যে, কোথায় যুদ্ধের ঢামাঢোল। যাক হারসামাকে আটক করা ঠিক হবে না।

১৮৯ হিঃ ২৫ শে মহররম মুহাম্মদ আমীন হারসামা ইবনে উয়াইনার নিকট এলেন। এসময় হারসামা যুদ্ধ জাহাজে আরোহী ছিলেন। তিনিও হারসামার সাথে জাহাযে আরোহন করলেন। তাহের ইবনে হুসাইন আমিনের জন্য সুযোগ খুঁজতে ছিল। সুযোগ বুঝে তাহেরের সাথীরা নৌকায় পাথর মারতে আরম্ভ করল। সুতরাং যারা নৌকায় ছিল তারা সবাই ডুবে গেল। অবস্থা দেখে আমীন কাপড় গোলা করে তার উপর ভর করে সাঁতরে তীরে উঠলেন। তাহেরের সাথীরা আমীনকে গ্রেফতার করল। আমীনকে ঘোড়ায় চড়িয়ে তাহেরের নিকট আনা হল। তাহের একদল লোককে আমীনের প্রাণ সংহারের আদেশ করলেন। তারা গিয়েই আমিনের উপর আক্রমণ করে বসল। তার মাথা কেটে আলাদা করে ফেলা হল। মাথা তাহেরের নিকট আনা হলে তাহের কর্তিত মস্তক মাটিতে পুতে ফেলল। এরপর তাহের আংটি ও আল খেল্লা নবী করীম (সাঃ) এর চাদরের সহিত মামুনের নিকট প্রেরণ করল। মামুনের কাছে প্রেরণ করতেই মামুন কৃতজ্ঞতার সেজদা আদায় করে এবং হত্যাকারীকে এক লক্ষ দেরহাম পুরুস্কার দেয়া হয়।

ইমাম আসমায়ী কর্তৃক মামুন ও আমীনের সাক্ষাৎকার:

আসমায়ী বলেন, আমি প্রায় এক বছর যাবৎ বসরায় অবস্থান করছিলাম। একদা আমি হারুনুর রশীদের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে গেলাম। যথা নিয়মে সম্মান প্রদর্শন করলাম। হারুনুর রশীদ আমাকে বসতে ইঙ্গিত করায় আমি বসে গেলাম। আমি আবার দাড়ালাম। খলীফা আমাকে ইশারায় বসিয়ে দিলেন। তখন মানুষ কমে গেল। হারুনুর রশীদ বললেন ওহে আসমায়ী, তুমি আমার ছেলেদের দেখতে ইচ্ছে কর না। আসমায়ী বললেন অবশ্যই আমি তাদেরকে দেখতে চাই। আমি তাদেরকে ভালবাসি। তাদেরকে দেখতে এসেছি। তখন হারুনুর রশীদ তাদেরকে আনার জন্য আদেশ করেন। কাউকে পাঠিয়ে দুভাইকে আনালেন। আসমায়ী বললেন, বাচ্চা দুটি এমন সুন্দর যে, যেমন তারা আকাশের চাঁদ। তারা আস্তে আস্তে কাছে এলো। তাদের চোখ যেন যমীন আলোকিত করে রেখেছে।

তারা এসে পিতার নিকট অত্যন্ত ভদ্রভাবে দাঁড়িয়ে গেল। হারুনুর রশীদ তাদেরকে ইশারায় বসিয়ে দিলেন। মুহাম্মদ আমীন ডানে এবং আব্দুল্লাহ মামুন বাম দিকে বসে গেলেন।

হারুনুর রশীদ বললেন, এখন আপনি তাদেরকে শিষ্টাচার সম্পর্কে প্রশ্ন করুন। তারা জবাব দিবে। ইমাম আসমায়ী বলেন আমি তাদেরকে কোন প্রশ্ন করা মাত্রই তারা দ্রুত জবাব দিয়ে দেয়। হারুনুর রশীদ বলেন এদের ব্যাপারে আপনার মতামত? আসমায়ী বললেন জনাব, এদের মত বুদ্ধিমান ও স্মরণ শক্তি আর অন্য কোন শিশুকে দেখিনি। আল্লাহ্ পাক এদের দীর্ঘায়ূ দান করুন এবং তাদের নম্রতায় মাখলুক উপকৃত হউক। এমন সময় হারুনুর রশীদ এদেরকে বুকে জড়িয়ে চুমু খেলেন। এরপর হারুনুর রশীদ কাঁদতে আরম্ভ করলেন। চোখের জলে সাদা দাড়ী ভিজে যাচ্ছিল। এর পর এই দুই ছেলেকে চলে যাবার অনুমতি দেন। তারা উঠে দাড়িয়ে রইল। হারুনুর রশীদ বলল হে আসমায়ী! সে সময় এদের অবস্থা কি হবে, যখন এরা পরস্পর পরপস্পরকে সক্র মনে করবে। উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ হবে! ররক্ত প্রবাহিত হবে! অনেক লোক এমন আছে যে, তারা চায় যদি আমি না থাকতাম তাহলে কতইনা ভাল হত। ইমাম আসমায়ী বলেন, আমি বললাম এমন অবস্থা সৃষ্টি হবে মর্মে কোন জ্যোতিষী অথবা কোন আলেম কি আপনাকে বলেছেন? হারুনুর রশীদ বলেন না, তবে উলামায়ে কেরাম অসিয়তকারীদের থেকে এবং যারা অসিয়ত করেছেন তারা নবীদের কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন।

ঐতিহাসিকগণ বলেন খলীফা মামুনুর রশীদ তার শাসনামলে বলতেন যে, আমাদের দুই ভায়ের মধ্যে যে সমস্ত কথা হয়েছে সেগুলো তখন উপস্থিত মুসা ইবনে জাফর আমাদের পিতা হারুনুর রশীদ এর নিকট বলা হয়েছিল।

মামুনুর রশীদের জন্মের ঘটনা:

উয়ূনুত্তারিখে উল্লেখ আছে যে, একদা খলীফা মামুন আমিনের মা যুবায়দার নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। মামুন দেখলেন যে, যুবায়দা ঠোট নাড়িয়ে কি যেন বিড় বিড় করে বলছেন। মামুন বললেন মা আপনি আমার জন্য বদদোয়া করছেন? কারণ আমি আপনার ছেলেকে হত্যা করে রাজ্য কেড়ে নিয়েছি এ কারণে? যুবায়দা বলেন না তো। মামুন বললেন তাহলে আপনি কি বলছিলেন?

যুবায়দা বলেন, খলীফা দীর্ঘজীবী হউন প্রয়োজন মনে করেছি তাই ঠোট নাড়িয়েছি। মামুন বললেন না না নিশ্চয় আপনি কিছু না কিছু বলছিলেন। এবার তিনি বললেন, আমি বলতেছিলাম যে, অপারগ অবস্থায় অমঙ্গল হউক। মামুন বললেন না তা কেমন করে? যুবায়দা বললেন ঘটনা হল একদিন আমিও হারুনুর রশীদ (তোমার পিতা) অবসরে দাবা খেলা খেলতেছিলাম। খেলায় তিনি জিতে গেলেন আর আমি হেরে গেলাম। তিনি আমাকে আদেশ করলেন উলঙ্গ হয়ে প্রাসাদ ঘুরে আস। আমি তার কাছে মাফ চাইলাম। তিনি অপারগতা প্রকাশ করলেন। কি করব তার আদেশ তামিল করে রাজ প্রাসাদ ঘুরলাম। কিন্তু ব্যাপারটি আমাকে বার বার পীড়া দিচ্ছিল। আবার খেলতে আরম্ভ করলাম। এবার আমি জিতে গেলাম, তিনি হেরে গেলেন। আমি তাকে বললাম, এখন আপনি বাবুর্চি খানায় গিয়ে সবচেয়ে কুশ্রী দাসীর সহিত সঙ্গ করতে হবে। তিনিও আমাকে বললেন ক্ষমা করে দেয়ার জন্য। আমি তাকে ক্ষমা করলাম না। এ কাজ ব্যতীত তিনি আমাকে মিশর ও ইরাকের যাবতীয় কর দিয়ে দেয়ার জন্য প্রস্তাব করলেন। কিন্তু আমি তা কিছুতেই মানলাম না। একাজ তাকে করতেই হবে বললাম। আবার তিনি অস্বীকৃতি জানালেন। আমি তার উপর চাপ প্রয়োগ করতে থাকলাম এবং তার হাত ধরে বাবুর্চি খানায় নিয়ে গেলাম। সেখানে তোমার মা ব্যতীত অন্য কাউকে কুশ্রী দাসী পেলাম না। আমি তাকে বললাম আপনি তার সাথে সঙ্গম করুন। তিনি তার সাথে সঙ্গম করলেন। এতে তুমি জন্ম নিলে। এরপর আমার ছেলে আমিন হত্যা ও তার রাজত্ব কেড়ে নেয়ার ঘটনা ঘটল। যখন মামুনকে খলীফা নিযুক্ত করা হয়েছিল তখন তিনি একথা বলছিলেন যে, আল্লাহ তাআলা অপারগতার অমঙ্গল করেন, এটিই বলছিলাম।

আমিনের পরলোকগমন ও খেলাফত:

আমিন ২৮ বছর বয়সে ইন্তকাল করেন। তিনি ছিলেন লম্বাটে, অত্যন্ত সুন্দর। ৪ বছর ৮মাস ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। কারো কারো মতে ৩ বছর। মামুনকে রজব মাসে অপসারণ করা হয়। এ হিসাবে তার মৃত্যু পর্যন্ত তার শাসন কয়েক মাস কম ৫ বছর। মামুন অনর্থক কাজে ধন সম্পদ ব্যায় করতেন। অথচ ইহা খেলাফতের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিল। তিনি খেল-তামাশায়, গান-বাজনায় এবং বিলাসী বস্তুর প্রতি অধিক মনোযোগী ছিলেন। কোন কবি বলেন

اذا غدا ملك بالهو مشتغلا ☆ فاحكم على ملكه بالويل والخرب

"বাদশাহ যখন নিরর্থক কর্মে লিপ্ত হয়ে গেলেন তখন রাজ্যে ধ্বংস এবং অশান্তি ছেয়ে গেল।

اما ترى الشمس فى المزان هابطة ☆ لما غداو هو برج اللهو والمطرب

"তুমি কি দেখ না যে, সূর্য মিযানের উপর নেমে এসেছে। তুমি যখন তাড়াহোড়া করছ তখন সে হাসি ঠাট্টায় এবং নেশায় উন্মত্ত ছিল।"

আব্দুল্লাহ আল মামুনের শাসনামল:

মুহাম্মদ আমিনের পর তার ভাই আব্দুল্লাহ মামুন সিংহাসনে সমাসীন হন। মুহাম্মদ আমিনকে হত্যা করা হয় রাতে। সকালে সাধারণ জনগণ তার নিকট বাইয়াত গ্রহণ করেন। একমাত্র স্পেনের গভর্নর ব্যতীত সকলেই তার বাইয়াত গ্রহণ করে। এর আগে ও পরে আব্বাসী বংশের শাসকরা দূরে হওয়ার কারণে স্পেনের গভর্ণরগণ তাদের আনুগত্য স্বীকার করেনি।

অখবার ত্বিওয়ালে উল্লেখ আছে যে, মামুন ছিলেন অত্যন্ত বিচক্ষণ দুরদর্শী, শক্তিশালী, ধৈর্যশীল। কেউ কেউ লিখেছেন যে, মামুন ছিলেন জ্যোতিষী। তিনি দর্শন শাস্ত্রেও কিছু কিছু জ্ঞান রাখতেন। এছাড়া অন্যান্য বিদ্যায়ও তিনি পারদর্শী ছিলেন। জ্যামিতি শাস্ত্রের গোড়াপত্তন তার হাতেই হয়। জ্যামিতি শাস্ত্র আরবীতে অনুবাদ করার আদেশ জারী করেন এবং ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করারও পরামর্শ দেন। মামুনই বহসের গোড়াপত্তন ঘটান। তার তর্ক শাস্ত্রের উস্তাদ ছিলেন আবুল হুযাইল মুহাম্মাদ ইবনে হুযাইল বসরী মুতাযেলী। তাকে ইলাফও বলা হত। মামুনের শাসনামলেই খলকে কুরআনের ফিৎনা সৃষ্টি হয়। কেউ কেউ বলেছেন হারুনুর রশীদের যুগ থেকে এর সূচনা হয়। মুমানের যুগে তা পূর্ণভাবে বিস্তৃতি লাভ করে। কিন্তু তার শাসনের শেষ দিকে ফিতনা প্রায় শেষ হয়ে যায়। খালকে কুরআনের ব্যাপারে লোকেরা তওবাহ করে। কিন্তু অধিকাংশ লোক এই মাসআলার ব্যাপারে মনকে শান্তনা দিতেন।

খলীফা মামুনের যুগে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) যিনি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের লোক ছিলেন তিনি কুরআনকে সৃষ্টি বলে স্বীকার করতেন না। এ জন্য মামুন তাকে বন্দী করার আদেশ দেন। তিনি মামুনের কাছে পৌছার আগেই মামুন ইন্তিকাল করেন। ঐতিহাসিকগণ বলেন মামুন আল

জাজিরাহ এবং সিরিয়াতে গিয়ে বেশ কয়েক দিন অবস্থান করেন এবং তিনি রোম জয় করেন। এছাড়াও তিনি অনেক বিজয় অর্জন করেন এবং অনেক উত্তম উত্তম কাজ আঞ্জাম দেন।

মামুনুর রশীদের পরলোক গমন:

তিনি ২১৮হিঃ অথবা ৮ই রজব নাহরবরদীতে পরলোকগত হন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৯ বছর। কারো কারো মতে ৩৯ বছর। তবে প্রথম মতই অধিক সত্য বলে বিবেচিত। তাকে তুরতুস নামক স্থানে দাফন করা হয়। মামুন জ্যোতিষ শাস্ত্র ব্যতীতও অন্যান্য বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন।

ঐতিহাসিক ইবনে খাল্লেকান বলেন খলীফা মামুন ক্ষমাশীল দয়ালু লোক ছিলেন। নাহু শাস্ত্রসহ অন্যান্য শাস্ত্রেও তিনি পারদর্শী ছিলেন। মামুন বলতেন মানুষ যদি জানত যে, মামুন ক্ষমার মধ্যে আনন্দবোধ করেন তাহলে অপরাধ করে সোজা আমার নিকট এসে ভীড় জমাতো। তাছাড়া ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন যে, আব্বাসীয়দের মধ্যে মামুনের চেয়ে আর কোন বড় আলেম ছিলেন না। বিশেষ করে মামুন জ্যোতিষ বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। কবি বলেন:

هل علوم النجوم اغنت عن الما☆ مون شبباو ملكه المانوس

"জ্যোতিষ শাস্ত্র ও তার সাথে সম্পর্কযুক্ত বস্তু কি খলীফা মামুনের রাজ্যের সামান্য সময়ের জন্যও কি অমুখাপেক্ষী থাকতে পারে?"

خلفوه بساحتى طرسوس☆ مثل ما خلفوا اباه بطوس

"মানুষ মামুনকে এলাকা ত্বাসুসের স্থলাভিষিক্ত বানিয়ে দেয় যেমন তাঁর পিতাকে তৌস এর শাসনে সমাসীন করেন।"

মামুন অত্যন্ত সুন্দর, কমনীয়, স্বাভাবিক গড়ন, লম্বা দাঁড়ী বিশিষ্ট দানবীর, দ্বীনদার, শিক্ষানুরাগী, জ্ঞানী এবং রাজনীতিবিদ ছিলেন।

ইব্রাহীম আল মু'তাসিম এর শাসনামল:

মামুনুর রশীদের পর তার ভাই আবু ইসহাক ইব্রাহীম মুতাসিম ইবনে হারুন ক্ষমতায় আসেন। মামুনের ইন্তিকালের দিনই তাঁর বাইয়াত নেয়া হয়। মুতাসিম ক্ষমতায় এসেই সর্বপ্রকার অসৎ আড্ডাখানা ধ্বংস করার আদেশ দেন। শহরের চতুস্পার্শে সৈন্য মোতায়েন করেন। বেশ কয়েকদিন শহর ছিল অবরুদ্ধ।

ঐতিহাসিকগণ বলেন আব্বাসীয় বংশে মুতাসিমের মত সাহসী, বীর ও শক্তিশালী আরেকজন ছিল না। একদা মুতাসিম সকালে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে দেখলেন শৈত্যপ্রবাহ বইছে। হাত বের করারও করো সাহস নেই। সেদিন মুতাসিম ৪ হাজার কামানের সর সংযোজন করেছিলেন। পুরা শহর তিনি অবরোধ করলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি রাজধানী দখল করে ফেলেন। অনেক ধন দৌলত হাতে আসে। শহরবাসীকে বন্দী করা হয়।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের প্রেফতার এবং জেল খানার নির্যাতন:

মুতাসিম সিংহাসনে বসেই সত্বর ইমাম আহমদ বিন হাম্বলকে উপস্থিত করতে আদেশ করেন। সে সময় তিনি মামুনের জেলখানায় বন্দী হয়ে অসহনীয় জালা যন্ত্রনা ভোগ করতে ছিলেন। মুতাসিম তার কাছে কোরআন সৃষ্টির ব্যাপারে ইন্টারভিউ নেন। যার বিস্তারিত আলোচনা একটু পরেই আসছে। ঘটনা হল হারুনুর রশীদ তার আমলে কোরআন সৃষ্টির সমর্থক ছিলেন না। এ জন্য ফুজাইল ইবনে আয়াজ হারুনের দীর্ঘায়ূ কামনা করে দোয়া করেছিলেন। এ জন্য তিনি চিন্তা করলেন যে, কোরআন সৃষ্টির বিপর্যয় হারুনের ইন্তিকালের পর মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। এছাড়া এ ধরনের যে কোন বিপর্যয় হারুনের শাসনামালে ঘটেনি। তবে হারুনের শাসনামলে কোরআন সৃষ্টির ব্যাপারে লোকেরা সন্দিহান ছিল। কখনো গ্রহণ কখনো বর্জন করতেন। হারুনুর রশীদের পর তার ছেলে মামুনকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়।

মামুন ক্ষমতায় এসে কোরআন সৃষ্টির পক্ষাবলম্বন করেন। কোন কোন সময় সাধারণ মানুষকে তার মতামত গ্রহণ করার আহবান জানাতেন আবর বর্জনেরও আহবান জানাতেন। মামুনের ইন্তিকালের বছর তিনি কোরআন সৃষ্টির পক্ষে শক্ত কঠোর হয়ে যান। তিনি এবার কোরআন সৃষ্টির দিকে মানুষকে আহবান করতে লাগলেন। যে ব্যক্তি কোরআন সৃষ্টির সমর্থন না করতেন তাকে জ্বালা যন্ত্রনা দিতেন। এ সময় ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ও তাঁর সমর্থকদেরও জ্বালা যন্ত্রনা দেন। মামুনের হুকুমে ইমাম সাহেবকে জেলখানায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল এমতাবস্থায় মামুনের ইন্তিকাল হয়ে গেল। এরপর তার ভাই মুতসিম শাসক নিযুক্ত হন। মামুন তাকে ওসীয়ত করেছিলেন যে, তুমি কোরআন সৃষ্টির সমর্থন করবে এবং জনসাধারণকে এপথে আহবান করবে। ইমাম আহমদ ইবনে

হাম্বল ধারাবাহিকভাবে জেলখানায় বন্দী ছিলেন। এ সময় মুতাসিমকে খলীফা নিযুক্ত করা হয়। মুতাসিম খলীফা নিযুক্ত হয়েই ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলকে বাগদাদে হাজির করার আদেশ করেন। বাহাসের মঞ্চ তৈরী করা হল। প্রতিপক্ষ ছিলেন আব্দুর রহমান ইবনে ইসহাক এবং কাজী আহমদ ইবনে দাউদ প্রমূখ। এদিকে ইমাম আহমদ (রহঃ) একা। চারদিন ব্যাপী তর্ক বিতর্ক চলল। শেষ পর্যন্ত খলীফা মুতাসিম আহমদ বিন হাম্বলকে বেত্রাঘাতের আদেশ করেন। বেত্রাঘাতে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েন। এতেও খলীফা শান্ত হতে না পেরে তলোয়ার এবং তীরের সাহায্যে তাকে মারতে থাকেন। কিন্তু ইমাম সাহেব তবু সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হননি। তাকে তার ঘরে পৌছে দেয়া হয়। তিনি জেলখানার ২৮ মাস ছিলেন। এরপর থেকে তিনি জুমা ও পাঞ্জেগানা নামাজে হাজির হতে থাকেন। তিনি নিয়মিত ফতোয়া দিতে থাকেন। এদিকে মুতাসিমের ইন্তিকাল হয়ে গেল।

আল ওয়াসিক এর কঠোরতা এবং মাতাওয়াক্কিলের পুরস্কার ও সম্মান:

মুতাসিমের পর আল ওয়াসিককে খলীফা নির্বাচিত করা হয়। তিনি ক্ষমতায় এসে মুতাসিমের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে থাকেন। ওয়াসিক ইমাম আহমদ বি হাম্বলকে বলেন যে, আপনার কাছে কোন মানুষই আসবে না। এমন কি আমি যে শহরে বসবাস করি আপনি সে শহরেও থাকতে পারবেন না। একথা বলার পর ইমাম সাহেব গোপনীয় ও ভয়ের জীবন কাটাতে থাকেন। নামায ও অন্যান্য কাজের জন্য বের হতেন না। এ অবস্থায় ওয়াসিকেরও মৃত্যু হল। ওয়াসিকের মৃত্যুর পর মুতাওয়াক্কিল সিংহাসনে আরোহন করেন। মাতাওয়াক্কিল ইমাম সাহেবের যাবতীয় বাধা বিপত্তি ও বাধ্যবাধকতার অবসান ঘটান এবং তাঁর কাছে চলে আসার জন্য ডেকে পাঠান। অধিকন্তু ইমাম সাহেবকে নানা পুরস্কার দেয়ারও আদেশ করেন। কিন্তু ইমাম সাহেব তা গ্রহণ করন নি। বরং তা ফকীর মিসকীনদের মধ্যে বিতরণ করেদেন। তাছাড়া মাতাওয়াক্কিল ইমাম সাহেবের পরিবার পরিজনের জন্য মাসিক ৪০০০ হাজার টাকা খরচ করতেন। কিন্তু ইমাম সাহেব তাতেও খুশী ছিলেন না।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের প্রতি খলীফা মুতাসিমের কঠোরতা:

জনৈক ইরাকী ইতিহাসবিদ থেকে বর্ণিত যে, ইমাম আহমদ ইবনে

হাম্বলের সাথে তিন দিন ধরে বাহাস হচ্ছিল। খলীফা মুতাসিম ইমাম সাহেবকে নির্জনে ডেকে নিয়ে বলেন যে, আল্লাহর কসম! ইমাম আহমদ! আমি আপনাকে এতই ভালবাসি যেমন ভালবাসি হারুন ওয়াসিককে। শুধু বলুন কোরআন সৃষ্টি। চুপে চুপে আমার কাছে বলুন । যদি আপনি তা একবার বলেন তাহলে আমি আপনার হাতের বন্ধন মুক্ত করে দেব। আপনাকে আমার বাহিনীর সাথে সওয়ার করিয়ে আপনার ঘরের দরজা পর্যন্ত পৌছে দেব। ইমাম সাহেব জবাব দিলেন বেশী কথা আমি পছন্দ করিনা। যদি আমাকে আল্লাহর কোরআনের এবং হাদছির কয়েকটি পাতা দেয়া হয় তাহলে উপকার হবে। কিন্তু আলোচনা যখন দীর্ঘ হতে লাগল আর ফলাফল শূন্য হল, তখন ইমাম সাহেবকে ধিক্কার দিতে লাগলেন এবং মুতাসিম ইমাম সাহেবকে ধমকিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। পূর্বে যেখানে ইমাম সাহেব ছিলেন সেখানে চলে যাবার আদেশ করলেন। মুতাসিমের দূত ইমাম সাহেবকে বারবার বলতেছিল ওহে ইমাম সাহেব কোরআনের ব্যাপারে তার যে ধারণা তার স্বীকৃতি আপনার দ্বারা নেয়ার চেষ্টা করলেন মাত্র। এতে দোষ কি আছে? ইমাম সাহেব আগের জবাবই পুনরাবৃত্তি করলেন।

তৃতীয় দিনেও ইমাম আহমদ বিন হাম্বলকে আলোচনার জন্য আহবান করা হল। মুতাসিমের দরবারে তাকে উপস্থিত করা হল। খলীফার দরবারে পূর্ব থেকেই মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল মালেক আযযিয়াত এবং কাজী আহমদ দাউদ বসাছিল। মুতাসিম নির্দেশ দিলেন যে, আপনারা তার সাথে আলোচনা করুন। খলীফার আদেশমত তারা বাহাস আরম্ভ করেন। এক পর্যায়ে তারা বলল হে আমীরুল মুমিনীন সে কোরআন সৃষ্টি মানতে চান না। আপনি তাকে হত্যা করে এর রক্ত আমাদের গায়ে ঢেলে দিন। একথা শুনে মোতাসিম ইমাম সাহেবকে এমন জোরে থাপ্পর মারলেন যাতে তিনি অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটে পড়লেন। এ অবস্থা দেখে খুরাসানের গভর্নরের চেহারা বদলে গেল। সম্ভবত তিনি ইমাম সাহেবের চাচা ছিলেন। অবস্থা দেখে মুতাসিম ভয় করতে লাগলেন। পরে পানি এনে তার চেহারায় ছিটিয়ে দেয়াতে তাঁর জ্ঞান ফিরে এল। জ্ঞান ফিরে আসতেই চাচাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, চাচাজান আমার চেহারায় যে পানি ঢালা হল সম্ভবত যিনি ঢাললেন তিনি আমার উপর সন্তুষ্ট হয়ে গিয়েছেন। একথা শুনে মুতাসিম বলল তোমার অমঙ্গল হউক তুমি কি দেখছ না? তা দেখতে জনতা ভিড় করছে? আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সঃ) এর সাথে আমার কোন বৈরীতা

নেই। ইমাম সাহেবের উপর চাবুক উঠা নামা করতে শুরু করবে, যতক্ষণ না তিনি বলেন যে, কুরআন সৃষ্টি। মুতাসিম ইমাম সাহেবের দিকে ফিরলেন। ইমাম সাহেব কিন্তু প্রথম জবাবেই অটল। মুতাসিম ইমাম সাহেবকে ধমকাতে লাগলেন। লোক সমাগম বাড়তে লাগল। মুতাসিম বললেন তোমার উপর আল্লাহর লানত বর্ষিত হউক। ভেবে ছিলাম তুমি কুরআন সৃষ্টি একথা মেনে নিবে। খলীফা তার লোকদের আদেশ করলেন যে, তার গায়ের যাবতীয় কাপড় খুলে তাকে মাটির উপর দিয়ে টানা হেচড়া করা হোক। আদেশ মতই ইমাম সাহেবকে যমিনে টানা হেচড়া করতে লাগল। ইমাম আহমদ বলেন যে, আমার নিকট নবী করীম (সাঃ) এর চুল মোবারক আছে যা আমার জামার আস্তিনের নীচে থাকে। তিনি বলতেন আমার নিকট কোন কোন মানুষ আসতো চুলগুলো জ্বালিয়ে দেবার জন্য। মুতাসিম বলল, সাবধান চুলগুলো পুড়বেনা। বরং এগুলো তার জামার নীচে থেকে নিয়ে নাও। ইমাম আহমদ বলেন, নবী করীম (সাঃ) এর চুল মোবারকের বরকতে আমার জামা পুড়ে যাওয়া থেকে রক্ষ পায়। লোকেরা আমার হাত বেধে রাখত আর জামা খুলে ফেলত। ইমাম আহমদ তার জীবনের অধিকাংশ সময়ই বিপদাপদ বালা মুসিবতে অতিবাহিত করেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর ইন্তিকাল হয়। মুতাসিম জল্লাদকে বললেন যে তুমি একটু সামনে যাও এদিকে প্রহারকারী বললেন ইমাম সাহেবকে আমার নিকট নিয়ে এসো। তাকে মন্দ বলতে থাক, কষ্ট দিতে থাক। আল্লাহ তোমার হাত টুকড়া টুকড়া করে দিন। তখন সে আগে এসে দুটি চাবুক মেরে চলে গেলে অপরজনকে খলীফা বলতেন তুমি তাকে গাল মন্দ করতে থাক। । আল্লাহ তোমার হাত টুকড়া টুকড়া করে দিন। তখন সে চাবুক দিয়ে দুটি আঘাত করে চলে যেত। এভাবে মুতাসিম বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জনকে ডেকে ডেকে চাবুক মারত। তারপর মুতাসিম ইমাম সাহেবের নিকট আসলেন। জনগণ ইমাম সাহেবের চতুর্দিকে ভীড় করে বলতে লাগল হে আহমদ তুমি কি নিজেকে পিদে ফেলে দিতে চাচ্ছ? ভাল করে জবাব দাও। তাহলে তোমার হাতের বন্ধন আমি খুলে দেব। এমন সময় কিছু কিছু লোকে বলতে লাগল ইমাম সাহেব, আপনার বাদশাহ আপনার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। আপনি জবাব দিন এবং সে হালকা পাতলা লোকটিকে তলোয়ারে অগ্রভাগ দিয়ে আহত করা হবে। মুতাসিম তাও বলছেন যে, হে আহমদ তুমি কি চাও যে, এ সমস্ত লোক ধ্বংস হয়ে যাক।?

কেউ কেউ বলছিল হে আমীরুল মুমিনীন আপনি তার রক্ত আমাদের উপর ঢেলে দিন। কিছুক্ষণ পর মুতাসিম চেয়ারে গিয়ে বসে পড়লেন। তারপর জল্লাদকে বললেন তুমি একে গালমন্দ করতে থাক। মুতাসিম আবার আসলেন। জল্লাদকে বললেন তার উপর আরো কঠোরতা আরোপ কর। ইমাম আহমদ বলেন আমি এতটুকুই জানি যে, আমি একটি নির্জন কক্ষে বন্দি। অন্যথায় আমার জ্ঞান লোপ পেয়ে যেত। আমার উপর এ সমস্ত বিপদাপদ আসছিল রোজা অবস্থায় । একদিন তাকে ১৮ টি বেত্রাঘাত করা হল। মারার কারণে তার বোঝাহালকা হয়ে গেল। এবং তার দুহাত নাড়াতেই বন্ধন মুক্ত হয়ে গেল। আবার বাঁধা হল।

যখন এ বিপদ থেকে তিনি মুক্ত হয়ে গেলেন তখন লোকেরা তাঁকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন যে, তখন আমি আল্লাহ তাআলার নিকট দোয় করতে ছিলাম যে, اللهم ان كنت على الحق فلا تفضحن

হে আল্লাহ আমি যদি সত্য পথে থাকি তাহলে আমাকে অপমানিত করো না। এ সমস্ত ঘটনার পর মুতাসিম একজন পাহারাদার মনোনীত করলেন যে চিকিৎসাও জানত। সে চিকিৎসা করতে লাগল। চিকিৎসক বলেন যে, আমি ইমাম সাহেবের শরীরে ১০০০ হাজার চাবুকের আঘাত দেখলাম। এতবেশী আঘাত আমি ইতিপূর্বে কারো শরীরে দেখিনি। এতসব চাবুকের আঘাত শরীর থেকে মুছে যাওয়ার পূর্বেই ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ইন্তিকাল করেন।

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) এর স্বপ্ন:

বর্ণিত আছে যে, ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) মিশরে থাকাকালীন একদিন স্বপ্নে নবী করীম (সাঃ) কে দেখেন। নবী (সাঃ) ইমাম শাফেয়ীকে বলছেন যে, তুমি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলকে বেহেশতের সুসংবাদ দিও। এ সুসংবাদের কারণ ছিল তাঁর ঐসকল কীর্তি যেগুলো তিনি কোরআন সৃষ্টি কি সৃষ্টি নয় এ ব্যাপারে কষ্ট ক্লেশ সহ্য করেছেন । ইমাম ইহমদ বিন হাম্বলকে যে কোন সময়ই প্রশ্ন করা হলে তিনি বলতেন কোরআন আল্লাহর সৃষ্টি নয় বরং এটি আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।

ইমাম শাফেয়ী স্বপ্ন থেকে জাগ্রত হয়ে একখানা পত্র লিখে রবী নামক এক ব্যক্তিকে দিয়ে ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের কাছে বাগদাদে প্রেরণ করেন।

বাগদাদে পৌছে রবী সোজা ইমাম আহমদের বাড়ীতে আসেন। সে অনুমতি চাইলে তিনি অনুমতি দেন। রবি ঘরে প্রবেশ করে বললেন এই পত্র আপনার ভাই ইমাম শাফেয়ী আমাকে দিয়ে আপনার খেদমতে পাঠিয়েছেন। ইমাম আহমদ (রহঃ) বললেন, রবি তুমি জান এতে কি আছে? জবাব দিল না জানি না। ইমাম আহমদ পত্রখানি পড়লে তার চোখ দিয়ে অঝোর ধারায় পানি পড়তে লাগল। তিনি বললেন ماشاء الله لا حول ولا قوة الا بالله

তিনি বললেন তাতে কি লিখা হয়েছে, রবি জবাব দিল এতে আপনার পুরস্কার রয়েছে। এ সময় ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের গায়ে দুটি জামা ছিল। যে জামাটি ইমাম সাহেবের গায়ে ছিল তা খুলে ইমাম শাফেয়ীকে উপহার দিয়ে দিলেন। জামা পেয়ে রাবি সঙ্গে সঙ্গে মিশরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেল। জামাটি নিয়ে ইমাম শাফেয়ীর কাছে গেলে শাফেয়ী (রহঃ) জিজ্ঞেস করলেন ইমাম সাহেব কি দিলেন? রবি বলল এই জামাটি যা তার চামড়ার (গায়ের) সাথে লেগেছিল। শাফেয়ী (রঃ) বললেন রবি এই জামার ব্যাপারে আমি তোমার খেদমত নিতে রাজী নই। নিজে একে ধৌত করব। সুতরাং তা ধুয়ে এর ফেনারাশি সুগন্ধি হিসেবে তার সমস্ত শরীরে ঢেলে দেন।

মহৎমনা ইমাম আহমদ (রহঃ):

ইব্রাহী হারবী (রঃ) বলেন, দেখুন ইমাম আহমদ বিন হাম্বল কেমন বৃহতৎ অন্তরের লোক ছিলেন যে, যারা ইমাম সাহেবকে প্রহারে অংশগ্রহণ করেছিল অথবা তাকে মারতে দেখে আনন্দ স্ফূর্তী করেছিল অথবা তাকে মারার সময় যারা সহায়তা করেছিল তিনি সবাইকে ক্ষমা করে দেন। কিন্তু আবু দাউদ কে ক্ষমা করেননি। কারণ সে ছিল বিদআতী। ইমাম সাহেব বলেন সে যদি বেদআতী না হত তাহলে তাকেও মাফ করে দিতাম। এখনো যদি সে বিদআত থেকে তওবা করে তাহলে তাকে ক্ষমা করে দেব। আহমদ ইবনে সিনাই বলেন আমার মনে হয় মুতাসিম যখন বাবেল ও উমুরিয়াহ দখল করেন সে দিন তিনি মু'তাসিমকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

নবী করীম (সাঃ) ও মুসা (আঃ) এর সুসংবাদ:

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওয়ারদ বলেন, একদিন আমি নবী করিম (সাঃ) কে স্বপ্নে দেখলাম। আমি নবী করীম (সাঃ) কে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল

(রহঃ) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। নবী করীম (সাঃ) বললেন তোমার কাছে মুসা ইবনে ইমরান (আঃ) আগমন করবেন। তুমি তার কাছে জিজ্ঞেস করিও। এ মুহূর্তে অকস্মাৎ মুসা (আঃ) কে দেখতে পেলাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম হযরত! ইমাম আহমদ কেমন ছিলেন? তিনি বললেন ইমাম আহমদের অবস্থা খুবই ভাল। তাকে বিপদগ্রস্থ করে পরীক্ষা নেয়া হয়েছে। তিনি ধৈর্যের চরম সীমায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। তিনি সত্য বলে প্রমাণিত করেছেন। অতএব তাকে সিদ্দীকীনদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। জনাব মুহাম্মদু রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত মুসা (আঃ) এর দিকে ইঙ্গিত করে যা বুঝাতে চেয়েছেন এতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে ইশারা পাওয়া যায়:

১। উম্মতে মুহাম্মদীকে অন্যান্য উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হিসেবে প্রমাণ করেছেন। হযরত মুসা (আঃ) একজন অতি সম্মানী রাসূল। তাঁর দ্বারা এর প্রমাণ করানো।

২। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল যে উম্মতে মুহাম্মদিয়ার নমুনা ছিলেন এর মধ্যে তার মান সম্মান, তাকে কষ্ট ও বিপদে ফেলে দেয়া হয়েছিল। এর বিনিময়ে তাকে মহা পুরুস্কারে ভূষিত করা হয়েছে। এমনকি নবী করীম (সাঃ) ও তাঁর অবস্থান এবং মান সম্মানের ব্যাপারে সাক্ষ দিয়েছেন।

৩। কুরআন সৃষ্টির বিষয় দ্বারা ইমাম আহমদকে পরীক্ষা করা হয়েছে। কোরআন আল্লাহর কিতাব। আর মুসা (আঃ) কলিমুল্লাহ। তিনি তুর পর্বতে আল্লাহ তাআলার সাথে কথোপকথন করেছেন। হযরত মুসা (আঃ) ভাল করেই জানেন পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ কালাম, সৃষ্টি নয়। এই সম্পর্কের কারণে হুজুর (সাঃ) বলেছিলেন যাতে মানুষ বুঝতে পারে এবং তাদের এ বিশ্বাস জন্মে যে, পবিত্র কুরআন আল্লাহ তাআলার অবতীর্ণ কিতাব, মাখলুক নয়।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের পরিচয়:

ইবনে খাল্লেকান বলেন, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) ১৬৪ হিজরী সানে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২৪১ হিজরী তে ইন্তিকাল করেন। তার নামাযে জানাযায় ৮ লাখ মানুষ ও ৬০ হাজার নারী অংশ গ্রহণ করে। তার ইন্তিকালের দিন ৬০ হাজার ইহুদী এবং অগ্নিপূজক ইসলাম গ্রহণ করে। ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, যে মাঠে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের নামাযে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়েছিল

মুতাওয়াক্কিল সে মাঠ পরিমাপ করার জন্য কাউকে আদেশ করলে ২৫ লাখ গজ জমিন বলে বিবেচিত হয়। তার মৃত্যুতে ৪ টি সম্প্রদায়ের মধ্যে শোকের ছায়া পরিলক্ষিত হয়। সেগুলো হলো মুসলমান, ইহুদী, খৃষ্টান এবং অগ্নিপুজক।

হাদীছ বিশারদ মুহাম্মদ ইবনে খুজাইমা বলেন, ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের ইন্তিকালের সংবাদ শুনে আমি অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে পড়ি। আমি তাকে স্বপ্নে দেখি যে, তিনি খুব শান শওকতের সাথে বিচরণ করছেন। তিনি বললেন এই চাল-চলন বেহেশতী খাদেমদের। আমি তাকে আরো জিজ্ঞেস করলাম যে, আল্লাহ পাক আপনার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? তিনি বললেন আমাকে আল্লাহ পাক ক্ষমা করে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা আমার পা খুলে দিয়ে স্বর্ণের জুতা পরিধান করিয়েছেন। এরপর আল্লাহ পাক বলেন হে আহমদ আমি তোমাকে এ সম্মান এজন্য দান করেছি যে, তুমি আমার কালামকে মাখলুক না বলার উপর অবিচল ছিলে। আল্লাহ তাআলা বালেন হে আহমদ তুমি আমার নিকট সে শব্দাবলী দ্বারা দোয়া করো যে শব্দাবলী দ্বারা সুফিয়ান থেকে তোমার পর্যন্ত পৌছেছে। আর যে সমস্ত শব্দাবলী দ্বারা তুমি দুনিয়াতেও দোয়া করেছিলে। ইমাম আহমদ বলেন- আমি তাড়াতাড়ি দোয়া করলাম:

يارب كل شئ اسئلك بقدرتك على شئ لا تسالنى عن شى واغفر لى كل شئ

"হে আল্লাহ আমি আপনার কুদরতে প্রত্যেকটি বস্তুর ব্যাপারে প্রতিটি ক্ষতিকর বস্তু থেকে আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি। আপনি আমার কাছে কোন বিষয়ে হিসাব নিবেন না। আপনি আমার সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দিন।"

দোয়া শুনে আল্লাহ পাক এরশাদ করেন হে আহমদ উঠ ! এটি বেহেশত, এতে প্রবেশ কর। আমি প্রবেশ করে দেখলাম যে, সুফিয়ান ছওরী বেহেশতে এমন অবস্থায় আছেন , যে তার দুটি ডানা আছে। তিনি একটি খেজুর গাছ থেকে উড়ে উড়ে অপর খেজুর গাছে যাচ্ছেন আর একথা বলে যাচ্ছেন:

الحمد لله الذى صدقتنا وعده واورثنا الارض نتبؤا من الجنة حيث نشاء فنعم اجر العاملين.

"সমস্ত প্রশংসা সে আল্লাহর যিনি আমার সাথে তার কৃত ওয়াদা বাস্তবায়িত করেছেন। যিনি আমাদেরকে যমীনের ওয়ারিছ বানিয়েছেন। বেহেশতে যেখানে ইচ্ছা সেখানেই থাকা যায়। ভাল কর্ম যারা করেন তাদের জন্য

কেমন পুরুস্কার।”

ইমাম আহমদ বলেন, আমি সুফিয়ান ছওরীকে জিজ্ঞেস করলাম, আব্দুল ওয়াহাব আল ওয়ারাক এর সাথে আল্লাহ পাক কেমন ব্যবহার করেছেন? সুফিয়ান বলেন আমি তাকে নূরের সমুদ্রে দেখেছি। নূরের কিস্তিতে বসে আল্লাহ দিদার করছেন। আমি তাকে আবার জিজ্ঞেস করলাম বাশার ইবনুল হারছ এর সাথে আল্লাহ তাআলা কেমন ব্যবহার করেছেন? সুফিয়ান বললেন থামুন! আমি তাকে মানুষের মতই আল্লাহর কাছে দেখেছি। তার সম্মুখে খানার দস্তরখানা বিছানো আছে। তিনি আল্লাহ তাআলার দিকে নিবিষ্ট হয়ে বলছেন

كل يا من لم يأكل واشرب ويا من لم يشرب وانعم يامن لم ينعم

“খাও! যা খাওনি, পান কর যা পান করনি, তৃপ্তিসহ খাও যে বস্তুতে তৃপ্তি লাভ করতে সক্ষম হওনি।”

মুতাসিমের মৃত্যু:

২২৭ হিজরী মুতাসিম শিরায় সিংগা বসায়। এর ক্ষতের কারণে তার জ্বর আসে এবং এতে তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি ৪৭/৪৮ বছর জীবিত ছিলেন। ৮ বছর ৮ মাস ৮দিন সিংহাসনে ছিলেন। তিনি বনু আব্বাসের ৮ ম খলীফা। তার পরিত্যক্ত সম্পদে ৮ হাজার আশরাফী ১০৮ লক্ষ দেরহাম ৮হাজার ঘোড়া, ৮হাজার উট, ৮হাজার খচ্চর, ৮হাজার গোলাম, ৮ হাজার বাদী ইত্যাদি রেখে যান।

এ কারণে মুতাসিমকে ৮ম খলীফা বলা হয়। মুতাসিম ছিলেন অশিক্ষিত বাদশাহ। তার এক ছোট গোলাম ছিল। সে তার কিতাব বহন করত। একদিন সে গোলামের ইন্তিকাল হল। হারুনুর রশীদ বললেন মুতাসিম তোমার গোলামের ইন্তিকাল হয়েছে? মুতাসিম বললেন হ্যাঁ তার ইন্তিকাল হয়েছে। আমি কিতাবের ঝামেলা থেকে মুক্ত হয়েছি। হারুনুর রশীদ বললেন কিতাবের সহিত বেয়াদবী করা তোমার অভ্যাস হয়ে গিয়েছে? হারুনুর রশীদ শিক্ষকদেরকে বলে দিলেন এখন থেকে তাকে আর পড়াবেন না। তাকে তার অবস্থায় থাকতে দিন এজন্য মুতাসিম মুর্খই থেকে যায়।

হারুন ওয়াসিক বিল্লাহর শাসনামল:

খলীফা মুতাসিমের পর তার পুত্র হারুন ওয়াসিক বিল্লাহ ক্ষমতায় আসেন। তার পিতার ইন্তিকালের দিনই অত্যন্ত গোপনীয়ভাবে তার বাইয়াত

নেয়া হয়। অতএব তার বাইয়াতের কথা বাগদাদ পর্যন্ত পৌছে। বাগদাদ ও অন্যান্য এলাকাতে তার শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। হারুন ওয়াসিককে খলীফা নিযুক্তির পর কোরআন সৃষ্টি এর সমর্থক না হওয়ার কারণে আহমদ ইবনে নজর খজায়ীকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। তার মুখমন্ডল পূর্ব দিকে ফিরিয়ে দিলে তা পশ্চিম দিকে ফিরে যায়। এক ব্যক্তিকে একটা শক্ত লাঠি দিয়ে নিযুক্ত করা হল যে সে যদি পশ্চিম দিকে ফিরতে চায় তাকে পূর্ব দিকে ফিরিয়ে দিও। বর্ণিত আছে যে, কোন এক ব্যক্তি আহমদ বিন নজরকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলেন যে, আল্লাহ পাক আপনার সহিত কি রকম ব্যবহার করেছেন? জবাবে তিনি বললেন আল্লাহ পাক অতি দয়া করে আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। তিন দিন যাবৎ আমি খুব চিন্তিত আছি। চিন্তার কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি জবাব দিলেন যে, নবী করীম (সাঃ) আমার পাশ দিয়ে দুবার অতিক্রম করে গেছেন। দুবারই নবী (সঃ) তার নূরানী চেহারা আমার দিক থেকে ফিরিয়ে নিয়েছেন। তাই আমি খুব চিন্তিত ও দুঃখিত হয়ে পড়ি। যখন তৃতীয় বার তিনি অতিক্রম করছেন, তখন আমি তাঁকে (সঃ) জিজ্ঞেস করলাম হে আল্লাহর নবী (সাঃ) আমি সত্যের উপর ছিলাম। তারা কি বাতিলের উপর ছিল না? আপনি আমার উপর অসন্তুষ্ট কেন? নবী (সাঃ) বললেন অবশ্যই তুমি সত্য পথে ছিলে? তবে কথা হল আহলে বাইতের একজন লোক তোমাকে হত্যা করেছে। এজন্য আমি তোমার কাছে লজ্জিত। তোমার উপর আমি অসন্তুষ্ট নই। ইমাম দামিরী (রহঃ) বললেন আমি দেখেছি যে, হারুন ওয়াসিক কোরআন সৃষ্টি এর মাসআলার ব্যাপারে তওবাহ করেছিলেন। সম্ভবত খতীবে বাগদাদী তার জীবনীতে তা উল্লেখ করেছেন।

কোরআন সৃষ্টি হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে আলোচনা:

খাতীবে বাগদাদী লিখেছেন যে, আমি তাহের ইবনে খলফ থেকে শুনেছি, তিনি বলতেন, মুহাম্মদ ওয়াসিক বলেছেন আমার পিতা যখন কোন লোককে হত্যা করার ইচ্ছা করতেন তখন আমরা সবাই তার মজলিসে উপস্থিত হতাম। এরূপ একটি ঘটনায় আমি তার কাছে ছিলাম। দেখলাম জনৈক বৃদ্ধকে হাতে হাত কড়া পরিয়ে উপস্থিত করা হল। এমন সময় আমার পিতা দাউদ ও তার সঙ্গী সাথীদেরকে আসার অনুমতি দেন। আর বৃদ্ধকে সম্মুখে আনা হয়। বৃদ্ধ সামনে এসে বললেন , আসসালামু আলাইকুম ইয়া আমীরুল মুমিনীন! হারুন

বললেন, আল্লাহ পাক তোমাকে শান্তিতে না রাখুন। বৃদ্ধ বললেন হে আমীরুল মুমিনীন যে আপনাকে শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়েছে সে হয়ত চরিত্রহীন ছিল। কারণ আল্লাহ পাক এরশাদ ফরমান :

واذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها اوردوها

"যদি তোমাদের জন্য কেউ দোয়া করে তাহলে তার জন্য উত্তম দোয়া অথবা তারই মত ফিরিয়ে বল।"

আল্লাহর কসম! এখন তো আপনি সালামও করলেন না আর না আমার সালামের জবাব দিলেন।

এমতাবস্থায় কাজী আহমদ ইবনে আবু দাউদ বলল জনাব!! মনে হয় এলোক তর্কে পরদর্শী। তখন খলীফা হারুন বললেন দাউদ! তুমি এর সাথে আলোচনা বা বাহস কর দেখি। দাউদ বৃদ্ধকে বলল বলতো কোরআনের ব্যাপারে তোমার অভিমত কি? বৃদ্ধ বললেন জনাব আমাকে নিয়ম মতই প্রশ্ন করুন। দাউদ বললেন, আচ্ছা আপনিই আমাকে প্রশ্ন করুন। বৃদ্ধ বলল দাউদ তুমি বল কোরআনের ব্যাপারে তোমর মতামত কি? ইবনে দাউদ বলল কোরআন তো মাখলুক। জবাব শুনে বৃদ্ধ বলল কোরআনের ব্যাপারে তুমি যে ধারণা রাখ, বলত নবী করীম (সাঃ) আবু বকর, ওমর ও আলী (রাঃ) এবং তাদের পরবর্তী খলীফাগণ এধরনের শিক্ষা দিয়েছেন কি না? ইবনে দাউদ বলল, কোরআনের ব্যাপারে এ ধরনের কথা কোন শাসনামলেই শিক্ষা দেয়া হয়নি। বৃদ্ধ বললেন, সুবহানাল্লাহ! কুরআন মাখলুক হওয়ার ব্যাপারে নবী (সাঃ) কোন কিছুই বলেননি। আবু বকর, ওমর, ওছমান ও আলী (রাঃ) তারাও বলেননি। তুমি বুঝি এমন ব্যাপারই মানুষকে শিক্ষা দিচ্ছ? জবাব শুনে ইবনে দাউদ লজ্জিত হয়ে গেল। ইবনে দাউদ বলল আপনার জবাব আবার উত্থাপন করুন। বৃদ্ধ আবার পূর্বের কথাই পূণরাবৃত্তি করলেন। অর্থাৎ কোরআন মাখলুক; একথা নবী করীম (সাঃ) আবু বকর, ওমর, ওছমান ও আলী (রাঃ) তারা কেউ শিক্ষা দেননি। ইবনে দাউদ বলল ঠিক, তোমর কথাই সত্য। এবার বৃদ্ধ বললেন, এখন বল কোরআনের ব্যাপারে তোমার মতামত কি? ইবনে দাউদ বলল তা আমার নিকট মাখলুক। বৃদ্ধ বলল কোরআন মাখলুক হওয়ার ব্যাপারে রাসূল (সাঃ) আবু বকর ওমর, ওছমান ও আলী (রাঃ) কি কাউকে শিক্ষা দিয়েছেন? ইবনে দাউদ বলল

এ ব্যাপারে নবী করীম (সাঃ) এর জানা ছিল কিন্তু কাউকে তিনি এ ব্যাপারে আহবান করেন নি আর না কাউকে এর প্রতি আকৃষ্ট করেছেন। বৃদ্ধ বললেন তুমি এমন কাজ কার্য সম্পাদন করতে চাচ্ছ যে কাজের অনুমতি তোমাকে দেয়া হয়নি।

ওয়াসিক বলেন, এ বাহাস শুনে আমার পিতা হারুন নির্জনে গিয়ে চিত হয়ে শুয়ে পড়লেন। পায়ের উপর পা রেখে চিন্তা করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি বলতে লাগলেন এমন আকীদা যা রাসূল (সাঃ) শিক্ষা দেননি আর না চার খলীফা তথা খোলাফায়ে রাশেদীন শিক্ষা দিয়েছেন, আর না জনগণকে এর দিকে আহাব করেছিলেন না আকৃষ্ট করেছিলেন। একথা তুমি জনগণকে শিক্ষা দিচ্ছ! সোবহানাল্লাহ কেমন খারাপ চিন্তাধারা। এটি এমন এক বস্তু যা নবী (সাঃ) ও খোলাফায়ে রাশেদীন শিক্ষা দেননি অধিকন্তু মানুষকে এ দিকে আকৃষ্টও করেননি। তুমি একথা কেন প্রচার করতে চাচ্ছ? যার অনুমতি শরিয়ত দেয় না। এ সকল চিন্তার পর আমার পিতা আম্মার নামক এক ব্যক্তিকে ডেকে বৃদ্ধকে বন্ধন মুক্ত করে দেয়ার জন্য হুকুম করলেন এবং ৪০০ শত আশরাফী পুরস্কার দেয়ার আদেশ করলেন। এঘটনার পর আমার পিতার কাছে ইবনে দাউদের কোন মূল্য আর থাকেনি। এরপর থেকে আমার পিতা কুরআন সৃষ্টি হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে কোন চিন্তাই করতেন না।

এ কথাও উল্লেখ করার মত যে, মাহদি বিল্লাহ ইবনে ওয়াসিক এর নাম মুহাম্মদ ছিল। ইমাম জাহাবী (রহঃ) তার কিতাব দাওলুল ইসলাম-এ উল্লেখ করেছেন। ইমাম জাহবী (রহঃ) হারুন ওয়াসিক এর জীবনী লিখার পর এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, তার নাম জাফর ছিল। তাছাড়া তার নাম আহমদও পাওয়া যায়।

হাফেজ আবু নাইম বলেন হাফেজ আবু বকর আজরী বলেছেন আমার কাছে স্বয়ং মাহদী বলেছেন যে, আমার পিতার প্রতি মাত্র এক ব্যক্তি খারাপ ধারণা পোষণ করত। যাকে মসিসাহ থেকে আনা হয়েছিল। সে মাত্র এক বছর জেলখানায় ছিল। এরপর তাকে আমার পিতা দরবারে নিয়ে আসার আদেশ করেন। তারপর বৃদ্ধ লোকটিকে হাতকড়াসহ দরবারে হাজির করা হয়। বৃদ্ধ দরবারে উপস্থিত হয়ে আমার পিতাকে সালাম করলেন। কিন্তু আমার পিতা

সালামের জবাব দিলেন না। বৃদ্ধ বললেন আমীরুল মুমিনীন আপনি আমার সাথে এমন আচরণ করলেন যা আল্লাহ করেননি এবং নবী (সাঃ) এর শিক্ষা অনুযায়ী আখলাক দেখাননি। অথচ আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন:

واذا حييتم بتحية فحيو باحسن منها اوردوها

"আর তোমাদেরকে কেউ যদি দোয়া করে তাহলে তোমরাও তার জন্য দোয়া কর, তার চেয়ে উত্তম দোয়া অথবা তারই মত ফিরিয়ে দাও।

নবী (সাঃ) সালামের জবাব শিক্ষা দিয়েছেন। একথা বলার পরপরই আমার পিতা সালামের জবাব দিয়ে দিলেন। তারপর ইবনে দাউদকে তাকে প্রশ্ন করার জন্য নিয়োজিত করলেন। বৃদ্ধ বললেন এখন আমি বন্দি। আমাকে বন্ধনমুক্ত করে দাও। তাহলে আমি ওযূ করে নামায আদায় করতে পারব। আমার পিতা তার বন্ধন মুক্ত করতে আদেশ করেন এবং ওযুর পানির ব্যবস্থা করতেও কাউকে আদশে বরলেন। বৃদ্ধ ওযু করে নামায আদায় করলেন। এরপর আমার পিতা বৃদ্ধকে প্রশ্ন করার জন্য ইবনে দাউদকে বললেন। বৃদ্ধ বললেন আপনি আমাকেও প্রশ্ন করার অধিকার দান করুন। আমার প্রশ্নের জবাবও ইবনে দাউদকে দিতে হবে। আমার পিতা এরও অনুমতি দিলেন। বৃদ্ধ ইবনে দাউদের প্রতি মনোযোগী হয়ে বললেন যে, যে কথার প্রতি আপনারা মানুষকে আহাবন করছেন; ইতিপূর্বে নবী করীম (সাঃ) কি মানুষকে এর প্রতি আহবান করেছেন? তখন ইবনে দাউদ বলল না, আহবান করেননি। বৃদ্ধ প্রশ্ন বললেন তাবে কি প্রথম খলীফা হযরত আবুবকর (রাঃ) এর প্রতি মানুষকে আহবান করেছেন? ইবনে দাউদ বলল না। বৃদ্ধ বললেন, তবে কি ওমর (রাঃ) আহবান করেছেন? সে বলল না। বৃদ্ধ আবার জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে কি ওছমান ও আলী (রাঃ) কোরআন সৃষ্টি বা মাখলুক এ কথার প্রতি মানুষকে আহবান করেছেন? এবারও ইবনে দাউদ না বোধক জবাব দিল। বৃদ্ধ এবার বললেন তাহলে তা বিদাআত। কারণ যে আহবান নবী (সাঃ) করেননি, আবু বকর, ওমর , ওছমান ও আলী (রাঃ) তারা কেউই এদিকে আহবান করেননি। তুমি কেন মানুষকে এদিকে আকৃষ্ট করছ? আমার ধারনা মতে তোমার এই বিশ্বাসে দু'টি ব্যাপার অতি জরুরী হয়ে পড়ে।

ক। হয়ত প্রথম যুগে কুরআনের ব্যাপারে মানুষ জানত অথবা খ। জানত

না। যদি তোমরা এ জবাব দাও যে প্রথম যুগে লোকেরা এ ব্যাপারে অবগত ছিল কিন্তু তারা চুপ থেকেছে। তার প্রচার প্রসার ঘটায়নি। তাহলে বলব যে, তোমরা এমন জিনিসের প্রচার প্রসার চাচ্ছ যার প্রচার প্রসার ইসলামের প্রথম যুগে হয়নি। তাহলে তোমাকে এর প্রচারের অধিকার কে দিল? আর যদি তুমি তা বল যে, প্রথম যুগের লোকেরা এ ব্যাপারে অবগত ছিল না। শুধু তুমিই অবগত আছ। তবে শুন হে কমিনা গাধার বাচ্চাই এমন হয় যে, নবী করীম (সাঃ) এর যে নবুওয়তের আলো এবং খোলাফায়ে রাশেদীন এ ব্যাপারে কিছু জানে না।

মাহদী বলেন, এমনি সামান্য কথা কাটাকাটির পরই আমার পিতা চলে গেলেন এবং তার খাস কামরায় প্রবেশ করে রুমাল মুখে দিয়ে জোরে জোরে হা হা করে হাসতে আরম্ভ করলেন এবং বলতে লাগলেন ঘটনাতো সত্যিই। নবী করীম (সাঃ) এবং খোলাফায়ে রাশেদীন এ ব্যাপারে জানতেন অথবা জানতেন না। আমরা যদি বলি কুরআন সৃষ্টির ব্যাপারে তাদের জানা ছিল, তবে তার জেনেও চুপ থেকেছেন তাহলে আমরা এর প্রকাশ চাচ্ছি। যদি আমরা বলি যে এ ব্যাপারে অবগত ছিলেন না তাহালে শুধু তুমিই অবগত আছো। সুতরাং হে কমবখত কোথায় এমন হয়েছে নবী (সাঃ) এবং তার সাহাবীরা (রাঃ) যে ব্যাপারে অবগত নন শুধু তুমিই জান আর তোমর সাঙ্গ পাঙ্গরাই জানে?

মুহতাদী বলেন, আমার পিতা বলেন হে আহমদ! আমি বললাম জি জনাব, পিতা বললেন, আমি তোমাকে ডাকছি না বরং আহমদ বিন আবু দাউদকেই ডাকছি। আমার পিতার ডাক শুনে ইবনে দাউদ দৌড়ে এলো। তাকে আদেশ করলেন যে; এই বৃদ্ধ লোককে কিছু অর্থ সম্পদ দিয়ে দাও এবং আমার রাজ্য থেকে বহিস্কার কর। এ ঘটনা থেকে বুঝা যায় মুহতাদি'র নাম ছিল আহমদ।

যৌন শক্তি বৃদ্ধিকারক ঔষধ:

অতি মাত্রায় সঙ্গম করার কারণে হারুন ওয়াসিকের দেহে ভেঙ্গে পড়েছিল। এক সময় তিনি ডাক্তারকে বললেন, আমার জন্য যৌন শক্তিবর্ধক ঔষদ তৈরী কর। ডাক্তার খলীফাকে বললেন মহামান্য খলীফা আপনি আপনার শরীরকে অতি মাত্রায় সঙ্গমের মাধ্যমে দুর্বল করবেন না এবং আল্লাহকে ভয় করুন। খলীফা বললেন, না না অতি সত্বর আমার জন্য যৌন শক্তি বর্ধক ঔষদ

তেরী করে দাও। ডাক্তার ঔষধের ব্যবস্থা করেন। ঔষধের উপকরণ ছিল এই, হিংস্র প্রাণীর গোশত মদের সিরকায় মিশিয়ে সাতবার রান্না করা। এরপর এই গোশতকে তিন দেরহাম পরিমান আরকে মিশ্রিত করে পান করা। এ পরিমাণের চেয়ে বেশী পান করলে দেহের ভীষণ ক্ষতি হবে।

হারুন বন্য প্রাণী জবেহ করালেন। এর গোশত পাক করা হলো। তাতে গাঢ় সোপ হয়ে গেল। পাককৃত হালুয়া হারুন সবটুকুই খেয়ে ফেললেন। তাতে তার দাস্ত হতে লাগল। সকল ডাক্তার বললেন তার দাস্ত হতে থাকবে। এখন আর কোন ঔষধই কাজে আসবে না। দাস্তের পরে তাকে যাইতন কাঠের কয়লায় সেক দিতে হবে। এর উপর তাকে বসাতে হবে। এই আমল করা হল। তিন ঘন্টা পর্যন্ত পানি পান করা থেকে বিরত রাখা হল। তিনি বার বার পানি চাইলেন কিন্তু পানি দেয়া হয়নি। কিছুক্ষণ পর তার শরীরে তরমুজের মত বড় বড় ফোঁসকা পড়ে গেল। তাকে সেখান থেকে সরিয়ে ফেলা হল। হারুন বার বার বলছিলেন আমাকে উনানে নিয়ে চল, নতুবা আমি মরে যাব। সাথে সাথে লোকেরা তাকে নিয়ে গেল। তিনি চুপ হয়ে গেলেন। তার গায়ের ফোসকা থেকে পানির মত বের হতে লাগল। পরে তাকে উনান থেকে নিয়ে আসা হল। তার সারা দেহ কাল বর্ণ হয়ে গেল। তার কিছুক্ষণ পরই তিনি ইন্তিকাল করলেন। ইন্তিকালের সময় তিনি এ কবিতা পড় ছিলেন:

الموت فيه جميع الناس تشترك☆ لاسوقة منهم يبقى ولا ملك

"মৃত্যুতে সব মানুষই অংশীদার, কোন ব্যক্তিই তা থেকে বাঁচতে পারবে না। আর না বাদশাহও বাঁচতে পারবে।"

ماضراهل قليل فى مقابرهم☆ وليس يغنى عن الملاك مالكوا

"দরিদ্র লোকেরা তাদের কবরে কোন ক্ষতির সম্মূখীন হবে না। আর বাদশাহ যে বস্তুর মালিক ছিল সেগুলো তার কোন উপকার আসবে না।"

ওয়াসিক বলেন, আমি খলীফা হারুনু ওয়াসিকের শুশ্রূষায় ছিলাম। হঠাৎ হারুন মুর্ছা যাওয়ার উপক্রম হলেন। আমার বিশ্বাস হল যে, তাঁর মৃত্যু হয়ে গেছে। আমার নিকট অন্যান্য লোকেরা বলতে লাগল, দেখতো তার অবস্থা কি? তাঁকে দেখার কারো সাহস হয়নি। শেষ পর্যন্ত আমি নিজে গিয়ে আমার আঙ্গুল তার নাকের কাছে ধরলাম। তিনি চোখ খুললেন। আমি ভয় পেয়ে কাছে দাঁড়িয়ে

রাইলাম। আমি একটু পেছনে সরতেই সিঁড়িতে রাখা তরবারী বাট ধরে তিনি ঝুলে গেলেন এবং হুচট খেয়ে ভুমিতে পড়ে গেলেন। তরবারী ভেঙ্গে গেল। আমি যদি কাছেই থাকতাম তবে তরাবরী আমার শরীরে গেথে যাওয়ার প্রবল আশংকা ছিল। আমি অন্য একটি তরাবরী খোঁজ করলাম। কিছুক্ষণ পর এসে হারুন ওয়াসিকের নিকট দাঁড়ালাম। আমার বিশ্বাস হল, তাঁর ইন্তিকাল হয়েগেছে। তখন আমি তাঁর দাঁড়ি বেধে দিলাম, চোখ বন্ধ করে দিলাম এবং তাঁকে কাপড় দিয়ে ঢেকে দিলাম। অন্যান্য লোকেরা তাকে একা রেখে তার মূল্যবান বিছানাটি কোষাগারে রেখে দেয়ার জন্য উঠিয়ে নিল। আহমদ বিন দাউদ আমাকে উপদেশ দিলেন যে, আমরা বাইয়াতের কাজে ব্যস্ত। কাজেই তুমি দাফন সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত মরদেহ হেফাজত করবে। তখন আমি দরজার পাশে বসে পড়লাম। কিছু ক্ষণ পর আমার মনে হল যেন কিছু নড়া ছড়া করছে। আমি ভিতরে গিয়ে দেখলাম, একটি ইদুর এসে হারুন ওয়াসিকের চোখ খেয়ে ফেলল। তা দেখে আমি কলমায়ে তাওহীদ পড়লাম। কারো কারো অন্তরে সন্দেহ হল যে, এ চোখ এমাত্র উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। আমি ভয়ে মাটিতে লুটে পড়লাম। আমার তরবারীটি মাটিতে পড়ে ভেঙ্গে গেল।

হারুন ওয়াসিকের ইন্তিকালের তারিখ:

হারুন ওয়াসিক রজব ২৩২ হিজরীতে সারমানরাই নামক স্থানে ইন্তিকাল করেন। তখন তার বয়স হয়েছিল ৩৬ বছর কয়েক মাস। তার খেলাফত কাল ছিল ৫ বছর ৯ মাস।

হারুন ওয়াসিক ছিলেন ফর্সা সাদা। মুখে হলদে রঙ্গের দাড়ি খুবই সুন্দর দেখাত। চোখে মুখে ছিল বুদ্ধির ছাপ। তিনি একাধারে আলেমে দ্বীন, আদীব বা সাহিত্যিক, উন্নত মানের কবি, বীর, জ্ঞানী ইত্যাদি গুণে গুণান্বিত ছিলেন। আবার পিতার ন্যায় তিনিও কঠোর ছিলেন। আল্লাহ তাঁরা পিতা ও ছেলেকে ক্ষমা করে দিন।

জাফর মুতাওয়াক্কিলের শাসন কাল:

হারুন ওয়াসিক এর ইন্তিকালের পর তার সহোদর ভাই জাফর মুতাওয়াক্কিল ক্ষমতায় আসেন। হরুনের ইন্তিকালের দিনই সারমানরাই নামকস্থানে তিনি খেলাফতের বাইয়াত গ্রহণ করেন। কারণ তিনিই ছিলেন ভাবি

স্থলাভিষিক্ত হিসেবে মনোণীত। মুতাওয়াক্কিলের খেলাফত কালে কোরআন সৃষ্টি ফিতনার অবসান ঘটে। সুন্নাতে নববীর বিজয় হতে থাকে। তিনি নবী করীম (সাঃ) এর হাদীছের বিস্তার ও মুদ্রনের আদেশ জারী করেন।

ঐতিহাসিক ইবনে খাল্লেকান বলেন, জাফর মুতাওয়াক্কিল বলতেন যে, যখন হারুন ওয়াসিক মৃত্যু শয্যায় শায়িত তখন আমি হারুনের বাড়ী পর্যন্ত সওয়ার হয়ে হারুনের শারীরিক খবরা খবর নেয়ার জন্য আসলাম। মেহমান খানায় অনুমতি জন্য বসে থাকলাম। আমি অপেক্ষিতাই ছিলাম, হঠাৎ কান্নার আওয়াজ শুনতে পেলাম। এর পরপরই আইদাখ এবং মুহাম্মদ বিন আব্দুল মালেক যিয়াদ আমার খেলাফতের ব্যাপারে ভিন্ন আলোচনা শুরু করেন। মুহাম্মদ বলেন আমি জাফরকে রুটি সেকার চুলায় পুড়িয়ে মারব। আইদাখ বলেন না না বরং হিমশীতল পানিতে ডুবিয়ে দিবেন। তাহলে সে ধ্বংস হয়ে যাবে। এতে করে আরোও উপকার হবে যে, তাকে হত্যার চিহ্ন পর্যন্ত বাকী থাকবে না। মুতাওয়াক্কিল বলেন, আইদাখ এবং মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল মালেক উভয়ই কথা বার্তায় মগ্ন হয়ে পড়েন। হঠাৎ সেখানে কাজী আহমদ ইবনে আবু দাউদ চলে আসেন এবং এ দুজনকে নিয়ে ভিতরে চলে যান। তারা উভয়ই রহস্যময় আলাপ আলোচনায় মগ্ন হলেন। তাদের মধ্যে কি কথাবার্তা হচ্ছিল তা আমি কিছুই বুঝতে পারি নি। তাদের পরস্পরের এহেন কানাঘোষা ও আলোচনায় আমি ভীত হই। পালিয়ে যাওয়ার চিন্তা করি। দেখলাম দুজন গোলাম দৌড়ে এসে বলতে লাগল যে, জনাব তাড়াতাড়ি এখান থেকে চলে যান। তাদের কথায় আমার বিশ্বাস হল যে, ভাগ্যে যা আছে তাই হবে। এখন আমি হারুন ওয়াসিক এর ছেলের আনুগত্যই মেনে নেব। আমি যখন ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলাম তখন লোকেরা আমার নিকট বাইয়াত হতে লাগল। অবস্থা দেখে আমি জিজ্ঞেস করলাম কি হয়েছে? আমি বুঝে ফেললাম সম্ভবত এ অবস্থা সৃষ্টি করেছে কাজী আহমদ ইবনে আবু দাউদ। তারপর আমি আইদাখকে ঠান্ডা পানিতে ফেলে হত্যা করলাম। আর মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল মালেককে রুটি সেকার চুলায় ফেলে হত্যা করা হল।

মুতাওয়াক্কিল বলেন, এটিও একটি বিস্ময়কর ঐক্যের ফলাফল ছিল যে, আব্দুল মালেক মানুষ হত্যা করার জন্য চুলা বানিয়ে ছিল এতে সে নিজেই নিক্ষিপ্ত হল। চুলাটি ছিল লোহার তৈরী। ভিতরে জ্বালানো হত কয়লা আর

যাইতুনের তৈল দিয়ে। সেখানে ফেলে মানুষ হত্যা করা হত।

জাফর মুতাওয়াক্কিলের কৃতিত্ব:

মুতাওয়াক্কিল সিংহাসনে বসার পরপরই সুন্নতে নববী (সাঃ) প্রতিষ্ঠা করতে আত্ম নিয়োগ করেন। তিনি বিদায়াতকে শুধু উৎখাতই করেননি বরং সমগ্র রাজ্যে আদেশ জারী করলেন যে, সুন্নতে নবীকেই শক্তিশালী করুন। বিদআত এবং ফিতানাকে একদম খতম করুন। নিজে তার দরবারের আরম্ভ করে দিল। সম্ভবত এ ক্রোধই ছিল মুতাওয়াক্কিলের মৃত্যুর কারণ। সে কারণে ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, মুতাওয়াক্কিল যেহেতু হযরত আলীকে শত্রু মনে করতেন সেহেতু তার বদনাম করতেন। আর এ কারণেই তার ছেলে মুনতাসির পিতার দুশমনে পরিনত হয়।

দিন কয়েক চলে গেল। এক সময় জাফর বন্ধু বান্ধবদের নিয়ে মদ্যপানে রত ছিল- এক পর্যায়ে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। তার গোলাম "বাগা আচ্ছগীর" নিকটে এলো জাফর তার সহপাঠিদের বাইরে যাবার নির্দেশ দিলেন। কাছে রইলেন তার ওযীর ফতেহ ইবনে খাকান। জাফরের দুই গোলাম বাগাচ্ছগীর ও বাগা কবীরকে তাকে হত্যা করার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল। তারা জাফরকে তরবারী দিয়ে আক্রমন করে বসল। তা দেখে ওযীর ফতেহ ইবনে খাকান বল্লেন- আমিরুল মুমিনীন! আপনি এখন মৃত্যুর দু'য়ারে পৌছে গেছেন। ওযীর জাফরের পায়ের উপর উপুড় হয়ে পড়ে গেল। আক্রমন কারীরা তাকেসহ হত্যা করে ফেলল।

জাফর মুতাওয়াক্কিলের হত্যা ঃ

২৩৭ হিঃ শাওয়াল মাসে মুতাওয়াক্কিলের হত্যার ঘটনা ঘটে । তাঁর বয়স হয় ৪০ বছর। ১৪ বছর ১০ মাস ক্ষমতায় থাকেন। কেউ কেউ অবশ্যই ১৫ বছর বলেছেন। মুতাওয়াক্কিল ছিলেন বাদামী রঙ্গের লোক। উজ্জল চোখ, হালকা দাড়ি ও মধ্যম গড়নের লোক। বস্তুর প্রতি তার আকর্ষণ ছিল। তিনি সুন্নাতে নববীকে জিন্দা করেন। "কোরআন সৃষ্টি" এর ফেতনাকে খতম করেন। তাছাড়াও তিনি রাজ্যের জন্য অসংখ্য উন্নয়নমূলক কাজ করেন। মুতাওয়াক্কিলের ছেলে মুনতাসিরকে পদ থেকে অপসারিত করে তার ২য় ছেলে মা'তাজকে তার স্থলাভিষিক্ত করতে চেয়েছিলেন। কারণ তিনি তার মাকে অধিক ভালবাসতেন।

যদি মুনতাসির স্বেচ্ছায় অভিভাবকত্বের পদ থেকে না সরতেন তাহলে মুতওয়াক্কিল তাকে শাস্তি বা ধমক দিয়ে কিছুতে সরাতে পারতেন না। মুতাওয়াক্কিলের আচরণে ছেলে মুনতাসির তার শত্রুতে পরিনত হয়। যে কারণে ওয়াছিক এবং বাগা এ দুই গোলামকে তাকিদ দিয়ে পিতাকে হত্যা করার জন্য উদ্বোদ্ধ করে। মুতাওয়াক্কিল যখন প্রমোদ ঘর থেকে রাতে ফিরছিলেন তখন ৫ জন ষড়যন্ত্রকারী একত্রে আক্রমন করে তাকে দ্বিখন্ডিত করে ফেলে। তার সাথে তাঁর ওযীর ফতেহ বিন খাকানকেও হত্যা করে।

মুনতাসির বিল্লাহর শাসনামল ঃ

জাফর মুতাওয়াক্কিলের পর তার পুত্র মুনতাসির বিল্লাহ ক্ষমতার অধিকারী হন। জাফর যে রাতে নিহত হয় সে রাতই তিনি খেলাফতের শপথ নেন। পরে সাধারণ জনগণ তার বাইয়াত গ্রহণ করে। তবে তিনি বেশী দিন ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারেননি।

ঐতিহাসিকগণ লেখেন, একদিন তার সামনে বিছানা বিছানো হয়। তিনি দেখলেন এতে কিছু লিখা আছে । কিন্তু লিখাগুলো পড়া যাচ্ছিল না। তিনি আদেশ করলেন, যে আলেম এই লেখা পড়তে সক্ষম হবে তাকে এখানে উপস্থিত করা হোক। বিছানাটিতে ইউনানী ভাষায় এই কথাই লিখছিল যে,

عمل هذا البساط للملك قباذبن كسرٰى قاتل ابيه وفرش قدامه لفم يلبث غير ستة اشهر ومات

"এই বিছানা বাদশাহ কুব্বাজ ইবনে কিছরা তৈরী করেছেন। যিনি তার পিতাকে হত্যা করেন । এ বিছান এজন্য বিছানো হয়েছে যে, তিনি ৬০ মাসের বেশী টিকতে পারেননি এবং মৃত্যু বরণ করেছেন।"

এই লিখা পড়তে পারার পর মুনতাসির ভাবলেন যে, এতেতো অমঙ্গল নিহীত রয়েছে। এখন তিনি চিন্তিত হয়ে পড়লেন। বিছানা তুলে নেয়ার আদেশ করলেন। তার ৬মাস পরই তিনি ইন্তেকাল করেন।তিনি ৬ মাস থেকে সামান্য কয়দিন ক্ষমতায় ছিলেন। মাত্র ২৬ বছরই তিনি জীবিত ছিলেন। তার মায়ের নাম রুমিতাহ ।

মুনতাসির ছিলেন খুব সুঠাম দেহী ও শান্ত প্রকৃতির। ফর্সা চেহারা এবং ভীরু স্বভাবের। তবে প্রজ্ঞাবান বাদশাহ ছিলেন। চোখের মনি ছিল বড় বড়, নাক

ছিল খাড়া, মাঝারি গড়নের। সৎ কাজের প্রতি তার আকর্ষণ ছিল বেশি।

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, মুনতাসির তুর্কী হাকেমগণকে খুবই ভয় পেতেন। তার জ্বর হলে তুর্কীরা ডাক্তারকে ১০০০ হাজার আশরাফী দিয়ে নির্বাচিত করে। অতঃপর ডাক্তার অস্ত্র পচারে বিষাক্ত বিষ মিশ্রণ করলে বিষের ক্রিয়ায় তিনি ইন্তেকাল করেন। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন তাকে খাদ্যে বিষ মিশ্রিত করে হত্যা করা হয়। মৃত্যুর সময় তার মাকে ডেকে বলেছিলেন আম্মা আমার দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ই বরবাদ হয়ে গেছে। আমি আমার পিতার কাছ থেকে অতি দ্রুততার সাথে কার্যোদ্ধার করেছি। সে কারণে মৃত্যু আমাকেও খুব দ্রুত গ্রাস করে ফেলল।

মুস্তাঈন বিল্লাহর শাসনামল ঃ

মুস্তাঈন বিল্লাহ খুব স্বল্প সময়ের জন্য খলিফা নিযুক্ত হয়েছিলেন। মুহাম্মদ মুনতাসিরের ইন্তিকালের পর তার চাচাত ভাই আহমদ মুস্তাইন বিল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ মু'তাসিম সিংহাসন লাভ করেন। ২৫১ হিঃ ৬ই রবিউস সানী সোমবার তিনি জনসাধারণ থেকে বাইয়াত নেন। তখন তার বয়স হয়েছিল ২৮ বছর। মস্তাইন অধিক সঙ্গম এবং নারী লোভী থাকার কারণে রুগ্নদেহী ছিলেন। তার চাচাত বোন অত্যন্ত সুন্দরী ছিল । তাই তিনি মেয়ের পিতাকে বিবাহ প্রস্তাব দিলে পিতা মুস্তাইনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তখন মুস্তাইন আহমায়ী, রুক্কাশী ও আবু নাওয়াছকে ডেকে বললেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী চাচাত বোনের মহব্বতে কবিতা আবৃত্তি করতে পারবে তাকে আশাতীত পুরুস্কার দেয়া হবে।

তাই আবু নাওয়াস তাকে বললেনঃ

ماروض ريحانكم الزاهر:: وماشتر انشركم العاطر

"তোমার অনাবৃত ফুলের উদ্যান কতইনা সুন্দর। আর তোমার ব্যবহৃত সুগন্ধির কতইনা ক্ষমতা। "

وحق وجدى ولهوى قاهر:: مذغمتولم يبق لى ناظر

والقلب لاسال ولاصابر

"আমার ভালবাসা স্থায়ী হয়ে গেছে এবং প্রেম-প্রীতি জয়ের নায়ক হয়ে

গিয়েছে। যখন থেকে তুমি অদৃশ্য হয়ে গেলে তখন থেকে আমি কাউকেই গ্রহণ করিনি। আর মন আমার ধৈর্য ধারণ করতে পারছে না''

قلت الالاتلحق دارنا:: وكابدالاشواق من اجلنا

''সে বল্ল তুমি আমার ঘরে দাড়াবে না? ওহে আমার কারণে কামনা দমনকারী।''

واصبر على مرالجفا والضنا:: ولاتمونا على بيتنا

ان ابانا رجل غائر

''দুর্ব্যবহার ও খারাপ আচরণের কারণে ধৈর্য ধারণ কর। আর তুমি আমার ঘরের পাশ দিয়ে যেয়ো না। কারণ আমার পিতা একজন ঘরোয়া মানুষ।''

فقلت انى طالب عزة:: يحظى بها القلب ولو مرة

''ওহে তুমি আমাকে বলেছিলে যে আমি একজন কামুক পুরুষ চাই যার দ্বারা অন্তরে প্রশান্তি পাওয়া যায় যদিও তা একবারের জন্য হয়।''

قالت بعيد ذاك مت حسرة:: قلت ساقضى غرة جهرة

''সে বল্ল তা অসম্ভব, উলঙ্গ হয়ে মরে যাও। আমি বল্লাম অচিরেই প্রকাশ্যভাবে যৌন খেলার মীমাংসা হবে।''

منك وفيسفى صارم باتر

''এ অবস্থায় আমার তলোয়ার অত্যন্ত ধারাল।''

قالت فان البحر من بيننا :: فابرح ولاتات الى حينا

''সে বল্ল আমাদের মাঝে সমুদ্র আড়াল (বাধা) যাও আরাম কর এ অবস্থায় আমার নিকটে তুমি পৌছাতে পারবেনা।''

واشرب بكاس الموت من هجرنا:: قلت ولو كان كثير العينا

''আর আমাদের মধ্যকার পার্থক্যের মৃত্যুর পেয়ালা পান কর। আমি বল্লাম যদি রাস্তা ভীতিজনক হয় তবুও? ''

يكفيك انى سابع ماهر

''তোমার জন্য তাই যথেষ্ট হবে যে আমি একজন উত্তম সাঁতারু।''

قالت فان القصر عالى البناء:: قلت ولو كان عظيم السنا

"সে বল্ল প্রাসাদ অনেক উঁচু আমি বল্লাম, উহা যতই উচু হউক।"

اوكان بالجوبلغت المنى

"অথবা তা এত উচু যে, তা নভোমন্ডল পর্যন্ত পৌছে গেছে।"

قالت صنيع فى الورٰى قصرنا:: قلت وانى توقه طائر

"সে বল্ল আমাদের আস্তানা জগতে মজবুত এবং উচু আস্তানা আমি বল্লাম এতে আমি উড়তে থাকব।"

قالت فضدى لبوة والد:: فقلت انى اسد شارد

"সে বল্ল আমার কাছে প্রসবকারিনী বাঘিনী আছে? সে বল্ল আমিও কিন্তু কমনা।"

قالت فعندى اخوة سبعة:: جمعاً اذا مالتقواعصبة

"সে বল্ল আমার সাত ভাই আছে। তারা কারো প্রতি রুষ্ট হলে ভারী পাথরে পরিণত হয়ে যায়। "

غشمشم مقتنص صائد

"অসভ্য শিকারী অত্যাচারী বাঘ হয়।"

قالت لها شبل بهالابد:: قلت وانى ليثها الكاثر

"সে বল্ল বাঘিনীর পাশেই রয়েছে বাঘ- এমনকি তার বাচ্চাও, আমি বল্লাম সে বাঘের উপর আমি আক্রমনকারী।"

قالت لهم يوم الذغى سطوة:: قلت وانى قاتل قاهر

"সে বল্ল আমার ভাইয়েরা তখন যুদ্ধ করে বিজয়ী হবে। আমি বল্লাম যে, আমিও একজন নির্দয় হত্যাকারী।"

قالت فان الله من فوقنا:: يعلم من بنديه من شوقنا

"সৈ বল্ল আল্লাহ পাক আমার রক্ষাকারী। আমার আশা আকাংখার ব্যাপারে তিনি ভালই জানেন। "

قمض الى الحق عند اكلنا

"আমি সব সত্য কথা হজম করে যাব।"

ونخشى النقمة من ربنا :: قلت وربى ساتر غابر

"আমি আল্লাহর শাস্তিকে ভয় পাই। আমি বল্লাম আমার রব ক্ষমাশীল দয়ালূ।"

قالت فكم اعيتنا حجة:: تجئى بها كاملة بهجة

"সে বল্ল তুমি যুক্তি তর্কে আমাকে পরাজিত করে ফেল্লে, আগামীকাল তুমি তার সম্মুখে যা সৃষ্টির মধ্যে।"

فيالها بين الودى حجله

"লজ্জিত পূর্ণাঙ্গ এবং উত্তম পন্থা উপস্থাপন করে। "

ان كنت ماتمهلنا ساعة:: فأت اذاماهجع الساهر

"যদি তুমি আমাকে সামান্য অবকাশ দিতে তাহলে যখনই তুমি জাগ্রত অবস্থায় শয়ন করতে তখনই আসতে পারবে।"

واسقط علينا كسقوط الندى:: اياك ان تظهر حرف النداء

"আর আমার কাছে মশারীর মত স্তুপ হয়ে যাও কিন্তু তুমি আওয়াজ করা থেকে বিরত থাক।"

يستيقظ الراشى ويادى الراد ى

"যেখান থেকে হউক চুগুলখোর এবং অকর্মন্যলোক যেন না আসে।"

وكم كسيف الطيف مستر صدا:: ساعته لاناه ولاامره

"তুমি ক্ষনিত মেহমানের মত সুযোগ সন্ধানী না কোন আদেশ কর। না অস্বীকার কল।"

حاججتها عضراومافحتها:: على دنان الخمر صافيتها

"আমি তার সহিত দশ বার ঝগড়া ও করমর্দন করেছি। মটকায় অকৃত্রিম ভালবাসা স্থায়ী করেছি।"

دامت مواثيقاً فوافتها

"সে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, তাই আমি একত্রে বসবাস করেছি।"

ملتحفاسيفى ولاقيتها:: آخرليلى والدحبى عاكر

"তরবারী আবৃত করে আমি তার সহিত শেষ রাতে সাক্ষাৎ করি এবং

তখন অন্ধকার বিদূরীত হচ্ছিল।"

ياليلة قنيتها اوخلوة::مرتشفا من ريقما قهوة

"হে সেই রাত যা আমি একা একা কাটিয়েছে। কফির মত তার থুথুকে চুষে ছিলাম।"

تشكر من قديبتغى ممكرة

"কখনো হুশ করে আবার কখনো নেশায় বুদ করে ফেলে"

ظننتها من طيبها لحظة:: ياليث لا كان لها آخر

"আমি তার সুঘ্রানে কিছুক্ষন সময় সুস্থ থাকি, হায় যদি এর শেষ মুহূর্ত না আসত!"

আবু নাওয়াছ কর্তৃক মুস্তাঈনকে এ কবিতা শুনালে তিনি তা খুবই পছন্দ করেন। তার প্রতিশ্রুতি মোতাবেক পুরস্কার প্রদান করেন। এরপর মুস্তাঈন শাসন ক্ষমতা থেকে স্বেচ্ছায় পদত্যাগের ব্যাপারে তাকে সাক্ষী বানালেন এবং কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে দেশের জনগণকে তার বাইয়াত থেকে মুক্ত করেদেন। মা'তাজ ইবনে মুতাওয়াক্কিল ক্ষমতা গ্রহণ করার জন্য খবর পাঠান। মুস্তাঈন এরপর হুসাইন ইবনে ওয়াহাব এর বাসগৃহে চলে যান । এখানে তিনি ৯ মাস দেখা শুনার দায়িত্ব পালন করেন। তার পর তিনি শহরের মাঝভাগের কোনস্থানে চলে যান। এ সময় মা'তাজ মুস্তাঈনের দেহরক্ষীকে তাকে হত্যা করার জন্য উদ্বোদ্ধ করে। তাতে দেহরক্ষী তাকে ৬৫৩ হিঃ রমজান মাসে হত্যা করে।

তার বিচ্ছিন্ন মস্তক এমন সময় হাজির করা হয় যখন মা'তাজ দাবা খেলায় মগ্ন ছিল। তাকে বলা হল যে, এটি পদচ্যুত শাসক মুস্তাঈনের মস্তক। মা'তাজ তাকে জবাব দিলেন তা এক জায়গায় রেখে দাও, আমি খেলা শেষে দেখব। বেশ কিছুক্ষণ চিন্তা ভাবনার পর তাকে কবরস্থ করা হয়। তার শাসনকাল ছিল ২ বছর ৯মাস। তিনি ৩১ বছর হায়াত পান। মুস্তাঈনের মুখমন্ডলে বসন্তের দাগছিল। তারপরও তার মুখমন্ডল ছিল উজ্জ্বল। তবে মুখে ছিল সামান্য তুতলানোভাব। তাই তিনি মুখ দিয়ে س এর পরিবর্তে ث ই উচ্ছারণ করতেন। তিনি শাসক হিসেবে ভদ্র এবং অপব্যয়ী ছিলেন।

মুহাম্মদ মা'তাজ বিল্লাহ ইবনে মুতাওযাক্কিলের শাসনঃ

মুস্তাইন-এর পর তার চাচাত ভাই আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ মা'তাজ ক্ষমতা গ্রহণ করেন। প্রহরী ছালেহ ইবনে ওছীফ তার খেলাফত মেনে নিতে অস্বীকার করে। অতঃপর প্রহরী তার কয়েক সহযোগী সহ মা'তাজ কে ঘর থেকে বের হওয়ার জন্য শাসাতে থাকে। মা'তাজ এ সময় ঐষধ ব্যবহারে কারণে ঘর থেকে বের হতে অপরাগতা প্রকাশ করলে প্রবেশ করে মা'তাজ কে পায়ে ধরে টেনে বের করে উত্তপ্ত রোদে দাড় করিয়ে রাখে। অধিক গরমের কারণে তিনি এক পা খাড়া রেখে অপর পা উঠাতে থাকেন। এর সঙ্গে আবার মা'তাজকে তারা চড় থাপ্পর মারতে থাকে। এবং বলতে থাকে অতি সত্বর পদত্যাগ কর। তাদের চড় থাপ্পার হাত দ্বারা প্রতিহত করার চেষ্টা করতেন। কিন্তু পদত্যাগ করতে অস্বীকার করতেন। পরে মা'তাজ তাদের দাবী পুরনে সম্মত হন এবং সিংহাসন থেকে পদত্যাগ করেন।

তারপর মা'তাজকে ছালেহ ইবনে ওসীফের রক্ষণাবেক্ষনে পাঠানো হয়। সে তাকে তিন দিন যাবৎ খাবার দাবার কিছুই দেয়নি। তাকে চুনের আস্তর যুক্ত মেঝে নিয়ে বন্দী করা হলে তিনি সেখানে ইন্তিকাল করেন। তাকে সেখান থেকে বের করা হলে দেখা যায়, তাকে বন্দী করার কোন চিহ্নও নেই।

কেউ কেউ বলেন, তাকে অপসারণ করে ৫দিন পর্যন্ত অত্যন্ত গরম হাম্মাম খানায় বন্দী করে রাখা হয় এবং আহার বিহার বন্ধ করে দেয়া হয়। মৃত্যুর কাছাকাছি হলে তাকে লবনাক্ত পানি পান করতে দেয়া হয়। এই পানি পান করেই তিনি মৃত্যু বরণ করেন। এটি ২৫৫ হিঃ রজব মাসের ঘটনা। তিনি ২৩ বছর জীবিত ছিলেন। ৪ বছর ৬মাস ক্ষমতায় ছিলেন। মা'তাজ অত্যন্ত সুন্দর লোক ছিলেন।

জাফর মুহতাদি বিল্লাহ ইবনে হারুনের শাসনকাল ঃ

মা'তাজ এর পর তার চাচাত ভাই জাফর ইবনে হারুন ওয়াসিক ইবনে মুতাসিম সিংহাসনে ক্ষমতায় আসেন। দামিরী (রহ.) বলেন আমি অন্য আরেকটি কিতাবে দেখেছি যে, মুহতাদি'র নাম মুহাম্মদ এবং তার উপাধি ছিল আবু ইসহাক। মা'তাজের পদচ্যুতির পরই তিনি শপথ নেন। তাকে ক্ষমতা দেয়ার পরপরই তিনি খেলাধুলার যাবতীয় সামগ্রী ঘর থেকে বের করার আদেশ করেন।

কুকুর এবং হিংস্র প্রাণীকে বের করার উপদেশ প্রদান করেন। তিনি নিজেই বিচার কার্য পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। খলিফা জাফর বলতেন আমি আল্লাহর নিকট লজ্জিত যে, আব্বাসীয় বংসে উমাইয়াদের শ্রেষ্ঠ ন্যায় পরায়ন খলিফা ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ এর মত ভাল শাসক আর হয়নি। এ কথা তুর্কী শাসকের কাছে মনপুতছিলো না। তুরস্কের বাদশাহ অত্যন্ত জালেম এবং দাম্বিক লোক ছিল। তাই মুহতাদি জাফর তাকে হত্যা করার আদেশ দেন। তাকে হত্যা করার পর তুর্কীদের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়। একারণে মুহতাদি ও পশ্চিমাদের মধ্যে প্রচন্ড যুদ্ধ হয়। উভয় পক্ষে ৪ হাজার করে লোক নিহত হয়। অবস্থা দেখে জাফর কোরআন ঘাড়ে বেধে বের হন। তাকে সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য লোকদের আহবান করতে থাকেন। পশ্চিমাঞ্চলীয় এবং সাধারণ লোক পক্ষ নেয় তুর্কী বাজের ভাই তাবিগান তাদের সবার সহিত যুদ্ধ করে জাফর মুহতাদিকে পরাজিত করেন। শেষ তক জাফর মুহতাদি তলোয়ার ঝুলিয়ে পরাজয় মেনে নিয়ে প্রত্যাবর্তন করেন। এ যুদ্ধে জাফরের দেহে দুটি আঘাত লেগেছিল। এই অবস্থায় জাফর মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজদাদের ঘরে প্রবেশ করেন। তুর্কীরা জানতে পারল যে, জাফর এখানে আছে। সেখানে তারা আক্রমণ করে জাফরকে গ্রেফতার করে নেয়। আহমদ বিন খাকান জাফরকে একটি সওয়ারীতে আরোহন করিয়ে নিরাপত্তার জন্য একটি ছোরা হাতে নিয়ে বসে পড়ে। জাফরকে আহমদ বিন খাকানের ঘরে প্রবেশ করানো হয়। লোকেরা বলল তাকে থাপ্পর দিয়ে খেলাফতের আসন থেকে অপসারণ কর। তখন জাফর অস্বীকার করে বসে । জাফরকে এমন এক ব্যক্তির কাছে হস্তান্তর করা হয় যে তার বিশেষ অঙ্গে রতিক্রিয়া করে। (নাউযু বিল্লাহ) এতে সে মার যায় । সম্ভবত এ ঘটনা ঘটেছিল ২৫৬ হিঃ রজব মাসে। তিনি ৩৮ বছর বেচে ছিলেন মাত্র ১১ মাস সিংহাসনে ছিলেন। ভিন্ন মতে তিনি পূর্ণ এক বছরই সিংহাসনে ছিলেন।

জাফর মুহতাদি ছিলেন গৌর বর্ণের লোক। তিনি দ্বীনদার খোদা ভীরু পরহেজগার, ন্যায় পরায়ন ও বিচক্ষন ছিলেন। কিন্তু তার কোন ভাল পরামর্শ দাতা ছিলনা।

ঐতিহাসিকগণ লিখেন, তিনি প্রায়ই রোজা রাখতেন। বেশির ভাগ তিনি রুটি, সিরকা যায়তুনের তৈল ইত্যাদি দিয়ে ইফতার করতেন। তিনি যাবতীয় গান বাজনা এবং মাদক দ্রব্যের উপর কড়া নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছিলেন।

রাজ্যের কর্মচারীদেরকে জুলম করলে তিনি তা প্রতিহত করতেন এবং আদালতে নিজে বসেই বিচার কাজ সম্পাদন করতেন।

একটি তর্ক-বিতর্ক অনুষ্ঠান ঃ

হাফেজ আবু বকর ইবনে হোসাইন ইবনে আব্দুল্লাহ বাগদাদী লিখেন, আবুল ফজল সালেহ ইবনে আলী ইবনে ইয়াকুব ইবনে মনসুর হাশেমী বলেন যে, (তিনি বনী হাশেমের সম্মানীত খলিফাদের অন্তর্গত) আমি একবার জাফর মোহতাদীর দরবারে বসা ছিলাম। জাফর মোহতাদী সাধারণ লোকদের মধ্যে বসে তাঁদের অবস্থার প্রতি মনোযোগ দিয়ে ছিলেন। এসময় গল্প গুজব হচ্ছিল। তিনি এতে সই করে নিজ সাথীরর্গদেরও লিখতে উপদেশ দিলেন। তার এ কাজ আমার নিকট খুবই পছন্দের হল। কিছুক্ষন পর আমি তাকে দেখতে লাগলাম যে তিনি তা বুঝে ফেলেন। বেশ কয়েকবার এমন হল। যখনই তিনি তার দৃষ্টি নীচে নামিয়ে ফেলতাম। এভাবে বেশ কয়েকবার এরকম হচ্ছিল। যখন তিনি কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়তেন দেখতে থাকতেন। হঠাৎ করে কিছুক্ষণ পরে সে বলল ওহে সালেহ! আমি তখন বল্লাম জনাব! একথা বলেই আমি দ্রুত দাড়িয়ে গেলাম। তিনি বল্লেন আমার নিকটতো তোমার কোন প্রয়োজন নেই। কোন কথাও বলার দরকার নেই? আমি তখন বল্লাম জি-জনাব আমি কিছু বলতে চাচ্ছি। তখন তিনি বল্লেন ঠিক আছে তুমি তোমার স্থানে চলে যাও। আমি আমার স্থানে চলে এলাম। শেষপর্যন্ত তিনি আমাকে দেখতে থাকলের্ন, এমানকি তিনি দঁড়িয়ে গেলেন।।

প্রহরীকে বললেন, ছালেহ্ তো এখনো থেকে গেল। এর ভিতর সকল মানুষ উঠে চলে গেল। এরপর তিনি আমাকে অনুমতি প্রদান করলেন যে, আমার পাশে এসে দাঁড়িয়ে যাও। আমি দাড়িয়ে গেলাম। আবার তিনি বললেন যে, সালেহ তোমার কাছে যা আসছে বলে দাও অথবা তোমার অন্তরে আসতেছে তা আমারই বলা। আমি বল্লাম, হে আমিরুল মু'মিনীন আপনি যা ইচ্ছা বলুন তা পালন করা হবে।

আল্লাহ পাক দেরীতে হলেও আপনাকে সুখে রাখেন। তিনি তখন বল্লেন সম্ভবত আমার ইচ্ছাও তোমার মতই এবং যে কথা তুমি আমার মধ্যে দেখলে তা যুৎসই হয়েছে। আবার আমি বল্লাম যে সম্মানীত হুজুর! তিনি কোন খলিফা যিনি পবিত্র কোরআনকে মাখলুক বলেননি। একথা বলেই আমি এমন অনুভব করলাম

যে মনে হয় আমি যে একটি বড়কথা বলে ফেললাম। আমি তাও ধারনা করতে পারলাম যে, মৃত্যুতো একবারই। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে কেউই মৃত্যু বরণ করেনা। আর না মিথ্যা, বিদ্রুপ ও মহানুভবতায় উভয় অবস্থায় মনোমুগ্ধকর করা যায়। আমি আরো বল্লম যে, আমার অন্তরেও যা আসল তা আমি বলে ফেল্লাম। এরপর আমিরুল মু'মিনীন বেশ কিছু সময় চিন্তা করে বললেন, আমি যা বলি শুন। একথা স্মরণ রেখো যে, সত্য কথাই শুনবে। এতটুকুই আমিরুল মু'মিনীন বলেছিলেন। তাতে আমার সব চিন্তা দূর হয়ে গেল। আমি বললাম মহামান্য খলিফা! আপনার চেয়ে অধিক বেশী সত্য কথা বলার অধিকার কে রাখে। আপনি তো মুসলমানদের নেতা। আল্লাহ তায়ালার যমীনে খলিফা। আপনিতো প্রথম ও শেষ নবী হযরত মোহাম্মদ (স.) এর চাচাত ভাই।

তিনি বললেন, আমিতো হারুন ওয়াসীকের খেলাফত থেকেই কোরআন মাখলুক এর মত পোষণ করি । শেষ পর্যন্ত আমাদের এখানে সিরিয়া থেকে শাইখ আহমাদ ইবনে আবু দাউদ আগমন করেন। বেশ কয়েকদিন পর হারুন ওয়াসিক এর রাজ দরবারে অত্যন্ত সুন্দর কোরআন মাখলুক এর প্রবক্তা, সুদর্শন বৃদ্ধকে লোহার শিকলে আবদ্ধ করে উপস্থিত করা হল। সে সময় আমি ওয়াসিককে দেখলাম যে, তাকে লজ্জা করে মহানুভবতার পরিচয় দিতে লাগলেন। কাছে ডেকে বসালেন। বৃদ্ধ তাকে ভদ্রভাবে সালাম করলেন। সংক্ষিপ্তাকারে দোয়া করলেন। ওয়াসিক বল্লেন যে, জনাব আপনি ইবনে আবু দাউদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হউন। যে বিষয়ে তিনি বাহাছ করতে চান তার শান্তনা মূলক জবাব দিবেন। বৃদ্ধ জবাব দিলেন আমিরুল মু'মিনীন! ইবনে আবু দাউদ'র সাথে আমি কি আলোচন করব? তার ইল্‌ম কম এবং সে দূর্বল ও কাপুরুষ। একথা শুনে ওয়াসিক ক্রোধান্বিত হয়ে গেলেন এবং তার দয়ার স্বভাব অগ্নিতে রূপান্তিরিত হয়ে গেল। ইবনে আবু দাউদ বললেন, জনাব আমি আপনার সাথে তর্ক করে পারবোনা। আমি কি তোমার চেয়ে স্বল্প বিদ্যা, দুর্বল ও কাপুরুষ? বৃদ্ধ বললেন আমিরুল মু'মিনীন আপনি ভয় পাবেন না। আপনি আমাকে তার সাথে বিতর্ক করার অনুমতি দিন। ওয়াসিক বললেন, আমি আপনাকে তার সাথে বিতর্ক করা ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে তলব করি নাই।

বৃদ্ধ বললেন- হে ইবনে আবু দাউদ! তুমি আমাকে এবং সাধারণ লোকদেরকে কখন পর্যন্ত এই আক্বীদার দিকে আহবান করতে থাকবে? ইবনে

আবু দাউদ বললেন যতদিন পর্যন্ত আপনি "কোরআন মাখলুক" একথা না বলবেন। এজন্য পরিস্কার কথা হল যে, আল্লাহ পাক ছাড়া দুনিয়ার সমস্ত বস্তুই সৃষ্টি হয়েছে। কোরআনও বস্তুর অন্তর্ভূক্ত। এজন্য কোরআন মাখলুক।

বৃদ্ধ বললেন- মহামান্য খলিফা! আপনি আমাদের তর্ক বিতর্কের প্রতি ভালভাবে মনযোগ দিবে এবং যা বলা হবে তা স্মরণ রাখবেন। বৃদ্ধ আহমদ ইবনে আবু দাউদকে লক্ষ্য করে বললেন হে আহমদ! কোরআন মাখলুক হওয়ার ব্যাপারে তোমার যে আকীদাহ তাকি দ্বীনের ব্যাপারে জরুরী? এ আক্বীদাহ ব্যতীত কি দ্বীন পূর্ণ হবে না? আহমদ বললেন হ্যাঁ- এই আক্বীদা ব্যতীত দ্বীন পূর্ণ হবে না।

বৃদ্ধ বল্লেন, হে আহমদ! রাসুলুল্লাহ (সঃ) দুনিয়াতে আবির্ভূত হয়ে দ্বীনের তাবলীগ করেন। তাতে কি তিনি দ্বীনের কোন বিষয় গোপন করেছেন? যে কারণে আল্লাহ তায়ালা আপনাকে তা প্রচার করার আদেশ দিয়েছেন? আহমদ বললেন না। নবী করীম (সঃ) ধর্মীয় বিষয়াদির কোন জিনিসই অবশিষ্ট রেখে যান নাই। আর না তিনি দ্বীনের কোন অংশ গোপন রেখেছেন। বৃদ্ধ বললেন তাহলে কি নবী (সঃ) এই আকীদার প্রতি আহবান করেছেন? একথা শুনে আহমদ চুপ থাকল। এ মুহুর্তে বৃদ্ধ খলিফা ওয়াসিকের দিকে মুখ ফেরালেন এবং একথা বললেন যে, আমিরুল মু'মিনীন এটি আমার প্রথম দলীল। খলিফা বললেন, হ্যাঁ এটি আপনার প্রথম দলীল।

বৃদ্ধ বললেন, হে আহমদ! নবী করিম (সঃ)এর উপর সর্বশেষ কোন আয়াতটি অবতীর্ণ হয়? আহমদ বললেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়ঃ

اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام ديناً

বৃদ্ধ বললেন, আচ্ছা আহমদ বলত দ্বীনের পূর্ণতার ব্যাপারে আল্লাহ পাক সত্যবাদী নাকি তুমি যে দ্বীনের দাবী করছ তা সত্য? যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাক তাহলে বলব যে পর্যন্ত তোমার দাবী মোতাবেক কোরআনকে মাখলুক না মানা হবে সে পর্যন্ত দ্বীন অপূর্ণাঙ্গ। একথা শুনে আহমদ ইবনে আবু দাউদ চুপ হয়ে গেল। বৃদ্ধ বল্লেন, আহমদ! আমার কথার জবাব দাও। আহমদ কোন উত্তর দিতে সক্ষম হলোনা। বৃদ্ধ বললেন, আমিরুল মু'মিনীন এখন আমর দলীল দুটি হয়ে গেল। খলিফা ওয়াসিক বললেন, হ্যাঁ অবশ্যই আপনার দলীল দুটি হল।

আবার বৃদ্ধ বললেন, আহমদ! কোরআন মাখলুক হওয়ার ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ (সঃ) এর জ্ঞান ছিল কিনা? আহমদ বলল হ্যাঁ এ ব্যাপারে নবী (সঃ) এর জ্ঞান ছিল। বৃদ্ধ বললেন, তবে কি নবী করীম (সঃ) এ ব্যাপারে মানুষকে দাওয়াত দিয়েছেন? এ কথা শুনে আহমদ চুপ হয়ে গেল। বৃদ্ধ বললেন আমিরুল মু'মিনীন আমার দলীল তিনটি হল। খলীফা ওয়াসিক বললেন হ্যাঁ আপনার তিনটি দলীদই হল।

আবার বৃদ্ধ বললেন, হে আহমদ! আমার কথানুযায়ী বুঝা গেল কোরআন মাখলুক হওয়ার ব্যাপারে নবী করিম (সঃ) এর জ্ঞান ছিল। নবী করিম (সঃ) এর উচিত ছিল যে, কোন জিনিসের ব্যাপারে তার জ্ঞান আছে এবং তার উম্মতকে তার দাওয়া দেওয়া। অথচ এ ব্যাপারে নবী করিম (সঃ)তার উম্মতকে দাওয়াত দেন নাই? আহমদ বল্ল হ্যাঁ। বৃদ্ধ আরো বল্লেন, হযরত আবু বকর (রা.) ওমর (রা.) ওসমান (রা.) আলী (রা.) এই চার খলিফাও ক্ষমতা থাকা সত্বেও উম্মতের কাছে এই আকীদার ব্যাপারে তাকিদ করেন নাই? আহমদ বললেন হ্যাঁ এতটুকু বলেই বৃদ্ধ আহমদ বিন আবু দাউদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তারপর খলিফা ওয়াসিক এর দিকে ফিরে বললেন, জনাব আমি তো প্রথমেই আপনার নিকট বলেছিলাম যে, আহমদ আমার সাথে বিতর্ক করতে সক্ষম হবে না। সে স্বল্প জ্ঞানী দুর্বল ও কাপুরুষ।

বৃদ্ধ খলীফাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, হে আমিরুর মু'মিনীন! যদি আপনি জনগণকে এই আক্বীদা থেকে বিরত রাখতে না পারেন যার ক্ষমতা নবী করিম (স.) কাউকে দেননি আর না চার খলিফা দিয়েছেন। তবে স্মরণ রাখুন আল্লাহ তায়ালা কখনোই এদেরকে ক্ষমতা দেননি যাদের এই আক্বীদা থেকে বিরত থাকার ধৈর্য্য নেই। যে আক্বীদার অনুমতি শরিয়তে দেয় নাই আর না ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। হারুন ওয়াসিক বললেন, আমাদের মধ্য থেকে কারো যদি এই আক্বীদা থেকে বিরত না রাখার ক্ষমতা থাকে যার ক্ষমতা নবী (স.) কাউকে দেননি আর না চার খলিফার কেউই তা দিয়েছেন, তা হলে আল্লাহ পাক এখনও আমদেরকে ক্ষমতা দেননি।

এঁরপর খলীফা হারুন ওয়াসিক বৃদ্ধের বন্ধন খুলে দেয়ার অনুমতি দিলেন। তার বন্ধন কেটে দেয়া হলে বৃদ্ধ শিকলটা হাতে নেয়ার জন্য ঝুকলেন

তখন বৃদ্ধকে কর্মকার পাকড়াও করল। ওয়াসিক বল্লেন- তাকে পাকড়াও করোনা এটি তাকে নিয়ে যেতে দাও। বৃদ্ধ শিকলটা নিয়ে জামার আস্তিনে রেখে দিলেন। এ সময় বৃদ্ধের কাছে জিজ্ঞেস করা হল যে, আপনি তা নেয়ার জন্য এত ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লেন কেন? বৃদ্ধ বললেন, আমার ইচ্ছা হল, আমি তা নিয়ে অসিয়ত করব যে, আমি যখন মৃত্যু বরণ করব তখন তা আমার কফিনে রেখে দেয়া হবে। তাহলে আমি আল্লাহ পাককের দরবারে সেই জালিম ব্যক্তির ব্যাপারে মামলা দায়ের করতে পারবো এবং আমি আমার রবের নিকট একথা বলতে পারবো যে, এখন আপনি এই বান্দাকে জিজ্ঞেস করুন যে, কেন সে আমাকে বন্দী করেছিল। সে আমার পরিবার-পরিজন, ছেলে-মেয়ে, ভাই-বোনদেরকে কেন অনিশ্চয়তার মধ্যে রেখে ছিল। এটুকু বলতেই বৃদ্ধ কাঁদতে লাগল। ওয়াসিকও অশ্রুসজল হয়ে পড়ল। আবুল ফজল ছালেহ হাশেমী বলেন আমিও কাঁদতে শুরু করলাম।

ওয়াসিক বললেন, এ ব্যাপারে আপনি যে কষ্ট পেয়েছেন তা অনুগ্রহ করে ক্ষমা করে দিন। বৃদ্ধ বললেন আল্লাহর শপথ! হে ওয়াসিক! তোমার বংশ নবী (স.) এর বংশ হওয়ার কারণে শুধু আমি প্রথম দিনই ক্ষমা করে দিলাম। ওয়াসিক বললেন- জনাব আপনার নিকট আমার একটি কাজ আছে। বৃদ্ধ বললেন কাজটি যদি উপযুক্ত হয় তা হলে আমি জরুরী ভিত্তিতে করে দেব। ওয়াসিক বললেন যদি আপনি আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে যান তাহলে আমাদের সমস্ত যুব সমাজ আপনার কাছ থেকে অনেক উপকৃত হবে। বৃদ্ধ বল্লেন হে আমিরুল মু'মিনীন! যদি আপনি আমাকে সে স্থানে প্রেরণ করতে পারেন যেখান থেকে সে জালিম আমাকে বের করে এনেছিল তাহলে আপনার পাশে দাড়ানোর চেয়ে অধিকতর ভাল হবে। এখন আমি আমার পরিবার পরিজনের নিকট ফিরে যেতে চাই। তাহলে আমি তাদেরকে আপনার বিরুদ্ধে বদ দোয়া করা থেকে বিরত রাখতে পারব। অন্যথায় আমি তাদেরকে বদ দোয়া করতে বলে ছিলাম।

ওয়াসিক বললেন, জনাব আমাদের পক্ষ থেকে কি আপনার প্রয়োজনের সময় ব্যবহারের জন্য কিছু উপঢৌকন গ্রহণ করবেন? বৃদ্ধ বললেন, আমিরুল মু'মিনীন হাদিয়া গ্রহণ করা আমার জন্য জায়েয মনে করি না। কারণ আমি একজন সম্পদশালী লোক। সুতরাং আমার তা প্রয়োজন নেই। ওয়াসিক বললেন এছাড়া আর কোন প্রয়োজন থাকলে বলুন। বৃদ্ধ বললেন আপনি কি তা পুরন

করবেন? ওয়াসিক বললেন, জি জনাব পারব। বৃদ্ধ বললেন, তাহলে এখন আমাকে যেতে দিন। তাই এখন আমার প্রয়োজন। ওয়াসিক বললেন ঠিক আছে চলে যেতে পারেন। বৃদ্ধ মাআসাসালাম বলে চলে গেলেন।

ছালেহ বলেন, মোহতাদি বিল্লাহ বলেন, সে দিন থেকেই ''কোরআন মাখলুক'' বলা থেকে তওবাহ করে নিলাম। অদ্যাবধি তাই ধারনা যে ওয়াসিকও সেদিন থেকেই তওবাহ নিয়েছিলেন। এই ঘটনা অন্যান্য কিতাবেও বর্ণিত আছে। এজন্য এই ঘটনার মধ্যে কিছু পরিবর্তন থাকতে পারে। আর একারণেই এই ঘটনা বিভিন্ন বর্ণনা থেকে বর্ণিত। ইতিপূর্বেও হারুন ওয়াসিক এর শাসনামলে তওবার ঘটনা ঘটেছে।

আবুল কাসেম আহমদ মুতামিদ আলাল্লাহ বিন মুতাওয়াক্কিলের শাসন:

জাফর মুহতাদীর পর তার চাচাত ভাই আবুল কাশেম আহমদ মু'তামিদ আলাল্লাহ ক্ষমতায় আসেন। জাফর মুহতাদিকে যেদিন হত্যা করা হয় সেদিনই তিনি ক্ষমতার শপথ গ্রহণ করেন। কারণ তাকে স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি নামে মাত্র খলিফা ছিলেন। তার ভাই মুয়াফিক ইবনে মুতাওক্কিলকে পরামর্শ দাতা নিযুক্ত করে রাজ্যের যাবতীয় দায়-দায়িত্ব তার উপর ন্যস্ত করে দিয়েছিলেন। কিন্তু যখন মাওফিক এর ইন্তেকাল হল তখন তার ছেলে মু'তাযিদ ইবনে মাওফিককে পরার্শদাতা নিযুক্ত করে রাষ্ট্রে যাবতীয় দায়দায়িত্ব হস্তান্তর করা হয়। আহমদ মু'তাযিদ তার চাচা মু'তামিদ এর অসহযোগিতার কারণে দুর্বল এবং অধিনস্থ হয়ে থাখেন। যেভাবে আহমদ মু'তামিদ এর পিতা মু'তামিদের উপ অগ্রাধিকার এবং প্রভাবী ছিলেন। মু'তামিদ যদি কোন সামান্য বস্তুরও দাবী করতেন তাও তার হস্তক্ষেপ ছাড়া হত না। সুতরাং আহমদ মু'তামিদ নামে মাত্র খলিফা ছিলেন। কবি বিষয়টিকে নিজ ভাষায় সুন্দর করে ব্যক্ত করেছেনঃ

اليس من العجائب ان مثلى :: يرى ماقل ممتنعا عليه

''এটি কি আশ্চর্যের বিষয় নয় যে আমি ব্যতীত সামান্য বস্তুও কোন ব্যক্তির জন্য অর্জন করা সম্ভব হয়না।''

وتوخذ باسمه الدنيا جميعاك: ومن ذاك شئى فى يديه

"মূলত সমগ্র বিশ্বই তার সঙ্গে সম্পৃক্ত কিন্তু তার হাতে কিছুই নেই।"

কেউ কেউ লিখেন যে, একদা আহমদ মু'তামিদ সমুদ্রপাড়ে এতবেশী মদ পান করেছিলেন, যে কারণে তাঁর হুশ, অনুভূতি হ্রাস পেয়েছে। এ অবস্থায় তার মৃত্যু ঘটে। কেউ লিখেন যে, তিনি কোন এক চিন্তায় মগ্ন ছিলেন এবং বিছানয় শোয়ার সাথে সাথেই ইন্তেকাল করেন। কোন কোন ঐতিহাসিক লিখেছেন, তাকে গোশতের সাথে বিষ মিশ্রিত করে হত্যা করা হয়। ২৭৯ হিঃ শাওয়াল মাসে তার মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। ৫০ বছর তিনি জীবিত ছিলেন এবং ২৩ বছর রাজত্ব করেন। সম্ভবত তিনি বাগদাদেই ইন্তেকাল করেন।

তিনি বাদামী রঙ্গের, স্বাভাবিক উচ্চতা, নম্র মিজাজের লোক ছিলেন, মুখমন্ডল ছিল গোলাকার। আঁখিযুগল ছিল উজ্জ্বল এবং দাড়ি ছিল ছোট। তিনি তাড়াতাড়ি বার্ধক্যে পৌঁছে যান। আমোদ-প্রমোদ, আরাম-আয়েশে ব্যস্ত থাকতেন। নেশা অবস্থায় এবং কঠিন মুহূর্তে নিজ হাতে নিজেই কামড় দিতেন।

আহমদ মু'তাযিদ ইবনে মাওফিক এর শাসনকাল ঃ

চাচা মু'তামিদ যেদিন ইন্তেকাল করেন সেদিনই আবুল আব্বাস আহমদ মু'তাযিদ সিংহাসনে আরোহন করেন। মু'তাযিদ ছিলেন বীর পুরুষ এবং ন্যায় পরায়ণ, চরমপন্থী, জ্ঞানী, অত্যন্ত চতুর। নিজের মতামতকে প্রধান্য দানকারী এবং মাহাত্ম ও মর্যাদাবান বাদশাহ । তিনি অধিক সহবাসে অভ্যস্থ ছিলেন। যা তার মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তিনি ন্যায় বিচারক এবং স্বার্থক খলীফা ছিলেন। তার ব্যাপারে অনেক ঘটনা বর্ণিত রয়েছে। ২৯০ হিঃ ২৩ শে রবিঃ আউয়াল ৪৬ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। কারো কারো মতে তিনি ৪০ বছর বেঁচে ছিলেন। ৯ বছর ৯ মাস ক্ষমতায় ছিলেন। কারো মতে তঁর শাসনকাল ১০ বছর। তার গায়ের রং ছিল বাদামী।

আলী মুখতাফী বিল্লাহ ইবনে মু'তাযিদ এর শাসনকাল ঃ

মুতাযিদ এর পরে তার পুত্র আবু মোহাম্মদ মুক্তাফী বিল্লাহ সিংহাসনে বসেন। তার বংশ তালিকা এরূপ: আবু মোহাম্মদ ইবনে মুতাওয়াক্কিল ইবনে মু'তাসিম। তার পিতার ইন্তেকালের দিনই তার কাছ থেকে খেলাফতের বাইয়াত নেয়া হয়। ৬৯৩ হিঃ বাগদাদে মুখতাফীর ইন্তেকাল হয়। তিনি ৩৪ বছর জীবিত ছিলেন। কারো কারো মতে ৩০ বছর। ২ বছর ৮মাস ক্ষমতা পরিচালনা ছিলেন।

ইমাম জাহবী (রহ.) লিখেছেন যে, মুখতাফীর ইন্তেকাল জিলক্বদ মাসে ২৯৯ হিঃ হয়েছে। তিনি ৩১ বছর জীবিত ছিলেন এবং সাড়ে ৬ বছর শাসন ক্ষমতায় ছিলেন।

তিনি ছিলেন অত্যন্ত সুন্দর সুদর্শন চেহারার লোক। সৌন্দর্যে তিনি ছিলেন অতুলনীয়। রং ফর্সা, মধ্যমাকৃতির, কুচ কুচে কাল চুল বিশিষ্ট। আক্বীদা-বিশ্বাস ছিল খুবই ভাল। কোন ক্রমেই রক্তারক্তি পছন্দ করতেন না। পিতা মু'তাযিদ মুখতাফীর জন্য রাষ্ট্রের অবস্থা খুব সহজ করে গিয়েছিলেন। মুখতাফী আলী (রাঃ)র প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। তিনি ছিলেন তার সন্তানদের প্রিয় পাত্র।

কবি ইয়াহ ইয়া ইবনে আলী 'রিক্বাহ' নামক স্থানে একটি কবিতা লিখেন। যাতে আলীর সন্তানদের তুলনায় বনু আব্বাছের মান মর্যাদার উল্লেখ ছিল। এ কাব্য শুনেই মুক্তাফী তা পড়তে বারণ করে দেন এবং বলেন যে, তুমি বনু আলীকে সম্ভবত নিন্দা করছ। তিনি কি আমাদের চাচার বংশের আত্মীয় নহে? নিকটাত্মীয়ের ত্রুটি বিচ্যুতি ধরা আমি মোটেও পছন্দ করিনা। বনু আলী থেকে অনেক লোক শাসন করেছেন। তবে এর উদ্দেশ্য এই নয় যে, বনু আলীকে নিন্দা কর। কারণ যদিও তিনি আমাদের চাচার বংশের দিকের নিকটাত্মীয় হন। কিন্তু আমি তার নিন্দাবাদ পছন্দ করিনা। সুতরাং কবিতাটি পাঠও করা হবেনা শুনাও হবেনা।

আবুল ফজল জাফর মুক্তাদির বিল্লাহর শাসনকালঃ

আবুল ফজল জাফর মুক্তাদির ছিলেন পদচ্যুৎ খলিফা। তাকে দু'বার ক্ষমতা থেকে অপসারণ করা হয়েছে। মুখতাফী বিল্লাহর পর তার ভাই আবুল ফজল জাফর মুক্তাদির ইবনে মু'তাযিদ সিংহাসনে আরোহন করেন। তার ভাই ইন্তেকালের দিনই বাগদাদে তিনি শপথ গ্রহণ করেন। শপথ গ্রহণের সময় মুক্তাদির বিল্লাহর বয়স ছিল ১৩ বছর ৪০ দিন। এত কম বয়সে এখনোও পর্যন্ত কাউকে খলিফা নিযুক্ত করা হয় নি। আর না তার পরে এত কম বয়সে কোন খলিফা অতিবাহিত হয়েছেন। মুক্তাদির বিল্লাহ পরে দুর্বল হয়ে গিয়েছিলেন। এতে করে তার শাসনামলে রাষ্ট্র দুর্বল হয়ে যায়।

ছাহেবুন্‌নাশওয়ান লিখেছেন, মু'তাযিদের গোলাম ছাফী বলেছে যে, খলিফা মুতাযিদ দারুল হুরুম-এ যাচ্ছিলেন। আমিও তার সঙ্গে ছিলাম। তিনি

মুক্তাদির এর ঘরের দরজার কাছাকাছি পৌছলে হঠাৎ দাড়িয়ে কি যেন শুনতে থাকেন এবং পর্দার আড়ালে কিছু দেখতে থাকেন। ঘটনাটি সে সময়কার যখন মুক্তাদির সিংহাসনে আরোহন করেছেন। মাত্র পাঁচ বছর অতিবাহিত হয়েছে। তিনি দেখতেছিলেন যে মুক্তাদির বসে আছেন। আশেপাশে তার সমবয়সের ১০ জন চাকর উপস্থিত ছিল। রৌপ্যের একটি বড় পাত্রে আঙ্গুরের থোসা রাখছে। মূলত সময়টি এমন ছিল যখন আঙ্গুর পাওয়া যাওয়া মুশকিল। মুক্তাদির নিজেও আঙ্গুরের একটি থোসা খাচ্ছিল। আর চাকরগণও একটি একটি করে আঙ্গুর খাচ্ছে। এমনিভাবে আঙ্গুর খাওয়ার প্রতিযোগিতা শুরু হল। আবার যখন পালা আসে তখন প্রথম বারের তুলনায় তিনি একাই সবার অংশের পরিমান আঙ্গুর খেয়ে ফেলেন। শেষ পর্যন্ত সব আঙ্গুর নিঃশেষ হয়ে গেল। ঘটনা দেখে মু'তাযিদ রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে গেলেন। তিনি দ্রুত সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন কিন্তু ঘরে প্রবেশ করলেন না।

ভৃত্য ছাফী বলল দেখলাম, মু'তাযিদ বিষন্ন মনে প্রস্থান করছে। আমি বল্লাম, আমার মুনীব! আপনিতো সব কিছুই দেখলেন। এর কারণ কি? জবাবে মু'তাযিদ বললেন, আল্লাহর শপথ! আমার যদি লজ্জা না হত এবং জাহান্নামের ভয় না হত তাহলে আমি আজ এই ছেলেকে হত্যা করে ফেলতাম। এ জন্য মুক্তাদিরকে হত্যা করার মাধ্যমে জনগণের কল্যাণ ও উন্নতি দেখা যেত। আমি বল্লাম জনাব! এই ছেলে এমন কি কাজ করেছে, যা আপনার কাছে এতই দৃষ্টিকটু মনে হল? মু'তাযিদ বললেন, দেখ আমি যা বলি তা অভিজ্ঞতার আলোকেই বলি। আমার অবস্থা হল আমি যাবতীয় কাজ কারবারে পরিপাটি সৃষ্টি করা এবং দুনিয়াকে ফ্যাসাদ থেকে মুক্ত করা । আমি তো মরে যাব। আমার খুব ভাল জানা আছে যে,আমার ছেলে ব্যতীত সাধারণ জনগণের জন্য আর কাউকে খেলাফতের উপযুক্ত পাওয়া যাবে না। আর না সাধারণ জনগনও তাকে ব্যতীত অন্য কাউকে মেনেনিবে। অচিরেই আমার সন্তানকে সিংহাসনে বসানো হবে। কিন্তু আমার আশা নেই যে, পুত্র মুক্তাফী তখন বেঁচে থাকবে। তার দীর্ঘায়ু হবে না। কারণ তার কণ্ঠনালী ত্রুটিযুক্ত । অচিরেই সে মৃত্যু বরণ করবে। মুক্তাফীর ইন্তেকালের পর জনগণ মুক্তাদিরকে অল্প বয়সেই খলিফা নির্বাচিত করেন। মুক্তাদির স্বাভাবিক ভাবেই দানবীর হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করবেন। আর আমি এও দেখলাম, যে পরিমান তিনি একা আহার করলেন, সে পরিমান তিনি সমস্ত

ভৃত্যকে খাওয়ালেন। প্রকৃত পক্ষে আঙ্গুর সে সময় দুস্প্রাপ্য ছিল। শিশুদের মধ্যে লোভ-লালসাই বিজয়ী থাকে। তার বয়স ছিল কম। সে কারণে তার কাছে স্ত্রী লোকের লজ্জা বেশী ছিল। সে তো জমাকৃত সমস্ত মালামাল নস্যাৎ করে ফেলবে। যেমনিভাবে আঙ্গুরকে বন্টন করল। এর প্রভাবে ভিত্তি দুর্বল হয়ে যাবে। ঋণ বৃদ্ধিপাবে। মামলা মোকাদ্দমা পুঞ্জিভূত হয়ে যাবে। জনগণ তার অধীনতা থেকে সরে যেতে থাকবে। ভান্ডারের যাবতীয় মালামাল বের হয়ে যাবার জন্য তৈরী থাকবে। এমন সব কারণ সৃষ্টি হয়ে বনু আব্বাসের খেলাফতের নিঃশেষ হয়ে যাবে।

আমি বললাম, মাননীয় হুজুর! আমার মুনীব! আল্লাহ পাক আপনার জীবনে বরকত দিন। মুক্তাদির আপনারই শিক্ষা অর্জন করবে। আপনার জীবদ্দশায়ই অর্ধেক বয়সে পৌছে যাবে। আপনারই উত্তম চরিত্রে ও শিষ্টাচারে ভূষিত হবে। আপনার মন মাথায় যা আসছে তা খোদা না করুন।

মুতাযিদ বললেন ছাফি তোমার অমঙ্গল হউক। স্মরণ রেখো আমি যা বলেছি। ছাফী বলল যে, আমি একদা মুক্তাদির এর বালিশের পাশে অনেক্ষন দাড়িয়ে থাকলাম। তিনি আরাম আয়েশ এবং খেল তামাশায় মত্ত ছিলেন। হঠাৎ করে ধন-সম্পদ উপস্থিত করার জন্য আদেশ করলেন। বায়তুলমাল থেকে টাকার থলি আনা হল। তিনি এগুলোকে দাসীদের জন্য উৎসর্গ করে দিলেন এবং তাদের সাথে খেলতে আরম্ভ করলেন। আমার তখন মুনীব মু'তাযিদ এর কথা স্মরণ হল। এরকম যৌনউমত্ত দেখে মন্ত্রী পরিষদ ও সেনাবাহিনীর সবাই মুক্তাদির এর উপর আক্রমন ও গ্রেফতার করে হত্যা করে ফেলল। জনগণ আব্দুল্লাহ ইবনে মা'তাজ এর নিকট চলে এল এবং তার বায়আত গ্রহণ করল।

আবদুল্লাহ ইবনে মো'তাজ আর মুরতাজা বিল্লাহর শাসনকালঃ

মুক্তাদিরকে যেদিন ক্ষমতাচ্যুত করা হয় সেদিনই তার কাছ থেকে বাইয়াতের শপথ নেয়া হয়। তাকে এই শর্তের উপর বাইয়াত করানো হয় যে তিনি কখনো যুদ্ধে যাবেন না । আর না রক্তারক্তি করবেন। শপথের পরই মুক্তাদিরের নিকট তা লিখে পাঠিয়ে দেয়া হল যে, তিনি তার মা ও দাসীদের সঙ্গী ইবনে তাহেরের আবাস স্থলে অবস্থান গ্রহণ করবেন। এর সহিত হাসান ইবনে হামদান এবং নগর রক্ষক ইবনে আমরু তিয়াহকে এই নির্দেশ দেয়া

হয়েছিল এ দুজন মুক্তাদিরের ঘরে গিয়ে নিরাপদ হয়ে গেল মনে হয়। এদের পেছনে দু'জন গোলাম লেলিয়ে দেয়া হল- যারা পথরের বৃষ্টি- বর্ষন করতে আরম্ভ করল। উভয় দলের মধ্যে মারাত্মক যুদ্ধ হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত মুক্তাদিরের সঙ্গীদের বিজয়ার্জিত হল। উভয় গোলাম মার খেয়ে প্রত্যাবর্তন করল। মর্তাজা বিল্লাহও মার খেলেন। তার সাথীবর্গ সব বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। মুর্তাজা বিল্লাহ ইবনুল জাছাছ এর ঘরে গিয়ে আত্মগোপন করলেন। মর্তাজা বিল্লাহর হাতে রাষ্ট্র ক্ষমতা ২৪ ঘন্টার বেশী স্থায়ী হয় নি। এ কারণে ঐতিহাসিকগণ এ সামান্য সময়ের খেলাফতকে স্বীকৃতি দেননি।

কিছু দিন পর মুক্তাদির বিল্লাহর শক্তি ফিরে এল। তিনি মুর্তাজা বিল্লাহর উপর বিজয়ী হলেন। তাকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়। জনগণকে বলা হল যে, মুর্তাজার ইন্তেকাল স্বাভাবিকভাবেই হয়েছে। মুর্তাজাকে রাজধানী থেকে বের করে তার ঘরের সামনে আঙ্গিনায় কবরস্থ করা হয়। তখন মুর্তাজা বিল্লাহর বয়স ছিল আনুমানিক ৫০ বছর।

ইবনে খাল্লেকান লিখেন, মুর্তাজা বিল্লাহ একজন নাম করা কবি, মিষ্টভাষী এবং স্পষ্টভাষী লোক ছিলেন। উলামায়ে কেরাম এবং সহিত্যিকদের সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিল ভাল। ভাল উপমা দানে পারদর্শী ছিলেন। তাকে ডিঙ্গিয়ে কেউ সামনে অগ্রসর হতে পারত না। আবার পরবর্তীতে বিরাট একটা দল তাকে সঙ্গ দিয়েছে। যারা মুক্তাদিরকে অপসারণ করতে পূর্ণ সহযোগিতা করে ছিল। আবার মর্তাজা বিল্লাহর কাছে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করে । মুর্তাজা বিল্লাহ ২৪ ঘন্টা সময়ও ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারেননি।

মুক্তাদির বিল্লাহর অনুগামীরা নাশকতামূলক কাজ করতে লাগল। মুর্তাজা বিল্লাহর সঙ্গী সাথীদের সহিত যুদ্ধ হল। শেষ পর্যন তমুর্তাজার সঙ্গি সাথীরা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। মুর্তাজা কোথায় যেন আত্মগোপন করে ছিলেন। পরে অবশ্য এ রাতেই তাকে পাকড়াও করা হয়। মুর্তাজাকে প্রেফতার করে মুক্তাদির এর নিকট উপস্থিত করা হলে তাকে বরফের ভিতর ডুবিয়ে রাখার নির্দেশ দেয়া হয়। তিনি বরফেই পড়ে থাকেন। এই সময় মুক্তাদির মদের নেশায় বিভোর ছিলেন । তখন মুর্তাজার মৃত্যু ঘটে। এই ঘটনা আনুমানিক ৬৯৬ হিঃ রবিঃ আউয়াল মাসে ঘটেছিল। এ জন্য মুর্তাজাকে খলিফাদের মধ্যে গণ্য করা হয়না। কারণ শাসন

একদিন স্থায়ী হয়নি স্থিরও হয়নি।

এরপরই মুক্তাদির বিল্লাহর শাসন ক্ষমতা সৃদৃঢ় হয়ে যায় এবং কয়েক দিন পরই অন্তরঙ্গ খাদেমদের একথা জানা হল যে, মুক্তাদির তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে গ্রেফতার করতে চায়। অথচ বন্ধুবর এ সময় সেনাবাহিনীর পুরোভাগে নেতৃত্ব দিচ্ছিল। মুক্তাদির তখন অস্বীকার করে বলেছিলেন এ ধরনের ষড়যন্ত্র আমার বিবেচনায় নেই। বন্ধুবর শেষ পর্যন্ত কথাটা গোপন করার চেষ্টা করে। কিন্তু কথাটি গোপন থাকেনি। স্বাভাবিব কথার মত তা প্রকাশ হয়ে যায়। এরপর প্রজা ও অন্যান্য খাদেমদের মধ্যে তা বিস্তৃতি লাভ করে।

জনগণের ধারনা হল যে, যে সব ঘটছে তা সবই মুক্তাদির এর ইঙ্গিতেই হচ্ছে। বন্ধু বর বারো হাজার ঘোড়সওয়ার সাথে নিয়ে রাজধানীতে হঠাৎ করে আক্রমণ করে বসেন। তারা মুক্তাদির এর একদম কাছে চলে এসে তাকে এবং তার মাকে গ্রেফতার করে তার (বন্ধুর) মহলে নিয়ে এল। এ সময় সৈন্যরা রাধানী লুন্টন করে ফেলে। মুক্তাদির যখন এ অবস্থা দেখলেন তখন তিনি স্বেচ্ছায় অপসারিত হয়ে গেলেন। এবং অপসারিত হওয়ার সংবাদ সমগ্র শহরে প্রচার করে দিলেন। অপসারিত হওয়ার দ্বিতীয় দিনে যখন সূর্যোদয হল তখন সৈন্যরা কোলহল আরম্ভ করে দিল। শহর কোতোয়ালকে হত্যা করা হল- মন্ত্রী ইবনে মাকুলা পলায়ন করলেন প্রহরীরা গায়েব হয়ে গেল।

কিছু দিন পর মুক্তাদির আবার ফিরে এলেন এবং সিংহাসনে বসে গেলেন। এবং তার ভাই কাহের বিল্লাহকে ডেকে সামনে বসালেন। তার কপালে চুম্বন করলেন এবং বললেন ভাই কাহের এতে তোমার কোন দোষ নেই। জবাবে কাহের বললেন, আমিরুল মু'মিনীন আমি আপনার ব্যাপারে আল্লাহর নিকট পানাহ চাই। তিনি বললেন, আল্লাহর কছম! এবং রাছুলুল্লাহ (স.) এর অধিকারের কছম আমি কখনোই আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করি নি।

পরে জানা গেল, মন্ত্রী ইবনে মাকুলাও ফিরে এসেছেন। মুক্তাদির বিল্লাহর ২য় বার খেলাফতের জন্য সমগ্র শহরে ফরমান জারী করে দেয়া হল। এ মুহুর্তে তার দেহরক্ষীর সাথে যুদ্ধ বেধে গেল। মুক্তাদির আবার মাদকাসক্তির সাগরে ডুবে গেল। সুযোগ বোঝে বড় বড় সম্প্রদায় তাকে ঘেরাও করে ফেলল। সর্বশেষ এক বার্বারীরা মুক্তাদিরকে হত্যা করে ফেলে। মাথা কেটে শরীর থেকে কাপড়

খুলে ফেলে। এরপর সব বার্বারী দেহ রক্ষীর নিকট চলে এলো। এমন সময় আকরাদ গোত্রের একজন লোক যাচ্ছিল। সে দেখল মুক্তাদির নিহত হয়ে খোলা ময়দানে পড়ে আছে। লোকটি লতাপাতা দিয়ে তাকে ঢেকে দাফন করল। যাতে করে কবরের কোন নিদর্শন বুঝা না যায়।

৩১৬ হিঃ ২৭শে শাওয়াল রোজ বুধবার মুক্তাদির নিহত হন। তিনি ৩৮ বছর ১ মাস জীবিত ছিলেন। তিনি শাসনকার্য পরিচালনা করেন ২৪ বছর ১১মাস। এর মধ্যে তিনি দু'বার অপসারিত হন এবং শেষ পর্যন্ত তাকে হত্যা করা হয়।

হযরত যাহবী (রহ.) লিখেছেন যে, মুক্তাদির ২৫ বছর রাজ্য শাসন করেছেন। তিনি ২৮ বছর জীবিত ছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত অপব্যয়ী, স্বল্প বুদ্ধি সম্পন্ন। বিচার কাজে অত্যন্ত দূর্বল। তিনি এক দাসীকে অত্যন্ত মূল্যবান মুতি বখশিশ দিয়েছিলেন। এর ওজন কম করে হলেও তিন মিছকাল। কেউ কেউ বলেন সে মুতির দাম এত বেশী যে, সে যুগে এর মূল্য ছিল ৮০ লক্ষ দেরহাম। তার বংশধরের মধ্যে রাজী বিল্লাহ, মুত্তাকী বিল্লাহ, ইছাহাক এবং মুতিউল্লাহ প্রমুখকে ছিলেন।

মোহাম্মদ কাহের বিল্লাহ প্রমুখের শাসনামলঃ

মুক্তাদির বিল্লাহর ইন্তিকালের পর তার ভাই আবু মানছুর মুহাম্মদ ইবনে মু'তাযিদ বিল্লাহ ক্ষমতায় আসেন। আনুমানিক শাওয়াল মাসের শেষ দিকের যে কোন এক রাত তিনি বাগদাদে শপথ বাক্য পাঠ করেন। সিংহাসনে আরোহন করেই তার ভাতিজা মুক্তাফি বিল্লাহকে গ্রেফতার করেন। মুক্তাফী বিল্লাহকে এমন এক ঘরে আবদ্ধ করে রাখেন যা ইট ও কাঁচ দ্বারা নির্মিত ছিল। তিনি বন্দী অবস্থাতেই ইন্তিকাল করেন। কাহের মুক্তাদির এর মা' সাইয়্যেদাহকেও গ্রেফতার করে বন্দী করেন এবং তার উপর এত বেশী করারোপ করেন যা তার পক্ষে অত্যন্ত বোঝা হয়ে গিয়েছিল। তাকে ভয় দেখাতেন, ধমক দিতেন, মারপিট করতেন, কষ্ট দিতেন, অত্যাচার-নিপীড়ন করতেন। এমন কি তাকে উল্টাভাবে লটকিয়ে কষ্ট দেয়া হত। আর তার পেশাব নাকে মুখে প্রবাহিত হত। সময় সময় সাইয়্যেদাহ বলতেন যে আল্লাহর কিতাব মতে আমি কি তোমার মা নই? ইতিপূর্বে প্রথমে আমার ছেলের চেয়ে তোমাকে বিশে হিস্যা দেইনি? এর পুরস্কার

স্বরূপ তুমি আমাকে সাজা দিচ্ছ। এমন সময় তুমি আমার উপর করারোপ করলে যখন আমার যাবতীয় সম্পদ শেষ হয়ে গেছে। এর ভিতরই সাইয়্যেদাহ ইন্তেকাল করেন। এর কয়েকদিন পর কাহেরের সেনাবাহিনী বিদ্রোহী হয়ে উঠে। তার মহলের প্রধান ফটকে আক্রমন করে শক্তভাবে অভ্যুত্থান ঘটালো। এ সময় কাহের গোসল খানার ছাদে পালিয়ে আত্মগোপন করলেন। কিছুক্ষণ পর অবশ্য সৈন্যরা তাকে খুজে পেয়ে পাকড়াও করল। সিংহাসনচ্যুত করে তার চোখ খুলে ফেল্ল। এই ঘটানা ৩২২ হিঃ জমাঃ ছানি মাসে ঘটে।

ইবনুল বিত্বিক লিখেছেন, কাহের কি ধরনের পাপে জড়িত ছিলেন তা ইতিহাসে পাওয়া যায় না। ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন যে, কোন এক জ্ঞানী বর্ণনা করেছেন যে, আমি বাগদাদের মানছুর জামে মসজিদে নামাজ আদায় করতেছিলাম। হঠাৎকরে আমি এক ব্যক্তিকে দেখলাম যে তার চেহারা বিকৃত, গায়ে হলুদ রঙ্গের জুব্বা। এ অবস্থায় সে বলতেছিল যে হে জনগণ তোমরা আমাকে ছদকা দ্বারা সাহায্য কর। গতকাল আমি ছিলাম প্রেসিডেন্ট আর আজ আমি মুসলমানের মধ্যে সব চেয়ে বেশী দরিদ্র। আমি জনগণকে বললাম ভাইসব তার ব্যাপারে কি মনে হয়? আমাকে বলা হল তিনি কাহের বিল্লাহ। এর থেকে মানুষের শিক্ষা নেয়া দরকার। (আল্লাহ তায়ালা তার রাগ এবং ক্রোধ থেকে হেফাজতে রাখুন।)

কাহের বিল্লাহ ৬ বছর ৬মস এক দিন শাসন ক্ষমতায় ছিলেন। কাহের ছিলেন বড় অলস, খুনী, নেশাবাজ ব্যক্তি। তার নিকট একটি বল্লম ছিল। এর দ্বারা কাউকে হত্যা না করা পর্যন্ত হাতে নিতেন না। যদি ছালিমুত্তাবা লোক দরবারে উপস্থিত না থাকতেন তাহলে সমস্ত লোককে তিনি হত্যা করে ফেলতেন।

আহমদ রাজি বিল্লাহ ইবনে মুক্তাদির বিল্লাহর শাসনকালঃ

কাহের বিল্লাহর অব্যাহতির পর তার ভাই আবুল আব্বাস আহমদ রাজি বিল্লাহ বিন মুক্তাদির সিংহাসনে আরোহন করেন। যেদিন কাহের বিল্লাহকে ক্ষমতা থেকে অব্যাহতি দেয়া হয় সে দিন তাকে শপথ বাক্য পাঠ করানো হয়। রাজিবিল্লাহ আবু আলী ইবনে মাক্কলকে তার মন্ত্রী নিযুক্ত করেন। সিংহাসনে আরোহন করেই তিনি কাহেরের জেলখানা থেকে সকল বন্দিকে মুক্ত করে দেন।

তিনি আমীর মোহাম্মদ ইবনে রায়েক্বকে ডেকে পাঠান। সে সময় চরমভাবে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দেয়। মানুষের সাথে মেলামেশা করা যখন দুরহ হয়ে যায়, মন্ত্রীরা তার আয়ত্তের বাইরে চলে যায় তখন তার মোহাম্মদ বি রায়েক্বের প্রয়োজনীয়তা অনুভুত হল। এজন্য তাকে বাগদাদ থেকে ডেকে পাঠিয়ে প্রধান উযির পদে নিয়োজিত করেন। রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব তাকে দেয়া হয়। তাকে অনেক বখশিশ ও সম্মান দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়। রাজধানীর পশ্চিম অংশের দায়িত্ব তাকে প্রদান করা হয়। এ সময় অন্যান্য মন্ত্রীদের প্রতিশ্রুতি বিনষ্ট হয়ে যায়। মন্ত্রী পদ ছাড়া তাদের আর কিছুই বাকী থাকে নাই। শুধু মাহাত্ম ও ক্ষমতা তার হাতেই থাকে যে জোর করে কোন এলাকার উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে।

৩২৪ হিঃ ২৫শে জিল তারিখেই মোহাম্মদ ইবনে রাইক্বেকে এ দায়িত্ব দেয়া হয়। পরবর্তী বছর অর্থাৎ ২৫ তম বছরের শুরুতে সারা দুনিয়া ভয়াবহ বিশৃংখলা দেখাদিল। বিভিন্ন এলাকার প্রধানরা নিজ নিজ এলাকা দখল করে নেয় । যার হাতে যে এলাকার দায়িত্ব ছিল সে এলাকার প্রশাসক সে নিজেই হয়ে যায়।

আব্দুল্লাহ আল বারদি ও তার ভাই এর অধীনে ছিল বছরা, ওয়াসিত আহওয়াজ ইত্যাদি এলাকা। ইমাদুদ্দিন ইবনে বুইয়ার হাতে ফারেস। ইবনে হামদানের অধিনে মৌছেল, বকর, রবিয়া, মুজার ইত্যাদি। আখলিদ ইবনে তুফাজ এর অধীনে ছিল মিশর ও সিরয়া, মাহদির হাতে মিরাকশ আফ্রিকা। উমাইয়াদের অধিকারে ছিল স্পেন। নছর বিন আহমদ ছামানী এর অধীনে ছিল খুরাসান এবং এর আশপাশের এলাকা। আবু তাহের কারা মতীর হাতের ছিল ইয়ামামা, বাহরাইন। দাইলাম এর হাতে ছিল তিবরিস্তান এবং জুরজান অঞ্চল। রাজিবিল্লাহ এবং আমির মোহাম্মদ ইবনে রাইক্ব এর অধীনে শুধু বাগদাদই ছিল। শেষ পর্যন্ত রাজ্যটি টুকরা টুকরা হয়ে যায়। বিচার বিভাগ ধ্বংস হয়ে যায়। খেলাফতের মান সম্মান ভুলুণ্ঠিত হয়। রাষ্ট্র হয়ে পড়ে অত্যন্ত দুর্বল। চতুর্দিকে বিচ্ছিন্নতা ছড়িয়ে পড়ে। খলিফা রাজী বিল্লাহ লাম্পের বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়। এছাড়াও আরাম আয়েশ এবং অধিক যৌন মিলনের কুপ্রভাব তাঁর দেহে পরিলক্ষিত হল। এতে করে খলিফা রাজী বিল্লাহ ৩২৯হিঃ ১৫রবিঃ আউয়াল শনিবার দিনগত রাতে ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয় ৩২ বছর

কয়েক মাস। ৬ বছর ১০ মাস তিনি ক্ষমতা পরিচালনা করেন।

খলিফা রাজী বিল্লাহ ছিলেন প্রশস্ত মনের অধিকারী, উদার সাহিত্যিক এবং কবি। কারো কারো মতে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ২২ বছর । ৬ বছর ৬ মাস ক্ষমতায় ছিলেন। তিনি বাদামী রংয়ের হালকা পাতলা গড়নের লোক। তার রচিত অনেক ভাল ভাল কবিতা ছাপা হয়েছে। একদা তিনি ছামরা নামক স্থানে তাকরীর করেন। সে বক্তব্য খুবই প্রভাব বিস্তার করে। এরপর বেশ কয়েক দিন তিনি অসুস্থ ছিলেন। রক্ত বমি করেন এবং দুনিয়া থেকে চির দিনের জন্য বিদায় নেন।

ইব্রাহীম মুক্তাফীর শাসনামল ঃ

খলিফা রাজী বিল্লাহর ইন্তিকালের পর তাঁর ভাই আবুল আব্বাস ইব্রাহীম মুক্তাফী বিল্লাহ ইবনে মুক্তাদীর ইবনে মু'তাযিদ ক্ষমতায় আরোহন করেন। ভাই রাজি বিল্লাহ যেদিন দুর্ঘটনার শিকার হন সেদিনই তিনি শপথ গ্রহণ করেন। ভাইয়ের মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে মুক্তাফী দ্রুত দু'রাকায়াত শোকরানা নামাজ আদায় করেন এবং জাকজমক ভাবে মিম্বরে আরোহন করেন। খলিফা মুক্তাফী ছিলেন দ্বীনদার এবং খোদাভীরু এজন্য তার নাম মুত্তকী বিল্লাহ রাখা হয়। মুক্তাফী রাষ্ট্রের যাবতীয় দায়-দায়িত্ব তুর্কীদের হাতে ন্যাস্ত করেন। রাজ্য চলত শধু মুত্তকাকীর নামে। এর কয়েক দনি পরই নব বর্ষ উদযাপনের মাধ্যমে বাগদাদের খলিফা নিযুক্ত হন। মুক্তাফী বিল্লাহকে অপসারিত করে তার চাচাত ভাই মুস্তাকফী বিল্লাহকে সিংহাসনে বসানো হয়। এরপরে মুত্তাকী বিল্লাহর চক্ষু সেলাই করে সিন্দিয়ার নিকটবর্তী কোন কেদ্বীপে নির্বাসনে পাঠিয়ে দেয়া হয়। প্রকৃক পক্ষে তিনি নিজেই শাসনভার হস্তান্তর করেন। ৩৩৩ হিঃ ২০ শে ছফর মাসে এ ঘটনা সংঘটিত হয়। মুত্তাকী ৩ বছর ১১মাস ক্ষমতায় ছিলেন। কারো কারো মতে ৪ বছর। ৩৭৭ হিঃ তিনি ইন্তেকাল করেন। তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন ২৯৭ হিঃ। তার পিতা তার থেকে মাত্র ১৫ বছরের বড় ছিলেন। মুত্তাকী ছিলেন রোজাদার, তাহাজ্জুদ আদায়ে অভ্যস্ত। নিয়মিত কোরআন মজিদ তেলাওয়াত করতেন। নেশা জাতীয় দ্রব্য তিনি কখনোই স্পর্শ করেন নি। ক্ষমতা থেকে অপসারিত হওয়ার পর তিনি ২৪ বছর জীবিত ছিলেন।

আব্দুল্লাহিল মুস্তাকফী বিল্লাহর পরে তাঁর চাচাত ভাই আবুল আব্বাস

আব্দুল্লাহিল মুস্তাকফী বিল্লাহ ইবনে মুক্তাদী ইবনে মু'তাযিদ সিংহাসনে আরোহন করেন। খলিফা মুস্তাকফী বিল্লাহকে যেদিন তাড়ানো হয় সেদিনই তিনি শপথ বাক্য পাঠ করেন। যেদিন মুস্তাকফী বিল্লাহকে শাসন ক্ষমতা দেয়া হয়, সেদিন নববর্ষ উদযাপন করে এবং শাহী পোশাক পরিধান করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হাতে নেন। তার শাসনামলে মা'যিলুদ্দৌলা ইবনে বুইয়াহ বাগদাদে আগমন করেন। তাকে শাহী পোষাক ও উপঢৌকন দিয়ে 'মাওরায়ে বার' এর শাসন ভার ন্যাস্ত করেন। তার নামে মুদ্রা চালু করা হয়। মিম্বরে আলোচনার জন্য তিনি পরামর্শ দেন এবং তার উপাধি দেযা হয় মা'যিলুদ্দৌলা। তিনি ছিলেন বুইয়া গোত্রের সবার বড়। ইমাদুদ্দৌলার ব্যাপারে অনেক আজব আজব কথা রয়েছে। (বিস্তারিত 'হা' অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে)। এরা দুভাইয়ের উপাধিই রুকনুদদ্দৌলা রাখা হয়েছিল। সম্ভবত তার আরো এক ভাই ছিল। তার সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা আছে। (যা 'দাল' অধ্যায়ে বর্ণনা করা হবে ইনশাআল্লাহ)।

মা'যিলুদ্দৌলা সম্ভবত ৩৩৪ হিজরী সনে আগমন করেন। তার আমলেই মস্তাকফীকে অপসারণ করা হয়। অপসারণের কারণ হিসেবে বলা হয়েছে যে, মা'যিলুদ্দৌকে কেউ বলল, মুস্তাকফী আপনাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করছে। এর কয়েকদিন পর মাযিলুদ্দৌলা মুস্তাকফীর দরবারে আগমন করলে তাকে কদম বুছি করলেন এবং হাতে চুমুও খেলেন। তার জন্য চেয়ার আনা হয়। মাযিলুদ্দৌলা এর উপর বসলেন। কিছুক্ষণ পর দাউলম এর দু'জন লোক মাযিলুদ্দৌলার দিকে হাত সম্প্রসারিত করেন। মুস্তাকফী মনে করলেন এরা আমার হাতে চুমু খেতে চায়। তখন তারা মুস্তাকফীর হাত শক্ত করে ধরে নিজেদের দিকে নিয়ে এলো এবং যে আসনে মুস্তাকফী বসা ছিলেন তা উল্টিয়ে ফেলে দিল। এরপর মস্তাকফীর পাগড়ী নিয়ে নেয়া হলো। তারা মুস্তাকফীকে টেনে হেচড়ে মা'যিলুদ্দৌলার নিকট নিয়ে এলো এবং তাকে বন্দী করা হল। এরপর তাকে ক্ষমতা থেকে অপসারণ করা হয় এবং তার চক্ষু ফোটো করে দেয়া হয়। রাজধানীতে ব্যাপকভাবে লোট তরাজ করা হয়। এমনকি সামান্য বস্তুও রক্ষা পায়নি। ৩৩৪ হিঃ ২২ জমাঃ ছানী তারিখে এ ঘটনা ঘটে। ৩৩৪ হি মাযিলুদ্দৌলার ঘরেই মুস্তাকফি মৃত্যু বরণ করে। তিনি ৪৬ বছর বয়স পেয়েছিলেন। সিংহাসনে ছিলেন এক বছর ৪ মাস।

আবুল ফজল মুতী লিল্লাহ ইবনে মুক্তাদির এর শাসনামল ঃ

খলিফা মুস্তাকফী বিল্লাহর অপসারনের পর তার চাচাত ভাই আবুল ফজল মুতীলিল্লাহ ইবনে মুক্তাদির ইবনে মু'তাযিদ সিংহাসনে আরোহন করেন। সিংহাসনে আরোহনের সময় তার বয়স ছিল ৩৪ বছর। চাচাত ভাই মুস্তাকফী বিল্লাহর অপসারনের দিনই তার কাছ থেকে শপথ নেয়া হয়। রাজ্যের অন্যান্য কাজসমূহ মাযিলুদ্দৌলার উপরই ন্যাস্ত করা হয়। মুতী লিল্লাহর শাসনামলে ২৫৬ হিজরীতে বাগদাদে মা'যিদ্দৌলার ইন্তেকাল হয়। ইরাকে মাযিদ্দৌলার কর্তৃত্ব ২১ বছর ১১ মাস স্থায়ী হয়। মাযিদ্দৌলা বীর সাহসী, নির্ভীক ও অত্যন্ত শক্তিশালী ছিলেন। তবে তিনি ছিলেন চরিত্রহীন। সৌভাগ্য তার পদচুম্বন করেছিল। ইতিপূর্বে ইসলামের চার খলিফা ব্যতীত কোন খলিফাই এমন সৌভাগ্যের চরম শিকরে পৌছতে পারেননি।

মাযিদ্দৌলার ইন্তেকালের পর তার সুযোগ্য পুত্র ক্ষমতার মানদন্ড হাতে নেন এবং পিতার শাহী পোশাক পরিধান করেন। তাকে জাক জমক সহকারে সিংহাসনে বসানো হয়। তার শাসন স্থায়ী হয়েছিল। মুতীলিল্লাহর শাসনামলে মিশরের গভর্ণর কাফুর আখশিদী ৩৫৮ হিঃ ইন্তেকাল করেন। তিনি ২২ বছর যাবৎ মিশরে রাজত্ব করেন। কাফুরের ইন্তেকালের পর মা'যিদ্দিনিল্লাহ'র গোলাম জাওহার ক্বায়েদ যিনি কিরওয়ানের গভর্ণর ছিলেন মিশরে আগমন করেন। মাযিদ্দিনিল্লাহর আনুগত্য করার জন্য তিনি জনগণকে আহবান করেন এবং জনগণ তার ডাকে সাড়া দিয়ে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করে। মিশর থেকে আব্বাসীয় বংশের প্রভাব নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। জাওহার সেনাপতিদের বসবাসের জন্য মিশরের রাজ্য গঠনে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। এ সমস্ত যাত্রাবিরতীর স্থান অতিক্রম করার পর মাযিদ্দৌল্যাহ ৮ই রমজান ৩৬২ হিঃ মিশরে প্রবেশ করেন এবং তিনিই মিশরে প্রথম ফাতেমী বংশের খলিফা নিযুক্ত হন। সবুক্তগীন তুর্কী মাযিদ্দৌলার প্রধান প্রহরী ছিলেন। বাগদাদে তার প্রভাব এতই বেশী হয়ে যায় যে, তিনি বাগদাদকে করায়ত্ব করে ফেলেন। তার প্রভাব প্রতিপত্তি মাযিদ্দৌলার কাছে দিনদিন বৃদ্ধি পেতে থাকল। এমন কি তিনি জনগণের সাথে মেলামেশা করতে লাগলেন। তার আদেশ কার্যকর হতে লাগল। মুতী তার ভয় অনুভব করে কোন এক অজানা রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়লেন। তাই তিনি ইচ্ছা করে শাসন ক্ষমতা ছেড়ে দিলেন এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা তার পুত্র আব্দুল করিমের হাতে দিয়ে

দেন। কেউ কেউ বলেছেন আবু বকরের হাতে ন্যস্ত করেন। কেউ কেউ বলেছেন আবু বকর আঃ করিমের উপাধি ছিল। সিংহাসনে আরোহনের পর তিনি ত্বায়িউল্লাহ নামে খ্যাতী অর্জন করেন।

এ সকল ঘটনা ৩২৩ হিঃ ১৩ই জিলক্বদে অনষ্ঠিত হয়। তিনি ৩৬৪ খৃঃ 'দীরে আকুল' নামক স্থানে ইন্তেকাল করেন। মৃত্যু এবং অপসারণ এর মধ্যে মাত্র ২ মাস ব্যবধান ছিল। সর্বমোট ৬৩ বছর বয়স পান। তিনি ছিলেন শক্তিশালী এবং বিশ্বস্ত বাদশাহ। তবে তিনি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন। নামমাত্র খেলাফত ব্যতীত আর কোন কিছুই তাঁর ছিলনা । তিনি ২৯ বছর ৪ মাস শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন।

আবু বকর আব্দুল করিম আত্তায়ি লিল্লাহর শাসন কালঃ

খলিফা মুতী লিল্লাহর ক্ষমতাচ্যুতির পরে তার পুত্র আব্দুল করিম আবু বকর আত্তয়িলিল্লাহ সিংহাসনে ক্ষমতায় আসেন। তার পিতাকে যেদিন অপসারণ করা হয় সেদিনই তিনি শপথ গ্রহণ করেন। এসময় তাঁর বয়স ছিল ৪৭ বছর। আব্বাসীয় বংশে তার চেয়ে বেশী বয়সের আর কেউ খেলাফতের দায়িত্ব নেন নি।

একটি হিকমত:

"রাছমাল নাদিম" বলেন যে, জগতে এমন কেউ ছিলেন না যে হযরত আবুবকর (রা.) ইসলামের প্রথম খলিফা এবং তায়িলিল্লাহ ব্যতীত আর কেউ পিতা জিবিত থাকতে ছেলে ক্ষমতার মসনদে আরোহন করেছেন। মজার কথা উভয়ের নামই আবু বকর ছিল। তিনি ছিলেন কেজন ব্যতিক্রম ধর্মী খলিফা। সুতরাং ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে তাকেও অপসারিত হতে হল। (এর বিস্তারিত আলোচনা পরে আসছে)

তাকে এমন সময় খলিফা হিসেবে নির্বাচিত করা হয় যখন ইবনুল মু'তাজকে শাসকদের মধ্যে গণ্য করা হত না। বরং মুতীলিল্লাহকেই নির্বাচন করা হয়। তিনি নিজে নিজেই অপসারিত হয়ে যান। কারণ তিনি অর্ধাঙ্গ রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। যখন ত্বায়িলিল্লিাহকে খলিফা হিসেবে বরণ করে নেয়া হয় তখন সবুক্তগীন তুর্কীকে "মাউরায়ে বাব" নামক অঞ্চলের শাসন ক্ষমতা দেয়া হয়। ত্বায়ি লিল্লিাহর শাসনামলেই আযদুদ্দৌলা ইবনে রুকনুদ্দৌলা ইবনে বুইয়াহ বাগদাদের নিয়ন্ত্রণ হস্তগত করেন। তখন ত্বায়ি লিল্লাহ আযদুদ্দৌলাকে শাহী

পোশাক উপহার দেন, কংকন পরিধান করান এবং দুই প্রাচ্য হস্তান্তর করেন। তাকে মাউরাউল বাবের গভর্নর নিযুক্ত করাহয়। আযদুদ্দৌলা আবু তাহের ইজ্জুদ্দৌলাকে শুলিতে চড়িয়ে হত্যা করেন। এঘটনায় তার পিতা হাসান ইবনে আম্বারী মর্মস্পশী ও মূল্যবান কিছু মরসিয়া লিখেন:

علوفى الحيات وفى الممات:: لحق انت احدى العجزات

"জীবন মৃত্যুতে উঁচু হও, একথা সত্য যে তুমি অলৌকিতার মধ্যে একজন।"

كان الناس حولك اذاقاموا:: وفو دندماك ايام الصلات

"তোমার আশেপাশে মানুষ দাড়িয়ে থাকে, তখন এমন মনে হয় যে, দানের মৌসুমে এটি তোমার দানের দল"।

كانك قائم فيهم خطيبا:: وكلهم قيام للطوة

"তুমি এদের মাঝখানে খতীবের মত দাড়িয়ে থাক, এবং তারা নামাজের জন্য কাতার বন্দী হয়ে আছে।"

مددت يديك نحوهم احتفاء :: كمادها اليهم بالاهبات

"তুমি তোমার হাত তার দিকে প্রসারিত করেছ যেন তুমি দানের হাতই তাদের প্রতি প্রসারিত করে রেখেছ।"

ولما ض اق بطن الارض عن ان:: يضم علاك من بعد الممات

"যখন ভূপৃষ্ট এ কথার উপর কংকুচিত হয়ে গেছে যে, মৃত্যুর পর তোমার উচু মর্যাদার সাথে সে সাক্ষাৎ করবে।"

اصار والجوقبرك واستعاضوا:: عن الاكفان ثوب السافيات

"তখন সে শূন্যে তোমার সমাধি বানিয়ে নেয় এবং কাফনের স্থলে বাতাসে উড়ন্ত কাপড় পরিধান করিয়ে দেয়।"

لعظمك فى النفوس تبيت ترعى :: بحزراس وحفاظ ثقات

" তোমার বড়ত্ব নফসসমূহে ঘর তৈরী করে যাচ্ছে, তোমার এ অবস্থা যে, তুমি চৌকিদার এবং আস্থাশীল দেহরক্ষীর মত তার সাহায্য কর।"

وترقد حولك النيوان قدما:: كذالك كنت ايام الحياة

"তোমার চতুস্পর্শ পদে পদে অগ্নি আলোকিত হয় তুমি এভাবে জীবন ভ্রমন করছ"।

ركبت عطية من قبل زيد:: علاهافى السنين الماضيات

"তুমি যায়েদের পক্ষ থেকে এমন ভাবে সওয়ারীতে সওয়ার হও যাতে সে বিগত বছর সমূহে দীর্ঘ ও মহত্তম করে দেয়া হয়।"

وتلك فضية فيها تاس :: تباعد عنك تعيير العداة

"এবং এটি হতাশার কেমন সম্পর্ক যা তোমার হতে শত্রুর সম্ভ্রমকে ম্লান করে দেয়? "

ولم ارقبل جزعك قط جزعا:: تمكن من عناق المكرمات

"আমি সে শূলীর রশির পূর্বে (যে রশি দিয়ে তোমাকে শুলীতে দেয়াহয়েছে।) কারো শুলীর রশি দেখি নাই যে সম্মানের সহিত আলিঙ্গন করেছে।"

اسأت الى النوائب فاستنارت :: فانت فتبيل ثار النائبات

"আমি অবস্থার সহিত দুর্ব্যাবহার করেছি তখন সে আলোকিত হয়ে গেল। আর তুমি বিপদাপদের জানালা উম্মোচনকারী।"

وكنت تجيرنامن صرف وهو:: فعادمطالبالك بالتراب

"আর তুমি আমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করে ছিলে আর এখন সে প্রতিশোধে সফলকাম হয়েছে।"

دصير وهوك الاحيان فيه: الينامن عظيم السئيات

"যে যুগ তোমার সাথে দুর্ব্যবহার করেছে সে যুগ আমাদের জন্য কল্যাণ কর হয়ে আগমন করা কি বড় পাপ নয়?"

وكنت لعشر سورفلما:: مضيت تفوقو ابالممحسنات

"জীবন কাটাতে তুমি নেক কাজ কর- তুমি চলে যাওয়ার পরও লোকেরা তোমার অনুরূপ কাজ করতে আগ্রহী হয়ে যাবে।"

غليل باطل لك فى فوادى:: حقيق بالدموع الجاريات

"আমার অন্তরে তোমার বিরহের জালা রয়েছে, যা অশ্রু বর্ষনের

উপযোগী।"

ولو انى قدرت على قيام:: بغر ضك الحقوق والواجبات

"আমি যদি তোমার ফরজ, ওয়াজিব কর্তব্য পালনের উপযোগী হতাম।"

ملات الارض من نظم القواقى:: ونعت بها خلاف والنائحات

"তাহলে আমি ছন্দ লিখে যমীন ভরে দিতাম। আর স্বাভাবিক কান্নার বিপরীত ক্রন্দন করতাম।"

ولكن اصبر عنك نفسى :: مخافة ان اعدمن الجناة

"কিন্তু তোমার জন্য আমি ধৈর্য ধরি, পাপীদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবার ভয়ে।"

ومالك توبة فاقول تسقى:: لانك نصب هطال الهطلات

"তোমার কবর কতইনা উত্তম, আমি পরিতৃপ্ত হওয়ার দোয়া করি, কেননা তুমি বর্ষনকারী মেঘের চিহ্ন।"

عليك تحية الرحمن تترك ك: برحمات غواد رائحات

"তোমার উপর আল্লাহর দয়া হোক এবং তোমাকে সকাল সন্ধ্যা মাগফেরাত ঢেকে রাখুক।"

বাদশাহ আযদোদ্দৌলার মৃত্যু ঃ

আযদোদ্দৌলা ইবনে বুইয়াহ ৩৭২ হিঃ জিলহজ্ব মাসে ইন্তেকাল করেন। তিনি ৪৯ বছর ১১ মাস বেচে ছিলেন। তার রাজত্ব ইরাক কিরমান, আস্মান, খুজিস্তান, মোছেল, বকর এলাকা, হেরান, মনাহ্ ইত্যাদি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি বাগদাদে ৫ বছর শাসন করেন।

আযদোদ্দৌলা ছিলেন প্রভাশালী, ভদ্র বীর, সাহসী, ধীশক্তি সম্পন্ন এবং নির্ভীক। তার বুদ্ধিমত্তার অতি আশ্চর্য ঘটনাবলী বর্ণিত আছে। যার আলোচনা এ স্বল্প পরিসরে করা অসম্ভব। তিনি সর্বপ্রথম ব্যক্তি যাকে ইসলামে (খলীফা শব্দ বাদ দিয়ে) বাদশাহ্ নামে অভিহিত করা হয়। ইন্তেকালের সময় তিনি নিম্নবর্ণিত ইবারত পাঠ করছিলেন।

ماغنى عنى ماليه :: هلك عنى سلطانيه

"আমার ধন সম্পদ কোন কাজে আসেনি আমার ক্ষমতা ও বরবাদ হয়ে গেল।"

তিনি এই আয়াত পাঠ করতে করতে ইহকাল ত্যাগ করেন। তার মৃত্যুর সংবাদ কাউকে জানানো হয়নি। তাকে রাজধানী বাগদাদেই দাফন করা হয়। পরবর্তীতে জনগণ জানতে পারল যে, আযদৌদ্দৌলার ইন্তেকাল হয়েছেন। তখন তার লাশ কবর থেকে উত্তোলন করে হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রা.) এর শহীদী গোরস্থানে দাফন করা হয়। আযদোদ্দৌলা মৃত্যুর পূর্বেই তার কবর তৈরী করেছিলেন।(এর কিছু আলোচনা باب الفا আসবে।)

বলা হয়ে থাকে, একদা আযদোদ্দৌলা বাগানে আনন্দ করতে যাচ্ছিলেন। তিনি বলছিলেন যে, যদি বৃষ্টি হত তাহলে কতইনা মজা হত। তিনি একথা বলতে না বলতেই বৃষ্টি এসে গেল। তখন তিনি নিম্ন কবিতা পাঠ করেন ঃ

ليس شرب الراح الى فى المطر :: وغناء من جوار فى السحر

"শরাব পান করা বর্ষা মৌসুমেই ভাল লাগে। আর গায়িকা দাসীর সঙ্গে থাকা সকালও উত্তম মনে হয়।"

ناعمات سالبات ال نهى:: ناغمات تضاعيفالوتر

"কোমল স্বভাবের বাদীরা বিবেক হরন কারিনী, তাত চলার আওয়াজের ন্যায় তাদের আওয়াজ।"

مبرزات الكاس من مطلعها:: ساقيات الراح من فاق البشير

"তারা শরাবখানা থেকে পিয়ালা সমুহ বের করে আনে, আর মানুষের মধ্যে উচ্চ মর্যাদাশীলকে শরাব পান করিয়ে থাকে।"

عضدالدولة والن ركنها:: ملك الاملاك غلاب القدر

"তার নাম আযদোদ্দৌলা ইবনে রুকন, তিনি শাহানশাহ এবং ভাগ্যের উপর বিজয়ী।"

سهل الله له بغيته:: فى ملوك الارض مادام القمر

"আল্লাহ তাআলা এই লোভনীয় যমীনের বাদশাহদের মধ্যে তাকে কিয়ামত পর্যন্ত সহজ করেছেন।"

واراه الخير فى اولاده ك: يساس الملك منهم بالعزر

"আর আমি তার বংশাবলীর মধ্যে কল্যাণ দেখেছি যে, সে তার রাজ্যে অতি সহজে রাজ্য শাসন করবে।"

তিনি এ কবিতা পাঠ করতে না করতেই ভাগ্যবিজেতার কথামত মৃত্যু দূত এসে হাজির হয়।

আযদোদ্দৌলার পর তার পুত্র বাহাউদ্দৌলা রাজ্যের অভিভাবক নিযুক্ত হলেন। খলীফা তায়ে' শাহজাদাকে নানা মূল্যবান উপঢৌকন দিয়ে বরণ করে নেন এবং পিতার কণ্ঠাবরণ পরিয়ে দেন। বাহাউদ্দৌলা ত্বায়ে'কে গ্রেফতার করে নজর বন্দী করলেন এবং রাজধানী লুন্টন করে ফেললেন। তারপর বাহাউদ্দৌলা জনগণকে এ কথার সাক্ষী বানালেন যে ত্বায়ে' স্বেচ্ছায় অব্যাহতি নিয়েছেন। এ ঘটনাটি ঘটেছিল ৩৮১ হিঃ শাবান মাসে। তারপর ত্বায়ে পরবর্তী জীবনে অপসারিত হয়ে নজর বন্দী অবস্থায় কাটান। শেষে ৩৯৩ হিঃ সালের ঈদের রাতে ইন্তেকাল করেন। তিনি ১৭ বছর ৯ মাস সিংহাসনে ছিলেন। তিনি ৭৮ বছর জীবিত ছিলেন। খলিফা ত্বায়ে'-এর গায়ের রং ছিল হলদে। তিনি মধ্যাকৃতির লোক ছিলেন। তাঁর নাক ছিল বড়, তিনি ছিলেন বীর পুরুষ, শক্তিশালী, দুঃসাহসী এবং দানবীর । কিন্তু তার মেজাজ ছিল রুক্ষ এবং বুইয়া গোত্রের সমস্ত বাদশাহর মধ্যে ছোট হাত বিশিষ্ট।

আহমদ কাদির বিল্লাহ ইবনে ইছহাকের শাসন কালঃ

খলিফা ত্বায়ে' এর পর আবুল আব্বাস আহমদ কাদির বিল্লাহ ইবনে ইছহাক ইবনে মুক্তাদির ইবনে মু'তাযিদ ক্ষমতায় আসেন। খলিফা ত্বায়ে'কে যে রাতে সিংহাসন থেকে অপসারণ করা হয় সে রাতেই তিনি বায়আত নেন। বায়আত গ্রহণের সময় তার বয়স ছিল ৪৪ বছর । খলিফা কাদির বিল্লাহ ছিলেন চরিত্রবান বিশ্বস্ত এবং দরিদ্র লোকের বন্ধু। তিনি গরীব লোকের বল্যাণ কামনা করতেন। কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালনার মধ্যে তিনি ছিলেন পরাজিত। জিলক্বদ মাসে কাদির বিল্লাহর ইন্তেকাল হয়। কেহ বলেছেন তার ইন্তেকালে হয় কোরবাণীর ঈদের রাত। আবার কেউ বলেছেন ৪৩২ হিঃ জিলহজ্ব মাসে তার ইন্তেকাল হয়। মুত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর।

কতিপয় ঐতিহাসিক লিখেছেন যে, তিনি ছিলেন সাদা রঙ্গের এবং লম্বাকৃতির। তার বয়স হয়েছিল ৪১ বছর কয়েক মাস। অবশ্য কেউ কেউ বলেন

কয়েক মাস অর্থাৎ ৩ মাস ছিল। একদল বিজ্ঞ লোক বলেছেন কাদেরের বয়স ছিল ৮৭ বছর । তিনি ছিলেন সাদা রঙ্গের লোক, তার দাড়িছিল লম্বা। বার্ধক্যের কারণে তিনি দাঁড়িতে খেজাব লাগাতেন। সত্য বলতে অভ্যস্থ ছিলেন এবং তিনি ছিলেন তাহাজ্জুদ গোজার ও সততার নায়ক। সুন্নতি বিষয়ের উপর তার রচিত একখানা কিতাবও আছে। কাদের বিল্লাহ মু'তাযিলা এবং রাফেযীদের উপর অত্যন্ত শক্তিধর ছিলেন। প্রত্যেক জুম্মাবারে কোরআন খতম করা তার অভ্যাস ছিল ।তিনি জনসাধারণকে গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ দিতেন।

আবু জাফর আব্দুল্লাহ কায়িম বিআমরিল্লাহ ইবনে কাদির বিল্লাহর শাসনামলঃ

কাদির বিল্লাহর ইন্তেকালে পর তার ছেলে আবু জাফর আবদুল্লাহ ক্বায়িম বিল্লাহ ইবনে কাদির বিল্লাহ সিংহাসনে আরোহন করেন। তার পিতার ইন্তেকালের দিনই তার বায়আত গ্রহণ করা হয়। কায়িম বিল্লাহর শাসনামলেই সেলজুক বংশের রাজত্ব আরম্ভ হয় এবং বুইয়া রাজ বংশের অবসান ঘটে। বুইয়া বংশের রাজত্বকাল ২৭ বছর স্থায়ী ছিল। আনুমানিক ৪৩০ হিঃ পর্যন্ত ছিল। সুতরাং ইবনে কিত্বারক তার ইতিহাসে তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা ৪৬ অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।

কায়িম বিআমরিল্লাহর দেহের রং ছিল সাদা, দীপ্তমান উজ্জ্বল । তিনি ছিলেন খোদাভীরু, পরহেযগার, আবেদ ও জাহেদ এবং মুসলমানদের প্রয়োজন পূর্ণকারী। তিনি আলেম উলামাকে অত্যাধিক সম্মান করতেন। দরিদ্র এবং সৎকর্মশীলদের পুত পবিত্র চরিত্রের অনুসারী ছিলেন। কায়িম বি আমরিল্লাহ যত দিন সিংহাসনে ছিলেন ততদিনই তিনি সসম্মানে ও গৌরবের সহিতই ছিলেন। অতি সত্যবাদী খলিফাদের মধ্যে তিনি ছিলেন বিদ্যা ও সম্মানের কারণে সুপ্রসিদ্ধ। তাকে যখন দ্বিতীয় বারের মতা খলিফা নির্বাচিত করা হয় তখন তিনি গরীবানা ছুরতের লেবাছ পড়ার কারণে প্রসিদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। সেদিন থেকে তিনি নিয়মিত রোজা রাখতেন এবং তাহাজ্জুদ গুজার হয়ে গিয়েছিল। নামাজের বিছানাতেই তিনি শুয়ে পড়তেন। ঘুমানোর জন্য তিনি কখনো অন্য কাপড় পাল্টাতেন না।

কায়িম বিআমরিল্লাহ ৪৬৭ হিঃ ১০ ই শাবান মাসে ইন্তেকাল করেন।

তিনি ৪৪ বছর ৮ মাস রাজ্য শাসন করেন। কেহ৯ মাসের ব্যাখ্যা দিয়েছেন আবার কেহ ৪৫ সাল পর্যন্ত সিংহাসনের থাকার দাবী করেছেন। তার মায়ের নাম ছিল আরমেনিয়াহ।

আবুল কাশেম মুক্তাদি বি আমরিল্লাহ ইবনে মোহাম্মদ ইবনে কায়িম বি-আমরিল্লাহ -এর শাসনামলঃ

কায়িম বি-আমবিল্লাহ'র ইন্তিকালের পর তার পৌত্র আবুল কাশেম আব্দুল্লাহ মুক্তাদি বি-আমবিল্লাহ ইবনে মোহাম্মদ ইবনে কায়িম বি-আমবিল্লাহ ক্ষমতায় আসেন।তার দাদার ইন্তেকালের দিনই তাঁর বায়আত গ্রহণ করা হয়। ৪৬৭ ই শাবান মাসে তার বায়আত নেয়া হয়।

তার দাদার ইন্তেকালের ঘটনা এভাবেই ঘটেছিল যে, যখন তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন তখন সিংগা লাগাানো হয়। সিংগা লাগানোর স্থান থেকে অনেক রক্ত ঝরে । যে কারণে তার শরীর রক্তশূণ্যতা হয়ে দূর্বল হয়ে পড়ে। তখন তিনি তাড়াতাড়ি তার পৌত্রকে কাছে ডেকে অভিভাবক নিযুক্ত করেন। সেদিন বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম ও জ্ঞানী গুণীদের সম্মুখে মুক্তাদি বিআমরিল্লাহ উপাবি দেন। মুক্তাদি বি- আমবিল্লাহ তার পিতা ধর্ম ভান্ডারের ইন্তেকালের পর জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং তিনি বাগদাদকে সংস্কার করেন। হেজাজ ইয়ামন এবং সিরিয়ার শাসনভার তার উপর দেয়া হয়।

তাঁর মৃত্যুর ঘটনা ঃ

একদা মুক্তাদিরের খেদমতে খাবার আনা হয়। তিনি আহার করে হাত ধৌত করলেন। তিনি খুবই সুস্থ ও শক্তিধর ছিলেন। তার পাশে বসা ছিলেন হাকিম শামছ। মুক্তাদি তাকে বললেন সে কে অনুমতি ব্যতীত ভিতরে প্রবেশ করল। চিকিৎসক দেখলেন কেউ আসেনি।তিনি মুক্তাদিরের দিকে লক্ষ্য করে দেখালেন যে, তার চেহারা পরিবর্তন হয়ে গেছে। তার হাত ঢিলাঢালা, হাতে শক্তিবল কম মনে হল। এরপর তিনি ভূমিতে লুটে পড়লেন। চিকিৎসক বুঝতে পারলেন তার মুর্ছা যাওয়ার উক্রম। এর বিছুক্ষণ পরই তিনি ইন্তেকাল করলেন। কিন্তু চিকিৎসক একদম চুপ রইলেন। একজন চাকরকে ডেকে বললেন, তুমি এক্ষুনি মন্ত্রী মনছুরকে ডেকে দাও। এরপর তারা উভয়েই কাঁদতে আরম্ভ করলেন। কিছুক্ষণ পর উভয়েই আবুল আব্বাস আহমদ মুস্তাজহির ইবনে

মুক্তাদির এর পাশে এলেন। কারণ তার পিতা তাকে অভিভাবক নিযুক্ত করেছিলেন। তারা উভয়ই সমবেদনা প্রকাশ করলেন। এরপর তার খেলাফতের উপর মোবারকবাদ জানালেন।

মুক্তাদ্দির বিআমরিল্লাহর বয়স হয়েছিল ২৩ বছর। তিনি ১৯ বছর কয়েক মাস রাজ্য শাসন করেন। কেউ বলেছেন ৩ মাস। আবার কেউ বলেছেন তার বয়স হয়েছিল ৩৯ বছর। ৪৮৭ হিঃ মহরম মাসে তার ইন্তেকাল হয়। কোন কোন ঐতিহাসিক লিখেছেন যে, তাকে বিষ পান করানো হয়েছিল। কেননা বাদশাহ তাকে বাগদাদ থেকে বছরায় প্রেরণের ইচ্ছা করেছিলেন। এজন্য মুক্তাদি প্রথম যুগের শাসকদের তুলনায় তাকে সম্মানের চোখে দেখাত।

মুস্তাজহির বিল্লাহ আবুল আব্বস আহমদ এর শাসনামল ঃ

মুক্তাদী বি আমরিল্লাহর পর তার ছেলে মুস্তাজহিদ বিল্লাহ সিংহাসনে আরোহন করেন। তার পিতার ইন্তেকালের দিনই তাঁর বায়আত গ্রহণ করা হয়। তাকে পূর্বেই হুলাভিষিক্ত বানানো হয়েছিল।

মুস্তাজহিরের জন্ম হয় ৪৭০হিঃ। তিনি ছিলেন- অনুপম চরিত্রর এবং প্রশস্তমনের অধিকারী, আলেমদেরকে তিনি ভালবাসতেন। তিনি নিজে ছিলেন হাফেজে কোরআন। অত্যাচার অবিচারকে তিনি মোটেও ভাল বাসতেন না। তিনি ছিলেন নরম ভবিয়তের লোক। উত্তম ও ভাল কাজকে তিনি পছন্দ করতেন । তিনি ছিলেন একজন উন্নতমানের সাহিত্যিক। গল্পকারক ও ঔপন্যাসিক। তিনি পূণ্য কাজে অংশ গ্রহণ করতেন।

মুস্তাজহির ৫১১ হিঃ ২৩ শে রবিঃ ছানী ইন্তেকাল করেন। তিনি মোট ৪১ বছর জীবিত ছিলেন। কেহ বলেছেন ৪৬ অথবা ৪৩ বছর। বর্ণিত আছে যে, তিনি তারাক্কি এবং খাওয়ানিক রোগে ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তিনি কয়েকজন ছেলে মেয়ে রেখে যান। আবার কিছুদিন পর আরজুয়ান নামক স্থানে তার দাদীর ইন্তেকাল হয়। তার ছেলে মুস্তারশিদ বিল্লাহর শাসনামল এসে যায়। ধারণা করা হয় তিনি মুহাম্মদ আজ জাখরাহ এর বিশ্বাস ভাজন ছিলেন। তার শাসন কাল ২৪ বছর তিন মাস স্থায়ী ছিল।

আবু মনসুর ফজল মুস্তারশিদ বিল্লাহ ইবনে মুস্তাজহির এর শাসন ঃ

খলিফা মুস্তাজহির এ পর আপন পুত্র মুস্তারশিদ বিল্লাহ সিংহাসনে

আরোহন করেন। তার পিতার ইন্তেকালে দিনই তার বায়আত নেয়া হয়। কারণ তাকে ভাবী খলিফা নিযুক্ত করা হয়েছিল। সে সময় তার বয়স ছিল ২৭ বছর।

কতিপয় ঐতিহাসিক লিখেছেন যে, তার নিকট একটি প্রতিনিধি দল এসে তার ঘরের সদস্যদের সাথে বসতে চাইল। তিনি যখন তাদের মধ্যে এলেন তখন কর্মচারীরা ছুরি নিয়ে আক্রমন করে বসল এবং সমস্ত লোককে হত্যা করে ফেলল। বলা হয়ে থাকে সুলতান মাহমুদের ভাই মাসউদই এ হত্যাকান্ড ঘটানোর জন্য উৎসাহ যোগিয়ে ছিল। এ ঘটনা ৫২৯ হিঃ ১৭ ই জিলকদ তারিখে ঘটেছিল। মুস্তারশিদ বিল্লাহ ১৭ বছর ৮ মাস রাজত্ব করেন। কারো কারো মতে ৭ বা ৬ মাস তিনি ৪৪ বছর জীবিত ছিলেন। অন্য মতে ৪৫ বছর । বিদ্যান লোকেরা বলেছেন মু'তাজিদ বিল্লাহর পর মুস্তারশিদ বিল্লাহ থেকে অধিক ধী শক্তি সম্পন্ন আর কোন লোক খেলাফতের মসনদে বসেন নি। তিনি ছিলেন বীর পুরুষ, প্রভাবশালী, মেধাসম্পন্ন, যে কোন ঘটনার সুষ্ঠু সামাধানকারী বাদশাহ। তিনি আব্বাসীয় গোত্রের আভিজাত্যকে পূণর্জীবিত করেছিলেন এবং বেশ কয়েক বার জিহাদও করেছেন।

আবু মনসুর জাফর রাশেদ বিল্লাহর শাসন ঃ

এটি ষষ্ঠ খলীফা এবং তাঁকে বরখাস্ত করা হয়। তবে তিনি ষষ্ঠ খলীফা তখন হবেন যদি ইবনে মু'তাজকে গণ্য করা না হয়। না হয় মুস্তারশিদ বিল্লাহই ষষ্ঠ খলীফা হবে। এর উপর নাতেনা আক্রমন করেছিল এবং বাতেনাকে সুঞ্জার যাকে যুলকারনাইনও বলা হয় তিনি এ হত্যা ঘটনার জন্য ইন্ধন যোগিয়ে ছিলেন।

মুস্তারশিদ বিল্লাহ'র পরে তার পুত্র আবু মনসুর জাফর রাশিদ বিল্লাহ ইবনে মুস্তারশিদ ইবনে মুস্তাজহির সিংহাসনে আরোহন হল করেন। তার পিতার ইন্তেকালের দিনই তার কাছ থেকে শপথ নেয়া হয়। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ পাকের ইচ্ছাছিল ততক্ষণই তিনি শাসনকার্য পরিচালনা করেন। এরপরই তার মধ্যেও সুলতান মাসউদের মধ্যে টক্কর লেগে যায়।

রাশিদ বিল্লাহ তার সমস্ত সৈন্যকে রণাঙ্গনে প্রেরণ করলেন। অতঃপর সুলতান মাছউদের সহিত কথোপকথনের জন্য নিজে প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। সুতরাং সুলতান মাছউদ আতাবুক জঙ্গীকে ডেকে পাঠিয়ে ধন সম্পদ দাবী

করেন। উবয়ের এ আলোচনা আন্তরিক ও ফল প্রসূ হওয়ায় তারা রাশিদকে থেমে যেতে এবং অপেক্ষা করতে পরামর্শ দেন। এদিকে সুলতান মাহমুদ তার সৈন্য সামন্ত সহ বাগদাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। এ ঘটনাটি ঘটেছিল জিলক্বদ মাসে- আবার কেহ বলেন ৫৩০ হিঃ জিলহজ্ব মাসে। সুলতান মাহমুদ সৈনিক ব্যারাকে আক্রমন করে তা লুন্টন করে ফেলেন। তবে শহর লুন্টন করা নিষেধ করে দিলেন। প্রজাদের কাছ থেকে ধন সম্পদ একত্রিত করলেন। কাযীর সাক্ষী আহবান করলেন। তারা রাশিদ বিল্লাহর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করলেন। তারা আরো বল্লেন, রাশিদ কোন ভাল কাজ করেনা বরং তার দ্বারা মন্দ কাজে উৎপত্তি হয়। যেমন খুনাখুনি, মন্দ কাজের দায়িত্ব গ্রহণ , নাজায়েজ কাজ করা ইত্যাদি ব্যাপারে তার উপর অভিযোগ দায়ের করলেন। এর পর তিনি জনগণকে এ সমস্ত পাপ করতে ধারাবাহকতার জন্ম দিলেন। সুতরাং প্রধান কাযী ইবনুল কারখী তাকে পদত্যাগ করতে ফতোয়া প্রদান করেন।

অতঃপর জনগণ তাকে ৫৩০ হিঃ জিলক্বদ মাসে গতিচ্যুৎ করে ফেলে। রাশিয়া বিল্লাহ ও আতাবাক জঙ্গী মৌসেলের দিকে পালিয়ে যান। সুলতান মাহমুদ তাদেরকে মৌসেল থেকে তলব করলে তরা পারস্যে চলে যান। সুলতান মাহমুদ ইস্পাহান গিয়ে অবরোধ করেন। অতঃপর রাশিদ বিল্লাহ অসুস্থ হয়ে পড়েন। এ কয়েক দিনপর ইসমাইলীয় ফেরকার লোকেরা তাকে হত্যা করে।

ঐতিহাসিকগণ লিখেন যে, রাশিদের বয়স ছিল ২১ বছর । কেউ বলেছেন ৩০ বছর । তিনি মাত্র কয়েক দিন কম এক বছর কাল শাসন করার পর তাকে সিংহাসন চ্যুৎ করা হয়। অতঃপর তারক ৫৩২ হিঃ সনে হত্যা করা হয় বলা হয় তিনি এ সময় ২৬ শে রমজান শরীফের রোজাদার ছিলেন। কেউ কেউ বলেছেন- তাকে বিষ প্রয়োগ করা হয়। তাকে গ্রামের মসজিদের পাশে দাফন করা হয়। তিনি ২০ জনেরও বেশী সন্তানের জনক ছিলেন। পিতার শাসনামলে রাশিদকে অভিভাবকের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। রাশিদ ছিলেন একজন বলিষ্ট যুবক, তার শরীরের রং ছিল ফর্সা । অত্যন্ত সুন্দর ও সুঠাম দেহের অধিকারী । তিনি ছিলেন বীরপুরুষ, প্রকৃতির হাস্যোজ্জল, কবি এবং দানবীর বাদশাহ ছিলেন।

আবু আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ মুক্তাফী লিআমরিল্লাহর খেলাফতঃ

খলিফা রাশিদ বিল্লাহর পর তার চাচা আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ মুস্তাজহির ইবনে মুক্তাদি ক্ষমতায় আসেন। রাশিদের অপসারণের দিনই তিনি বায়আত নেন। তাকে মুক্তাফি লি আমরিল্লাহ উপাধি দেয়া হয়। কারণ তিনি সিংহাসনে আরোহনের ৬ মাস পূর্বে জনাব রাছুল (স.) কে স্বপ্নে দেখেছিলেন। কেউ বলেন তিনি ১ বছর পূর্বে স্বপ্নে দেখেন। নবী করিম (স.) স্বপ্নে তাকে এই সু সংবাদ দেন যে, অচিরেই তোমাকে খেলাফতের দায়িত্ব দেয়া হবে। সুতরাং তুমি আমার পথ অনুসরণ করো। মুক্তাফী ছিলেন বাদামী রং এর লোক। তার চেহারাতে দাগছিল। উজ্জ্বল দুঃসাহসী, জ্ঞানী আলেম, অত্যন্ত বিজ্ঞ, সহিষ্ণু, বীর পুরষ, স্পষ্টভাষী রাজনীতিতে দক্ষ, রাষ্ট্রের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন ব্যক্তিত্ববাদ তার হাতেই ছিল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বাগডোর। তার স্বাক্ষর ব্যতীত রাষ্ট্রীয় যেকোন ছোট খাট কাজ আদৌ সম্পন্ন হতনা। তবে তার মাতা ছিলেন হাবশী। তিনি তার শাসন কালেই ৪টি রুবাইয়াত লিখে যান। খাওয়ানিক নামক রোগে তিনি আক্রানাত হয়েছিলেন। সুতরাং তিনি ৫৫৫ হিঃ রবিঃ আউয়াল মাসে ইন্তেকাল করেন। তার বয়স হয়েছিল প্রায় ৪৪ বছর।

তিনি ২৩ বছর ক্ষমতায় ছিলেন। কেউ বলেছেন ২৫ বছর। তিনি কাবা ঘরের নতুন দরজা নির্মাণ করে দেন। তিনি নিজের ব্যবহারের জন্য অধিক পাথরের একটি সিন্দুক তৈরী করেছিলেন। এর মধ্যেই তাকে দাফন করা হয়।

ইমাম দামিরী (রহ.) বলেন আমি তার ঘনিষ্ট বন্ধু ছালাহুদ্দীন খলীফা ইবনে মুহাম্মদ আল আকফাহী'র রচনা থেকে নিম্নের কিছু গুরত্ব পূর্ণ বিষয় নোট করেছি। আকফাহী আল্লামা আব্দুল করিম ইবনে আল্লামা আলাউদ্দিন কুনুভী থেকে লিখেছেন- মুক্তাফী লি আমরিল্লাহ মুস্তাজহির এর পরে কায়ম বি সম্পর্কে বেশী জানি। এখনি খলিফাদের যে ধারাবাহিতকতা কল্পিত কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে তা ইমাম জাহরীর চিন্তা প্রসুত।

আবুল মুজাফফর ইউসুফ মুস্তানজিদ বিল্লাহ ইবনে মুক্তাফী বিআমল্লিাহ'র খেলাফতঃ

খলিফা মুক্তাফী লিআমরিল্লাহর পর তার ছেলে আবুল মোজফফর ইউসুফ মুস্তানজিদ বিল্লাহ ইবনে মুক্তাফি সিংহাসনে আরোহন করেন। কারণ

তাকে তা পিতা হবু খলিফা নিযুক্ত করেছিলেন। এ ঘটনা আনুমানিক ৫৪৭ হিঃ পিতার ইন্তেকালের এক/দুইদিন পর তাকে শপথ করানো হয়। কেউ বলেছেন তার পিতার ইন্তেকালের দিনই তাকে শপথ করানো হয়। কোন কোন ঐতিহাসিক লিখিছেন যে, মুস্তানজিদ তার পিতার শাসনামলে স্বপ্নে দেখেন যে, আকাশ থেকে একজন পেরেস্তা আগমন করেছেন। ফেরেস্তাতার হাতে চারটি খাদ্য বস্তু লিখেদেন। অতঃপর তিনি স্বপ্নের ব্যাখ্যা কারীদের ডেকে এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা চাইলেন। ব্যাখ্যা কারকগণ স্বপ্নের ব্যাখ্যায় বল্লেন যে, তিনি ৫৫৫ হিঃ খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। আর হলোও তাই।

মুস্তানজিদ ৫৭৬ হিঃ ৮ই রবিঃ আউয়াল তারিখে কয়েক খানার গোসলখানায় ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৪৮ বছর। তিনি ২১ বছর খেলাফত পরিচালনা করেন। মুস্তানজিদ ছিলেন ব্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত তিনি ছিলেন দ্বীনদার কলিফা। তিনি বেত্রাঘাত প্রথার মধ্যে মধ্যম পন্থার চুল ছিল। তার মায়ের নাম ছিল ত্বাউস। তিনি কুফার বাসিন্দা ছিলেন। তিনি তার ছেলের শাসনকাল দেখেছিলেন।

মুস্তাজি বিনূরিল্লাহ ইবনে মুস্তানজিদ বিল্লাহর খেলাফতঃ

খলিফা মুস্তাজিদ বিল্লাহর পরে তার ছেলে আবুল হাসান আলী মুস্তাজি বিনুরিল্লাহ ইবনে মুস্তানজিদ বিল্লাহ সিংহাসনে আরোহন করেন।তরি পিতার ইন্তেকালের দিনই তিনি শপথ গ্রহণকরেন। মিশর এবং ইয়ামন তার শাসনাধীন ছিল। আব্বাসীর খেলাফত মুতি উল্লাহর শাসনামল থেকে দুর্বল অবস্থায় পতিত হয়ে ছিল।

মুস্তাজিবিনূল্লিাহ ছিলেন হাস্যোজ্জ্বল স্বভাবের লোক। সত্যবাদিতা ও উত্তম কর্মে অভ্যস্ত ছিলেন তিনি। ইলমও উলামায়ে কেরামকে তিনি অতি সম্মানের চোখে দেখতেন। ৫৯৫ হিঃ তার ইন্তেকাল হয়। তিনি ১৯ বছর রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্টিত ছিলেন। তিনি ৩৯ বছর জীবিত ছিলেন। তিনি ছিলেন দানবীর, লজ্জাশীল এবং সুন্নতে নববীর পূর্ণ অনুসারী। তার শাসনামলে সার্বিক নিরাপত্তা এবং আরাম আয়েশের ছড়াছড়ি ছিল। তিনি সমস্ত জুলুম পীড়ন ধ্বংস করেছিলেন। তিনি জনগণ থেকে পৃথক থাকতেন। তিনি শুধু তার বন্ধু বান্ধবদের সহিতই সফরে বেরহতেন। প্রধান বিচারপ্রতি ব্যতিত অন্য কেহ তার কাছে

যাওয়ার সুযোগ পেতনা।

আবুল আব্বাস আহমদ নাসির উদ্দিনিল্লাহ এর খেলাফত ঃ

মুস্তাজি বিনুবিল্লাহর পর তার পুত্র আবুল আব্বাস নাসির উদ্দিনিল্লাহ ক্ষমতায় আসেন। ৫৯৫ হিঃ জিলক্বদ মাসের শুরুতেই বাগদাদে শপথ গ্রহণ করেন। এ সময়ে তার বয়স ছিল ২৩ বছর । খেলাফতের আসনে সমাসীন হয়েই, তিনি ন্যায় নীতির ডানা বিস্তার করে দেন। মদ ফেলে দেয়ার আদেশ জারী করেন। ক্রিড়া কৌতুকের সামগ্রী ভেঙ্গে ফেলার আদেশ জারী করেন। টেক্স এবং বেত্রাঘাতের শাস্তি দানের পদ্ধতি খতম করে দেন। তিনি রাষ্ট্রকে উন্নত ও সমৃদ্ধশালঅ করে তুলেন। বসবাস এবং খাদ্য উপার্জনের মাধ্যমে স্বাভাবিক হয়ে গেল। তার শাসনামলে বাগদাদকে অতি পবিত্র মনে করে জনগণ ভ্রমণ করত।

তার ইন্তিকাল হয় ৬২২ হিজরী সনে।তিনি মোট ৫০ বছর জীবিত ছিলেন।রমজান মাসের প্রথম দিকে তিনি ইন্তেকাল করেন। জনতা তার মৃত লাশ কাধে বহন করে আল বদরিয়া নমক স্থানে নিয়ে যায় এবং সেখানেই তাকে সমাহত করা হয়। তিনি ২৮ বছর শাসন করেন। নাসিরের চেহারা ছিল সাদা তুর্কী মানুষের মত। আট সাট নাকের ছিদ্র. স্বাভাবিকের চেয়ে চিল বড়। হালকা-পাতলা উজ্জ্বল গন্ড দেশ। তার দাড়ি ছিল লালচে হলুদে । তার সঙ্গে ছিল নম্র মেজাজ পুত পবিত্র চরিত্র, ধীশক্তি সম্পন্ন, বীর পুরুষ, শৌর্য-বীর্য, বুদ্ধিমান জাগ্রত মস্তিস্ক এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার উপযুক্ত ব্যক্তিত্ব। রাতের বেলা বাজারের অলি গলিতে ঘোরা ফেরা করতেন। লোকেরা তার সহিত সাক্ষাৎ করে প্রভাবিত হয়ে যেত। ইরাকে সঠিকভাবে তার প্রভাব পড়ে যায়। খেলাফতের উপযুক্ত ছিলেন। রাষ্ট্রয় লেনদেন তিনি নিজে করতেন। তিনি অতি প্রভাব প্রতিপত্তি, মর্যাদার সহিত জীবন অতিবাহিত করেন।

তার শাসনামলে নেযা ও বন্দুক ইত্যাদির ইন্নতি সাধিত হয় আব্বাসীয়দের মধ্যে তিনি সবচেয়ে বেশী সময় খেলাফত পরিচালনা করেন।তিনি প্রত্যেক বিচারকের পিছনেই গোয়েন্দা লাগিয়ে রাখতেন।সারগর্ভ সংবাদ পরিবেশন করতেন।

শেষ পর্যন্ত জনগণের মধ্যে এ সংবাদ প্রচার হয়ে পড়ে যে, নাসিরের কাশফ হয়। শেষ জীবনে তিনি পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হন।২ বছর এই রোগে

ভোগেন। এরপর তিনি রোগমুক্ত হন। প্রজা সাধারণের ব্যাপারে তার নীতি ছিল কঠোর।

জাহের বি আমরিল্লাহ ইবনে নাসিরুদ্দীনিল্লাহর খেলাফতঃ

নাসির উদ্দীনিল্লাহর পর তার পুত্র মুহাম্মদ জাহের বিআমরিল্লাহ ইবনে নাসিরুদ্দীনিল্লাহ ক্ষমতায় আসেন। তার পিতার ইন্তেকালের দিনই তার বায়আত গ্রহণ করা হয়। শপথের তিন দিন পর্যন্ত শোক পালন করা হয়। মানুষের সহিত উত্তম আচরণ করা হয়। সাজ বিলুপ্ত করে দেন। অত্যাচার অবিচারকে সমূলে ধ্বংস করে দেন। ন্যায় বিচারক বাদশাহ আবু বকর ইবনে আইয়ুবের পরিবার পরিজনকে শাহী পোসাকে ভূষিত করেন। শাহী দারোয়ান জানতে পারেন যে, জাহের বি আমরিল্লাহকে হত্যা করা হয়। অতঃপর জাহের বি আমরিল্লাহর উত্তম আচরণের জন্য প্রজারা শোক পালন করতে থাকে। এসমস্ত ঘটনা ঘটনাবলী ৬৪০ হিঃ সং ঘটিত হয়। এ সময় তার বয়স হয়েছিল ৩০ বছরের কাছাকাছি। তিনি ১৮ বছর রাজ্য শাসন করেন।

ইমাম দামিরী (রহ.) বলেন আমি ও ঘটনাটি একটিপান্ডুলিপি থেকে সংগ্রহ করেছি। তবে এর মধ্যে কিছু ভেজাল মিশ্রিত আছে। এজন্য এর মধ্যে কিছু আছে জাহের বি আমবিল্লাহর আর কিছু মুস্তাজির বিল্লাহর অবস্থা। আমার ধারণামতে তা লিখকের ভূল। এখন থেকে উভয়ের অবস্থা পৃথক ভাবে বর্ণনা করা হবে।

জাহের বি আমরিল্লাহর জীবন চরিত ঃ

জাহের বি আমরিল্লাহর নাম আবু নছর মুহাম্মদ ইবনে নাসির উদ্দীনিল্লাহ আবু ল আব্বাস আহমদ ইবনে মুস্তাফিবিনুরিল্লাহ হাসান বিন আবুল হাসান মুস্তানজিদ বিল্লাহ আবুল মুজাফফর ইউসুফ বিন মুক্তাফি লি আমরিল্লাহ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ আল আব্বাসী। তার পিতা তাকে হবু খলিফা চিহ্নিত করেছিলেন। তার পিতার ইন্তেকালের পর পরই তাকে খেলাফতের দায়িত্ব দেয়া হয়। সম্মানীত লোকেরা তার আনুগত্য করেন। তিনি ৫৭১ হিঃ জন্ম গ্রহণ করেন এবং এবং ৬৩২ হিঃ ৩রা রজব ইন্তেকাল করেন। তিনি মোট ৫২ বা ৫৩ বছর জীবিত ছিলেন। ৯ মাস বা সাড়ে ৯ মাস রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন।

জাহের বি আমবিল্লাহ গায়ের রং ছিল ধবধবে সাদ। তিনি ছিলেন নম্র

প্রকৃতির লোক এবং উত্তম চরিত্রর অধিকারী। সুস্থ ও শক্তিশালী। সুবিবেচক বুদ্ধিমান ও ন্যায় বিচারক বাদশাহ। সুতরাং ইবনে আছির অতিরঞ্জিত লিকেন যে, তিনি ন্যায় বিচার ও উত্তম চরিত্রের অনুপম দৃষ্টান্ত ছিলেন। যে কারণে প্রজারা তাকে মহামতি ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) এবং ওমর ইবনে আঃ আজিজ (রহ.) এর সহিত তুলনা করে।

একদা তাকে বলা হল যে, আপনি কেন আনন্দ বিহারে যাননা? উত্তরে তিনি বলেন ভূমি শুকিয়ে গেছে। তখন বলা হল আল্লাহ তায়ালা আপনার জীবনে বরকত দান করুন। তিনি বলেন যে ব্যক্তি তার দোকান আসরের পর খোলে সে কি ব্যবসা করবে? অতঃপর তিনি প্রজাদের সহিত সদাচরন করেন। ধন সম্পদ ব্যয় করেন। অত্যাচার বিদুরীত করেন। শাস্তি দূর করে দেন । তিনি বলতেন ধন সম্পদ একত্র করা বনিকদের কাজ। তোমরা তো যুগের কর্মকার ইমামের চেয়ে বেশী মুখাপেক্ষী। মৌখিকভাবে খরচকারী ইমাম আমাকে তোমরা যেতে দাও। আমার তনুতে যতক্ষণ শক্তি আছে ততক্ষণ কিছু পূন্যের কাজ করে নেই। কথিত আছে যে, জাহের বিআমরিল্লাহ ঈদের রাত উলামা এবং নেককার লোকদের মধ্যে এক লাখ আশরাফী বন্টন করতেন।

মুস্তানছির বিল্লাহর জীবন চরিতঃ

মুস্তানছির বিল্লাহর নাম আবু জাফর বিন মানছুর বিন জাহের আমরিল্লাহ নাসির উদ্দিনিল্লাহ আব্বাসী। তার মা ছিলেন তুর্কী। তার জন্ম হয় ৫৮৮ হিঃ তার পিতার ইন্তেকালের পরই তার কাছ থেকে শপথ নেয়া হয়। সুতরাং তার সহোদর ও চাচাতো ভাইয়েরা আনুগত্য করেন। তিনি ছিলেন সব ভাইয়ের মধ্যে বড়। সময় তার বয়স ছিল ৩৫ বছর। তার মৃত্যু হয় ৬৪০ হিঃ জমা ছানী শুক্রবার সকালে।

মুস্তানছির বিল্লাহ তার পিতার মতই ছিলেন সৌম্য কান্দি সুপুরুষ মাথার চুল বাদামী সুস্থ এবং শক্তিশালী। বার্ধক্যের কারণে চুলের মধ্যে হালকা ঝলক দিত। যে কারণে তিনি মেহেন্দীর খেযাব লাগাতেন। ইবনে সাবাঈ বলেন বাইয়াতের সময় আমি তার পাশে ছিলাম। তিনি ছিলেন আবরণহীন। তখন আমি তাকে দেখে ফেলি। আল্লাহ পাক তাকে উত্তম আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ তিনি ছিলেন সাদা রঙ্গের। হালকা পাতলা লম্বাটে ধরনের চেয়ে বড় নাক বিশিষ্ট

প্রশস্থ বক্ষ। তিনি সাদা রঙ্গের কাপড় পছন্দ করতেন। এবং সাদা রঙ্গের লাঠি সাথে রাখতেন।

ইমাম দামিরী (রহ.) বলেন আমি জানতে পারলাম যে, মুস্তানছির যেলোকদিগকে শাহী পোষাক উপহার দিয়েছেলেন তাদের সংখ্যা আনুমানিক ৩৫৭০ টি পর্যন্ত পৌছে যায়।

ঐতিহাসিকগণ লিখেন যে মুস্তানছির শৌর্য- বীর্যের সহিত রাজ্য শাসন করেন। সুবিবেচক, ন্যায় বিচারক ছিলেন। তিনি অপছন্দনীয় কাজের মূলোৎপাটন করেন। তিনি ছিলেন প্রকৃত বাদশাহ। তাছাড়া তিনি অসংখ্য মসজিদ মাদ্রাসা নির্মান করেন। এর জন্য তিনি অজস্র টাকা খরচ করেন। অন্যান্য বাদশাগণ তার কাছে নত হয়ে যায়।

দাদা নাসির উদ্দিন তাকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। চিত্তাকর্ষক এবং অনুভূতি প্রবন হওয়ার কারণে তার দাদা তাকে 'কাজী' বলা শুরু করে দিয়ে ছিলেন। মনছুর অসংখ্য মাদ্রাসা তৈরী করেন। তিনি একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠন করেন। এমন কি অশ্বারোহী বাহিনীর জন্য প্রায় এক লক্ষ ঘোড়ার ব্যবস্থা করেন। সম্ভবত তা করা হয়েছিল সকল যুদ্ধের অবস্থাকে সু সজ্জিত করার জন্য তাকে স্পেন এবং মারাকিশ এর কোন কোন অঞ্চল থেকে উপঢৌকন দেয়া হত। মুস্তানছির ১৮ বছর পর্যন্ত সিংহাসনে ছিলেন। তাকে এবং তার পিতাকে পদচ্যুৎ করা হয়নি। তারপরে রাষ্ট্রে অনেক বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়েছিল। তাতারীদের দ্বারা অনেক টাকা পয়সা খাটানো আরম্ভ হল।

তারা অধিকাংশ ইসলামি রাষ্ট্র হস্তগত করে ফেলল। তার শাসনামলে তাতারীদের সহিত যুদ্ধে জালালুদ্দিন খাওয়ারিজম নিখোঁজ হন। ব্যাস এ ব্যাপারটি পদচ্যুতি থেকে কোন দিক দিয়ে কম ছিল। তাঁর পরেও ইরাকের পুর্ণগঠন নিয়ন্ত্রণে আসেনি। কারণ যাকেই অভিভাবক বানানো হত তিনি নির্ধারিত সময় সীমা পূর্ণ করতে পারতেন না। তার পরে মাত্র একজন জন্মগ্রহণ করেন। যিনি তাতারীদের সাতে যুদ্ধ করেন এবং উল্লেখযোগ্যদিগকে মৃত্যুর দুয়ারে ঠেলে দেন। যাকে বলা হয় মুস্তা'ছিম বিল্লাহ ইবনে মুস্তানছির। অতঃপর ইরাক থেকে ৬৫৬ হিঃ আব্বাসীয় খেলাফতের চিহ্ন নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এজন্য মু'তাছিমকে ২৮ মহরম তারিখে হত্যা করা হয়। এখন তার ব্যাপারে আলোচনা

করা হবে।

মুস্তাছিম বিল্লাহর শাসনকালঃ

খলিফা মুস্তানছির এর পরে মুস্তাছিম বিল্লাহ সিংহাসনে আরোহন করেন। তার পূর্ণনাম হল- আবু আহমদ আব্দুল্লাহ ইবনে মুস্তানছির বিল্লাহর আবু জাফর মানছুর ইবনে জাহির মুহাম্মদ ইবনে নাছির আল আব্বাসী । যিনি খলিফাদের মধ্যে চুড়ান্ত রুক্ষ ছিলেন। যার শাসনকাল ৫২৪ হিঃ পর্যন্ত ছিল। মুস্তাছিমের জন্ম তার দাদার শাসনামলে। ইমাম জাহবী (রহ) বলেন- সাধারণ জনগণ তার আনুগত্য সেদিনই গ্রহণ করেন যেদিন জাহিরকে হত্যা করা হয়। ৬৪০ হিঃ জমাঃআউয়াল এ ঘটনা ঘটে । ইমাম দামিরী বলেন উপরোক্ত আলোচনার দ্বারা বুঝা যায় যে, তাঁর পূর্বে জীবনী লিখা হয় তা জাহিরের সহিত সম্পর্কিত। খলিফা মুস্তান সিরের সহিত সম্পর্কিত নয়।

এ ব্যাপারে জীবনী কারক যা পেয়েছেন তাই তিনি লিখেছেন। কারণ আমি সেদিনের ধ্বংস প্রাপ্ত যে অবস্থা পেয়েছি তা গণ্য করার মত। এজন্য মুস্তাছিমকে পদচ্যুত খলিফা হিসেবে গণ্য করা হয়। অতএব হালাকুখানের যুগে তারক পদচ্যুৎ করে হত্যা করা হয়। ৬৫৫ হিজরীতে বাগদাদের শাসন ক্ষমতা হস্তগত করা হয়। এ সমস্ত কথা ওযীর ইবনে আলকামার ষড়যন্ত্র মুস্তাছিমের অনুপযুক্ততা, বিশৃংখলা ব্যবস্থাপনা, কবুতর বাজীতে অর্থ ব্যয় এবং নামায়েজ কাজের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। যা খলিফার উপযুক্ততা ছিলনা । মুস্তাছিম খালাকু'র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করেন। তার সাথে ফুকাহায়ে কেরাম এবং ছুফী সাধকদের ও একটি দল ছিল। সুতরাং এদের সবাইকে হত্যা করা হয়। মুস্তাছিমকে অপসারিত করে তার ঘরে রেখেই হাতুড়ী দ্বারা পিটিয়ে হত্যা করা হয়। কেউ কেউ বলেছেন চুনের পল যুক্ত মেঝেতে ফেলে তাকে হত্যা করা হয়। এরপরই আব্বাসীয় গোত্রের ব্যবস্থাপনা দুর্বল হয়ে পড়ে। ৬৫৬ হিঃ ২৮ শে মহরম মাসে এ ঘটনা ঘটে।

কোন কোন ঐতিহাসিক মুস্তাছিমের হত্যার ঘটনা বর্ণনা করেন যে, উদ্ধুত হালাকু ইবনে কুবলায়ী ইবনে ফেল চেঙ্গিজ খান ৬৫৬ হিঃ একদল সৈন্য সহ বাগদাদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। তাকে মোকাবেলা করার জন্য অফিস সহকারীর পর্যন্ত নেমে আসে আবার তৃতীয়বার সৈন্য বাহিনী কমান্ড করে চূড়ান্ত

পর্যায়ে পৌছে যায়। (ইহাই ছিল তাদের সর্বশেষ শক্তি) নানা দুর্বলতার কারণে তারা পরাজিত হয়। এরপর অভিজাত ব্যক্তি বর্গ বাগদাদের পশ্চিমাঞ্চলে স্থাপন করে এবং হালাকুখা ও পশ্চিম দিক দিয়ে চলে আসেন । অবস্থা বেগতিক দেখেমন্ত্রী খলিফাকে এই পরামর্শ দিলেন যে, হালাকুখানের সহিত (অতি সত্বর) সন্ধি করুন। সুতরাং খলিফা একাই বের হয়ে তার বিশ্বস্ততা প্রকাশ করে চলে আসেন। ফেরত সে বলেন যে, হালাকুখান আপনার কন্যার সহিত তার ছেলের বিয়ে দিতে চান আরো বলা হয়েছে যে, সেল জুকী বাদশাহর মত আপনাকে হালাকুখানের আনুগত্য করতে হবে। তারপর হালাকু এখানে থেকে চলে যাবেন।

অবস্থা দৃষ্টে খলিফা ভাবলেন রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের পরামর্শ নেয়া দরকার । উদ্দেশ্যে তিনি সবাইকে নিয়ে বসা মাত্রই খালাকুখান সকলের সহিত খলিফাকেও হত্যা করে ফেলেন। মুস্তাছিম ছিলেন ধৈর্যশীল, ভদ্র, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সুবিবেচক। তিনি বিদায়াতকে মনে প্রাণে ঘৃণা করতেন। ভাল কাজের প্রতি তার অত্যন্ত আকর্ষণ ছিল। সুতরাং তার এই গুণাগুণ মধ্যেই সীমিত ছিল। হিংস্র হালাকু হুকুম জারী করেছিল যে, তাকে এবং তার পুত্র আবু বকরকে বক্ষ স্থলে মারতে মারতে ধ্বংস করতে হবে। পে তার আদেশই বাস্তাবায়িত হয়।

মুস্তাছমের মৃত্যুর ঘটনা অনুসন্ধান করে লিখা ঐতিহাসিকদের জন্য অতি নাজুক ব্যাপার। এরপর আনুমানিক ৩ বছর পর্যন্ত জনগণ খলিফাহীন অবস্থায় ছিল। শেষ পর্যন্ত মিশরীরা ৬৫৯ হিঃ রজব মাসে মুস্তানসির বিল্লাহর আনু গত্য মেনে নেয়।

মুস্তানসির বিল্লাহ আহমদ ইবনে খলিফা জাহের বিল্লাহর খেলাফত ঃ

তার পূর্ণ নাম আহমদ ইবনে খলিফা জাহির বিল্লাহ মুহাম্মদ নাসির আল আব্বাসী আল আসওয়াদ । তার মা ছিলেন হাবসী। তিনি অত্যন্ত সাহসী এবং বীর ছিলেন। তিনি যখন মিশরে আগমন করেন- তখন লোকেরা তাকে চিনে ফেলে। কারণ এই সে মুস্তাসিম যাকে হত্যা করেছিলেন। তিনি তার চাচা ছিলেন। অতঃপর ক্ষমতার বাগডোর হাতে পাওয়ার জন্য এবং খলিফা জাহিরের আনুগত্য করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। সুতরাং জনগণের দায় দায়িত্ব তার উপর ন্যস্ত করা হয়। অতঃপর তারা উভয়ে সিরিয়ার দিকে চলে যান।

এর পর খলিফা এখানে থেকে পৃথক হয়ে যান। অতঃপর তিনি বাগদাদ

দখল করার জন্য ১০০০ হাজার সৈন্য প্রস্তুত করেন। শেষে তার মধ্যে ও তাতারীদের মধ্যে প্রচন্ড যুদ্ধে তিনি নিখোজ হয়ে যান। তার পাশে ছিলেন হাকিম আবুল আব্বাস। অতঃপর তিনি সিরিয়া পর্যন্ত পরাজয় বরণ করেন।

হাকিম বি আমরিল্লাহর খেলাফত ঃ

৬৬১ হিঃ ৮ই মহরম তারিখে এক বিরাট জনসমাগমে খলিফার আনুগত্য স্বীকারের জন্য লোক জড়ো হয়। জনগণ আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে আমীর আবু আলী ইবনে আবু বকর ইবনে মুস্তারশিদ বিল্লাহ ইবনে মুস্তাজহির বিল্লাহ আব্বাসী এর নিকট আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন।

অতঃপর বাদশাহ জহির ও তার প্রতি আনুগত্যের হাত সম্প্রসারিত করেন। তারপর বিচারকগন ও আনুগত্যের শপথ নেন। এ সময় তার উপাধি দেয়া হয় হাকিম বি আমরিল্লাহ। অতঃপর ২য় দিন একটি বিরাট খুৎবা প্রদান করা হয় যার প্রথম কথাগুলো ছিল এরকম-

الحمد لله الذى اقام لبنى عباس ركنا وظهرا

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার যিনি বনু আব্বাসকে শিক্তি ও সহযোগিতার উপলক্ষে বানিয়েছেন। এরপর খেলাফত ও আনুগত্যের জন্য সমগ্র রাজ্যে পত্র মারফত আহবান জানানো হয়। সুতরাং তিনি মাত্র কয়েক বছর এবং কয়েক মাস সিংহাসনে ছিলেন। ৭০১ হিঃ জমাঃ উলা তারিখে মিম্বরে আরোহন করে খুৎবা প্রদান করেন। তিনি ২৯ বছর পর্যন্ত রাজ্য শাসন করেন।

তিনি ৭৪০ হিঃ শাবান মাসে কওস নামক স্থানে ইন্তেকাল করেন। মৃত্যু কালে তার বয়স হয়েলি ৫০ বছর।

হাকিম বি আমরিল্লাহ আমমদ ইবনে মুস্তাকফী বিল্লাহর খেলাফত ঃ

হাকিম বি আমরিল্লাহ আমমদ ইবনে মুস্তাকফী বিল্লাহর শাসনকাল ৭৪২ হিঃ মহরম মাস পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। কেননা তার পিতা তাকে ভবী খলীফা মনোনীত করে গিয়ে ছিলেন। তাই তার কাছ থেকে বাইয়াত নেয়া হয়। ঐতিহাসিক হোসাইনী তাঁর ইতিহাসে "যীনে আলাল বার" এ তাই উল্লেখ করেছেন। শেষে ইমাম জাহবী লিখেছেন যে, তার শাসনকাল ছিল ৭৪০ হিঃ পর্যন্ত। তার ইন্তেকালের সময় ভাই ইব্রাহীম অভিভাবকহীন বাইয়াত গ্রহণ করেন। তিনি খেলাফত পরিচালনা করতে থাকেন। ৭৫৪হিঃ কাহেরাতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

মু'তাযিদ বিল্লাহর খেলাফত ঃ

তিনি যেহেতু তার ভাই হাকিম বি আমরিল্লাহর অভিভাবক ছিলেন সেহেতু তার মৃত্যুর পর তিনি শপত গ্রহণ করেন। তিনি মু'তাযিদ নামেই সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তার বংশধারা নিম্নরূপ- "মু'তাযিদ বিল্লা ইবনে আবুল ফাতাহ ইবনে আবু বকর ইবনে মুস্তাকফী বিল্লাহ আবুররাবি সুলাইমান ইবনে হাকিম বিআমরিল্লাহ আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে আবু আলী ইবনে মুস্তারশিদ বিল্লাহ আল আরবাসী। তিনি একটানা বিশ বছর রাজত্ব করেন। ৭৬৩ হিঃ ৪ঠা জমাঃ উলা তারিখে কাহেরাহ নামক স্থানে তিনি ইন্তেকাল করেন।

মুতাওয়াক্কিল আলাল্লাহর খেলাফত ঃ

তিনি যেহেতু তার পিতার পক্ষ থেকেই ভাবী অভিভাবক ছিলেন সেহেতু পিতার ইন্তেকালের পর ৭৬৩ হিঃ ৭ই জমাঃ ছানী তারিখে তিনি শপথ গ্রহণ করেন। তিনি ৭৪০ হিঃ বা এর কাছাকাছি সনে জন্ম গ্রহণ করেন। তার নাম ছিল আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ। কেহ বলেছেন তার নাম হামজাহ মুতাওয়াক্কিল আলাল্লাহ ইবনে মু'তাযিদ বিল্লাহ আব্বাসী। তাঁর পর তিনিই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী হন। তিনি ৮০৮ হিঃ রজব মাস পর্যন্ত সিংহাসনে ছিলেন। অতঃপর তাকে অপসারণ করে বন্দী করা হয়। এরপর ওমর বিন মু'তাযিদের শপথ নেয়া হয়। তার উপাধি দেয়া হয় ওয়াসিক। অতঃপর তিনি ইন্তেকাল করলে তার ভাই যাকারিয়া শপথ গ্রহণ করেন এবং তার উপাধি দেয়া হয় মুস্তাসিম। এ সময় মুতাওয়াক্কিল ৯১ বছর বয়সে সফর মাস পর্যন্ত কারা জীবন কাটান। কয়েক দিন পর তাকে বন্দী দশা থেকে মুক্ত করা হয়। আবার তাকে বন্দী করে জনগণের সহিত সাক্ষাৎ করা বন্ধ করে দেযা হয়। আবার ১৭ ই রবিঃ উয়াল তারিখে তাকে বন্দীদশা থেকে মুক্ত করা হয়।

অতঃপর জমাঃউলার প্রথম তারিখে তর কাছে আনুগত্যের পশথ নেয়অ হয়। সুতরাং তার কাছে বিচারপতি ও অন্যান্য পদস্থ কর্মকর্তা কর্মচারীগণ একত্রিত হন। তার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলো। এ অবস্থায় ক্ষমতা থাকাকালীনই তিনি পরলোক গমন করেন।

মুস্তাঈন বিল্লাহর খেলাফত ঃ

তার পূর্ণ নাম আবুল ফজল আব্বাস ইবনে মুতাওয়াক্কিল আলাল্লাহ আবু

আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ ইবনে মু'তাজিদ আবু বকর ইবনে সুলায়মান ইবনে আহমদ আব্বাসী। তার পিতা তাকে অভিভাবক নিযুক্ত করেছিলেন। কিন্তু তার পূর্বে অন্য ছেলে মু'তামিদ আলাল্লাহকে অভিভাবক বানিয়ে ছিলেন। কিন্তু তার কাছ থেকে অভিভাবকত্ব ফেরত নিয়ে মুস্তাঈদ বিল্লাহকে দিয়ে দেন। মু'তামিদ আলল্লাহ সর্বক্ষণ খেলাফতের ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত থাকেন।

পিতা মুতাওয়াক্কিল আলাল্লাহ যখন ইন্তেকাল করেন তখন তার ছেলে মুস্তাঈন এর কাছ থেকে ৮০৮ হিঃ রজব মাসে শপথ নেয়া হয়। সুতরাং মুস্তঈন সব সময় খলিফা নিযুক্ত থাকেন। শেয পর্যন্ত বাদশাহ নাসির ফারজ ইবনে বারকুক দামেস্ক অবরোধ করে নেন । কেউ বলেছেন মুস্তাঈনের কাছ থেকে এমন রাষ্ট্রের শপথ নেয়া হয় যা কিনা শুধু নাম সর্বস্বই ছিল।

ঘটনাটি ঘটেছিল ৮১৫ হিঃ ১৫ই মহররম তারিখে। আবার কয়েক দিন পর ব্যবস্থাপনা পরিষদ, কাজী এবং চিকিৎসকগণ, কতিপয় সাধারণ লোক একত্রিত হয়ে তার ব্যপারে প্রশ্ন উত্থাপন করলে তিনি কঠোরভাবে তা দমন করেন। কিন্তু যখন তাদের বিশ্বাস ও আস্থা জন্ম নিল তখন তাকে বরণ করে নেয়া হয়। তার উপাধিকে পরিবর্তন করা হয় নাই। অতঃপর স্বর্ণ এবং রোপার টাকায় তার নামাঙ্কিত করা হয়। সিংহাসনে আরোহন এবং পদচ্যুতির ব্যাপারে প্রচুর টাকা ব্যয় করেন। খুৎবাহ এবং বিচার ব্যবস্থা তার অধীনে ছিল।

সৈন্যবাহিনী তৈরী হয়ে যখন মিশরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হল তখন প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীগণ তার সামনে উপস্থিত ছিল। কিন্তু ব্যবস্থাপকগণ এবং বিশিষ্ট আমীরঘণ শেখের পাশে চিলেন। অতঃপর তিনি রবিঃছানী মাসের ৮ তারিখে মিশরে প্রবেশ করে বিশ্রংখল অবস্থার সৃষ্টি করেন, তখন সমস্ত অফিসারগণ তার সামনে হাজির ছিলেন। এ দিনটি হাশরের মাঠের মতই মনে হচ্ছিল। এ সময় তিনি দুর্গেই থাকতে ছিলেন। এরপর দুর্গে অবতরণ করেন এবং ধর্মীয় পন্ডিত ব্যক্তি বাবে সিলসিলা থেকে ঘোড়াশালে অবতরণ করেন।

কিন্তু ৮ম দিনে শেখ এবং অফিসারগণ মহলে প্রবেশ করেন এবং খলিফা সিংহাসনে আরোহন করেন। শেখকে খলিফা এমন শাহী পোষাক পরিধান করালেন যার কোন তুলনা হয়না। তারপর শেখকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বাগডোর হস্তান্তর করেন এবং "নিযামে মূলক" ইপাধিতে ভূষিত করেন। অতঃপর শেষ

যখনই তাদের জন্য হারামাইন শরীফের মিম্বরে দোয়া কর হয়। অফিসারগণ যখনই তাদের কাজ থেকে অবসর নিতেন তখনই তারা ঘোড়াশালে শেখের নিকট চলে যেতেন এবং তাদের সংশয় সন্দেহ বিদূরীত করতেন।

এরপর শেখের সহকারী খলিফার দিকে ফিরে সংকলিত ঘোষণা সমূহে স্বাক্ষর করতেন। এভাবে একটা নির্ধারিত সময় পর্যন্তএ অবস্থা চলতে থাকে। শেখ ধারণা করলেন যে, খলিফার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিয়ে তার ঘরে ফিরে যেতে চান। কিন্তু যখন তা করলেন না কথন তিনি তার কাছ থেকে দূরে সরে পড়লেন। অতঃপর তার কাছে বাকর নোকর ও তার ঘনিষ্টজন ব্যতীত আর কেহ থাকে নাই। অতঃপর শাবানের প্রথম দিকে সোমবার দিন প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীগণ বিচার পতি, অফিসারগণ, সাথীবর্গকে একত্রিত করলে, তারা তার কাছে আনুগত্য প্রকাশ করেন। এসময়ে তার উপাধি দেয়া হয় সুলতান মুইয়াদ আবু নছর । অতঃপর তিনি মহলে আরোহন করে রাজকীয় আসনে বসে যান। অফিসারগন তাকে কদমকুছি করেন। বিচারপতিগণ এবং সমস্ত শ্রমিকগণ করমর্দন করে।

তাপর খলিফার নিকট এ সংবাদ প্রেরণ করা হয় যে, তার কাছে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে তিনি যেন উপস্থিত থাকেন। সুতরাং এই শর্তেই খলিফা তা মনজুর করে যে তিনি যদি ঘরে ফিরে যান তাহলে আমি সাক্ষী থাতলাম। বেশ কয়েকদিন পর্যন্ত তিনি অনভূলে ছিলেন না। অতঃপর তাকে মহল থেকে স্থানান্তরিত করে দূর্গের এক কামরায় নিয়ে যাওয়া হয়। তখন তার সঙ্গে তার পরিবার পরিজন এবং সে সমস্ত লোকজন ছিল যারা ভিতরে প্রবেশ করতে পারত না। কিন্তু জিলক্বদ মাসে মিম্বরে খলিফার জন্য দোয়া করা ছেড়ে দেয়া হয় এবং রাষ্ট্রের অবিভাবক হওয়ার পূর্বে তার সহিত দোয়া করেছিলেন। অতঃপর তিনি ক্ষমতায় টিকে যান। ১৬ বছর পর তাকে পদচ্যুৎ করা হয়। অতঃপর যখন মুয়াইদ ফিরোজের কাছে গেলেন যাকে ইস্কান্দরিয়াতে পাঠানো হয়েছিল। সেখানে তিনি স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। এবং তাতারী রাষ্টের ক্ষমতায় চলে আসেন। এরপর সেখানে তার বসবাসের স্থান হয়ে যায় এবং ব্যবসায় ভাল আমদানী হয়। অতঃপর তিনি সেখানেই বসবাস করতে থাকেন। প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি সেখানেই ৮৩৩ হিঃ শাহ্যদাতের পিয়ালা পান করেন।

বন্ধু -বান্ধব ও নিকটজনদের প্রতি উপদেশ ঃ

ইমাম শা'বী (রহ.) বলেন যে, আমার কাছে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) তিনি তার পিতার বরাত বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন- হে বৎস! তার নাম ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) যিনি সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম থেকে তোমাকে সর্বদা অগ্রগামী করে রাখেন। এজন্য আমি তোমাকে ৪টি উপদেশ দিচ্ছি শোন-

(১) তুমি তাঁর সম্মুখে কারো গোপন কথা প্রকাশ করবেনা।

(২) তাঁর সামনে মিথ্যা কথা বলবেনা।

(৩) তার সম্মুখে কারো প্রশংসা করতে অতিরঞ্জিত কিছু বলবেনা।

(৪)তাঁর সম্মুখে কারো গীবত করবেনা।

ইমাম শা'বী বলেন আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.)এর নিকট আরজ করলাম যে, এর মধ্যে প্রত্যেকটি উপদেশে ১০০০ হাজারের চেয়েও উত্তম তখন তিনি বল্লেন না বরং ১০,০০০ হাজারের চেয়েও উত্তম।

কোন কোন জ্ঞানী বলেন, যখন কোন বাদশাহ তোমাকে বেশী বেশী সম্মান করতে থাকবে তাহলে তুমি তার সম্মান করবে।যখন তোমাকে কেহ বালকের মত হনে করে তখন তুমি তাকে মুরুব্বী মনে করবে যখন তোমারকে ভাই বানাবে তখন তুমি তাকে পিতার মত মনে করবে। তমি তাকে দন্ডের সাথে বেধে সাজা দেয়ার মত দেখনা। তার জন্য বস সময় দোয়া করতে থাক।দোয়া করা বন্ধ করোনা। যখন সে তোমার উপর অসন্তুষ্ট হবে তখন তুমি প্রতিক্রিয়াশীল হয়োনা যখন সে সন্তুষ্ট থাকে তখন তুমি তাকে ধোকা দিওনা পেছনে লেগে থেকে কোন জিনিষ চেয়েও না । সুতরাং এ বিষয়ের কবিতা হলঃ

قرب الملوك يا اخاالبدرالسنى:: حظجزيل بين شرقى ضيغم

ওহে আমার মধ্যম বয়সী ভাই, সম্রাটের নৈকট লাভ করা সিংহের দুচোয়ালে চলে যাওয়ার নামান্তর।

ফজল বিন রবি বলেন যে, যদি কেহ বাদশাহর কাছে অনুপযুক্ত স্থানের কথা বলে তাহলে সে শিষ্টাচার সম্পর্কে ওয়াকিফ হাল নহে। সে যেন তার তুখ খনন করে। তার একাজ অসময়ে বাদ্য বাজানোর মতই এবং অসময়ে নামাজ আদায় করার মতই। এজন্য ওয়াক্ত ব্যতীত নামাজ কবুল করা হয়না।

খালিদ বিন ছাফওয়ান বলেন যে, যে ব্যক্তি বাদশাহর নিকট ভাল এবং আমানতের সহিত বসে, সে বড় ন্যায় পন্থি। সে এ সমস্ত লোকদের মত নয় যারা কপটতা ও খেয়ানতের সহিত বসে। কারণ সে বাদশাহর সামনে উপদেশ দাত দুশমন হয়ে, এবং বন্ধু বেশী দুশমন হয়ে কাছে আসে।

সুতরাং দুশমন বাদশাহর উপদেশের কারণে বিদ্বেষ রাখে এবং বন্ধু তার উচ্চ মর্যাদার কারণে লোভ করে।

হাকিম আফলাতুন বলেন যে, তুমি যদি কোন বাদশাহর খেদমতে থাক তাহলে আল্লাহর কাছে অপরাধ থেকে বাচতে তার অনুসরণ করোনা। কেননা আল্লাহ্ পাকের দয়া অধিক প্রশস্ত। যে বাদশাহর দরবারে তুমি আসা যাওয়া কর এবং আল্লাহতায়ালার শাস্তির প্রতিজ্ঞা বাদশাহর শাস্তি ও ধমক থেকে কঠোর।

নবী করিম (সঃ) এরশাদ ফরমান যে,

من تواضع لغنى لاجل غناه ذهب ثلثة دينه.(الحديث)

অর্থাৎ যদি কোন সম্পদশালী তার সম্পদে প্রভাবিত হয়ে যায় তাহলে এর প্রভাবে দ্বীনের এক তৃতীয়াংশ তার কাছ থেকে চলে যায়।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) এবং হযরত আনাস (রাঃ) বলেন

জানাব রাছুল (সঃ) বলেন-

من اصبح حزينا على الدنيا اصبح ساقطا على ربه ومن اصبح يشكو مصيبته فانما يشكو ربه ومن دخل لغنى فتضعضع له ذهب ثلث دينه.(بيهقى فى الثعب الايمان)

"যে ব্যক্তি দুনিয়ার চিন্তা করে সকালে সে যেন তার প্রভূর উপর রাগান্বিত হল। আর যে ব্যক্তি তার দুৎখ দুর্দশার উপর অভিযোগ করে প্রভাত করে ফেলল সে যেন তার প্রভূর উপর অভিযোগ দায়েরকরল। যে ব্যক্তি কোন ধনবান ব্যক্তির নিকট গরম করল এবং তার প্রতি ঝুকে গেল, তার দ্বীনের এক তৃতীয়াংশ ধ্বাংস হয়ে গেল।

হযরত আবুযর গিফারী (রাঃ) বলেন- নবী করিম (স.) এরশাদ ফরমান-

আল্লাহ্ তায়ালা সে ফকীরের উপর অভিসম্পাৎ বর্ষণ করেন যে কোন ধনীর নিকট গিয়ে মাল পাবার আশায় ঝুকে যায়। যে ব্যক্তি এমন কাজ করল

তার দ্বীনের দুই তৃতীয়ংশ চলে গেল। অন্য একটি হাদীসে আছে-

من ترك شيئا لله عوضه الله خيراً.(الحديث)

নবী করিম (স.) এরশাদ ফরমান যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য কোন বস্তু ত্যাগ করে আল্লাহ পাক তার প্রতিদান কোন উত্তম কাজের মাধ্যমে দিয়ে থাকেন। কোন কোন ছাহাবা (রা.) বর্ণিত

انك لاتدع شيئا التقاء الله الااعطاك الله خيراً منه .(رواه احمد مرفوعاً

তুমি আল্লাহ তায়ালার ভয়ে কোন জিনিষকে ছেড়ে যেতে পারবেনা কিন্তু তা এই যে, আল্লাহ পাক তোমাকে এর চেয়ে উত্তম বস্তু প্রদান করবেন।

আফলাতুন বলেন যে ব্যক্তি অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে না, সে প্রতারিত হয়। তিনি আরো বলেছেন যে, অভিজ্ঞতা শিষ্টাচারে জন্য এবং রাত দিনের আবর্তন উপদেশ এবং সতর্কী করণের জন্য যথেষ্ট। বাদশাহ ২য় একটি প্রকান্ড সাগরের মত। যার থেকে ছোট ছোট অসংখ্য নদী প্রবাহিত হয়। যদি সে সাগরের পানি মিষ্টি হয় তাহলে সে ছোট ছোট নদীর পানিও মিষ্টি হবে। আর যদি নোনা হয় তাহলে ছোট ছোট নদীর পানিও নোনা হয়। কোন জ্ঞানী লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করা হল, তখন সে জবাব দিল যার মধ্যে শিষ্টাচারের গুনাবলী একত্রিত হয় তাহলে সে রাগের নিকট পরাজিত হয়না। কেননা জ্ঞান কথাবার্তার মধ্যে ধৈর্যের জন্ম দেয়। অথবা জ্ঞানী স্বতন্ত্র সত্তার নাম সুতরাং তার ফল হয় প্রশান্তিময় । বাদশাহ হল চলন্ত বাজারের মত যার মধ্যে বিভিন্ন মালামাল থাকে। বাদশাহ শহরে আরোহীর মত, যাকে লোকে ভয় পায়। বরং লোক তার সওকরীর কারণে আরো বেশী ভীত সন্ত্রস্থ হয়।

যদি কেউ তার উদ্দেশ্য জানতে পারে তাহলে এতে ব্যয় করতে সহজ হয়। যার দৃষ্টিকে লাগামহীন করে দেয় সে অনেকদিন পর্যন্ত আনুশোচনায় ভুগতে থাকে। যার আশা আকাংখা দীর্ঘ হয় তার ব্যবস্থাপনায় ত্রুটি হয়। যার মুখে লাগাম নেই সে নিজেই নিজেকে আসামী করে। যে ব্যক্তি নিজের ত্রুটিকে বিদূরীত করে হিংসুকেরা তাকে ঈর্ষার নজরে দেখে। যে ব্যক্তি মুছিবত সহ্য করে সে গভীরে পৌছে যেতে পারে। যে ভাল জিনিষকে ভালবাসে সে হারাম স্থান থেকে বাচঁতে পারে।

যে ব্যক্তি সুধারনা রাখে তা অনেকদিন পর্যন্ত শিষ্টাচার ভদ্রতার

স্থলাভিষিক্ত। ভদ্রলোক যতই সজ্জিত হবে ততই সে বদ্ বখ্তকে ক্ষমা করতে বিগড়ে যায়। যে ব্যক্তি জ্ঞানী লোকের পরামর্শে কাজ করে সঠিক পন্থা সে পায়। যে ব্যক্তি কারো কাছ থেকে আশা প্রাপ্ত হয় সে ততই ভীত হয়।

যে কোন কাজই সূচারু রূপে করেনা- সে শুধু দোষ- খোঁজে। যে ব্যক্তি ঝগড়া ঝটি বেশী করে সে পাপ করে। যে ব্যক্তি নিয়ম ভঙ্গ করে কাজ করে সে অত্যাচার করে। আর সে উদ্দেশ্যের বিপরীত কাজ করে। যে ব্যক্তি নিজেকে এমন কাজের জন্য উপস্থিত করে যা তা সে করতে পারবেনা, তাহলে অন্যের দৃষ্টিতে তা পড়ে যাবে।

যে নেতৃত্ব দিল সে তার উদ্দেশ্যে পূর্ণ করল। অনাথ এবং নিঃস্বদের উপর জুলুম করা দারিদ্রতার চাবিকাঠি। বক্ষের বিশুদ্ধতা বিস্মৃত অন্তরের মানুষ ছাড়া অন্য কেহ তা করতে পারেনা। অল্প কথায় আশ্রমে বসা ব্রাহ্মন বাধা দেয় এবং ছোট লোকই ফখরের শীকার হয়। আর কৃপণ লোক পক্ষপাতিত্ব করে। সাহায্যকারী ভাইয়ের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যক্তি ব্যতীত অন্যকে পানির প্রয়োজনীয়তার ন্যায় নীতির অভিলাষী হয়না।

সাহায্যকারী ভদ্রলোকের কাছ থেকে যখন অনুকম্পা প্রত্যাশা করা হয় তখন সে নম্র আচরণ করে । পাপিষ্টের কাছথেকে যখন ভদ্রতার আশা করা হয় তখন সে আরো কঠোর হয়ে যায়। আল্লাহর কাছে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী নৈকট্যের অধিকারী যে প্রতিশোধের শক্তি থাকার পরও মাফ করে দেয়। নির্বোধ হল সে ব্যক্তি যে তার চেয়ে দুর্বল ব্যক্তির উপর অত্যাচার করে। যে ব্যাক্তি নিজের জন্য উপদেশ দাতা না হয তার্ুপদেশ উপকারী হয়না।

যে ব্যক্তি তার অদৃষ্টের উপর সন্তুষ্ট থাকে সে বিপদ আপদে ধৈর্য ধারন করে। যে ব্যক্তি দুনিয়াকে আবাদ করে সে যেন তার ধন সম্পদ বিনষ্ট করল। যে ব্যক্তি পরকালকে যথেষ্ট মনে করে সে তার বাসনা পূর্ণ করে। তুষ্টি, দারিদ্রতাকে সম্মানী করে নেয় ছদকা করা মালদারের জন্য ভান্ডার স্বরূপ। যে ব্যক্তি তার নিজের ত্রুটি বিচ্যুতিকে সাঁচে ঢেলে দুর্ভেদ্য প্রাচীরে আবদ্ধ রাখল তার হাশর মন্দ হবে। পাপিষ্ট সে ব্যক্তি যে নিজের ব্যাপারে কৃপণতা করে অন্যের জন্য ধন সম্পদ জমা করে।

সৌজন্যবোধ উত্তম অভ্যাস। যে লোক ধনী হয় সে টাকা পয়সা যত্নে

রাখে। যে তার প্রয়োজন আল্লাহর সামনে পেশ করে সে লেনদেনে বিজয়ী হয়। যে ব্যক্তি তার প্রয়োজন লোকের কাছে প্রকাশ করে সে তার নিজের ইজ্জতকে ভুলুণ্ঠিত করে। যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের গোপন রহস্য ফাঁস করে দেয় আল্লাহ পাক ও সব সময় তার গোপন কথা ফাঁস করে দেন।

মুর্খের অনাচার থেকে বেচে থাক। জ্ঞানী লোকের আনুগত্যের উপকৃত হও। রোকার কাছে শিষ্টাচার শিক্ষা যেমন তিক্ত বৃক্ষের গোড়ায় পানি ঢালার মত। এতে বিশ্বাদ ব্যতীত আর কিছুই পাবেনা। যে যা করবে তার প্রতিদান পাবে।

যেভাবে শপথ করে তুমি তা গ্রহণ করেছ তা সে অনুযায়ী কাজ করিও। কোন কোন খলিফা তার বংশী ভাইর কাছ থেকে আনন্দে তরঙ্গের মত লুকিয়ে আসে। সে তার সম্মুখে ১০০০ হাজার টাকার থলি ঢেলে দেয় এবং সে বলতে থাকে যে তুমি তাই রেখে দাও। অতঃপর ছোট বাচ্চাদেরকে প্রেরণ করে এবং তাকে তা খরচ করার পূর্ণ অনুমতি য়ে এবং তাও বলে দেয়া হয় যে তোমাকে তা খরচ করার পূর্ণ ক্ষমতা দেয়া হল। কোন কোন তথ্য জ্ঞানী বলেন, প্রকৃত বুদ্ধিমান হল সে ব্যক্তি যে সম্পদের দ্বারা নিজেকে হেফাজত করল এবং দ্বীনকে প্রবৃদ্ধি থেকে থেকে রক্ষা করেছে। মানুষের মধ্যে সে ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী দানবীর যে ব্যক্তি বিদ্যা ও সম্মানের সহিত মানব সমাজে বসবাস করে। উত্তম স্বাদ হল এই যে, নিজের ভাইদের সহিত ভাল ব্যবহার করা। পূঁজি হল নেক কাজ করা। পূণ্য করা জ্ঞানী লোকের জন্য গণিমতের মালের মত। সৌজন্য বোধ হিত কর্মের আতর স্বরূপ।

যে তার সম্পদ ব্যয় করে অনুরূপ তাকে দেয়া হয় যে ব্যক্তি তার টাকা পয়সা স্বল্পবলে মনে করে তার মান সম্মান চলে যায়। পূন্যার্জনকারী কখনোই বিফল মনোরম হয়না। যদিওবা কখনো হয়ে যায়, তাহলে তাকে সহায়তা করার মত লোক সাড়া দেয়। ন্যায় পরায়ন বাদশাহ বৃষ্টি এবং উট থেকে শ্রেষ্ট। অত্যাচারী বাদশাহ সার্বক্ষনিক ফিতনা থেকে উত্তম। বাদশাহর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপালনে আর তার ভদ্রতা ক্ষমা করার মধ্যে। তার সম্মান ন্যায় নীতির মধ্যে। ন্যয় নীতি জগত পরিচালনার নাম। হাদীছে বর্ণিত আছে-

قال رسول الله ﷺ سبعة يظلهم الله يوم لاظل الاظله امام عادل ـ(الحديث)

২৩-৯

নবী করিম (স.) এরশাদ ফরমান- আল্লাহ তায়ালা সাত ধরনের লোককে সেদিন (কিয়ামতের দিন) ছায়ার নীচে রাখবেন যে দিন আল্লাহর ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়অ থাকবেনা। হাদীছ এর মধ্যে প্রথম ব্যক্তি ন্যায় বিচারক। সুতরাং নবী করীম (স.) ন্যায় বিচারকে প্রথমে উল্লেখ করেছেন।

قال عليه الصلوة والسلام عدل السلطان يوا يعد عبادة سبعين سنة

নবী (স.) এরশাদ ফরমান- বাদশাহর এক দিনের ন্যায় বিচার ৭০ বছরের ইবাদতের সমান।

قال عليه الصلوة والسلام عدل ساعة فى الحديث خير من عبادة ستين ستة

নবী করিম (স.) এরশাদ ফরমান- এক মুহুর্তের ন্যায় বিচার ৬০ বছরের ইবাদত থেকে উত্তম।

قال عليه الصلوة ولاسلام السلطان ظل الله فى الارض ياوى اليه كل مظلوم من عباده فان عدل كان له الاجر وعلى الرعية الشكروان جبار كان عليه الاثم وعلى الرعية الصبر.

নবী করিম (স.) এরশাদ ফরমান বাদশাহ যমীনে আল্লাহর ছায় স্বরূপ। আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে প্রত্যেক নিপীড়িত ব্যক্তি তার কাছে আশ্রয় চায়। যদি বাদশাহ ন্যায় বিচার করে তাহলে তার জন্য প্রতিদান রয়েছে এবং প্রজা সাধারণের উপর শুকরিয়া আদায় করা কর্তব্য হয়ে পড়ে। কিন্তি যদি সে অত্যাচার করে তাহরে তার পাপ হয়- আর প্রজার উপর ধৈর্য ধারন করা কর্তব্য হয়ে যায়।

মুতাযিদ বিল্লাহ আবুল ফাতাহ দাউদ এর খেলাফতঃ

৮১৬ হিঃ ১৮ ই জিলহজ্ব মাসে মু'তাযিদ বিল্লাহর কাছ থেকে তার ভাই মুস্তাঈদ বিল্লাহ পরিবর্তে শপথ নেয়া হয়। এজন্য সুলতান মুয়াইদকে পদচ্যুৎ করা হয়েছিল। অতঃপর তাকে ডেকে এনে সুলতান মুয়াইদ এবং কাজী ছালেহ বিলকিনী শাফেয়ীর মাঝখানে বসানো হয়। অতঃপর তাকে সিং হাসনে স্থায়ীভাবে বসানো হয়। তিনি গদিতে বসে যান। তিনি ৮৪৫ হিঃ ৪ঠা রবিঃ আউয়াল রবিবার দিন এক পুরাতন রোগে আক্রান্ত হয়ে ৮০ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

মুস্তাকফী বিল্লাহর খেলাফত ঃ

তার পূর্ণনাম আবু রবি ইবনে মুতাওয়াক্কিল আলাল্লাহ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আবু বকর ইবনে সুলায়মান ইবনে আহমদ আব্বাসী। তার ভাই মু'তাযিদ বিল্লাহ ইন্তেকালের দিনই তিনি শপথ গ্রহণ করেন। এজন্য তাকে অভিভাবক বানানো হয়েছিল। সম্ভবত তা হয়েছিল ৮৪৫ হিঃ রবিউল আউয়াল মাসে। সালাহউদ্দিন ছাফাদী " শরহে লামিয়াতুল আজম" নামক কিতাবে লিখেছেন, এমনিভাবে উবাদী গোত্রের লোকেরা মিশরের খলিফাকে ফাতেমীয়দের উপাধিতে ভূষিত করেছিল। এদের মধ্যে সর্বপ্রথম মারাকিশের অলি নিযুক্ত হন। তিনিই মাহান্দী তাঁর পরে শাহজাদা মনছুর আবার মোয়াজ একজনের পর অপরজন নির্বাচিত হন। মনে করা হয় এই মোয়াজকেই সর্বপ্রথম মিশরের অলী বানানো হয়। যা আলোচনা করা হয়েছে। এরপর আজিজকে নির্বাচিত করা হয়। আবার ক্ষনকালীন-খলিফা হাকিমকে বানানো হয়। তার বোনই তাকে হত্যা করে।

ছফদী লিখেছেন- হকিমকে তার বোন যখন হত্যা করে তখন তার (হাকিমের) ছেলে জাহেরকে অভিভাবক বানানো হয়। অতঃপর মুস্তাক্ফী, মুস্তানসির, আল আমর ও হাফিজ প্রমূখ একের পর এক খলিফা হতে থাকেন। অতঃপর খলিফা বানানো হয় জাফর কে। সুতরাং তাকে অপসারিত করা হয়। তারপর ক্ষনকালীন তার ছেলে জাফর এর ছেলে সফলতা লাভ করেন এবং কনিষ্ট ছেলে আযিদকে অভিভাবক বানানো হয়।

তিনি আরো লিখেছেন যে, এমনিভাবে মিশরে বনি আইয়ুব বংশ রাজত্ব করতে থাকে। সুতরাং সর্ব প্রথম সূলতান সালাহউদ্দিন নাসির সিংহাসনে আরোহন করেন। অতঃপর তার ছেলে আজিজ, ভাই আফজাল বিন সালাহ উদ্দিন, সালেহ উদ্দিনের ভাই আমিল কবির, শাহজাদা কামিল, তারা একজনের পর অপরজন শাসন দন্ডের বাদডোর হাতে নিতে থাকেন। এরপর আদিল ছগীরকে খলিফা বানানো হয়। সুতরাং তাকে প্রেফতার করে অপসারণ করা হয়। অতঃপর পরিচালনা পরিষদের সদস্য সুলতান সালাহদ্দিন নাজমুদ্দিনকে সর্বশেষ খলিফা বানানো হয়।

তিনি আরো লিখেছেন যে, এ অবস্থা তুর্কী সাম্রাজ্যেও চলছিল। সর্ব প্রথম

তুর্কীদের অভিভাবক মায়াজ ইজুদ্দিন আইবেক ছালেহীকে বানানো হয়। তারপর শাহজাদা মানছুর মুজাফফর কত্বর, জাহির, বিব্রাস শাহজাদা ছাইদ মোহাম্মদ প্রমুখ একজনের পর অপরজন সিংহাসনে আরোহন করতে থাকেন। অতঃপর খলিফা সালমান বিন জাহির বাব্রাসকে নির্বাচিত করা হয়। সুতরাং তাকেও পদচ্যুত করা হয়। তার পরে বাদশাহ মানসুর কেলাদুন আলফীকে ক্ষমতার মসনদে বসানো হয়।

উবায়দী বংশ ঃ

ইমাম দামিরী (রহ.) বলেন যে, উবায়দী বংশ মিশরের রাজকীয় বিষয় সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন। এখন আমি তা বিস্তারিত আলোচনা করছি। সুতরাং উবায়দী গোত্রের প্রতিষ্টাতা হোসাইন ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল কোদাহ থেকে মুরু হয়। তিনি চোখের চিকিৎসা করতে ছিলেন এবং তার চোখের পানি ইবনে মাইমুন ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল ইবনে জাফর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে হোসাইন ইবনে আলী ইবনে আবু তালিব বের করতেন।

হোসাইন ইবনে মুহাম্মদ ইন্তেকালের পূর্বে ছালিমা নামক স্থানে চলে যান, কারণ তার দাদা আব্দুল কাদাহর ধন সম্পদ সেখানে ছিল। হঠাৎ করেতার উপস্থিতিতে নারী লোকের আলোচেনা হতে লাগল। লোকেরা তার সামনে কর্মকারের এক মেয়ে এনে সমালোচনা করতে লাগল। কারণ এই মেয়ে লোকটির স্বামী পূর্বেই মার দিয়েছিল এবং মেয়েটি ছিল অত্যন্ত সুন্দরী ।ইহুদীর ঐরশে মেয়ে লোকটির এক অতীব সুন্দর ছেলেও ছিল। হোসাইন মুহাম্মদ করতে থাকেন। ছেলেছিকে লেখা পড়া করাতে থাকেন। বালকটি লেখাপড়া করে একজন ব্যক্তিত্ববান পুরুষে পরিণত হয়ে গেল। হোসাইন ইবনে মুহাম্মদ বলতে লাগলো এ ই ছেলেটি আমার অতি বিশ্বস্ত এবং আমি তার সার্বিক তত্বাবধায়ক। এ ঘোষনা শুনে লোকেরা ছেলেটির সহিত সার্বক্ষণিক যোগাযোগ করতে লাগল। হোসাইন ইবনে মুহাম্মদের ঐরষে কোন ছেলে সন্তান ছিলনা- এই জন্য এই ইহুদী ছেলেটিকেই অভিভাবক নিযুক্ত করলেন। এছেলের নামই ওবায়দুল্লাহ মাহদী।

তিনিই সে লোক যিনি উবাইদী গোত্রে সর্ব প্রথম ক্ষমতার মালিক

হয়েছিলেন। লোকেরা উবাইদ নামের দিকে নিছবত করতে লাগল। সেই উসুলের দাওয়াত এবং রহস্য ভেদী বিদ্যায় পারদর্শীতা লাভ করে। সে প্রচারকগণকে আদেশ করলেন যেন, লোকেরা তাকে অনেক ধন দৌলত উপঢৌকন এবং ভোগ্য সামগ্রী দিয়ে পুরস্কৃত করে। সমবয়সীদের এবং প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা কর্মচারীদেরকেও আদেশ করলেন। হোসাইন ইবনে মুহাম্মদ বল্লেন যে এই ছেলে আমার খুব বিশ্বস্ত। এরপর ছেলেটিকে তার চাচাতো বোনের সহিত বিবাহ দেন। সুতরাং তখন থেকেই ছেলেটি উবাইদ নামের সহিত মাহদী যোগ করে নেয়। তার বংশ তালিকা নিম্নরূপ ওবায়দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে অলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুসা ইবনে জাফর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে হোসাইন (রা.) ইবনে আলী (রা.) ইবনে আবু তালিব।

কোন কোন বিদ্যান বলেন যে উবায়দুল্লাহ কাদাহ এর ছেলে হোসাইনের মৃত্যুর পর মাহদী সিংহাসনে আরোহন করেন। সুতরাং তার আরোহনের সংবাদ সমগ্র দেশে জানাজানি হওয়ার পর একের পর এক এলাকা জয়ের সংবাদ মানুষ শুনতে থাকে। মুক্তাফীর শাসনামলেই উবাদুল্লাহ মাহদীর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু যখন মুক্তাফীকে তলব করা হল তখন তিনি তার ছেলে আবুল কাশেম সেদিনও শিশুই ছিলেন। তার সাথে দুইজন গোলামও ছিল। আর তারা উভয়েই মারাকিশ যাওয়ার ইচ্ছা করেছিলেন। তারা যখন আফ্রিকা পৌছে গেলেন তখন মাল সামানা বিভিন্ন লোকের মাধ্যমে সেখানে নিয়ে যান।

এরপর তিনি ২৯৭ হিঃ রবিঃ ছানীর শেষে দশকে রিকাদা পৌছে নিজস্ব বাড়ীতে স্থায়ী ভাবে বসবাস করতে থাকেন এবং শুক্রবারে জুমার খুৎবা দেয়ার ব্যবস্থার জন্য আদেশ জারী করেন। সে সময় মাহদীকে আমীরুল মু'মিনীন উপাধিতে ভূষিত করা হয়। অতঃপর তিনি নিজেই শুক্রবাররে জনতাকে জোর পূর্বক দোয়া করতে বসে যান। অতঃপর তার নিজস্ব তামাদর্শের আহবান করেন। সে সময় যে ব্যক্তি তার মতাদর্শের প্রতি আনুগত্য দেখিয়েছে তার সহিত তিনি ভাল আচরণ করেন, আর যে ব্যক্তি তা প্রত্যাখ্যান করেছে তাকেই বন্দী করা হয়। উবায়দি গোত্রের শাসন ২৯৭ হিঃ থেকে আরম্ভ হয়। আর উবায়দুল্লাহ মাহদীকেই প্রথম খলিফা নির্বাচিত করা হয়। তার পরে তারই পুত্র কায়িম নায্যার, মুনসুরের ছেলে ইসমাইল, মোয়ায মা'দিয়ার ছেলে- একজনের রপ অন্যজন সিংহাসনে আরোহন করতে থাকেন। মায়ায মায়াদই উবায় দিদের

মধ্যে সর্বপ্রথম ব্যক্তি যিনি মিশরের বাদশাহ নির্বাছিত হন।

সম্ভবত ২৫৩ হিঃ ১৭ ই শাবান তারিখে হয়েছিল। অতঃপর ২০ শে শাবান তারিখে মিম্বরে আরোহন করে দোয়া করা হয়। সেদিনই মিশরে খুৎবাহ থেকে বনী আব্বাসের আলোচনা উঠিয়ে দেয়া হয়। আব্বাসীয়া খলিফা মুতিউল্লাহ আল ফজল ইবনে জাফর ছিলেন। সে দিনের ঘটনাগুলোর মধ্যে একটি বিশেষ ঘটনা হল, খলিফ মোয়ায ৩৬৩ হিঃ রামজান মাসে মঙ্গলবার দিন মিশরে প্রবেশ করেন।

এরপর খলিফা মোয়াযের পর আজিজের পুত্র মোয়ায সিংহাসনে আরোহন করেন। তার পর হাকিম আবুল আব্বাসের পুত্র আহমদ খলিফা নির্বাচিত হন। তিনি উবায়দী গোত্রের অনুপযুক্ত খলিফা ছিলেন। তাই তাকে হত্যা করা হয়। তিনি ৪১১ হিঃ ১৭ই শাওয়াল তারিখের সোমবার দিন বাইরে বের হয়ে নিয়মিতভাবে টহল দেয়া আরম্ভ করেন। অতঃপর তিনি হিলওয়ান শহরের পশ্চিম দিকে টহল দেয়া শুরু করেন। তার সহিত দুটি সওার ছিল। কিন্তু তিনি এদেরকে ফেরত পাঠিয়ে দেন। জনগণ ১৩ ই জিলক্বদ পর্যন্ত হাকিম আবুল আব্বাসের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে । তরি প্রত্যাবর্তনের কোন আলামত দেখা গেল না । তখন লোকেরা ঘর থেকে বের হয়ে তাকে খোঁজাখুজি করতে আরম্ভ করল। মহলের চারদিক পঁই পঁই করে তালাশ করা হল। জনগণ যখন পাহাড়ের দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ করল তখনদেখা গেল যে তার গাধাটি সেখানে দাড়িয়ে আছে। গাধাটির সম্মুখের পায়ে তলোয়ারের আঘাত মনে হচ্ছিল। জনগণ এই নিদর্শন অনুমান করে অগ্রসর হল। তারা একটি কূপের পাশে চলে এলা । এক ব্যক্তি কূপে অবতরণ করে দেখতে পেল যে, সেখানে কয়েকটি অংঙ্গ প্রত্যঙ্গ বাধা। এগুলো মধ্যে চাকুর আলামত পাওয়া গেল। তখন লোকেরা বুঝতে পারল তাকে হত্যা করা হয়েছে। তার পরে তার ছেলে জাহর আবুল হাসান আলী সিংহাসনে আরোহন করেন। তারপর সাহেবজাদা মুস্তানসির, মুস্তালী আমর, হাফিজ আঃ মজিদ ইবনে আবুল কাশেম, মুহাম্মদ বিন মুস্তানসির , জাফির প্রমুখ একজনের পর অপরজন সিং হাসনে আরোহন করেন। জাফির যেহেতু অনুপযুক্ত খলিফা ছিলেন সেহেতু তাকে হত্যা করা হয়। এদের পর মাত্র দুইজনের কাছেই খেলাফত থাকে। সাহেব জাদায়ে ফায়িজ, তারপর আযিদ গোত্রের রাজত্ব কাল শেষ হয়ে যায়। ৫৬৭ হিঃ পর্যন্ত তা ছিল। সর্বশেষ মুস্তাজি বিনুরিল্লাহ আবুল

হাসান বিন মস্তিানজিদ আব্বাসী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় ছিলেন।

উবায়দীদের ক্ষমতা সমাপ্তির পর মিশরে বাদশাহ ছায়ীদ শহীদ নাসির উদ্দিন ইউসুফ ইবনে আইয়ুবকে শাসক নিযুক্ত করা হয়। তারপরে বাদশাহ আজিজে উসমান, ভাই আফজাল বাদশাহ আদিল কবির, আবু বকর ইবনে আইয়ুব, বাদশাহ কমিল মোহাম্মদ প্রমুখ পরপর সিংহাসনে আরোহন করেন। অতঃপর বাদশাহ আদিল ছগীর অনুপযুক্ত খলিফা হওয়ায় তাকে অপসারণ করা হয়। তারপরে বাদশাহ ছালেহ বিন আইয়ুব বিন কামিল সিংহাসনে আরোহন করেন। তারপরে বাদশাহ মোয়াজ্জম তাওরান শাহ, ভাই আশরাফ, ইউসুফ বিন সাজারাতুদ্দার মোয়ায আইবেক সাহেব জাদা মনসুর আলী পর সিংহাসনে বসেন। অতঃপর নাবালেগ মুজাফফরকে সিংহাসনে বসানো হয়- কিন্তু তাকে হত্যা করা হয়।

এরপর জাহের, বিব্রস, সাইদ মুহাম্মদ বককত খা, ভাই আদিল সালামস, মানসুর কালাদুন , আশরাফ খলিলের ছেলে পরপর সিংহাসনে আরোহন করতে থাকেন। তারপর কাহের বায়দারকে স্বল্পকালীন খলিফ বানানো হলে তিনি মাত্র অর্ধদিন সিংহাসনে ছিলেন তারপর তাকে হত্যা করা হয়।

এরপর নাসির বিন মনসুরকে খলিফা নিযুক্ত করা হয়। তাকে অপসারণ করে আদিল কুতুবর্গাকে খলিফা বানানো হয়। কিন্তু তিনি সেচ্ছায় দুইবার অব্যাহতি নেন। তারপরে তার পিতার গোলাম সিংহাসনে আরোহন করেন। তারপরে আবার আদিল কুতুবর্গা মুনসুর াজিন মুজাফফর বিব্রাস, মনসুর আবু বকর বিন নাসির বিন মনসুর খলিফা নিযুক্ত হন। শেষ পর্যন্ত স্বল্পকালীন খলিফা ভাই আশরাফ কাজাক নিযুক্ত হন।

তারপরে ভাই নাসির আহমদ, লালেহ ইসমাইলের ভাই, কামিল শাবানের ভাই, মুজাফফর হাজী, বাদশাহ নসির হোসাইনের ভাই পরপর অলিফ হতে থাকেন। অতঃপর সুলতান সালেহকে ক্ষনস্থায়ী খলিফা বানানো হলে তাকে অপসারণ করে জেলখানায় আবদ্ধ করা হয়। তারপর প্রথম অপসারিত অলিফাকে রাষ্ট্রের কর্ণধার নিযুক্ত করা হয়। তিনিই নাসির হোসান। তারপর মনসুর আলী ইবনে ছালেহ, আশরাফ শাবান ইবনে হুসাইন। তাপর মনসুর আলী

ইবনে ছালেহ, আশরাফ শাবান ইবনে হুসাইন ইবনে নাসির, মনসুর আলী ইবনে আশরাফ শাবান ইবনে হুসাইন ইবনে নাসির, সালেহ এর ভাই হাজী ইবনে আশরাফ, জাহর বারকুক প্রমুখ পরপর সিংহাসনে আরোহন করতে থাকেন। অতঃপর দুই দুই বার হাজীকে অলী বানানো হয় এবং মনসুর উপাধিতে ভূষিত করা হয়। আবার ২য় বার বাককুককে বসানো হয়। তারপরে তার ছেলে নাসির ফরজকে, তারপর তাকে অপসারণ করে হত্যা করা হয়।

এর পর মুস্তাঈন বিল্লাহ আব্বাসী কে সিংহাসনে বসানো হয়। তার পরে সুলতান জাহির তাতারকে খলিফা নিযুক্ত করা হয়। তাঁর পরে সুলতান সালেহ এর পুত্রকে গদিতে বসানো হয়। অতঃপর তাকে পদচ্যুত করে মৃত্যুর দুয়ারে ঠেলে দেয়া হয়। তারপরে সুলতান আশরাফ কানসুহ কে সিংহাসনে বসানো হয়। তাপরে সুলতান আজিজ ইউসুফকে খলিফা বানানো হয়। কিন্তু তাকে পদচ্যুৎ করা হয়। তারপরে সুলতান জাহির হাকামবাক সিংহানে আরোহন করেন। তাঁর পরে সুলতান মানসুর উসমানকে খলিফা বানানো হয়। অহঃপর তাকে পদচ্যুৎ করা হয়।

এরপর সুলতান আশরাফ আনিয়ালকে খলিফা বানানো হয়। তাঁর পয়ে সুলতান মুয়াইদ এর পুত্র আহমদকে সিংহাসনে বসানো হয়। কিন্তু তাকে পদচ্যুৎ করা হয়। অতঃপর সুলতান জাহির খাসাকদমকে খলিফা বানানো হয়। অতঃপর সুলতান জাহির বাল বাঈকে খলিফা বানানো হয়। কিন্তু তাকে অপসারণ করা হয়। অতঃপর তার পরে সুলতান জাহির তামরীগাকে খলিফা নিযুক্ত করে তাকে অপসারণ করা হয়। তার পরে সুলতান জাহির খাইরাবাককে খলিফা নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু তাকে সে রাতেই অপসারণ করা হয়। তাঁর পরে সুলতান আশরাফ ফাইত বায়ীকে খলিফা নিযুক্ত করা হয়। অতঃপর সুলতান নাসির উদ্দিন মাহমুদের পুত্রেকে খলিফা নিযুক্ত করা হয় এবং তাকে হত্যা করা হয়।

অতঃপরে সুলতান নাসির উদ্দিনের মামা সুলতান জাহির কানছুহকে খলিফা নিযুক্ত করা হয় কিন্তু তাকেও পদচ্যুৎ করা হয়। গদীর মালিক বানানো হয় আশরাফ জাম্বিলাত কে। কিন্তু তাকেও পদচ্যুৎ করে হত্যা করা হয়। অতঃপর সুলতান আদিল তোফান বায়ীকে খলিফা নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু তাকেও হত্যা করে মৃত্যুর ঘাটে পাঠিয়ে দেয়া হয়। তার পরে সুলতান আশরাফ তাকাছোহ

গৌরীকে খলিফা নিযুক্ত করা হয়। তারপরে সুলতান ছালীম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে বায়জিদ ইবনে উসমান, সুলতান সুলাইমানের ছেলে, সুলতান সালিমের ছেলে সুলতান মুবাদের ছেলে প্রমুখ পরপর খলিফা নিযুক্ত হন। (আল্লাহ পাক তাদেরকে প্রভূত সাহায্য সহায়তা করেন এবং তাদের ক্ষমা করেন)। ইমাম দামিরী (রা.) বলেন আমি ইতিহাসে কয়েকটি পাতায় তা আলোচনা করেছি। যদিও তা দীর্ঘ হয়েছে কিন্তু উপকার থেকে খালী নয়। এখন আমি আলোচ্য বিষয়ের প্রতি ফিরে যাব।

বড়হাসের বৈশিষ্টসমূহ ঃ

হাঁস সাতার কাটতে পছন্দ করে। তার বাচ্চা ডিম থেকে বের হয়েই সাতার কাটতে থাকে। হংসী ডিমে তাদিতে থাকে তখন হংস একমূহুর্তের জন্যও অন্য কোথাও যায়না। শেষ পর্যন্ত পূর্ণ এক মাসপর ডিম থেকে বাচ্চাগুলো বের হয়ে আসে।

অপরাধির পরিচয় করা একটি নিয়ম ঃ

ইমাম দানইউরী (রহ.) 'মাজালিছায়' এবং ইবনে জাওযী আল "আজকিয়া" নামক কিতাবে লিখেছেন যে, মুহাম্মদ ইবনে কাব কিরফালী বর্ণনা করেছেন যে, একব্যক্তি হযরত সুলায়মান (আ.) এর কাছে এসে অভিযোগ দিল যে, হে আল্লাহর নবী আমার প্রতিবেশী আমার হাঁস চুরি করে নিয়ে যায়। এই কথা শুনোর পর হযরত সুলায়নাম (আ.) মানুষকে নামাজের প্রতি আহবান করলেন। অতঃপর নামাজের পর তিনি তার তার ভাষনে বলেন, তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা নিজেদের প্রতিবেশীর হাঁস চুরী করে। আবার মসজিদেও আসে সুতরাং এদের মাথায় এখনো হাঁসের পালক লেগে রয়েছে। ব্যাস এতটুকু তিনি বলতেনা বলতেই এক ব্যক্তি তার হাত মাথায় বুলাতে লাগল এমনি সুলায়মান বললেন তাকে গ্রেফতার কর সেই চুরী করেছে।

বড় হাসের শরয়ী বিধান ঃ

ছাহাবায়ে কেরামের ঐক্যমতে হাসের গোস্ত হালাল।

চিকিৎসা ক্ষেত্রে বড় হাসের উপকারিতা ঃ

ছোট বড় উভয় প্রকারের হাঁসের গোস্তই খাওয়া যায়। এগুলোর গোস্ত সাধারণত আর্দ্র হয়ে থাকে। হাকিম বাকরাতি লিখেছেন যে, হাঁস শহুরে পাখীদের

মধ্যে সবচেয়ে বেশী হয়ে থাকে। বড় হাঁসের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম একটি বিপরীত বিষয় হয়ে থাকে এজন্য তার গোস্ত শরীরকে মেদ বহুল করে। কিন্তুএর মধ্যে উৎকর্ষতা বিদ্যমান। একে যবাই করার সময় যদি এর কণ্ঠনালীতে সোহাগা ফুঁকা হয় তাহলে যাবতীয় ক্ষতি থেকে বাচা যায়। অন্যথায় তার গোস্ত সাধারণত শ্লেস্মা সৃষ্টি করে। তার গোস্ত নরম মেজারে লোকদেরকে বেশী রসালো করে। যদি এর গোস্তে যাইতুনের তৈল মিশ্রন করা যায় তাহলে এর দুর্গন্ধ দূর হয়ে যায়। গোস্ত রান্নার সময় গরম মসলা একটা বেশী মেশানো হলে গোস্তের দুর্গন্ধ ও পুরুত্ব দুর হয়ে যায়।অন্যথায় এর গোস্ত ক্ষতিকারক বলে বিবেচিত হয়। বড় হাসের গোস্ত দ্রুত হজম না হওয়ার কারণে তা পাকস্থলির অনুকুল নয়। গোস্তের প্রভাবের কারণে শরীরে জ্বর উঠে যায়। ইমাম কাযবিনী বলেন, যদি কেহ বড় হাঁসের অন্ডকোষ রান্না করে খায় এবং সহবাস করে তাহলে ই আল্লাহ স্থায়ীভাবে স্ত্রী গর্ভবতী হয়ে যাবে। হাঁসের পেটে যে পাথর হয় বা কারো পেট যদি বড় হয়ে যায় অথবা কারো মেদভূড়ি হলে সে পাথর বিষে পান করলে বেশ উপকার হয়।

এর তৈল টাক বা চুলপড়া রোগে ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যায়। বড় হাসেরর জিহবা নিয়মিত ভাবে খেলে বহু মুত্র রোগ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। হাসের গোস্ত উত্তম খাবারের মধ্যে গণ্য- তবে তা হজম হতে বেশ দেরী হয়। তার ডিম মধ্যম গরমের হে থাকে। কিন্তু তা গাঢ় রক্ত সৃষ্টি করে। তবে তা পিত্ত থাফিল বিশেষ উপকার করে । বিশেষ রোগের উপকার করে মাথার ঘূর্ণন, পেটের বায়ূ এবং শুল বেদনা রোগীর জন্য ক্ষতিকারক। তার ডিম ভেঙ্গে পুদিনা (সুগন্ধি শাক বিশেষ) এবং লবলে মিশ্রিত করে খেলে ক্ষয়কৃত অংশ পুরন হয়ে যায়। তার ডিম দুর্গন্ধময় রক্তের জন্ম দেয়। বিশেষ করে গরম মেজাজী লোকদের রুক্ষ করে।

হাস এবং উট পাখীর ডিমে প্রগাঢ় রক্ত তৈরী করে এবং দেরীতে হজম হয়। কোন ব্যক্তি যদি হাস অথবা উট পাখীর ডিম ব্যবহার করতে চায় তবে তা নিরেট পিতাম্বর ব্যবহার করতে হবে। স্মরণ রাখা দরকার যে, প্রতিটি ডিমের হলুদ অংশ সাদা অংশ থেকে অধিকতর মুলায়েম এবং সাদা অংশ হলুদ অংশ থেকে অধিকতর ভিজা হয়। কিন্তু ডিমের মধ্যে বেশী অংশই মোলায়েম হয় ডিমের সাদা অংশ স্বাভাবিক ভাবে এবং ডিমের মধ্যে খাদ্য হিসেবে হলুদ বর্ণ বেশী অংশ হয়ে থাকে। খুব কম মুরগীই আছে যা মোরগীই আছে যা মোরগ

ছাড়া ডিম দেয়। তবে এমন মুরগীর ডিমে বাচ্চা হয়না। মোরগ ছাড়া যে ডিম হয় এ ধরনের ডিমকে মেটে ডিম বলে।

চান্দ্র মাসের ১৪ তারিখের রাতে যখন চন্দ্র কমতে আরম্ভ করে তখন সে ডিম পাড়া বন্ধ করে দেয়। কারণ ডিম কমার দিন থেকে শুরু করে চন্দ্র বৃদ্ধির দিন পর্যন্ত পূর্ণ আর্দ্র হয়ে যায়। অর্থাৎ মুরগীটি তখন দুর্বল থাকে। এরপর তারমধ্যে ডিম জন্ম দেয়ার গোগ্যতা সৃষ্টি হয়না।

الالفة

(৩৯) বাঘিনী

الـفة বলা হয় ডাইনি বা ভূতকে। তবে কোন অভিধানবিদ বলেছেন এর অর্থ বাঘিনী। এর কিছু ব্যাখ্যা باب السين এবং باب الذال এ আসবে।

الالق

(৪০) নেকড়ে বাঘ

নেকড়ে বাঘ কে الـق বলা হয়। মাদী নেকড়েকে الـقة বলা হয়। এর বহুবচন الالقة আসে। আবার কোন কোন সময় বানরকেও الـقة বলে। এই সম্পর্কের জন্যই বানরের জন্য الـق ব্যবহার করা যায়। কিন্তু এরকম করা উচিত হবেনা যেহেতু বানরের জন্য পৃথক শব্দ রয়েছে যেমন قرد এবং رباح ইত্যাদি।

الاودع

(৪১) জংগলী ইঁদুর

ইমাম জাওহারী বলেন, এ প্রকারের ইঁদুরকে ইয়ার বু' বলে। এগুলো ইদুরের মতই এক ধরনের প্রাণী। যাদের আঙ্গুলের গিড়া ছোট হয় এবং তার পাছা হয় বড়। এদের লেজ হয় লম্বা আর এর বহুবচন يرابيع হয়। (বিস্তারিত باب الياء তে দেখুন)।

الاورق

(৪২) মেটে রং এর উট

ইমাম জাওহারী (রহ.) এর কথা হল একধরনের উটকে اورق বলা হয় যা সাদার মধ্যে কাল রঙ্গের হয়। অন্যাঅন্য উটের চেয়ে এর গোস্ত সুস্বাদু। কিন্তু আরবীরা ভ্রমনের জন্য এ ধরনের উটকে ভাল মনে করে না।

الاوس

(৪৩) বাঘ

বাঘের অর্থেও اوس শব্দটির ব্যবহৃত হয়। কোন কোন সময় মানুষকেও اوس বলে। আবার শব্দটি تصغير (ক্ষুদ্রতা বাচক বিশেষ্য) হিসেবে اويس বাঘের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। যেমন لجين ও كميت ইত্যাদি সুতরাং কবি আল হাজ্‌লী বলেন -

يالیت شعری عنك ولا مراهم :: مافعل الیوم اویس بالغنم

"আমি যদি তোমার সাথে মিলিত হতাম তবে ঘটনা এখনও নিস্পত্তি হয়ে যেত, যেমন বাঘ বাকরীর সাথে আচরণ করে থাকে।"

এমনিভাবে আরেক কবি বলেন ঃ

كما خامرت فی حضنها ام عامر:: لذی الحبل حتی عال اوس عیالها

"বাজ পাখী যেমন শিকারীর কাছে নেকড়ে থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে এমনিভাবে নেকড়ে তার বাচ্চাকেও পুর্ণাঙ্গ নিরাপদে রাখে।"

জাওহারী বলেন, কবি لذی الحبل থেকে শিকারী অর্থ নিয়ে এই বলতে চেয়েছেন যে, শিকারী যে রশিকে বাজপাখী বা মেষের কুঁচে ফাঁস দেয়। (এরকিছু সবিস্তারে العبساء এর অধীনে বর্ণনা করা হবে)

হাদীসে শরীফে اوس ـ اویس উল্লেখ ঃ

হামজাহ বিন আসাদ আল হারছী বলেন,

خرج رسول الله ﷺ فی جنازه رجل من الانصار الی بقیع الفرقد فاذاذئب مفترش ذراعیه فقال رسول الله ﷺ هذا اویس فافر ضواله لقم یفعلوا (رواه ابو نعیم)

একদা নবী করিম (স.) জনৈক আনসারীর জানায়ায় গিয়ে বাকিউল ফারকাদ নামক স্থান পর্যন্ত গমন করেন। নবী (স.) দেখতে পেলেন একটি নেকড়ে তার উভয় হাত প্রসারিত করে বসে আছে। নবী করিম (স.) এরশাদ ফরমান এই প্রানীটিকে اویس বলে। তাকে কিছু দিয়ে দাও। কিন্তু তারা তা করলনা। (নবী করিম (স.) এর দরবারে নেকড়ের উপস্থিতি সম্পর্কে باب الذال এর আলোচনা হবে ইনশাল্লাহ)

ওয়েস করণী (রহ.)ঃ

اويس ইবিনে আমের আল কুরনীর নামও ছিল। তিনি নবী করিম (স.) এর যুগ পেয়েছিলেন। কিন্তু হুযূর (স.)এর পবিত্র দর্শন থেকে বঞ্চিত থাকেন। তিনি কূফার অধিবাসী। তাকে তাবেয়ীনদের মধ্যে গণ্য করা হয়। হযরত ওমর (রা.) বলেন -

ان رسول الله ﷺ قال خير التابعين رجل يقال له اويس القرنى يائتى عليكم فى امداد اهل اليمين لو اقسم على الله لا بره فان استطعت ان يستغفرلك فافعل (رواه امام مسلم)

"নবী করিম (স.) এরশাদ ফরমান তাবেয়ীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ট সে ব্যক্তি যার নাম হবে ওয়েছ করনী। সে তোমাদের কাছে সাহায্যের জন্য ইয়ামনী লোকদের সহিত আগমন করবে। যদি সে কোন কথায় শপথ করে তাহলে আল্লাহ তায়ালা তা সত্বর পূর্ণ করে দিবেন। যদি তুমি তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর তাহলে সেও করবে।" (মুসলিম)

হযরত ওয়েশ করনী (রহ.) একদা হযরত ওমরের (রা.) দরবারে আগমন করেন। তখন তিনি আল্লাহ তায়ালার কাছে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা আবেদন করেন। তিনি হযরত ওমর (রা.) এর জন্য ক্ষমা প্রাথনা করেন। হযরত ওয়েশ করনী (রহ.) ছিফ্ফীন যুদ্ধে হযরত আলী (রা.) পক্ষে যুদ্ধে করে শাহাদাত বরণ করেন। হযরত বসরী (রহ.) বলেন-

قال رسول الله ﷺ يدخل الجنة بشفاعة رجل من امتى اكثر من ربيعة ومضر. (رواد الامام احمد)

"হযরত নবী করিম (স.) এরশাদ ফরমান, আমার উম্মতের এক ব্যক্তির সুপারিশে এত লোক বেহেস্তে প্রবেশ করবে যার পরিমান রবিয়া ও মুজার গোত্রের লোকের সমপরিমান হবে।"

হাসান বসরী (রহ.) বলেন, আমার মনে হয় সে ব্যক্তি ওয়েশ করনী হবে। আর 'করণ' উদ্দেশ্য একটি গোত্র। এ ক্ষেত্রে ইমাম জাওহারী (রহ.) এর সামান্য ত্রুটিও হয়। যা প্রসিদ্ধ হওয়ার কারণে আলোচনা করার দরকার নেই। আবু উমামা বলেন -

قال رسول الله ﷺ يدخل الجنة بشفاعة رجل من امتى مثل

الحيين ربيعة ومضر قيل يارسول الله وما ربيعة من مضر قال ﷺ انما اقول ما اقول ـ (رواه ابن السمك)

"নবী করিম (স.) এরশাদ ফরমান আমার উম্মতের এক লোকের সুপারিশে রবিয়া ও মুজার গোত্রের লোকের সমপরিমান লোক বেহেস্তে প্রবেশ করবে। কেহ জিজ্ঞেস করলে হে আল্লাহর রাছুল (স.) রবিয়া গোত্র মুজার গোত্রের সহিত কি যোগ সূত্র রয়েছে? তখন নবী করিম (স.) এরশাদ ফরমান ব্যাস! আমি যা বলি তা আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা ওহীর ভিত্তিতেই বলি।

ইবনুচ্ছামাক বলেন "আমার উম্মতের একব্যক্তির" দ্বারা উদ্দেশ্য হল হযরত ওসমান (রা.)। কাজী আয়াজ (রহ.) বলেন হযরত কাব (রা.) বলেন -

لكل رجل من الصحابة شفاعة

প্রত্যেক সাহাবীই নবী করিম (স.) এর সুপারিশ এ দাবী রাখেন। ইয়াজিদ বিন জাবির (রা.) বলেন-

ان رسول الله ﷺ قال يكون فى امتى رجل يقال له لمة ابن اشيم يدخل الجنة بضفاعة كذاوكذا

"নবী করিম (স.) এরশাদ ফরমান আমার উম্মেতের ছেলাহ ইবনে আশিম নামক এক লোক জন্ম গ্রহণ করবে। যার শাফা'তে অনেক অনেক বেহেস্তে প্রবেশ করবে।" (ইবনে মোবারক)

الايلس

(৪৪) বড় মাছ

ইমাম কাযভিনী বলেন, الايلس একটি প্রকার বড় মাছ। এ ধরনের মাছ ব্যতীত সাগরের সব ধরনের প্রাণীই শিকার করা হয়ে থাকে। মাছটির বৈশিষ্ট হল, মাছটিকে ভুনা করে যদি দু'লোক একত্রে খেতে বসে তাহলে পরস্পরে বৈরীতার অবসান হয়ে বন্ধুত্বের সৃষ্টি হয়।

الايم والاين

(৪৫) সাপ

الايم والاين সাপকে বলা হয়। আযরাকী বলেন الايم নর সাপ কে বলে। তালক্ব ইবনে হাবিব বলেন যে, আমরা একবার আব্দুল্লাহ ইবনে আমর

ইবনে আসএর সহিত একটি কামরায় বসছিলাম। হঠাৎ আমরা দেখতে পেলাম যে একজন চিত্রল রঙ্গের নাদুস নাদুস লোক বাবে বনি সাইবা থেকে বের হল। লোকেরা তাকে দেখে হকচকিয়ে গেল। এ সময় সে লোক কাবা ঘরের চতুস্পার্শে ৭টি তওয়াফ করল। লোকটি মাকামে ইব্রাহীমে গিয়ে দুরাকাত নামাজ আদায় করল। আমরা তখন তার নিকট গিয়ে বল্লাম যে, হে ওমরাহকারী, আল্লাহ্ পাক তোমার ইবাদত কবুল করুন। দেখো আমাদের কাছে নির্বোধ এবং ছোট ছোট বাচ্চারা রয়েছে। আমাদের মিনতি রইল যে, তুমি এদেরকে ভয় দেখাবেনা। এজন্য তুমি এদের থেকে পৃথক থাকবে। দেখা গেল এ কথা বলতেই লোকটি অদৃশ্য হয় গেল। তাপর লোকটিকে আর দেখা গেলনা। বর্ণিত আছে যে,

انه امر بقتل الايم (الحديث)

"নবী করিম (স.) আইম নামক সাপকে হত্যা করতে আদেশ করেছেন।

ইবনুচ্ছাকিত বলেন যে, মূলত শব্দটি ايـم ছিল। পরে তাকে হালকা করা হয়েছে। যেমন لـيـن- ولـيـن- وهـيـن শব্দটি বহুবচন الـوم হয়ে থাকে। (বাকী আলোচনা সবিস্তারে كعيب এর স্থলে আসবে)

الايّل

(৪৬) বারো শিংগা

الايـل বারো শিংগাকে বলা হয়। এর কয়েকটি অর্থ রয়েছে কারো মতে الايـل ফার্সীতে বলা হয় كـوزن অর্থ পাহড়ী ছাগল। তাকে জংলী গাভীল মত দেখা যায়। প্রাণীটি এতই দুঃসাহসী হয় যে, যদি সে কনো শীকারীকে ভয় দেখাতে চায় তাহলে সে পাহাড়ের চুড়ায় পর্যন্ত আক্রমন করে। একারণে তার কোন আঘাত লাগেনা। তার শিং এ যতটি গিরা থাকে তত বৎসর বয়স হয়। প্রাণীটিকে যখন কোন সাপে কামড় য়ে তখন সে পোকামাকড় খাওয়ার কারণে তার আর কোন ক্ষতি হয়না। বারো শিংগার বৈশিষ্ট হল সে মাছের সহিত সখ্যাতা রাখে। সুতরাং সে মাছ দেখার জন্য কোন কোন সময় সাগর পাড়ে চলে যায়। মাছও তাকে দেখে ডাঙ্গার কাছাকাছি চলে আসে। মৎস শিকারী এর অভ্যাস ভাল করেই জানে। যখনই কোন জেলে মাছ শিকার করতে ইচ্ছা করে তখনই বারো শিংগার চামড়া গায়ে জড়িয়ে মৎস শীকার করতে ইচ্ছা করে তখনই বারো শিংগার চামড়া গায়ে জড়িয়ে মৎস শীকার করে নেয়।

বারো সিংগা সাপ খেতে অভ্যস্ত। সুতরাং যেখানেই সে সর্প পায় তখন সে তাকে খাবারের বস্তু বানিয়ে নেয়।

অনেক সময় এমনও হয় যে, সর্প যখন তাকে কামড় দেয় তখন তার চোখ থেকে দুটি ছোট রোপার টুকরা পরিমান রক্ত বের হয়। যে কারণে তার চোখে আঙ্গল পরিমান গর্তের সৃষ্টি হয়। যেখানে অনায়াসে দুটি আঙ্গুল প্রবেশ করে। এ রক্ত ভূমিতে পড়ে গিয়ে শুকিয়ে যাবার পর মোমের মত হয়ে যায়। মানুষ তার রক্তে সাপের বিষ থেকে বাচার জন্য বিষের প্রতিশেধক তৈরী করে এবং এ প্রতিশেধক কে "বিষের প্রতিক্রিয়া বিনষ্টকারী পাথর" বিশেষ বলে। হলুদ রঙ্গের প্রতিশেধক সবচেয়ে উত্তম। এ ধরনের বারো শিংগা বিশির ভাগ পাওয়া যায় ভারতের সিন্ধু প্রদেশে এবং প্যারিসে। যখন এই বিশেষ ধরনের প্রতিশেধক সাপ অথবা বিচ্ছু ধ্বংশিত স্থানে লাগানো হয় তখন আশাতীত উপকার পাওয়া যায়। এমনিভাবে কেহ যদি বিষ পান করে ফেলে তাহলে তৎক্ষনাত এই প্রতিশোধক খেলে বিশেষ উপকার হয়। বিষের মারাত্মক প্রতিক্রিয়াকে নস্যাৎ করার জন্য আল্লাহ তায়ালা এই প্রতিশেধকে অতি আশ্চর্য ধরনের বৈশিষ্ট দান করেছেন।

এদের শিং বের হওয়ার সময়ঃ

বার শিংগা দু'বছরে পদার্পন করলে তার শিং গজাতে থাকে। তার শিং অবিকল পেরেকের মত বের হতে। তৃতীয় বছর শিং এ শাখা প্রশাখা গজায়। এমনিভাবে ৬ বছর পর্যন্ত শাখা-প্রশাখা গজাতে থাকে। একদিন তার এই শিংকে দেখা যায় যে, যেন একটি ঘনবৃক্ষ। প্রাণীটির মধ্যে আরো তার মধ্যে এমনও একটি বৈশিষ্ট পরিলক্ষিত হয় যে, সে তার শিং ও শাখা-প্রশাখা নিয়ে চলার সময় প্রতি বছরই তার দুই শিংও পড়ে যেতে থাকে। আবার সেটা গজিয়ে উঠে। তা শক্ত হওয়ার জন্য সূর্য তাপে স্বল্প সময়ের জন্য তাপ গ্রহণ করে।

এরিষ্টটলের দর্শন ঃ

দর্শন শাস্ত্রের পন্ডিত এরিষ্টটল বলেন এধরনের বারো শিংগাকে, কৌশল এবং ছলচাতুর্যতার আশ্রয় নিয়ে শিকার করা হয়। কারণ হল যখন সে বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ শ্রবন করে তখন তার ঘুম আসেনা। শিকারী সে বাদ্য যন্ত্র দ্বারা তাকে এমন বেহুশ করে দেয় তখন তার আর কোন জ্ঞান থাকেনা। উভয় কান শ্রবনে নিজীব দেখে পেছন থেকে তাকে ধরে ফেলা হয় তার পুরুষাঙ্গটি গোস্ত ও হাড্ডি

ব্যতীত একটি তক্তার মত হয়। তার শিং একদম পরিপূর্ণ থাকে। প্রাণীটি অতিভীরু হয়ে থাকে। কিন্তু দেখতে সে বীরের মত মনে হয়। সে পাপকে মজা করে খায় এবং লেজ থেকে খাওয়া আরম্ভ করে। প্রতি বছরই তার শিং এ ডাল পালা মেলে। মনে হয় আল্লাহ তায়ালার বিশেষ মহিমায় তার শিং এ ডাল পালা হয়। এজন্য আল্লাহ তায়ালা তার শিং এ অত্যাশ্চর্য ধরনের উপকার নিহীত রেখেছেন।

লোকেরা তার শিং এর মাধ্যমে ক্ষতিকারক প্রাণীকে তাড়িয়ে থাকে। তার শিং এ অতি সহজে সন্তান প্রসব হয়। গর্ভবর্তী মহিলারা এর থেকে বিশেষ উপকার অর্জন করে। তার সামান্য শিং যদি কেহ পুরে মধুর সহিত মিশ্রিত করে চেটে খায় তাহলে পেটের কীট বের হয়ে যায়।

ইমাম দামিরী বলেন, প্রণিটি বেশ মোটা তাজা হয়। যদি তার ভেংগে যাওয়ার কোন সুযোগ হয় তাহলে শিকারীর হাত থেকে বেচে বের হয়ে যায়।

ফায়দা ঃ

যুজাজী বলেন, ইমামুলল্গাত ইবনে দুরাইদ (রহ.) এর নিকট কবিতার উদ্দেশ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল-

هجرتك لا قلى منى ولكن :: رأيت بقاء ودك فى الصدور

"আমি তোমাকে ছেড়ে দিয়েছি কিন্তু কোন এক হিংসার কারণে ছাড়ি নাই। কারণ হল আমার নিকট তোমার দোস্তী উপত্যাকার কিনারায় বসবাসরত বারো সিংগার ন্যয়। "

جهجر الحائما ت الوددلما :: رأيت ان المنية فى الورود

"পানির ঘাটের চার দিকে পানি থাকার পরও যেমনি ভাবে পিপাসা থাকে অতচ পান করেনা, কারণ সে জানে মৃত্যু ঘাটেই দন্ডয়মান।"

تغيظ نفوسها ظمأ وتخشى:: حماما فهى تنظر من بعيد

"পিপাসার কারনে ছটপট করছে অথচ মৃত্যুকে এমন ভাবে ভয় করছে যে, (পিপাসা থাকার পরও) মৃত্যু থেকে বাচতে সুযোগের অপেক্ষায় রয়েছে।"

تصدبوجه ذى البغضاء عنه::وترمقه بالحاظ الودود

"মৃত্যু দুশমনের মত ফিরে থাকছে আর প্রিয়তমের ন্যায় গভীর দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষন করছে।"

ইমাম যুজাজী (রহ.) বলেন যে আলহায়েম তাকে বলেন যে, যে ব্যক্তি পানির আশেপাশে বসবাস করে অথচ পানির ধারে কাছেও যায়না এবং এ কবিতার, অর্থ এভাবে বুঝে আসছে যে, বারো শিংগা সাফ খেতে অভ্যস্ত। যখন তার মধ্যে গরম বৃদ্ধি পায় তখন সে প্রচন্ড আক্রোশে জ্বলে উঠে। এ অবস্থায় সে পানি অন্বেষণ করতে থাকে। পানি পেলেও সে পান করেনা বরং সে পানির মধ্যে বার বার শ্বাস গ্রহণ করতে থাকে। কারণ এই অবস্থায় সে পানি পান করতে পানি এবং বিষ পেটের মধ্যে একত্র হয়ে দিয়ে তার মৃত্যুর সম্ভাবনা প্রবল করে তুলে । এই কারণে সে বেশ কয়েক দিন পানি পান করেনা। যখন বিষের প্রভাব শেষ হয়ে যায় তখন সে পানি পান করে । এই অবস্থায় পানি কোন ক্ষতি করেনা। সুতরাং কবি বলতে চাচ্ছেন যে, আমি তোমাদের কঠোরতার উপসমের অপেক্ষা করছি। কারণ আমি বিরহের জিন্দেগী কাটাচ্ছি। যেমনি ভাবে বারো শিংগা পানির চারিদিকে চক্কর দেয় অথচ মৃত্যুর ভয়ে পানি পান করে না।

ইমাম যুজাযীঃ

তাঁর নাম আব্দুর রহমান ইবনে ইসহাক উপাধি আবুল কাসেম। তিনি নাহু শাস্ত্রের একজন প্রখ্যাত পন্ডিত ছিলেন। দীর্ঘদিন পর্যন্ত আবু ইছহাক (রহ.) এর খেদমতে থেকে তিনি অনেক উপকৃত হন। এজন্য যুজাজী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তার রচিত কিতাবের নাম "কিতাবুল জুমাল"। উদাহরণের জন্য দীর্ঘ বর্ণনা রয়েছে। কিতাবটির বৈশিষ্ট হল যে কেহ এই কিতাব পাঠ করে সে অত্যন্ত লাভবান হয়। কারণ হল তিনি মক্কা শরীফে বসে কিতাবখান লিখেছেন। যখনই তিনি একটি অধ্যায় লিখে অবসর নিতেন তখন এক সপ্তাহ পর্যন্ত তওয়াফ করতেন। কিতাব পড়ুয়াদের জন্য তিনি দোয়া করতেন । যে যারা কিতাব পাঠ করে তাদেরকে যেন আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে উপকৃত করেন এবং লেখককে ক্ষমা করেন। তার কিতাবের নমুনা নিম্নরূপ-

ماحرم الله شيئاً الاواحل بازائه خيرا منه حرم الميتة واباح المذكى وحرم الخمر واباح النبيذ وحرم اسفاح واباح انكاح وحرم الربوا واباح البيع

"আল্লাহ তায়ালা যদি কোন বস্তু হারাম করেন তাহলে তার পরিবর্তে সত্বর আরেকটি বস্তু হালাল করে দেন। যেমন মৃত প্রাণী হারাম তার পরিবর্তে জবেহকৃত প্রাণী হালাল করেছেন। মদ হারাম করেছেন তার পরিবর্তে খেজুরের

তাজা নির্জাস হালাল করেছেন। ব্যভিচার হারাম করেছেন- তার পরিবর্তে বিবাহ হালাল করেছেন। সুদ হারাম করেছেন কিন্তু বেচাকেনা হলাল করেছেন।

ইমাম যুজাযী ৩৩৯ বা ৩৩৭ খৃঃ দামেস্কে ইন্তেকাল করেন। কেহ বলেছেন ত্বিবরিয়াতে ইন্তেকাল করেন। আবু মনসুর মাওহোব আল জাওয়ালিকি আল্ লুগভী কতইনা উত্তম কবিতা বলেছেন।"

وردالورى سلسال جودك فارتوواء : وقفت حول الورد وقفه حائم

"সৃষ্টি তোমার দান প্রতিদানের ঘাটে এসে তৃপ্তি লাভ করেছে এবং ঘাটের চতুস্পার্শে ব্যাকুল হয়ে পিপাসার্তের দাড়িয়ে গেল।"

حيران طلب غفلة من وارد:: والورد اليزادد غير تزاحم

"আমি পেরেশান হয়ে আগত অমনোযোগীদের অগ্র পথিক হয়ে থাকলাম এবং ঘাটে প্রচন্ড ভিড়ের কারণে চলে যাচ্ছিল।"

ইমাম আল জাওয়ালিকী ঃ

ইমাম আল জাওয়ালিকী বিভিন্ন সাহিত্যের মহান পন্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি যখন প্রথম বার খলিফার দরবারে আগমন করেন তখন তিনি বলেছিলেন-

السلام على امير المؤمنين ورحمة الله وبركاته

তখন চিকিৎসক হাবতাল্লাহ বিন ছায়ীদ বিন তিলমিজ নাছরানী বলেন আমিরুল মু'মিনীনকে কি এভাবে সালাম করে? জাওয়ালিকী তার কথার প্রতি তেমন মনোযোগ দেননি। তিনি সোজা খলিফাকে বললেন, আমি সবসময় সুন্নতে নববী অনুযায়ী সালামকারি এবং তা আপনার জন্য অতি উত্তম মনে করি। জাওয়ালিকী এও বলেছেন হে আমিরুল মু'মিনীন যদি কেউ এই শপথ করে যে, ইহুদী নাসারাদের ইলম তাদের অন্তরের গভীরতায় নেই তাহলে সে শপথ ভঙ্গকারী হবেনা হানেছ হবে না। সে সত্য বাস্তবার উপর শপথ করেছে। কারণ আল্লাহ পা তাদের অন্তর মোহরাঙ্কিত করে দিয়েছেন। তবে যাদের ঈমান ও ইসলামের দৌলত অর্জিত হয় তাদের নয়।

একথা শুনে খলিফা বললেন আপনিতো অনেক কথা বলেছেন এবং একদম সত্য কথাটিই বলেছেন। সুতরাং ইবনুত্তিলমিয চিন্তিত হয়ে গেল। তার মুখে কোন উত্তর এলোনা। অথচ তিনি ছিলেন একজন উচুমানের আলেম। জাওয়ালিকী ৪৩৯ খৃঃ বাগদাদে ইন্তেকাল করেছেন।

বারো শিংগার শরয়ী বিধান ঃ

বারো শিংগা হালাল প্রাণীর মধ্যে গণ্য। সুতরাং তা খাওয়া হালাল- যেমন পাহাড়ী ছাগল হালাল। কিন্তু ইমাম সাফেয়ী বাবুল আতয়িমা তে তার আলোচনা করেননি। অথচ তিনি বাবুর বিরাতে আলোচনা করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ তিনি তাও বলেছেন যে, হরিণের গোস্ত হল রোগ প্রতিশেধক বারো শিংগার ব্যাপারে শেখ আবু মোহাম্মদ মন্তব্য স্পষ্ট নয় এতে বুঝা যায় যে, এই মাছওয়ালার ব্যাপারে ভিন্ন মত রয়েছে। অতঃপর অগ্রে গিয়ে তা বুঝা যায় যে, শেষ পর্যন্ত তারা এ মীমাংসায় উপনীত হয়েছেন যে, হরিনের মাছয়ালা বারো শিংগার মাছয়ালার মতই । যেমন- ভেড়া, ছাগলের ন্যায় বৈধতার হুকুম দেয়া হয়। তবে একটির বদলে অপরটি খরিদ করা যাবেনা। ইমাম মুতাওল্লী কোন একটি প্রাধান্য দিয়ে মাছয়ালায় এমনটি বর্জনের আলোচনা করেছেন।

চিকিৎসা ক্ষেত্রে এর উপকারিতা ঃ

যে কোন জায়গায় এর শিং পুড়ে ধোপ দেয়া হলে সমস্ত পোকা মাকড়সহ ক্ষতিকারক প্রানী দুর হয়ে যাবে। এমনিভাবে কেহ তার শিং পুরে দাতে লাগায় তাহলে দাতের হলদে রং দূর হয়ে গর্ত ভরে যাবে এবং মাড়ি শক্ত হবে। কেহ যদি এর শিং এর কোন অংশ গলায় বেধে রাখে - তাহলে তা গলায় থাকা পর্যন্ত তার ঘুম আসবেনা। বারো শিংগার শরীরের কোন অংগ পাটায় পিষে পানি দ্বারা পান করলে বীর্যের আধিক্য বৃদ্ধি পায়। মানুষের শরীরে এর ব্যবহার বিশৃংখলায় সৃষ্টি করে। এর রক্ত পান করায়। কিডনীর পাথর টুকরা টুকরা হয়ে বের হয়ে যায়।

ابن اوىٰ
(৪৭) বাগডাস

বাগডাসাকে ابن اوىٰ বলা হয়। এর বহুবচন بنات اوىٰ এমনিভাবে اعرس، بنات مخاض ابن البون، ابن المخاض، ابن عرس এর বহু বচন غير منصرف হল بنات اوىٰ ، بنات لبون بنات সুতরাং কবি বলেন,

ان ابن اوى لشديد المقتنص:: وهو اذاما صيد ريح فى قفص

"নিশ্চয় বাগডাসা অভিজ্ঞ শিকারী। কিন্তু যখন তাকে ধরে বন্দি করা হয় তখন সে পিঞ্জরায় ঘুরে বেড়ায়।

বাগডাসার কতিপয় উপনাম হল আবু আইয়ুব, আবু যুয়াইব, আবু কাব, আব ওয়াইল (কেহ কেহ আবু জাহরাও লিখেছেন) তার নাম আবু আওয়া এজন্য রেখেছেন যে, সে তার স্বজাতীয় সবার সহিত মিলেমিশে থাকে। বিশেষ করে রাথে সে চিৎকার করতে থাকে। তাও সে যখন একাকিত্ব থাকে তখন এরকম করে। তার আওয়াজ শিশুদের আওয়াজের মত হয়। বাগডাসার পায়ের থাবার নখ বড় বড়। সে অন্যের উপর প্রচন্ড আক্রমন করে। পশু পাখী ধৃত করে খেয়ে থাকে। মোরগ মুরগী শৃগালের চেয়েও বেশী বাগডাসাকে ভয় পায়। যে গাছের উপর মুরগী বসা সে গাছের নিচ দিয়ে বাগডাসা অতিক্রম করলে ভয়ের চোটে সে মাটিতে পড়ে যায়। মুরগী ঝাকে ঝাকে হলেও তাতে কিছু আসে যায় না।

বাগড়াসের শরয়ী বিধান ঃ

বিশুদ্ধ মত হল বাগডাসার গোস্ত হারাম। কারণ সে তার চোখা দাঁত দ্বারা আক্রমন করে। কারো যদি প্রশ্ন জাগে যে বাগডাসার চোখা দাঁত সাধারণ দুর্বল হয়। তবু তার হুকুম হবে বাজপাখীর হুকুমের মতই। অথবা শৃগালের হুকুমের মত। তাহলে দস্তুরমত একটি মাজহাবেরই জন্ম হয়ে যাবে। মোট কথা আমাদের (শফেয়ীদের) নিকট উভয় ছুরতই আছে। এজন্য প্রকৃত কথা হল الحاوى الصغير، الشرح، المنهاج جوالمحرر ইত্যাদি। কিতাবে আছে-যে তা একদম হারাম। কিন্তু শাইখ আবু হামিদের নিকট তা হালাল। ইমাম আহমদ (রহ.)এর নিকট এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন- যে কোন প্রাণী তার চোখা দাত দ্বারা চর্বন করে তাই হিংস্র প্রাণীর অর্ন্তভূক্ত। ইমাম আযম আবু ইউসুফ ও মোহাম্মদ (রহ.) প্রমুখ মনিষীদের নিকট তা নিষিদ্ধ।

চিকিৎসাক্ষেত্রে বাগডাসের উপকারিতা ঃ

বাগড়াসের জিহবা কারো ঘরে রাখা হলে ঐ ঘরে সব সময় ঝগড়া লেগে থাকবে। তার গোস্ত পাগল, মৃগী রোগীর জন্য বিশেষ উপকার দর্শে। তার ডান দিকের চোখ যদি নজর লাগা বস্তুতে টানিয়ে দেয়া হয় তাহলে বদনজর থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। অধিকন্ত বদনজরকারী তার উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে পারেনা। যদি কেহ তার কলিজা গলায় বেধে রাখে তাহরে আল্লাহর রহমতে সমস্ত হিংস্র প্রাণী থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।

باب الباء

البابوس

(৪৮) মানব শিশু

البـــابـوس মানুষের ছোট ছোট সন্তানকে বলা হয়। এমনকি সব সন্তুর ছোট বাচ্চাকেও بابوس বলে। কবি ইবনে আহমার বলেন-

حنت قلوسى الى بابوس طربا :: وماحنينك بل ماانت والذكر

"মৌমাছি তার ডিম এবং বাচ্চা দেখে আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে গুণগুণ করতে থাকে। ওহে মধু পোকা, তোমার এই গুণ গুণ শব্দ বরং তোমার প্রতিটি আওয়াজ এবং বহ্নি মনের দিকে কোনই গুরুত্ব নেই।

البازىّ

(৪৯) বাজ পাখী

ইবনে সাইদা লিখেছেন যে, البـازى ছাড়া বাজ এবং بـازىَ ও বলা হয় بـازى সাধারণত পুরুষ বাজের বেলায় ব্যবহৃত হয়। تثنية বা দ্বিবচনের জন্য بـازيان এবং বহু বচনের জন্য بـزاة বলা হয়। যেমন- فضاة.وقاضيان شـاهين এবং بـازى শব্দটি بـزوان থেকে বের হয়েছে। নৃত্য করা, লাফ দেয়া অর্থেও পাওয়া যায়। ابو البهلول . ابـوالاشـعث . ابو لاحق এ পাখিটি সমস্ত পাখী থেকে নিকৃষ্ট চরিত্রের দাম্ভিক হয় কাযবিনী বলেন যে, بـــازى শুধু নারীই হয়। এর পুরুষ হয় অন্য প্রকারের। যেমন- চিল ও শাহীন এ কারণে তার আকার আকৃতিতে বেশ মত পার্থক্য রয়েছে।

দ্বীনের খাদেমদের প্রতি আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারকের সাহায্য ঃ

হাদীস শাস্ত্রে আমীরুল মুমিনীন আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক ব্যবসা করতেন এবং এই কথা বলতেন যে, যদি পাঁচ ব্যক্তি না থাকত তাহলে আমি ব্যবসা করতামনা। পাঁচ ব্যক্তি হলেন- ছুফিয়ান ছওরী, ছুফিয়ান ইবনে ওয়াইনাহ, ফুজাইল ইবনে ছিমাক, ইবনে আলীয়াহ (রহ.) অর্থাৎ ইবনে মোবারক। তারা পরস্পরকে ধন সম্পদের মাধ্যমে সাহায্য করে আত্মীয়তার বন্ধন সুদৃঢ় করতেন।

এভাবে এক বছর অতিক্রম করল। কোন লোক আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারককে একথা বল্‌ল যে, ইবনে আলীয়াহ কে এখন কাজী বানানো হয়েছে। সংবাদ শুনে ইবনে মুবারক বিনে আলীয়াহর নিকট গেলেন না এবং আর্থিক সাহায্য ও করলেন না। বেশ কয়েকদিন পর ইবনে আলীয়াহ আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারকের নিকট - নিজে আগমন করলেন। কিন্তু আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক মাথা উঠিয়েই তার দিকে চাইলেন না। এরপর ইবনে মুবারক ইবনে আলীয়ার নিকট নিম্নলিখিত কবিতা লিখে পাঠয়ে দিলেন।

ياجاعل العلم له بازيا:: يصطاد اموال المساكين

হে, ইলমেকে বাজপাখী সাব্যস্তকারী, গরীবের ধন সম্পদ শিকার করে-

احتلت للذنيا ولذاتها:: بحيلة تذهب بالدين

তুমি দুনিয়া এবং স্বাধক এর তদবীরের দ্বারা আটকিয়ে রেখেছো যে দ্বীনকে ধ্বংস করে দেয়।

فصرت مجنونا بها بعدما:: كنت دواء للمجانبين

তুমি দুনিয়া অর্জন করে পাগল হয়ে গেলে- অথচ তুমি নিজে পাগলের জন্য ঐষধ ছিলে।

اين رواياتك في سودها:: لترك ابوب السلاطين

তোমার আলোচনা বাদশাহদের দরজায় নিক্ষেপের ব্যাপারে কোথায় চলে গেল?

اين رواياتك فيما مضى :: عن ابن عوف وابن سيرين

তোমার বর্ণিত আলোচনা কোথায়- যা ইবনে আউফ, এবং মুহাম্মদ ইবনে শিরিনের জন্য বর্ণনা করা হয়েছিল?

ان قلت اكرهت فذاباطل:: زل حمار العلم فى الطين

যদি তুমি একথা বল যে, আমার প্রয়োজন পুরা করার জন্য আমাকে বাধ্য করা হয়েছে- তাহলে আলবৎ ভুল। বিদ্যার গাধা মাটিতে হোঁছট খেয়েছে।

ইসমাইল ইবনে আলীয়াহ এই কবিতার সংবাদ পাওয়ার পর তিনি বাদশাহ হারুন্নুর রশীদের দরবারে গিয়ে ইস্তাফা দিয়ে দিলেন এবং তার এই ইস্তেফা গ্রহণ করা হল।

আব্দুল্লা ইবনে মুবারক ঃ

আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারাক একজন বিখ্যাত আলেম, আবেদ, জাহিদ, হাদীছের ইমাম, ইল্‌ম ও আমলের বাস্তব নমুনা ছিলেন। ইবনে খাল্লেকান তার জীবনের উপর আলোকপাত করতে গিয়ে একটি ঘটনা লিখেছেন, জনৈক লোক আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারকের মজলিসে বসা ছিলেন। তার হাঁচি এলো। কিন্তু তিনি الحمد لله বলে নাই। ইবনে মুবারক তখন বললেন কারো হাঁচি এলে তার কি বলা উচিত? লোকটি বল্ল الحمد لله বলা উচিত। তখন আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক বল্লেন يرحمك الله একথা ওনে উপস্থিত জনতা হতভম্ব হয়ে গেল। ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন যে, একদা আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারকের দরবারে আল রিক্কাহ তাশরীফ আনয়ন করলেন। তখন দলে দলে লোক আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারকের পেছনে গিয়ে জড়ো হতে লাগল। আকাশে ধুলি কণা উড়তে লাগল। অর্থাৎ ধুমধাম পড়ে গেল। এমন সময় জানালার ফাকে হারুনুর রশীদের একজন বাদী তা দেখে বল্ল লোকটিকে যাকে দেখে জনগণ সবাই চলে যেতে লাগল? তাকে বলা হল যে, তিনি খুবাসানের একজন বিখ্যাত আলেম, যাকে আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক বলা হয়। তখন দাসী বল্ল আল্লাহর কছম! "বাদশাহ এই কথা বলার অধিকারী জেন্য যে, মানুষ তার পেছনে কোন উদ্দেশ্যে অথবা শর্তে একত্রিত হয় না বরং তার সুমহান বিদ্যার জন্যই ফখর করে। জ্ঞানীগণ বলেছেন যে কেদা আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক সিরিয়াতে কোন এক ব্যক্তির কাছে একটি কলম চাইলেন। হঠাৎ করে তিনি ভ্রমনে বের হয়ে পড়লেন। তিনি ইরাকের এন্তাকিয়ার দিকে চলে গেলেন। কলমটিও ভুলে তিনি সাথে নিয়ে গেলেন। এন্তাকিয়ায় গিয়ে তার সে কলমের কথা স্বরণ হল। তখন তিনি দ্রুত ভাবে পায়ে হেটে চলে এলেন। এবং কলমটি ফেরত দিলেন। অতঃপর সেখান থেকে ফিরে গেলেন। কেউ কেউ বলেন, তিনি যে স্থানে বসতেন সে স্থানের মাটি আলোকিত হয়ে যেত। তিনি ১৮১ হিঃ ইন্তেকাল করেন।

বাদশাহ হারুনুর রশীদের ঘটনা ঃ

একদা বাদশাহ হারুনুর রশীদ শিকার করার জন্য বের হলেন। তখন তিনি একটি কালো বাজপাখী বাতাসে উড়িয়ে দিলেন। বেশ কিছুক্ষন বাজটি উড়তে থাকল। অতঃপর বাজটি দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল। কিছুক্ষণ পর সে

একটি মাছ তার পায়ের পঞ্জায় করে নিচে নেমে এলো। হারুনুর রশীদ এই মাছ সম্পর্কে উলামায়ে কেরামের নিকট জিজ্ঞেস করলেন যে তা খাওয়া জায়েজ কিনা? এবং প্রাণীটির যথার্থতা কি? প্রশ্নের উত্তরে মাক্বাতিল জবাব দিলেন, জনাব আপনার পূর্ববর্তী মান্যব্যক্তি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন যে, মহাবিশ্বে নানা প্রকার মাখলুক রয়েছে। এগুলোর মধ্যে এমন ধরনের সাদা রং এর প্রাণী আছে- যাদের থেকে মাছের আকৃতিতে বাচ্চা জন্ম নেয়। যাদের ডানা আছে কিন্তু পালক হয়না। এরপর হযরত মাকাতিল এগুলো খেতে অনুমতি প্রদান করেন- তখন সে প্রাণীকে সম্মান দেখানো হয়।

বাজের প্রকার ভেদ ঃ

বাজ ৫ প্রকার ঃ ☆ البازى ☆ الرزق ☆ الباشق ☆ البيدق ☆ الصقر। এ সবের মধ্যে বাযি নামক পাখী উদ্যমশীল হয়ে থাকে। কারণ সে পিপাসাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। ঘন ছায়া বিশিষ্ট পাশাপাশি গাছের ঝুপড়ী খোনে আছে সেখানে সে তার আবাস স্থল বানায়। এই ধরণের পাখী অত্যন্ত হালকা পাতলা হয়েথাকে খুব তীব্র ভাবে তার উতে পারে। স্ত্রী বাজ পুরুষ বাজ থেকে বেশী শক্তি শালী হয়। কেননা بـــازى তে উষ্ণতা বেশী হয়। এজন্য তার নানা রকম রোগ হতে থাকে । যেমন- গোস্ত হালকা হয়ে যায়। কিন্তু বাজ মোটা হয়ে যায়। সে বাজ সবচেয়ে উত্তম যার চোখ লাল, ডানা হালকা পাতলা, এবং উড়াল হয় তীব্রতর। মেন- কবি আননাসির বলেন ঃ

لو استضاء المرء فى اولا جه:: بعينه كفته عن سراجه

যদি মানুষ রাতে বাজের চোখ থেকে আলো অর্জন করে, তাহলে তার কোন বাতির প্রয়োজন হবেনা । তার চেয়ে সামান্য একধাপ নীচ বাজ হল -যার চোখ চিত্রল এবং লাল হয়।

বাজ পাখীর গর্দান লম্বা হয়, বুক হয় প্রশস্ত , তুলনামূলক তার মাথা বড়। পেছনের অংশ দুর্বল, উভয় উরু পালক দ্বারা আবৃত। বাজ মোটসোটা হয়। আজের বাচ্চাকে আরবীতে غـــطـريف বলে। আরবীতে বাজের দৃষ্টান্ত ও দেয়া হয়। এতএব কবি কবিতার শেষে এ ব্যাপারে বলেন-

اذاما اعتزذو علم يعلم:: فعلم الفقه اولى باعتزاز

যদি কোন আলেম তার ইলম নিয়ে ফখর করে তাহলে ইলমে ফিকাহ

ফখরের উপযোগী।

وكم طيب يفوح ولا كمسك :: وكم طير يطير ولا كباز

অনেক সুগন্ধি ব্যবহার করে কিন্তু মেশক নয়। এবং কথা হল অনেক পাখীই উড়ে কিন্তু বাজের মতো কেহ পরেনা।

শেখ জাহিদ আবুল আব্বাস- কসতুলানী বলেন, আমি আবু সোজা ইবনে রুস্তম আল ইছহানী এর কাছ যিনি (মাক্বামে ইব্রাহীমের ইমাম ছিলেন) থেকে শুনেছি, তিনি বলেছেন আমি শেখ আহমদ এর কাছ থেকে (হাম্মাদুদাব্বাসের খাদেম ছিলেন) শুনেছি যে একদা শেখ আব্দুল কাদির জনাব হাম্মাদুদদাব্বাস উপস্থিত হলেন, এর কাছে সাক্ষাতের নিমিত্তে তখন الدباس তাকে দেখলেন- যে তিনি বাজ পাখী শিকার করেছেন। তখন তার শাইখ তার প্রতি অভিযোগের দৃষ্টিতে দেখতে থাকেন। তখন তিনি তার শেখের কাছ থেকে মালছামানা ব্যতীতই অন্যান্য জিনিষ পত্র নিয়ে বের হয়ে আসেন। এবং তাও আমাদের উচু মানের লোকের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এজন্য শেখ আব্দুল কাদির বলেন-

انا ببلل الاقداح املأ دوحها:: طرباوفى العليا بازاشهب

"আনন্দের কারণে আমি ঘন বৃক্ষকে সংজ্ঞাহীন করে দেব এবং পহাড়ের চুড়ায় সাদা কাল রং এর বাজ বসবাস করে। শেখ আবু ইছহাক সিরাজী বলেন লোকেরা কাজী সুরাইকে আশহুব বাজ বলত।

আবু আইজি কবিতার প্রথমে বলেন-

ليس المقام بدار الذال من شيمى:: ولا معاشرة الاتزال من هممى

অপমানের স্থানে থাকা আমার অভ্যাস নেই এবং অপমানির মত থাকাও আমার ইচ্ছা নেই।

ولا مجاورة الاوباش تجمل لى:: كذالك البازك ياوى مع الرخيم

চরিত্রহীনদের সংশ্রবকে আমার জন্য সৌন্দর্য বানায়নি। যেমন- গাধার সহিত বাজ বসবাস করেনা।

الباشق বাজঃ الباشق শব্দটি অনারবী। শব্দটি মুরাব। তার উপাধি হল ابـــوالاخـــذ সে মেজাজে অত্যন্ত গরম চরিত্র খারাপ। এ ধরনের বাজ ও খুব শক্তিশালী হয়। এই ধরনের পাখি যদি ছোট বেলাই অন্তরঙ্গ হয়ে যায় তাহলে

তার মালিক শিকার দ্বারা ভরপুর হয়ে যায়। এই পাখিটিও হালকা পাতলা হয়- তার অভ্যাস ভাল। বাদশাহদের লালন পালনের উপযোগী। কারণ এই ধরনের বাজ ভাল ভাল পাখী শিকার করে। যেমন- কবুতর, তিতর এবং ঘুঘু ইত্যাদি। পাখিটি অত্যন্ত ক্ষিপ্র গতি সম্পন্ন। তার প্রতিদ্বন্দ্বি যদি তার থেকে প্রবল হয়- তবু তাকে সে ছাড়েনা যতক্ষণ না সে পরিশ্রান্ত হয়। এ ধরনের বাজের আরো সৌন্দর্য তাহল দেখতে ছোট অথচ ওজনে ভারী, পায়ের গোছা লম্বা উরু হয় ছোট।

البيـــدق আরেক প্রকার বাজ ঃ এ ধরনের বাজ চড়ুই প্রজাতির পাখি শিকার করে থাকে। ঘন বৃক্ষের স্থানে এরা খুবই কম বসবাস করে। স্বভাব চরিত্রে সে স্বাধারণ পাখীদের মতই হয়ে থাকে। তাই কবি আবুল ফাতাহ কাশাজিম বলেন-

حسبى من البزاة والبيادق :: بيبدق يصيد صيد الباشق

বাজ পাখী এবং তিতর পাখী আমার জন্য যথেষ্ট, জংগলে তিতর পাখীর মত শিকার করে।

مؤدب مورب الخلائق :: اصيد من معشوقة العاشق

সে শিষ্টাচার এবং অন্যান্য মানুষের সংশোধনকারী

যে আশেকের জন্য মাশুক বেশী শিকারী হয়

يسبق فى السرعة كل سابق:: ليس له فى صيده من عائق

সে দ্রুতগতিতে অগ্রে বের হয়ে যায়। এ ধরনের শিকার করাতে কোন প্রকার বাধা থাকেনা।

ربية وكنت غير واثق:: ان الفرازين من البيادق

আমি তাকে লালন করেছি বটে কিন্তু বিশ্বাস করিনা, কথা হল দাবার রাজা বাজেরর চেয়েও নিকট। এই পাখীগুলো শিকারী পাখীর তুলনায় অধিকতর ছোট। প্রতিকার এবং প্রতারনায় সে দূর্বল। এরা হয় চরিত্রহীন মন্দ চরিত্র তার মেজাজ হয় রুক্ষ ধরনের । কোন কোন সময় চড়াই ইত্যাদি শিকার করে। অধিকাংশ সময় এদের ভয়ে পাখীরা পালিয়ে যায়। আকার আকৃতিতে এই পাখী এক প্রকার ছোট শিকারী পাখী এর মতই।

বাজ পাখীর এর শরয়ী বিধান ঃ

শরয়ী বিধানহল সর্বপ্রকার বাজ পাখী হারাম। কারণ মাইমুন ইবনে মেহরান আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, প্রতিটি হিংস্র জন্তু এবং থাবা মারে এমন পাখী খাওয়া হারাম । অধিকাংশ আলেমদের মতও তাই। ইমাম মালেক বলেন বাজের গোস্ত হারাম নহে। এ মতের সমর্থক আওযায়ী, লইছ, ইয়াহইয়া ইবরন ছায়ীদ প্রমূখ মনিষীগণ। তাদের দলীল হল- কোন পাখীই হারাম নয় لا يحرم من الطير شئ ইমাম মালেক (রহ.) এবং অন্যান্যদের দলীল ইবনে পবিত্র কোরআনের সে আয়াত যাতে মুবাহ বস্তুর আলোচনা করা হয়েছে ইমাম মালেকের নিকট حديث " ذى ناب " ছহীহ নহে।

ইমাম আবহরী (রহ.) বলেন চুঙ্গল দেয় এমন পাখীর ব্যপারে কোন প্রকাশ্য দলীল নেই । কেউ কেউ লিখেছেন যে, যে হাদীছে ذو مخل শব্দের উল্লেখ রয়েছে সে হাদীছে নহে। কারণ মাইমুন ইবনে মেহরান উল্লেখিত হাদীছটি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা পরিত্যাগ করেছেন। মধ্যম পন্থায় রয়েছেন ছায়ীদ ইবনে জুবাইর (রা.)ও। এ জন্য এই হাদীছখানা পরিত্যাজ্য থেকে মুক্ত নহে। এ কারণে আমাদের নিকট হাদীছখানা মাপ কাঠি মোতাবেক নেই। ইমাম দামিরী (রহ.) বলেন আমাদের ইমাম মাফেয়ী (রহ.) বলেন মুহরিম ব্যক্তি বাজ পাখী সঙ্গে রাখা মাকরুহ। এমনিভাবে এমন প্রাণী যা কুকুর গোত্রের তা রাখাও মাকরুহ। কারণ এ ধরনের প্রাণীদের দেখে শিকার ভেগে যায় এবং কখনো এমনও হয় যে, এ ধরনের পাখী অথবা জানোয়ার শিকার দেখে অনাকাংখিত আক্রমন করে বসে যে কারণে শিকার মরে যায়। কারণ শিকার ধরার জন্য যদি বাজ পাখীকে উৎসাহিত করা হয় অথবা শিকারের উপর ছেড়ে দেয়া হয়, কিন্তু শিকারকে মারেনি অথবা কোন কষ্ট দেয়নি তাহলে মুহরিমকে কোন প্রকার বদলা দিতে হবেনা। তবে গুনাহ গার হবে। এই মাছয়ালাটি এরকম যেমন- কোন মানুষ তীরের নিশানা করল কিন্তু ভুল করে ফেল্ল। তাহলে তীর নিক্ষেপের কারণে গুণাহ গার হবে। এই কারণে যে সে তীর নিক্ষেপের সময় তো ইচ্ছাই করেছিল। কিন্তু যেহেতু কোন ক্ষতি হয়নি সেহেতু কোন জরিমানা লাগবেনা।

ইমাম শাফেয়ী আরো বলেছেন, যে জানুয়ার কোন ক্ষতি করেনা এবং

কোন উপকারও করেনা- তাকে হত্যা করাও জায়েজ নাই। কারণ তার কাছে উপকারের আশাই করা যায়। অধিকন্ত মানুষের উপর আক্রমন করার কারণে মাকরুহও বলা যায়না। যেমন বাজ পাখী, চিতা এবং ঈগল পাখী ইত্যাদি।

বাজ পাখী যেহেতু পাক পবিত্র প্রাণী সেহেতু তা বিক্রী করা জায়েজ। এ ব্যাপারে কারো কোন দ্বিমত নেই। বাজ পাখীর দরুন বেশ উপকৃত হওয়া যায়। তাই আদ্দি বিন হাকিম বলেন, আমি রাছুলুল্লাহ (স.) এর কাছে বাজ পাখী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে নবী (স.) জবাব দেন- তোমরা তাকে ধরতে পার এবং খেতে পার। (ترمزی)

বাজ পাখীর প্রবাদ ও উপমা ঃ

আরবগণ বলে থাকেন- هل ينهض البازی بغير جناح

বাজ পাখী ব্যতীত কি শিকারী যাত্রা করতে পারে?

এই উদাহরণটি কাউকে সহায়তা বা তুলনা করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। যেমন কবি বলেন-

اخاك اخاك ان من لا اخاله:: كساع الى البهيجا بغير سلاح

"তোমার ভাইতো ভাই-ই। যার ভাই নেই সে অস্ত্র বিহীন লড়াই করার ন্যায়।

وان ابن عم المرء فاعلم جناحه :: وهل ينهض البازی بغير جناح

"কেউ চাচাত ভাইকে (আপন) ভাই মনে করলে বাজ পাখীর মত যেন ডানা বিহীন উড়ল।"

একটি উপদেশ মূলক কাহিনী ঃ

খালিদ বিন ইয়াজিদ আল-আরক্বত বলেন আবু আইয়ুব সুলায়মান ইবনে আবুল মাজালিদের উত্তম দৃষ্টান্তসমূহের মধ্যে একটি দৃষ্টান্ত আছে যে, একদা আবু আয়ুব আমাদের সবাইকে সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকতে প্রলুব্ধ এবং উৎসাহিত করছিলেন। হঠাৎ করে সেখানে খলিফা মনসুরের ডাক এল। একথা শুনেই আবু আইয়ুব আনসারীর চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে গেল। তার চেহারা পাংশু বর্ণ ধারণ করল। কিছুক্ষণ পর যখন তিনি দরবার থেকে বের হলেন, তখন দেখা গেল তার চেহারায় কোন ভয়ের ছাপ নেই। বরং ইহা কোন

নতুন কাথা নয় যে, যখনই মনসুর তাকে ডাকতেন তখনই তিনি অস্বাভাবিক হয়ে যেতেন। লোকেরা জিজ্ঞেস করল যে আপনি তো খলিফার কাছে বার বার আসা যাওয়া করেন। তিনি আপনার অন্তরঙ্গ মানুষ। তাহলে আপনি তাকে কেন এত ভয় করেন? ডাক শুনেই চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে যায় কেন? জবাবে তিনি বল্লেন- আমি বড়দের কাছ থেকে শুনেছি যে, একদা বাজপাখী এবং মুরগী তর্কানুষ্ঠানে অবতীন হল। বাজপাখী বল্ল- আমি মনে করি তুমি তোমার মালিখের অনুগত নও। মুরগী বল্ল- আমি কিভাবে মালিকের অনুগত নই? বাজপাখী বল্ল-অতি কষ্টে তুমি দৈনিক একটি করে ডিম দিয়ে থাক। তোমার মালিক অতি যত্নে তাকে তা দেয়। কয়েকদিনের মধ্যেএ থেকে বাচ্চা বাইরে বের হয়ে আসে। মালিকের হাতে তোমাকে খাবার দেয়। অতপর তুমি যখন বড় হয়ে যাও তখন উড়ে চলে যাও। কারো কাছেই আসনা এদিক থেকে ওদিক চষে বেড়াও। এমনিভাবে তোমার অবস্থা হল এই যে যদি কারো দেয়ালে বড়ে যাও যদিও তুমি বেশ কয়েক বছর থাকনা কেন তবু তুমি ছেড়ে উড়ে চলে যাও তুমি প্রত্যহ অন্য ঢাল-পালা তালাশ করতে থাক। আবার অন্যের মেহেরবানী ও পেয়ে থাক। বাজ লল, আর লোকেরা পাহাড় থেকে আমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে লালন পালন করে। আমি যখন বড় হয়ে যাই তখন খানাদান ও অল্প অল্প করে চিবাই। অতএব, বেশীদিন লাগেনা- কয়েকদিনের মধ্যেই বন্ধুত্ব হয়ে যায়। আমার মালিক আমাকে শিকারের জন্য ছেড়ে দেয়। তখন আমি একই উড়তে থাকি। কিছুক্ষণ পরই শিকার ধরে আমার মালিকের নিকট পৌছে দেই।

মুরগী বলল- মিয়া থাম! এখন তো প্রমানাদি শেষ হয়ে গেছে। মূল কথা হল যে, যদি তুমি বাজ পাখীকে শিকের মধ্যে ভূনা করতে দেখে থাক তাহলে দ্বিতীয়বার আর অগ্নিশিখায় পশেও আসবে না। আর আমার অবস্থা হল আমি প্রত্যহ শিকে মোরগ ভূনা করতে দেখি- তখন আমি তা দেখতে থাকি। এ অবস্থা দেখেও অবস্থা আমি তোমার চেয়ে মালিখের বেশী অনুগত। তখন আমি আগ্রহ প্রকাশ করি যে সম্ভবত আমি তোমার মতই।

আবু আইয়ুব বলেন, যদি তোমরা মনসুরকে এত কাছে থেকে দেখে থাক যত কাছে থেকে আমি তাকে জেনেছি- তাহলে মনসুরর ডাকের সময় তোমাদের অবস্থা আমার চেয়েও বেশী খারাপ হয়ে যেতে।

আবু আইয়ুব সুলায়মানের হত্যা ঘটনা ঃ

১৫৪ হিঃ খলিফা মনসুর আবু আইয়ুব সুলায়মান ইবনে আবুল মাজালিদ এর ধন সম্পদ ছিনিয়ে নিয়ে তাকে অত্যন্ত নিরিত অবস্থায় হত্যা করা হয়। আসলে মনসুর খলিফা হওয়ার পূর্বে আবু আইয়ুব এর সঙ্গে ঘরনা সম্পর্কে ছিল। যে কারণে মনসুর খলিফা হবার পর তার দরবারে আবু আইয়ুব যথেষ্ট সম্মান মর্যাদা ছিল। পরে কোন এক কারণে মনসুর পরস্পরের সম্পর্কে ফাটল ধরে।

আলেমগণ লিখেছেন যে, সম্ভবত আবু আইয়ুব যখন খলিফা দরবারে যেতেন তখন তার উপর ভয়-ভীতির সুস্পষ্ট ছাপ পরিলক্ষিত হত। কিন্তু কোন কারণে নিরাপদ হয়ে ফিরে আসতেন। আবার কোন কোন ঐতিহাসিক লিখেছেন যে, খলিফা মনসুরকে আকৃষ্ট করার জন্য তৈল জাতীয় বস্তুতে যাদু করে রেখেছিল। যখন তিনি মনসুরের দরবারে যেতেন তখনই তিনি সে তৈল চোখের ভ্রুতে লাগিয়ে দরবারে যেতেন যে কারণে সাধারণ লোকের মধ্যে তা প্রচার হয়ে গেল যে "আবু আইয়ুবের তৈল" এই আমলের কারণে খলিফা মনসুর তাকে দেখেই বেহুশ হয়ে যেতেন এবং ভাল বাসতেন।

এই অর্থেই নাছিহুদ্দীন ইবনে ছায়ীদ ইবনে দাহান যিনি জ্ঞানে গরিমায় তার যুগের ইমাম ছিবুইয়াহ গন্য করা হত।

لا تجعل الهزل دابافهو منقصته :: والجد تخلوبه بين الورى القيم

তুমি ঠাট্টা বিদ্রুপে অভ্যস্থ হয়োনা, কারণ তা দোষ। মহানুভবতা সৃষ্টির মধ্যে মানুষের সম্মান ও শৌর্যবীর্য এনে দেয়।

ولا يغزنك من ملك بتسمه:: ماسحت الحب الاحين بتسم

বাদশাহর মুচকি হাসিকে তুমি ধোকা মনে করো না, কেননা যখন মেঘ চলে আসে তখন মযলধারা বৃষ্টি হতে থাকে।

بادرالى العيش ولايام راقدة :: ولا تكن لصروف الدهر تنتظر

যুগ যদি চুপ হয়ে তাহলে আরামে জিন্দেগী কাটাও। আর তুমি যুগের ঘুর্ণনের অপেক্ষা করোনা।

فالعمر كالكاس يبد وافى اوائله :: صفوو آخره فى قعره كدر

বয়স হল পিয়ালার মত- যা প্রকাশ্যে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকে কিন্তু

অভ্যন্তরে থাকে ময়লা আবর্জনা।

تائمل تحولى والاهلال اذابدا:: لليلته فى افقه ابنا اضنى

তুমি আমার কৃষতাকে মনোযোগ সহ দেখ-আর রাতে চাঁদনী যখন রাতে নিজ ধরনীতলে উদিত হয়- আমার চেয়ে কে বেশী দুর্বল।

على انه يزداد فى كل ليلة:: نمو اوجسمى باضنى دائما يغنى

চন্দ্রতো প্রতিরাতেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। আর আমার শরীর দুর্বলতার কারণে সব সময় কমতে থাকে। এ কবিতাটিও তারই বলে ধরে নেয়া হয়।

والله لو الا ان يقال تغيرا:: وصبا وان كان التصابى اجدرا

আল্লাহর শপথ! কেন বলা যাবেনা যে সে পরিবর্তন করে নারীলোকের প্রতি ধাবিত হয়ে গেছে। যদিও তার খেলা তামাশার দিকে ধাবিত হওয়া অধিকতর উচিত।

لا عدت تفاح الخدود بنفسجا :: لثما وكافور التراب عنبرا

তোমার মুখমন্ডল আমার কাছে বেগুনী আপেলেপর মত। নাক কর্পুর ও সুগন্ধির মত, বক্ষ দেশকে ও তৈরী করব। নাসিহুদ্দীন ছায়ীদ ইবনে দাহান এ মৃত্যু হয়। ৬৯ হিঃ গজনবী বলেন - تـربـيـه- الـتـرائـب এর বহু বচন বুকের সম্মুখের অংশ যেখানে কণ্ঠাবরণ বাধা হয়। আল কুয়াসী বলেন এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল কারো মতে বুক, কারো মতে হাড়। কারো মতে পায়ের মতে পায়ের পার্শ অথবা আঙ্গল।

চিকিৎসা ক্ষেত্রে বাজ পাখীর উপকারীতা ঃ

বাজ পাখীর যকৃত দ্বারা সুরমা বানিয়ে চোখে লাগালে চোখের পানি পড়া বন্ধ হয়। এমনিভাবে দৃষ্টিহীনতার জন্যও বেশ উপকারী। যদি কোন স্ত্রীলোক বন্ধা হয় তাহলে বাজের বীট পানির সহিত মিশ্রিত করে পান করলে গর্ভ হওয়ার সম্ভাবান রয়েছে। যদি কোন ব্যক্তি بـاشـق নামক বিশেষ ধরনের বাজের মস্তক খায় তাহলে হৃদ কম্পন যা পাগলামির কারণে হয় তা দূর হয়ে যায়। তবে এক দেরহাম পরিমান আরক গোলাবের মধ্যে মিশ্রিত করে ব্যবহার করতে হবে।

বাজ পাখী সংক্রান্ত স্বপ্নের তা'বীর ঃ

বিচারক যদি স্বপ্নে বাজপাখী দেখে তাহলে সে বাদশাহ হওয়ার ইঙ্গিত

বহন করে ।যদি কোন বিচারক দেখে যে বাজ পাখী তার হাত থেকে উড়ে গিয়েছে কিন্তু গোড়ালী হাতে রয়ে গেছে- তাহলে এ ব্যাখ্যা হবে যে, তার রাজত্ব চলে যাবে- শুধু নাম মাত্র বাকী থাকবে। এবং যদি তা দেখে যে, বাজ পাখী উড়ে যাবার পর তার পালক রয়ে গেছে তাহলে এর ব্যাখ্যা হবে যে তার হাতে মাত্র সামান্য মালামাল থাকবে। স্বপ্নে বাজপাখী জবাই করতে দেখলে সফলতার লক্ষণ বলে মনে করতে হবে। কেহ স্বপ্নে দেখল যে, সে অনেক বাজ পাখী জবাই করেছে- তাহলে এর ব্যাখ্যা হবে যে বিচারক বা বাদশাহ অত্যাচার করে ধন-সম্পদ লুটে নিবে অথবা সাধারণ লোকদেরকে টেনে আনবে। সে অতি সত্বর মরে যাবে। স্বপ্নে বাজের গোস্ত , দেখা বাদশাহ বা হাকিমের মালের সাদৃশ্য। কোন বাজারী লোক স্বপ্নে বাজ পাখী দেখলে তার ব্যাখ্যা হবে তার জন্য অনেক অনুকম্পা এবং সর্দারীর আলামত। বাসক নামক বাজ স্বপ্নে দেখলে সে ডাকাত অথবা চুরের মত হবে। কোন কোন জ্ঞানী বলেন- বাসক বাজপাখী স্বপ্নে দেখলে নিসন্তান হওয়ার দিকে ইঙ্গিতবহ।

الباذل

(৫০) উট

যে উটের চুয়ালের দাত গজায় তাকে بـــــازل "বাযিল" বলা হয়। তা পুরুষ হোক বা স্ত্রী। আট বছর বয়সে এই দাত উঠা আরম্ভ হয়। البـازل এর বহু বচন بـذل এবং ابواذل।

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) বলেন ঃ নবী করিম (স.) একটি সাদা জোয়ান উট কর্য গ্রহণ করলেন । পরবর্তীতে নবী করিম (স.) একটি بـازل (আট বছরের) ফেরত দেন এবং এরশাদ ফরমান তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ট হল সে ব্যক্তি যে উত্তমরূপে কর্য পরিশোদ করে (অর্থাৎ উত্তমম মালের দ্বারা তা পরিশোঃ করে)

ইমাম খাত্তাবী, ইবনে খুজাইসাহ ইউনুছ বিন আব্দুল আলা বলেন- একদা সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহ (রহ.) এর নিকট হুজুর (স.) এর এক হাদীছের মর্ম জানতে চেয়ে চুপ হয়ে যান। কিছুক্ষণ পর সুফিয়ান ইবনে ওয়াইনাহ (রহ.) এর নিকট জিজ্ঞেস করা হল যে, সে হাদীছের মর্ম ইমাম মালেক (রহ.) বর্ণনা করেছেন তা বর্ণনা করলে। তবে কি তা আপনি পছন্দ করবেন? তিনি বল্লেন-

ইমাম মালেক (রহ.) এ ব্যাপারে কি বলেন? তখন তাকে বলা হল তা অতি উত্তম। অর্থাৎ পাথর থেকে পবিত্রতা অর্জন করা যাবে।

একথা শওন সুফিয়ান ইবনে ওয়াইনা বলেন আমার এবং ইমাম মালেক (রহ.) এর উদাহরণ হল এরকম যেমন পূর্বেবর্তী লোকেরা বলেছেন-

وابن اللبون اذا مالزفيقرن :: لم يستطع صولة البزل القناعيس

অর্থাৎ উটের বাচ্চা যখন শি দ্বারা ঘর্ষণ করে তখন কানাইছ পাহাড়ের বকরীর আক্রমনেও তার সমকক্ষ হয়না।

الباقعه

(৫১) বুদ্ধিমান মানুষ

الباقعه অর্থ داهية অর্থাৎ বুদ্ধিমান ও তীক্ষ্ণ ধীসম্পন্ন মানুষ। ইমাম আল হারভী (রহ.) হযরত ইবনে ওমর(রা.) এর কাছ থেকে الباقعه এর অর্থ বর্ণনা করেছেন। যে, ইহা একটি ভীতিজনক পাখী। সে পানি পান করে ডান এবং বামদিকে উড়ে চলে যায়। কাবাইল এর হাদীসে বর্ণিত আছে ঃ

ان عليا لابى بكرٍّ لقد عشرت من الاعراب على ناقعة

আমিরুল মু'মিনীন হযরত আলী (রা.) হযরত আবু বকর (রা.) এর নিকট জিজ্ঞেস করলেন যে, আমার নিকট নাকিয়ার উপর হুওয়াব হওয়ার জন্য বেদুইনের পক্ষ থেকে সংবাদ এসেছে। অন্য এক হাদীছে আছে باقعة فتفاتحة فنازاهو আমি তার গতি বিধি লক্ষ্য করলাম- তখন সে অত্যন্ত সাবধান হয়ে গেল।

بالام

(৫২) মাছ

হযরত আবু সাইদ খুদরী (রা.) বলেন, নবী করিম (স.) এরশাদ ফরমান, কিয়ামত দিবসে যমীন একটি রুটির মত হয়ে যাবে। আল্লাহ তায়ালা আপন কুদরতে উলট পালট করে দেবেন। (যেমন তোমরা ভ্রমনে রুটিকে উলট করে থাক) বেহেস্তী মেহমানদের পুরস্কার স্বরূর। এমন সময় এক ইহুদী এলো। সো বল্ল হে আবুল কাশেম, আল্লাহ পাক তোমার উপর কল্যান করুন, কিয়ামতের দিন আমি জান্নাতীদের খাবারের ব্যাপারে বলবনা কি ? হুজুর (স.)

বলেন অবশ্যই বল। ইহুদী লোকটি বল্ল যমীন একটি রুটির মত হয়ে যাবে। যেমন- নবী করিম (স.) এরশাদ করেছিলেন। নবী করিম (স.) আমাদের দিকে তাকালেন- অতপর তিনি হাসলেন- এমন কি তাঁর (স.) দাঁত মোবারক বের হয়ে গেল। ইহুদী লোকটি বল্ল আমি কি আপনাকে তাদের তরকারী সম্পর্কে বলব নাকি? নবী করিম (স.) ফরমালেন- অবশ্যই বল। লোকটি বল্ল- তাদের তরকারী হবে "বালাম" নামক মাছ এবং নুন। আবু সাইদ খুদরী (রা.) জিজ্ঞেস করলেন বালাম এবং নুন কি? ইহুদী লোকটি বল্ল- তাহল বলদ এবং মৎস। এদের কলিজা দ্বারা ৭০,০০০ হাজার লোক খেতে পারবে।

আরেক হাদীসে হযরত ছাওবান (রা.) বলেন আমি একদা নবী করিম (স.) এর পাশে দন্ডয়মান ছিলাম। হঠাৎ করে একজন ইহুদী আলেম আসল। তিনি মোহাম্মদ (দ.) السلام عليك (ছাওবান (রা.) বলেন) একথা শ্রবন করে আমি তাকে এমন জোরে ধাক্কা মারলাম, ধাক্কার চোটে সে ঘোরপাক খেয়ে পড়ে গেল। সে বল্ল তুমি আমাকে কেন ধাক্কা দিলে? আমি বল্লাম তুমি ইয়া রাসুলুল্লাহ বলে কেন সম্ভোধন করলে না? ইহুদী বল্ল- আমি তার সে নাম নিয়ে সম্বোধন করছি যে নাম তার পরিবার পরিজনেরা রেখেছে। তখন নবী করিম (স.) এরশাদ করেন- হ্যাঁ আমার নাম মুহাম্মদ (স.) ই বটে- যা আমার পরিজনেরা অনুমোদন করেছেন। ইহুদী লোকটি বল্ল আমি আপনাকে কিছু প্রশ্ন করতে এসেছি। নবী করিম (স.) বল্লেন আমি যদি তোমাকে কিছু বলি তাহলে কি তুমি মেনে নিবে? ইহুদী বল্ল- আমি মনোযোগ সহকারে শ্রবন করব। এমন সময় নবী করিম (স.) এর সাথে থাকা লাঠি দ্বারা মাটি খনন করতে লাগলেন এবং বল্লেন হবে সেদিন আসমান ও যমীন ব্যতীত মানুষ কোথায় থাকবে?

নবী করিম (স.) জবাবে বললেন, সে সময় হাশর ময়দান ব্যতীত সব কিছুই অন্ধকার থাকবে।

ইহুদী আবার প্রশ্ন করল যে, কিয়ামতের দিন সর্ব প্রথম কোন কোন লোককে অনুমতি দেয়া হবে? নবী (স.) বললেন, দরিদ্র মুহাজিরদেরকে। ইহুদী আবার প্রশ্ন করল- যখন সে জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন তাদের কি কি পুরস্কার দেয়া হবে? নবী করিম (স.) বললেন মাছের কলিজার টুকরা।

ইহুদী আবার জিজ্ঞেস করল: তাদেরকে আর কি খাদ্য দেয়া হবে? নবী

করিম (স.) বললেন, তাদের জন্য বেহেস্তের সে বলদ জবাই করা হবে যা বেহেস্তের চারণ ভূমিতে চরানো হয়েছে। ইহুদী বলল খাবারের পর তাদের পানীয় বস্তু কি হবে? নবী করিম (স.) জবাবে বললেন শরাব এবং জীবন সঞ্জীবনী এমন ঝর্না থেকে পান করানো হবে যে ঝর্নার নাম সালসাবিল হবে।

ইহুদী বলল: পুরোপুরি সত্য কথা বলেছেন। আমি আপনার নিকট এমন প্রশ্ন করতে এসেছি যা এই ধরাধামে নবী ব্যতীত আর অন্য কেহ জানেনা। নবী (স.) বললেন আমি জবাব দিলে কি তোমার সন্দেহ দূর হবে? ইহুদী বলল, আমি মনোযোগ সহকারে শুনব। এবার নবী করিম (স.) বললেন ঠিক আছে। তুমি জিজ্ঞেস করতে পার। ইহুদী বলল, বলুনত সন্তান কিভাবে জন্ম নেয়? নবী (স.) বললেন পুরুষের মনি সাদা এবং মহিলার মনি হলুদ রঙ্গের হয়। যখন উভয়ের মিলন ঘটে তখন যদি পুরুষের মনি মহিলার মনির উপর প্রভাব ফেলতে পারে তখনই আল্লাহর হুকুমে ছেলে সন্তান জন্ম হয়। আর যদি স্ত্রীর মনি পুরুষের মনির উপর প্রভাব ফেলতে পারে তখন হয় কন্যা সন্তান। ইহুদী বলল আপনি অতি সত্য কথাটি বলেছেন। বিশ্বাস হয় আপনি নবী। এরপর ইহুদী লোকটি চলে গেল। সে চলে যাবার পর নবী করিম (স.) বললেন, সে আমার কাছে যে সমস্ত প্রশ্ন করেছে সে গুলো আমি মোটেও জানতাম না। আল্লাহ তায়ালা তখনই আমাকে অবগত করেছেন। (মুসলিম) এ ধরনের হাদীছ বুখারী শরীফেও আছে। যা হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। আর সে ইহুদী ছিল আব্দুল্লাহ ইবনে ছালাম। যেমন অন্যান্য হাদীছে পরবর্তীতে তার নাম প্রকাশ্য ভাবে আসবে।

নুন এবং বালাম মাছ ঃ

নুন বলা হয় মাছকে। হযরত ইউনুস (আ.)এরও এই নাম ছিল। তাকে যু-নুন বলা হয়। বালাম এর ব্যাপারে লোকেরা যুক্তিসম্মত কথা বলেছেন। বালাম শব্দটি মনে হয় ইব্রানী শব্দ। (নেহায়া) ইমাম খাত্তাবী (রহ.) বলেন ইহুদী তামীম উদ্দেশ্য নিয়ে ছিল। সে বর্ণনায় আগপর করেছে। আসলে সে ى۬ বলতে চেয়েছিল। যেন لـــعـــى তখন পরিবর্তন কারীরা ى۬ ব্যতীত بـــا এর আলোচনা করেছেন। সেভাবে ى۬ এর অর্থ হবে জংগলী বলদ। আমার নিকট তাই সঠিক বলে মনে হচ্ছে। ইমাম দামিরী (রহ.) বলেন সঠিক হল যে, শব্দটি আসলে ইরানী ভাষায়। আর "زيـــادة" বলে মাছের কলিজাকে। যা তার একটি

অংশ আলাদা হয়ে গিয়েছে। এজন্য তা খেতে খুবই সুস্বাদু হয়। سبعون الف "৭০,০০০ হাজার" এর উদ্দেশ্য হল অসংখ্য অগনিত পরিমান লোক বেহেস্তে প্রবেশের ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। তাও ধারনা করা যায় যে, এর উদ্দেশ্য হল অধিক সংখ্যক । এই বর্ণনাকে ইমাম নাছঈ ও 'বাবুন ফি আশরাতুন নিছা' তে বর্ণনা করেছেন।

البال

(৫৩) বড় মাছ

البال এমন এক প্রকান্ড মাছকে বলা হয় যার দৈর্ঘ হয় ৫০ গজ। এই ধরনের মাছ সাধারণত বড় বড় সাগরে পাওয়া যায়। কেউ কেউ এ ধরনের মাছকে 'আম্বর' ও বলেছেন। কিন্তু আম্বর শব্দটি আরবী নয়। ইমাম জাওয়ালিকী বলেছেন সম্ভবত এই তিমি কেই চিহ্নিত কর হয়েছে।

আল্লামা জাওহারী বলেন, بال সমূদ্রের বৃহৎ মাছকে বলে। কিন্তু শব্দটি আরবী নয়। ইমাম কাযভিনী (রহ.) বলেন তিমি বলা হয় এমন মাছকে - যার দৈর্ঘ হয় ৫০০ শত গজ। অধিকাংশ সময় মনে হয় যে এর শরীরের একটি অংশ প্রকান্ড একটি টিলা। মাঝি মাল্লারা তাকে খুব ভয় পায়। তারা যখন মনে করে যে ইহা তিমি মৎস তখনই তাকে তবলা বাজিয়ে উড়িয়ে দেয়া হয়। কথিত আছে যে যখন এই তিমি নামক মাছ সাগরের অন্যান্য মাছের উপর অত্যাচার করে তখন আল্লাহ তায়ালা এক গজ পরিমান একটি ক্ষদ্র মাছ তার উপর লেলিয়ে দেন যাতে (তিমি মাছের) কানের ভিতর নিঃশব্দে প্রবেশ করে- তখন এই তিমি মাছ তার গর্তে গিয়ে তার মাথা মাটিতে ঘষতে থাকে। এমন কি সে মারাও যায়। কয়েকদিন পর মরে পাহাড়ের মত ভেসে উঠে। এ ধরনের মাছ শিকারের জন্য বিশেষ ধরনের হাবশী লোক দরকার। এরা যখন এই মাছটিকে দেখে কখন মাছের প্রতি তার কুকুর ছেড়ে দেয়। আর কুকুর মাছকে ধরে টেনে সাগরের বাইরে নিয়ে আসে। অতপর এর পেট চিড়ে, আম্বর বের করে আনে।

البر

(৫৪) এক প্রকারের বাঘ (বাব্বর বাঘ)

ببر প্রথম باء এ যবর, আর দ্বিতীয় باء তে যের ।এটি হিংস্র প্রাণীর একটি প্রজাতি। বাঘের সাথে তার বৈরীতা আছে। একে بربر এবং فرانق ও

বলে। ببر ভারতে পাওয়া যায়। ইহার আকৃতি বাগডাসার মত। প্রসিদ্ধ কথা হল হালকা দাড়ি বিশিষ্ট এক জাতীয় প্রাণী এবং বাঘের মিলনে বাব্বর বাঘ এর জন্ম হয়।

এর স্ত্রীটি বাতাস থেকে গর্ভ ধারণ করে। এজন্য তা (ক্ষীপ্রতা) আক্রমনও বাতাসের মত হয়। তাকে শিকার করতে মানুষ প্রস্তুত থাকে। এর বাচ্চাকে চুরি করে বোতলে ভরে রাখা হয়। অতপর সে বোতলকে দ্রুত গামী ঘোড়ায় চড়ে নিয়ে যাওয়া হয়। তার বাচ্চাকে না পেয়ে খুজতে বের হয়ে পড়ে । শেষ পর্যন্ত শিকারী আবদ্ধ বোতল সহ তার সামনে ফেলে দেয়। আর সে তা দেখে ব্যস্ত হয়ে পড়ে- এসময় তার দৃষ্টি অন্য বাচ্চাটি থেকে দূরে সরে যায়। আর এ সুযোগে শিকারী অন্য বাচ্চাটি ধরে নিয়ে লালন পালন করতে থাকে।

বাচ্চা মানব শিশুর সহিত ভালবাসা সম্প্রীতি রাখে এবং মানুষের সহিত সম্পর্ক গড়ে উঠে। এমনিভাবে সে কর্পুর গাছের সহিত ও সম্পর্ক রাখে। এজন্য সে যখন কর্পুর গাছের পাশে অবস্থান করে। তখন কেউ সে গাছের পাশে যেতে পারেনা।

মানুষ কর্পুর ও বের করতে পারেনা। অতঃপর সে বেশ কয়েক দিনের জন্য বৃক্ষ থেকে পৃথক হয়ে যায়। সে এলাকার জনগণ তার চলে যাওয়ার সংবাদ রাখে। অতএব লোকেরা সুযোগ বুঝে কর্পুর বের াকরে নিয়ে যায়।

বাব্বারের শরয়ী বিধান ঃ

এ জন্তুর গোস্ত হারাম । কারণ সেও ধারালো দাতের সাহায্যে আক্রমণ করে এবং খায়। তাকে হিংস্র প্রাণীর মধ্যে গণ্য করা হয়।

চিকিৎসায় এর উপকারিতা ঃ

বাঘের পিত্ত মাথার রোগ অথবা বক্ষ ব্যধিতে বেশ উপকারী। পিত্তরসে পানি মিশ্রিত করে মাথায় মালিশ করলে এ ধরনের রোগ ভাল হয়। কোন মহিলা যদি তার লজ্জাস্থানে তার পিত্ত রেখে দেয় তাহলে সে গর্ভবর্তী হবেনা। আর যদি গর্ভাবস্তয় এই পিত্ত লজ্জাস্থানে বেধে রাখে তাহলে গর্ভপাত হয়ে যাবে। এর পায়ের গোড়ালী যদি হাতের কব্জিতে বেধে রাখে তাহলে তার যাবতীয় অবসাদ ও ক্লান্তি দূর হয়ে যাবে। যদিও সে প্রত্যহ বিশ ফারসাখ হাটুক না কেন (এক ফরসখ-৩ মাইল) এমনকি ৬০ ফরসখ হলেও ক্লান্তি আসবেনা। কোন কোন

অভিধান বেত্তা লিখেছেন- এক ফরসাখ সমান বারো হাজার কদম। কারো যদি টাকা রোগ হয় তাহলে সে বাঘের চামড়ায় বসলে এই রোগ দূর হয়ে যাবে।

রবিউল আবরার নামক কিতাবে আছে যে, এই প্রণী বড় ধরনের সিংহের মত এবং সাদা হলুদ ও কাল রং হয়ে থাকে। এরিষ্টটল লিখেছেন এ প্রাণী হাবশা দেশে অথ্যন্ত প্রভাবশালী হয়। সম্ভবত এখানে ছাড়া অন্য দেশে খুব কমই দেখা যায়। এর গোস্ত খুব দেরীতে হজম হয়। এর কলিজা খেলে বীরত্ব বাড়ে এর চর্বি পুরুষাঙ্গ কোমরে ও পিঠে মালিশ করণে উপকার দর্শে এবং কণ্ঠ নালীর জন্য উপকার হয়।

الببغاء

(৫৫) তোতা

আভিধানিকদের কেউ কেউ বলেছেন- এর মধ্যে তিনটি ب একত্রি আছে অর্থাৎ শব্দটি ببباء প্রথম এবং তৃতীয় ب তে যবর এবং ২য় ب এ সাকীন। এটি সবুজ রং এর পাখী।

আরবীতে একে درة ও বলে ইবনে ছাময়ানী বলেন যে, ببغاء তে মাত্র ২টি ب প্রথম ب তে যবর এবং ২য় ب তে সাকীন। তোতা পাখীর উপাধি হল। কেহ কেহ বলেন ببغاء উপাধি ইমাম কুজাঈ কে দেয়া হয়েছিল এজন্য তিনি তুতলায়ে কথা বলতেন। তিনি 'ছিল' এর স্থলে ছা রা এর স্থলে গাইন অথবা লাম উচ্চারণ করতেন। পাখিটি কবুতরের মত হয় এর ডাকে সাধ উপভোগ করার জন্য লোকেরা একে পোষে থাকে। যেমনিভাবে ময়ুরের রং রূপ এবং মিষ্টি আওয়াজের জন্য পোষে থাকে।

তোতার বিভিন্ন প্রকার ও বৈশিষ্ট ঃ

এ পাখীটি বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে। কোনটি সাদা, কোনটি সবুজ রংয়ের। ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন যে, খলিফা মা'যিদ্দৌলা ইবনে বুইয়ার খেদমতে একধরণে আশ্চর্য ও দুস্প্রাপ্য তোতা পাখী আনা হয়েছিল। তোটির রং সাদা, ঠোট এবং কোন কাল। এর মাথার ঝুঁটি পেস্তা রং এর। বর্তমানে তোতা খুব একটা দেখা যায়না। তবে সবুজ রং তোতা দেখতে পাওয়া যায়। তোতা উত্তম চরিত্রের। বুদ্ধিমান, তথ্য উদঘাটনে সক্ষম। তোতা সাধারণত বাদশাহ, আমীরগণ তাদের গোপন সংবাদ সংরক্ষনের জন্যও পোষে থাকেন। তোতা নিজের খাদ্য

স্বীয় পায়ের সাহায্যে খেয়ে থাকে। যেমন মানুষ তার খাদ্য হাতে খায়। কোন কোন মানুষ তার শিক্ষা আয়ত্ব করে ।

তোতার অসাধারণ শিক্ষা ঃ

আরাস্তু বলেন, তোতাকে শিক্ষা দেয়ার পন্থা হল, একটি আয়না নিয়ে এর সামনে রাখতে হবে এবং এর ছুরত দেখতে থাকুন। অতঃপর আয়নায় দেখে বার বার বলুন "কথা বল, কথা বল" এবার সেও কথাটি পুনঃরা বৃত্তি করতে থাকবে। এভাবে সে কথা বলা শিখে ফেলবে।

ইবনুল ফকিহা বলেন- আমি রান্জ দ্বীপে অত্যাশ্চর্য ধরনের তোতা পাখি দেখেছি। যা সবুজ, সাদা, হলুদ ছিল এবং নিঃসংকোচ এরা কথা বলছে। আবু ইছহাক আচ্ছানী তোতা পাখীর প্রশংসা গেয়ে বলেন-

انعتها صبيحة مليحة:: ناطقة باللغة الفصيحة

আমি উজ্জ্বল এবং সুন্দর তোতার প্রশাংসা করি যে, পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে কথা বলে।

عدت من الطيار واللسان:: يوهمنى بانها انسان

পাখীর মধ্যে একে গন্য করা হয়, কিন্তু ভাষার কারণে আমার মনে হয় সে মানুষ।

تنهى الى صحبها الاخبارا:: وتكشف الاسرار والاستار

সে তার প্রভূকে সংবাদ দেয়- গোপন কথা এবং রহস্য উম্মোচন করে দেয়।

وبكماء الانهار سميحة:: تعيد ما تسمعه طبيعته

বোকা বটে কিন্তু শুনে। জন্মশ্রুতি কথা বলতে যোগ্যতা রাখে।

زراتك من بلادها البعيدة:: ولاستو طنت عنك كالقعيد

তুমি একে দূর দূরান্তে দেখবে- আবার সে তোমার রক্ষক হিসাবেও কাজ করে।

ضيف قراه الجوز والارز:: والضيف فى اتيانه يعز

সে এমন মেহমান যার খাদ্য আখরোট (ফল বিশেষ) এবং চাউল আর এ

মেহমান আসাতে সম্পদ বৃদ্ধি পায়।

تراها فى منقار ها الخلوقى:: كلؤ لؤ يلقظ بالعقيق

যে জাফরানী ঠোট দ্বারা ঠোকরায় তা কালো রং এর আকিজ পাথরের মুতি মনে হয়।

تنظر فى عينين كالفصين :: فى النور الظلمة بصاصين

তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দ্বারা আলো অন্ধকার সর্বাবস্থায় সে দেখতে পারে

تميس فى حلتها الخضراء:: مثل الفتاةالغدة العذراء

সে তার সবুজ ঝুঁটিতে এমন সুশ্রী অবয়ব যেমন যুবতী মহিলার মত মাধুর্য ভঙ্গিমায় চলা ফেরা করে।

خريدة خدورها الاقفاص:: ليس لها من جسمها خلاص

লজ্জাশীল তোতা পিঞ্জিরায় থাকে, সে বন্দী দশা থেকে মুক্তি পায়না।

فحسبها ومالها من ذنبا:: وانماذاك لفرط الب

আমরা তাকে নিরপরাধ বন্দী করে রাখি, সীমাহীন ভালবাসার কারণেই হয়ত আমরা তা করি।

تلك اللتى قلبى بها مشغوف ك: كنيت عنها واسمها معروف

অথব তা এমন জিনিষ যে কারণে আমি অপব্যায়ী হয়ে গিয়েছি আমি তার নামও উচ্চারণ করিনি যদিও সে প্রসিদ্ধ।

يشرك فيها شاعر الزمان:: الكاتب المعروف بالبيان

যুগের কবি তার প্রশংসায় অংশীদার হয়ে গেল অথচ আমি প্রসিদ্ধ রচনার উপর নিমগ্ন।

ذالك عبد الواحدبن نصر:: تقيه نفسى حادثات الدهر

তিনি আব্দুল ওয়াহেদ বিন নছর যাকে আল্লাহ তায়ালা রাত দিনের বিপদ থেকে রক্ষা করুন। একথা শুনে আবুল ফারজ্ জবাবী কবিতা বলেন-

من نصفى محكم الكتاب ك: شمس العلوم قمر الاداب

কোন্ সে জন যে এই কিতাবের অস্পষ্ট আয়াত বর্ণনা করে যিনি জ্ঞানে গরিমার সূর্য শিখা, শিষ্টাচারের চন্দ্র?

امسى الاصناف العلوم محززا:: وسام ان يلحق لما برزا

এই কিতাব সমস্ত বিদ্যার ভান্ডার জীবন চলার জন্য তা রাজকীয় মোহর স্বরূপ।

وهل يجارى السابق المقصر::او هل يبارى المدرك المغور

ক্ষমা ও বদান্নতা যে কম দেখায় এবং যে বেশী দেখায় উভয় কি সমান মনে কর? অথবা শিশু ও যুবক ব্যক্তির সমকক্ষ মনে কর? সর্বশেষে আবুল ফারজ তোতা পাখীর প্রশংসা করে বলেন-

ذات شعا تحسبه ياقوتا:: لاترضى غير الارزقوتا

বাঁকা ঠোট ধারীকে তুমি ইয়াকুত মনে করছ। সেতো চাউল ব্যতীত আর অন্য কিছু খেতে রাজী হয়না।

كانما الجبكة فى منقاره:: حبابة تطفو على عقارها

শষ্য দানা তার ঠোটে এমন মনে হয় যেমন তার ঠোটে দানা বসে রয়েছে। ইবনে খাল্লেকান ফজল বিন রবিয়ার জীবনীতে লিখেছেন যে আহমদ ইবনে ইউসুফ আল কাতেব এর কৃতঘ্ন ভাই আব্দুল হামিদ এর তোতা পাখী মরে যাওয়াতে এই কবিতা লিখেছেন।

انت تبقى ونحن طرّه فداكا ك: احسن الله ذوالجلال عزاكا

তুমি বেঁচে থাক আমি খুশী থাকি। আল্লাহর নামে তোমার উৎসর্গ মঙ্গল হউক।

فلقد جلّ خطب دهر اتاكا:: بمقادير اتلفت ببغاكا

যুগের যে বিপদাপদে তুমি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছ তা অতি বড়, তোমার তোতা পাখী তা ধ্বংস করে ফেলেছে।

عجبا للمنون كيف انتهاك: وتخطت عبد الحميد اخاك

আশ্চর্য, মৃত্যু কিভাবে এসে গেল এবং তোমার ভাই আব্দুল হামিদের কাছে পৌছে গেল।

كان عبد الحميد اجمل اللموت:: من البيغاء واولىٰ بذاك

মৃত্যুর জন্য আব্দুল হামিদ তোতার সহিত সম্পর্ক রাখত।

شملتنا المصينتان جميعا:: فقد نا هذه وروية ذاك

আমি দুটি বিপদের সহিত একই সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছি। একটিকে অনুমোদন দিয়েছি দ্বিতীয়টির সম্মুখীন হয়েছি। আল্লামা যমাখ শারী (রহ.) বলেন তোতা তার নিজের আওয়াজে এ কথা বলে যে,

ويل لمن كانت الدنيا همه

দুনিয়া অর্জন করা যার উদ্দেশ্য সে ধ্বংস হয়ে যাবে।

শরয়ী হুকুমঃ

"রাফেয়ী" লিখেছেন যে, সঠিক কথা হল তোতার গোস্ত হারাম। এই কথাটাই আচ্ছামিরী আল বাহরী নামক কিতাবে লিখেছেন। তা গোস্ত হারাম হওয়ার কারণ হল ইহা লোংরা। অবশ্য কোন কোন আলেম তার গোস্ত হালাল বলেছেন। কেন না সে পাক পবিত্র জিনিষ খায়। বিষাক্ত প্রাণীর অন্তর্ভুক্ত নয়। আর না সে পায়ে চংগল। সারে অধিকান্ত তোতা মারার বিধান নেই এবং এর প্রতি কোন নিষেধাজ্ঞা ও নেই। ইমামে মুতাওয়াল্লী (রহ.) তার আওয়াজ এবং কথা বার্তায় মানুষের সহিত ভালবাসা সম্প্রীতি রাখার কারণে একে ভাড়ায় খাটানো জায়েজ বলেছেন। ইমাম বাগভী (রহ.) জায়েজ এবং না জায়েজ উভয় ছুরতই বর্ণনা করেছেন । বরং প্রত্যেক প্রাণীই যাদের আওয়াজে মানুষ সমন্ধ রাখে যেমন বুলবুলি ইত্যাদি উভয় ছুরতই লিখেছেন।

চিকিৎসা ক্ষেত্রে তোতার উপকারিতা ঃ

তোতার জিহ্বা খেলে কথার মধ্যে পরিচ্ছন্নতা বাগ্মীতা, মার্ধুযতা, কথার শক্তিতে বীরত্ব সৃষ্টি হয়। তোতার পিত্ত জিহবার ভার দূর করে। তার রক্ত শুকিয়ে পাতলা করে নিক্ষেফ করলে দুই বন্ধুর মধ্যে বৈরীতা সৃষ্টি করে। তোতার মাংস দেরীতে হজম হয়। তবে অন্তরে প্রশান্তি সৃষ্টি করে। বিশেষ করে ফুসফুসের জন্য বিশেষ ফলপ্রদ। তোতার বিষ্ঠা কদর্যতা বিদূরীতে করে। তার বিট কাঁচা সবুজ আঙ্গুরের পানিতে মিশিয়ে চোখে সুরমা ব্যবহার করলে দৃষ্টি শক্তি বৃদ্ধি এবং চোখ বেদনার চেচামেচি থেকে নিরাপদ থাকায় যায়। যদি কোন শিশু তোতলামি করে তাহলে তোতার গোস্ত খেলে তোতলামী দূর হয়ে যাবে।

স্বপ্নের তা'বীর ঃ

স্বপ্নে তোতা পাখী দেখা অমঙ্গল এবং মিথ্যাবাদীর লক্ষন। কোন কোন ব্যাখ্যা কারক লিখেছেন যে, দার্শনিক হওয়ার লক্ষন।

الببع

(৫৬) জলজ পাখী

এর আলোচনা باب الطاء তে বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করা হবে।

البجع

(৫৭) লম্বাঠোট বিশিষ্ট পাখী বিশেষ

এর আলোচনা باب الحاء তে বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করা হবে। আরবী কবি বিস্ময় কর কবিতা বলেছেন ।

ماطائر فى قلبه :: يلوح للناس عجب

কোন পাখী এমন নেই যার অন্তরে মানুষের জন্য বিস্ময়কর বস্তু প্রকাশ হয়না।

منقاره فى بطنه :: والعين منه فى الذنب

এর ঠোট পেটে এবং চোখ লেজে।

البحزج

(৫৮) নীল গাইয়ের বাচ্চা

البحزج নীল গাভীর বাছুর কে বলে।

البخاق

(৫৯) পুরুষ নেকড়ে

غراب এর ওজনে بخاق নর ভেড়া।

البخت

(৬০) এক প্রকারের উট

بختى এক প্রকার উটকে বলা হয়। কেউ কেউ লিখেছেন, আরবী বংশোদ্ভোত পুরুষ উটকে بختى এবং স্ত্রী উটকে بختية বলে। এর বহু বচন بخاتى আসে। جمع الجمع হওয়ার কারণে তা منصرف غيرইয়া অক্ষর কে

تخفيف এর সহিত بخاتى ও পড়া যায়।

ইমাম জাওহারী এবং ইবনুচ্ছাকীত বলেন- যে ছি গাটি بخاتى এর ওজনে হয় আর তার এক বচন যদি কঠিন হয় তাহলে এর বহু বচনে তাশদীদ এবং তাখফীফ উভয়ই পড়া যায়। যেমন ঃ

عوارى ، سوارى، علالى ، ادانى ، اثافى، كراسى، مهارى ، (الصحاح والاصلاح)

ইবনুচ্ছাকীত বলেন যে- الاثفية এক বচন এর বহু বচন اثافى হয়। এমন তিন পদকে যাদের কে খাদ্য কাকানোর সময় হাড়ি পাতিল রাখার জন্য রাখা হয়। শব্দটি আরবী ভাষায় ও ব্যবহৃত হয়। বলাহয়ে থাকে ঃ

رماه الله لثالثة (আল্লাহ তায়ালা তাকে পাহাড় বানিয়ে দিন)।

একারণে মানুষের প্রয়োজনের সময় দু'পা ব্যতীত অথবা তৃতীয় কোন কিছু না পায় তথা তখন সে পাহাড়কে তৃতীয় পা বানিয়ে নেয়। পরে অবশ্য الاثانى ثالثة উদ্দেশ্য পাহাড় লওয়া শুরু করা।

بخاتى এমন উটকে বলে যার ঘাড় লম্বা হয়।

জিনাদা বিন উমায়্যা বলেন, একদা আমরা কয়েকজন লোক بسربن ارطاة এর সাথে সাগর ভ্রমনে ছিলাম। আমাদের সঙ্গে একজন চোর কে নেওয়া হল যে কিনা بختى উটচুরী করে ছিল। بسربن ارطاة বলেন আমি নবী করিম (স.) এর কাছ থেকে শুনেছি যে নবী করিম (স.) এরশাদ ফরমান ভ্রমনে হাত কাট না। যদি এই অসুবিদা না হত তাহলে অবশ্যই আমি তার হাত কেটে ফেলতাম।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন ঃ

নবী করীম (স.) সে মেয়ে লোকের ব্যপারে প্রকাশ্য বলেছেন যে শেষ যমানায় তার মাথা بختى উটের উচু হাড়ের ন্যায় হবে। এবং সে জান্নাতের গন্ধ ও পাবেনা। অথচ জান্নাতের সুঘ্রান ৫০০ বছরের দূরত্ব থেকে পাওয়া যায়।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন ঃ

নবী করিম (স.) এরশাদ করেন এই উম্মতের শেষযুগে এমন লোক জন্ম গ্রহন করবে যে হিংস্র প্রাণীর পিঠে আরোহন করবে। এমন কি মসজিদের

দরজা পর্যন্ত চলে আসবে। তাদের মহিলাদের পোষাক থাকবে অথচ তারা হবে উলঙ্গ। এদের মাথায় হালকা পাতলা উটের প্রতি অভিশম্পাত করবে। কারণ সে অভিশপ্ত। মুস্তাদরাক।

উছমান ইবনে মালেক (রা.) বলেন ঃ

নবী করিম (স.) এরশাদ ফরমান বেহেস্তে بـخـتى উটের মত পাখী হবে। আবু বকর (রা.) বলেন 'হে আল্লাহর নবী (স.) সে পাখী গুলোথি নম্র এবং মনোলোভা হবে? নবী করিম (স.) বলেন ঃ এদের ও বেশী মনোলোভা হবে যারা এদের কে খাবে। শোন আবু বকর (রা.) তুমিও কিন্তু সে খাদকদের অন্তর্ভূক্ত হবে।

البدنة

(৬১) হজ্জে কোরবানীর জন্তু

হজ্জে কোরবানী করার জন্তুকে البـــدنة বলা হয়। এমন গাভী বা উটকে বলে থাকে কোরবানী করার জন্য মক্কায় নিয়ে যাওয়া হয়। শব্দটি একবচন। এর বহু বচন بـــــدن ، دال অক্ষরে সাকীন এবং পেশ হয় دالকে সাকীনের সাথে পড়তে হবে।

ইমাম জাওহারী লিখেছেন। তাকে এজন্য بـــــدنة বলাহয় যে, সে সূ-স্বাস্থের অধিকারী। ইমাম নববী (রহ.) বলেন بـــدنة এমন উটকে বলে যে কোরবানীর উপযুক্ত হয়েছে তাইতো নর বা নারী হউক। সম্ভবত তা فـــقـهـــاء কেরামের পারিভাষিক অর্থ মোতাবেক। আর অভিধান বিশারদ গনের নিকটبـــــدنةর সম্বন্ধ হয় গাভী বা উট উভয়ের বেলায়। আযহারী (রহ.) বলেন بـــدنة হল গাভী, উট, বকরী ইত্যাদি। তাকে بـــدنة এজন্য বলা হয় যে সে হয় সুস্থ এবং বলবান, শক্তিশালী, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে بـــــدنة শব্দটি উটের জন্য প্রযোজ্য নবী করিম (স.) হাদীসে ব্যবহার করেছেন।

সুতরাং আবু হোরায়রা (রা.)বলেন ঃ

ان النبى ﷺ قال من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فى الساعة الاولى فكانما قرب بدنة ومن راح فى الساعة الثانية فكانما قرب بقرة ومن راح فى الساعة الثالثة فكانما قرب ومن راح فى الساعة الرابعة فكانما قرب دجاجة ومن راح فى الساعة الخامسة فكانما قرب بيضة.

নবী করিম (স.) এরশাদ ফরমান ঃ

যে ব্যক্তি জুমা বারে গোসল করল অতঃপর সে প্রথম ধাপেই মসজিদের জন্য চলেগেল সে যেন একটি উট কোরবানী করল, অতঃপর দ্বিতীয় ধাপে গেলে সে যেন একটি গাভী কোরবানী করল, তৃতীয় ধাপে গেলে সে যেন একটি শিং ওয়ালা দুম্বা কোরবানী করল, ৪র্থ ধাপে গেলে সে যেন একটি মুরগী জবাই করল অতঃপর যে ব্যক্তি ৫ম ধাপে গের সে যেন একটি ডিম উৎসর্গ করল। (মুসলিম)

অন্য একটি হাদিছে এরকম শব্দ বর্ণিত রয়েছে-

وفى الساعة الرابعة بطة وفى الخامسة دجاجة وفى الساعسة بيضة.

অতঃপর ৪র্থ ধাপে গেলে একটি হাস কোরবানীর পূন্য অর্জন করল, ৫ম ধাপে গেলে সে যেন মূরগী এবং ৬ষ্ঠ ধাপে গেলে একটি ডিম উৎসর্গের ছোয়াব অর্জন করল। (আহমদ)

শিং বিশিষ্ঠ ভেড়াকে এজন্য বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সে শিং এর কারণে মন ভুলানো মনে হয়।

بـــدنة এর বহু বচন بـــدن হয়। সুরাং পবিত্র ক্বোরআনে আল্লাহ পাক এরশাদ ফরমান ঃ

والبدنة جعلنا ها لكم من شعائر الله (الحج)

আর কাবার জন্য উৎসর্গীকৃত্য আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর অন্যতম নিদর্শন করেছি। (হজ্জ-৩৬)

অর্থাৎ আমি সে দিনের নিদর্শন বানিয়েছি যাতে তোমাদের মঙ্গল হয়। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন এই মঙ্গল দ্বারা উদ্দেশ্য হলো দুনিয়ার কল্যান এবং পরকালের প্রতিদান ও পূন্য। জ্ঞনীগন বলেন যে, ছাফওয়ান ইবনে ছালীম হজ্জ করতে চলে গেলেন তখন তার হাতে মাত্র ৭টি আশরাফী ছিল। তিনি এর দ্বারা একাট بـــدنة ক্রয় করলেন। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন পবিত্র ক্বোরআনে বর্ণিত আছে-

والبدنة جعلنا ها لكم من شعائر الله.(الحج)

আর হজ্জ করার জন্য উৎসর্গী কৃত উটকে আমি তোমাদের জন্য অন্যতম নির্দশন করেছি।

সর্ব প্রথম উৎসর্গ কারী ঃ

আল্লাহর ঘরের জন্য যে ব্যক্তি বর্সপ্রথম بـــدنة উৎসর্গ করেছেন তিনি হলেন ইলিয়াস ইবনে মুদার এবং তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি বাইতুল্লাহ, (খানায়ে বা'বা) ডুবে যাওয়া এবং বিধ্বস্ত হওয়ার পর মাকামে ইব্রাহীম খোঁজ করে মানুষের জন্য সীমানা নির্ধারন করে দেন।

এটি সম্ভবত হযরত নূহ (আ.) এর যুগের ঘটনা । আর ইলিয়াসই প্রথম ব্যক্তি যিনি এ ব্যাপারে পূর্ণ সফলতা লাভ করেন এবং তিনি বায়তুল্লাহকে এক প্রান্তে স্থাপন করেন। এজন্য আরব বাসী ইলিয়াস ইবনে মুদারের শেষ জীবন পর্যন্ত সম্মন করতে থাকে। ইলিয়াস ইবনে মুদারের ইন্তেকাল হলে খিন্দাক নামে তার স্ত্রী অনেক ও অনুশোচনা করেন। এমনকি তিনি নিজের জন্য সুগন্ধি ব্যবহার করা হারাম করে দেন। এবং অন্যত্র আর বিবাহ করেন নি।

ঐতিহাসিকগন লিখেছেন যে, তার স্ত্রী এই শপথ করেন যে, তিনি শহরে ইন্তেকাল করলে সে শহরে তিনি বসবাস করবেন না এবং অন্য কোন ঘরও নির্মান করবেন না। এমনি তিনি বসবাস করতে ছিলেন। শোক এবং অনুতাপে দগ্ধ হয়ে বৃহস্পতিবার তিনি ইন্তেকাল করেন। ইতিহাসে এও সূর্যোদয় পর্যন্ত ক্রন্দন করতে থাকবেন।

ইমাম সায়লভী বলেন হাদীছে বর্ণিত রয়েছে যেঃ নবী করিম (স.) এরশাদ ফরমান ইলিয়াসকে মন্দ বলোনা। কারণ সে মুমিন ছিল। জ্ঞানীগন লিখেছেন হজ্জের স্থানে ইলিয়াস ইবনে মুদাবের সমাধি থেকে নবী করিম (স.) এর তালবিয়ার আওয়াজ আসত।

মুসা বিন সুলায়মান আল হাজলী বলেন ঃ

আমি এবং সিনান উভয়ই ওমরাহ করার জন্য যাত্রা করলাম। সিনানের সাথে ক্বোরবানীর একটি উট ছিল। যাকে সিনান ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ করে উটটি রাস্তায় আটকে গেল। এ অবস্থা দেখে আমি দুঃখিত হলাম তারপরও সে থেকেই লেল। আমরা ইবনে আব্বাস (রা.) এর নিকট ব্যাপারটি জিজ্ঞেস করার জন্য আসলাম । তিনি বল্লেন তোমরা কিন্তু অতি সাবধানী এবং বিজ্ঞ ব্যাক্তি পেয়ছ। এখন শুন, নবী কর্রিম (স.) একদা ১৬টি উট এক ব্যক্তির সঙ্গে প্রেরণ করেন এবং সে চলে গেল। এবং জিজ্ঞেস করল হে আল্লাহর নবী! এদের মধ্যে

কোন একটি যদি বসে যায় তাহলে আমি কি করব? নবী করিম (স.) এরশাদ ফরমান যে, তাকে নহর (জবাই) করে দাও এবং তার গলার জুতা তার রক্তে রঞ্জিত করে তার কুঁজে ছাপ লাগিয়ে দাও এবং এ থেকে তুমি খাবেনা । আর না তোমার কোন সাথী ।(মুসলিম)

هدى সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা باب الهاء এ আসবে।

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) বলেন, "নবী করিম (স.) দেখলেন যে হজ্জের দিন এক ব্যক্তি কোরবানীর উট টেনে ধরে রয়েছে। নবী করিম (স.) সে ব্যক্তিকে বল্লেন তুমি এর উপর সওয়ার হয়ে যাও। লোকটি বল্ল হে আল্লাহর নবী! এতো কোরবানীর উট, নবী করিম (স.) বল্লেন এতে সাওয়ার হয়ে যাও। লোকটি বল্ল এতো কোরবাণীর উট, নবী (স.) দ্বিতীয় বার এবং তৃতীয় বার বল্লেন তোমার অমঙ্গল হইক, এতে সয়োর হয়ে যাও । (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাই) ويلك اركبها ويلك اركبها

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন ঃ নবী করিম (স.) এরশাদ করেন তোমরা যখন কোরবাণীর উটকে নহর করতে চাও তখন একে দাড় করে । অতঃপর আল্লাহু আকবার বলে اللهم منك وليك বলে নহর কর। এমনি ভাবে কোরবানীর দিন সমূহে করবে।

যিয়াদ বিন যুবাইর (রা.) বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর কে দেখেছি যে, তিনি বললেন উটটিকে টউঠাও এবং পা বেধে ফেল। (অতঃপর নহর কর) ইহ্যতো নবী করিম (স.) এর সুন্নত। (বুখারী, মুসলিম)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ফারত (রা.) বলেন, নবী করিম (স.) এরশাদ ফরমান আল্লাহ তায়ালার কাছে সবচেয়ে উত্তম দিন হল নহরের দিন। এরপর জিলহজ্জ মাসের ১১ তারিখ যে দিন হাজীগন মিনায় অবস্থান করেন। নবী করিম (স.) এর নিকট কোরবানীর ৫টি বা ৬টি উট ছিল। যেগুলোকে নহর করার জন্য নিয়ে যাচ্ছিলেন। লোকেরা নবী (স.) এর পাশে চলে এলেন (তিনি ভাবতে থাকেন) এগুলোর মধ্যে কোনটি সর্ব প্রথম নহর করবেন। (আহমদ, আবুদাউদ)

বুদনার উপর সাওয়ার হওয়া যাবে কি না?

হযরত ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, বিশেষ প্রয়োজনের সময় বুদনাহর উপর আরোহন করা জায়েজ। প্রয়োজন ব্যতীত তার উপর সওয়ার হওয়া

জায়েজ নহে। বুদনাহর উপর আরোহন করা ততক্ষন জায়েজ যতক্ষন তার কষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক, ইবনে মুনজির এবং বলেন বুদনাহর উপর আরোহন করা প্রয়োজন ব্যতীতও জায়েজ। এ মতের প্রবক্তা হযরত ওরওয়াহ ইবনে যুবাইর, ইছহাক ইবনে রাহোয়িয়াহ। ইমাম আজম আবু হানিফা (রহ.) বলেন- যদি বুদনাহ ব্যতীত আর কোন বাহন না থাকেতাহলে তার উপর আরোহন করা জায়েজ। আল কাজী কোন জ্ঞানীর কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এতে সওয়ার হওয়া যায়।

জমহুর উলামায়ে কেবায়ের বলেন ঃ

ان النبى ﷺ اهدى ولم يركب هدية ولم يأمر الناس بركوب الهدايا۔

নবী করিম (স.) হাদীছ জন্তু নিয়ে গেছেন অথচ তার উপর সওয়ার হননি। আর না তিনি হাদীর জন্তু উপর সওয়ার হতে অনুমতি প্রদান করেছেন। ইতিপূর্বে নবী করিম (স.) বলেছেন।

মূলতঃ একথা সে লোকদের জন্য আসলেই ক্ষতির মধ্যে নিপতিত রয়েছে। কারণ সে মুখাপেক্ষী। এবং সে বিপদে লিপ্ত রয়েছে। কেহ বলেছেন নবী করিম (স.) এর পবিত্র যবান থেকে তা অনিচ্ছা সত্বে বের হয়েছে এবং তা তিনি প্রথমে বিষয় বস্তু লক্ষ করে ব্যবহার করেছেন। যেমন আরবীগন বলেনঃ

لاام له ۔لا اب له ۔تربت ۔قاتله الله۔

এসমস্ত কথা অপবাদ স্বরূপ হয়ে থাকে। এর অর্থ হল তার মা নেই, তার পিতা নেই, তোমার হস্ত ধুলামলীন হউক। আল্লাহ তাকে হত্যা করুন। অনুরূপ অন্যান্য কথাও।

البذج

(৬২) মেষ এর বাচ্চা

البـذج মেষ শাবক কে বলা হয়। এটি বকরীর বাচ্চার ন্যায় হয়ে থাকে। এর বহু বচর بذجان। কবি বলেন ঃ

قدهلكت جارتنا من الهمج :: وان تجع تأكل عتودا اوبذج

আমাদের প্রতিবেশিনী যে নীচু সম্প্রদায়ের ছিল সে মরেগেছে। যখন তার ক্ষুধা লাগত তখনই সে বকরীর বাচ্চা ধরে খেত।

ইমাম জওয়ারী (স.) বলেন هـمـج এর শব্দ জীবনোপ করণে বা সম্পদ আহরনের ব্যপারে বড় ধরনের চেষ্ঠা করাকে বলে। হাদীছে রয়েছেঃ

بخرج رجل من النار كانه بذج

দোযখ থেকে এক ব্যক্তিকে বের করা হবে যে বকরীর বাচ্চার মত হবে।

হযরত আনাস (রা.) থেকে আরেকটি হাদীছ বর্ণিত আছে যে, তিনি নবী করিম (স.) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করিম (স.) এরশাদ ফরমান কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে আনা হবে সে অপমানের কারণে মেষের বাচ্চার মত হবে। সুতরাং তাকে আল্লাহ তায়ালার সম্মুখে দাড় করানো হবে। আল্লাহ তায়ালা তাকে বলবেন আমি তোমাকে পাঠিয়েছিলাম এবং আমি তোমাকে দয়াকরে প্রতি পালন করেছিলাম। তোমাকে নিয়মত দ্বারা ভরপুর করে ছিলাম । এখন বল তুমি কি করে এসেছ? সে বলবে হে আল্লাহ আমি ধন সম্পদ জমা করেছি তা বাড়িয়েছি আর অধিকাংশ মালামাল আমি ছেড়ে এসেছি। এখন আবার আমাকে জগতে পাঠিয়ে দিন। আল্লাহ তায়ালা বলবেন আচ্ছা তুমি যা কিছু করে অগ্রে প্রেরন করেছ তা ধোকা। তখন সে বান্দা এমন ভাবে বের হয়ে আসবে যে সে যেন কোন ভাল কাজই করেনি। সুতরাং তাকে দোযখের রাস্তা দেখিয়ে দেওয়া হবে। (ইবনে মুবারক)

এ হাদীছ ইসমাইল ইবনে মুসলিম হাসান এবং কাতাদাহ থেকে বর্ণনা করেছেন। আবুবকর ইবনে আরাবী মালেখী ও তার কিতাব سراج المريدين এ উল্লেখ করেছেন। তারা তাও লিখেছেন যে হাদিছ খানা ছহীহ এবং হাসান মুরসালের অন্তর্ভূক্ত। আর হাফিজ মানজারী ترغيب وترهيب এ লিখেছেন যে হাদীছ খানা ইসমাইল ইবনে মুসলিম মক্কী থেকে বর্ণনা করেছেন।

হাদীছে মেষ শাবকের তুলনা এজন্য করা হয়েছে যে, এতে অপমান ও অবজ্ঞা উদ্দেশ্যে, হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) বলেন নবী করিম (স.) এরশাদ ফরমান "কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তি কে আনা হবে, সে অপমান ও অবজ্ঞার কারণে মেষের বাচ্চার মত হয়ে যাবে। আল্লাহ পাক তাকে বলবেন ওহে আদম সন্তান! আমি উত্তম বন্টন কারীদের বন্টনকারী। তুমি এই কাজের পুরুস্কার গ্রহন কর, যা তুমি অন্যের উদ্দেশ্য করেছ।এ কারণে এগুলোরও প্রতিফল পাবে। যার জন্য তুমি করেছিলে। بذج ফার্সী শব্দ, অপর শব্দটি معرب

করে নেয়া হয়েছে।

কোন একজন বলেছেন যে, এক গ্রাম্য লোককে কাবায় কোন পর্দার পাশে দেখা গেল যে, সে বলতেছে-

اللهم امتنى ميتة ابى خارجة

"হে আল্লাহ! আবু খারেজার মৃত্যুর মত আমাকে মৃত্যু দাও।"

গ্রাম্য লোকটিকে জিজ্ঞেস করা হল যে, আবু খারেজার মৃত্যু কি ভাবে হয়েছে? সে উত্তর দিল, সে একটি মেষ শাবক জবাই করে বেয়ে ফেলে উজ্জল পাত্রে সে পানি পান করল, অতঃপর প্রখর রোদ্রে গিয়ে শয়ন করল। সে তৃপ্তি সহকারে এবং উত্তপ্তাবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষা করল। (যে পাত্রে নবীজ(অর্থাৎ খেজুরের কাচা রস) বানানো হয) তাকে উজ্জল পাত্র বলে।

উদাহরণ ঃ

আরবগন বলে থাকেন - فلان اذل من بذل

"অমুক মেষের বাচ্চার চেয়েও বেশী দূর্বল এবং অপমানিত।"

মেষ শাবক গৃহ পালিত পশুর বাচ্চার চেয়ে বেশী দুর্বল হয়।

البراق

(৬৩) বুরাক্ব

বুরাক্ব এমন একটি প্রাণী যার উপর নবী করিম (স.) শবে মেরাজে সওয়ার হয়েছিলেন। জ্ঞানীগন বলেছেন নবী (স.) এর পূর্বে ও অন্যান্য নবী রাসুলগন বুরাক্বে আরোহন করেছিলেন। البراق শব্দটি برق থেকে বের হয়েছি, যার অর্থ-বিদ্যুৎ (বিজলী) যে বিদ্যুৎ মেঘের মাঝে চলতে দেখা যায়। যেমন পুলছিরত অতিক্রমকারীদের ব্যাপারে পবিত্র হাদিছে বর্ণিত আছে যে, তার বিদ্যুতাকারে পার হয়ে যাবে। আবার কেহ দ্রুতগামী সওয়ারীর মত পার হয়ে যাবে। আবার কেহ দ্রুতগামী ঘোড়ার মত পার হয়ে যাবে। বুরাক্বের ব্যাপারে মত পর্থক্য রয়েছে। তাহলে ইহা কি? সত্যি বলতে বুরাক হল একটি প্রাণী যা কচ্চর থেকে ছোট, গাধা থেকে বড়। সাদা রঙ্গের প্রাণী। ইহা এতই দ্রুত গতি সম্পন্ন যে, তার কদম যেখানে পড়ে সেখানে তার দৃষ্টি পড়ে পতিত হয়। এজন্য প্রসিদ্ধ কথা হল আকাশ থেকে যমীন পর্যন্ত যে দূরত্ব তা মাত্র এক কদমেই অতিক্রম

করতে পারে। অতঃপর মাত্র সাত কদমে সাত আসমান অতিক্রম করে ছিল। এর কারণে কোন কোন লোক উলামাদের এবক্তব্য প্রত্যাখ্যান করে বলেন যে, রানী বিলকীসের সিংহাসনকে চোখের পলকে উপস্থিত করা হয়েছিল তা ভুল এবং অসম্ভব ব্যাপার। কারো মতে বুরাক্ব কোন প্রাণী নয়। এর কোন অস্তিত্ব নেই। শুধু শবে মে'রাজ তার অবয়ব বানানো হয়। যারা বলেন এ বিশাল দুরত্ব এত দ্রুত অতিক্রম করা কল্পনাতীত। তাদের জন্য পূর্বোক্ত আলোচনাই যথেষ্ট।

ইমাম সোহাইলী বলেন- নবী করিম (স.) যখন বুরাক্বে আরোহন করলেন তখন সে হট করতে লাগল। জিব্রাইল (আ.) বুরাককে প্রশ্ন করলেন "হে বুরাক্ব! তুমি এমন সময় লজ্জা বোধ করছ যখন আল্লাহ তায়ালার নিকট মুহাম্মদ (স.) এর মত কোন মানুষ সম্মানীত নয়। যিনি তোমার উপর আরোহী হয়েছেন"।

ইমাম ইবনে বাত্তাল (রহ.) এই প্রশ্নের ব্যাপারে বলেন যে, কেননা আম্বিয়া (আ.) সওয়ার হয়ে অনেক দিন অতিবাহিত হয়েছিলেন । হযরত ঈসা (আ.) এবং হযরত মুহাম্মদ (স.) এর মাঝখান থেকে একটি একটি বিরাট সময় অতিবাহিত হয়েছিল সে জন্য হযরত জিব্রাইল (আ.) এই প্রশ্নটি করে ছিলেন।

ইমাম নববী (রা.) যাবিদী এবং উক্ত কিতাবের রচয়িতা আল্লামা কামাল উদ্দিন দামিরী বলেন- বুরাক্ব হল এমন প্রাণী যার উপর আম্বিয়া (আ.) সওয়ার হতেন কিন্তু ইমাম নববী তাও বলেছেন একথা দাবী ঠিক হবে না যে, ইতি পূর্বে আম্বিয়া (আ.) সওয়ার হওয়ার ধারাবাহিকতার কোন হাদীছ ছহীহ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

আল মুক্তাফীর রচয়িতা বলেন যে, বুরাক্ব কচ্চরের আকৃতি হওয়ার উদ্দেশ্য হল যে, মানুষের মধ্যে এ ধারনা সৃষ্টি হউক যে, তার উপর নবী করিম (স.) এর সাওয়ার হওয়া নিরাপত্তার জন্য ছিল, যুদ্ধ করার জন্য নয়, যা ভয়-ভীতিতে নিপাতিত হওয়ার জন্য নয়। অথবা একথা বলা উদ্দেশ্য যে, নবী করিম (স.) এত দীর্ঘ ভ্রমন অত্যাশ্চর্য এবং দুস্প্রাপ্য অনুমানে এত দ্রুত অতিক্রম করা যে, এ ধরনের আকৃতির স্বাক্ষ না দেয়।

একটি সন্দেহ ও তার নিরসন ঃ

কেউ যদি বলে যে, নবী করিম (স.) যুদ্ধে কেন খচ্চরের পিঠে আরোহন

করেছিলেন? এর নিরসনের বলা যায় এই যে, যুদ্ধে ঘোড়ায় চড়া দরকার তবে খচ্চরের উপর আরোহন করা অধিকতর নিরাপত্তার দিকে ঈঙ্গিত করা। যা উপরে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু যুদ্ধের ময়দানে নবী করিম (স.) এর খচ্চরের উপর আরোহন করা বীরত্ব এবং বাহদুরী দেখানোর উদ্দেশ্যে ছিল। উলামায়ে কেরাম তাও লিখেছেন যে, বুরাক ছিল সাদা সংঙ্গের চেয়ে ভাল মনে হত।

শবে মেরাজে হযরত জিব্রাঈল (আ.) নবী করিম (স.) এর সাথে সওয়ার হয়েছিলেন কিনা?

মেরাজ রজনীতে হযরত জিব্রাঈল নবী করিম (স.) এর সহিত সওয়ার হয়েছিলেন কিনা, এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরামদের মধ্যে যথেষ্ট মত পার্থক্য রয়েছে।

কারো কারো মতে নবী (স.) এর সাথে হযরত জিব্রাঈল (আ.) যথারীতি তার পেছনে সওয়ার হয়েছিলেন। আলমুক্বতাফী কিতাবের লিখক বলেন, আমার মতে হযরত জিব্রাঈল নবী করিম (স.) এর সাথে সওয়ার হন নি। কারণ মে'রাজ রজনীর বৈশিষ্ট শুধু নবী মুহাম্মদ (স.) এর জন্য নির্ধারিত ছিল। কিন্তু এক বর্ণনায় আছে যে, হযরত ইব্রাহীম (আ.) তার পুত্র ইসমাইল (আ.) এর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য বুরাকে আরোহী হয়ে গিয়ে ছিলেন, আবার হযরত ইব্রাহীম (আ.) ও ইসমাঈল (আ.) উভয়েই বুরাকে সওয়ার হয়েছিলেন। এমনিভাবে যখন হযরত ইব্রাহিম (আ.) মা-ছেলেকে বায়তুল্লাহর নিকটবর্তী স্থানে ফেলে দিয়ে ছিলেন- সেখান থেকে তিনি বুরাকে আরোহন করে হিজরত করে ছিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ বলেন -নবী করিম (স.) এরশাদ ফরমান- "যখন বুরাক আনা হল তখন আমি হযরত জিব্রাইল (আ.) এর পিছনে আরোহন করলাম। " (মুস্তাদরেক) আবার সামনে গিয়ে বর্ণনায় আবু জামরাহ মাইমুনাহ আল আওয়ার পৃথক হয়ে গিয়েছেন।

উম্মুল মুমিনীন হযরত ফাতেমা (রা.) এর মর্যাদা ঃ

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, নবী করিম (স.) এরশাদ ফরমান, কিয়ামতের দিন সমস্ত নবীগন চতুস্পদ জন্তুর উপর আরোহন করে উঠবেন, এতে করে তিনি তার কওমের মুমিনদের পূর্ণ হক আদায় করবেন। কিন্তু হযরত ছালেহ (আ.) তার উটের উচ্চতায় আরোহন করে উঠবেন। আর আমি মুহাম্মদ

(স.) বুরাকের উপর আরোহন করে উঠব। যার পা চুড়ান্ত সীমা পর্যন্ত দৃষ্টি গোচর হবে। আর ফাতেমা থাকবে আমার সম্মুখে। (আল-হাদীছ)

আবুল কাশেম ইসমাইল ইবনে মুহাম্মদ আল ইসফাহানী বলেন যে, যদি কোন ব্যক্তি বলেন যে, নবী করিম (স.) মে'রাজ রজনীতে বুরাক দ্বারা গমন করেছিলেন আবার তার দ্বারা প্রত্যাগমন করেননি। তাহলে এর জবাব হল, নবী করিম (স.) তার মহত্ব, শ্রেষ্ঠত্বের কারণে নেয়া হয়েছিল। কিন্তু বুরাক দ্বারা তিনি জগতে আসেননি। তাহলে এর বুঝতে হবে, এতে আল্লাহ্ পাকের মহাশক্তির ইঙ্গিত ছিল। কোন কোন বিজ্ঞ মনিষী লিখেছেন যে, বুরাকের সাহায্যে নবী করিম (স.) মে'রাজে গমন এবং এর সাহায্যেই জগতে প্রত্যাগমনেরও প্রমান বহন করে। যেন পবিত্র কুরআনে গরমের সময়ে কাপড়ের সাহায্যে রক্ষা পাওয়ার উল্লেখ আছে, অথচ ভাল মন্দের উল্লেখ আল্লাহ্ পাকের হাতে। কিন্তু মোদ্দাকথা, ঠান্ডা থেকে বাচার এবং উত্তম পন্থায় মন্দ থেকে বাচার কথাও বুঝে আসে।

وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر ـ(نحل)

"আল্লাহ্ পাক তোমাদের জন্য জামা বানালেন যার সাহয্যে তোমরা গরম থেকে বাচতে পার। "

بيده الخير ـ(كتاب الحجة) "তার হাতে ভাল মন্দের মীমাংসা।"

হযরত হুযায়ফা (রা.) বলেন, নবী করিম (স.) কিয়ামতের দিনও এতে আরোহন করবেন। কিন্তু অন্য কোন নবী এতে আরোহন করবেন না।

হাকিম এর বর্ণনা, যায়েদ বিন আমর বলেন -নবী করিম (স.) এরশাদ ফরমান, "আমি আমার হাউজ থেকে কিয়ামতের দিন পান করব এবং সে নবীও সন্তুষ্ট হবেন যিনি আমাকে ডাকবে আল্লাহ্ পাক হযরত ছালেহ (আ.) এর উটনীকে তার জন্য উঠাবেন। যার কাছ থেকে তিনি শুধু দুধ পান করবেন, সে মুমিনও সন্তুষ্ট হবেন যে তার উপর ইমান এনেছে। অতঃপর তিনি এতে আরোহন করবেন এবং এর সাহায্যে তিনি গন্তব্য স্থানে পৌছে যাবেন। এবং উটনী ছটফট করতে থাকবে। তখন এক ব্যক্তি তাঁর নিকট প্রশ্ন করবেন, হে আল্লাহর নবী! (স.) সে দিন আপনি عضباء (নবী (সা.) এর উটনীর নাম) এর উপর সাওয়ার হবেন? নবী (স.) বল্লেন এর উপর আমার মেয়ে ফাতেমা আরোহন করে হাশরের মাঠে উপস্থিত হবে। আর আমার হাশর হবে বুরাকের সহিত। যা আমার

বিশেষত ইহা অন্য কোন নবীর নয়। (رواية السبتى فى الشفاء)

মে'রাজের ঘটনা কোন দিন সংগঠিত হয়েছিল? এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের মতভেদ রয়েছে। ইবনে আছির বলেন আমর মতে সত্য হল ২৭ শে রবিউল আউয়াল সোম বার, হিজরতের এক বছর পূর্বে তা সংগঠিত হয়েছিল। ইমাম মুসলিম (রহঃ) ও মুসলিম শরীফ এর শরাহতে উল্লেখ করেছেন। ইমাম নববী (রা.) তার ফতোয়াত উল্লেখ করেছেন যে তা ছিল রবিউসানী মাসে। সিয়রুর রাওজাহ নামক কিতাবে মেরাজের ঘটনা রজব মাসে হয়েছে বলে উল্লেখ রয়েছে। আর তা সংগঠিত হয় রাতে। নবী করিম (স.) কে রাতের বেলায় মেরাজ করানো হয়েছে যাতে করে বাদশাহদের সহিত তার সঙ্গদের রাত এবং দিনের পার্থক্য প্রকাশ হয়ে যায়। এ জন্য বিশেষ করে রাতে সম মনাদের বৈঠক হয়।

নবী করিম (স.) এর সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত:

ইতিহাসবিদগণ লিখেছেন, নবী করিম (স.) আ'মুলফিল অর্থাৎ হস্তি বছর অর্থাৎ ইয়ামনের বাদশাহ আবরাহা কর্তৃক কা'বা ঘর আক্রমনের বছর জন্ম গ্রহন করেন। তিনি বনু সা'দ গোত্রে পাঁচ বছর লালিত পালিত হন। মা ইন্তেকাল করেন আবওয়া নামক স্থানে। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ছয় বছর। মায়ের ইন্তেকালের পর তার লালন পালনের দায়িত্ব বর্তায় দাদা আব্দুল মোত্তালিবের উপর। কিছু কাল পর দাদাও ইন্তেকাল করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৮ বছর। নবী (স.) এর লালন পালনের দায়িত্ব বর্তায় চাচা আবু তালেবের উপর। তিনি চাচার সাথে সিরিয়া ভ্রমনে যান। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ১২ বছর।

২৫ বছর বয়সে তিনি খাদিজার পক্ষ থেকে বাণিজ্যের জন্য বের হন। এ বছরই তিনি বিবি খাদিজাকে জীবনসঙ্গীনী রূপে গ্রহণ করেন অর্থাৎ বিয়ে করনে।

৩৫ বছর বয়সে কুরাইশরা কা'বা ঘরের সংস্কারের পরিকল্পনার ক্ষেত্রে নবী করিম (স.) কে মীমাংসাকারী নিযুক্ত করে ।

৪০ বছর বয়সে তিনি নবুওতের দায়িত্ব লাভ করেন।

৪৯ বছর ৮ মাস ১১ দিন বয়সে চাচা আবু তালিবের ইন্তেকাল হয়।

চাচা আবু তালিবের ইন্তেকালের মাত্র তিন দিন পর হযরত খাদিজা (রা.) ইন্তেকাল করেন। সেখানে তিনি মাসপর তিনি যায়েদ বিন হারিসকে সাথে নিয়ে

তায়েফ গমন করেন। সেখানে তিনি এক মাস অবস্থান করেন।

মুতয়ীম ইবনে আদ্দির তত্ত্বাধানে মক্কায় চলে আসেন। ৫০ বছর বয়সে নবী (স.) এর বয়স ৫১ বছর ৯ মাস হয়, তখন শবে মেরাজের ঘটনা ঘটে।

মক্কা থেকে মদীনায় হিরজতের ঘটনা যখন ঘটে তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৩ বছর । আর তা ছিল নবুওতের ১৩ তম বছর । কেহ বলেন তা ঘটেছিল নবুওতের ১৪মত বছরে। নবী করিম (স.) এর হিজরতের সঙ্গী ছিলেন আবু বকর (রা.) এবং রাহবর ছিলেন আমের বিন ফাহিরার গোলাম আব্দুল্লাহ ইবনে আরিক্বাত। ইসলামের ইতিহাসে ইহাই হিজরতের মূল তারিখ বলে গন্য করা হয়।

এ বছরই নবী (স.) সমস্ত সাহাবা (স.) এর মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সুদৃঢ় করে বিভিন্ন শিক্ষাদেন। আর হযরত আলী (রা.) কে নবী (স.) এর ভাই বানিয়ে নেন। এই বৎসরই আরো উল্লেখ যোগ্য ঘটনা ঘটে। যেমন মুকীম অবস্থায় পূর্ণ নামাজ পড়ার বিধান, ভ্রমনে স্বাধীনতা (অর্থাৎ চার রাকাত বিশিষ্ট ফরজ নামাজ ২ রাকাত, সুন্নতে ময়াক্কাদা ইচ্ছাধীন। কিন্তু বিতর আবশ্যক)।

এ বছরই হযরত আলী (রা.) এর সহিত নবী নন্দিনী বিবি ফাতেমার শুভ পরিনয় সু-সংঘটিত হয় । এর পর নবী (স.) এর জীবনে হিজরতের ২য় পালা আরম্ভ হয়। গজওয়ায়ে ওদান, বুয়াত্ব, আশিয়াহ এবং প্রথম বারে সংঘটিত হয়।

ওদান একটি স্থানের নাম, বুয়াতুর রিজওয়ানের পাশে। এবং প্রথম বদর সংঘটিত হয়, জমাদিউল উখরাতে বদরে কুবরা বা বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এতে কুরাইশদের বড় বড় বীর বাহাদুর , নওজোয়ান, সাহসী যোদ্ধা এবং কাফের নিহত হয়। আল্লাহ তায়ালা মুসমানদের বিজয় দান করে সম্মানী করেন।

এই যুদ্ধেটা সংঘটিত হয়েছিল ১৩ রমজান, জুমার দিন। গজওয়ায়ে বনী ছামীম জিলহজ্জ মাসে সংঘটিত হয়। যে যুদ্ধে নবী করিম (স.) আবু সুফিয়ানের অনুসরন করেছিলেন, কিন্তু তাকে ধরা সম্ভব হয়নি।

হিজরতের তৃতীয় বছর গজওয়ায়ে বনী গাতফান, নাজরান, কাইনুকা, গজওয়ায়ে বনী নজীর, যাতুর রিকা সংঘঠিত হয়। হিজরতের ৪ র্থ বছরে গজওয়ায়ে বনী নজীর, যাতুর রিকা সংঘঠিত হয়। ৫ম হিঃ দোমাতুল জন্দুল, খন্দক, বনী কুরাইযা ইত্যাদি সংঘঠিত হয়। ৬ষ্ঠ হিঃ বনী লেহইয়ান, বনী

মুস্তালিক সংঘঠিত হয়। হিজরী ৭ম বছরে মিম্বর বানানো হয়, খায়বর যুদ্ধে এবং ফিদাক যুদ্ধ সংগঠিত হয়।

ফিদাক এর ঘটনা প্রসিদ্ধ। আর তা নবী (স.) এর জন্যই নির্ধারিত ছিল। ৮ম হিঃ গজওয়ায়ে মু'তা, মক্কা বিজয়, হুনাইন, তায়েফ এবং হাওয়াজিন গোত্রের ধন সম্পদ বন্টন ইত্যাদি ঘটনা ঘটে। ৯ম হিঃ তাবুক যুদ্ধ, ১০ ম বছরে বিদায় হজ্জ (নবী করিম (স.) এর জবীনের শেষ হজ্জ) অনুষ্ঠিত হয়। এই হজ্জে নবী করিম (স.) তাঁর নিজ হাতে ৬৩ টি উট নহর করেন এবং ৬৩ জন গোলাম আযাদ করেন। আর এই পরিমান বয়সই নবী করিম (স.) জগতে জীবিত ছিলেন। হিজরী ১১তম বছরে নবী করিম (স.) ইন্তেকাল করেন।

নবী (স.) রবিউল আউয়াল মাসের প্রারম্বেই অসুস্থ হন এবং ১২ ই রবিঃ আউয়াল তারিখে ইহ জগত ত্যাগ করে আল্লাহর সান্নিধ্য চলে যান।

নবী (স.) এর মোট বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর। এহিসাবে তিনি সর্ব মোট ১০ বছর কাল মদীনাতে অবস্থান করেন। নবী করিম (স.) এর সব কয় জন ছেলের ইন্তেকাল হয়ে গিয়েছিল। বিবি খাদিজা (রা.) জীবিত থাকতে নবী (স.) আর বিয়ে করেননি। বিবি খাদিজার ইন্তেকালের পর সওদাহ বিনতে যাময়াহ এবং আয়েশা বিনতে আবু বকর (রা.) কে বিবাহ করেন। তিনি (স.) এক মাত্র হযরত আয়েশা (রা.) ব্যতীত অন্যকোন কুমারী ও যুবতী মহিলা বিবাহ করেননি। ৫৮ হিজরী হযরত মুয়াবিয়াহ (রা.) এর শাসনামলে হযরত আয়েশা ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর।

এর পর নবী করিম (স.) তৃতীয় বছর হযরত হাফসাহ বিনতে উমর ফারুক (রা.) কে বিয়ে করেন। হযরত ওসমানের শাসনমলে হযরত হাফসা ইন্তেকাল করেন। এরপরে নবী কমির (স.) যয়নব বিতে খুজাইমাহ (রা.) কে বিয়ে করেন। তিনি নবী (স.) এর জবিদ্দশায় ইন্তেকাল করেন। নবী করিম (স.) এর জীবদ্দশাতে যয়নাব বিনতে যয়নাব বিনতে খুজাইমাহ ও বিবি খাদিজা (রা.) ছাড়া অন্যান্য বিবি গন তাঁর (সা.) ইন্তেকালের পর ইহধামত্যাগ করেন। অতঃপর ৪র্থ বছরে তিনি (স.) উম্মে সালমা (রা.) কে বিয়ে করেন। তার মা আতেক আত্মীয়তা সূত্রে নবী (স.) এর চাচী হতেন। তিনি৫৭হিঃ মুয়াবিয়ার (রা.) শাসনকালে ইন্তেকাল করেন। কোন কোন ঐতিহাসিক ৬১ হিঃ তার ইন্তেকাল

হয়েছে বলে মত প্রকাশ করেন। তিনি আশুরার দিনি ইন্তেকাল করেন বলেও পাওয়া যায়। যেদিন হযরত আলীকে শহীদ করা হয়। ৫ম বছরে নবী করিম (স.) যয়নব বিনতে জাহাশ (রা.) কে বিয়ে করেন। তিনি ইন্তেকাল করেন ২০ হিঃ ফারুকী যুগে। বিবি খাদিজার পর প্রথম ইন্তেকাল কারী বিবি গনের মধ্যে তিনিই প্রথম।

এরপর নবী (স.) রামালাহ বিনতে আবু সুফিয়ান যাকে উম্মে হাবিবাহ বলা হয়, তাকে বিয়ে করেন। তিনি ৪৪ হিঃ মুয়াবিয়ার শাসনকালে ইন্তেকাল করেন। এরপর নবী করিম (স.) জুয়াইরিয়া বিনতে হারেছ আলমুস্তালিক্বিয়াহ কে বিয়ে করেন। তিনিও ৫৬ হিঃ খেলাফতে মুয়াবিয়াতে ইন্তেকাল করেন। সর্বশেষে নবী (স.) হযরত মাইমুনা বিনতে হারেছ (রা.) কে বিবাহ করেন। তিনি ৪০ হিঃ ইন্তেকাল করেন।

প্রকাশ থাকে যে, নবী করিম (স.) মোট ৯ জন বিবির সহিত ঘর সংসার করেন।

البرذون

(৬৪) টাট্টু ঘোড়া

সাধারণ ঘোড়া বা তুর্কী ঘোড়াকে البرذون বলে। এর বহুবচন براذين আর ঘোড়ার জন্য برذونة ব্যবহার করা যায়। এর উপাধি ابو الاخطل কেননা তার কান নেতিয়ে থাকে কিন্তু আরবী ঘোড়ার কান নেতিয়ে থাকেনা।

আল্লামা দামিরী (রহ.) বলেন বলেন برزون হলো এমন ঘোড়া বা টাট্টু যার পিতা মাতা অনারবী হয়ে থাকে। আজমী বলে এমন লোককে যারা পরিস্কার ভাবে কথা বলার ক্ষমতা রাখে না। চাই তারা আরবী হউক বা অনারবী। এজন্য যিয়াদ বিন উবাইয়াহ কে আজমী বলে। কারণ তার মুখে ছিল জড়তা, যদিও তিনি আরবী বংশোদ্ভত ছিলেন। আজম শব্দটি হাদীছে ও রয়েছে।

قال رسول الله ﷺ النهار عجماء

নবী করিম (স.) এরশাদ ফরমান- দিনের নামাঁয চুপে চুপে পড়বে।

দিনের নামাজকে উজমা বলার কারণ হল- এই নামায চুপে পড়া হয় এতে প্রকাশ্য কিরাত নেই। কিন্তু ইমাম নববী (রহ.) এ হাদীছ বাতিল বলেছেন।

আল আজমী তাকে বরেযে কথা বার্তা বলতে অক্ষম। হাদীছে রয়েছে-

قال ﷺ العجماء جرحها جبار.(الح٩ديث)

"নবী করিম (স.) এরশাদ ফরমান- প্রাণীদের কৃত অপরাধ ক্ষমা করা হয়েছে।" উজামা বলা হয় মুক্ত এবং স্বাধীন প্রাণীকে অন্যথায় اجماع হল এই যে, এই শব্দটি سائق এবং قائد উভয় জানুয়ারের অন্তর্ভুক্ত। منطق الطيران কিতাবের লিখক বলেন টাট্টু তার নিজ ভাষায় কথা বলার সময় একথা বলে যে,

اللهم انى اسئلك قوت يوم بيوم

হে আল্লাহ! আমি প্রত্যহ দ্বিওন শক্তির প্রর্থনা করি।

হাদীছে টাট্টু ঘাড়ার আলোচনাঃ

বর্ণিত আছে যে,

عن ابن مسعودؓ قال كانى بالترك وقد اتتكم على برازين مجدعة الاذان حتى تربطها بشط الفرات (حاكم)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন আমি তুর্কীতে ছিলাম আর সে তোমাদের উপর কান কাটা টাট্টুর উপর সওয়ার হয়ে আক্রমন করছেল। শেষ পর্যন্ত তারা ফুরাত কুল পর্যন্ত বেধে দিয়েছিল। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন যে, একদা তিনি মারওয়ানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন এমতাবস্থায় তিনি মদীনাতে তার ঘর নির্মান করিছিলেন। সুতরাং আমি তার পাশে বসে গেলাম এবং পারিশ্রমিকের বিনিময় কাজ করতে ছিলাম। আমি বল্লাম শক্ত করে বানাও। এবং দীর্ঘ আশা কর আর দ্রুত মরে যাও। মারওয়ান বল্ল আবু হোরায়রা! (রা.) শ্রমিকদের সহিত কথা বলছে, হে আবু হোরায়রা! (রা.) তুমি তার সহিত কি আলোচনা করেছ। আবু হোরায়রা (রা.) বল্লেন আমি তার সহিত এই কথা বলছি যে, শক্ত করে বানাও, দুরের আশা কর, আর দ্রুত মরে যাও।

হে কোরাইশ বংশ! কমপক্ষে তিনবার স্মরন কর যে, তোমরা গতকাল কি করে ছিলে আর আজ তোমরা কি রকম হয়েছ? তোমরা পারস্য এবং রোমের গোলামদের সেবা গ্রহণ করছ এবং সাদা আটার রুটি এবং ভুনা গোস্ত খাচ্ছ। তোমাদের মধ্যেই কেহ কেহ না খেয়ে আছে। আর একজন অপর জনের প্রতি দাত ভেংচিয়েওনা। আজ তোমরা ছোট, আগামী কাল তোমরা বড় হবে। আর

আল্লাহ পাক ইহ জগতে কারো একধাপ মর্যাদা বাড়ালার পর কালে তার এক ধাপ মর্যাদা কমিয়ে দিবেন।

সিরাজুল ওয়ারাদ ঘোড়ার অপবাদ দিয়ে বলেন ঃ

لصاحب الاحباش برزنة :: بعيد العهد عن القرط

হাবশীদের নিকট একটি (স্ত্রী) টাট্টু ঘোড়া আছে, যে কানের দুলা থেকেও অধিক প্রাক্তন মনে হয়।

اذارأت خيلا على مربط:: تقول سبحانك يا معطى

যখন সে রশিতে বাধা অবস্থায় কোন ঘোড়া দেখত তখন সে বলত হে দাতা তুমি পুত পবিত্র।

تمشى على خلف اذامامشت:: كانما تكتب بالقبطى

যখন সে চলে তখন পেছন দিকে চলে, মনে হয় সে ক্বিবতী ভাষায় লিখে।

জাহিজ বলেন, একদা আমি এক গ্রাম্য লোকের কাছে প্রশ্ন করলাম কোন প্রাণীর খাদ্য বেশী লাগে? জবাবে সে বলল- দুধাল টাট্টু। মা আয়েশা (রা.) বলেন যে, একদা এক ব্যক্তি টাট্টু ঘোড়ার উপর সাওয়ার হয়ে নবী করিম (স.) এর নিকট আসে। তার মাথায় ছিল পাপড়ী। এর শিমলা উভয় কাধের মাঝখানে ঝুলেছিল। আমি নবী করিম (স.) এর নিকট জিজ্ঞেস করলাম সে কে? নবী করিম (স.) বললেন তুমি কি তাকে দেখেছ? আমি বল্লাম জি জনাব, আমি তাকে দেখেছি। নবী করিম (স.) বল্লেন তিনি ছিলেন জিব্রাইর (আ.) আমাকে বনিকুরাইজার দিকে যেতে পরামর্শ দিয়েছে।

হযরত ওমর ফারুক (রা.) এর সিরিয়াতে গমন ঃ

আল কামিল কিতাবে ১৫ হিজরীর অবস্থা লিখা হয়েছে যে, যখন বায়তুল মোকাদ্দাস বিজয় হল তখন হযরত ওমর (রা.) চার বার সিরিয়াতে গমন করেন। প্রথম বার ঘোড়ায় আরোহন করে গমন করেন। দ্বিতীয় বার উটের উপর সওয়ার হয়ে আগমন করেন। তৃতীয়বার ইচ্ছা প্রকাশ করে ছিলেন কিন্তু রাস্তা থেকে প্রত্যাবর্তন করেন। কারণ তখন সিরিয়াতে কলেরায় মারাত্মক প্রকোপ দেখা দিয়েছিল। ৪র্থ বার তিনি গাধার উপর আরোহন করে গমন করেন। এর সঙ্গে

সঙ্গে সরকারী কর্মচারীদেরকে জানিয়েদেন যে, তিনি "জাবিয়া" নামক স্থানে সাক্ষাৎ করবেন। এরপর তিনি ঘোড়ার উপর আরোহন করেন। তিনি এতে খোড়ামির আভাস পেলেন। তাই তিনি দ্রুত নেমে পড়েন এবং তার জন্য একটি টাট্টু ঘোড়া আনা হয়, সওয়ার হওয়ার সময় টাট্টুটি ঔদ্বত্য দেখাতে লাগলে তিনি এর উপর থেকেও নেমে পড়েন অথবা অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বলেন আল্লাহ পাক তোমাদের সমস্ত অহংকার এবং বক্রতা ধ্বংস করে দিবেন। অতঃপর তিনি উটনীর উপর আরোহন করেন। এরপর থেকে তিনি আর কখনো টাট্টু ঘোড়ার উপর সওয়ার হননি।

উলামায়ে কেরাম লিখেছেন, হযরত ওমর (রা.) যখন সিরিয়া যেতে ইচ্ছা করলেন তখন মদীনায় তার স্থলাভিষিক্ত হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রা.) কে মনোনীত করেন। হযরত আলী (রা.) হযরত ওমর (রা.) কে বল্লেন যে, আপনি সেচ্চায় সে কুকুরের কাছে যাচ্ছেন (তখন সিরিয়াতে ইহুদী শাসক ছিল) হযরত ওমর (রা.) জবাব দিলেন আমি তো হযরত আব্বাস (রা.) এর ইন্তেকালের পর ফিতনার দরজা খুলে যেত। যেমনি ভাবে রশি খুলে যায়। সুতরাং হযরত আব্বাস (রা.) হযরত ওসমান (রা.) এর শাসনামলে ইন্তেকালের পর পরই ফিতনার দরজা খুলে যায়। বিশৃংখলা এবং বিপর্যয় চরম আকার ধারন করে। যা ছিল হযরত ওমর (রা.) এর ভবিষ্যৎবানী।

আবুল হোসাইন সম্পর্কে একটি কাহিনী ঃ

ইতিহাসবিদ ইবনে খাল্লেকান আবুল হোসাইন মুহাম্মদ ইবনে হোসাইন আল আল্লাহ আনছারী যিনি মুতাযিলা সম্প্রদায়ের মিশরের একজন শেষ ছিলেন। তিনি নিজেই বলেন একদা আমি আমার নিজদের বছরা থেকে টাট্টু ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে বাগদাদে মামুনুর রশিদের রাজ দরবারে গেলাম। রাস্তায় হেরাকালার ইবাদত খানার পার্শ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলাম যে, এক ব্যক্তি ইবাদত খানার দেয়ালে বাধা। আমি তাকে দেখে সালাম করলাম। তিনি সালামের জবাব দোর পর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন। অতঃপর তিনি বল্লেন যে তুমি মু'তাযিলা? আমি বল্লাম হ্যাঁ আমি মু'তাযিলাই বটে । লোকেটি বল্ল তুমি কি আমার সম্মুখে রয়েছ? আমি বল্লাম হ্যাঁ আমিতো আপনার সম্মুখেই রয়েছি। লোকটি এবার বল্ল তুমি কি আবুল হোসাইন আল- আল্লাফ? আমি বল্লাম জিহ্য

আমিই আবুল হোসাইন। লোকটি বল্ল ঘুমে কি স্বাদ আছে? আমি বল্লাম জিহ্বা তাতে স্বাদ আছে। তিনি বল্লেন কখন তা পাওয়া যায়? আমি মনে মনে ভাবতে লাগলাম যদি বলি ঘুমের সহিতই স্বদ সম্পর্ক তাহলে ভূল হবে কেননা ঘুমের কারণে জ্ঞান লোপ পায়।আর যদি বলি শোয়ার পুর্বে স্বাদ পাওয়া যায় তাও ভূল হবে। কারণ স্বাদের তো কোন অবয়ব নেই। তা থাকে অস্তিত্বহীন। আর যদি বলি ঘুমের পর স্বাদ পাওয়া যায় তাহলেও ভুল কথা হবে। কারণ স্বাদের তো অনুভুতির স্থান নেই। সুতরাং আমি লা জওয়াব হয়ে গেলাম আবুল হোসাইন বল্ল আমি আবার তাকে বল্লাম যে আমি তো জবাব দিতে অপারগ। দয়া করে আপনিই জবাব দিন। এব্যাপারে আমারও জানা হবে এবং যে কোন স্থানে তা আলোজনা করতে পারবো। আপনার বরাত দিয়েই তা আলোচনা করব। তখন লোকটি বল্ল যে আমি এক শর্তে জবাব দিতে পারি যে, তুমি এই ইবাদত খানার মালিকের স্ত্রীর কাছে নিবেদন কর সে যেন আমাকে না মারে সুতরাং আবুল হোসাইন তার স্ত্রীর কাছে আরজ করলে তা মঞ্জুর করা হয়। অতঃপর দেয়ালে বাধা লোকটি বল্লেন, ভাই! শোন, তন্দ্রাতো একটি রোগ মাত্র তা শরীরে অনুপ্রবেশ করে। তার দুটি নিদ্রা। আবুল হোসাইন বল্লেন, তার জবাব আমার পছন্দ হল। যখন আমি ফেরত আসতে লাগলাম তখন তিনি বল্লেন আবুল হোসাইন! একটু অপেক্ষা কর এবং আমার প্রশ্ন মনোযোগ কহকারে শ্রবন কর।

আরেকটি ঘটনাঃ

নবী করিম (স.) এর ব্যাপারে তোমার আকীদা হল যে তিনি ছিলেন বিশ্বাসী। আকাশ ও যমীনের নীচে আরাম ফরমাচ্ছিলেন? আবুল হোসাইন বললেন হ্যাঁ, আমার আকীদা তো তাই। তিনি আবার আমাকে প্রশ্ন করলেন তার উম্মতের ব্যাপারে মত পার্থক্য ও বিশৃংখলা কি পছন্দ কর? নাকি ঐক্য এবং বন্ধন? আমি বললাম মত পার্থক্য পছন্দ করিনা বরং ঐক্য ও বন্ধন পছন্দ করি। তিনি বল্লেন পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক এরশাদ ফরমান-

وما ارسلناك الا رحمة للعالمين

"আমি আপনাকে সারা জগতের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি।"

নবী করীম (স.) এর জীবনের শেষ যুগের কি অবস্থা ছিল যা, নবী করিম (স.) নিজে এরশাদ ফরমান যে, আমার পরে সে খলিফা হবে। নবী করিম (স.)

অছিয়তও করেছিলেন এবং উম্মতকে এ ব্যাপারে অনুপ্রেরণাও দিয়ে ছিলেন। আবুল হোসাইন বল্লেন আমি তার জবাব দেই নাই। আমি তাকে বল্লাম আপনিই এর জবাব দিন। কিন্তু আমি তখনও তাকে জানতে পারলাম না যে, তিনি কে? আমি তাড়াতাড়ি টাট্টুর রুখ ফিরিয়ে খলিফা মামুনুর রশিদের দরবারে উপস্থিত হলাম। আমি খলিফাকে তার ব্যপারে বিস্তারিত জানালাম। খলিফা তখন এই অবস্থায়ই লোকটিকে দরবারে হাজির করার জন্য নির্দেশ দিলেন। লোকটিকে উপস্থিত করা হলে। খলিফা মামুন তার উদ্দেশ্যে বলেন, এখন আপনি আমাকে সে প্রশ্ন গুলোই করুন যা আপনি আবুল হোসাইনের নিকট জানতে চেয়েছিলেন। তিনি সবগুলো প্রশ্ন পুনাবৃত্তি করলেন। মামুনের দরবারে বড় বড় আলেম বসা ছিলেন। কেহই যখন উত্তর দিলনা তখন মামুন বল্লেন ভাই আপনার প্রশ্নে সবাই ক্লান্ত । আপনি নিজেই জবাব দিন। লোকটি তখন বল্লেন ছুবহানাল্লাহ! আমিই প্রশ্ন করলাম আবার আমিই উত্তর দেব? মামুন বল্লেন আরে তাও আবার কি মুশকিল ? কমপক্ষে তোমার দ্বারাতো আমাদের উপকার হবে।

দেওয়ারে বাধা লোকটি বলল ঠিক আছে, খলিফার আদেশ পালন করা হবে। আপনি জেনে রাখুন আল্লাহ তায়ালা অনাগত সমস্থ বস্তু আদিকাল থেকে লিখে রেখে তার মীমাংসা করে রেখেছেন। তার পরে আল্লাহর প্রিয় নবী (স.) কেও অবগত করলেন। এখন তার জন্য উচিত হবেনা যে, তার পক্ষ থেকেই কোন প্রকার পাপ কাজ অথবা শরীয়ত বিরোধী কোন কাজ প্রকাশ পেয়ে যাক। যাখন এ পর্যন্ত স্থায়ী হয়ে গেল তখন সমস্ত কাজ কর্মকে ভাগ্যের উপর ন্যাস্ত করে দিলেন। এজন্য তা হবে যা দির্ধারন করা হয়েছে। তিনি অতি শ্রেষ্ট মহা শক্তিধর আল্লাহ। তার আদেশ রুখবার কেউ নেই। কেউ তার বিদ্রোহী হতে পারেনা। আর না তার বিদ্রোহী কাজে কেহ বাধা দিতে পারে।

খলিফা মামুনুর রশিদের এ কথা খুবই ভাল লাগল। এ মুহুর্তে মামুনুর রশিদের কোন কথা স্মরন হয়ে গেল। তিনি ঘরের ভিতর চলে গেলেন। তখন লোকটির নিকট এক পাগল এসে বল্ল। হে নাপাক মুখ তুমি আমার কাছ থেকে উপকার গ্রহন করব এবং আমার কাছ থেকে পলায়ন করতে হবে। তারা দুজনে কথা বার্তা বলতে ছিল। হঠাৎ করে মামুনুর রশিদ চলে এলেন। তিনি বল্লেন আচ্ছা তুমি আমার কাছে কি পুরস্কার আশা কর? লোকটি বল্ল ১০০০/- (এক হাজর) আশরাফী। মামুন বল্লেন এত টাকা দিয়ে তুমি কি করবে? লোকটি বল্ল

ওগুলো আমার কাজে ব্যয় করব। সুতরাং তাকে পুরস্কার দেয়ার আদেশ করা হল। পুরস্কার গ্রহণ করে লোকটি চলে গেল। ২২৭ হিঃ আবুল হোসইন আল্লাফের ইন্তেকাল হয়।

ওলামায়েকেরাম বলেন, তন্দ্রা হল মাথায়, আর ঘুম হল চোখে। ঘুম অন্তরে হঠাৎ প্রকাশিত হয়, আর ঘুম এমন কঠিন মুর্ছা যাওয়াকে বলে যা অন্তরে আচমকা এসে পড়ে। যে কারণে বস্তুর পরিচিতি এবং অন্যান্য ধাতুর পার্তক্য করা যায়না। কেননা নিদ্রা এবং তন্দ্রা ক্ষতি পরিবর্তন শীল। আল্লাহ তায়ালা এ সমস্ত ক্ষতি থেকে মুক্ত। সুতরাং আল্লাহর বানী-

لا تاخذة سنة ولانوم আল্লাহ পাকের না তন্দ্রা আসে আর না নিদ্রা।

খলিফা আবুল আব্বাস সাফফাহ এর দরবারে খালিদ ইবনে ছফওয়ান ঃ

আবুল ফারজ আর জাওজী লিখেছেন যে, একদা খালিদ বিন ছফওয়ান আত্তিতুমী খলিফা আবুল আব্বাস ছাফফাহর দরবারে আগমন করলেন। খলিফা তখন একাকি বসে ছিলেন। খালেদ বল্ল মহামান্য খলীফা! যখন থেকে আপনি খেলাফতের সিংহাসনকে অলংকৃত করেছেন তখন থেকেই আমার মনের একান্ত ইচ্ছা ছিল আপনার উপস্থিতিতেই আমি একা গিয়ে আপনার ব্যাপারে কিছু শক্তি প্রতিষ্ঠা করব। এজন্য আপনি যদি এগলো উপযুক্ত মনে করেন তাহলে আমি আপনার সে আকাংখা পুর্ণ করব। আপনি দরজায় একজন প্রহরীরক বলে দিবেন যেন সে কাউকে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি না দেয়। আমিরুল মুমিনীন ছাফফাহ প্রহরীকে হুকুম দিয়ে দিলেন। কিছুক্ষন পর খালিদ বিন ছফওয়ান একাকিত্ব থেকে সমাবেশে চলে আসেন। তিনি বলেন হে আমিরুল মু'মিনীন। আমি আপনার ব্যাপারে খুব চিন্তা করেছি, শেষ পর্যন্ত আমি এ সিদ্ধান্তে পৌছালাম যে, আপনি একজন একক বাদশাহ। আপনার চেয়ে আর বেশী কেহ মহিলাদের কাছ থেকে অধিক মেহেরবানী পায়নি, আর না কারো অতটুকু ক্ষমতাও ছিল। এখন আপনার কি বলার আছে আপনি অবগত যে, নিজে আপনার জ্ঞানমত একজন মহিলার পরীক্ষা করলেন উভয়ের সম্পর্কের ব্যাপারে তাও জানেন যে, যদি সে নিজে অসুস্থ হয়ে পড়ত তাহলে আপনি নিজেও অসুস্থ হয়ে যান। সে যদি কোথাও চলে যায়, তাহলে আপনি গায়েব হয়ে যান। সে যদি কোথাও চলে যায়,

তাহলেআপনি গায়েব হয়ে যান। যখন সে খতু কালীন দিন কাটায় তাহলে আপনিও রোজা অবস্থায় দিন কাটান, দাসীদের পক্ষ থেকে কোন মেহেরবানী পাওয়া যায় না । অথচ আপনার কাছে এমন সব দাসী রয়েছে যাদের দিকে মানুষের আকর্ষণ থাকার জন্মগত অভ্যাস। যেমন সাদা সুন্দর , বাদামী রঙ্গের দাসী। এমনি ভাবে কোন কোন দাসী এমন রয়েছে যারা স্বর্ণ রঙ্গের। কেহ আবার টুকটুকে লাল। কোন কোন দাসী আছে ইয়ামামার, মদীনার । যাদের কথার মধ্যে ফুলের পাপড়ী ছড়ায়। যাদেরকে দেখলে যৌন উত্তেজন প্রবল হয়ে উঠে।

ছাফফাহ বলেন আজ তুমি আমার সহিত এমন সব চিত্তাকর্ষক কথা বলছ যা আমি আশাতীত নিরাপত্তা লাভ করছি। আল্লাহর কছম, ইতিপূর্বে তুমি এধরনের কথা বার্তা আর কখনো বলোনি। এমন ধরনের কথা তুমি আমাকে বার বার বলবে। খালিদ বিন ছফওয়ান আবার এ ধরনের মনোলোভা কথা বল্লেন এবং এ অনুমানে কথা বল্লেন যে, ছাফফাহর পক্ষ থেকে দয়া দাক্ষিন্ন পাওয়া যাবে। কিছুক্ষণ পর ছাফফাহ খালিদকে বল্লেন ঠিক আছে এখন যেতে পার। সুতরাং খালিদ দরবার ত্যাগ করলেন। আবুল আব্বাস সাফফাহ আবার গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হলেন। সাফফাহ এ অবস্থায় থাকতেই তার বিবি উম্মে সালমা চলে এলেন। যার কাছে সাফফাহ এ প্রতিশ্রুতি দিয়ে ছিলেন যে সে উম্মে সালমারই হয়ে থাকবে, কোন বাদীর সহিত সম্পর্ক গড়বেন না। এবং অন্য কোন মহিলাকে বিয়ে করবেননা । সুতারাং সাফফাহ প্রতিশ্রুতি মত একত্রে অতিবাহিত করার আপ্রান চেষ্টা করে ছিলেন। উম্মে সালমা যখন বুঝলেন যে, সাফফাহ গভীর চিন্তায় মগ্ন তখন তিনি প্রশ্ন করলেন আমিরুল মুমিনীন! ব্যপার কি? আজ আপনি এত চিন্তিত কেন?মন মানসিকতার বিপরীত কোন কথা হলনা কি? সাফফাহ বল্লেন, না না কোন কথা হয়নি। খালিদ বিন ছফওয়ানের সহিত যে গোপন কথা হয়েছিল তা উম্মে সালমাকে অবগত করলেন। উম্মে সালমা বল্লেন আপনি এই জারজ সন্তানের কথা শুনে আনন্দিতও হয়েছেন? সাফফাহ বলেন সে তো আমার মঙ্গল কামী। আর তুমি তাকে গালি দিচ্ছ? তাকে মন্দ বলছ? কিছুক্ষন পর উম্মে সালমা গোলামদের কাছে চলে গেলেন এবং খালিদ বিন সফওয়ানকে প্রহার করতে নির্দেশ দিলেন। খালিদ বিন সফওয়ান বলে আমি যখন সাফফাহর সহিত চিত্তাকর্ষক কথা বলে উঠলান তখন মনের মধ্যে একথা ছিল যে, সাফফাহ আমার প্রতি খুশী হয়েছেন এবং অবশ্য কোন না কোন পুরস্কার পাওয়া যাবে।

এই চিন্তায় নিমজ্জিত হয়ে আমি যখন গেইট থেকে বের হলাম তখন দেখলাম যে, কিছু লোক আমাকে জিজ্ঞেস করতে করতে আমার পাশে চলে এলে। তখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে, তারা হয়ত আমার পুরস্কারের সুসংবাদ দেয়ার জন্য আসছে। আমি তাদেরকে বল্লাম আমিইতো খালিদ বিন সফওয়ান। এ কথা শুনতেই এক ব্যক্তি একটি কাষ্ট খন্ড দিয়ে আমাকে মারার জন্য সামনে এগিয়ে এলো। আমি তার হাব ভাব দেখেই বুঝে ফেললাম এবং দ্রুত টাট্টু ঘোড়ার উপর সওয়ার হয়ে কেটে পড়লাম। বেশ কয়েক দিন আত্মগোপন করে থাকলাম। আমি বুঝে ফেললাম এই ষড় যন্ত্র সাফফহার স্ত্রী উম্মে সালমার।

খালিদ বলেন একদা আমি কয়েক জন লোকের সহিত হাটছিলাম। হঠাৎ করে কিছু লোক এসে আমার উপর আক্রমন করে বসল এবং বলতে লাগল যে, তুমিই নাকি আমিরুল মুমিনীনের সম্মুখে চিত্তাকর্ষক কথা বলে ছিলে? আমি তখন বুঝতে পারলাম যে এখন আমার মৃত্যু হবে। তখন 'ইন্না ল্লিাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' পড়তে থাকলাম। তখন আমার খেয়াল হল যে, আমার এসব কথা বৃদ্ধ লোকের সহিত কোন সর্ম্পকে নেই। বেশ কয়েক দিন পর আমি খলিফার দরবারে গেলাম, দেখলাম খলিফা এসেছেন এবং অন্য পাশে কিছু পাতলা পর্দা লটকানো আছে। কেহ গোপন থাকার আভাস পেলাম। তখন সাফফাহ আমাকে বসার ইঙ্গিত করলেন। এবং বল্লেন ওহে খালিদ! তুমি আমার নিকট কিছু ব্যাপার বর্ণনা করেছিলে। তুমি এগুলো পুনরায় বর্ণনা করতো । আমি বল্লাম ঠিক আছে জনাব! এখন আমি তাই বর্ণনা করব শুনুন, আরবীদের নিকট 'সতীন' শব্দ 'ক্ষতি' থেকে বের হয়েছে। এজন্য আপনার নিকট যদি একাধিক স্ত্রী থাকে তাহলে তা ক্ষতির কারণ হবে। আর জীবন হয়ে যাবে দূর্বিসহ। সাফফাহ্ বল্লেন খালিদ তোমার কথায় তা বুঝা যায় না । খালিদ বল্ল জি জনাব! তাই আমি আপনাকে বলেছিলাম যে তিন প্রকার নারী কঠোর প্রকৃতির পুরুষের উপর বিজয়ী হযঃ (ক) যাদের কাজ হয় চিদ্রান্বেষন করা। ছাফফাহ বল্লেন যদি তুমি এধরনের কথা নবী (স.) এর কাছ থেকে শুনে থাক তাহলে তিনি তোমার চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ? খালিদ বল্ল তাই যেমন বুঝেছেন। খালিদ বল্ল জনাব!আমিতো আপনাকে তাও বলেছিলাম চার প্রকার নারী তার নিজ স্বামীর ছিদ্রান্বেষন করে থাকে। খারাপ কাজ এবং ফিতনা ফাসাদে তারা ডুবে রয়েছে, স্বামীর ত্রুটি বিচ্যুতি তারা প্রকাশ করে দেয়।

সাফফাহ বললেন খালিদ! আমি তো তোমার নিকট এধরনের কথা ইতি পূর্বে শুনিনি। খালিদ তা স্বীকার করে নিল। সাফফাহ বল্লেন তুমি কি আমার সহিত মিত্যা বলছ? খালিদ বল্ল আপনি কি আমাকে হত্যা করতে চাচ্ছেন? আমিরুল মুমিনীন! আল্লাহর শপথ অবিবাহিতা দাসী পুরুষের মতই কিন্তু পার্থক্য শুধু তারা নপুংশক নয়।

কালিদ একথা বলতে না বলতেই পর্দার আড়াল থেকে হাসির শব্দ আসল। অতঃপর আমি সাফফাহকে বল্লাম জনাব! আপনার কাছে কি সুন্দরী মহিলা কম আছে। আপনার নিকটতো কুরাইশের সুন্দরী মহিলা আছে। আপনি এই সমস্ত সুন্দরী নারী ও দাসীদের দেখে সন্তুষ্ট হতে পারেন। খালিদ বলেন এ কথোপকথনে পর্দার পেছন দিক থেকে শব্দ এল যে, তুমি সত্য বলছ। হে আমার চাচা! এ সমস্ত কথা যা বল্লেন মনে হয় এগুলো আপনার কথা নয়। আর আপনার অন্তরের কথা তা নয়। সাফফাহ বলেন খালিদ! আল্লাহ তোমাকে হত্যা করুন। খালিদ বল্ল কিছুক্ষন পর আমি বাইরে বের হয়ে দেখি সাফফার স্ত্রী উম্মে সালমা ১০,০০০ হাজার দিরহাম এবং একটি টাট্টু ঘোড়া যা জিন দ্বারা সজ্জিত ছিল তা উপঢৌক হিসেবে আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। (كتاب الاذكياء) টাট্টু ঘোড়া হালাল হারাম হওয়ার ব্যাপারে সাধারন ঘোড়ার মতই।

চিকিৎসায় টাট্টু ঘোড়ার উপকারিতাঃ

কোন মহিলা যদি টাট্টু ঘোড়ার রক্ত পান করে তাহলে সে কখনো গর্ভবতী হবে না। তা বিষ্ঠা পেটে ঘসলে সন্তান এবং ফুল বের হয়ে আসে। তার বিষ্ঠা শুকিয়ে যদি নামে নোশনেয় তাহলে (নাকছির) নাক দিয়ে রক্ত পড়া রোগ ভাল হবে। ক্ষত স্থানে ছিটিয়ে দিলে রক্ত পড়া বন্ধ হবে। এর চর্বি মালিশ করলে (স্নায়ুব্যাথা) রোগ ভাল হয়।

স্বপ্নের ব্যাখ্যা ঃ

স্বপ্নে টাট্টু দেখা প্রতিদ্বন্ধী ঝগড়াটে হওয়ার লক্ষন। কেহ বলেন গোলাম অথবা অনারবী লোকের সহিত দূরত্ব হওয়ার লক্ষন। স্বপ্নে কেহ দেখল যে সে তার নিজের টাট্টু ঘোড় চুরি হয়েছে তাহলে তাবীর হবে তার স্ত্রীকে তালাক দিবে। যদি কেহ তার টাট্টুকে ধ্বংস করতে দেখে তাহলে তাবীর হবে তার স্ত্রী পাপীয়সী হওয়ার লক্ষন। কেহ দেখল যে সে টাট্টু ঘোড়ার উপর সওয়ার অথচ তার অভ্যাস

ছিল টাট্টু ঘোড়ার সওয়ার না হওয়ার তাহলে ব্যাখ্য হবে যে তার মান সম্মান হ্রাস পাবে।

البرغش

(৬৫) মশা বিশেষ

এক প্রকার মশাকে بـرغـش বলা হয়। নীচের কবিতাটি হাফেজ জাকি উদ্দিন আব্দুল আযীয শেখ আবুল হাসান আল মাকদাসী এ ব্যাপারে বলেন, আল মাকাদ্দিসী ইমাম দাকীকুল ঈদ এর পিতার নাম যিনি মৃত্যু বরন করেন ৬২১ হিঃ যাবান মাসে - কাহেরাতে।

ثلاث بآت بلينا بها:ك البق والبرغوث والبرغش

তিনটি মহামারীতে আমাকে নিপতিত করা হয়েছে আর এই তিন টি মাহামারী হল মাছি, মশা জাতীয় প্রাণী, বিচ্ছু।

ثلاثه او حش مافى الورى :: ياليت شعرى ايها اوحش

পৃথিবীতে তিন টি অসভ্য রয়েছে হায় আমি যদি শুনতাম কে বেশী অসভ্য?

البرغن

(৬৬) নীল গাই এর শাবক

بـرغن নীল গাই এর বাচ্চাকে বলা হয়। باএবং غ এ যের এবং পেশ উভয়ই পড়া যায়।

البرغوث

(৬৭) ডাশ

ডাশ কে আরবীতে بـرغـوث বলা হয়, এর বহু বচন بـا ابـراغيـث অক্ষরে পেশ তবে যের বেশী প্রসিদ্ধ। আরবান বলেন-

كونى فى البراغيث "আমাকে ডাশে খেয়ে ফেলেছে"

এ ভাষা তাই গোত্রের। যা একটি নিয়মিত ভাষা। তারা কোরআন শরীফ থেকে দলীল গ্রহন করেন এবং এই কেরাতই মানেন।

واسـروا الـنجوى الذين ظلموا আর জালেমরা সংগোপনে কানাকানি

করে। দ্বিতীয় বাণী خشعا ابصارهم চোখ নীচে নামালো অথবা এই এবারত يتعاقبون فيكم الملائكة ফেরেস্তারা একদলের পর অন্য দল আসতে লাগলেন। حتى احمر تاعيناه এমনকি ফেরেস্তাদের চোখ লাল হয়ে গেল। এরকম অনেক উদাহরন রয়েছে। ইমাম ছুয়ুতী (রহ.) বলেন اكلونى البراغيث এর দৃষ্টান্ত পবিত্র কুরআনে নেই। আর اسروا النجوى সর্ব তেম নামটি فاعل আর الذين হল বদল।

ডাশ পোকার বৈশিষ্ট ঃ

ডাশের উপাধি হল ابوالواثب ابوعدى. ابوطافر একে طامر بن طامر ও বলা হয়। ডাশ বিষাক্ত প্রাণীদের অন্তর্গত। এর উপর আল্লাহর করুনা হল যে প্রয়োজনের সময় সে পেছন দিক থেকেও সে আক্রমন করতে পারে । এতেকরে সে শিকারীকে দেখতে পারে। অন্যথায় সে সামনের দিক থেকে আক্রমনের ভঙ্গিতে সে নিজেই মৃত্যুর জালে আটকে যায়। ইমাম হাফিজ ইয়াহ ইয়া মারমাফী থেকে বর্ণনা করেছেন, ডাশ কোন কোন পিপিলিকার মত উড়তে পারে এমন প্রাণী। সে অনেকক্ষন সহবাস করতে পারে । ডিম পাড়ে বাচ্ছা ফোটার পর সে বাচ্চাদের দলেই থাকে, উড়ে, এক মাটি এব অন্ধকার সয় স্থানে বেশী পাওয়া যায়। ডাশ পোকার আক্রমন বেশী হয় শীতের বেষে এবং বসন্ত কালের প্রথম দিকে এবং সে বাঁকা হয়ে আক্রমন। কোন কোন প্রাণী বিশারদ লিখেছেন যে ডাশ পোকা হাতির আকৃতি। কামড় দেয়ার জন্য তার দাত আছে এবং চোখের জন্য শুড় ও আছে।

শারয়ী বিধান ঃ

ডাশ খাওয়া হারাম। মোহরিম অমোহরিম সবার জন্যই একে হত্যাকরা মোস্তাহাব। কিন্তু ডাশ বকা দেয়ার অনুমতি নেই। সুতরাং আনাস (রা.) বলেন- জনাব রাছুলুল্লাহ (স.) এক ব্যক্তি কে ডাশকে বকা দিতে শুনলে তিনি বলেন একে বকাদিওনা এরা নবীদেরকে ফজর নামাজ আদায় করতে অধিকাংশ সময় জাগিয়ে দেয়। (আহমদ, বুখারী, রাজ্জাক, তিবরানী)

হযরত আনাস (রা.) বলেন একদা নবী করিম (স.) এর সামনে ডাশ এর ব্যাপারে আলোচনা করা হলে নবী (স.) বলেন, সে ফজরের নামাযের জন্য জাগিয়ে দেয়। হযরত আলী (রা.) একদা আমরা একস্থানে অবস্থান করি।

সেখানে ডাশ আমাদের কে খুব কষ্ট দেয়। আমরা তাকে গালমন্দ করলাম। নবী করিম একে বকা দিতে নিষেধ করলেন। কারণ সে ভাল প্রাণী সে তোমাকে আল্লাহর জিকিরের জন্য জাগিয়ে দেয়। (তিবরানী)

ডাশ সচরাচর হওয়ায় বাধ্যতার কারণে তার স্বল্প রক্ত ক্ষমা যোগ্য। হাফেজ ইবনে আব্দুল বার বলেন যতক্ষন পর্যন্ত বেশী রক্ত না লাগে ততক্ষন তা ছাড় দেয়া যায়। শাফেয়ীরা বলেন স্বাভাবিক রক্ত ক্ষমা যোগ্য। এতে কাহরো দ্বিমত নেই। তবে ইচ্ছা করে লাগানো ভিন্ন কথা। যেমন ডাশকে নিজের কাপড়ে বা শরীরে নিজেই মারা হয়েছে। এখন দুটি অবস্থা ছহীহ অবস্থা হল তা ক্ষমা যোগ্য। বরং এভাবে এই প্রানীর একই হুকুম যেখানে রক্ত প্রবাহিত হয়না। যেমন ছারপোকা, ডাশপোকা এবং মশা ইত্যাদি এদের হুকুমের মতই ডাশপোকার হুকুম। শাইখুল ইসলাম আজিজুদ্দিন ইবনে ছালামের নিকট কেহ জিজ্ঞেস করল যে কাপড়ে ডাশের রক্ত লেগেছে সে, কাপড় পরে কি নামজ পড়া জায়েজ আছে। অথবা সে কাপড়ে যদি ঘাম লাগে সে কাপড়ে কি নামজ পড়া জায়েজ হবে? এতে করে কি শরীর নাপাক হবে, অথবা এ অবস্থায় কি ক্ষমার কোন ব্যবস্থা আছে অথবা তার গোসল করা মোস্তাহাব কিনা? তিনি জবাব দিলেন- এ অবস্থায় কাপড় এবং শরীর নাপাক হয়ে যাবে। এমন ব্যক্তি নির্ধারিত সময়েই গোসল করতে হবে অন্যথায় এর থেকে পূর্বেই গোসল করা খোদাভীতি এবং অধিকতর সাবধানতার কথা। তাই ছিল আমাদের পূর্ববর্তী লোকদের বিধান। তারা দ্বীনের হেফাজতে বড় ধরনের ভূমিকা রাখতেন। মুক্তি প্রাপ্ত বেশী রক্তের মাছয়ালাতে ও উলামায়ে কেরাম এর নিকট সাধারন ক্ষমা। সে রক্ত যদিও ঘামের কারনে ছড়িয়ে পড়ুক না কেন। ইমাম নববী (রহ.) তাই বলেছেন।

ডাশ পোকা থেকে নিরাপদ থাকার আমল ঃ

বাশের ঝাড়ে গাধীর দুধ এবং জংলী বকরীর দুধ একত্রে মিশিয়ে ঘরের মধ্যবর্তী স্থানে পুঁতে ২৫ বার এ দোয়া পড়তে হবে-

اقسمت عليكم ايها البر اغيث انكم جند من جنود الله من عهد عادو ثمود واقسمت عليكم بخالق الوجود الفرد الصمد المعبود ان تجتمعوا الىٰ هذا العود ولكم على المواثيق والعهود ان لا اقتل منكم والدا ولا مولودا.

এ দোয়া পড়লে ইনশাল্লাহ সব ডাশ মাটিতে চলে আসবে। এগুলো না

মেরে ফেলে দিতে হবে। অতঃপর ঘরটি ঝাড়ু দিয়ে ৪০ বার পড়তে হবে-

وما لنا ان لا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما اذيتمنا وعلى الله فليتوكل المتوكلون

এ আমল করার পর ডাশ পোকা আর হবে না। আমলটি অতি উপকারী।

ইমাম মালেক (রহ.) এর কাছে একটি প্রশ্নঃ

একদা কোন লোক ইমাম মালেক (রহ.) কে প্রশ্ন করল যে, ডাশ পোকার মৃত্যু ফেরেস্তারা হস্তগত করেন কি না? তিনি কিছুক্ষন নীরব থেকে বললেন, বলত ডাশপোকা কি প্রবাহ মান রক্ত আছে? লোকটি জবাব দিল হ্যাঁ, তার প্রবাহমান রক্ত আছে। তখন তিনি বলেন তাহলে মালাকুল মউত তার প্রান বের করবে। এর পর তিনি পবিত্র কুরআনের এই আয়াত তিলাওয়াত করেন ঃ

الله يتوفى الانفس حين موتها

তার মৃত্যুর সময় আল্লাহ তার প্রান টেনে বের করবেন।

ডাশ পোকা সংক্রান্ত উদাহরন ও প্রবাদ বাক্যঃ

আরবগণ বলেন هو اطمر من برغوث সে ডাশপোকার চেয়ে ও বেশী মারমুখী হয়। فلان اطير من برغوث অমুক ডাশ থেকে ও বেশী উড়ে।

ডাশ সংক্রান্ত কবিতাঃ

ডাশ পোকা কামড় দেয় এবং কষ্ট দেয়। ডাশ পোকা সর্ম্পকে এক মিশরী গ্রাম্য লোক বলেন-

قطال فى الفسطاط ليلى ولم يكن :: بارض الفضاليل على يطول

তার তাবুতে আমার রাত অধিক লম্বা হয়েগেল এবং খোলা মাঠে আমার রাত দীর্ঘ হয় না-

لاليت شعرى هل ابيتن قتلتهم:: كمااستحلو ادم الحجاج فى الحرم

হায় আমি জানতাম তুমি কাটিয়েছ অথচ ডাশর জন্য আমার কোন রাস্তা নেই। আবুল মাইমুনা মাজ দুদিন আলকানানী ডাশ পোকা সম্পর্কে বিস্ময় কর কথা বলেছেন -

ومعشر يستحل الناس قتلهم:: كما استحلو ادم الحجاج فى الحرم

আর এই ডাশ পোকা মানুষ হত্যা করা বৈধ মনে করে যেমনি ভাবে হেরেমে হাজীদের রক্ত বৈধ মনে করা হয়েছে।

اذا اسفكت وما منهم فما سفكت:: يداى من دمه المسفوك غيردمى

এদের কারো যখন রক্ত প্রবাহিত হয় তখন আমার রক্ত ব্যতীত আমার হাত প্রবাহিত হয়ে রক্তে রঞ্জিত হয়না। আবুল হাসান ইবনে ছাফরাতুল হাশেমী একজন সমোজ্জল ব্যক্তি ইবনে برغوث এ ব্যাপারে বলেন-

بليت ولا اقول بمن لانى :: متى ماقلت من هو يعضقوه

আমি তার ভাল বাসার পাড়েছি কিন্তু তার নাম আমি নেইনা কারণ যখন আমি ও বলি সে অমুক তখন লোকের তার প্রেমাসক্ত হয়ে যায়।

حبيبى قد تقى عن رقادى:: فان اغمضت ايقظى ابوه

সে এমন বন্ধু যে আমার নিদ্রা উড়িয়ে দেয় যদি ও কখনো চোখ বন্ধ হয়ে যায় এখন তার পিতা আমাকে জাগয়ে দেয়। তিনি এই সুন্দর কবিতা ও বলেছেন-

كان خالالاح فى حده:: للعين فى سلسلة من عذار

তার গন্ড দেথের (আকৃতি) জিনিজরের পরস্পর সংযুক্ত কটি গুলো এমন প্রতীয়মান হয় যেমন চোখের কাছে নিস্মাঞ্চল।

اسود يتسندم فى جنة:: قيده مولاه خوف الفرار

যেমন সে বেহেস্তের বাগানে সেবা করার জন্য বাঘ- যেমন তার মুনিব পালিয়ে যাবার ভয়ে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন তিনি এ কবিতা ও বলেছেন।

وما عشقى له وحشالانى::كرهت الحسن واخترت القبيحا

তার প্রতি আমার ভাল বাসা অসভ্যতা এবং একাকিত্বের জন্য নহে (বরং) আমি সৌন্দর্যকে মন্দ মনে করে কুৎসিৎ চেহারা কেই গ্রহন করেছি।

ولكن عزت اهوى مليحا:: وكل الناس يهوون المليحا

বরং আমার এই যজবাহ হল যে, আমি একজন খ্যাতিমান ব্যক্তিত্বের সাথে ভালবাসা করেছি এবং প্রতিটি মানুষকেই ভাল ভাল বস্তু আকৃষ্ট করে।

تحمل عظيم الذنب ممن تحبه:: وان كنت مظلوما فقل انا ظالم

তুমি যাকে ভালবাস তার বড় অপরাধ ও ক্ষমা করে দাও যদিও তুমি মালজুম হওনা কেন, তুমি নিজেকেই জালেম মনেকর।

فانك ان لم تغفر الذنب فى الهوى :: يفارقك من تهوى وانفط راغم

কেননা তুমি যদি ভাল বাসায় অপরাধকে ক্ষমা না করে দাও তাহলে তোমার ভালবাসার মানুষটি তোমা থেকে দুরে চলে যাবে। এবং পরে তুমি নাক ছিট কাতে থাকবে। কোন কোন জ্ঞানী বলেন সর্বশেষ কবিতা দুটি আব্বাস বিন আহনাফের । ৩৮৫ হিঃ ইবনে ছাফরান এর ইন্তেকাল হয়।

ক্ষতিকারক প্রানী থেকে রক্ষা পাওয়ার আমল ঃ

ইবনে আবুদ্দানিয়া লিখেছেন, একদা আফ্রিকার গভর্নর হযরত ওমর বিন আব্দুল আজিজের দরবারে মাকড়শা এবং ডাশের ক্ষতির বিষয়ে আলোচনা করা হলে তিনি জবাবে বললে সকাল সন্ধ্যা এই দোয়া পড়। দোয়া উপকার থেকে বঞ্চিত নয়- (ابراهيم) وما لنا ان لا نتوكل على الله.

"আমরা আল্লাহর উপর নির্ভর না করার কি কারণ রয়েছে।"

যারযাহ ইবনে আব্দুল্লাহ বলেছেন এই দোয়া ডাশ পোকা থেকে রক্ষার জন্য বিরাট উপকারের। (এব্যাপারে হা অধ্যায়ে আলোচনা হবে)

আবুদ্দারদা এবং আবু যর (রাঃ) বলেন, নবী করিম (স.) এরশাদ ফরমান যখন তোমাদের কে ডাশ পোকা কষ্ট দিতে থাকে তাহলে পানির একটি পিয়ালা নিয়ে وما لنا ان لانتوكل على الله

এই আয়াত সাত বার পাঠ করে দম করো এবং বল যদি তুমি আল্লার প্রতি ঈমান রাখ তাহলে তুমি তোমার ক্ষতি এবং কষ্ট থেকে আমাদের কে বিরত রাখ। এরপর এ পানি বসবাসের চারিদিকে ছিটিয়ে দাও। সুতরাং এই আমলের মধ্যেমে এর ক্ষতি থেকে নিরাপদ হয়ে রাত অতিবাহিত কর। হোসাইন ইবনে ইসহাক বলেন ডাশ পোকা থেকে নিরাপত্তার জন্য এই আমল করা যায় ।

তাহলে গন্ধক এবং 'মছল' বৃক্ষ ঘরে ধুপদিলে এর ক্ষতি থেকে নিরাপদ থাকবে। দ্বিতীয় আমল হল ঘরে একটি গর্ত করে মাথান পাতা ঢেলে দিলে এই গর্তে সমস্ত ডাশ পোকা একত্র হয়ে যাবে। কেহ বলেন কালজিরা পানিতে ভিজিয়ে ঘরে ছিটিয়ে দিয়ে উইমরে যাবে। পুরাতন কাতান কাপড় এবং নারিকেলের ছোলা পুরে ধোয়া দিলে সে ঘরে আর ২য় বার ডাশ হবেনা । কারো ডান কানে যদি

ডাশ প্রবেশ করে তাহলে ডান হাতে বাম অন্ডকোষে ধরতে হবে আর যদি বাম কানে প্রবেশে করে তাহলে বাম হাতে ডান অন্ড কোষে ধরলে শীঘ্রই তা বের হয়ে যাবে।

স্বপ্নে ডাশ পোকা দেখলে তাবীর :

স্বপ্নে ডাশ পোকা দেখলে তার দুশমন দুর্বল অথবা তার স্ত্রীই, তার দুশমন হওয়ার আলামত। স্বপ্নে ডাশপোকা কামড় দিতে দেখলে ধন দৌলত পাওয়ার আলামত।

البرا

(৬৮) এক প্রকারের মোরগ

এক ধরনের পাখীকে البـــرا বলা হয় । যাকে ســـمـــويـــل বলে (এর বিস্তারিত আলোচনা সীন অধ্যায়ে করা হবে)

البرقانة

(৬৯) টিড্ডি

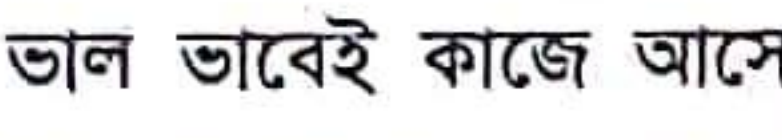
ইবনে সাইদ বলেন برقانة রং বেরঙ্গের টিড্ডিকে বলা হয়। এ বহু বচন برقان

البرقش

(৭০) চড়ুই পাখী

بـرقـش চড়ুই পাখীকে বলা হয়। একে عـصفور ও বলে। হেযাজীগন একে سرشورবলে ابوبراقش এর আলোচনা পরবর্তীতে আসবে।

بـــراقـــش প্রবাদের এক কুকুরের নাম। (যার ঘ্রান ও শ্রবন শক্তি অত্যন্ত প্রখর। বর্তমান যুগে এ ধরনের কুকুর দ্বারা প্রভুত উপকার পাওয়া যাচ্ছে, বিশেষ করে সিকুরিটি সিষ্টেমের ক্ষেত্রে এ ধরণের কুকুর ভাল ভাবেই কাজে আসে) জ্ঞানী গন যেমন লিখেছেন যে অমুক লোকের ঠিকানা কুকুরের মাধ্যমে পাওয়া গিয়েছে। এজন্য এই প্রাণী ঘরে আওয়াজ শুনে ঘেউ ঘেউ করতে থাকে। লোকেরা তাদের গন্তব্য পৌছে যায়।



البُركة

(৭১) এক প্রকার সামদ্রিক পাখী

بــركة সামুদ্রিক চড়ুই পাখীকে বলা হয়। এর বহু বচন بــرك । অতএব কবি যুহাইর বলেন বাজ যখন সে পাখী দেখে তখন সে পানিতে ডুব দিয়ে পালিয়ে যায়।

حتى استغاثت بماء لارشائله:: بين الاباطح فى حافاته البرك

"শেষ পর্যন্ত সামুদ্রিক চড়ুই প্রশস্ত নালার গভীর পানিতে ডুব দিয়ে প্রান বাচায়। যায় আশপাশের কিনারায় তার স্বজাতীয় পাখীর ঝাক থাকে।"

আভিধানিক ইবনে সাইদাহ বলেন بــركــه অতি ক্ষুদ্র পাখীকে বলে। এরবহু বচন ابراك ـبـركان ـبـرك ইত্যাদি হয়। আর আমার নিকট চুড়ান্ত বহু বচন হলো ابراك এবং بـركان এমনি ভাবে -ব্যাঙ্গকে ও بركة বলে। সুতরাং অনেক মনিষি কবি যুহাইরের কবিতার অর্থ بــــركة এর অর্থ ব্যাঙ্গ বলেছেন। আলউবাব নামক কিতাবে লিখা হয়েছে যে, ابـرك বসা উটের غـول কে বলে। এর একবচন بارل এবং বহুবচন হলبَاركة ।

البشر

(৭২) মানুষ

بشر মানুষ এর একবচন, বহুবচন, স্ত্রী, পুরষ সকলের জন্য ব্যবহৃত হয়। তবে কোন কোন সময় দ্বিবচনও ব্যবহৃত হতে দেখা যায় যেমন আল্লাহর বানী فـقـالـو انـؤمن لبشرين مثلنا সম্প্রদায় আমাদের মত দুজন লোকের মত কি আমরা ইমান আনব? এর বহু বচন البشر আসে।

البطخ

(৭৩) হাঁস

হাঁসকে بــطـخ বলা হয়। যা সর্বক্ষণ পানিতে থাকতেই ভালবাসে। এর এক বচনের বেলায় بطة ব্যবহৃত হয়। শব্দস্থিত هـاء স্ত্রী লিঙ্গের জন্য নয়। বরং এক বচনীয় নির্দেশক। এজন্য শব্দীট জাতী বাচক । বলা হয়ে থাকে هــــذه البطة(ইহা হাঁস) স্ত্রী পুরুষ উভয়ের বেলায় একই শব্দ বলা হয়। যেমন دجاجة وحـمامة ব্যবহার করা হয়। بطة শব্দটি মূলত আরবী নয়। আরববাসী গন ছোট

بطخ কে বড় بطخ কে (مرغاء بی اوزہ) বলে।

পূর্বে আলোচিত বড় হাসের বিধানের মতই তার বিধান, হযরত আব্দুল্লাহ বিন আবিস বলেন, আমি কুরবানীর দিন হযরত আলী কাররামাল্লাহ ওয়াজ হাহু (রা.) এর কাছে গেলাম। সুতরাং আমাদের জন্য আটার শিরকার গোস্ত আনা হল। আমরা বল্লাম যদি আমাদের জন্য বড় হাসের গোস্ত আনা হত তাহলে আরো ভল হত। কারণ এতে আল্লাহ পাক অধিকতর কল্যান নিহীত রেখেচেন। হযরত আলী (রা.) বল্লেন হে ইবনে যুয়াইছ আমি নবী করিম (স.) এর কাছে শুনেছি তিনি বলেছেন কোন খলিফার জন্য আল্লাহ পাকের ধন সম্পদের মধ্যে থেকে দুটি পেয়ালা ব্যতীত জায়েজ নাই। একটি পেয়াল হল তা যাতে সে খায় এবং ২য় পিয়াল হল য মানুষের সম্মুখে রাখা হয়। (আহমদ)

আলী ইবনে যায়েদ ইবনে জিদআনের জীবনীতে লেখা হয়েছে যে সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহ বলেন আমি ৬৭ হিঃ আলী ইবনে যায়েদ ইবনে জিদআনের কাছ থেকে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন,তিনজন নারীলোক যখন একত্র হয়, তখন তারা একদম হাসের মত হয় এদের যখন একজনে চিল্লাতে থাকে তখন তাদের সবাই চিল্লাতে থাকে। (কামেল)

ইমাম মাওরিদী বলেন যে হাস اوزہ এর মোকাবেলায় উড়তে থাকে তখন এতে কোন পার্থক্য সূচিত হয় না। এমতা ব্যবস্থায় মুহরিম ব্যক্তি এমন হাস কে হত্যাকরন তখন এই হত্যা শিকারী প্রাণীর মধ্যে গন্য হবেনা। কোন কোন জ্ঞানী বলেছেন, সে এমন জলজ প্রাণী যে কিনা পানিতে ডুব দিয়ে ভেসে উঠে তা মুহরিমের জন্য হারাম । অতঃপর তারা হাসের উদাহরন দিয়েছেন। কিন্তু যে প্রাণী শুধু পানিতেই থাকে যেমন মাছ ইত্যাদি তাহলে তার শিকার জায়েজ নহে। টিড্ডি সম্পর্কে সত্য কথা হল তা ডাঙ্গার প্রাণীর মধ্যে গন্য এজন্য একে হত্যা করলে জরিমানা আছে।

প্রবাদ ও উদাহরণ :

اوللبطتهدين بالشط হাঁসকি কিনারায় এসে যুদ্ধের হুমকী দিচ্ছে?

হাঁস যখন সমুদ্রে থাকে তখন সাঁতার কাটা এবং ডুব দেয়ার কারনে তার তার পক্ষ থেকে কিছু নম্রতা পাওয়া যায় যে কারনে সে আত্মার্ব করে কিন্ত কিনারে এসে যুদ্ধেং দেহী মনোভাবে ধমক দিতে থাকে। এজন্য তার ধমকেই

তার মৃত্যু লক্ষ্য করা যায়। এজন্য কিনারায় এসে সে কিছু করেনা। ইবনে খাল্লেকান লিখেন আমার স্বরণ আছে যে, সুলতান মোহাম্মদ নূরুদ্দিন জংগী এবং আবুল হাসান ছেনান বিন সুলায়মান ইবনে মুহাম্মদ যিনি রাশিদুদ্দিন নামে অধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইসমাইলী দূর্গের মালিক ছিলেন এদের মধ্যে যোগ সূত্রছিল। সুলতান মাহমুদ তার কাছে ধর্মাদীর পত্র লিখন। তখন যেনান বিন সুলায়মান এই কবিতা এবং চিরকুট লিখে পাঠিয়ে দেন।

يالرجال لامرى هال مفظعه:: مامرقط على سمعى توقعه

ওহে লোক সকল যার আচরন ভীতিজনক, কখনো আমি তার কাছে উপাকারের আশা করিনা।

ياذالذى بقراع السيف هددنا:: لا قام قائم جنبى حين تصرعه

হে সে ব্যক্তি যে আমাকে তরবারীর ঝনঝনানীর ধমক দেয়, যখন তুমি তার সহিত লড়বে তখন তার স্বপক্ষে কোন লোক থাকবে না।

قام الحمام الى الباذى يهدده:: واستيقظت لا سود الغاب اصبعه

কবুতর বাজকে শাসাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। এবং হিংস্র জন্তু সিংহের মোকাবিলায় ফন্দী এটেছে।

اضعى يسدفهم الافعى باصبعه :: يكفيه ماقدتلاقى منه اصبعه

সে তার আঙ্গুল দ্বারা সর্পের মুখ বন্ধ করতে লাগল তার আঙ্গুল এতে রাখাই তার জন্য যথেষ্ট।

রুকয়ার প্রবাদ হলঃ আমরা অধিকার এবং বিশ্লেষণে আগত। তার কর্ম এবং কথায় ধমক ও বুঝা যায়। আল্লাহর শপথ কেমন বিস্ময় কর কথা একটি মধুপোকা হাতির কানে হুল ফুটাচ্ছে। মশাকে শক্তিশালী বীর গন্য করা হচ্ছে। এ ধরনের কথা পূর্বে ও বলা হয়েছিল। কিন্তু আমরা আবার তার বিপদ সংকুল আক্রমন করি। তার কোন সহায়তা কারীও ছিলনা। এবং তুমি কি তাভাবতে পারছ যে সত্য পরাজিত এবং অসত্য বিজয়ী হবে? অচিরেই অত্যাচারীদের পতন হবে। সেকি ভাবে এদের দল সর্মথন করছে? তিনি আরো বলেন সেমানের মাথা কে পৃথক করবে? তিনি নিজের ব্যাপারে বলেন আমার ঘাটি পর্বতের মত শক্ত। মনে রাখবে এগুলো মন ভোলানো কথা ধারনা শুধু ধারনাই যা সব

বিরক্তির কারণ দুর্বল হয়না। রূহ অসুস্থতার কারনে দর্বল হয়না। চিত্ত হরী শক্তি এবং দুর্বল ,ভদ্র এবং ইতরে কত পার্থক্য ,যদি আমরা প্রকাশ্য এবং অনুভূতি প্রবন বস্তুর দিকে ধাবিত হই এবং অপ্রকাশ্য এবং জ্ঞান গত বস্তুতে বড় রাস্তা ছেড়ে দেই তাহলে আমাদের জন্য নবী করিম (স.) এর আদর্শই যথেষ্ট। কারণ বনী করিম (স.) বলেছেন যে আমাদের যত কষ্ট দেয়া হয়েছে আমার পূর্বে কোন নবীকে এত কষ্ট দেয়া হয়নি। আর নবী (স.) এর গোত্রের লোকদের সাথে তিনি যে আচরন করেছেন ওগুলো সবইতো জানা বিষয়। মোদ্দকথা, পারলে কি হবে তা আল্লাহ ভাল শুনেন তবে ইহজগতে সমস্ত প্রশংসা তারই নিমিত্তে। কারণ আমরা অত্যচারিত তবে অত্যাচারী নহি।

قل جاص الحق وزهق الباطل كان زهوقاً(بنى اسرائيل)

হে নবী বলেদিন সত্য সমাগত অসত্য বিতাড়িত অসত্যের পতন অবশ্যম্ভাবী। তিনি তাও জানতেন যে আমাদের সৈন্যরা যুদ্ধ বাজ। মৃত্যুকে তারা মোটেও পরোয়া করেনা। প্রত্যহ এদেরকে মৃত্যুর দুয়ারে দাড় করানো হয়। আল্লাহ পাক বলেন ঃ

فتمنو الموت ان كنتم صادقين ولا يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين (الجمعه)

তোমরা মৃত্যু কামনা কর যদি তোমরা সত্যবাদী হও তারা নিজেদের কৃত কর্মের দরুন মৃত্যু কামনা করবে না। আল্লাহ জালেমদের সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত আছেন। প্রসিদ্ধ উদাহরন হাসঁ কি তীরে এসে যুদ্ধ করার হুমকী দিচ্ছে? বাঘ বিপদাপদ থেকে বাচার জন্য ঢাল তৈয়ার করল অথবা উড়ন্ত কাপড়কে ঢাল বানিয়ে নেয়। অন্যথায় আমি তোমার সৈন্য বাহিনী দ্বারাই তোমার ঘাটির উপর বিজয়ী হব এবং তোমাকে ও তোমার সৈন্যদলকে মৃত্যুর ঘাটে পৌছেদেব। যদি তাও না হয় তবে নিজের ঘরেই মৃত্যু খোজ কার তুমি নিজে তোমার নাম কর্তন করী হবে। আমার এই পত্র যখন তোমার নিকট পৌছবে তখন সুযোগের অপেক্ষায় থাকবে। প্রথমেই ছুরা নহলের আয়াত এবং সর্বশেষ ছুরা ص এর আয়াত পড়বে। অতঃপর এলিখা এই দুই কবিতার মধ্যেই সমাপ্ত হয়ে যায়।

بنا نك هذا الملك حتى تاثلث:: بيوتك فيه واستقر عمودها

এ রাজ্য তো তুমি আমার কাছ থেকে পেয়েছ এমন কি তোমার ঘরের

নিদর্শন পাক পোক্ত তা হয়ে গেল এবং রাজ্য স্থায়ী হয়ে গেল।

فاصبحت ترمينا بنبل بنا استوى:: مغارسها قد ما وفينا جديدها

এখন তুমি আমাকে তীরের লক্ষ্যবস্তুতে পরিনত করছ, আর পায়ের কাছে থেকে প্রতিদ্বন্ধি সমান হয়ে গেল। আমার নিকট রাজ্যের জন্য নতুন উদ্দম উদ্দীপনা। ইয়াকুব ইবনে ইউছুফ ইবনে আব্দুল মুমিন 'বিলাদুল মাগরিবের" লিখকের জীবনীতে লিখেছেন যে, তার এবং ادقوش۔ طليطلة গ্রন্থ কারের মধ্যে যোগা যোগ ছিল। এমুহুর্তে আমীর ইয়াকুব এর কাছে ادقونش এক জন দূত প্রেরন করেন। এর উদ্দেশ্যে হল আমীর ইয়াকুব কে প্রভাবিত করে শাসানো। এবং অন্যান্য দূর্গের দাবী করা এবং ادقونش মন্ত্রী ابن النجار এর পরামর্শে জবাব ও লিখেন আর তাহলো ঃ

باسمك اللهم فاطر السموٰت والارض وصلى الله على سيد المسيح روح الله وكلمته الرسول الفص۔ امابعد!

বুদ্ধিমান মানুষের কাছে এটি দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট যে, তুমি যেমন একত্ববাদীদের নেতা আমিও নাসারাদের নেতা। তোমার জানা যে, স্পেনের শাসনব্যহ্ন অতিদূর্বল ও অপমানের মনে হচ্ছে। শাসন শ্রেনী প্রজাদের ব্যাপারে উদাসীন। তারা আরাম আয়েশের জিন্দেগীতে নিমগ্ন হয়েপড়েছে। এদিকে আমি তাদের অথ্যাচার অবিচার থেকে বাচার জনা নির্বাসনের হুশিয়ারী দিচ্ছি। তাদের সন্তান সন্ততিদের বন্দী করছি। বীরত্ব দেখিয়ে তাদের পরাভূত করছি। তাই চুড়ান্ত লক্ষ্য অর্জিত নাহওয়া পর্যন্ত তুমি তাদের পক্ষালম্বন করোনা। অধিকন্ত তোমাদের বাহিনীতে ত্যাগী ও পরীক্ষিত লোক রয়েছে। আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে এমন ক্ষমতা দিয়েছেন। তোমাদের এক জন আমাদের দশজনের সহিত মোকাবেলা করে। এখন আল্লাহ্ পাক তা জেনে গেছেন যে, তোমরা মানুষের মধ্যে অতি দূর্বল মানুষ। এজন্য শাসন ব্যবস্থা অতিদূর্বল। এখন কাজ করবার একদম উল্টাপাল্টা। এখন আমাদের একজন তোমাদের ১০ জনের উপর ভারী হয়ে গেল। তোমরা চিন্তা ভাবনা করতে পারছনা আর না তাদের প্রতিহত করতে পারছ। আমার মনে হয় তোমরা উৎসব প্রিয় হয়েগেছ এবং অথি আরম প্রিয় হয়েগেছ। এক বছর পরে অন্য বছর বেকার এবংধ্বংসের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও। এক পা আগে ফলতেই অন্য পা পেছনে চলে যায়। আমার বুঝে আসেনা এ

কাপরুষতা তোমাদের সঙ্গে বিলম্ব করছে কেন? তোমাদের আল্লাহর ওয়াদা মিথ্যা। আবার আমার ব্যাপারে প্রপা গোন্ডা ছড়ানো হয়েছেযে, আমি সমুদ্র অতিক্রম করতে পারিনা এবং যুদ্ধেও আমি সন্তুষ্ট হতে পারিনা। এজন্য আমার পরামর্শ রইল যেখানে তোমাদের আরম আয়েশ আমি আপত্তি করিয়ে, তোমাদের জন্য উপযুক্ত হল এইযে, অঙ্গীকারের মূল্যায়ন কর এবং বেশী বেশী বন্ধর রাখ এবং তোমার সব গোলামকে সাজ সরঞ্জাম সহ এবং সওয়ারীর সাথে আমার নিকট পাঠিে দাও। অন্যথায় আমার আক্রমন তোমার উপর অবশ্যম্ভাবী। অতঃপর আমি এমন স্থানে আক্রমন চালাব যা তোমার নিকট অতি প্রিয়। যদি যুদ্ধে তুমি বিজয় লাভ কর তাহলে গনিমতের অনেক মালামাল অর্জন করবে। এবং একটি উল্লেখ্য যোগ্য ধন সম্পদের মালিক হয়ে যাবে। আর যদি জয় করা আমার ভাগ্যে জুটে তাহলে আমি তোমার উপর শ্রেষ্ট বলে প্রমাণিত হব। তখন মাযহাবের এবং রাজ্যের হাকিম হয়ে যাব। আল্লাহ পাকই আকাংখা রাস্তবায়ন কারী। তিনিই সবার রব। কল্যানই তার কাম্য। সুতরাং এই পত্র যখন আমীর ইয়াকুবের নিকট পৌছল তখন তিনি তা ছিড়ে টুকড়া টুকড়া করে ফেলেন আর তার একটুকড়াতে লিখে পাঠালেন যে তুমি চলে যাও। আমরা এমন এক শক্তি শালী সৈন্য বাহিনী দ্বারা আক্রমন করব যাদেব কাছ থেকে তুমি পালাতেও পারবেনা। অতঃপর আমরা অপমানিত করে রাখব। এর প্রকৃত জবাব তুমি স্বচক্ষেই দেখবে। তা জন শ্রুতি নহে। কবি মুতানাব্বি বলেন ঃ

ولا كتبِ الاالمشرفيه عنده:: والارسله الاالخميس العرموم

তার কোন নির্দেশ নেই তবে তরবারী আরনেই তার কোন দূত তবে আছে প্রশিক্ষন প্রাপ্ত সৈন্য অর্থাৎ সে দুশমনের কাছে কোন সংবাদ প্রেরন করেন। বরং তার বীরত্ব দ্বারাই পরাভূত করে দেয়। কিছুক্ষন পরই রওয়ানা হওয়ার আদেশ দিলেন এবং শহরে সৈন্য মোতয়েনের আদেশ দিলেন। সেদিন শহরে তাবু টানিয়ে দিলেন। অতঃপর তিনি সামুদ্রিক রাস্তায় زقاق سبت এরদিকে চলে যাওয়ার সংকল্প করলেন। তিনি ফ্রান্স পর্যন্ত দখল করলেন। অতঃপর তিনি উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে অনেক গনিমতের মাল সহ প্রত্যাবর্তন করলেন।

আমীর ইয়াকুবের পরিচিত ঃ

আমীর ইয়াকুব ছিলেন একজন শরীয়ত সমর্থিত বিচারক। তিনি ন্যায়ের

আদেশ করতেন। শরীয়তের বিভিন্ন দিক প্রতিষ্ট করতেন। কোন পার্থক্য ছাড়া সাধারণ লোকের মধ্যে যেমন শরীয়তের সীমা নির্ধারিত করতেন, তেমনি নিজের পরিবার পরিজনের প্রতিও তাই প্রতিষ্টা করতেন। ফিক্বাহ শাস্ত্রের ছোট খাট বিষয়ের উপর তিনি তেমন আস্থা রাখতেননা। অন্যথায় হাকীম গন হাদীছের আলোকেই ফতোয়া দিতেন। যে কেউ ইজতেহাদ তা কিতাবুল্লাহ ইজমা এবং কিয়াসের ভিত্তিতেই করতেন। ইমাম দামিরী (রহ.) বলেন এরকম চরিত্রের কেজন লোক পশ্চিম দেশ থেকে আমাদের কাছে এসেছিলেন যাদের মধ্যে আবু উমর, আবুল খাত্তব, মহীউদ্দিন আল আরাবী- আছুফী। আমীর ইয়াকুব ইন্তেকাল করেন ৬০৯ অর্থবা ৬১০ হিঃ।

সুলতান মাহমুদ এর পরিচয় ঃ

আবুল আছির বলেন নূরুদ্দীন শহীদ সম্পর্কে জানতে পারলাম যে, তিনি প্রথম ব্যক্তি যিনি ন্যায় বিচারের জন্য একটি স্থান নির্ধারণ করেন। নির্মানের এই আলোকে ক্বারীরে মধ্যে আমীরদের মধ্যে আসাদুদ্দিন শেরকুহ নামে ওযীরও অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। প্রত্যেকই একে অপরের উপর জুলুম রবত, পরশী হওয়া স্বত্বেও জনগনের অভিযোগ অধিক পরিমান আসতে লাগল। বিশেষ করে জনগন ফরিয়াদের জন্য কাজী কামাল উদ্দিন সাহরুরদী এর কাছে বেশী যাতায়াত করতে লাগল। শেরকুহ যেহেতু সকলের নেতা সেহেতু তার কাছে লোকেরা কোন ন্যায় বিচার পায়না । কিন্তু যখন একথা জানতে পাবলেন তখন তিনি তার জেলা প্রশাসক কে বলেন দেখ নূরুদ্দিন শুধু আমার আমি মতামতের উপর ভিত্তি করেই এই বিচারালয় নির্মান করানো হয়। অন্যথায় আমি কাজী কামাল উদ্দিনের বিপরীত কোন কাজ করিনা। আল্লাহর শপথ। যদি আমি তোমাদের মধ্য থেকে কারো কারনে বিচারালায়ে ন্যায় বিচারের জন্য উপস্থিত করি তাহলে আমি তোমাদের গুলিতে চড়াব। তোমরা স্বেচ্ছায় ক্ষমা প্রার্থনা কর। ইবনুল আছীর বলেন যে, নূরুদ্দীন শহীদ এর ইন্তেকালের পর একদিন একজন লোকের উপর জুলম করা হয়। সে হয়ে যায় অতি চিন্তিত। সে মজলুম ব্যক্তি দ্রুত নূরুদ্দীন শহীদ এর নাম নিয়ে আবেদন কর, একথা ছালাহুদ্দীন ইবনে ইউসুফ ইবনে আইয়ুব এর কাছে চলে যায়। তিনি সে মজলুমের ফরিয়াদ শুনে তার দুঃখ দুরকরে দেন। কিছুক্ষন পর সে মজলুম ব্যক্তি প্রথম বারের চেয়েও বেশী ক্রন্দন করতে লাগল তার কাছে লোকেরা জানতে চাইল ভাইআপনি যে প্রথম বারের তুলনায় আরো

বেশী কাঁদছেন ব্যাপার কি? সে বল্ল আমি ন্যায় বিচারক বাদশাহর মৃত্যুর কারনে কাঁদছি। ৫৬৯ হিঃ দামাস্কের দূর্গেই নুরুদ্দিন শহীদের ইন্তেকাল হয়। তিনি লক্ষঘাত রোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন বলে প্রসিদ্ধ মতামত রয়েছে। সে সময় বিজ্ঞ চিকিৎসক গন তাকে তার শরীর থেকে রক্ত খুলার পরামর্শ দেন। কিন্তু একথায় তিনি কান দেননি বিধায় ইন্তেকাল করেন। তিনি ছিলেন একজন নির্ভীক শাসক। দুর্গের তাকে দাফন করা হয়। অতঃপর সেখান থেকে তার লাশ উত্তোলন করে তার নির্মিত মাদ্রাসা প্রাঙ্গনে سوق الخواصين এর ফটকের নিকট দাফন করেন। বলা হয়ে থাকে তার কবরের পাশে দোয়া করলে দোয়া কবুল হয়। ককথা পরীক্ষিত। সুলতান নূরুদ্দীন ন্যায় পরায়ন আবেদ ও জাহিদ। খোদা ভীরু পরহেজগার, শরীয়ত প্রেমি লোক ছিলেন।তার কপালে সৌভাগ্যের রেখা প্রস্ফুটিত ছিল। তিনি বেশী বেশী দান খয়রাত করতেন। শিরিয়াতে তিনি মাদ্রাসার জাল বিস্তার করেছিলেন। দামেস্কের সারেস্তানের নিকট দারুল হাদীছ এবং মোসেল শহরে নূরী জামে মসজিদ এবং শহর তলিতে নিকটে যেখানে আছি ঝরনা বহমান ছিল সেখানে একটি মসজিদ নির্মান করেন। এ ছাড়া সুফী সাধকদের জন্য মুসাফির খানা, খানকা এবং হোটেল ইত্যাদি বানিয়ে দেন। মৃত্যুর পর তিনি লোকদের উপর শ্রেষ্ঠ চিত্রাবলী রেখে যান। বলা হয়ে থাকে তিনি কাফেরদের কাছ থেকে ৫০টি শহর দখল করেনেন। তার অসংখ্য কীর্তি কলাপ রয়েছে। ৫৮৯ হিঃ সফর মাসে সুলতান নাসির উদ্দিন ইউসুফ ইবনে আইয়ুব এর ইন্তেকাল হয়।

ইবনে খাল্লেকান লিখেছেন যে, তার যখন ইন্তেকাল হয় তখন কাজী আল ফাজ তার পুত্রের (যিনি حلب এর হাকিম ছিলেন) নিকট একটি চির কূট লিখে প্রেরন করেন। যার আলোচ্য বিষয় এরূপ ঃ "দেখ তুমি নবী করিম (স.) এর উত্তর আদর্শ থেকে উপদেশ অর্জন কর। কিয়ামতের বিভীষিকা একটি ভীতি জনক বিভীষিকা। অশ্রু চোখের বৃত্তকে খুড়ে ফেলেছ। আর আত্মা কণ্ঠ নালী পর্যন্ত চলে এসেছে। তুমি আমার মাখদুম তোমার পিতাকে এমনি ভাবে অবসর করে দিলে এখন তিনি আমার ২য় বার আগমন করবেন না। তুমি আমার পক্ষ থেকে তাকে গ্রহন করেছ আর তিনি যাবতীয় কৌশল থেকে প্রভাবিত করে আল্লাহর নিকট সপেছেন। আল্লাহর কাজে রাজী হয়েযাও। "لاحول ولاقوة الابالله" দরজাতে বর্মে সজ্জিত সৈনিক অস্ত্র এবং চৌকিদার যারা বিপদকে রুখতে

পারবেনা। আর না তারা ভাগ্যের বিপরীত কোন কাজ করতে পারবে। চোখ অশ্রু সজল এবং অন্তর ভারাক্রান্ত। আমরা আল্লাহর সন্তুস্টি ব্যতীত কি করারই বা আছে? তে ইউসুফ! তুমি আমাদেরকে চিন্তান্বিত করে গেলে । পরিত্যাক্ত সম্পদের কেহ মুখাপেক্ষী নয়। আমাদেরকে বিপদাপদে ঘিরে ফেলেছে। একদিন তো আল্লাহর ফায়সালা হবেই। যদি আপনার ব্যাপার ঐক্য মত্যের ভিত্তিতে হয় তাহলে কোন কথা নাই। আমার তো সহজ মৃত্যুই কাম্য। সব মুছিবত থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। কিন্তু মৃত্যু থেকে সর্বৈ অসম্ভব অথচ মানুষ মৃত্যুইকে সবচেয়ে খারাপ মনে করে। السلام عليكم রাষ্ট্রয় বলয়ের প্রশক্ততার সহিত আনুগত্য এবং অধীনতা আবশ্যক। জনগনের নৈকট্য এবং অন্তরঙ্গ দয়াদ্র চিত্ত, স্নেহ ভাজন, ধৈর্য ধারনকারী মেজায ভাল লোকের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করে। ভাল ভাল কবিতা পছন্দ করে বরং মজলিশে বার বার গুন গুন করতে থাকে। অধীকাংশ কবিতা যা শুনাতেন তা মুহাম্মদ বিন হুসাইন আল হেমিয়াবীর ছিল।

وزارنى طيف من اهوى على حذر:: من الرشاة وداعى الصبح قدهتفا

চোগল খোরদের ভয় সত্ত্বেও স্বপ্নে প্রেমিকার সহিত সাক্ষাৎ ঘটে অথঃপর ভোরের আহবায়ক আযান দেয়। অর্থাৎ বাস্তবে তার সহিত আমার কোন দেখা হয়না।

فكدت اوقظ من حولى به فر حا:: وكاد يهتك ستر الحب فى شغف

আমি আনন্দিত হয়ে জাগ্রত হওয়ার কাছাকছি ছিলাম এ সকল ভয়ভীতি সত্বেও যা তার সহিত সম্পর্কিন ছিল। যেহেতু আমি তার প্রতি আসক্ত ছিলাম, সেহেতু তার গোপন ভেদ ফাঁস হয়ে যেত।

ثم انتبهت واما لى تخيل لى:: نيل المنى فاستحالت غبطى اسفا

এরপর থেকে আমি সাবধান হয়ে গেলাম এবং আমার কাংখিত ফলাফল অর্জনের উপায় হয়। শেষ ফলাফল বের হল যে, আমার আনন্দ অনুশোচনায় পরিবর্তন হয়ে গেল।

عجبت لمبتاع الضلالة بالهدى:: وللمشترى دنياه بالدين اعجب

হেদায়েতের পরিবর্তে আমি পথভ্রষ্টতাকে ক্রয় কারীর প্রতি আশ্চর্য হই। বরং দ্বীনের পরিবর্তে দুনিয়া ক্রয় কারীর উপর আরো আশ্চর্য হই।

وعجب من هذين من باع دنى :: يدنيا سواه فهو من زين اخيب

দুজনের চেয়ে আশ্চর্য ময় হলে। সে ব্যক্তি যে নিজে দুনিয়ার পরিবর্তে দ্বীনকে বিক্রী করে ফেলেছে এ ব্যক্তি এ দুয়েও অধিক হতভাগ্য।

البطس

(৭৪) বিশেষ প্রকারের মাছ

এক বিশেষ প্রকার মাছকে بـطـس নাম। এর বিশেষত্ব হল এই যে মাছটির গায়ে কিছু লিখলে শুকিয়ে যাবার পর দিনের মত রাতের আধারেও তা পড়া যায়।

البعوض

(৭৫) মশা

بـعوض মশাকে বলা হয়। মশা অতি ক্ষুদ্র একটি প্রাণী। ইমাম জাওহারী (রহ.) লিখেছেন যে, بعوض মশাকে বলে। এর বহু বচন بعضة (ইমাম ছামিরী বলেন (ইহাতার কল্পনা মাত্র) বরং আসল কথা হল মশা দৃপ্রকার। মশা বিশেষ একটি কীটের মত এর সঙ্গে আছে দুটি হালকা পাতলা পা। যার মধ্যে আদ্রতা থাকে। এধরনের প্রানীকে ইরাকে, শামে জর্জিছ বলে জাওহারী (রহ.) বলেন بعوضى، فرقس অর্থে ও পাওয়া যায় ছোট মশাকে বলে। মশা হাতির মত হয়। অধিকন্ত মশার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হাতির অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থেকে বেশী। কারণ হাতীর মাত্র চারটি পা একটি একটি শুড় ও একটি লেজ। আর মশার এই সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ব্যতীত দুটি পা বেশী এর চারটি ডানা । হাতীল শুড়ে গোস্ত থাকে এবং মশার শুড় থাকে খোকলা।অধিকন্তু তার শুড় পেট পর্যন্ত প্রলাম্বিত। মাশা যখন কোন মানুষকে ধ্বংসন করে তখন তার রক্ত পান করে পেটে পাঠিয়ে দেয়। মশার শুড় গলে এবং কণ্ঠ নালীর যোগান দেয়। এ কারণে মশার কামড় কষ্ট দায়ক হয়। এমনকি চামড়া কে সে সহজে আয়ত্বে নিয়ে আসতে পারে।

مثل السفلة دائما طنينها::ركب فى خرطومها راجز বলেনঃ سكينها সব সময় মশার তন তনানী খুরধার বৃক্ষের মত এবং মুখে ছুরী স্থাপন করা হয়েছে। আল্লাহ পাকের ইলহাম কৃত বস্তুর মধ্যে এই মশাও অন্তর্ভূক্ত । মশা মানুষের শরীরে এমন কৌশলগত স্থানে বসে যেখানে থেকে কোন কোন শিয়া বের হয়ে যায় কারণ স্থানটি অধিক নরম। মশা যখন তার অনুসন্ধান পেয়ে যায়

তখন সে তার শুড় সেখানে স্থাপন করে রক্ত পান করে। রক্তের প্রতি সে এত আশক্ত হয় যে কোন কোন সময় রক্ত বেশী পান করার কারনে তার পেট পর্যন্ত ফেটে যায়। উড়ে যেতে সে সক্ষম হয় না। অধিকাংশ সময় তার মৃত্যুর কারণ রক্ত বেশী পান করা।

মশার শক্তি ঃ

আল্লাহ তাআলা মশাকে এতই শক্তি প্রদান করেছেন যে, কোন কোন সময় সে উটকে পর্যন্ত হত্যা করার ক্ষমাত রাখে। মশা যখন এদের কে হুল ফুটিয়ে ধ্বংশন করে তখন হিংস্র প্রাণীরা মৃতু প্রাণীর আশ পাশে একত্রিত হয়ে যায়। মশার ধ্বংশন করা প্রাণী যে খায় সে ও মার যায়। ইরাকী বাদশাহদের প্রাচীন যুগের নিয়ম ছিল যে, যখনই তারা কাউকে হত্যা করার ইচ্ছা করত তখন তাকে মশার ঝোপের নিকট বেধে আসত। অতঃপর তাকে মশকরা বার বার ধ্বংশন করে হত্যা করে ফেলত। এই অর্থে আবুল ফাতাহ আচ্ছাবুতী কবিতা বলেন ঃ

لا تستخفن الفتى بعد اوة:: ابدا وان كا اعدوضئيلا

শত্রু যুবককে কখনো হালকা পাতলা মনে করোনা, যদিও দুশমন দুর্বল ইউপোকা হোক।

ان القذى يوذى العيون قليله:: ولربما جرح البعوض الفيلا

অতি ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র চোখ ও কষ্ট দায় হয়। আর কোন কোন সময় মশা হাতীকে পর্যন্ত আহত করে ফেলে। কোন কোন কবি অত্যন্ত মর্মস্পর্শী কবিতা বলেছেন-

لا تحقون صغيرافى عدوته:: ان البعوضة تدمى مقلة الاسدى

শত্রু ছোট হলেও তাকে ছোট মনে করোনা। কেননা মশা বাঘকে রক্তাক্ত করে দিতে পারে।

لا تحوقن عدوار ماك :: وان كان فى ساعديه قصر

যে শত্রু তোমাকে তীরের লক্ষ বস্তুতে পরিনত করেছে তাকে শক্তী হিন মনে করোনা যদি তার হাতে খড় কোটা বা তৃণ থাকুকনা কেন।

فان الحسام يحز الرقاب :: ويعجز عماتنال الابر

যেহেতু তরবারী দ্বারা গর্দান কাটা যায় কিন্তু সূচের আঘাত মানুষের জন্য অসহনীয় হয়।

يامن لبست عليه اثواب الضنا:: صفرا موشحه بحمر الارمع

হায়! সে যেন অতি দুর্বলতার পোষাক পরিধান করেছে যার মধ্যে লাল রং এর অশ্রুর চিহ্ন হয়ে রয়েছে।

ادرك بقية مهجة لولم تذب:: اسفا عليك رمينها عن اض دعى

যদি তোমাকে সরানো না যায় তাহলে শরীরের অবশিষ্ট শক্তিও বের করে দেবে, আমি সে প্রানীকে আমার পাজর থেকে পৃথক করে দেব। তারই সুন্দর কবিতা হলঃ

لما وقفنا للوداع وصارما:: كنانظن من النوى تحقيقا

আমি যখন অবসর নেয়ার জন্য দাড়াই তখন যে বিরহের কারনে আমি ছবি আকতে ছিলাম তা পূর্ব থেকেই হয়ে রয়েছে।

نشرو اعلى ورق الشقائق لؤلؤ:: ونشرت من ورق البهار عقيقا

সে লাল রঙ্গের ফুলের পাতায় মুতি ছড়িয়ে দেয় তখন আমিও লম্বা পোষাকের পাতায় আকীক ছড়িয়ে দেই। এমনি ভাবে ইব্রাহীম ইবনে আলী আল কিরওয়ানী প্রমূখ কবিতা বলেন ঃ

ومعزرين كن بنت خدودهم:: اقلام مسك تستد خلوقا

অনেক সবুজ উদ্ভিদের মূল উৎস যাদের গন্ডদেশ বালিতে অঙ্কুরিত হলে এমন মনে হয় যেন মেশকে আম্বরের কলম ডুবানো যায়ঃ

مظمو البنفسج بالشقيق ونظدوا :: تحت الزبر جد لؤلؤاوعقيقا

তারা বেগুনী রঙ্গের ডাগর ডাগর চোখে মালা গলায় মুতী এবং আক্বীক কে যবরযদ পাথরের নিচে লাগিয়ে অভিজাত্যে আগমন করবে। সহল বিন সায়অদ বলেন নবী করিম (স.) বলেন যদির দুনিয়ার স্থায়িত্ব আল্লাহ তায়ালার কাছে মশার ডানার মত ও হত তাহলে কোন কাফের কে এক ফোটা পানিও দেয়া হতনা। (তিরমিযি, হাকেম)

اذا كان شئى لا يساوى جميعه :: جناح بعوض عندمن كست عبده

সব মিলে যদি সে সত্তার প্রশংসা করা হয় যার গোলাম তুমি, তারপরও

মাছের পাতির সমানও হবেনা।

واشغل جزء منه كلك ما الذى:: يكون ذالحال قدرك عنده

এ সমস্ত জিনিষের কোন অংশ যদি তোমাকে ব্যস্ত করে ফেলে তাহলে এ অবস্থায় তোমার মালিকের সম্মুখে কি মালিকত্ব রইল।

মোট কথা হল দুনিয়ার গ্রহনযোগ্যতা আল্লাহ তায়ালার কাছে শুধু এতটুকুই যে দুনিয়াকে আল্লাহ তায়ালা মূল উদ্দেশ্য বানাননি বরং দুনিয়াকে তো মূল উদ্দেশ্যের জন্য পথ প্রদর্শক বানানো হয়েছে। এমনি ভাবে দুনিয়া স্থায়িত্বের স্থান নয়। আর না পুরস্কারের স্থান বরং এখানে কষ্ট ও ক্লেশ রয়েছে। পরীক্ষা এবং আমল আম্বিয়া ও আউলিয়া এবংআমল করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। অধিকাংশ মুর্খদার ও কাফের দুনিয়ার আম্বিয়াও আউলিয়া এবং আব্দুল গন দুনিয়া থেকে বাচার চেষ্টা করেছেন। দুনিয়া গ্রহন যোগ্যতা আল্লাহ তায়ালার নিকট কি? এতেই আপনার অনুমান হবে যে, আল্লাহ তায়ালা দুনিয়াকে গুরুত্ব হীন ও ঘৃনা করেছেন বরং ক্রোধান্বিত বস্তুর মধ্যে গন্য করেছেন। এমন কি দুনিয়াতে বসবাস কারীকে এবং একে মহব্বত কারী কেও ক্রোধান্বিত ঘোষণা করেছেন। জ্ঞানীদের কে অভিশপ্ত আখেরাতের শেষ সম্বল অর্জন করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) বলেন, নবী করিম (স.) এরশাদ ফরমান দুনিয়া অভিশপ্ত, এতে যা কিছু আছে তাও অভিশপ্ত। শুধু আল্লাহ পাকের স্বরন ব্যতীত। সে অভিশপ্ত নয় এবং জিকরুল্লাহর নিকটবর্তী ব্যক্তি ও অভিশপ্ত নয়। হোক সে শিক্ষক বা শিক্ষার্থী। (তিরমিজি) এ হাদীছ দ্বারা দুনিয়াকে লা'নত করা গালী দেয়া উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং আবু মুছা আল আশয়ারী (রহ.) বলেন, নিসন্দেহে নবী করিম (স.) এরশাদ ফরমান তুমি দুনিয়াকে গালি দিওনা, কারণ দুনিয়া মুমিনের উত্তম সওয়ারী।যার সাহায্যে মুমিন অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌছে যায় এবং এর দ্বারা অমঙ্গল থেকে নাজাত হাসিল করে। যখন বান্দা বলে আল্লাহ পাক জগতকে অভিশপ্ত ঘোষনা করেছেন। তখন দুনিয়অ বলে আল্লাহ পাক দুনিয়াকে তার প্রভুর নাফরমনী করার কারনে লা'নত বর্ষন করেছেন। এর দ্বারা তাই বুঝা যাচ্ছে যে দুনিয়াকে অভিশপ্ত এবং ভাল মন্দ বলা যাবেনা।

পূর্বের দুটি হাদীছ এর মাধ্যেমে মধ্যম পন্থার এই মতামত বের হয়যে, দুনিয়াকে হালাল মনে করা এবং উপকার প্রত্যাশীর জন্য লা'নত করা হয়েছে

দুনিয়া মশার মত বস্তুতে ও আল্লাহর স্বরণ থেকে বেখবর করে দেয়। যেমন কোন কোন সলফে সালেহীন থেকে বর্ণিত আছে- এমন সব বস্তু যা আল্লাহর তায়ালার স্বরনে রেকর্ড সৃষ্টি করতে চায়। সেতা সন্তানের এর মধ্যে থেকেই হোক অথবা ধন সম্পদের শাখা প্রশাখা পূর্বে থেকেই প্রত্যাশী তাই পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهب وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر فى الاموال والاولاد۔(حديد)

তোমরা জেনে রাখ, পার্থীব জীবন ক্রীরা কৌতুক, সাজ সজ্জা আর পাস্পরিক অহমিকা এবং ধন ও জনের প্রাচুর্য ব্যতীত আর কিছু নয়। আর যে কিনিষ আল্লাহ তায়ালার নৈকট্যের মাধ্যমে হয় অথবা ইবাদতে স্থিরিকৃত হয় মানুষ এর প্রশংসায় পঞ্চ মুখ হয়ে থাকে। যদি দুনিয়ার জিনিষ আল্লাহর নৈকট্যের মাধ্যম হয় তাহলে দুনিয়া ধ্বংসের উপযোগী হবেনা। বরং সে জিনিষের প্রলুব্ধ করা হয়। বিশেষত এর দিকে ইঙ্গিত করে বলা হয়-

الاذكر الله وما والاه او عالم اومتعلم

আল্লাহকে যে স্মরন করে সে অভিশপ্ত নয়। আর সে ও অভিশপ্ত নয় যে আল্লাহর নিকট আছে। হোক সে শিক্ষক বা ছাত্র। এরকম আলোচনা অন্য হাদীছে রয়েছে-

فنعمت مطية المؤ من عليما:: يبلغ الخير وبها ينجو من الشر

মুমিনের উত্তম বাহন হলো যার সাহায্যে কল্যান পর্যন্ত পৌছে আর এর সাহায্যে অকল্যান থেকে মুক্তি পায়। ইতি পূর্বে যা আলোচনা করা হয়েছে এই আলোচনা উভয় হাদীছের মত পার্থক্য হয়ে যায়। সুতরাং ইমাম গাযালী ৬ষ্ঠ অধ্যায় বলেন- নবী করিম (স.) ফরমান কোন কোন সময় বান্দার এতই প্রশংসা করা হয় যে পূর্ব ও পশ্চিম দিগন্তের মাজখানের অংশ প্রশংসায় কাজ। কিন্তু আল্লাহ পাকের নিকট এই প্রশংসা পাখার সমকক্ষতাও রাখেনা। হযরত আবু হোরায়রা (রা.) বলেন নবী করিম (স.) বলেছেন কিয়ামতের দিন একজন মোটা সোটা লোক আগমন করবে কিন্তু আল্লাহ পাকের কাছে তার মর্যদা মশার পাখনার মত ও হবেনা। চাও তো কোরআন শরীফের এই আয়াত পড় যার অর্থ হল আমি তার জন্য কিয়াততের দিন শোভা বর্ধন করবনা। (বুখারী)

উলামায়ে কেরাম এই হাদীছের ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন, এদের কাছে আযাবের মোকাবেলায় কোন আমল থাকবেনা আর না কর্মের পূণ্য যেমন ভাস্কর্যের তুলনা করা হয় এবং তা স্বতন্ত্র মীমাংসা । যাদের কাছে কোন আমল থাকবেনা তাকে জাহান্নামের নিক্ষিপ্ত করা হবে। হযরত আবু ছায়ীদ খুদরী(রহ.) বলেন যে, তেহামা পাহাড়ের সমান লোকের আমল নামা কিন্তু আল্লাহ তায়ালার কাছে এর কোন পূন্য নেই।

কোন কোন আলেম বলেন এ বাক্য দ্বারা পারিভাষিক অর্থ বুঝায়। আসল কথা হল এর কোন উদ্দেশ্য হবেনা। যে লোক খাবারের মধ্যে ঘি ইত্যাদির গুরুত্ব দেয় এদের জন্য এই হাদীছ ঘি এর অসম্মান মনে হবে। এজন্য কোন কোন লোক তার আত্ম সম্মান বেশী গন্য করে। হাদীছ শরীফে রয়েছে নবী করিম (স.) এরশাদ ফরমান এখানে অভিশপ্ত হৃষ্ট পুষ্ট একজন আলেম আছে।

নমরুদের নাকে মশা প্রবেশের ঘটনা ঃ

হযরত ওয়াহাব ইবনে মোনাব্বেহ (রা.) বলেন, আল্লাহ পাক মশাকে নমরুদের জন্য প্রেরন করেন। নমরুদ তখন তার বিশাল সৈন্য বাহিনীর বেষ্টনীতে ছিল। এত সৈন্য ছিল যে তা অনুমান করা যায় না। নমরুদ যখন মাশাকে দেখল তখন সৈন্য বাহিনী থেকে পৃথক হয়ে গেল। ঘরে প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করে দিল এবং পর্দা টানিয়ে দিল। কিছুক্ষন পর গাধার আওয়াজ গিয়ে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষন করতে লাগল। এমন সময় একটি মশা তার নাকে প্রবেশ করে মস্তিষ্ক পর্যন্ত পৌছে গেল। মশাটি চল্লিশ দিন পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করে নমরুদ কে ব্যতি ব্যস্ত করে রাখল। ক্ষনিকের জন্যও মশাটি বের হয় নি। দাম্বিক নমরুদের মাশা ভুলণ্ঠিত হবার উপক্রম। সর্বশেষে নমরুদের এই অবস্থা হল যে, ব্যক্তি নমরুদের মাথায় আঘাত করতো সেই তার কাছে অতি প্রিয় হত। পরে সে মশাটি মুরগীর বাচ্চার মত নিরাপদে বের হয়ে আসে। মনে হয় মশাটি বলছিল ঃ

ذلك يسلط الله رسله على من يشاء من عباده (القرآن)

আল্লাহ পাক নবী রাছুলগণকে এমনি ভাবে যে বান্দার উপর ইচ্ছা করেন বিজয়ী করেন । কিছুক্ষন পর নমরুদ মরেগের । মুহাম্মদ বিন আব্বাস আল খাওয়ারিজীমী ওযীর আবুল কাশেম আলমাযনী কে গ্রেফতার করার সময়

একবিতা পড়েনঃ

لا تجبو امن صيد صعو بازيا:: ان الاسود تصاد بالخرفان

ছোট একটি চড়ুই পাখী বাজ পাখী শিকার করে ফেলল, তবে এতে বিস্ময় প্রকাশ করোনা কেননা বকরীর বাচ্চা ও (কোন কোন সময়) বাঘকে শিকার করে ঃ

قد غرت املاك حمير فأرة:: وبعوضة قتلت بنى نعان

একটি ইদুর লাল রঙ্গের সমস্ত ছামান ডুবিয়ে দিল এবং একটি মশাই গোত্র (নমরুদকে) হত্যা করে।

মালাকুল মউত কর্তৃক মৃত্যুর জরিপ করা:

জাফর ছাদেক ইবনে মুহাম্মদ আল বাকের তার পিতার বরাতে বর্ণনা করেন যে, একদা হযরত আযরাইল (আ.) কে নবী করিম (স.) এক আনসারী সাহাবীর মৃত্যু যন্ত্রনা দেখে বল্লেন আমার সাহাবীকে সৌজন্য মুলক আচরন করিও। কারণ সে মুমিন। হযরত আযরাইল (আ.) জবাব দিলেন যে, আমি সব মুমিনের উপরই সৌজন্য মুলক আচরন করি। এমনি ভাবে আমি প্রতিটি লোকের দৈনিক পাঁচ বার জরিপ করি। আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত প্রান বের করার শক্তি আমার নেই। জাফর বিন মোহাম্মদ বলেন আমি বুঝতে পারলাম তিনি নামাজের সময় জরিপ করেন। ইতি পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে, হযরত আযরাইল (আ.) ই প্রতিটি প্রাণীর প্রান কবজ করার জন্য আদিষ্ট।

মশার সৌন্দর্য ঃ

মশার অবয়ব খুব ছোট এবং অতি সুন্দর। তাছাড়া আল্লাহ পাক তার মাথার প্রথমাংশে শক্তি সংরক্ষন, মাঝের অংশে চিন্তা এবং শেষ অংশে স্মরনশক্তি দান করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে দর্শন শক্তি, স্পর্শ করার যোগ্যতা এবং ঘ্রান নেয়ার শক্তি দান করেছেন। তাছাড়া খাবারের রাস্তা, অপ্রয়োজনীয় জিনিষ বের হওয়ার রাস্তা, পেট নারিভুড়ি এবং হাড় ও তৈরী করেছেন। আল্লাহ পাক কতই না মহান। তিনি কোন জিনিষ অনর্থক সৃষ্টি করেন নি। আল্লামা যমাখশরী ছুরা বাকারার তাফসীরে কবিতা লিখেছেন-

يا من يرى مد البعوض جناحها:: فى ظلمة الليل البهيم الاليل

হে ঐ সত্তা! যিনি অমাবশ্যার অন্ধকারে ও মশার পাখের উড়ার দৃশ্য দেখেন।

ويرى مناط عرو قها فى نحوها:: والمخ فى تلك العظام النحل

আরো দেখেন তার বুকের রগের স্থান এবং অতি সূক্ষ্ম হাড্ডির মধ্যে মগজ ও দেখেনঃ

امنن على بتوبة تمحوبها:: ماكان منى فى الزمان الاول

তুমি আমাকে তওবাহ অনুগ্রহ কর, যাতে বিগত দিনের পাপ মিটে যায়। ইবনে খাল্লেকান অন্যান্য আলেমদের উদ্বৃতি দিয়ে লিখেছেন ইমাম যমাখ শরী ও এই কবিতা গুলো তার সমাধিতে লিখে দেয়ার জন্য ওছিয়ত করেন কবিতার শেষাংশে তাও আছে-

اغفر لعبد تاب من فرطاته:: ماكان منه فى الزمان الاول

তুমি বান্দাকে মাফ করে দাও, যে যমানার কৃত পাপ থেকে তাওবাহ করে।

ইমাম যমাখশরী (রহ.)ঃ

ইবনে খাল্লেকান প্রমুখ লিখেছেন যে, ইমাম যমাখশরী (রহ.) ছিলেন মুতাযেলা মতাব লম্বী। তিনি এর প্রচার ও করতেন। তিনি কারো কাছে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করলেও বলতেন যে আমি কাশেম মুতাযেলী। তার প্রথম লিখা তাফসীরে কাশ শাফ। সুতরাং তিনি এই খুৎবাহ লিখে আল্লাহর প্রশংসা ও নবী করিম (স.) এর উপর দরুদ পড়েন-

الحمد لله الذى جعل القرآن

"সমস্ত প্রশংসা তার যিনি কোরআন বানিয়েছেন (সৃষ্টি)।

جعل শব্দটি মুতাযেলাদের মতে সৃষ্টি অর্থে ব্যবহৃত। তাফসীরের অধিকাংশ কিতাবে আছে ঃ

الحمد لله الذى انزل القرآن সমস্ত প্রশংসা তার যিনি কোরআন অবতীর্ণ করেছেন কিন্তু একথা স্বরন রাখা চাই যে, ইহা লিখকের সংশোধন অথবা শুদ্ধনয় বরং পরবর্তীতে লোকেরা এমন করে লিখে দিয়েছেন মনে করতে হবে। ৫৩৮ হিঃ তিনি আরাফাত রাতে ইন্তেকাল করেন।

দুশ্চিন্তা দূরিভূত হওয়ার আমল ঃ

ইমাম আবু রিন্দার আবু বকর মুহাম্মদ বিন আল ওয়ালিদ আল ফিহ্‌রি আত্তারতুসী, তিনি একজন খোদাভীরু, পরহেজগার, আদবি, এবং স্বল্প ভাষী লোক ছিলেন। তিনি ৫০২হিঃ ইস্কান্দরিয়াতে ইন্তেকাল করেন। তার কিতাবে লিখেছেন মুত্বরিফ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আবু মাছয়াব আল মাদানী বলেন যে, আমি যখন মনসুরের দরবারে এলাম তখন মনসুর চিন্তিত ছিলেন। কোন কথা বলছিলেন না। সম্ভত তার কারণ এই ছিলযে, তার কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু তার কাছ থেকে পৃথক হয়ে গিয়ে ছিল। কিছুক্ষন পর মনসুর আমার দিকে ফিরে বল্লেন এসো মুত্বরিফ, দুশ্চিন্তা আমার পর এতই প্রবল হয়েছে যে, মনে হয় আল্লাহ ব্যতীত আর কেহ তা নিরসন করতে পারবেনা। কোন দোয়া আছে কি যার দ্বারা তার বিদুরীতে হয়? আমি বল্লাম জনাব আমাকে মুহাম্মদ বিন ছাবেত আমর বিন ছাবেত বসরী এর উদ্ধৃতি দিরা শুনয়েছেন যে একদা বসরার এক লোকের কানের ভিতর মশা প্রবেশ করে পর্দার নিকট গিয়ে শ্রবন শক্তি পর্যন্ত দখল করে ফেলে। যে কারণে রাতের ঘুম হারাম হয়েগেল। অতএব হযরত বসরী (রহ.) এর কোন এক শাগরেদের মধ্য থেকে কেহ পথ বাতালে দিলেন যে, তুমি নবী করিম (স.) এর দোয়া পড়।যা তিনি জংগল এবং দরিয়ার বিভিষিকাময় স্থানে পড়তেন। তখন আল্লাহ পাক তাকে মুক্ত করেন। বছরার লোকটি বল্ল তাহলে দোয়াটি কি?

তিনি জবাব দিলেন, বিস্তারিত কথা হল আমি হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে শুনতে পেরেছি যে, তিনি বলেন একদা العلاء الحضرمى কে কিছু সৈন্য সহ বাহরহিনে প্রেরণ করেন। এদের মধ্যে, আমি ও ছিলাম। রাস্তা অতিক্রম করার সময় একটি জংগল দিয়ে যাচ্ছিলাম। এমন সময় আমি খুব তৃষ্ণা অনুভব করলাম। العلاء الحضرمى তখন বাহন থেকে অবতরন করে দু রাকায়াত নামাজ আদায় করে দোয়া করেন।

يا حليم يا عليم يا على يا عظيم

(হে আল্লাহ) আমাদের কে পানি দ্বারা তৃপ্ত করে দিন। তিনি এতটুকু বলতে না বলতেই একটু মেঘ পাখির ডানার মত এসে সমস্ত আকাশ ছেয়ে গেল। তার পরে এমন বৃষ্টি হল যে, আমাদের পাত্র পানিতে ভরে গেল। আমাদের সাওয়ারীকেও পান করালাম। কিছুক্ষন পর আমরা যাত্রা করলাম। শেষ পর্যন্ত

আমরা উপসাগরে পৌছে গেলাম। সাগরের উত্তাল উর্মীমালা গুলো তীরে আছড়ে পড়ছিল । এরকম আর ইতিপুর্বে কখনো দেখিনাই। সাগর পার হওয়ার জন্য কোন নৌকা ছিলনা। আবার علاء الحضرمى দুরাকাত নামাজ উপরোক্ত শব্দ গুলো দ্বারা দোয়া কড়লেন ঃ

يا حليم يا عليم يا على يا عظيم

আমাদেরকে সাগর পারকরে দিল। অতঃপর علاء الحضرمى ঘোড়ার লাগাম ধরে বল্লেন ভাই সব আল্লাহর নাম নিয়ে হাটতে থাকুন। হযরত আবু হোরায়রা (রা.) বলেন এতেই আমরা পানিতে হাটতে লাগলাম। আল্লাহর শপথ এতে আমাদের পা তো ভিজেই নি মৌজা ও না । আর না কোন জানওয়ারের খড়া। সৈন্য সংখ্য ছিল প্রায় চার হাজার। সুতরাং বসরার লোকটি এই দোয়া পড়লেন। কিছু ক্ষন পর ভন ভন করে দুটি মশা উড়ে এলো এবং দেয়ালে গিয়ে টক্কর খেল এবং সে ব্যক্তি মক্ত হয়ে গেল।

একথা শুনেই খলিফা মনসুর কেবলার দিকে ফিরে গেলো এবং এই দোয়া পড়তে আরম্ভ করলো। মাত্বরাফ বলেন বেশ কিছুক্ষন পড় তিনি আমার দিকে মনোযোগ দিলেন এবং আমার নাম নিয়ে বলতে লাগলেন মাত্বরাফ আমা চিন্তা সব দুর হয়ে গেছে। এর পর তিনি খানা চাইলেন এবং আমাকে সাথে নিয়ে খানা খেলেন।

আরেকটি ঘটনা এবং দোয়াঃ

অনুরূপ আরো একটি ঘটনা ঐতিহাসিক ইবনে খাল্লেকান মুসা আল কাজিম ইবনে জাফর ছাদেক (রহ.) এর জীবনীতে উল্লেখ করেছেন। একদা মুসা আল কাজিমকে খলিফা হারুনার রশিদ বাগদাদে তাকে বন্দী করলেন । কয়েক দিন পর হারুনুর রশিদ কতোয়ালকে ডেকে পাঠান এবং তাকে বলেদেন যে আমি স্বপ্নে এক হাবশী কে দেখেছি। তার হাতে একটি ক্ষুদ্র বল্লম ছিল। সে আমাকে বলতেছিল যে মুসা আল কাজিম কে মুক্ত করে দাও। অন্যথায় আমি তোমাকে এই বল্লম দ্বারা হত্যা করে ফেলব। তুমি এখন গিয়ে তাকে মুক্ত করে দাও। এর সঙ্গে তাঁকে ৩০,০০০/- হাজার স্বর্ণ মদ্রা হাদিয়া দিয়ে দাও। তুমি আরো তাকে বলেদিবে যে, যদি আপনি আমার কাছ থেকে কোন কিছু অঙ্গীকার নিতে চান তাও দিব। অন্যথায় মদীনা মনোওয়ারা গেলে আপনার যা ইচ্ছা তাই

করবেন। কতোয়াল বলেন আমি মুসা কাজিম এর কাছে অবিকল সংবাদটাই পরিবেশন করলাম। আমি আরো বল্লাম তা বর্তমান ব্যবহার একদম বিস্ময় কর দেখলাম। মুসা আল্ কাজিম বল্লেন দেখ আমি তোমাকে গোপন কথা বলব যে, রাতে আমি শুয়ে। ছিলাম। তখন নবী (সা.) শুভাগমন করলেন। তিনি এসে বল্লেন ওহে মুসা। তোমাকে অন্যায়ভাবে বন্দী করা হয়েছে। তাই তুমি এ দোয়া পড়। তুমি অদ্য রাতেই বন্দী খানায় থাকবে আর না। তোমাকে মুক্ত করে দেয়া হবে। দোয়াটি হল এই ঃ

يا سامع كل صوت يا سابق كل فوت ويا كاسى العظام لحما ومنشر ها بعد الوت اسالك باسمائك العظام وباسمك الاعظم الاكبر المخزون المعروف الذى لم يطلع عليه احد من المخلوقين يا حليما اذا نلة لا يقد على اناته يا ذا المعزون الذى لا ينقطع معروفه ابدا ولا نحصب له عددا فوج عنى

অতঃপর তাই হল যা তুমি আমাকে দেখছ। অর্থাৎ তুমি মুক্তির পয়গাম নিয়ে এসেছ।

মূসা আল কাজিমের মৃত্যুঃ

১৮৭ অথবা ১৮৩ হিঃ বাগদাদে মুসা আল কাজিমের মৃত্যু হয়। কেহ বলেছেন তিনি জেলখানায় বন্দী অবস্থায়ই মৃত্যু বরণ করেন। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন মুসা আল কাজিমের কবরের পাশে দোয়া পরীক্ষিত।

একথা খতীব আবুবকর এর উদ্বৃতিতে পাওয়া যায়। ইবনে খাল্লেকান ইয়াকুব ইবনে দাউদের জীবনীতেও লিখেছেন যে, খলিফা মাহদী মুসা আল কাজিম কে একটি কূপে বন্দী করে এর উপরে একটি গম্বুজ তৈরী করে দেন। সেখানে তিনি ১৫ বছর বন্দী থাকেন। সেখানে তার খাদ্য পাঠানো হতো। নামাজের সময় তাকে অবহিত করা হত। মুসা বলেন যখন ১২ বছর অতিক্রান্ত হলো তখন ১৩ বছরের শুরুতে আমি একটি অতি মূল্যবান স্বপ্ন দেখলাম। স্বপ্ন দর্শন দাতা এই কবিতা বলে চলে যাচ্ছেন ঃ

حسن على يوسف رب فاخرجه:: من قعرجب وبيت حوله غمم

আল্লাহ তায়ালা ইউসুফ (আঃ) উপর দয়া করেছিলেন সুতরাং তাকে গভীর কূপ এবং মন ঘর থেকে বের করেছেন যার চার পাশে ধন্ সম্পদ ছিল।

মুসা আল কাজিম বলেন আমি আল্লাহ তায়ালার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলাম। আর আমি তাও বুঝতে পারলাম যে, এখন আমার যাবতীয় দুঃখ দুর্দশা লাগব হবে। এর পর আমি আরো১ বছর কাল সেখানে থাকলাম, কিন্তু কিছুই দেখলামনা। অতঃপর ২য় বছর স্বপ্ন দেখলাম যে, এক ব্যাক্তি এসে এই কবিতা গেয়েছেন ঃ

عسى فرج ياتى به الله انه:: له كل يوم فى خليقته امر

সত্বরই আল্লাহ পাক বিস্তৃতি দিবেন। কারণ তিনি তার সৃষ্টির ব্যাপারে প্রত্যহই নির্দেশ করেন। মুসা বলেন এরপর আমি আরো ১বছর সেখানে থাকলাম কিছুই দেখলাম না। ২য় বছরের শুরুতেই দেখলাম যে এক ব্যক্তিকে স্বপ্নে এই কবিতা পাঠ করতে দেখলাম ঃ

عسى الكرب الذى امست فيه :: يكون ورائه فرج قريب

যে বিপদে তুমি নিপতিত আছ সেখান থেকে সত্বরই মুক্তি পাচ্ছ এবং খোলা মেলা মেলা স্থানে আসছে।

فيا من خائف ويفك عاف:: وتاتى اهله انائى الغريب

ভীত সন্ত্রস্ত ব্যক্তি অচিরেই বিপদ বিদূরীত হবে এবং তুমি দূর দরজার ঘরের মালিকদের সহিত সাক্ষাৎ করবে।

মুসা আল কজিম বলেন যখন ভোর হয়েগেল তখন আমাকে কেহ আওয়াজ দিল আমি বুঝলাম আমাকে নামাজের সংবাদ দেয়া হচ্ছে। এমন সময় একটি রশি লটকানো হলো। আমি সে রশিটি আমার কোমরে বেধে নিলাম। অতঃপর আমাকে কূপ থেকে বের করে নিয়ে এলো। তার পর আমাকে হারুনুর রশিদের দরবারে নিয়া যাওয়া হল। আমাকে বলা হল আমিরুল মু'মিনীনকে সালাম করুন। তখন আমি বল্লম-

السلام عليكم يا امير المؤمنين المهدى

আমিরুল মু'মিনীন বল্লেন আমি মাহদী নই। তার পর আমি বল্লাম-

السلام عليكم يا امير المؤمنين الهادى

তখন আমিরুল মু'মিনীন বল্লেন আমি হাদী নই। তখন আমি বল্লম-

السلام عليكم يا امير المؤمنين هارون الرشيد

হারুনুর রশীদ বলেন, হ্যাঁ আম হারুনুর রশীদ। অতঃপর হারুনুর রশীদ

বল্লেন, হে ইয়াকুব! তোমার ব্যাপারে আমাকে কেহ অনুরোধ করেনি। একদিন আমি আমার সন্তানদের কাধে উঠালাম। সে সময় আমি তোমাকে (কুপ থেকে উঠাবার কথা স্বরন হলো। কারণ তুমি আমাকে বাল্যকালে এভাবে কাধে উঠিয়া খেলা করতে। মুসা কাজিম বলেন একথা বলে হারুনুর রশীদ আমাকে ইনাম দেয়ার আদেশ করেন এবং চলে যাবার অনুমতি দান করেন।

মশার শরয়ী হুকুমঃ দূর্গন্ধের কারণে তাহা হারাম।

ফায়দাঃ

আব্দুর রহমান ইবনে নাঈম বলেন আমি আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) এর পাশে ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি মশার রক্ত সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। তখন হযরত ইবনে ওমর (রা.) বল্লেন তুমি কোন গোত্রের লোক? বল্লাম আমি আরাকী। ইবনে ওমর (রা.) বলেন, ওহে লোকেরা! তোমরা দেখ, লোকটি আমার কাছে মশার রক্ত সম্পর্কে জানতে চায়। অথচ তারা নবী করিম (স.) এর দৌহিত্রকে হত্যা করেছে। আর আমি নবী করিম (স.) এর নিকট শুনেছি, তিনি বলেছেন হাসান (রা.) ও হোসাইন (রা.) চেয়ে বেশী কেহ নবী করিম (স.) এর সহিত সাদৃশ্য ছিলনা। (বুখারী, তিরমিযি)

হযরত আলী (রা.) বলেন, হাসান (রা.) জনাব রাছুলুল্লাহ (স.) এর বক্ষ থেকে মাথা (মোবারক) পর্যন্ত বেশী সাদৃশ্য ছিল। আর হোসাইন ছিল এর চেয়ে নীচের অংশের মধ্যে বেশী সাদৃশ্য পূর্ণ। (ইবনে হাব্বান, তিরমিযি).

হযরত হোসাইন (রা.) এর বংশধর নবী করিম (স.) এর হওয়া প্রমান

ইমাম শা'বী (রা.) বলেন হাজ্জাজ বিন ইউসুফ যখন জানতে পারলেন যে, ইয়াহইয়া ইবনে ইয়া'মার এর এই ধারনা যে, হযরত হাসান এবং হযরত হোসাইন (রা.) নবী করিম (স.) এর বংশধর এবং আহলে বাইয়াত এর অন্তর্ভূক্ত, তখন হাজ্জাজ খোরাসানের গভর্নর কুতাইবাহ ইবনে মুসলিমের নিকট এই মর্মে পত্র নিখেন যে ইয়াহইয়া ইবনে ইয়ামার কে আমার নিকট পাঠিয়ে দাও। ইয়াহইয়াও খুরাসানে বসবাস করছিলেন। সুতরাং ইয়াহ ইবনে ইয়াহ ইবনে ইয়ামার যখন হাজ্জাজের নিকট আসল শাবী বলেন আমি তখন হাজ্জাজের পাশেই ছিলাম। হাজ্জাজ ইয়াহ ইয়া সম্ভোধন করে বল্লেন, আমি জানতে পারলাম হযরত হাসান ও হযরত হোসাইন (রা.) রাছুল (স.) এ

আহলে বাইয়াতের অন্তর্ভূক্ত? ইয়াহইয়া ইবনে ইয়ামার বল্ল হা ঠিকই তো হে হাজ্জাজ।

ইমাম শাবী বলেন ইয়াহইয়া ইবনে ইয়ামারের দুঃসাহসী পূর্ণ কথায় আশ্চর্য হয়ে গেলাম যে, তিনি হে হাজ্জাজ বলে সম্বোধন করলেন, হাজ্জাজ বল্লেন আল্লাহ শপথ যদি আপনি এই কথার সমর্থনে কুরআনের প্রসিদ্ধ এই আয়াত ব্যতীত অন্য কোন আয়াত পেশ করতে পারেন তাহলে আপনি আমার হেফাজতে থাকবেন এবং আপনার কোন ভয় থাকবে না।

فقل تعالو اندع ابناء ناوابنائكم ونسائنا ونسائكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله على الكٰذبين .(ال عمران)

অতঃপর আপনি বলে দিন এসো, আমরা ডেকেনেই আমাদের পুত্রদের ও তোমাদের পুত্রদের এবং আমাদের স্ত্রীদের এবং তোমাদের স্ত্রীদের এবং আমাদের নিজেদের এবং তোমাদের নিজেদের আর তার পর চলে আমরা সবাই মিলে প্রার্থনা করি এবং তাদের প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাৎ করি যারা মিত্যা বাদী।

ইয়াহইয়া বল্লেন জি হা, আয়াতে করিমা দ্বারা তা প্রমান করে দেব। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

ووهبنا له اسحاق ويعقوب كلا هدينا ونو حا هدينا من قبل ومن ذريته داؤد وسليمان وايوب ويوسف وموسىٰ وهارون وكذالك نجز المحسنين وزكريا ويحىٰ ويسى والياس كل من الصالحين.

আমি তাকে দান করেছি সহাক এবং ইয়াকুব। প্রত্যেককেই আমি পথ প্রদর্শন করেছি। তার সন্তানদের মধ্যে দাউদ, সোলায়মান, আইউব, ইউসুফ, মুসা ও হারুনকে। এমনি ভাবে আমি সৎকর্মীদেরকে পুরস্কার দিয়ে থাকি। আরও যাকারিয়া, ইয়াহইয়া, ঈসা এবং ইলিয়াসকে, তারা সবাই পূন্যবানদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন।

পবিত্র কুরআনের আয়াত পাঠ করার পর ইয়াহইয়া ইবনে ইয়ামার বলেন আল্লাহ পাক হযরত ঈসা (আ.) ও ইব্রাহীমকে বংশদের মধ্যে পণ্য করেছেন। অথচ হযরত ঈসা (আ.) পিতাই ছিলেন না। আবার ঈসা (আ.) ও ইব্রাহীম (আ.) এর মাঝে এক বিশাল সময় অতিবাহিত হয়েছেন। যা হযরত হাসান ও হোসাইন (রা.) এবং নবী করিম (স.) এর মাঝে অতি বাহিত হয়নি।

হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ বললেন, ঘটনাতো আপনি খুব সুন্দর করে বর্ণনা করলেন। আল্লাহর কছম আমি অসংখ্য বার পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেছি। কিন্তু আমি কখনও এই আয়াতের প্রতি ভালভাবে লক্ষ্য করিনি। এতো দেখি অত্যাশ্চর্য ও বিস্ময় কর প্রমান । অতঃপর হাজ্জাজ ইয়াহ ইয়া কে বল্লেন আমার ব্যাপারে আপনার মতামত কি? আমিতো স্বর চিহ্নে ভূল করিনি। (আরবী ভাষায় কারক চিহ্ন) ইয়াহা ইয়া ইবনে ইয়ামার চুপ হয়ে গেলেন। হাজ্জাজ বল্লেন আমি আপনাকে কছম দিয়ে বলছি সত্বর বলুন ইয়াহ ইয়া বলেন হে আমীর! আপনি যদি আমাকে কছমই দিলেন তাহলে তা স্বত্বর ই বলছি। আপনি তো যেরকে পেশ এবং পেমকে যের পড়ে থাকেন। হাজ্জাজ বল্লেন কথাতো তাই আল্লাহর কছম প্রকাশ্য এরাব কে ভূল করা হয়েছিল। হাজ্জাজ এ ঘটনায় প্রতি ক্রিয়াশীল হয়ে খোরাসানের গভর্নল কে কুতাইবাহ ইবনে মুসলিম এর নিকট লিখে পাঠান। তখন ইয়াইয়া ইবনে ইয়ামার কে তোমরা কাযী নিযুক্ত করে নিও। কোন কোন জ্ঞানী মনিষী লিখেছে যে, হাজ্জাজ ইয়াহ ইয়াকে বলেছিলেন যে, আপনি শুনেছেন যে, আমি এরাবে ভূল করি। ইয়াহ ইয়া বল্লেন মাত্র একটি অক্ষরে। হাজ্জাজ বল্লেন তা কোন স্থানে? ইয়াহ ইয়া বল্লেন ভূলটি পবিত্র কুরআনে। হাজ্জাজ বল্লেন তাতো আবার মারাত্নক ভূল। ভূলটি কি? ইয়া ইয়া বল্লেন তা হচ্ছেঃ

قل ان كان ابائكم واخوانكم وازواجكم عشير تكم واموال ن اقتر قتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن تر ضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد افى سبيله فتربصوا حتى ياتى الله بامره

বল তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান তোমাদের ভাই, তোমাদের পত্নী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধন সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা, যা তোমরা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান যাকে তোমরা পছন্দকর আল্লাহ্ তার রাছুল ও তার রাহে জিহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত এতে আপনি পেশ পড়ে থাকেন। হাজ্জাজ বল্লেন আমার বিশ্বাস আপনি আমার কোন কারক চিহ্নের ভূল শুনেন নি। অতঃপর তাকে খুরাসান পাঠিয়ে দেয়া হল। ইমাম শা'বী বলেন এমন মনে হচ্ছে যে, হাজ্জাজ বিন ইউসুফের কথোপকথন দীর্ঘায়ীত হওয়ার কারনে তার আসল বিষয় বস্তু ভুলে গেলেন।

ইয়াহইয়া ইবনে ইয়ামার এর জীবনীতে ইবনে খাল্লেকান লিখেছেন যে, এতে সামান্য ত্রুটি বিচ্যুতি রয়েছে। ইমাম দামিরী (রহ.) বলেন ইয়াহ ইয়া ইবনে ইয়ামারের কথা বার্তায় এ কথার বিস্তারিত ব্যাখ্যা পাওয়া যায় যে, ও এর জমীর এবং ومن ذريته এর যমীর হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর দিকে প্রত্যাবর্তিত الكواشى এবং ইমাম بغوى এর তাফসীরে একথা রয়েছে যে, সর্বনাম নুহ (আ.) এর প্রতি প্রত্যাবর্তিত। কারণ ইউনুস ও হযরত লুৎ (আ.) দ্বয়ের উল্লেখ পয়গম্ভরদের মধ্যে গন্য করা হয়েছে। আর একথা বলা হয়েছে যে, যাকারিয়া ইব্রাহীম (আ.) তাঁদের প্রত্যেক কেই বিশ্ব বাসীর উপর মর্যদা দান করেছি ইউনুস ও হযরত লূৎ দ্বয় নুহ (আ.) এ বংশধর। ইব্রাহীম (আ.) এর বংশধর নয়। কিন্তু দ্বিতীয় কথা অনুযায়ী এর প্রমান টি বিশুদ্ধ রয়েছে।

ইয়াহইয়া ইবনে ইয়ামার কে ?

ইবনে খাল্লেকান লিখেছে যে, ইয়াহ ইয়া ইবনে ইয়ামার একজন তাবেয়ী এবং কুরআনের জ্ঞানে পারদর্শী আলেম। নাহু শাস্ত্রের ও প্রসিদ্ধ শিয়া আলেম ছিলেন। কিন্তু উলামায়ে মুত্তকাদ্দিমীনদের গননায় তিনি ছিলেন শিয়াদের অন্তর্ভূক্ত। করণ তার কাছে শিয়া মত সাধারন ব্যাপার ছিল। তবে প্রবল নয়। কোন সাথীর মর্যদা ক্ষুন্ন করা ব্যতীত বরং আহলে বায়েতের মর্যাদার স্বপক্ষে ছিলেন। ইবনে খাল্লেকান বলেন একদা বসরার বিচারক ভাষন দিতে গিয়ে বলেন তোমরা আল্লাহকে ভয়কর, এই কারনে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে তার ধ্বংস হওয়ার কোন কারণ নেই। মূলত বসরা বাসীগন "হাওয়ারা" শব্দের মূল উদ্দেশ্য বুঝতে পারেন নি। তবে আবু সাইদ ইয়াহইয়া ইবনে ইয়ামারের নিকট এর উদ্দেশ্য বুঝার জন্য জিজ্ঞাসা করেছেন তখন তিনি বলেছেন যে, এর উদ্দেশ্য হল যে কেউ আল্লাহকে ভয় করে তার ধ্বংস এবং বিনষ্ট হওয়ার কোন কারণ নেই। কারণ ইমাম আছামাঈ এর উপর কথা বলতে গিয়া বললেন দুর্বল ইয়া ইবনে ইয়ামারের ইন্তেকাল ১২৯ হিঃ সনে হয়েছে।

ইয়ামার শব্দের উচ্চারন ا তে যবর দিয়ে কেহ পেশ দিয়ে ও পড়ছেন তবে প্রথমটিই অধিকতর বিশুদ্ধ।

স্বপ্নে হযরত আলী (রা.) এর কাছে একটি প্রশ্ন ঃ

নাছরুল্লাহ ইবনে ইয়াহইয়া আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের একজন

গণ্যমান্য ও প্রসিদ্ধ আলেম ছিলেন। তিনি বলেন একদা আমি স্বপ্ন যোগে হযরত আলী (রা.) কে দেখে তার কাছে জানতে চাইলাম হে আমিরুল মুমিনীন আপনি মক্কা বিজয়ের সময় বলেছিলেন যে, ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের ঘরে আশ্রয় নিবে সে নিরাপদে থাকবে। কিন্তু আপনার ছেলে হযরত হোসাইন (রা.) এর সহিত যে আচরণ করা হয়েছে তাতো সবারই জানা।

হযরত আলী (রা.) বল্লেন তুমি কি এব্যাপারে ইবনে ছাইগী এর কবিতা শুনেনি? আমি বল্লাম নাতো শুনি নাই। তিনি (আলী (রা.) বল্লেন যাওতো গিয়ে শুনে এস। এরপর আমি জাগ্রত হয়ে গেলাম। তাড়া তাড়ি তখনই আমি লড়াকু কবির কাছে গেলাম, এবং আমার দেখা স্বপ্নের আদ্যোপান্ত তাকে শুনালাম। স্বপ্ন শুনেই তিনি ফুফিয়ে কাদতে আরম্ভ করলেন। অতঃপর তিনি শপথ করে বর্ণনা করলেন যে, তিনি যে কবিতা গেয়েছেন তা কারো কাছ থেকে লিখেন নাই আর তিনি শুধু সেরাতেই দেখেছেন। অতঃপর তিনি এই কবিতা বলেন ঃ

ملكنا فكان العفو منا سجية:: فلما ملكتم سال بالدم ابطح

আমি মালিক হয়ে গেলাম তখন ক্ষমা ও দয়া করা আমার স্বভাবের ২য় অভ্যাসে পরিনত হয়ে গেল কিন্তু যখন তুমি মালিক হয়ে গেলে তখন রক্তের বন্যা বইয়ে গেল।

وحللتمو اقتل الاسارى وطالما:: عدونا على الاسرى فتفعو ونصفع

তুমি বন্দীদের রক্ত বৈধ ভাবছ। দীর্ঘ সময় পর্যন্ত দুশমন আমার বন্দীশালায় থাকে, কিন্তু আমি ক্ষমা করে দেই।

حسبكم هذا اتفاوت بيننا:: وكل اناء بالذى فيه وينضح

তোমার এবং আমার মধ্যে এতটুকু পার্থক্যই যথেষ্ট (দেখ মুল কথা হল) পাত্রে যে জিনিষ অতিরিক্ত হয় তা টাপকিয়ে পড়তে থাকে।

লড়াকু কবিঃ

তার প্রকৃত নাম ছা'য়াদ বিন মোহাম্মদ। তার উপধি আবুল ফাওয়ারেছ আততামিমী। কিন্তু ইবনে ছাইফী থেকে বেশ প্রসিদ্ধ। উপাধি হয় حيض بيض (লাড়ুক)। একদা তিনি লোক দিগকে কোন গুরুত্ব পূর্ণ ব্যাপারে ফেঁসে যেতে দেখে বলেন, এই সমস্ত লোকদের কি হল যে, তারা শোর গোলে পড়ে রয়েছে।

অর্থাৎ এমন বিশৃংখলায় নিপতিত রয়েছে যাথেকে বের হওয়ার কোন রাস্তাই খোলা নেই। তখন থেকে তার উপাধি حيض بيض রাখা হয়। তিনি হযরত ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর কাছ থেকে ফিকাহ শাস্ত্রের শিক্ষা করেন। কিন্তু ইলম ও শিষ্টাচার এবং কবিও কবিত্বের জয় হয়। তার কবিতা অত্যন্ত ভল হত। লোকেরা যখন তার বয়স সম্পর্কে জিজ্ঞেস করত তখন তিনি বলতেন আমি এই পৃথিবীতে অনুমানেই বেচে আমি। কারণ তার জন্ম তারিখ প্রকৃত ভাবে স্বরন ছিল। তিনি ৫৭৪ হিঃ সনে ইন্তেকাল করেন তার শ্রেষ্ঠ কবিতা গুলোর মধ্যে ঃ

ياطالب الرزق فى الافاق مجتهدا:: اقصر عناك فان الرزق مقسوم

ওহে দুনিয়াতে কষ্ট করে রিযিক অন্বেষণ কারী দৌড় ঝাপ কমাও কেননা রুযী তো বন্টন করা আছে।

الرزق يسعى من ليس يطلبه:: وطالب الرزق يسعى وهو محروم

যে ব্যক্তি রুযী তালাশ করেনা তার কাছে চলে যায়। আর রুযী অন্বেষণ কারী প্রচেষ্টা ব্যতীত বঞ্চিত থাকে।

ياطالب الطب من داء اصيب بها:: ان الطيب الذى ابلاك بالداء

ওহে রোগাক্রান্ত ঔষধ অন্বেষণ কারী, প্রকৃত ঐষধ প্রয়োগ কারী সেই যে, তোমাকে রোগ দিয়েছেন।

هو الطبيب الذى يرجى لعافية:: لا من يذهب لك الترياق فى السماء

ডাক্তার তো সেই যে, যার কাছ থেকে নিরাময়ের আশা করে। চিকিৎসক সে নয়, যে তোমাদের জন্য পানিতে স্বর্পের বিষ মিশিয়ে রাখে। এটাও তার কবিতাঃ

اله عما استاثر الله به:: ايها القلب ورع عنك الحرق

মাবুদ তিনিই যিনি মৃত্যু দেন, হে অন্তর যামী! অন্তরের তৃষ্ণা আমার উপর থেকে বিদূরীত করে দাও।

فقضاه الله لا يد فعه:: حول محتال اذا لا فرسبق

আল্লাহর ফায়সালা কেহ পরিবর্তন করতে পারেনা। তবে যখন নির্দেশ প্রদান করা হয়। (তখনই কেবল পরি বর্তির্ত হয়।

انفق ولا تخش اقلا لا فقد قسمت :: على العباد من الرحمان ادزاق

ব্যায় খুব কম, নিঃশেষ হওয়ার ভয় করোনা, কেননা আল্লাহর পক্ষ থেকে রিযিক বন্টিত ।

لا ينفع البخل مع دنيا موليه:: ولا يضرمع الاقبال انفاق

কারণ দুনিয়া থেকে বিদায়ী কৃপণ কোন উপকার করতে পারেনা আর না দুনিয়ায় আগমনে খরচে কোন ক্ষতি হয়।

মশা সম্পর্কে প্রবাদ ঃ

আবরগন বলেন هو اعز من مخ البعوض অর্থাৎ ইহা মশার মস্তিস্কের চেয়ে বেশী বিরল। তার তাও থাকে كلفتنى مخ البعوض তুমি আমাকে মশার মস্তিস্কের কষ্ট দিলে। যেমন উর্দুতে বাল হয়ে থাকে যে, তুমি আমাকে হিংস্র প্রাণীর মৃত্যুর কষ্ট দিয়েছে।

মশার উপকারিতা ঃ আল্লা তাআলার বানী -

ان الله لا يستحى ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها .(بقرة)

আল্লাহ পাক মশা বা তদপেক্ষ ক্ষুদ্র প্রাণীর উদাহরন দিতে মোটেও লজ্জা বোধ করেন না।

হযরত হাসান বসরী (রহ.) লিখেছেন যে, এই আয়াতের শানে নুযুল হল মক্কার কাফের রা এই ছুরা (বাকারা) ব্যতীত মধুপোকা এবং মাকড় শার ইত্যাদির উদাহরন দেয়ার কথা ঘৃনা করে যে, এই সমস্ত জিনিষ দ্বারা উদাহরন দেয়া হয়নি। কোন মুফাচ্ছির লিখেছেন যে, আল্লাহ পাক যখন পবিত্র কুরআনে মুনাফিকদের ব্যাপারে দুইটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বর্ণনা করেন-

مثلهم كمثل الذى استو قدنارا

তাদের দৃষ্টান্ত হল এমন ব্যক্তির ন্যায় যে অগ্নি প্রজ্জলিত করে।

او كصيب من السماء এই সমস্ত মুনাফিকদের উদাহরন হল এরকম যে, আকাশ থেকে বিদ্যুৎ চমকায়, অতএব কাফেররা বলে যে, আল্লাহ তায়ালা এ সমস্ত উদাহরন দেয়ার জন্য পাকা। তাই আল্লাহ পাক এই আয়াত অবর্তীন করেন। ইমাম কুসাই বলেন যে আবু উবায়দা প্রমুখ যারা উচ্চাঙ্গের মুফাস্সীর গনের মধ্যে গণ্য তারা বলেন فما فوقها এর মধ্যে একটি ঘৃনিত এবং ছোট বস্তুর দিকে ইশারা উদ্দেশ্য।

হযরত কাতাদাহ এবং জুরাইজ বলেন যে, না فما فوقها মশা দ্বারা বড় বস্তুই উদ্দেশ্য। মুফাস্সীর ইবনে আতিয়া বলেন ঝগড়ার কথা নয়। উভয় অর্থের ই ব্যবহার আছে।

بعير

(৭৬) উট

উট বিষ্ঠা দেয় সেজন্য তাকে بعير বলে। আরবীতে بعر۔ يبعر۔ البعير مضارع এবং ماضى উভয় কলমাতে যবর। (অর্থ হল উটে বিষ্ঠা দিল) এবং ধাতু মুল। بعر এর عين কলমাতে সাকীন। যেমন ذبح۔ يذبح۔ ذبحا এর عين كلمه তে সাকীন। অতএব ابن السكيت এর ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন। بعير শব্দটি اسم جنس নারী- পুরুষ উভয় টি বলা প্রযোজ্য। উটের নামের মধ্যে بعير শব্দটি বিলকুল এরকমই হয় যেমন মানুষের জন্য শব্দ انس এতএব جمل শব্দটি পুরুষের স্থানে এবং ناقه শব্দটি مؤنث এর স্থানে قعود যুবার বেলায় আর قلوص বাচ্চার বেলায় বলা হয়ে থাকে। কিন্তু এর বিপরীত কোন কোন আরবী থেকে বর্ণিত আছে যে, বলা হয়ে থাকে صرعتنى بعيرى অর্থাৎ ناقتى আমাকে আমার উটনী চিৎ করে ফেলে দিয়েছে। এবং شربت من لبن ناقتى অর্থাৎ আমি উটনীর দুধ পান করেছি। বয়স যখন ৯বা ৪বছর হয় তখন তাকে بعير বলা শুরু হয়ে যায়। এর বহু বচন بعران আসে কেহ কেহ ابا عير۔ اباعر۔ ابعر বলেছেন।

امام التفسير হযরত মুজাহিদ (রহ.) পবিত্র ক্বুরআনের এই আয়াত দ্বারা বলেছেন ঃ ولمن جاء به حمل بعير

আর যে ব্যক্তি তা গ্রহণ করবে তার একটি উট পরিমান মাটির গুলতি মিলবে। এখানে بعير দ্বারা উদ্দেশ্য গাধা। কারণ কোন কোন আরব গাধাকে ও بعير বলে। কিন্তু তা খুব লোকই বলে থাকে।

কতিপয় মাসআলা ঃ

কেউ যদি মৃত্যুর সময় بعير এর ওছিয়ত করে তাহলে এই অছিয়ত উটের মধ্যে গণ্য হবে। কিন্তু কেহ যদি বকরী'র ওছিয়ত করে তাহলে বকরা (ছাগ) অন্তর্গত হবেনা। যদি কেহ এর মতই ওছিয়ত করে যেমন উটনীর ওছিয়ত করল অথবা বকরা (ছাগ) ওছিয়ত করল তাহলে এই দু অবস্থায়ই উট এবং

বকরী অন্তর্গত নয়। ইবারতে তাই মনে হচ্ছে। কিন্তু প্রকাশ্য কথায় আরবদের বিপরীতে بعير কে حمل এর মান দেয়া হয়েছে।

ইমাম রাফেয়ী বলেন কখনো কখনো عرب كلام এর نص কে দুর করে দেয়ার কারনে একটি মধ্যস্থ মনে হচ্ছে। যেমন সাধারন পরিচয়ে بـــعيـــر এর ব্যবহার جـــمـــل অর্থ বেশী হতে থাকে। কিন্তু সাধারন পরিচয়ে বেশী ব্যবহৃত হয়না। তখন অভিধান এবং ভাষামত ব্যবহার করা হবে। ইমাম ছাবকী বলেন এ সমস্ত মাসাইলের মধ্যে نـــص এর বিপরীত বিশুদ্ধ করা সুদুর পরাহত মনে হয় কারণ ইমাম শফেয়ী (রহ.) ভাষা সম্বন্ধে অধিক জ্ঞানী ছিলেন।

এ কারনে কোন মাছয়ালা সাধারন ভাবে পরিচিত হওয়ার কারনে তার মূল লক্ষ্য থেকে বের হয়ে যাবেনা। একারনে কোন মাছয়ালা যদি হয় তাহলে সাধারন পরিচয়ে প্রসিদ্ধ। তবে ইমাম শাফেয়ীর এ কথার বিপরীতে اتبـــع ولا فـــلا ولـــى اتبـــاع ولـــه অর্থাৎ অভিধানের অনুসরন কর। অন্যথায় সাধারন পরিচয়ের অনুসরনই ভাল।

(২) কোন কুপে দুটি উট পড়ে গেল এবং একটি অপরটির উপরে উঠে গেল। যদি উপরের উটটিকে বল্লম দ্বারা আঘাত করা হয় এবং নীচের উটটি উটরের উটের ভারের কারনে মরে যায় তাহলে সেটি হারাম হবে। কারণ এর উপর বল্লমের আঘাত লাগে নাই। তবে যদি বল্লম উভয় উটের লাগে তাহলে উভয়টিই জায়েজ এবং হালাল। আর যদি একথা সন্দেহ জাগে যে, নীচের উটটি উপরের উটের বোঝার কারনে মারা গিয়েছে অথবা বল্লম ভেদ হয়ে মারা গিয়েছে তাহলে দেখতে হবে যে, তার বল্লম প্রমান বের হওয়ার পূর্বে লেগেছে না পরে এ অবস্থায় ইমাম বাগুবী (রহ.) এর ফতোয়া মতে হালাল এবং হারাম উভয়ের সম্ভাবনা মনে করতে হবে। যেমন কোন গোলাম নিখোজ হয়েছে তাহলে আসলে তাকে কাফফারায় করা আযাদ করা জায়েজ আছে অথবা নাই।

(৩) এমনি ভাবে কেউ যদি কোন দুর্বল প্রানীর উপর তীর নিক্ষেপ করে পরে উহা শক্তিহীন থাকে নাই বরং সে শক্তি শালী হয়ে জবাই করার অনুপযুক্ত হয়ে গেল, তাহলে তা হলাল হবেনা। যদি কেহ শক্তি শালী প্রানীর উপর তীর ছুড়ে অতঃপর সে শক্তিহীন হয়ে গেল এমতাবস্থায় যদি তা জবাই করার স্থানে চলে যায় তাহলে হালাল। আর যদি জবাই করার স্থানে চলে না যায় তাহলে

হারাম।

বাসর রাতের দোয়া ঃ

ان النبى ﷺ قال إذا تزوج احدكم امرأة او اشتر جارية او غلا ما او دابة فليأ خذبنا صيتها واليقل اللهم انى اسئلك خيره وخير ما جبل عليه واعوذبك من شره وشر ماجبل عليه واذا اشتر بعيرا فليأ خذروة سنامه واليدع بالبركة وليقل مثل ذالك ـ (ابو داؤد ـ نسائى ـ ابن ماجه)

হযরত রাসূল (স.) এরশাদ ফরমান তোমাদের কেউ যখন কোন মহিলাকে বিবাহ করে অথবা কোন দাসী বা কোন গোলাম কিংবা কোন পশুক্রয় করে তাহলে এর কপালে হাত রেখে এই দোয়া পড়বে, "হে আল্লাহ! আমি এর কল্যাণ এবং তুমি এতে যত কল্যাণ আছে এর থেকে তোমার কাছে পানাহ চাই। নবী করিম (স.) বলেছেন যখন কোন কিচ্ছু ক্রয় করবে তখন তার পৃষ্টের উচু হাড়ে হাতে ধরে বরকতের দোয়া করবে। এবং উপরোক্ত দোয়া করবে।

হাদীছে উটের আলোচনা ঃ

উবনে আছীর লিখেছেন যে, একদা খাল্লাদ বিন রাফে এবং তার ভাই উভয়ে একটি জির্নশীর্ন উটের আরোহন করে বদরের দিকে যাচ্ছিল। তারা যখন روحا নামক স্থানে পৌছল তখন উটটি বসে পড়ল। সুতরাং এ অবস্থায় তারা মান্নত করল যে, হে আল্লাহ যদি আমরা বদর পর্যন্ত পৌছতে পারি তাহলে আমরা আপনার নামে উট কুরবাণী করব। এমন সময় আমরা নবী করিম (স.) কে দেখতে পেলাম নবী করিম (স.) বল্লেন মঙ্গল হউক তোমাদের কি হল? আমরা তাকে (স.) আমাদের বিপদের কারণ অবহিত করলাম। নবী করিম (স.) অবতরন করতঃ এ উটের মুখে সামান্য পানি ঢেলে দিলেন। তারপর সামান্য পানি মাথায়, গর্দানে কাধে উঁচু কুঁজে পেছনের অংশে এবং কিছু পানি লেজে ঢেলে দিলেন। অতঃপর তিনি (স.) এরশাদ করলেন হে আল্লাহ খাল্লাদ এবং রেফায়া কে ভ্রমন করার সামর্থ দাও। দুই ভাই বলেন অতঃপর আমরা উটের উপর ছওয়ার হয়ে ভ্রমন করছিলাম। শেষ পর্যন্ত আমরা প্রথম কাফেলা কে পেয়ে গেলাম। আর যখন আমরা বদরে রৌছে গেলাম তখন উটনী বসে গেল। অতঃপর আমরা মান্নত মানার কারনে কুরবাণী করে এর সমুদয় গোস্ত দান (ছদকাহ)

করে দিলাম।

বাদীর বিরুদ্ধ উটের সাক্ষ্য প্রদানঃ

হযরত যায়েদ বিন ছাবিত (রা.) বলেন যে, আমি একদা নবী করিম (স.) এর সাথে কোন এক যুদ্ধে অংশ গ্রহন করে ছিলাম। আমরা যখন মদীনার রাস্তার মোড়ে পৌছলাম তখন এক গ্রাম্য আরব কে দেখলাম যে, সে একটি উটের নাকের রশি ধরে নবী করিম (স.) এর পাশে এসে দাড়িয়ে গেল। আমরা তার পাশে একত্রিত হয়ে গেলাম। সে নবী (স.) কে সালাম করল। নবী (স.) তার সালামের উত্তর দিলেন। নবী (স.) বললেন তুমি কেমন আছ? সকাল টা কিভাবে গিয়েছে? এমন সময় একজন লোক এলো। তাকে দেখে মনে হল যে, সে চৌকিদার । সে বলল হে আল্লাহর নবী (স.) এই অপরিচিত লোকটি আমার উট চুরি করেছে। এই কথা বলতেই তার উটটি উত্তেজিত হয়েগেল। কিছুক্ষন পর আবার তার রাগ প্রশমিত হয়ে গেল। নবী করিম (স.) তার উত্তেজনা এবং তার আওয়াজ মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। অতঃপর নবী করিম (স.) চৌকিদারের দিকে মনো নিবেশ করে বল্লেন তুমি তোমার দাবী প্রত্যাখ্যান কর। কেননা উটই তোমার বিপক্ষ সাক্ষ দিচ্ছে যে তুমি মিথ্যুক। সুতরাং চৌকিদার তার দাবী প্রত্যাহার করে নিল। অতঃপর নবী করিম (স.) গ্রাম্য লোকটির দিকে ফিরে বল্লেন, আমার নিকট এসেই তুমি কি বলছিলে? লোকটি বল্ল হে আল্লাহর নবী আমার পিতা মাতা আপনার জন্য কোরবান হউক আমি এই দোয়া পড়ছিলামঃ

اللهم صل على محمد حتى لا تبقى صلوٰة اللهم وابارك على محمد حتى لا تبقى بركة اللهم وسلم على محمد حتى لا يبقى سلام اللهم ارحم محمد حتى لا تبقى رحمة

হে আল্লাহ! যতক্ষন রহমত অবশিষ্ট থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মুহাম্মদ (স.) এর উপর রহমত বর্ষণ করতে থাকুন। হে আল্লাহ! যতক্ষন পর্যন্ত বরকত অবশিষ্ট থাকে ততক্ষন 'পর্যন্ত মুহাম্মদ (স.) এর উপর বরকত অবর্তীণ করুন। হে আল্লাহ! যতক্ষন পর্যন্ত দরুদ এবং সালাম অবশিষ্ট থাকে ততক্ষন পর্যন্ত মুহাম্মদ (স.) এ দরুদ ও ছালাম বর্ষণ কর। আল্লাহ! যতক্ষন পর্যন্ত রহমত ও মেহের বানী অবশিষ্ট থাকে ততক্ষন পর্যন্ত রহমত ও মেহের বানী করুন। একথা শুনে নবী করিম (স.) বললেন আল্লাহ এই কাজটি আমার জন্য উম্মুক্ত করে দেয়া

হয়েছে এবং উট আল্লাহ তায়ালার কুদরতে কথা বলছিল। আর ফেরেস্তারা আকাশ ঘিরে রেখে ছিলেন। (তিবরানী)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন, কয়েকজন মানুষ এক ব্যক্তি কে নিয়ে নবী করিম (স.) এর কাছে উপস্থিত হল, সুতরাং তারা সে ব্যক্তি বিরুদ্ধে সাক্ষ দিলযে, সে তাদের সব কিছু চুরি করে নিয়ে গেছে। একথা শুনে নবী করিম (স.) সেখানে থেকে চলে যাবার উপদেশ দিলেন সুতরাং সে এই কবিতা পড়তে পড়তে চলে যাচ্ছিল ঃ

اللهم صلى محمد حتى ليبقى من صلواتك شئى وبارك على محمد حتى لا يبقى من بركاتك شئى وسلم على محمد حتى لا يبقى من سلامك شئى ـ

হে আল্লাহ! মুহাম্মদ (স.) এর উপর দারুদ এবং সালাম। ততক্ষন পর্যন্তই যতক্ষন আপনার কাছে অবশিষ্ট থাকে। হে আল্লাহ! আপনার কাছে যতক্ষন পর্যন্ত বরকত খতম নাহয় ততক্ষন পর্যন্ত মুহাম্মদ (স.) এর উপর এত দরুদ ও ছালাম যত আপনার নিকট আছে। এমন সময় উটনী কথা বলে বসল যে, হে আল্লাহর নবী (স.) লোকটি আমাকে চুরি করা থেকে মুক্ত (অর্থাৎ সে আমাকে চুরি করেনি) অতঃপর নবী করিম (স.) এরশাদ ফরমালেন, লোকটি আমার কাছে কে উপস্থিত করে দিতে পারবে? অতঃপর আহলে বদরের ৭০ জন লোক সে লোকটির অন্বেষণে বের হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষন পর তারা লোকটি সহ নবী করিম (স.) এর দরবারে এসে উপস্থিত হলেন। নবী করিম (স.) বল্লেন, তুমি এখন কি করছিলে? লোকটি বল্ল, আপনি বলেছিলেন এজন্য আমি মদীনার অলিগলিতে ফেরেস্তার ভীর দেখছিলাম। এতই কাছা কাছি যে সে আমার ও আপনার মাঝ খানে আড়াল হয়ে পড়ে ছিল। অতঃপর নবী করিম (স.) বল্লেন তুমি অচিরেই পুলছিরাতে এ অবস্থায় যাবে যে তোমার চেহারা ১৪ তারিখের রাতের চাঁন্দ থেকে বেশী আলোকিত হবে।

হযরত তামীমে দারী (রা.) বলেন, একদা আমরা নবী করিম (স.) এর সাথে উপবিষ্ট ছিলাম। হঠাৎ একটি উট আমাদের পাশে দৌড়ে এলো। উটটি নবী করিম (স.) এর মাথা মোবারকের পাশে এসে আনচার করতে লাগল। নবী (স.) বল্লেন হে উট দাড়াও। যদি তুমি সত্যবাদী হও তাহলে সত্যই পুরস্কার পাবে।

আর যদি তুমি মিত্যুক হও তাহলে মিথ্যার শাস্তি ভোগ করতে হবে। আর আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের কাছে আশ্রয় প্রার্থীকে নিরাশ করবেন না। আমি বল্লাম হে আল্লাহর রাছুল (রা.) উটটি কি বলছে? নবী করিম (স.) এরশাদ যে, উটটি এসেছে তা মালিক তাকে নহর করে তার গোস্ত খাওয়ার ইচ্ছা করেছিল। সুতরাং সে তার মালিকের কাছ থেকে ভেগে চলে এসেছে। আর তাই সে তোমাদের নবীর কাছে এসে ফরিয়াদ করছে। আমি বসাই ছিলাম। এমন সময় উটটির মালিক দৌড়ে আসছিল। উটটি তাকে দেখেই আবার নবী করিম (স.) এর মাথা মোবারকের নিকট এসে আশ্রয় চাইল। তারা এসে বল্ল হে আল্লাহর রাছুল! (স.) উটটি আমাদের কাছ থেকে তিন দিন যাবত পলায়ন করে রয়েছে। এখন তাকে আমরা আপনার কাছে দেখছি। একথা শুনে নবী করিম (স.) বল্লন উটটি আমার নিকট অভিযোগ করছে, উটের মালিকরা বল্ল হে আল্লাহর নবী! (স.) উটটি কি ধরনের অভিযোগ করছে? নবী করিম (স.) বল্লেন উটটি অভিযোগ করেছে যে, বেশ কয়েক বছর যাবৎ সে তোমাদের সাথে আছে। তোমরা গরম ঋতুতে ঘাসের বড় বাজার পর্যন্ত তার উপর জবরদস্তি কর এবং শীতের ঋতুতে পশম এবং গরম আসবাব পত্র বাজার পর্যন্ত বহন করাও। সে যখন বড় হল তখন তোমরা এর সহিত সঙ্গম করিয়েছ। অতঃপর এরই সুবাধে আল্লাহ পাক তোমাদেরকে অনেক ভাল উট দিয়েছেন। অতঃপর সে বছর যখন সবুজ শ্যামল ফসল হল তখন তোমরা একে নহর করে তার গোস্ত খাওয়ার ইচ্ছা করেছ। তারা বলল হে আল্লাহর রাসূল! ঘটনা মুলত তাই। নবী করিম (স.) বললেন তাহলে এ অনুগত উটতে এই পুরস্কার দিতে চাচ্ছ? তারা বল্ল হে আল্লাহর নবী, ঠিক আছে আমরা তাকে বিক্রী ও করবনা এবং নহর ও করবনা। নবী করিম (স.) বল্লেন তোমরা মিথ্যুক সে তোমাদের কাছে আবেদন করেছিল কিন্তু তোমরা তার আবেদন অগ্রাহ্য করেছ, এই জন্য আমি তোমাদের চেয়ে অধিক বেশী তার জন্য অনুকম্পা প্রদর্শনের অধিকারী। কারণ আল্লাহ্ পাক মুনাফিকদের অন্তর থেকে দয়া মায়া বিলুপ্ত করে মুমিনদের অন্তরে গচ্ছিত রেখেছেন । সুতরাং নবী করিম (স.) ১০০ দিরহামের বিনিময়ে তাদের কাছ থেকে উটটি ক্রয় করে নিলেন এবং বল্লেন হে উট যাও তুমি আল্লাহর জন্য মুক্ত।

এটুকু বলার পর উটটি নবী করিম (স.) এর মাথা মোবারকের কাছে এসে আনচান করতে লাগল। তখন নবী করিম (স.) বল্লেন আমীন। উটটি ২য়

বার ও আনচান করল, এবার ও বল্লেন আমীন। উটটি ৩য় বার আনচার করল নবী (স.) এবার ও আমনি বল্লেন। ৪র্থ বার যখন উটটি আনচান করল তখন নবী করিম (স.) ক্রন্দন করতে আরম্ভ করলেন, আমরা জিজ্ঞেস করলাম হে আল্লাহর নবী উটটি কি বলছিল? নবী করিম (স.) বল্লেন প্রথম বার উটটি বল্ল, হে আল্লাহর নবী (স.) আল্লাহ পাক আপনাকে ইসলাম এবং কুরআনের বিনিময়ে উত্তম প্রতিদান দিন। আমি তখন আমীন বল্লাম। ২য় বার সে বল্ল আল্লাহ তায়ালা আপনার উম্মতের শান শওকত কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী থাকুক। যেমনি আপনি আমার রক্ত হেফাজত করেছেন। তেমনি ভাবে আল্লাহ তায়ালা আপনার উম্মতের রক্তও হেফাজত করুণ। তাই আমি বল্লাম আমীন। ৪র্থ বার সে বল্ল আল্লাহ পাক আপনার উম্মতের ধ্বংস না করুন। আমি তার এই দোয়া শুনে কাঁদতে আরম্ভ করলাম। কারণ আমি এ সমস্ত দোয়া আল্লাহর নিকটই করেছি। সুতরাং আল্লাহ তা কবুল করেছেন। আর শেষে ধ্বংস থেকে নিষেধ করেছেন।

হযরত জিব্রাইল (আ.) বলেন-

انّ فناء امتى بالسيف جزى القلم بماهو كائن ـ(ابن ماجه)

"ভাগ্যে লিখা রয়েছে যে, আমার উম্মেতের ধ্বংস তরবারীর সাহায্যে হবে"।

হারুনুর রশিদ এর পেরেশানী এবং ফুজাইল ইবনে আয়াজ এর উপদেশ:

ইমাম ত্বারতুসী, ইবনে বালবান এবং মুকাদ্দেসী প্রমুখ ফুজাইল ইবনে রবি থেকে বর্ণিনা করেন যে, একদা হারুনুর রশিদ হজ্জ করলেন। এক রাতে তিনি শুয়ে ছিলেন হঠাৎ করে আমি দরজা খট খটানোর আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমি বল্লাম কে? জবাব এল আমিরুল মুমিনীন। আমি দ্রুত বাইরে বেড়িয়ে দেখি খলিফা হারুনুর রশিদ। আমি বল্লাম মহামান্য খলিফা আপনি কষ্ট করে আসলেন? কাউকে পাঠালেইতো আমি উপস্থিত হতাম। হারুনুর রশিদ বল্লেন (ঠিক আছে) তোমার অমঙ্গল হোক। আমার নিকট একটি সংশয় দেখা দিল যে কোন আলেম লোক ব্যতীত তাদূর করতে পারবেনা। এজন্য তুমি আমাকে কোন আলেমের সন্ধান দাও যায় কাছে গিয়ে তা আমি অবলোকন করতে পারি। আমি বল্লাম হুজুর এখানে ছুফিয়ান ইবনে ওয়াইনাহ উপস্থিত আছেন। তিনি বল্লেন তার

কাছে আমাকে নিয়ে চল। অতঃপর আমি তার কাছে গিয়ে দরজার কড়া নাড়ালাম। ভেতর থেকে আওয়াজ এল কে? আমি বল্লম তাড়া আসুন। আমিরুল মুমিনীন আগমন করেছেন। সুতরাং তিনি দ্রুত আসলেন এবং বল্লেন আমিরুল মুমিনীন কষ্ট করে আপনি কেন আগমন করলেন? কাউকে পাঠিয়ে দিলেই তো আমি উপস্থিত হয়ে যেতাম। আমিরুল মুমিন বল্লেন যে কারনে আমি এসেছি তার উপর পূর্ণ শক্তি নিয়োগ কর। তারা উভয়ের দীর্ঘ সময় পর্যন্ত আলোচনা করলেন। সুফিয়ান বল্লেন হুজুর কর্জ গুলো আদায় করে ফেলুন। ফজর বিন রবি বলেন অতঃপর আমরা সেখানে থেকে চলে এলাম। আমিরুল মুমিনীন বল্লেন তোমার সঙ্গীর পক্ষথেকে আমার কোন উপকার হলনা। অন্যকোন আলেমে দ্বীন তালাশ কর। যার কাছে গিয়ে আমি শান্তনা পাই। আমি বল্লাম অন্য একজন এখানে আছেন আব্দুর রাজ্জাক হুমাম, তিনি ইরাকের প্রসিদ্ধ ওয়ায়েজ। হারুনুর রশিদ বল্লেন তার কাছে আমাদের নিয়ে চল।

এরপর আমি তার দরজায় গিয়ে খটখট করলাম। ভেতর থেকে আওয়াজ এলো কে? আমি বল্লাম তাড়া তাড়ি এসো, আমিরুল মুমিনীন এসেছেন। তিনি দ্রুত আসলেন। আবদুর রাজ্জাক বল্লেন জনাব কষ্ট করে আপনি কেন আসলেন? কাউকে পাঠয়ে দিলেইতো আমি উপস্থিত হয়ে যেতাম। খলিফা তার সহিত কিছুক্ষন আলোচনা করলেন। তখন আব্দুর রাজ্জাক বল্লেন হুজুর আপনি তো কারো কাছে ঋনী নন? তিনি বল্লেন হাঁ আমার কাছে অনেকেই ঋন পাবে। তিনি বল্লেন তাহলে তা তাড়া তাড়ি পরিশোধ করে দিন। অতঃপর আমরা তার কাছ থেকে চলে এলাম। খলীফা বললেন তোমার সাথীর দ্বারা আমার কোন উপকার হলোনা। আবার অন্য কোন আলেমের খোঁজ কর। যাতে আমি প্রশান্তি লাভ করতে পারি। তখন আমি বল্লম ৩য় জন এখানে ফুজাইল ইবনে আয়াজ আছেন। খলিফা বল্লেন আমাকে তার কাছে নিয়ে চল। অতঃপর আমরা তার নিকট এসে বুঝলাম তিনি নামাজে পবিত্র কোরআন পাঠ করছিলেন, আমি দরজায় খটখট করলাম। ভেতর থেকে আওয়াজ এলো কে? আমি বললাম তাড়াতাড়ি আসুন আমিরুল মুমিনীনের আগমন করেছেন। ফুজাইল ইবনে আয়াজ বল্লেন আমার সহিত আমিরুল মুমিনীনের কি সম্পর্ক আছে? আমি বল্লাম ছুবাহাল্লাহ! আমিরুল মুমিনীনের আনুগত্য করা কি আপনার কর্তব্য নয়? ফুজাইল বল্লেন নবী করিম (স.) কি বলেন নাই যে, ليس المؤمن ان يذل نفسه মুমিনের জন্য নিজেকে

নিজে নিচুকরা সঙ্গত নয়। একথা বলেই তিনি দরজা খুলেদিলেন। অতঃপর ফুজাইল তাড়া তাড়ি উপর উঠে বাতি নিভিয়ে দিলেন এবং একটি নির্জন স্থানে বসে গেলেন। এর পর আমরা তাকে হাতের সাহায্যে খুজতে লাগলাম। হঠাৎ করে খলিফার হাত তার উপরে পড়ে গেল ফুজাইল বল্লেন যদি ইটের পাজা ভরপুরকারী কাল কিয়ামতে আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা পেলে আপনার হাত থেকে অধিক নম্র কোন হাত হবেনা। ফুজাইল ইবনে রবি বলেন একথা শুনে আমি মনকে বল্লাম সে রাতে আমি পরিস্কার কথা বলব। খলিফা ফুজাইল ইবনে আয়াজকে বল্লেন, আমি যে কারণে এসেছি তুমি এব্যাপারে তাড়া তাড়ি সমাধান তালাশকর। ফুজাইল ইবনে আয়াজ বলেন আপনি তো এলেন তবে নিজে আপনার বোঝা উঠিয়ে রাখলেন। আর আপনার সঙ্গীয় লোকটির বোঝাও আপনার উপরই । যদি আপনি তার কাছে নিজের এবং তার পাপের একাংশ বহনের আবেদন করেন তাহলে সে তা অবশ্যই করবেনা। যে ব্যক্তি আপনাকে অধিক ভালবাসে সে নিজের পক্ষ থেকেই পদচ্যুৎ হয়ে যায়। ফুজাইল ইবনে আয়াজ তাও বলেছেন, যে সময় হযরত ওমর বিন আব্দুল আজিজকে রাষ্ট্রীয় অভিভাবক নিযুক্ত (খলিফা) করা হয় তখন তিনি ছালিম বিন আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর মুহাম্মদ বিন কাব কারজি এবং রেজা বিন হায়াত কে ডেকে পাঠান। তিনি তাদেরকে বল্লেন আমাকে খেলাফতের বিপদে নিপতিত করা হয়েছে। সুতরাং তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও। (হযরত ওমর বিন আব্দুল আযিয (রহ.) খেলাফতকে বিপদের কারণ মনে করলেন) আর হারুনুর রশিদ আপনি (রহ.) খেলাফতকে নিয়ামত মনে করলেন। সুতরাং সালিম, বিন আব্দুল্লাহ বিন ওমর বলেন যদি আপনি আগামী কাল আল্লাহ পাক থেকে মুক্তি পেতে চান তাহলে দুনিয়া থেকে রোজা রেখে মৃত্যুর দিন ইফতার করুন।

মুহাম্মদ বিন কাব বলেন যদি আপনি কাল কিয়ামতের দিনে আল্লাহর শাস্তি থেকে বাচতে চান তাহলে বৃদ্ধ মুসলমানকে পিতা, যুবকদের কে ভাই এবং শিশুদের কে সন্তান মনে করুন। এমনি ভাবে আপনি এদের সাথে পিতার সুলভ আচরণ, ভাইয়ের মত সুসর্ম্পক, এবং শিশুদের মত স্নেহ ও করুনা করবেন। রেজা বিন হায়াত বলেন যদি কাল কিয়ামতের দিন আল্লাহর শাস্তি থেকে বাচতে চান তাহলে আপনার নিজের জন্য যা পছন্দ করেন তা আপনার মুসলিম ভাইয়ের জন্য পছন্দ করবেন। আর যে জিনিষ আপনার নিজের জন্য অপছন্দ

করবেন তা আপনার অপর মুসলমান ভাইয়ের জন্য অপছন্দ করবেন। তাহলে আপনি যখন চাইবেন দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে পারবেন। এত টুকু বর্ণনা করার পর ফুজাইল ইবনে আরজ আমিরুর মুমিনীন হারুনুর রশিদ কে ইদ্দেশ্য করে বল্লেন আপনি আপনার কাছ থেকে এসমস্ত কথার উপর আমল করার জন্য বলতেছি, যেদিন মানুষের পা ফসকে যাবে, সেদিন আপনার জন্য ভীতি অনুভব করতে থাকবে। আল্লাহ আপনাকে মঙ্গল করুন। আপনার কাছে যেমন উপরন্থ লোক আছে যা আপনাকে যেমন উপদেশ দেয় একথা শুনে হারুনুর রশীদ এতই কাদলে যে তিনি মুর্ছা যাওয়ার উপক্রম হলেন।

ফুজায়েল বিন রবি বলেন, এমন সময় ফুজায়েল বিন আয়াজ কে বললেন আমিরুল মুমিনীনের সঙ্গে নম্র ব্যবহার করুন। ফুজাইল বিন আয়াজ জবাব দিলেন তুমি এবং তোমার সাথীরা তাকে হত্যা করে ফেলেছ। আমি তার সহিত নম্র ব্যবহার করব? এমন সময় হারুনুর রশীদের স্বাভাবিকত ফিরে এলো। তিনি বল্লেন হে আমিরুল মুমিন! আমি জানতে পারলাম যে, আমিরুল মুমিনীন হযরত ওমর বিন আবদুল আজিজ এর একজন ভৃত্য তার কাছে বিনিদ্র থাকার অভিযোগ করল। তখন ওমর বিন আবদুল আজিজ পত্র লিখে পাঠান, আমার ভাই ! তুমি দোজখীদেরকে জাগ্রত করতে একটু চিন্তা কর। আর এদের সবসময় জাহান্নামে থাকার ব্যপারে ও চিন্তা কর। বাস! তাই তোমাকে তোমার পরওয়ার দিগারের দরবারে শুয়ে থাকার এবং জাগ্রত থাকার জন্য প্রস্তুত করবে। তোমার কদম যাতে অন্য রাস্তায় হোচট না খায় তাও খিয়াল করতে হবে। যে কারণে নৈরাশ্য এবং দুনিয়তে শেষ নিশ্বাস গ্রহন কারী হও।

পত্রটি যখন সে কর্মচারীর কাছে পৌছল তখন সে দ্রুত ওমর বিন আব্দুল আজিজ এর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য উপস্থিত হল। ওমর বিন আব্দুল আজিজ জিজ্ঞেস করলেন তুমি কেন এসেছ? কর্মচারি জবাব দিল আমি পত্রের জন্য আমার অন্তর কে আজাদ করে দিয়েছি। এখন আল্লাহর সহিত মোলাকাত হওয়া পর্যন্ত আপনি আমাকে কোন কাজের দায়িত্ব দিবেন। এ কথা শ্রবন করে হারুনুর রশীদ খুব ক্রন্দন করলেন। তিনি বল্লেন ফুজায়েল আল্লাহ তোমার উপর রহম করুন। আরো কিছু উপদেশ দিন। ফুজায়েল বল্লেন হে আমিরুল মুমিনীন, আপনার শ্রদ্ধাভাজন হযরত আব্বাস (রা.) যিনি নবী করীম (স.) এর চাচা ছিলেন। তিনি একদা নবী করীম (স.) এর পাশে এসে বল্লেন হে আল্লাহর

রাসুল! (স.) শাসন ক্ষমতার ব্যাপারে আমাকে কিছু পরামর্শ দিন। নবী (স.) বল্লেন, হে আমার চাচা! আপনার শারীরিক অবয়ব রাজত্বের চেয়ে উত্তম। কারণ রাষ্ট্র ও ক্ষমতা কিয়ামতের দিন ক্ষতি ওদুঃখ হয়ে দেখা দিবে। যদি তা আপনার পক্ষ থেকেই হয় তাহলে শেষ পর্যন্ত আপনাকে আমীর এবং হাকিম বানানো হবেনা। একথা শ্রবন করে আবার খলিফা হারুনুর রশিদ কাঁদতে করেন। কিছুক্ষন পর হারুনুর রশীদ বল্লেন, হে ফুজায়েল আরো উপদেশ দিন। সুতরাং ফুজায়েল ইবনে আয়াজ বল্লেন, ওহে ক্রন্দনরত খলিফা কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাক আপনার কাছে সৃষ্টিসর্ম্পকে প্রশ্ন করবেন। যদি আপনি আপনার চেহারা আগুন থেকে বাচাতে চান তাহল আপনি এমন জরুরী কাজ করুন এবং আপনি সকাল সন্ধা এর থেকে ভেগে থাকবেন যে প্রজাদের পক্ষ থেকে আপনার অন্তর যেন ভেজাল মিশ্রিত না হয়। কেন না বর্ণিত আছে নবী করিম (স.) এরশাদ ফরমান যে ব্যক্তি প্রজা সাধারন কে ধোকা দিয়ে রাত কাটায় সে বেহেস্তের গন্ধ ও পাবেনা। একথা শুনে হারুনুর রশিদ অনেক কাদলেন। কিছুক্ষন পর ফুজাইল তিনি বল্লেন হা আমার উপ আল্লাহ পাকের ঋন আছে। যার হিসাব তিনি আমার কাছ থেকে নিবেন। তিনি (আল্লাহ) যদি এব্যাপারে আমাকে প্রশ্ন করেন তাহলে আমার ধ্বংস ছাড়া আর কোন রক্ষা নেই। আর যদি তথ্য ভিত্তিক জবাব না হয় তাহলে ঋন। আল্লাহ পাক আমাকে এর অনুগামী বানাননি। বরং তিনি আমাকে তার অনুগত ও ইবাদতে অনুগামী এবং ওয়াদা পুরণের অনুগত বানিয়েছেন। সুতরাং আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

وما خلقت الجن والانس الاليعبدون .ماارید منهم من رزق وما ارید ان یطعمون ان الله هو الرزاق ذوالقوة المتین-

আর আমি মানব ও জীন জাতিকে আমার ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছি। আমি তাদের কাছে জীবিকা চাইনা এবং এটাও চাইনা যে তারা আমাকে আহার্য যোগাবে। আল্লাহ তায়ালাইতো জীবিকা দাতা শক্তির আধার প্রবল পরাক্রান্ত। (জারিয়াত-৫৬)

হারুনুর রশিদ বলেন, ফুজাইল! নাও, এখানে ১,০০০/- হাজার আশরাফী আছে। এগুলো আপনার পরিবার পরিজনের জন্য করচ করবেন। এর মাধ্যমে আপনি আপনার রবের ইবাদে শক্তি অর্জন করবেন। ফুজাইল ইবনে

আয়াজ বল্লেন ছুবহানল্লাহ। আমিতো আপনার মুক্তির ব্যাপারে পথ প্রদর্শন করেছি মাত্র। আর আপনি কিনা এর বিনিময় দিতে চাচ্ছেন। আল্লাহ তায়ালা আপনার মঙ্গল করুন। ফুজাইল আমাদের সহিত আর কোন কথা বলেন নি। তার পর আমরা তার কাচ থেকে উঠে এলাম।হারুনুর রশিদ আমাকে বল্লেন যে, যখনই তুমি আমাকে কোন আলেমে দ্বীনের সংবাদ দিবে তখন তার প্রকৃতি সর্ম্পকে আমাকে অবগত করবে। কেন না আজ থেকে তিনি মুমিনদের নেতা।

আরেকটি ঘটনাঃ

ফুজাইল ইবনে আয়াজ এর পরিবারের রমনীদের মধ্যে জনৈকা রমনী তার কাছে এসে বলল হুজুর আপনি তো জানেন আমি কত অসহায় যদি আপনি এইমাল গুলো অনুগ্রহ করে কবুল করেন তাহলে আমাদের জন্য অত্যন্ত আনন্দের কারণ হবে। একথা শুনে ফুজাইল বলেন আমার এবং তোমাদের উদাহরন হল ঐ লোকদের মত যার কাছে একটি উট আছে এবং সে লোকটি সে উটটি যবেহ করে খেয়ে ফেল্ল। ওহে মহিলারা মোমারা ক্ষুধায় মরে যেয়ো কিন্তু এমন উট যবাই করোনা। এ কথা যখন হারুনুর রশীদ শুনলেন তখন তিনি বল্লেন চল আমরা মাল নিয়ে যাই। সম্ভবত ফুজাইল তা কবুল করবেন।

রাবী বা বর্ণনাকারী বলেন, আমরা যখন মালামাল নিয়ে ফুজাইল ইবনে আয়াজের খেদমতে আসলাম তখন আমাদের আগমনের কারণ ফুজাইল অবগত হলেন। সুতারাং ফুজাইল ঘরের ছাদে প্রাচীরের উপর বসে গেলেন। এদিকে হারুনুর রশীদ তার এক দম পাশে এসে বসে পড়লেন এবং তার সহিত আলাপ আলোচনা করতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু ফুজাইল কোন জবাব দিলেন না। আমরা এ অবস্থায় ছিলাম এ মুহুর্তে একজন কাল রঙ্গের দাসী এসে বল্ল হে অমুক যখন থেকে তুমি এসেছো তখন থেকেই শেখকে কষ্ট দিচ্ছ। এ কারনে তোমরা চলে যাও সুতরাং আমরা ফেরত চলে এলাম।

ইমাম দামিরী (রহ.) বলেন কাজী ইবনে খাল্লেকান ফুজাইল ইবনে আয়াজের জীবনীতে উল্লেখ করেছেন। এ ঘটনা যখন সুফিয়ান ছওরী অবগত হলেন তখন তিনি নিজেই ফুজাইল ইবনে আয়াজের কাছে আগমন করে বল্লেন হে ফুজাইল! তুমিতো আশরাফীর থলে গ্রহন না করে ভূল করেছ। খলিফার কাছ থেকে নিয়ে তা নেক কাজে ব্যয় করতে পারতে । একথা শুনে ফুজাইল ছুফিয়ান

ছওরীর দাড়ীতে ধরে বল্লেন সুফিয়ান! তোমাকে শহরের কাজী গন্য করা হয়। সাধারন লোকের নিকট তুমি গ্রহনযোগ্য ব্যক্তিত্ব, কিন্তু তুমিও ভূল করেছ। যদি একথা এ লোকদের কানা হয় তাহলে আমার ও জানা হবে।

ইমাম দামিরী এও বলেছেন যে, ইবনে খাল্লেকান এ ইতিহাস وفيات والايان এ ছওরী উল্লেখ রয়েছে। আসলে তিনি সুফিয়ান ইবনে ওয়াইনাহ

একদা হারুনুর রশীদ ফুজাইল ইবনে আয়াজকে বললেন যে, আল্লাহ পাক আপনার উপর দয়া করুন। আপনি একজন সাধক। ফুজাইল বল্লেন আপনি আমার চেয়ে বড় জাহেদ। আমি তো দুনিয়ার সাধন আর আপনি আখেরাতের সাধক। অর্থাৎ আপনি পরকালীন ব্যাক্তিত্ব গ্রহন করেছেন আর আমি জাগতিক ব্যাক্তিত্ব গ্রহন করেছি। অথচ দুনিয়া একদিন একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে কিন্তু পরকাল ধ্বংস হবেনা।

ইতিহাসবিদদের কেউ কেউ লিখেছেন শেখ ফুজাইল ইবনে আয়াজের একজন ছোট মেয়ে ছিল। একদা মেয়েটির হাতে অসুখ হলে ফুজাইল তার মেয়ে কে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার হাতের অবস্থা কি? মেয়েটি বল্ল আল্লাহর শোকর! আল্লাহর কছম। যদিও আল্লাহ পাক আমাকে সামান্য মুছিবতে ফেলেছেন কিন্তু সমস্ত শরীর তো সুস্থ রেখেছেন। হাতে অসুখ তবে সমস্থ শরীর তো ভাল। তাই আল্লাহর শোকর। একটি হাত দেখাল, তিনি মেয়েটির হাতে চুমু খেয়ে বল্লেন আমি আপনাকে আল্লাহর কছম দিয়ে বলছি যে, আপনি কি আমাকে মহব্বত করেন? ফুজাইল বল্লেন আল্লাহর শপথ অবশ্যই তোমাকে মহব্বত করি। মেয়েটি বল্ল আল্লাহ তায়ালা আপনাকে ক্ষমা করুন। আল্লাহর শপথ! আমার ধারনা ছিলনা যে আপনি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে মহব্বত করেন। একথা শুনে ফুজাইল চিৎকার করে উঠলেন- মা আমার! তুমি আমাকে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো মহব্বতে তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করছ। হে আল্লাহ! তোমার বড়ত্ব ও মহত্বের কছম আমি তোমার সহিত মোমার মহব্বতে অন্য কাউকে শরীক করিনাই।

একসময় জনৈক ব্যক্তি ফুজাইলের কাছে তার অবস্থা বর্ণনা করলে তিনি বল্লেন হে আমার ভাই! আল্লার ব্যতীত আর কেহ কি শ্রেষ্ট ব্যবস্থাপক আছে? লোকটি জবাব দিল না। তখন তিনি বল্লেন ঠিক আছে তাহলে তাঁর উত্তম ব্যবস্থা পনায় রাজী হয়ে যাও। তিনি আরো বল্লেন আল্লাহ পাক যখন তার কোন

বান্দাকে মহব্বত করেন তখন তাকে চিন্তায় ফেলে দেন। তিনি যখন কারো প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে যান তখন তিনি তার জন্য জগতটিকে প্রশস্থ করে দেন। ইমাম নববী (রহ.) বলেন, ফুজাইল বলতেন মানুষের কারনে কোন আমর ছেড়ে দেয়া রিয়া লৌকিকতা মানুষের জন্য শিকর। যদি এ দু'কাজ থেকে কেহ বেচে যায় তাহলে তাই একনিষ্ট কর্ম। কোন এক লোক ফুজাইল ইবনে আয়াজের কাছে প্রশ্ন করলেন যে মহাব্বত কাকে বলে? তিনি তখন জবাব দিলেন সমস্ত বস্তুছেড়ে শুধু আল্লাহর দিকে মনোযোগী হওয়াকে মহব্বত বলে। তিনি আরো বলেন যদি আমার দোয়া কবুল হয় তাহলে আমি শুধু ইমামের জন্য দোয়া করি।

কেননা যদি আল্লাহ পাক ইমামকে শুদ্ধ করে দেন তাহলে সমগ্র জগত নিরাপদ হয়ে যায়। মানুষ কর্তৃক তার সহকর্মীদের সাথে নম্র ব্যবহার করা উচিত এবং সৌজন্য মূলক আচরণ করা, রাত্রে কিয়াম করা এবং দিনের বেরা রোজা রাখা উত্তম। কেহ যদি মনে প্রানে لا اله الا الله অথবা سبحان الله বলে তাহলে অনেক সময় তার দোযকে যাওয়ার আশংকা থাকে তার কাছে জিজ্ঞেস করা হল যে, তা কিভাবে? তিনি জবাব দিলেন যদি তোমার সামনে কোন কোন লোক গীবত করে তাহলে তুমি একে ভালই মনে করে থাকো। সুতরাং তাড়া তাড়ি শুনেই বলতে থাকে لا اله الا الله অথবা سبحان الله সুতারাং এই কথার স্থানতো এটা নয় বরং সে সময় তো নিজেকে নিজে বুঝা উচিত এবং এ ধর্মোপদেশ দেয়া উচিত যে, হে নফ্স! আল্লাহকে ভয় কর।

একদা ফুজাইল ইবনে আয়াজের ছেলে বলেন, আব্বাজান আমার মন চায় যে, আমি এমন স্থানে বসে যাই, যেখান থেকে আমি সব কিছু দেখি, অথচ আমাকে কেউ যেন না দেখে। একথা শুনে তিনি বল্লেন যদি তোমার এ ইচ্ছা পুরা হয়ে যায় তাহলে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে। তখন ছেলে তাড়া তাড়ি বল্লেন বরং এমন জায়গা যদি পাই যেখান থেকে আমি লোক দিগকে দেখতে না পাই এবং লোকেরা আমাকে না দেখে। ফুজাইল বিন আয়াজ মক্কায় অবস্থান করতে থাকেন। তিনি শেষ পর্যন্ত মক্ক শরীফকে তার স্থায়ী বাসস্থান হিসাবে বানিয়ে নেন। তিনি ১৮৭ হিঃ ৫ই মহরম তারিখে ইন্তেকাল করেন । ইবনে খাল্লেকান লিখেনে যে সুফিয়ান ছওরী (রহ.) জানতে পারলেন যে, ইমাম আওযায়ী শুভাগমন করছেন। তখন তিনি তার সহিত সাক্ষাৎ করেন। সুতরাং ইমাম আওযায়ীর সহিত "ذی طوی" নামক স্থানে সাক্ষাৎ করেন । সুফিয়ান ছওরী তার উটটির লাগাম

ধরে উটের বাথান থেকে পৃথক করে লাগাম (নাকিল) ঘাড়ে রেখে দেন। অতঃপর সুফিয়ান যখন জন সম্মুখ দিয়ে গমন করতেন তখন তিনি বলতেন জনগন চলে যাও এই রাস্তা ইমাম আওযায়ী (রহ.) এর।

হযরত ইমাম আওযায়ী ঃ

ইমাম আওযায়ী (রহঃ) এর নাম আব্দুল রহমান ইবনে আমর ইবনে বুহামাদ আবু আমর। তিনি শ্যাম বাসীর ইমাম ছিলাম। কেহ কেহ বলেন তিনি ৭০,০০০ মাছয়ালর জবাব দেন। আওযায়ী বইরুতে থাকতেন। بـحـمـد অক্ষরে পেশ, يـاء অক্ষরে ছাফীন ইমাম নববী (রহ.) تهـذيب الاسماء واللغات ياء এ ব্যতীত يـاء এবং يـاء অক্ষরে পেশ এবং جيم অক্ষরে জেরের ব্যখ্যা দিয়েছেন ইমাম আওযায়ী তাতে তারেয়ীন দের মধ্যে গন্য। ইমাম আওযায়ী বলেন আমি আল্লাহ তায়ালাকে স্বপ্নে দেখেছি। আল্লাহ তায়ালাকে আমাকে বলেন হে আবদুর রহমান! তুমি অবশ্যই নেক কাজের আদেশ কর আর মন্দ কাজের নিষেধ কর। আমি বল্লাম হে আল্লাহ তা আপনার অনুগ্রহেই করি।.আবার আমি আল্লাহ তায়ালার কাছে আরজ করলাম হে আল্লাহ! আমাকে ইসলামের উপরই মৃত্যু দিন। আল্লাহপাক বল্লেন সুন্নতের উপর ও । তিনি ১৫৭ হিঃ রবিঃ আউঃ তারিখে ইন্তেকাল

কেউ কেউ তার মৃত্যুর ঘটনা এভাবে লিখেছেন যে, একদা তিনি বৈরুতের গোসল খানায় প্রবেশ করেন। গোসল খানার মালিক অন্যকোন কাজে ব্যস্ত ছিলেন বিধায় তিনি দরজা বন্ধ করে চলে গেলেন। বেশ কয়েক দিনপর তিনি বাড়ীতে আসলেন। অতঃপর দরজা খুলে দেখলেন তিনি ইন্তেকাল করেছেন। তার ডান হাত গন্ড দেশের নীচে আর মুখ কেবলার দিকে রয়েছে। কেহ কেহ লিখেছেন গোসল খানার মালিকের স্ত্রী ইচ্ছা করেই তা বন্ধ করে দিয়েছেল।

اوزاع আওযা' দামেস্কের একটি গ্রামের নাম। আবু আমর সেখানের বাসিন্দা ছিলেন। তিনি এখানে এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন। কেহ কেহ বলেন তিনি ইয়ামনের বন্দীদের অন্তর্ভূক্ত।

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন আওযায়ী بـعـلـبك শহরে ৮৮ হিঃ জন্ম গ্রহন করেন এবং 'হান্তুস' নামক বস্তীর সমজিদের সম্মুখে তাকে দাফন করা হয়। এ

স্থানটি সম্ভবত বৈরুত প্রবেশের পথেই পড়ে। কিন্তু বস্তী বাসীরা তার মাকার সম্পর্কে জানেনা। বরং তারা জানেন যে এখানে একজন পূর্ণ বান লোকেরই কবর রয়েছে। যার উপর পূরেন বাড়ি হয়। একজন চাকরানী ব্যতীত আর কেহই ইমাম আওযায়ীর কবরের সন্ধান জানেনা।

উটের শরয়ী বিধান ঃ

উটের শরয়ী বিধান সম্পর্কে ইতি পূর্বে ابـــل এর অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। উটের উপর সাওয়ার হওয়ার সময় বিসমিল্লাহ বলা সুন্নত। যেমন হাদীছে রয়েছে হযরত আব্দুল আস খুযায়ী বলেন হজ্জের জন্য আমাকে নবী করিম (স.) একটি দর্বল উটের উপর সওয়ার করিয়ে দিলে আমি বল্লাম হে আল্লাহর রাছুল (স.) আপনি আমাকে উটের উপর সওয়ার করানো সঙ্গত মনে করিনা। তখন নবী করিম (স.) বল্লেন যে, প্রত্যেক উটের কুঁজেই শয়তান থাকে। তাই তুমি যখন এতে আরোহন করবে তখন আল্লাহ তায়ালার নাম এভাবে নিবে যেভাবে আল্লাহ তাঁর নাম নেবার আদেশ করেছেন। এর পর তুমি এর থেকে নিজের ফায়দা হাসিল কর। কেননা আল্লাহ তায়ালাই এর উপর সাওয়ার হওয়ার জন্য বলেছেন। (আহমদ ত্বিবরানী)

উট সংক্রান্ত প্রবাদ ও উদাহরণ ঃ

আরবরা বলেন-

(১) فلان اخف حلما من بعير

অমুক লোক উটের চেয়ে ও অনেক আগে চড়ে যায়। স্বল্প বুদ্ধি এবং ক্রোধের জন্য উট দ্বারা উদাহরণ দেয়া হয়। আর উট হয় ঈর্ষা পরায়ন ও ক্রোধান্বিত।

(২) هماكركبتى بعير

তারা দুজন উটের দু হাটু অথবা দু'গিড়ার মত। একথা তখনই বলা হয় যখন দুইটি বস্তুর মধ্যে সমান তুলনা করা হয়। যেমন অন্য আরো একটি উদাহরণ

هماكفرسى رهان

তারা দুজন দৌড়ের ঘোড়ার মত (অর্থাৎ একে অপরকে পেছনে ফেলে

হায়ওয়ার ভেড়া করে)

এধরনের দৃষ্টান্ত সর্ব প্রথম বহম বিন ক্বাতবাহ ফুজারী ব্যবহার করেণ।

(٣) وهو كالحاوى وليس له بعير

সে এখন হাকঁ ডাক কারীর মত যার কাছে উট নেই। এই উদাহরণ অনুপযুক্ত বস্তুর সহিত সম্পর্কে যুক্ত। যেমন উর্দুতে বলা হয় ঃ

حلوائی کی دکان نانا جی کا فاتحہ

অর্থাৎ মিষ্টির দোকান, নানা জানের উদ্বোধন।

এর চেয়ে ও বেশী পূর্ণাঙ্গ ও উত্তম উদাহরণ হাদীছ শরীফে রয়েছে যে, নবী করিম (সে.) এরশাদ ফরমান ঃ

التشبع بما لم يعط كلا بس ثوبى زور

যে লোক নিজের বড়ত্ব জাহির করার জন্য মানুষের মধ্যে বলে যে, অমুক বস্তু আমার কাছে রয়েছে অথচ তার কাছে তা নেই। তার দৃষ্টান্ত এমন যেমন কোন বেকুবাজ দুই কাপড় পরিধান করে। কোন কোন বুজর্গ ব্যক্তি বলেছেন ঃ

اصبحت لا احمل السلاح ولا:: املك راس البعير اذنفر

আমি এমন অবস্থায় আছি যে, অস্ত্র উঠাবার শক্তি আমার নেই। আর না ভ্রমনের সময় কোন উটের মালিক হওয়ার শক্তি আছে।

الذئب اخشاد ان امررت به:: وجدى وخشى الرياح المطرا

আর বাঘের পাশদিয়ে একা অতিক্রম করা ভয় করি এমনি ভাবে বাতাস ও বৃষ্টি কেহ ভয় করি।

من بعد ماقوة اصيب بها:: اسبحت شيخا يعالج الكبيرا

শক্তি সামর্থ থাকার পরও আমি যখন বিপদে নিপতিত হই তখন এমন বৃদ্ধের মত হয়ে যাই যেন বার্ধকের চিকিৎসা করছি।

প্রখর মেধা এবং বুদ্ধিমত্তার ঘটনাঃ

ইমাম আবুল ফরজ জাওজী লিখেছেন যে, আবু নাওয়াস লিখেছেন একটি উটের উপর একজন মহিলার সহিত আমার সাক্ষাৎ ঘটে। অথচ মহিলাটি আমাকে চিনেনা। সেতার চেহারা থেকে নেকাব উঠালে তাকে অত্যন্ত সুন্দরী মনে

হল। সে আমাকে জিজ্ঞেস করল যে, তোমার নাম কি? আমি বল্লাম (وجهك) তোমার চেহারা। একথা শুনেই মহিলাটি বল্ল তাহলে তো তোমার নাম হাসান। এরকম আরো অনেক বুদ্ধির ঘটনা রয়েছে। যেমন একদা মামুনুর রশীদ আব্দুল্লাহ ইবনে তাহেরের উপর রাগান্বিত হলেন। মামুনুর রশীদ তাহেরকে হত্যা করার জন্য তার সহকর্মীদের সহিত পরামর্শ করল। ঘটনা ক্রমে এই বৈঠকেই তার একজন ঘনিষ্ট বন্ধু বসা ছিলেন। সে তাহেরের নিকট একটি পত্র লিখল যারা বিষয়বস্তু এরকম ঃ

بسم الله الرحمن الرحيم ياموسىٰ!

তাদের পত্র পেয়ে অত্যন্ত ভয় পেয়ে গেলেন। অনেকক্ষন পর্যন্ত পত্রটি দেখতে থাকেন। কিন্তু তার উদ্দেশ্য কিছুই বুঝতে পারতে ছিলেন না। তাহেরের পাশে একজন দাসী দাড়ানো ছিল। সে বল্ল হে আমার মুনিব! আমি এ পত্রের মর্ম বুঝেছি। তাহল ঃ

ياموسٰى ان الملاء ياتمرون بك ليقتلون.(القصص)

হে মুসা! সভাসদগন তোমার ব্যাপারে পরমর্শ করেছেন যে তারা তোমাকে হত্যা করবে। অথচ ইতি পূর্বে তাহের মামুনের দরবারে যাওয়ার ইচ্ছা করেছিল সুতরাং তার দরবারে যাওয়া আর হলনা। তাই ইহাই তার বাচার অবলম্বন হয়ে গেল। এর চেয়ে ও একটি ভাল ঘটনা কাজী ইবনে হয়ে গেলেন। তাই বাদশাহ তার মন্ত্রীকে আদেশ করলেন যে, তাকে একটি পত্রদিয়ে জানিয়ে দাও। বাদশাহ তার মন্ত্রীকে আদেশ করলেন যে, তাকে একটি পত্রদিয়ে জানিয়ে দাও। কিন্তু সে মন্ত্রী কর্ম কর্তার সহিত সুসম্পর্ক ছিল। সুতরাং মন্ত্রী বাদশাহর আদেশ পালনার্থে পত্র লিখলেন বটে কিন্তু বিষয়ের শেষে ان شاء الله লিখেদিলেন এবং ان شاء الله এর ن অক্ষরে তাশদীদ লাগিয়ে দিলেন। কর্মচারী এই পত্র পাঠান্তে বিস্ময় বোধ করলো যে মন্ত্রীর পক্ষ থেকে এই রকম (ن এর উপর তাশদীদ) কেন হল? কিছুক্ষণ পর সে বুঝে ফেল্ল যে, পবিত্র কুরআনের দিকেই ইঙ্গত করে।

ان الملائياتمرون ليقتلون.

নিশ্চয় সভাবদগন এই পরামর্শ করেছেন যে, তোমাকে হত্যাকরা হবে। সুতরাং সে ও পত্রটি সামান্য পরিবর্তন করে মন্ত্রীর নামে ফেরত দিয়ে দিল।

শংশোধন হল ن এর উপর থেকে তাশদীদ উঠিয়ে দিয়ে ن এর সহিত একটি الف বর্দ্ধিত করে দিল অর্থাৎ انا বানিয়া দিয়ে মীল মাল করে পত্রটি প্রেরণ করা হল। পত্রটি যখন মন্ত্রী পেলেন তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হলেন মন্ত্রী বুঝলেন এই সংশোধন দ্বারা পবিত্র কুরআনের এই উদ্ধেশ্য

ان لن ندخلها ابدامادامةافيها

আমরা কখনোই এই শহরে প্রবেশ করবনা, এখানেই আমরা থাকতে চাই।

চিকিৎসা ক্ষেত্রে উটের উপকারীতা ঃ

(১) উটের গোস্ত প্রশ্রাবের জ্বালা যন্ত্রনায় বেশ উপকারী। (২) উটের গোস্ত দাদের মালিশেস জন্ত্র বেশ উপকারী। (৩) উটের ভুড়ী কদাকার চেহ্যরায় বেশ উপকারী। (৪) উটের চর্বি অর্শ্ব রোগের উপকার করে। লোক বহু মুত্র রোগীর রানে বেধে দিলে বেশ উপকার দর্শে। (৫) উটের ঘামে গম মিশিয়ে চড়ুই পাখীকে খাইয়ে দিলে সে জ্ঞানহারা যাবে।

بغاث

(৭৭) শকুনের চেয়ে ছোট সামান্য সবুজ সাদা রঙ্গের পাখী বিশেষ

بـــاء অক্ষরে যবর যের পেশ তিনটি হরকতই পড়া যা । সবুজাভ সাদা রঙ্গের এক প্রকার পাখী । পাখীটি শকুনের চেয়ে ছোট এবং বেশ উড়তে পারে । এ ধরনের পাখী অত্যন্ত হিংস্ত্র একে কেই শিকার করেনা । শেখ আবু ইসহাক বলেন যে সমস্ত মালে বাধ্য বাধকতা আরোপ করা হয় সে মাল নিয়ে ভ্রমন করা যায় না । কেনা বর্ণিত আছেঃ

المسافر وماله لعلى اى هلاك

অর্থাৎ মুসাফিরের ধন সম্পদ মুক্ত নয় । কবি বলেনঃ

بغاث الطير اكثر هفراخا :: وام الصفر مقملات نزور

বুগাছ পাখী অনেক বাচ্চাদেয়। আর বাজ পাখী অল্পবাচ্চা দেয় এবং বাচ্চাকে কম মহব্বত করে । مقلاتএর মীম অক্ষরে যবর । শব্দটির অর্থ হল

(১) এমন নারী যাদের বাচ্চা জীবিত থাকেনা।

(২) এমন উট যে উট এক বাচ্চা প্রসব করার পর আর কোন বাচ্চা দেয় না ।

(৩) কোন কোন মনিষী বলেন এমন পাখীকে বলে যারা বিরান ভূমিতে তাদের বাসা বানায়।

এ পাখীর শরয়ী বিধানঃ

নোং রামির কারনে এ পাখী খাওয়া হারাম

এ পাখী সংক্রান্ত প্রবাদ বাক্যঃ

আরবগন বলেন ঃ البغاث بارضنا يستنسر

"যে আমাদের পড়শী হয়ে থাকে সে সম্মানী হয়ে যায়।"

প্রবাদটি এমন সম্মানী লেঅকের বেলায় বলা হয় যার কাছে অসম্মানী লোকও বেশ সম্মানী হয়ে যায়। অথবা দুর্বল লোক ও সবল হয়ে যায় ।

بغل

(৭৮) খচ্চর

খচ্চর একটি প্রসিদ্ধ প্রানী । এর উপাধি- ابو الاسج ـابواحرون ـ ابوالصفر ـ ابوقضاعه ـ ابو قموص ـ ابو كعب ـ ابو مخماز ابوطعونইত্যাদি । কেউ কেউ অবশ্য একে ابن ناحق ও বলে থাকেন। ফার্সী ভাষায় একে বলে استرআর হিন্দি ভাষায় খচ্চর (গাধা ও ঘোড়ার মিলনের শাবককে) বলা হয়।

খচ্চর ঘোড়া ও গাধা পরস্পরের সঙ্গমে জন্ম নেয়। তার শরীর হয় অত্যন্ত শক্ত এবং গোড়ার হাড়ের মত হাড় বিশিষ্ট। তার আওয়াজ ও ঘোড়া ও গাধার আওয়াজের মাঝামাঝি আওয়ায হয়। কিন্তু এরা হয় বান্‌ঝা । এরা সন্তান প্রসব করেনা কিন্তু ابن بطريق ৪৪৪ হিঃ এর ঘটনা বলিতে লিখেছেন যে,

আশ্চর্য ধরনের এক প্রকার খচ্চর ছিল-যার থেকে একটি কালো রংয়ের ঘোড়া এবং একটি সাদা রংয়ের খচ্চর জন্মগ্রহন করে। এর পর ابن بطريق বিস্ময় প্রকাশ করে । বড় কথা হল দুটি বিন্ন ধর্মী প্রাণির মিলনে তার জন্ম হওয়ার কারনে এর মধ্যে ভিন্ন ধর্মী চরিত্রও ব্যতিক্রম আচরণ পাওয়া যায়। যদি খচ্চরের পিতা গাধা হয় তাহলে সে ঘোড়ার মতো হয় আর যদি পিতা ঘোড়া হয় তাহলে আকৃতি হয় গাধার ন্যায়। আরো বড় আশ্চর্যের কথা হলো খচ্চরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ঘোড়া ওগাধার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মাঝামাঝি হয়। তাই এর প্রভাব খচ্চরের

চরিত্রে পাওয়অ যায়। যেমন খচ্চরের মধ্যে ঘোড়ার বুদ্ধিমত্তা থাকেনা তেমনি দু প্রানীর মিলনে জন্ম হওয়ার কারণে এর চরিত্র বরবাদ এবং দুরদর্শী হয়ে থাকে। এ অর্থে আরবী কবি গন কবিতা লিখেছেনঃ

خلق جديد كل يوم :: مثل اخلاق البغال

নবনব অভ্যাস দৈনিকই খচ্চরের ন্যয় পরিবর্তন হয়। তাছাড়াও খচ্চর যে রাস্তায় একবার যাতায়াত করে তা আর কখনো সে ভুলেনা । খচ্চর যদি ও দুটি ব্যতিক্রম ধর্মী প্রাণীর যৌন মিলনে জন্ম গ্রহন করে । তবে সে রাজা বাদশাহদের সওয়ারী দরবেশসে বোঝা বহন সহ যাবতীয় ধৈর্যের কাজ করে । তাই কবি বলে

مركب قاضى ومام عادل:: وعالم وسيدو كهل

বিচারক লেখক বাদশাহ আলেম এবং মধ্য বয়সীর সর্দারদের সাওয়ারী।

يصلح للرحل وغير الرحل

খচ্চর ভ্রমন এবং অভ্রমন উভয় অবস্থায় উপযোগী ।

খচ্চরের উপর আরোহনের কাহিনীঃ

আব্বাস ইবনে ফারজ ওমর বিন আছকে বলেন যে, তিনি একটি খচ্চরের উপর সওয়ার । তার মুখমন্ডলের পশমগুলো লম্বা হওয়ার কারনে ঝুলে রযেছে। তাকে কেউ জিজ্ঞেস করল এই খচ্চরের উপর আরোহন করেছেন অথচ আপনি মিশরে উত্তম সওয়ারীতে আরোহন করে ছিলেন। একজন সিরীয় বলল একদা আমি মদীনাতে গেলাম সেখানে এমন সুন্দর চেহারর লোক দেখলাম যে, তার মত এমন সুন্দর চেহারার লোক এযাবৎ আমি আর কখনো দেখিনি। আর না এমন সুন্দর প্রাণী কখনো দেখেছি। সে একটি খচ্চরের উপর সওয়ার ছিল। এ অবস্থা দেখে আমি তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গেলাম । আমি তার ব্যাপারে লোকদের কে জিজ্ঞেস করলাম যে , তিনি কে? লোকেরা আমাকে বল্ল তিনি হলেন হযরত আলী ইবনে হোসাইন ইবনে আবু তালিব (রা.) সুতারাং আমি তার কাছে এলাম । অথচ তাকে হিংসা করতাম। তাকে বল্লাম, আপনি আবু তালেবের ছেলে ? তিনি বল্লেন না আমি তার প্রপৌত্র। বল্লাম, আপনাকে এবং আপনার পিতাকে আর আপনার সম্মানীত দাদা আবু তালেব আলী বিন আবু তালেব কে আমি ভালবাসি না । আমার বক্তব্য শেষ হওয়ার পর তিনি বল্লেন আমার মনে হয় তুমি মুসাফির । আমি বল্লাম ঠিকই বলেছেন। অতঃপর তিনি বল্লেন। তুমি

মুসাফির। আমি বল্লাম ঠিকই বলেছেন। অতৎপর তিনি বল্লেন। তুমি আমার সথে চল । যদি আমি কোথাও কোন থাকার ইন্তেজাম করতে পারি তাহলে তোমাকে সেখানে রেখেদেব। যদি তোমার কোন ধন সম্পদের অভাব হয় তাহলে তাও তোমাকে দেব অথবা কোন জিনিষের প্রয়োজন হলে তাও তোমাকে সাহায্য করা হবে।

আলী বিন হোসাইন এর পরিচিতি:

আল্লামা দামিরী (র.) বলেন, আলী ইবনে হুসাইনকে যায়নুল আবেদীন উপাধিতে ডাকা হত। তার মায়ের নাম ছালমাহ । তার বড় ভাইয়ের নামও আলী। যাকে কারবালতে তার পিতার সাথে শহীদ করা হয়। তিনি তাঁর পিতা এবং চাচা হাছান, জাবের, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, মুছাব্বির ইবনে মাখরুমাহ, আবু হোরায়রা, ছোফিয়া, আয়েশা, উম্মে সালমা, (রা.) থেকে হাদসি বর্ণনা করেছেন। ইবনে খাল্লেকান বলেন যায়নুল আবেদীনের মায়ের নাম ছালমা, যিনি পাস্যের শেষ শাসক ইয়াজদিজারের কন্যা ছিলেন।

আল্লামা যামাখশরী বলেন ইয়াজদিজারের তিনজন কন্য ছিল। যাদের সে হযরত ওমর (রা.) এর খেলাফত আমলে বন্দী করা হয়েছিল। এদের মধ্যে একজন আব্দুল্লাহ বিন ওমরের ভাগে পড়ে । তার ঘরেই ছালেম জন্ম গ্রহন করেন । ২য় কন্যা মুহাম্মদ বিন আবু বকরের ভাগে পড়ে। যার ঘরে আলী যায়নুল আবেদীন জন্ম গ্রহন করেন। সুতারাং তারা একে অপরের খালাত ভাই ছিলেন। আলী যায়নুল আবেদীন তার পিতার সঙ্গে কারবালাতে অংশ গ্রহণ করে ছিলেন কিন্তু তিনি শিশু থাকার কানে বেচে যান। কারণ কারবালঅতে বিরোধীরা প্রত্যেক গোত্রের লোকদের কে হত্যা করেছিল । তাদের সহিত ও তারা একই আচরণ করেছিল, যা কাফেরদের সহিত করা হয়। (আল্লাহ পাক হত্যাকারীদের ধ্বং স করুব।) আব্দুল্লাহ ইবনে যিয়াদ আলী যায়নুল আবেদীন কে হত্যা করতে ইচ্ছা করেছিল। কিন্তু আল্লাহ পাক তার সে ইচ্ছা পুরণ হতে দেননি। তবু অন্যান্যরা তাকে হত্যা করতে ইয়াযিদকে পরামর্শ দিয়েছিল। তখনও আল্লাহ পাক তাকে রক্ষা করেন। এরপর থেকেই ইয়াযিদ তাদের সম্মান করতে থাকে। এমনকি ইয়অযিদ তাদের সহিত উঠাবসা করত এবং খাওয়ার সময় তাদের কে নিয়ে খাওয়অ দাওয়া করত। অতঃপর ইয়াযিদ তাদেকে মদীনায় প্রেরন করে।

তিনি মদীনায় গিয়ে যথেষ্ট সম্মানের অধিকারী হন। ইবনে আছাকির বলেন, দামাস্কে আলী যায়নুল আবেদীন এর মসজিদ প্রসিদ্ধ। এই মসজিদটি শহর জামে নামে প্রসিদ্ধ। ইমাম যুহরী বলেন আমি কোন কুরাইশীকে তারচেয়ে উত্তম দেখিনাই।

মুহাম্মদ বিন ছায়াদ বলেন, আলী যায়নুল আবেদীন বিশ্বাসী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি নবী করিম (সা.) থেকে অনেক সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি একজন প্রখ্যাত আলেম ছিলেন। আহলে বায়তের মধ্যে তার চেয়ে উত্তম লোক আর কেহ ছিল না। ইমাম আছমায়ী বলেন হযরত হাসান এর বংশধারা আলী ইবনে যায়নুল আবেদীন ব্যাতীত অন্যা থেকে অন্য কারো বংশধর আসেনি। সমস্ত হুসাইনীই তাদের বংশের সহিত এসে মিলেছে।

বর্ণিত আছে যে, হযরত যায়নুল আবেদীন ওযু করলে তার মুখমন্ডল হলুদ বর্ণ হয়ে যেত। আর তিনি নামাযে দন্ডায়মান হয়ে গেলে অত্যন্তভীত হয়ে যেতেন। একদা তাঁর কাছে জানতে চাওয়া হল যে, তাঁর এ অবস্থা হয় কেন? উত্তরে তিনি বল্লেন তোমরা কি জাননা আমি কার সম্মুখে দন্ডায়মান হই?আর কার সহিত কানাকান করি? কোন কোন ঐতিহাসিক লিখেছেন আলী যায়নুল আবেদীন এক জায়গায় নামাজ পড়ছিলেন, সেখানে আগুন লেগে গেছে। নামাজান্তে তিনি জিজ্ঞেস করলেন কি হয়েছে?লোকেরা বল্ল যখন আগুন লেগে গেল তখন আপনি কেন নামাজের নিযত ছেড়ে দিলেন না ? জবাবে তিনি বল্লেন আমি এই আগুনের চেয়ে অন্য আগুনের প্রতি মনোনিবেশকরে ছিলাম।

বিদ্যান লোকের অভিমত হল তিনি যখন হজ্জ করতেন তখন তালীবয়া পাঠ করার সময় ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে যেতেন। মুখ মন্ডল হলুদ বর্ণ হয়ে যেত এবং জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যেতেন। জ্ঞান ফিরে এলে লোকেরা জিজ্ঞাস করলে তিনি বলতেন, আমি লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা পাঠ করার সময় আমার এমন ভয় অনুভব হত যে না জানি বলা হয় তুমি হাজির নও, তুমি হাজির নও। তখন লোকেরা তাকে সাহস যোগাত এবং বলত তালবিয়া পাঠ করা জরুরী। তিনি তালবিয়া পাঠ করে সওয়ারী থেকে বেহুশ হয়ে পড়ে যেতেন। তিনি ২৪ ঘন্টায় ১০০০ হাজার রাকাত নামাজ আদায় করতেন। অধিক পারিমানে দান খয়রাত করতেন। অধিকন্তু রাতে তিনি দান খয়রাত বেশী বেশী বেশী করতেন এবং বলতেন

রাতের ছদকাহ পরওয়অর দিগারের ক্রোধকে প্রসমিত করে। তিনি বেশী বেশী ক্রন্দন করতেন (আ.) এর বেশী ক্রন্দন করতেন যে তাঁর চোখ সাদা হয়ে গিয়েছিল। এ কারণে তার মৃত্যু ঘটেনি, তাহলে আমি কাদবনা কেন?

আলী যায়নুল আবেদীন নিজেও বলতেন যে ১০ থেকে বেশী লোখকে দেখেছি যে, সে প্রতি হজ্জেই আমার পরিবারের পক্ষ থেকে কোরবাণী করতো তিনি ঘর থেকে বের হলে এ দোয়া পড়তেন

اللهم انى اتصدق اليوم اواهب عرفى اليوم عمن يغتابنى

হে আল্লাহ! আমি আমার গীবত কারীদের জন্য আজ ছদকা করতেছি। এবং আমি আমা সম্মান দান করতেছি।

হযরত আলী বিন যায়নুল আবেদীনের ইন্তেকালঃ

ইতিহাসবিদগণের মধ্যে তাঁর মৃত্যুর সন ও তারিখ এর ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। জমহুর উলামা (তথা অধিকাংশ আলেম) বলেছেন তার ইন্তেকাল ৭৯ হিঃ হয়েছে। ইবনে ফুলাছ বলেন, উক্ত সালে সাঈদ বিন মুসাইব, সাইদ বিন জুবাইর, ওরওয়া বিন যুবাইর এবং আবু বকর ইবনে আব্দুর রহমান প্রমূখ মনিষী গন ইন্তেকাল করেছেন। কেহ বলেছেন তিনি ৯২ হিঃ বা ৯৩ হিঃ ইন্তেকাল করেছেন। কিন্তু মাদায়েনী বলেন ১০০ হিঃ সালে তিনি ইন্তেকাল করেন। আবার কেহ বলেন ৯৯ হিঃ তার বয়স ছিল ৫৮ বছর। চাচা হযরত হাসান (রা.) এর কবর স্থানে তাকে দাফন করা হয় ।

শেখ আবূ ইছহাক সিরাজী ফিরোজাবাদীঃ

ইবনে খাল্লেকান জালালুদ্দৌলা মুলকে শাহ এর জীবনিতে লিখেছে যে, একদা মুক্তাদির বিল্লাহ শেখ আবু ইছহাক সিরাজী ফিরোজ আবাদী (যার লিখা التبةএবং المذبইত্যাদি।) শাসক জালালুদ্দৌলার ছেলের সংবাদ নিয়ে নিশাপুর পৌছেন। তিনি যখন তার কাজ থেকে অবসর গ্রহন করেন তখন امام الحرمين এর সহিত বিতর্ক হয়। আবার যখন ফিরোজ আবাদী নশাপুর থেকে প্রত্যাবর্তন করতে লাগলো তখন ইমামুল হারামাইন ধরে রাখেন যতক্ষন না ফিরোজ আবাদী তার খচ্চরের উপর আরোহন করেছে। খোরাসানে ফিরোজ আবাদী যথেষ্ট সম্মানের অধিকারী হন। লোকেরা তার প্রতি এতই অনুরক্ত ছিল যে, তার খচ্চরের পা যে খানেই পড়ত সেখানের মাটিই তাবারক হিসেবে গ্রহন

করত। ফিরোজ আবাদী ছিলেন একজন উচুমানের আলেম, খোদাভীরু পরহেজগার, আবেদ এবং জাহেদ। তিনি ৪৭৬ হিঃ ইন্তেকাল করেন।

ইমামুল হারামাইনের ইন্তেকালঃ

শায়খ ইবনে খাল্লেকান বলেন, ইমামুল হারামাইন ৪৭৬ হিঃ ইন্তেকাল করেন। যে দিন তার ইন্তেকাল হয় সেদি হাট বাজার বন্ধ হয়ে যায়। জামে মসজিদের মিম্বর ভেঙ্গে ফেলা হয়। তার শাগরেদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৪০০ জন। তাদের উস্তাদের খবর যখন তারা অবহিত হল তখন তারা দোয়অত কলম ভেঙ্গে ফেলেন। এভাবে তারা বেশ কয়েক বছর কাটিয়ে দেন।

ইমাম আজম আবু হানিফা (রহ.)ঃ

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর এক প্রতিবেশীর নাম ছিল ইস্কাফী। লোকটি দিনের বেলায় কাজ করত। আর রাতে যখন সে ঘরে ফিরে আসত তখন কিছু একটা পান করত। লোকটি নেশাগ্রস্ত হয়ে গুন গুন করে একবিতা পড়ত।

اضاعونى واى فتى اضاعو:: ليوم كريهة وسداد ثغر

"লোকেরা আমাকে ধ্বংস করে দিয়েছে আমি ব্যতীত কোন্ সে নওজোয়ান যুদ্ধের ময়দানে এবং সীমান্তে ধ্বংস হয়েছে?

ইস্কাফী বারংবার ড্রিং করত এবং এ কবিতা টি বার বার পাঠ করত। শেব মেষ সে ঘুমিয়ে পড়ত। ইমাম আবু হানিফা প্রত্যেক রাত তার এই শোর গোল শুনতেন। একদিন সে আওয়াজ শুনতে পেলেন না। তখন ইমাম সাহেব তার ব্যাপারে লোকদের জিজ্ঞেস করলেন। লোকেরা তাঁকে জানালো বেশ কায়েক দিন হল ইস্কাফীকে বন্দী করেছে। একথা শুনার পর ইমাম সাহেব ফজরের নামাজ পড়ে খচ্চরের উপর সওয়ার হয়ে আমীরের বাড়ীতে আগমন করলেন এবং ঘরের ভিতর প্রবেশ করার অনুমতি চাইলেন। ভিতরে গালিচা স্থাপন পূর্বে তাকে ভিতরে আসতে দেয়া হলনা । সার্বিক এন্তেযাম করা হল। তারপর তাকে মজলিশে আসার অনুমতি দেয়া হল। আমীর বল্লেন মাননীয় ইমাম সাহেব কি প্রয়োজনে সুভাগমত করেছেন? আপনি কষ্ট করে কেন আগমন করলেন? ইমাম সাহেব সরাসরি ইস্কাফীকে ছেড়ে দেয়ার হুকুম করলেন। অধিকন্তু সে রাতে যত লোক গ্রেফতার হয়েছিল এদের কেও ছেড়ে দেবার আদেশ করলেন। আদেশানুযায়ী সকলকে ছেড়ে দেয়া হল। তারা নিজ নিজ

বাড়ীতে চলে গেল। তারপর ইমাম আবু হানিফা (রহ.) খচ্চরে আরোহন করে চলে এলেন। তিনি দেখতে ফেলেন যেন ইস্ফাফী পেছনে পেছনে আসছে। তা দেখে ইমাম সাহেব বললেন ইস্কাফী আমি তো তোমাকে ধ্বংস করে ফেলেছি। ইস্ফাফী বলল না জনাব! বরং আপনি আমাকে রক্ষা করেছেন। আমাকে বাচালেন। আল্লাহ্ পাক আপনাকে এর উত্তম প্রতিদান দিন। আপনি পরশী হওয়ার হক আদায় করেছেন। এর পর ইস্কাফী সে কাজ থেকে তওবা করল। তার পর থেকে ইস্কাফী আর সে কাজে জড়িত হয় নি।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর নাম হল নোমান বিন ছাবিত বিন যুত্বী বিন মাহ। তিনি ছিলেন একজন উচুমানের আলেম।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ইমাম মালেক (রহ.) এর কাছে জিজ্ঞেস করলেন যে, আপনি কি ইমাম আবু হনিফা (রহ.) কে দেখেছেন? তিনি জবাব দিলেন হ্যাঁ তাঁকে দেখেছি। যদি তিনি এ দেওয়ালকে বলে দিতেন তা স্বর্ণের, তবে তিনি তা অকাট্য দলীল-প্রমাণে তা প্রমাণ করে ছাড়তে পারতেন।

ইমাম শাফেয়ী বলতেন ফিক্বহ শাস্ত্রে ইমাম আবু হানিফাকে, কবিতায় যুহাইর ইবনে আবু সালামাকে , ইতিহাস এবং যুদ্ধ বিদ্যায় মুহাম্মদ বিন ইসহাককে, নাহু শাস্ত্রে'ইমাম কুসাইকে, তাফসীর শাস্ত্রে মাক্বাতিল বিন মুলায়মানকে সকল লোকের আত্মীয় মনে করা হত। আবু হানিফা ছিলেন কিয়াস শাস্ত্রের ইমাম । তিনি ঈশার ওযু দিয়ে একাধারে ৪০ বছর ফজরের নামাজ আদায় করেন। তিনি স্বাভাবিক ভাবেই একরাতে পূর্ণ ক্বোরআন খতম করতেন। রাতের বেলা এতই ক্রন্দন করতেন যে পরশীরা পর্যন্ত তার প্রতি অনুরক্ত হয়ে যেত। যে স্থানে তার ইন্তেকাল হয় সেখানে তিনি ৭০ হাজার বার পবিত্র ক্বোরআন খতম করেন এবং ৩০ বছর পর্যন্ত সকালে নাস্তা করেননি।

বর্ণিত আছে যে, আবু আমর ইবনুউলা প্রশ্ন কর্বল যে, যদি কোন ব্যক্তি কাউকে ভারী বস্তু দ্বারা হত্যা করে তাহলে সে ব্যক্তির উপর কেছাছ ওয়াজিব হবে কিনা? তিনি জবাব দিলেন না কেছাছ ওয়াজিব হবে না । (জবাব তিনি তার মতাদর্শানুযায়ী দিয়ে ছিলেন) এতে ইমাম শাফেয়ীর মতানৈক্য রয়েছে। আবু আমর আবার প্রশ্ন করলেন যে, যদি কেউ গোপনে পাথরের সাহায্যে কাউকে হত্যা করে তাহলে এর উত্তর কি হবে? জবাবে তিনি বললেন যে কেউ ইচ্ছা

পূর্বক আবু কুবাইহ পাহাড়ের পাথর দ্বারা হত্যা করুক কেছাছ হবে না। কোন সময় লোকেরা ইমাম সাহেবের পক্ষ থেকে এই আপত্তি উত্থান করল যে, তিনি এই জবাব সে সমস্ত লোকদের মুখের উপর দিয়ে দিতেন যারা اسماء ستہ مکبرہ কে তিন অবস্থায় আলিফ এর সাথে পড়তেন। আরব কবি বলেনঃ

ان اباها وابا اباها:: قد بلغنا فی المسجد غاییتاها

ঘটনা হল তার পিতা ও দাদার নিজ নিজ উদ্দেশ্য শ্রেষ্ঠত্ব ও বুযর্গী অর্জন করেছেন। তাহলে কূফা বাসীর ভাষা। আর ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ছিলেন কূফী। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বাগদাদ জেল খানায় ১৫০ হিঃ ইন্তেকাল করেন। আর কেহ কেহ এ তারিখ ব্যতীত ও অন্য কথা বলেছেন। কেহ বলেন তিনি জেলখানায় ইন্তেকাল করেননি। আবার কোন ঐতিহাসিক লিখেছেন যে, ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর জন্মের দিন তিনি ইন্তেকাল করেছেন। ইমাম নববী (রহ.) বলেছেন তিনি ১৫১ হিঃ অথবা ১৫৩ হিঃ ইন্তেকাল করেছেন। ইমাম দামিরী (রহ.) বলেন, ইস্কাফীর ঘটনায় যে আফ্ফান (রহ.) এর কবিতাটিকে নজর বিন শামায়েল মামুনুর রশিদের দরবারে নিয়মিত তা পাঠ করা হত।

নযর বিন শামাইলের ইকটি জ্ঞানগর্ভ ঘটনাঃ

ইবনে খাল্লেকান লিখেছেন যে, একদা নযর বিন শামাইল মামুনুর রশিদের দরবারে আগমন করেন। তারা উভয়েই হাদীষ ব্যাপারে আলোচনা করতে থাকেন। মামুনুর রশিদ হাশিমের ছনদে একটি হাদীস আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস পর্যন্ত বর্ণনা করে বলেন, জনাব রাছুল্লাহ (সা.) এরশাদ ফরমান মানুষ যখন কোন নারীর দ্বীন এবং রূপ লাবন্যের কারনে বিবাহ করে তখন সে দারিদ্রতা থেকে মুক্তি পায়। বর্ণনা শুনে নজর বিন শামাইল বলেন হাশিম কিন্তু সত্য বর্ণনা করেছেন। আমার কাছে অমুক থেকে অমুক বর্ণনা করে আলী বিন আবুতালেব পর্যন্ত সনদের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন ।

জনাব রাছলুল্লাহ (সা.) এরশাদ ফরমান মানুষ যখন কোন নারী কে দ্বীন ও মাজহাব এবং খুরছুরতের কারণে বিয়ে করে তাহলে সে দারিদ্রতা থেকে মুক্ত হয়ে যায়।

নযর বিন শামাইল বলেন একথা শুনে মামুনুর রশিদ সোজা হয়ে বসে গেলেন। অথচ তিনি বালিশে হেলান দিয়ে বসেছিলেন। অতঃপর তিনি বলেন

নযর তুমি سداد বল্লেকি বরে ? আমি জবাব দিলাম যে এখানে سداد ভুল। মামুন বল্লেন তুমি আমার এরাবের ভুল শুধরাচ্ছ? আমি বল্লাম হাশিম এরাবের ভুল করেছেন তাই আমিরুল মুমিনিনের কথাইমানা হল অতঃপর তিনি আবার বলেন আচ্ছা سداد এ যে অথবা যবর পড়াতে পার্থক্য কি হবে । আমি বল্লম سداد দ্বীনের সততা এবং "পাল্কী দেখা"বলে। আর سداد প্রয়োজন এবং দারিদ্র তা কে বলে। আর যাকে আপনি ঠিক করলে তাকে سداد বলে মামুনুর রশিদ বল্লেন এ ব্যপারে কি আরবদের কোন করিবত তোমার জনা আছে। আমি বল্লাম জি জনাব আছে আরবীরা বলেনঃ

اضاعونى واى فتى اضاعوا :: ليوم كريهة وسداد ثغر

লোকেরা আমাকে ধ্বংস করে দিয়েছে আমাকে ব্যতীত কোন্ সে যুবক যুদ্ধের ময়দানে এবং সীমান্তে ধ্বংস হয়েছে? একথা শুনে মামুনুর রশীদ কেটি চির কুট নিয়ে নযর বিন শামাইলের সঙ্গে ফজল বিন সুহাইলের কাছে চলে যাও। ফজল বিন সুহাইল যখন চিরকুটটি খুলে পাঠ করলেন তখন বলেন ওহে নযর আমিরুল মুমিনীন তোমাকে ৫০,০০০/- দেরহাম দেয়ার ঘোষণা করেছেন। ঘটনা কি আমাকে বলত। (ঘটনা শুনে) ফজল বিন সোহাইল তাকে আরো ৩৯,০০০/- হাজার দেরহাম পুরস্কার প্রদান করেন। সুতরাং এক অক্ষরের বিনিময়ে আমি ৮০,০০০/- হাজার দেরহাম নিয়ে চলে এলাম। নজর বিন শামায়েল মরোনামক স্থানে ২০৪ হিঃ ইন্তেকাল করেন।

হারুনুর রশীদের দরবারে ইমাম আবু ইউসুফের জ্ঞানের মূল্যায়নঃ

ইমাম আবু ইউছুফ (রহঃ) ইমাম আবু হানিফা (রহ.)এর শগরিদ ছিলেন। তার প্রকৃত নাম ইয়াকুব। ইমাম আবু ইউসুফ বলেন, একদা আমি বিছানায় শোয়ার জন্য সে দেখি এক ব্যক্তি দরজায় কড়া নাড়ছে। আমি বাইরে এসে বুঝলাম তিনি হারছামাহ বিন আইয়ূন। তিনি বল্লেন চলুন খলিফা হারুনুর রশীদ আপনাকে স্মরন করছেন। একথা শুনে আমি আমার খচ্চরের উপর আরোহন করলাম এবং ভয়ে ভয়ে আমিরুল মুমিনীন এর ঘরে আসলাম। দরজায় হারছামাকে জিজ্ঞেস করা হলো যে ভাই আমিরুল মুমিনীনের পাশে আরেকজন কে বসে আছেন? তিনি জবাব দিলেন ইসা ইবনে জাফর বসা আছেন। অতঃপর আমি ঘরে প্রবেশ করে দেখলাম আমিরুল মুমিনীন আগমত করেছেন। তার ডান

পার্শে ঈসা বিন জাফর বসা আছেন। অতঃপর আমি সালাম দিয়ে বসে গেলাম হারুন্নুর রশীদ বল্লেন আবু ইউসুফআমার ধারনা যে আমি তোমাকে ভীতির মধ্যে ফেলে দিয়েছি। আমি বল্লাম আল্লাহর কছম তাই! বরং আমার পেছনের লোকটিকেও পর্যন্ত ভীতির মধ্যে ফেলে দিয়েছি। একথা শুনে হারুন্নুর রশীদ কিছুক্ষন চুপ থাকলেন অতঃপর বল্লেন হে ইয়াকুব! তুমি কি শুনেছো কেন তোমাকে ডাকা হয়েছে? আমি বল্লাম তাতো জানিনা। তিনি বল্লেন আমি তোমাকে এজন্য ডেকেছিযে, তুমি স্বাক্ষী থেকো যে, ঈসা বিন জাফর এর নিকট একজন দাসী রয়েছে। দাসিটি আমাকে দিয়ে দিতে বল্লে সে তা অস্বীকার করেছে যদি সে দাসীটি আমাকে না দেয় তাহলে খোদার কছম আমি তাকে হত্যাকরব। ইমাম আবু ইউসুফ বলেন, একথা শুনে আমি ঈসা বিন আবু জাফর এর উদ্দেশ্যে বল্লাম তোমার কাছে দাসীর এতই হুরুত্ব যে, তুমি তাকে দিয়ে দিতে অস্বীকার করলে এবং দসীর কারনে তোমার মান মর্যদা আমিরুল মুমিনীনের কাছে ভুলষ্ঠিত করবে? শেষ পর্যন্ত সে দাসী তোমার কাছে থেকে চলে যাবে। একথা শুনে জাফর বল্ল আমিরুল মুমিনীন ধমক দেয়াতে বেশ তাড়া হুড়া করেন। আমার কিছু ওজর আপত্তি ও তো থাকতে পারে । আমি বল্লাম ঠিক আছে বলকি তোমার ওযর আপত্তি? ঈসা বিন জাফর বলেন আমি এই দাসীকে তালাক এবং আযাদ না করার শপথ করেছি। যদিও আমার যাবতীয় ধন সম্পদ লুট হয়ে যাকনা কেন। কিন্তু আমি তাকে বিক্রীও করবনা আর দামদর ও করবনা। ইমাম আবু ইউসুফ বলেন একথা শুনে হারুন্নুর রশিদ আমার দিকে ফিরলেন এবং বল্লেন, আবু ইউসুফ এই সাছয়ালার কোন সমাধান করতে পারবেন? আমি বল্লাম জি জনাব সমস্যা সমাধান করতে পারব। খলিফা বল্লেন কি ভাবে? আমি বল্লাম দাসীর অর্ধেক আপনাকে দান করা হবে আর বাকী অর্ধেক দাসী আপনার কাছে বিক্রী করে দেবে তাহলে দাসীটি মুলত বিক্রীও হবেনা আর হেবাও হবে না। ঈসা বিন আবু জাফর বল্লেন হ্যা জায়েজ আছে। ঈসা বিন জাফর বল্লেন ঠিক আছে আপনি স্বাক্ষী থাকুন আমি অর্ধেক দাসী আমিরুল্ল মুমিনীনকে দান করলাম, বাকী অর্ধেক ১০০০/-হাজার আশরাফীর পরিবর্তে তাঁর হাতে বিক্রী করলাম। হারুন্নুর রশীদ বল্লেন আমি অর্ধেক দাসী কবুল করলাম আর অর্ধেক ১০০০/- আশরাফীর বদলে ক্রয় করলাম।

আবু ইউসুফ বল্লেন, ঠিক আছে দাসী ও মাল আমার কাছে নিয়ে আসুন।

সুতরাং তারা উভয়েই মালও দাসী উপস্থিত করলেন ইমাম আবু ইউসুফ বল্লেন হে আমিরুল মুমিনীন !এখন দাসীটি নিয়ে যেতে পারেন। আল্লাহ্ তায়ালা এতে বরকত দিবেন।

হারুনুর রশীদ বললেন ইয়াকুব আরেকটি জিনিষ বাকী রয়ে গেল তাও সমাধা করে দাও। আমি বল্লাম সেটা কি? তিনি বল্লেন দাসিটি তো মালিকানা ধীন এবং দাসীকে ঋতুশ্রাব পর্যন্ত সহবাস করা ছেড়ে দেয়া জরুরী। আল্লাহর কছম! এ রাতেই যদি আমি দাসীর সহিত না কাটাই তাহলে আমার প্রাণ বের হয়ে যাবে। আমি বল্লাম হে খলিফা! আপনি দাসীটি আযাদ করে তাকে বিয়ে করুন। কারণ স্বাধীন নারীর জন্য ঋতুশ্রাব পর্যন্ত সহবাস করা ছেড়ে দেয়া জরুরী নয় । হারুনুর রশীদ বললেন ঠিক আছে আমি তাকে আযাদ করে দিলাম। এখন তাহলে বিয়ে পড়াবে কে ? আমি বল্লাম বিয়ে পড়াব আমি । সুতরাং মাছরুর এবং হুসাইনের সম্মুখে বিয়ের খুৎবার পাঠ করা হল। আর এই দাসীরক ২০,০০০ হাজার আশরাফীর মহরের মাধ্যমে হারুনুর রশীদের সহিত বিয়ে পড়ানো হল। এর পর খলিফা বল্লেন আবু ইউসুফ এখন যেতে পারেন। এ দিকে মাসরুরকে বলে দিলেন তুমি আবু ইউসূফকে ২লক্ষ দেরহাম এবং ২০ খানা শাহী পোশাক উপহার দিয়ে তাকে ঘরে পৌছে দাও । সুতারাং খলিফার আদেশ মত তাই করা হল।

ঐতিহাসিকদের কেউ কেউ লিখেছেন ইমাম আবু ইউসুফের মজলিসে একজন লোক অত্যন্ত চুপ থাকতেন , তিনি কোন কথাই জিজ্ঞেস করতেন না। একদিন ইমাম আবু ইউসুফ তাকে জিজ্ঞেস করলেন যে ভাই তুমি তো কোন দিন কিছুই জিজ্ঞেস করলেনা। সে লোক বলল ঠিক আছে যদি আপনি বলেন তাহলে প্রশ্ন করব। লোকটি বলল রোজাদার কখন ইফতার করবে? তিনি বললেন সুর্য যখন আড়াল হয়ে যায়। লোকটি বলল যদি অর্ধরাত পর্যন্ত সূর্য না ডুবে , তাহলে রোজাদার কখন ইফতার করবে? একথা শুনে ইমাম সাহেব হাসতে আরম্ভ করলেন এবং বললেন তুমি ঘটনা গোপন রাখছ? আমি তোমার উৎসাহে ভুল করেছি। আর তিনি এই কবিতা পাঠ করতে আরম্ভ করলেন।

عجبت لازراء الغبى بنفسه ☆ وصمت الذى قد كان بالقول أعلما

"আমি নির্বোধ লোককে উপহাস করায় হতভম্ভ হয়ে পড়েছে যখন সে

তার উদ্দেশ্যের প্রকাশ ঘটাল তখন আমি তার কারণে চুপ হয়ে গেলাম।

وفى الصمت ستر للغبى وانما ☆ صحيفة لب المرأان يتكلما

চুপ থাকা বে কার জন্য পর্দা স্বরূপ, কাথা বলা মানুষের দেমাগের ছোট কিতাব।

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন জনৈক ব্যক্তি এক আলেমের মজলিসে উপবিষ্ট ছিলেন। কিন্তু তিনি কোন কথাই বলেন না। একদিন তাকে একথা বলা হল যে, ভাই তুমি একদম কথা বলছনা। লোকটি বল্লেন ঠিক বলুন তো প্রতি চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে আইয়াম ভেজের রোজা কেন মুস্তাহাব? লোকটি বল্ল আমি তা জানিনা। তখন লোকটি বল্ল আইয়াম বিজের রোজা এজন্য মোস্তাহাব যে, চন্দ্র আইয়াম ভিজে গ্রহন লাগে। এজন্য আল্লাহ্ পাক চান যে আকাশে কোন নতুন জিনিষ এমন না হোক যার দৃশ্য যমীনে হয়। এঘটানার উপর সুন্দর ঘটনা আছে।

ইবনে খাল্লেকান লিখেন যে, ইমাম শাবীর মজলিসে এক ব্যক্তি বসা ছিল এবং লোকটি প্রায়ই চুপ থাকত। একদিন ইমাম শাবী বলেন ভাই তুমি কিছু বল। লোকটি বল্ল আমি চুপ থাকলে ইলম বর্ধিত হয়। কারণ মানুষের ভাগ্য তার শ্রবনের মধ্যেই রাখা হয়েছে। আর যবান দ্বারা ভাগ্য অন্যের উপকার হওয়ার জন্য।

ইবনে খাল্লেকান লিখেন, এক যুবক ইমাম শাবীর সাথে কথোপকথন করতে ছিলেন। ইমাম শাবী তখন বল্লেন আমিতো তা শুনিনি। যুবা লোকটি বল্ল, এই কথাটি আপনার কানের এমন স্থানে রেখে দিন যাকে আপনি শুনেননি। এ কথা শুনে ইমাম শাবী চুপ হয়ে গেলেন।

ইমাম আবু ইউসুফকে সর্ব প্রথম কাযিউল কুযাত বা প্রধান বিচারপতি উপাধিতে ভূষিত করা হয়। আর সর্বপ্রথম ফকীহ্ যারা উলামাদের উপস্থিত সেই রীতি-নীতি মোতাবেক পোশাক পরিচ্ছেদ নির্ধারিত করে দেন। অন্যথায় সাধারন ভাবে মানুষের পোষাক পরিচ্ছেদ একই অবস্থায় হত। পোষাকের কানে কোন মানুষকে সম্মান করা হতনা। কোন কোন ঐতিহাসিক লিখেছেন, আব্দুল রহমান ইবনে মাহহাব বাগদাদ এবং তার আস পাশের ছোট ছোট শহরের কাজী ছিলেন। তিনি যখন জানতে পারলেন খলিফা হারুনুর রশীদ এবং তার সাথে

ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)বছরাতে আগমন করেছেন তখন আব্দুর রহমান ইবনে নিকট আমার প্রশংসা করবে। শহর বাসীরা তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান কররেন। সুতরাং শহর বাসীরা তাদের পোশাক পরিবর্তন করে তাদের সহিত সাক্ষাৎ করেন বেং তারা যেতেই বল্ল যে, কাজী তাওবিছ আমাদের শহরের লোক। একথা শুনে হারুনুর রশীদ ইমাম আবু ইউসুফের দিকে ফিরে বলেন এখানে মনে হয় কাজীর কর্ম কান্ড ভাল নয়। ইমাম আবু ইউসুফ বল্লেন আমিরুল মুমিনীন! অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার যে, কাজী নিজেই তার প্রশংসা করছেন। একথা শুনে হারুনুর রশীদ হেসে ফেলেন। খলিফা বলেন যে, একাজী মনে হয় সূক্ষ্নভাষী এবং চিত্তাকর্ষক হবে। এমন ব্যক্তিকে অপসারন করা যায়না।

ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) এর ইন্তেকাল ঃ

ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) ১৮২ হিঃ রবিঃ আউয়াল মাসে ইন্তেকাল করেন। আবার অন্যান্য লোকেরা অন্য তারিখ বর্ণনা করেছেন।

খচ্চর বংশহীন হয় কেন?

এক সময় মোওছেলের হাকিম তার খচ্চর থেকে নীচে পড়ে যান তখন আবুচ্ছায়াদাত ইবনে আছীর এই কবিতা পাঠ করেনঃ

ان زلت البغلة من تحته ☆ فان فى زلتها عذرا

যদি খচ্চর তাঁর নীচে ফসকে পড়ে তাহলে অবশ্যই কোন কারনে ফসকে গেছে।

حملها من علمه شاهقا☆ ومن نذى راحته بحرا

তারা জেনে বুঝেই পাহাড়ের চুড়ায় আরোহন করে আর তাদের দান খয়রাত ও সম্মানের উদাহরণ সমুদ্রের ন্যায়।

হাফেজ ইবনে আছাকির লিখেন যে, হযরত আলী (রহ.) বলতেন যে, খচ্চরের বং শ হয়না । যদিও খচ্চর সমস্ত প্রানী তেকে দ্রুত গতি সম্পন্ন কেননা জানোয়ারের মধ্যে হযরত ইব্রাহীম (আ.) কে আগুনে ফেলার জন্য যারা লাকড়ী একত্র করেছিল এদের মধ্যে খচ্চর ও ছিল। সুতরাং তিনি এর জন্য বদদোয়া করেছিলেন। এজন্য আল্লাহ পাক খচ্চরকে বংশহীন করেছেন।

একজন রাফেজী মতাবলম্বীর দুষ্টামীঃ

ইসমাইল ইবনে হাম্মদ ইবনে আবু হানিফা বলেন, আমাদের প্রতিবেশীদের মধ্যে একজন চাক্কীওয়ালা রাফেজী ছিল। তার দুটি খচ্চর ছিল। একটির নাম রেখেছিল আবু বকর, অপরটির নাম রেখেছিল ওমর। কয়েকদিন পর সে রাফেজী লোকটি একটি খচ্চরকে বল্লমের আঘাতে হত্যা করে ফেল্ল। যখন (ইমাম আবু হানিফা) দাদাজানের এই ঘটনা অবগত হলেন তখন তিনি বল্লেন তোমরা গিয়ে দেখ বুঝতে পারল যে যা ইমাম আজম বলেছিলেন তাই হয়েছে। ছুফিয়ান ইবনে আব্বান বলেন যে, হযরত আনাস (রা.) বল্লেঃ নবী করিম (স.) একদা খচ্চরের উপর আরোহন করলে খচ্চরটি বিগড়ে যায়। অতঃপর নবী করিম (স.) তাকে থামিয়ে দেন এবং একজন লোককে খচ্চরের উপর ছুরা ফালাক পাঠ করার নির্দেশ দেন। যখন পড়া হল তখন সব ঠিক হয়ে গেল।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন, নবী করিম (স.) এরশাদ ফরমান যে যার তিনটি সন্তান জন্ম গ্রহণ করেছে এবং এদের কোন একজনের নাম মুহাম্মদ না রাখা হয় সে বড়ই নির্দয়। যদি তোমরা তার নাম মুহাম্মদ রাখ তাহলে তাকে গালি দিওনা। আর না ভাল মন্দ বলিওনা। তাকে মার পিট করোনা বরং তাকে সম্মান করবে।

আব্দুল্লাহ বিন যারীর গামজী মিশরী বলেন, হযরত আলী (রা.) বলেন যে, আমি নবী করিম (স.) কে একটি খচ্চর হাদিয়া দেয়া হয়। নবী করিম (স.) এতে আরোহন করলেন। লোকেরা বলতে লাগল যে আমরা গাধাকে ঘোড়ার সহিত মিলালে আমিও এমন একটি খচ্চর পেতে পারি। এত নবী করিম (স.) কল্লেন সেই তা করতে যাবে যার এ ব্যাপারে কোন জ্ঞান নেই (আবু দাউদ নাছাঈ)।

ইবনে হাব্বান বলেন, জ্ঞান নাই কথার মর্ম হল এ ধরনের কাজ থেকে বিরত থাকার কথা বলেছেন। ইমাম খাত্তাবী এর কাছাকাছি অর্থ বর্ণনা করেছেন। যখন গাধাকে ঘোড়ার সহিত সঙ্গম করানো হয় তখন ঘোড়ার উপকারিত খতম হয়ে যায়। এর সংখ্যায় স্বল্পতা সৃষ্টি হয়। এবং বংশধর নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। অথচ ঘোড়াকে লোকেরা ছওয়ারী এবং অন্যান্য কাজে ব্যবহার করে আবার ঘোড়ায়

আরোহন, শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই এবং ধন সম্পদ ইত্যাদি অর্জন করা যায়।

কতিপয় মাসআলাঃ

খচ্চরের গোস্ত খাওয়া যাবে এবং যে পরিমান মুজাহিদদের গনিমতে নির্ধারন করা হয় ততটুকুই ঘোড়ার অংশে শামিল হবে। উপকারিতা খচ্চর থেকে পাওয়া যাবেনা। আর মানুষ এ সমস্ত কাজে খচ্চর ব্যবহার করেনা। এসমস্ত গুনাগুন এবং সৌন্দর্যের জন্য নবী করিম (স.) ঘোড়া পছন্দ করেছেন। আর নবী করিম (স.) এর একান্ত ইচ্ছা ছিল যে ঘোড়ার সংখ্যা বৃদ্ধি হোক, এর বংশ বৃদ্ধি হোক, কারণ ঘোড়াতে অসংখ্য পরিমান উপকারিতা এবং মঙ্গল নিহিত রয়েছে। যদি ঘোড়া গাধার সাথে সঙ্গম করে তাহলে এ অবস্থায় নয় যে, নিম্নাংশে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। কেহ এই ব্যাখ্যা করতে আরম্ভ করল যে, হাদীছের উদ্দেশ্য ঘোড়ার প্রকারকে গাধার বংশের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা উদ্দেশ্য। আর এদুয়ের মধ্যে সঙ্গম দৃষ্টি কটু হলে দুটি ভিন্ন প্রাণী দ্বারা কোন যৌগিক বংশ সৃষ্টি হবেনা। এই জন্য দুই প্রকারের মিলনে যে প্রাণীর জন্ম হয় তা সাধারণ জন্মের প্রাণীর চেয়ে অধিকতর দুষ্ট ও উগ্র হয়ে থাকে। যেমন- মেষ শাবক যে কিনা বিচ্ছু বা বাজ পাখীর মিলনে জন্মায়। আর কুকুর ছানা যে কি স্ত্রী মেষের গর্ভে জন্মগ্রহণ করে।

খচ্চর সাধারণত: বন্ধা হয়, এদের কোন বংশধর থাকেনা । এগুলো সাধারণ চতুর চালক তবে তারা ইতর। এ মতামত আমার মন পুত হলনা- কারণ পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة (النحل)

আল্লাহ পাক খচ্চরকে বিশেষ নামে উল্লেখ করায় এর উপর বিশেষ মেহেরবানী করেছেন। যেমনিভাবে ঘোড়া এবং গাধার উপর আরোহন করার জন্য অনুগ্রহ করেছেন। আবার এগুলোর মধ্যে যে অধিকতর লাভবান সেগুলোর প্রতি মনোযোগ করিয়েছেন। আর না এদের উপর আরোহন করা যায়- আর না এর মাধ্যমে কোন উপকার পাওয়া যায়। অথচ নবী করিম (স.) খচ্চর ব্যবহারের কথা বলেছেন- এবং সওয়ারীর জন্য অনুমতি দিয়েছেন। নবী করিম (স.) সবার এবং বাড়ীতে থাকাবস্থায় ও খচ্চরের উপর আরোহন করেছেন। যদি তা অপছন্দনীয়ই হত তাহলে নবী করিম (স.) অনুমতি ও দিতেন না এবং

নিজেও ব্যবহার করতেন না । সুতরাং যায়েদ বিন ছাবিত (রা.) বর্ণনা করেন- একদা নবী করিম (স.) বনী নাজ্জারের বাগানের উপর দিয়ে খচ্চরে আরোহন করে যাচ্ছিলেন, আমরাও তাঁর সহিত ছিলাম। হঠাৎ করে তাঁর খচ্চরটি এমনভাবে বিগড়ে যায় যে ভয় হচ্ছিল যে, নাজানি তাঁকে নীচে ফেলে দেয়। সেখানে ৪টি অথবা ৫টি বা ৬টি কবর ছিল । নবী করিম (স.) বল্লেন তোমরা বি জান এখানে কাদের কবর রয়েছে? উপস্থিত লোকেরা বল্ল- তারা বুফুরী অবস্থায় সৃত্যুবরণ করেছে। তখন নবী করিম (স.) বল্লেন- তারা কবরে আযাবে লিপ্ত রয়েছে। অতঃপর নবী করিম (স.) বল্লেন তোমরা যদি ব্যাপারটি প্রকাশ না করতে তাহলে আমি আল্লাহ পাকের নিকট দোয়া করতাম । তাহলে আমি যেমন এই কবর সমূহের আযাব গুনতেঠি তোমাদেরকেও তা শুনাতে পারতাম। অতঃপর নবী করিম (স.) আমাদের দিকে ফিরে এরশাদ ফরমান- আল্লাহ পাকের নিকট কবর আযাব থেকে পানাহ চাও। আমরা দোয়া করলা যে হে আল্লাহ আমাদেরকে কবর আযাব থেকে মুক্তি দিন । তিনি (স.) বল্লেন- জাহান্নামের আযাব থেকে তোমরা আল্লাহর নিকট পানাহ চাও। আমরা বললাম হে আল্লাহ দোযখের আযাব থেকে মুক্তি চাই। আবার নবী করিম (স.) বল্লেন প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য ফিতন থেকে আল্লাহর নিকট পানাহ চাও। আমরা বল্লাম, আল্লাহ তায়ালার নিকট জাহেরী ও বাতেনী ফিতনা থেকে মুক্তি চাই। আবার নবী করিম (স.) বল্লেন তোমরা পানাহ চাও দাজ্জালের ফিতনা থেকে। আমরা তখনই দাজ্জালের ফিতনা থেকে আল্লাহর নিকট পানাহ চাই।

নবী করিম (স.) এর দুলদুল নামের খচ্চরঃ

নবী করিম (স.) যে খচ্চরের উপর আরোহন করে ভ্রমন ইত্যাদি করতেন তার নাম ছিল দুলদুল। সে ছিল স্ত্রী প্রজাতি । এর সমর্থন করেছেন ইবনে ছালাহ প্রমুখ মনিষীগণ। এ খচ্চরটি নবী করিম (স.)এর ইন্তেকালের পর জীবিত ছিল।বার্ধক্যের কারণে এর চোয়ালের দাঁত পড়ে গিয়েছিল। সুতরাং তখন একে গম ভাঙ্গিয়ে খাওয়ানো হত । এই খচ্চরটি আমীর মুয়াবিয়র শাসনামলে বাকী নামক কবর স্থানের পাশে মৃত্যুবরণ করে। ঐতিহাসিকগণ বলেছেন নবী করিম (স.) এর খচ্চরটি ছিল সাদা রং এর।

হাফেজ কুতুব উদ্দিন শরহে জামে ছগীর এর উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন,

কোন ব্যক্তি যদি খচ্চরের উপর আরোহন করার শপথ করে , অতঃপর সে স্ত্রী বা পুরুষ খচ্চরের উপর আরোহন করল তাহলে সে কছম ভঙ্গকারী হিসাবে গণ্য হবে। কারণ খচ্চর শব্দটি اسم جنس আর جنس এর সম্পর্ক নারী পুরুষ উভয়ের বেলায় প্রযোজ্য। তাই খচ্চরের মাছয়ালাও তাই।

আরবী ভাষায় بغلة শব্দে যে ة অক্ষরটি রয়েছে তা হলো افراد এর জন্য ব্যবহৃত। আর افراد ة স্ত্রী পুরুষ উভয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন تمرة تمر (টিন্ডিও খেজুর) এ ة রয়েছে। এমনিভাবে কেহ যদি بغلة (খচ্চরে) আরোহন না করার কছম করে অতঃপর সে মাদা বা মাদী খচ্চরের উপর আরোহন করল তাহলেও সে কছম ভাঙ্গার জন্য গোনাহগার হবে।

হাফেজ কুতুব উদ্দিন আরো বলেছেন, মুহাদ্দেসীনে কেরাম এই কথার উপর ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, নবী করিম (স.) এর খচ্চরটি পুরুষ ছিল নারী নয়। এছাড়া ও নবী করিম (স.) এর আরো ৫টি খচ্চর ছিল । ইমাম সোহাইলী বলেন যে, হুনাইন যুদ্ধের আলোচনায় এসেছে যে, নবী করিম (স.) بطحاء থেকে স্ত্রী খচ্চরের উপর সওয়ার হয়ে এক মুষ্টি মাটি হাতে নেন- যে গুলোকে কাফেরদের মুখমন্ডলে شاهت الوجوه বলে নিক্ষেপ করেন। এতেই কাফের বাহিনী পরাজিত হয়। নবী করিম (স.) যে মুহুর্তে মাটি নেয়ার ইচ্ছা করেন সে মুহুর্তে খচ্চরটি নাম ছিল 'বয়যা'। এই খচ্চরিটি সম্ভবত فروة بن نعامة নবী করিম (স.) কে হাদিয়া হিসেবে দিয়ে ছিলেন।

হযরত আনাস (রা.) বলেন, হুনাইন যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী যখন পরাজয়ের কাছাকাছি তখন নবী করিম (স.) তার সাদা রঙ্গের খচ্চরীর উপর সওয়ার ছিলেন, একে দুলদুল বলা হত। নবী করিম (স.) দুলদুলকে উদ্দেশ্য করে বলেন হে দুলদুল ঝুকে যাও। সে এই কথা শুনা মাত্রই তার পেট মাটিতে লাগিয়ে দেয়, এত নবী (স.) এক মুষ্টি মাটি হাতে উঠিয়ে নেন। আর এই মাটিই কাফেরদের মুখমন্ডল লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করেন এবং বলেন- কাফেররা বিজয়ী হতে পারবেনা।তাই কাফেররা পরাজিত হয়। অথচ আমরা তীর বা বল্লম দ্বারা আক্রমন করিনি আর না এদেরকে তলোয়ার দ্বারা মেরেছি। হযরত শাইবাহ ইবনে ওসমান বলেন, নবী করিম (স.) হুনাইন যুদ্ধের নিদ তাঁর চাচা হযরত আব্বাস (রা.) এর নিকট বল্লেন যে, بطحاء থেকে আমাকে এক মুষ্টি মাটি

উঠিয়ে দিন। নবী করিম (স.)একথা খচ্চরী বুঝে ফেলল। আর সাথে সাথে সে ঝুকে গেল- এমন কি তার পেট মাটির সহিত মিশিয়ে দেয়। আর নবী করিম (স.) কংকরময় ভূমি থেকে মাটি উঠিয়ে কাফেরদের মুখমন্ডল লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করেন এবং বলে شاهت ال وجوه কাফেরদের চেহারা বদছুরত হয়ে যাক তারা বিজয়ী হতে পাবেনা। (طبرانى)

খুজাইমাহ ইবনে আওস বলেন যে, আমি হিজরত করে নবী করিম (স.) এর কাছ থেকে চলে এলাম। সুতরাং আমি তবুক থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় নবী করিম এর খেদমতে হাজির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করলাম। সে সময় আমি নবী করিম (স.) কে একথা বলতে শুনেছি যে, "এ স্থানটির নাম হিরাহ আর তা আমাকে দেখানো হয়েছে। অচিরেই তোমরা তা দখল করবে। আর সেখানে সীমা বিতে নাফীলা আযবী সে সাদা কালো খচ্চরীতে কাল ওড়নায় ঢেকে সওয়ারী আমি বল্লাম হে আল্লাহর নবী (স.) আমি যদি সে হিরাহ নামক স্থানটিতে প্রবেশ করতে পারি এবং সীমাকে সে অবস্থায় পেয়ে যাই তাহলে সীমা কিন্তু আমার হয়ে যাবে। নবী করিম (স.) বল্লেন ঠিক আছে সে তোমারই হবে। এরপর আমরা খালিদ বি ওলীদের সহিত হিরাহ যাওয়ার ইচ্ছা করে চল্লাম। আমরা যখন হিরাতে প্রবেশ করলাম তখন সেখানে সর্ব প্রথম যার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ ঘটল সে ছিল সীমা বিতে নাফিল। আমরা তাকে সে অবস্থায়ই ফেলাম যা নবী করিম (স.) বলে ছিলেন। সে সাদা কাল খচ্চরীতে কাল ওড়না দিয়ে সওয়ার হয়ে চলে যাচ্ছে। সেখানে গিয়েই আমি তাকে ঝাপ্টে ধরলাম এবং বল্লাম নবী করিম (স.) একে আমাকে দিয়ে দিয়েছেন। একথা শুনে খালিদ বিন ওলীদ বল্লেন- তোমার এ দাবীর কি কোন প্রমান আছে? আমি দলীল পেশ করলে তিনি আমাকে দিয়ে দেন। কিছুক্ষণ পর সীমা'র ভাই আব্দুল মছীহ এসে বল্ল আমার নিকট কি আমর বোনকে বিক্রী করবে? আমি বল্লম হ্যা বিক্রী করব। সে বল্ল তুমি যত ইচ্ছা তার মূল্য নির্ধারণ কর। আমি বল্লম ১,০০০ হাজার দেরহামের কমে বিক্রী করবনা। অতঃপর সে ১০০০ হাজার দেরহাম দেরহাম দিয়ে দিল। অতঃপর সে বল্ল আজ যদি তুমি আমর কাছে এক লক্ষ দেরহাম ও চাইতে তাও দিতে আমি বাধ্য ছিলাম। আমি বল্লাম ১০০০ হাজারের বেশী দেরহাম আমি নিতেও পাবো না। তিবরানী বলেন একথার সাক্ষী (আমার জানামতে) মুহাম্মদ বিন মুসলিম এবং আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রা.) ছিলেন।

গৃহ পালিত গাধা ও ঘোড়ার মিলনে জন্ম গ্রহণকরী প্রাণীর গোস্ত খাওয়া হারাম। এ ব্যাপারে হযরত জাবের (রা.) বলেন হুনাইন যুদ্ধের দিন আমরা খচ্চর, গাধা ও ঘোড়া জবাই করেছি। নবী করিম আমাদের সবাইকে খচ্চরও গাধার গোস্ত খেতে নিষেধ করেছেন কিন্তু ঘোড়ার গোস্ত যেতে নিষেধ করেননি। হারাম হওয়ার আরেকটি কারণ- তাও হতে পারে যে, খচ্চর দুই প্রাণীর মিলনে অর্থাৎ ১টি হালাল ও অপরটি হারাম প্রাণীর মিলনের ফলে জন্ম গ্রহণ করে। এজন্য হারামকেই প্রাধান্য দেয়া হয়। কারণ খচ্চর জংগলী গাধা এবং হালাল ঘোড়ার মিলনে জন্ম গ্রহণ করে।

আরেকটি হাদীসে আবু ওয়াকিদ বর্ণনা করেছেন যে, কোন এক গোত্রের খচ্চর মার গেল। কিন্তু খাবারের জন্য এছাড়া তাদের আর কিছুই ছিলনা তারা ব্যাপারটি নিয়ে নবী করিম (স.) এর নিকট আগমন করলে তিনি বল্লেন তাদেরকে তা খেতে অনুমতি দেয়া হয়েছে।

একটি মতভেদপূর্ণ মাছয়ালা ঃ

মৃত্যুর পর যায়েদকে খচ্চরী দেয়ার ওছিয়ত করলে তাহলে সে ওছিয়ত ছহীহ কওল মত খচ্চর অন্তর্ভূক্ত হবে না। যেমন গাভীর জন্য ওছিয়ত করলে বলদ তার অন্তর্ভূক্ত হবেনা। তাছাড়া যদি খচ্চরের জন্য ওছিয়ত করে তাহলে খচ্চরই অন্তর্ভূক্ত হবে। আর بغلة র মধ্যে هاء এর বছনের জন্য আসে। যেমন زينة وثمرة এ تاء কে বচনের জন্য। বহু বচন বা স্ত্রী লিঙ্গের জন্য নয়।

উদাহরণ ও প্রবাদ বাক্যঃ

(১) قيل للبغال من ابوك قال الفرس خالى

খচ্চরকে জিজ্ঞেস করা হল যে, তোমার বাবা কে? সে জবাব দিল ঘোড়া আমার মামা। উদাহরণটি সে ব্যক্তির বেলায় বলা হয়ে থাকে যে, যে ব্যক্তি তার লেনদেনে ভূলভ্রান্তি ও ঝগড়ার অবতারনা ঘটায়। অমুক খচ্চরের চেয়েও বাঞ্ছা (২) فلان اعقر من البغل অর্থাৎ- তার বাংশধর মোটেও নাই। অমুক খচ্চরের চেয়েও বাঞ্ছা (৩) فلان اعقم من بغلة আরববাসীরা বলে থাকে (৪) هو اعيب من بغلة ابى دلامة সে ব্যক্তি আবু দালামাহ এর খচ্চরের চেয়েও বেশী দোষী।

আবু দালামার নাম যনদ বিন জোন। লোকটি অত্যন্ত কুৎসিত ছিল সে

ছিল কুফার অধিবাসি সে বনু আছাদের গোলাম ছিল। তার ব্যাপারে অনেক চিত্তাকর্ষক ঘটনাবলি রয়েছে। যেমন। আবু দালামার ছেলের অসুখ হল। তখন সে একটা নির্দিষ্ট পারিশ্রমিক এর বিনিময়ে একজন চিকিৎসক নিযুক্ত করল। আবু দালামার ছেলে যখন সুস্থ হল তখন সে বলতে লাগল- আল্লাহর কছম তোমাকে দেয়ার মত কোন জিনিষই আমার কাছে নেই। তবে তোমাকে একটি তদবীর বলে দিতে পারি। অমুক ইহুদী অগাধ ধন-সম্পদের মালিক । তুমি বিনা পরিশ্রামিকে তার রোগ মুক্তির জন্য ঐষধ প্রয়োগ কর। আমিও আমার ২ ছেলে সাক্ষী থাকব। সুতরাং সে ডাক্তার তার দাবী নিয়ে কাজী ইবনে লাইলীর কাছে গেল । ইহুদীকে এ ব্যাপারে আহবান করায় সে তা অস্বীকার করল । ইবনে আবু লাইলা বল্ল তোমার স্বপক্ষে কি কোন প্রমান বা স্বাক্ষী আছে ডাক্তার বল্ল জিহা আছে। কাজী বল্ল তাহলে তাকে উপস্থিত কর। সুতরাং আবু দালামা করিতা পাঠ করতে করতে আসল। কাজী তার কবিতা শুনতে ছিলেন।

ان الناس غطوفى تغطيت عنهم:: وان بحثواعنى ففيهم مباحث

লোকেরা আমাকে গোপন করেছে আর আমিও লুকিয়ে গেলাম। তারা যদি আমাকে প্রতিদান দেয় আমিও তাদেরকে প্রতিদান দিব।

وان نبثوا بئرى نبثت بارهم:: ليعلم قوم كيف تلك النبائث

যদি সে আমার কূপ খনন করে মাটি উত্তোলন করে তাহলে আমিও তাকে কূপ থেকে বের করে দিব। তাহলে লোকেরা জানতে পারবে নির্গত মাটি কি রূপ।

আবু দালামা ও দু'ছেলে যখন স্বাক্ষী দিল তখন কাজী বল্লেন তোমাদের দুইজনের স্বাক্ষী গ্রহণযোগ্য। আর তোমরা লোকের কথা বার্তা শুনেছ। এর পর কাজী তার পকেট থেকে ডাক্তারের পারিশ্রামিক দিয়ে দিলেন। প্রকৃত পক্ষে কাজী উভয়ের উপযোগিতা লক্ষ্য করে সৌজন্য মূলক আচরণ করেছেন

এমনি অন্য একটি ঘটনাঃ

একদা আবু দালামা কাজী আফিয়া ইবনে ইয়াজিদ এর একজন লোকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে গিয়ে এই কবিতা পাঠ করেনঃ

لقد خاصمتنى غواة الرجال:: وخاصمتهم سنة وافيه

ধোকা বাজেরা আমার সহিত ঝগড়া করেছে- সুতরাং আমিও তাদের সহিত এক বছর কাল যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে।

فمااد حض الله لى حجة :: وماخيب الله لى قافية

আল্লাহ পাক আমার কোন দলীল বাতিল করেননি আর না তিনি আমাকে কোন কবিতায় অকৃতকার্য করেছেন।

فمن كنت من جوره خائفا:: فلست اخافك يا عافية

কে সে ব্যক্তি যার বাড়াবাড়িতে আমি ভয় করব? ওহে (সুস্থাতা ও নিরাপদ) আমি তোমাকে ভয় পাইনা । একথা শুনে আফিয়া বল্ল অচিরেই আমি তোমাদের শাসকের নিকট অভিযোগ দায়ের করব । লোকটি বল্ল তুমি কেন অভিযোগ করবে? কাজী বল্লেন এর কারণ হল তুমি আমার দুর্নাম করেছ। আবু দালামা বল্ল যদি তুমি আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের কর তাহলে আমিরুল মু'মিনীন তোমাকে অপসারণ করবেন। কাজী বল্লেন অপসারণ করবেন কেন? আবু দালামা বল্ল তুমি নিন্দা ও প্রশংসার পার্থক্য বুঝনা তাই।

ইমাম আবুল ফারজ ইবনুল জওজী বললেন একদা কবি আবু দালামা খলিফা মাহদী'র দরবারে গেলেন। তিনি খলিফাকে খুব সুন্দর কাছিদা শুনালেন। আমাকে একট কুকুর দিন। একথা শুনে মাহদী ক্রোধান্বিত হয়ে গেল এবং বললেন যে, আমি ভেবেছিলাম তুমি একটি গুরুত্বপীর্ণ জিনিষ চাইবে; অথচ তুমি চাইলে কুকুর। আবু দালামা বল্লেন প্রয়োজন আমার না আপনার? মহদী বল্লেন- না প্রয়োজন তো তোমারই। আবু দালামা বল্লেন - শিকারের জন্য আমার একাটা কুকুরের প্রয়োজন। সুতরাং এরপর মাহদী তাকে একটি কুকুর দিয়ে দেয়ার জন্য আদেশ করলেন। আবু দালামা বল্লেন- আমিরুল মু'মিনীন, আমি শিকারের জন্য চলে যাচ্ছি তাহলে কি দৌড়ে শিকারকে পা লেংড়া করে দেব? এর সহিত সওয়ার ও ছিল । খলিফা তাকে একটি জানোয়ার দেয়ারও আদেশ করলেন । আবু দালাম আবার বল্লেন এই প্রাণীকে দেখা শুনা কে করবে? খলিফা একটি গোলাম দিয়ে দেয়ার ও আদেশ করলেন। আবু দালামা বল্ল আমি শিকার নিয়ে আসলে একে রান্না করবে কে ? খলিফা একটি দাসী দেয়ার আদেশ করলেন । আবু দালামা বল্লেন এ সমস্ত জিনিস সারা রাত কোথায় থাকবে ? তা শুনে খলিফা তাকে একটি ঘর দেয়ার ও আদেশ করলেন। আবু দালামা বল্লেন আমর

উপর পরিবার পরিজনের চাপ রয়েছে। এদেরকে আমি কোথেকে বরন-পোষণ করব?

খলিফা বললেন তাহলে তোমার জন্য এক হাজার বিঘা আবাদী বা অনাবাদি জমি দিয়ে দেয়ার ফায়সালা করব।

খলিফা মাহদীর ২য় শব্দটি ছিল "غافر"কেননা আবু দালামাকে জিজ্ঞেস করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল যে غـــامـــر(আবাদ) তো আমি জানি কিন্তু এই غـــامـــر কি বল্লেন? খলিফা বল্লেন-"অনাবাদী" আবু দালামা হেসে হেসে বল্লেন আমি আপনাকে এক লাখ অনাবাদী ধূধূ মরু ভূমি দিয়ে দেব। এর বিনিময়ে আপনি আমাকে শুধু এক বিঘা কৃষি উপযোগী জমি দিন। আমিরুল মু'মিনীন বল্লেন আমি তা কোথেকে দেব? আবু দালামা বল্লেন বায়তুল মাল থেকে দিন- খলিফা চমকে উঠে বল্লেন তার কাছ থেকে (আমার দেয়া) সব মালামাল ফেরত নিয়ে নাও এবং কৃষি উপযোগী এক বিঘা জমি তাকে দিয়ে দাও। আবু দালামা বল্লেন আপটি দান করে ফেরত নিয়ে নিলে তো সেগুলো অনাবাদী হয়ে যাবে।

একথা শুনে মাহদী হেসে দলিন এবং মাল গুলো দিয়ে তাকে খুশী করলেন। ইমাম আবুল ফারজ জাওজী মুহাম্মদ বিন ইছহাক আল সিরাজ এর বরাতে একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন যে, দাউদ বিন রশীদ বর্ণনা করেন যে, একদা আমি হাশিম বিন আদীকে বল্লাম যে, আপনি বলুন তো-খলিফা মাহদী ছায়ীদ ইবনে আব্দুর রহমানকে কেন কাজী নিযুক্ত করলেন? এবং এত গুরুত্বপূর্ণ কর্মকান্ড তার উপর ন্যাস্ত করলেন? হাশিম বিন আদী জবাব দিলেন তার গল্প অত্যন্ত মর্ম স্পর্শী। তুমি যদি এই মর্ম স্পর্শী গল্প শুনতে চাও তাহলে আমি তোমাকে বিস্তারিত ভাবে বলব। দাউদ বিন রশীদ বল্লেন- অবশ্যই আমি মনোযোগ সহকারে তা শুনব। হাশিম বল্লেন ঠিক আছে- মনোযোগ সহকারে শুন।

মাহদীরক যখন খলিফ নিযুক্ত করা হয় তখন হঠাৎ করে ছায়ীদ বিন আব্দুর রহমান রবি দারুয়ানের কাছে এসে বল্ল যে আমি আমিরুল মু'মিনীন এর সহিত সাক্ষাত করতে চাই । দয়া করে আপনি অনুমতির ব্যবস্থা করুন । রবি বল্লেন আপনি কে ? কেন এসেছেন? ছায়ীদ বল্লেন আমি খলিফা মাহদীর ব্যাপারে একটি অতি সন্দর স্বপ্ন দেখেটি । তা বর্ণনা করাই আমার ইচ্ছা । রবি

বল্ল- আহ! ছায়ীদ। মানুষে যে স্বপ্ন দেখে তা নিজের জন্যই সত্য হয়না । অথচ অন্যের দেখা স্বপ্ন কিভাবে মেনে নিবেন। এছাড়া তুমি অন্য কোন চিন্তা কর । যা এরচেয়ে বেশী প্রভাব যুক্ত হবে । ছায়ীদ দারুয়ানকে বল্লেন তুমি যদি আমার সংবাদ খলিফার নিকট না পৌছাও তাহলে আমি অন্য কারো সাহায্য নেব এবং তাকে আমি তাও বলব যে তার কাছে অনুমতি চেয়েছিলাম কিন্তু সে অনুমতি দিলনা। এতটুকু আলোচনার পর দারুয়ান রবি খলিফার নিকট গেল এবং আরজ করল যে, আপনি তো ভাল লোক গুলোকে লোভের মধ্যে নিপতিত রেখেছেন। এজন্য মানুষ বারবার বিভিন্ন পন্থা অন্বেষণ করে। খলিফা মাহদী জবাব দিলেন- বাদশাহদের কাজইতো এরকম হয়ে থাকে।

পাহারাদার বলল, জনাব দেখুন তো এক আগন্তুক দরজায় দাড়িয়ে বলছে যে, আমি আমিরুল মুমিনীন মাহদী এর ব্যাপারে একটি উত্তম স্বপ্ন দেখেটি -তার একানাত ইচ্ছা হল সরাসরি আপনার সহিত এ ব্যাপারে আলোচান করবে। মাহদী বলেন- রবি তোমার ধ্বংস হউক। আমি স্বপ্ন দেখি তা সত্য হয়না অথচ স্বপ্ন দ্রষ্টা দাবী করছে যে সে আমার জন্য কোন স্বপ্ন তৈরী করেছে। প্রহরী রবি মনে মনে ভাবল তার দেখা স্বপ্ন বাদশার দরবারে গ্রহণযোগ্য হবেনা । এমন সময় মাহদী বল্লেন ঠিক আছে লোকটাকে আসতে বল। সুতরাং প্রহরী সায়ীদ ইবনে আব্দুল রহমানকে ডেকে দরবারে হাজির করল। ছায়ীদ বিন আব্দুল রহমান ছিলেন অত্যন্ত সুন্দর সুদর্শন, সাহসী, ধনী এবং লম্বা দাড়ী বিশিষ্ট এবং খোল মনের অধিকারী। মাহদী বল্লেন ছায়ীদ বল কি স্বপ্ন দেখেছ। আল্লাহ তোমাকে বরকত দিন। ছায়ীদ জবাব দিলেন যে, স্বপ্নে দেখলাম একজন লোক এসে বলতেছে তুমি আমিরুল মু'মিনীনের কাছে বল যে, সে ৩০ বছর রাজত্ব করবে। আমার এই স্বপ্নের সত্যতা প্রমানের জন্য সে স্বপ্নই যতেষ্ট যা আপনি এ রাতেই দেখবেন। আপনি একটি ইয়াকুত পাথরকে দুটি ইয়াকুত পাথর দ্বারা বদলাবেন যা থেকে ৩০ টি ইয়াকুত জন্মাবে। আর সেগুলো আপনাকে দেয়া হবে। একথা শুনে মাহদী বললেন- ছায়ীদ তুমি উত্তম স্বপ্ন দেখেছ। আগত রাতে যদি আমি আগত রাতে এই স্বপ্ন দেখি তাহলে তুমি সত্যবাদী না মিথ্যা বাদী প্রমানীত হয়ে যাবে। তোমার কথামত যদি ঘটন দেখেই ফেলি- তাহলে তোমার ইচ্ছামত পুরস্কার দেয়া হবে। আর যদি আমার ঘোষণা মতে স্বপ্ন না দেখি তাহলে কিন্তু কঠোর শাস্তি তেব। কারণ স্বপ্নের ব্যাপারটা মূলত পৃথক কখনো ঘটনা দেখা

যায় আবার কখনো স্বপন স্বল্প পরিসরে দেখানো হয়।

ছায়ীদ বললেন, হে আমিরুল মু'মিনীন আমি তখন পর্যন্ত কি করব, যখন আমি আমার পরিবার, পরিজনের কাছে ফিরে যাব এবং তাদেরকে একথা বলব যে, আমি আমিরুল মুমিনীনের কাছে গিয়েছিলাম আর সেখান থেকে শূন্য হাতে ফিরে এলাম। মাহদী বললেন বল আমি কি করতে পারি? ছায়ীদ বললেন- আমি যা বলি তা সত্তর দিয়ে দিন। আমি সত্য স্বপ্ন দেখার ব্যাপার কছম করে বলছি যে, যদি স্বপ্ন সত্যি না হয় তাহলে আমার স্ত্রী তালাক। একথা শুনে মাহদী সায়ীদের জন্য ১০,০০০ হাজার দেরহাম দেয়ার আদেশ করেন। তিনি তাও বল্লেন যে , পুরস্কার দেয়ার সময় তার কাছ থেকে জামানত নিয়ে নিবে।

একথা শুনে ছাদ্বীদের চক্ষু মাহদীর দিকে উঠে এলো। ছায়ীদ দেখতে পেল খলিফা মাহদীর পাশে একজন খুব ছোরত ভৃত্যই আমার পক্ষ থেকে সে জামানত থাকবে। মাহদী বল্লেন তুমি কি তার পক্ষ থেকে জামানত থাকবে? একথা শুনে ভুত্যটির চেহারা লাল হয়ে গেল এবং লজ্জিত হয়ে গেল। অতঃপর ভৃত্যটি বল্ল হ্যাঁ ছায়ীদের জামানত আমি নিজে রইলাম। এ মহুর্তে ছায়ীদ মাল মাত্তা নিয়ে তার বাড়ীর দিকে রওনা হলেন। রাতে খলিফা অনুরূপ স্বপ্নই দেখলেন যা ছায়ীদ তাকে সংবাদ দিয়ে ছিলেন। সকাল বেলা ছায়ীদ খলিফঅর দরজায় হাজির হয়ে ভিতর প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করল। অতঃপর তাকে ভিতর প্রবেশের অনুমতি দেয়া হল। মাহদী ছায়ীদকে দেখে বল্লেন ছায়ীদ স্বপ্ন দেখার ব্যাপারে তুমি যা বলেছিলে তা সর্বই সত্যে পরিণত হয়েছে। ছায়ীদ বল্লেন- আমিরুল মু'মিনীন আপনি কি স্বপ্ন দেখেন নাই? এদিকে ছায়ীদ জবাব দিবার জন্যে তোতলাতে আরম্ভ করলেন। ছায়ীদ বল্লেন যদি আপনি স্বপ্ন না দেখে থাকেন তাহলে আমার বিবি তালাক। মাহদী বল্লেন তোমার অমঙ গল হোক। তোমার স্ত্রীকে তালাক দেয়ার জন্য কে তোমাকে বাধ্য করল? ছায়ীদ বল্লেন আমি আমার সত্যবাদীতার উর কছম খাচ্ছি। মাহদী বল্লেন আল্লাহর শপথ তুমি যেভাবে বলেছিলে হুবহু তাই দেখেছি। একথা শুনে ছায়ীদ আল্লাহু আকবার তকবীর দিলেন। ছায়ীদ বল্লেন- আমিরুল মুমিনীন আপনি যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা সত্বর পুরা করুন। খলিফা বল্লেন অতি সম্মানের সহিত তা পুরা করা হবে। এর পর মাহদী তিন হাজার ৩০০০ আশরাফী দশটি কাপড় দানী এবং তিনি এক জাতীয় সওয়ারী পুরস্কার প্রদান করলেন অথচ কোন কোন

ঐতিহাসিক তিনটি সাদা ও কালো কচ্ছরের উল্লেখ করেছেন। অতঃপর ছায়ীদ এ সমস্ত উপঢৌকন সহ প্রত্যাবর্তন করতে যাবেন এ মুহূর্তে ছায়ীদের কাছে সেই আসল যে তার জামানত হিসেবে থেকে ছিল। ভৃত্যটি বল্ল আমি তোমাকে সে সত্তার কদম দিয়ে জিজ্ঞেস করি যিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই।

যে স্বপ্নের কথা তুমি বল্লে তার কোন যথার্থতা আছে কি? ছায়ীদ বল্লেন- আল্লাহর কছম এর কোন যথার্থতা নেই । ভৃত্য বল্ল তা কি করে হয়। যেমনি আপনি আমিরুল মুমিনীনকে বলেছিলেন তেমনি তা তিনি দেখেছেন? ছায়ীদ বল্লেন- এ ধরনের কথাবার্তা বুযুর্গ লোকের অলৌক ঘটনা । এর কোন দৃষ্টান্ত মিলেনা। আমি যখন খলিফার নিকট স্বপ্নর ব্যাপারে আলোচনা করি তখন তিনি অত্যন্ত চিন্তিত ছিলেন। একথা তার আশ্চর্য মনে হয়েছিল শেষ পর্যন্ত এই কথাই তার অন্তরে চিরন্তন হয়ে যায়। এর পর থেকেই তিনি চিন্তাযুক্ত হয়ে পড়েন এ অবস্থায় তিনি শুয়ে পড়েন। সুতরাং যে কথা তাঁর স্মৃতিতে ছিল তাই তিনি স্বপ্নাকারে দেখেছেন। একথা শুনে ভৃত্যটি বল্ল আপনি যে তালাকের শপথ করেছেন এর কি হবে? ছায়ীদ বল্লেন- আমি শুধু এক তালাকের নিয়ত করেছিলাম, এখন বাকী দুই তালাক দেয়অ আমার ইচ্ছাধীন। এর পরিবর্তে আমি মহরে ১০ দেরহাম বেশী দেব। এর শাস্তি স্বরূপ আমি ১০-০০০ হাজার দেরহাম, তিন হাজার আশরাফী, ১০ প্রকার কাপড়ের হেংগার এবং তিনটি সওয়ারী অর্জিত হয়েছে। একথা শুনে ভৃত্যটি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ল।

ছায়ীদ বললেন, আল্লাহর কসম- আমি তোমার কাছে সত্র সত্য বলেছি। আর তুমি যে আমার জামানত নিয়েছিলে এর বদলা স্বরূপ আমি অতি সত্য কথাটি বলেছি। এখন তুমি এগুলো অতি সংগোপনে রাখবে । সুতরাং ভৃত্যটি তাই করল। হাশিম বলেন, খলিফা যখনই তার সঙ্গীদের আহবান করতেন তখন ছায়ীদ ও তার সঙ্গীদের অন্তর্ভূক্ত হতেন । ছায়ীদ রাষ্ট্রীয় যাবতীয় সুযোগ সুবিধা ভোগ করতেন। শেষ পর্যন্ত মাহদী তার সেনাবাহিনীর সৈন্যাধ্যক্ষ ছায়ীদকে নিযুক্ত করেন । সুতরাং মাহদীর ইন্তেকাল পর্যন্ত সেনাপতির পদেই বহাল ছিলেন।

আবুল ফরজ ইবনে জাওযী বলেন, আমি এ ঘটনাটি এভাবেই শুনেছি। কিন্তু এ ব্যাপারে আমার সন্দেহ রয়েছে এবং কাজীদের পক্ষ থেকে এ ধরনের

কথা প্রকাশ পাওয়া উচিত নয়।

সাঈদ বিন আব্দুর রহমান সম্পর্কে উলামায়ে কেরামের অভিমত ঃ

ইমাম দামিরী (রহ.) বলেন, সাঈদ বিন আব্দুর রহমান এর এই ঘটনার ব্যাপারে ইমাম আহমদ (রহ.) এর নিকট জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, এতে কোন দোষ নেই। ইয়াহইয়া ইবনে মুঈন বলেন- এতে কোন দোষ নেই। ইয়াহইয়া ইবনে মুঈন বলেন সাঈদ বিন আব্দু রহমান একজন ছেকাহ (বিশ্বস্ত) ব্যক্তি ছিলেন। উক্ত ঘটনার দায় দায়িত্ব হাশিম বিন আদ্দির জিম্মায় থাকবে। এ রপর ইয়াহইয়া বলেন হাশিম সত্যিকার লোক ছিলনা- সে মিথ্যা কথা বলত। আলী বিন আদি বলেন, আমি এ ধরনের কোন কথা পছন্দ করি না। আবু দাউদ আজলী বলেন, হাশিম মিথ্যা বাদী ছিল। ইব্রাহীম বিন ইয়াকুব জুরজানী বলেন হাশিম ছিল কুপ্রকৃতির, তা প্রকাশ পেয়েছিল। আবু জাররাহ বলেন হাশিমের কোন মান সম্মান ছিলনা।

জনৈক ডাকাত পাদরীর ঘটনাঃ

ঐতিহাসিকগণ বলেছেন, একদা একজন সৈন্য সিরিয়া এলাকার বস্তী দিয়ে যাচ্ছিল। সে কয়েক ক্রোশ রাস্তা অতিক্রম করে থেমে গেল। তার কাছে একটি খচ্ছর ছিল । এর পিঠে ভ্রমনের যাবতীয় মাল ছামানা ছিল। সন্ধা ঘনিয়ে এল । সৈনিক লোকটি একটি গীর্জা দেখতে পেল। গীর্জাতে ছিল এক পাদ্রী। পাদ্রী তাকে দেখে স্বাগত জানাল এবং সেখানে রাতে থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানাল। সুতরাং পাদ্রী তাকে আপ্যায়নের জন্য খানার আয়োজন করতে লাগল। সুতরাং সৈনিকটি সেখানে থাকার সিদ্ধান্ত নিল । সে সৈনিক বলল, আমি যখন গীর্জা ঘরে প্রবেশ করি তখন পাদ্রী ছাড়া আর কোন লোক দেখিনাই। পাদ্রী আমার খচ্চরটি অন্য একস্থানে নিয়ে বেধে এল এবং তার ঘাস পানি দিল। আমার সঙ্গে থাকা সমস্ত মালামাল গীর্জার এক কামরায় রেখে দিল। তখন শীত ছিল বেশী। তাই বরফ ও পড়ছিল । তাই সে আগুন জালিয়ে আমার জন্য গরম পানির ব্যবস্থা করল। কিছুক্ষণ পর খানা এলে আমি পেট পুরে খানা খেলাম। রাতের এক প্রহর চলে যাবার পর ঘুমোনোর পূর্বে আমি তাকে বল্লাম- প্রাকৃতিক প্রয়োজন পুরনের ব্যবস্থা কোথায়? পাদ্রী বল্ল তা উরের তলায়। সে আমাকে এর রাস্তা দেখিয়ে দিল। আমি প্রাকৃতিক প্রয়োজন পুরন করে যখন বাইরে পা

রাখলাম সেখানে একটি পাথরের সিড়ির মত দেখতে পেলাম। পাথরের উপর পা রাখা মাত্রই সিড়িটি আমাকে নিয়ে একদম গীর্জার বাইরে চলে এলো। কমবখ্ত পাদ্রী সিড়িটিকে ছাদের সঙ্গে এমনভাবে ফিট করেছিল যে এতে সামান্য ঝাকুনী লাগামাত্রই মানুষটি পড়ে যেত। আমি পড়তে পড়তে চিল্লাতে লাগলাম কিন্তু পাদ্রী কোন জবাব দিলনা । ভাগ্য ভাল শক্ত আঘাত পেলাম কিন্তু কোন হাড় ভাঙ্গলনা। বরফ গলা প্রচন্ড শীতে আমি থর থর করে কাপছিলাম। বরফ থেকে বাচার জন্য আমি গীর্জার সামনে এস দাড়ালাম। এ মুহুর্তে উপর থেকে প্রকান্ড একটি পাথর এসি নীচে পড়ল । পাথরটি আমার উপর পড়লে আমাকে পিষে দিত। সেহ্থান থেকে আমি বের হয়ে ভেগে গেলাম। পাদ্রী আমাকে গালি দিতে লাগল এত আমি বুঝতে পারলাম কোজ কমবখ্ত পাদ্রীর শয়তানী। সে আমার মালামাল লুন্ঠন এবং আমাকে হত্যা করার জন্যই করেছে। সেখান থেকে আমি চলে এলাম। তখনও আকাশ থেকে বরফ পড়ছিল । আমার সমস্ত কাপড় ভিজে গেল । ভাবতে লাগলাম প্রাণ বাঁচানোর কোন একটা উপায় বের করতে হবে। অন্য থায় সকাল পর্যন্ত এভাবে থাকলে মরে যাব। হঠাৎ করে আমার তাথায় এক বুদ্ধির উদয় হল। আমি কিছু পাথর আমার কাধে উঠিয়ে নিয়ে মাঠের এদিক থেকে সেদিক-সেদিক থেকে ওদিক- এরকম দৌড়া -দৌড়ি করতে লাগলাম। এতে করে আমার শরীর গরম থাকল । কিছুক্ষন এরকম খরার পর পাথরগুলো ফেলে দিয়ে ক্ষানিক জিরিয়ে নিয়ে আবার এরকম করতে লাগলাম। উদ্দেশ্য হল আমি সকাল পর্যন্ত তাই করব। বেলা উঠার পর আমি গীর্জার দরজা খোলার শব্দ পেরাম । আমি একটি সামনে অগ্রসর হয়ে দেখতে পেলাম যে পাদ্রী সেখানে আমাকে খোজাখুঁজি করছে, যেখান থেকে রাতে আমি নীচে পড়ে গিয়েছিলাম। আমাকে সেখানে না পেয়ে সে বিরবির করে বলতে লাগল কি আশ্চর্য, লোকটি গেল কোথায়? আমি পাদ্রীর সব কথাই শুনতে পেলাম। এ সময় সে আমার আগে চলে গেল। আমি তখন তার পেছন দিয়ে আস্তে করে গীর্জার দরজায় পৌছে গেলাম এবং দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে গেলাম। পাদ্রী আমাকে না পেয়ে গীর্জার দরজা বন্ধ করতে লাগল। তখন আমি চুপ করে দাড়িয়ে রইলাম যে লোকটি আমাকে হত্যা করার মারাত্মক ষড়যন্ত্র করেছিল এবং আমার প্রতি দয়াও করেছিল । আমি এক ছোঁরা বের করে, তার বুকে আমুল বসিয়ে দিয়ে তাকে খতম করে শান্তির ঢেকুর গিল্লাম। অতঃপর আমি গীর্জার দরজা বন্ধ করে উপরে উঠলাম। সেখানে

আগুন থাকায় লাকড়ি দিয়ে তা জ্বালিয়ে শরীরটা সেক দিয়ে গরম করে নিলাম। এর পর আমার শরীরে সব কাপড় খুলে গাঠুরী থেকে নতুন কাপড় বের করে পরিধান করলাম। আমি পাদ্রীর চাদর গায়ে দিয়ে শুয়ে পড়লাম । রাত জাগার কারণে আছর পর্যন্ত ঘুমায়লাম। ঘুম থেকে জাগতেই আমি খুব ক্ষিধে অনুভব করলাম। আমি গীর্জার চার পাশে ঘুরাফেরা করলাম। বাবুর্চি খানায় গিয়ে দেখলাম খুব ভাল ভাল খাবার রয়েছে আমি খুব পেট পুরে খেলাম। মনে হল যেন প্রাণের মধ্যে নতুন প্রাণ এসেছে। সেখানেই গীর্জার অন্য কক্ষের চাবি পেয়ে গেলাম।

এমতাবস্থায় আমি তখন খুব ধীরে ধীরে একটা একটা করে কক্ষ খুলতে লাগলাম। কক্ষগুলোতে রকম-বেরকম মালামাল দেখতে পেলাম। মূল্যবান জিনিষের মধ্যে স্বর্ণ-রৌপ্য, পর্যটকদের নানা ধরনে হাতিয়ার। এগুলো দেখে আমি বুঝতে পারলাম এই পাদ্রী এক প্রকার ডাকাত ছিল। যেকোন মুছাফিরকে এখানে একা পেয়ে তাদের সাথে সে আচরণই করেছিল যা আমার সাথে করেছে। আগন্তুকরা তার ধোকায় পড়ে প্রাণ বিসর্জন সহ সর্বস্ব হারিয়ে গেছেন। আর ডাকাত পাদ্রী তাদের সর্বস্ব লুন্ঠন করেছে। আমি ভাবতে লাগলাম এত বড় বড় ধন-ভান্ডার এখানে থেকে কি করে সারানো যায়? তার সম্পর্কে কারো যেন কোনো প্রকার সন্দেহ নায়। এ মুহূর্তে আমার মাথায় এক আশ্চর্য ধরনের বুদ্ধি এসে গেল। আর তাহল ভোর হতেই আমি পাদ্রীর পোষাক পড়ে নিলাম এবং গীর্জার উরে উঠে ছাদে পায়দারী করতে লাগলাম। নিচ দিয়ে অতিক্রমকারীরা দূর থেকে বুঝত যে তিনি পাদ্রী। কিন্তু আগমনকারীরা যখন গীর্জঅর কাছাকাছি চলে আসত তখন আমি বসে বসে অন্য দিকে চলে যেতাম।

এমনিভাবে সেখানেই বেশ কয়েক দিন কাটালাম। কিন্তু কেউ আমার ব্যাপারে খোজ খবর নিল না। আমি দুটি বস্তা বের করে এর ভেতর মূল্যবান জিনিষ পত্র ভরে নিলাম। তারপর পাদ্রীর পোষাক পরিবর্তন করে আমার নিজের পোষাক পড়ে নিলাম। অতঃপর মালগুলো আমার খচ্চরের পিঠে উঠিয়ে দিয়ে পাশের এক পল্লীতে এস হাজর হলাম। সেখানে একটি বাড়ী ভাড়া করে রয়ে গেলাম। যেখান থেকে গীর্জার অবশিষ্ট মালামাল খচ্চরের পিঠে করে বিভিন্ন স্থানে পাঠাতে লাগলাম। গীর্জায় মালামাল ছিল প্রচুর। তাই সময় ও সুযোগমত এ সমস্ত মালামালের ধরন ও ওজন পরিবর্তন করতাম। মালগুলো ছিল অত্যন্ত

শূল্যবান । সুতরাং ভারী মালগুলো ফেলে দিয়ে হালাল ও মূল্যবান মালগুলো সংগ্রহ করতাম। মালগুলো নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি এরকমই করতে লাগলাম। অনেক গাধা ও শ্রমিক নিয়োগ করলমা কিছু দিন পর আমি সমস্ত মালামাল সহ এক কাফেলার সহিত বাড়ীতে পৌছে গেলাম ।

হাফেজ ইবনে শাকির ঘটনাটি আবু মুহাম্মদ বাত্তাল এর উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন কিন্তু এতে সামান্য সংশোধন পরিলক্ষিত হয়।

চিকিৎসাক্ষেত্রে খচ্চরের উপকারিতাঃ

খচ্চরের কলিজা শুকিয়ে পানিতে ভিজিয়ে কোন মেয়ে লোককে সে পানি পান করালে কোন দিনও সে গর্ভবর্তী হবে না। অনুরূপ খচ্চরের কানের ময়লা যদি কোন মহিলার লজ্জাস্থানে রেখে দেয়াহয় তাহলে সে গর্ভবতী হবেনা। যদি তার কান খৈল তার চামড়ায় রেখে পরিধান করে তাহলে পরিধান কালীন সময়ে সে আর গর্ভবতী হবেনা। কোন ঠাকওয়ালা ব্যক্তি যদি খচ্চরের খুড়ের ছাই পিষে তার সহিত তৈল টাকে মালিশ করে তাহলে টাক ভাল হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে শরীরের যে কোন স্থানে চুল না উঠলে তা নিয়ম মত ব্যবহার করলে ভাল হবে। কাল খচ্চরের খুব ও রক্ত দরজার চৌখাটে অথবা সিড়ির নীচে পুতে রাখলে সে ঘরে ইদুর ইত্যাদি প্রবেশ করবে না । এমনিভাবে খচ্চরের খুড় দ্বারা ধরে ধোপ দিলে সে ধরে ইদুর পোকা মাকড় ইত্যাদি ঘর থেকে পালাবে। খচ্চরের যৌনাঙ্গ তুকমার সিত কুটে যাইতুনের তৈলে মিশ্রিত করে চুলে মালিশ করলে চুল কাল হয়ে যাবে এবংচুল বড় হবে।

খচ্চরের মাংশ প্রন্থি রোগে এর চর্বি গেটে বাঁত এবং ইরকুন্নিছা রোগের বেশ উপকার হয়। ইবনে যুহাইর সক্রেটিস এর উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন যদি কেহ কারো প্রতি প্রেমাশক্ত হয়ে পড়ে এবং সে চায় যে, তার সহিত প্রেম বন্ধন ছিন্ন হয়ে পড়ুক তাহলে সে ব্যক্তি খচ্চরের শোবার স্থানে সে শয়ন করলে প্রেম বন্ধন ছুটে যাবে। কারো সর্দি হলে খচ্চরের গোবর শুকার পর থুথু দিয়ে ফেলে বা এর গোবরের উর দিয়ে চলে গেলেও তার সর্দ্দ চলে যাবে। যদি কেহ খচ্চরের কান খৈলে খেজুরের পানি মিশ্রিত করে শাক টানে তার নেশাহবে।

হারমাছ লিখেছেন কোন গর্ভবতী মহিল যদি খচ্চরের কান খৈল রোপার পাত্রে রেখে পরিধান করে তাহলে যত দিন সে পরিধান করতে থাকবে ততদিন

সে হহিলা সন্তান হবেনা । কোন মহিলা যদি খচ্চরের ৩০ দিরহাম পরিমান পেশাব পান করে তাহলে সে কোন দিনই গর্ভবতী হবেনা । কোন মহিলা যদি খচ্চরের সামান্য পরিমান মগজ পান করে তাহলে তার সন্তান পাগল হবে। ইবনে বখতিশো লিখেছেন যে, কোন মহিলা যদি খচ্চরের ঘাম তুলায় ভিজিয়ে লজ্জাস্থানে রাখে তাহলে সে মহিলা গর্ভবতী হবেনা।

খচ্চরের স্বপ্নের ব্যাখ্যা:

স্বপ্নে খচ্চরের উপর সওয়ার হওয়া ভ্রমনের আলামত এবং দীর্ঘায়ু লাভের লক্ষন। এমন কোন ব্যক্তি খচ্চর দেখল যে, সে ভ্রমনের ইচ্ছাই করেনি তাহলে এর তাবীর হবে যে, সে কঠোর প্রকৃতির লোকের উপর বিজয়ী হবে। স্বপ্নে খচ্চর দেখা সম্মানের লক্ষণ। কেউ কেউ লিখেছেন যে, মহিলা যদি স্বপ্নে খচ্চর দেখে তাহলে তার বন্ধা হওয়ার লক্ষন। কাল রঙ্গের খচ্চর দেখল ধন-দৌলত পাওয়ার এবং সাদা রঙ্গের খচ্চর দেখা সম্মান পাওয়ার লক্ষন। স্বপ্নে কেহ দেখল যে, সে তার খচ্চর থেকে পড়ে গিয়ে একদম পৃথক হয়ে গিয়েছে- তাহলে এর ব্যাখ্যা হবে যে, তার মান সম্মান ও পৃথক হয়ে যাবে । অথবা তার স্ত্রী থেকে পৃথক হয়ে যাবে। কেননা স্ত্রী এক প্রকার সওয়ারী অথবা স্বপ্ন ভ্রমন অনেক দীর্ঘ হবে। খচ্চরের গোস্ত ও চামড়া দেখলে ধন সম্পদ পাওয়ার আলামত।

البغيبغ

(৭৯) হরিণ

এর বিস্তারিত আলোচনা الظاء অধ্যায়ে করা হবে।

البقر الاهلى

(৮০) গৃহ পালিত গাভী

البقر বলদ, গাভী ইত্যাদিকে বলা হয়।এটি اسم جنس তাই এর প্রয়োগ পুরুষ স্ত্রী উভয়ের বেলায় প্রযোজ্য। بقرة এর ها এর একবচনের জন্য বহু বচনের জন্য নয়। এর বহু বচন بقرات যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী سبع بقرات سمان (অর্থাৎ সাতটি মোটা তাজা গাভী) (সুরা ইউসুফ) নাহুবিদ মাবরাদ বলেন, ভাল মন্দের বিচারে এভাবে ব্যবহার করা যায় যে, هذا بقرة পুরুষের জন্য এবং هذه بقرة স্ত্রীর জন্য যেমন পুরুষের জন্য বলা হয়ে থাকে هذا بطة এবং স্ত্রীর জন্য هذه بطة। কোন কোন জ্ঞানীগন বলেন-

ইয়ামন বাসীরা গাভীকে তার بـقـرة নাবলে بـــاقوره বলে। যেমন নবী করিম (স.) ছদকার জন্র তাদের কাছে পত্র পাঠিয়ে ছিলেন-

فى كل ثلاثين باقورة بقرة

"প্রতি ৩০ গাভীর জন্য ১টি গাভী অথবা বলদ ওয়াজিব।"

بقرة শব্দটি بـقراً- باب فتح হয় بقر থেকে এসেছে। যার অর্থ ফেঁটে ফেলা, খোলা। জমিতে কৃষকের কাজ করা, বলদ দ্বারা যেহেতু জমি চাষ করা হয় এজন্য একে بـــقـــر বলা হয়ে থাকে।আর এজন্য মুহাম্মদ বিন আলী যায়নুল আবেদীন হোসাইন (রা.) কে الباقر বলা হত। কোননা তিনি ইলমকে খুলে এর অভ্যন্তরে পৌছে ছিলেন। তাঁর ব্যাপারে হাদীসে রয়েছে যে, নবী করিম (স.) ফিতনার আলোচনা করার পর বলেন- যে ফেতনা "وجـوه البقر" অর্থাৎ গাভী বলদের চেহারার মত একে অন্যের সহিত মিলবে। যেমন (১) কিছু লোক এমন হবে তাদের হাতে গাভীর লেজের মত চাবুক হবে। সে উহা দ্বারা লোকদিগকে মার পিট করবে।

☆ আমি নবী করিম (স.) এর নিকট শুনেছি তিনি বলেছেন, হে আবু হোরায়রা যদি তুমি দর্ঘায়ু পাও তাহলে অচিরেই এমন কিছু লোক দেখবে যে সে আল্লাহর অসন্তুষ্টি সহ সকাল করবে (সারা রাত পাপ করবে) এবং তার (আল্লাহর) অভিশম্পাৎ নিয়ে সন্ধ্যা করবে (সমস্ত দিন পাপে লিপ্ত থাকবে) এদের হাতে গাভীর লেজের মত কোন বস্তু থাকবে।

☆ এমতাবস্থায় কোন লোক একটি গাভী হাকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল । কি আশ্চর্য গাভিটি কথা বলছিল। লোকেরা আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলাবলি করতে লাগল ছুবহানাল্লাহ। গবভীও কথা বলছে? তখন নবী করিম (স.) বল্লেন, আল্লাহর কুদরতের উপর ইমান সে এনেছে। যার উপর আমি নিজে আবু বকর ও ওমর যেভাবে ইমান এনেছে।

হাদীছ শরীফেও এধরনের শব্দ রয়েছে। যেমনঃ

(١) رجال بايديهم سياط كاذناب البقر يضريون بها الناس

হযরত আবু হোরাইরা (রা.) বলেন-

(٢) سمتع النبى صلى الله عل يه وسلم يقول ان طالت بلا

حيلة يوشك ان ترى قوما يغدون فى سخط الله وير وحون فى لعنته فى ايديهم مثل اذناب البقر۔(رواه ال حاكم)

একটি হাদীছে ও ধরনের শব্দ রয়েছে যেমন-

(৩) بينما رجل يسوق بقرة اذ تكلمت فقالوا سبحان الله بقرة تتكلم قال أمنت بذالك انا وابوبكرؓ وعمرؓ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে অমর (রা.) বলেন-

ان النبى صلى الله عليه ولم قال ان الله يبغض البليغ من الرجال الذى يتخل بلسانه كما تخلل البقرة.

☆ আল্লাহ পাক এমন ব্যক্তির উপর অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হন যে ব্যক্তি গাভীর মত জিহ্বাকে আঁকাবাকা করে কথা বলে।

☆ নবী করিম (স.) এরশাদ ফরমান যখন তোমরা চক্ষুস্মানদের কাছে বাইয়াত গ্রহণ কর, তখন গাভীর লেজকে খুটি বানাবে আর যমিকে কার্যস্থান বানাবে। জেহাদ করা ছেড়ে দিবে। তখনই আল্লাহ পাক তোমাদের উপর এমন অথ্যাচারী এবং অপদস্তকারীকে বিজয়ী করবেন যে তোমাদের ইমানকে একদম শেষ করে দিবে। শেষ পর্যন্ত তোমরা নিজ ধর্মে ফিরে যাবে।

হযরত আব্দুল ইবনে ওমর (রা.) বলেন-

ان النبى صلى الله عليه وسلم قال اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقره ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لاينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم .(رواه ابوداؤد)

নেহায়াতুল গরীব নামক কিতাবে লিখা হয়েছে- হাদীস শরীফে আছে- مادخلت السكة دار قوم الاذلوا যা দ্বারা মাটিকে কর্ষণ করা হয়।

মূলত হাদীছের মূল উদ্দেশ্য তাই বুঝা যায় যে, মুসলমানগণ কৃষি কাজে লিপ্ত হয়ে পড়বে বেং জিহাদ করা ছেড়ে দেবে। তাই কৃষি কাজের দারুন হাকিম তাদের উপর করারোপ করবেন। উক্ত হাদিসের পাশাপাশি নবী করিম (স.) তাও বলেছেন।

العز فى نواصى الخيل والذى فى اذناب البقر

"ঘোড়ার কপালে থাকে মান সম্মান আর গাভীর লেজে থাকে অসম্মান।'

গাভীর বৈশিষ্টাবলী ঃ

গাভী খুবই শক্তিশালী প্রাণী, এর অনেক উপকারিত আছে। আল্লাহ্ পাক মানুষের জন্য একে আনুগত্যশীল করে সৃষ্টি করেছেন। হিংস্রপ্রাণীর মত এদেরকে আক্রমণ করার হাতিয়ার দেয়া হয়নি। কারণ এরা মানুষের আনুগতশীল। সতরাং মানুষ এদেরকে শত্রু থেকে রক্ষা করে । তাদের ক্ষতি হওয়া থেকে মানুষই এদেরকে রক্ষ করে। যদি এদের মধ্যে কোন হাতিয়ার দেয়া হত তাহলে এরা মানুষের অনুগত্য থাকতনা। এবং এদেরকে আয়ত্ব করা মানুষের পক্ষে দুসাধ্য মানুষের অনুগত্য থাকতনা। এবং এদেরকে আয়ত্ব করা মানুষের পক্ষে দুসাধ্য হয়ে যেত। গাভীর শিং থাকে মাথায় সুতরাং মাথাকে শিং এর বদলে ব্যবহার করে। গাভী বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে। এদের মধ্যে এক প্রকার গাভীকে জামুছ (মহিষ) বলা হয় । কারণ এর অনেক দুধ দেয়। এদের শরীর ও অনেক বড় হয় ।

ইমাম জাহিয বলেন, মহিষ ও গাভী একই প্রজাতি । কারণ এ ধরনের মহিষের গোস্ত অধিকতর স্বাদযুক্ত হয়। সম্ভবত এ কারণেই কুরবানীর সময় মহিষকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়। যেমন ভেড়া বা দুম্বার তুলনায় বকরীকে প্রাধান্য দেয়া হয় ।

যামাখশরী বলেন, হিংস্র প্রাণীর মধ্যে শ্রেষ্ঠত্যের দাবীদার যেমন বাঘ, চিতা, রয়েল বেঙ্গল। অন্যান্যপ্রাণীদের মধেদ্য শ্রেষ্ঠ হল -হাতী, গন্ডার ও মহিষ। দ্বিতীয় প্রকার গাভী হল- আরবী বংশোদ্ভুদ। এ ধরনের গাভী নম্র প্রকৃতির ও পশমহীন হয়ে থাকে। এধরনের গাভীকে دربـــانة বলে। এধরনের গাভী মাল বহনের জন্য রাখা হয়। কখনো কখনো এর কুঁজ উঠতেও দেখা যায়।

গাভীর বৈশিষ্ট হল যখন সে একবছর বয়সের হয় তখন কোন কোন সময় বলদ ঘাড়ের উপর উঠে যায়। গাভী সাধারনত ষাড়ের চেয়েও বেশী মান যুক্ত হয়। সমস্ত প্রাণীর মধ্যে প্রসিদ্ধ কথা হল স্ত্রীর আওয়াজ পুরুষের আওয়াজ থেকে হালকা ধরনের হয়। তবে সাধারণ গাভীর বেলায় তা হয়না। বরং সাধারণ গাভীর আওয়াজ অতি কর্কশ হয় । যখন ষাড় গাভীর উপর চড়ে তখন সে দিশেহারা হয়ে ষাড়ের নীচে পড়ে বাকা হয়ে যায় বিশেষ করে ষাড়ের বিশেষ অঙ্গ যখন

শক্ত হয়ে যায় এবং সঙ্গম করার সময় মুল স্থানে ভূল করে। যখন গাভীর সহবাস করার উচ্ছা হয় তখন সে অত্যন্ত ভীতু হয়ে পড়ে এবং রাখালকে ক্লান্ত করে ফেলে। মিশরীয় এলাকাতে এক প্রকার গাভী হয় এদেরকে بقر الخيس বলে। এদের গর্দান হয় লম্বা এবং শিং হয় গৃহপাতিল গাভীর মত। কিন্তু এরা খুব বেশী দুধ দেয়।

মাছউদী বলেন, আমি রাই নামক স্থানে এমন এক প্রকার গাভী দেকেছি- যারা উটের মত বসে।আর এর নিজের পিঠের বোঝা সহ আক্রমন করতে পারে । কিন্তু এদের উপরের দু চোয়ালের দাত গাভীর মত নয়- আর এরা ঘাস ইত্যাদি নীচের দাতের সাহায্যে চিবায়।

সন্তান ভুমিষ্ট হওয়ার সহজ আমল ঃ

হযরত ইকরামা হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) র বরাত দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, একদা হযরত ঈষা (আ.) একটি গাভীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি দেখতে পেলেন গাভীর পেটের আসন্ন বাচ্চা তাকে অস্থির করে তুলেছে। গাভীটি আজ করল- হে রুহুল্লাহ! আমার এই অস্থিরতা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে দেয়া করুন। সুতরায় হযরত ঈসা (আ.) এই দোয়া করলেন-

يا خالق النفس من النفوس ويامخرج النفس من النفس خلصها

হযরত ঈসা (আ.) এই দোয় করতেছিলেন-এই মুহূর্তে গাভীটি বাচ্ছা প্রসব করল। এর পর হযরত ইবনে আব্বাস বলেন- প্রসবকালীন কোন মহিলা যদি প্রসব বেদনায় ব্যাকুল হয়ে যায় তাহলে কাগজে লিখে হাতে বেধে দিলে সহজে প্রসব হবে। (প্রসবান্তে তাবিজটি অবশ্যই সঙ্গে সঙ্গে খুলে ফেলতে হবে অনুবাদক) অনুরূপভাবে হযরত ছায়ীদ ইবনে যুবাইর (রা.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) র বরাত দিয়ে বর্ণনা করেছেন প্রসবের সময় কোন হহিলা যদি অত্যন্ত কষ্টের সম্মুখীন হয় তাহলে নিম্নের দোয়াটি লিখে হাতে বেধে দিবে।

بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين كا نهم يوم يرونه مايو عدون لم يلبثوا الاساعة من نهار بلا غ فهل يهلك الاالقوم الفاسقون

সহজে প্রসবের জন্য একটি আমল :

ইমাম দামিরী (রহ.) বলেন এ ধরনের ব্যাপারে হাদীছেও এসেছে

সুতরাং হযরত আনস (রা.) বলেন-

ان النبى صلى الله عليه وسلم قال اذا طلبت حاجة واجلبت ان تنجح فقل لا اله الاالله وحده لا شريك له العليم العظيم لا اله الله وحده لاشريك له العليم الكريم لا اله الاالله وحده لا شريك له رب السمٰوات والارض ورب العرش العظيم الحمد له رب العالمين كانهم يرون ما يوعفون لم يلبثو الاساعة من نهار بلاغ فهل يهلك الاالقوم الفاسقون كانهم يوم يروها لم يلبثوا الاعشية اوضحاا. اللهم انى اسئلك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل اثم والغنيمة من كل بروالفوز بالجنة والنجاة عن النار. اللهم لا تدع لنا ذنب الاحاجة هى لك رضا الاقضيتها بر حمتك يا ارحم الراحمين

সহজে প্রসব হওয়ার জন্য নিম্নের দোয়াটি লিখে প্রসূতিকে পান করালে সহজে প্রসব হয়ে যাবে।

بسم الله الرحمن الرحيم. سورة فاتحه بسم الله الرحمن الرحيم سورة صمد بسم الله الرحمن الرحيم. سورة فلق بسم الله الرحمن الرحيم سورة ناس بسم الله الرحمن الرحيم. اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذ الارض مدت والقت ما فيها وتخلق. اللهم يا مخلص النفس من النفس يا مخرج النفس من النفس يا عليم يا قدير خلص فلا نة مما فى بطنها من ولدها خلاصا فى عافيه انك ارحم الراحمين

গাভীর একটি বিস্ময়কর ঘটনা ঃ

হযরত আবুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেন, এক সময় জনৈক বাদশাহ তার দেশ ভ্রমনে বের হলেন। কিন্তু সে তার প্রজাদেরকে ভয় পাচ্ছিল। তাই সে এমন একজন লোকের কাছে অবস্থান নিল যার কাছে একটি গাভী ছিল। গাভীটি সন্ধায় বাড়ী এলে লোকটি গাভী দোহন করে ৩০টি গাভীর দুধের পরিমান দুধ বের করল। গাভীর এত বেশী দুধ দিতে দেখে বাদশাহ আশ্চর্য হয়ে গেলেন। বাদশাহ গাভীটি নিয়ে যাওয়ার মনস্থ করলেন। দ্বিতীয় দিন গাভীটি ফিরে এলে প্রথম দিনের তুলনায় অর্ধেক দুধ মক দিল। এ অবস্থা দেখে বাদশাহ গাভীর মালিককে বল্লেন যে,- বলতো গত কাল গাভীটি যথেষ্ট পরিমানে দুধ দিয়েছিল আজ কি

সেখানে যায়নি? লোকটি বল্ল- গত কালের চারন ভূমিতেই আজ গাভীটি গিয়েছিল। কিন্তু আজ এমন হল যে, গত কালের অবস্থা দেখে বাদশাহ তার প্রজার সাথে খারাপ আচরনের চিন্তা করলেন। এজন্য আজ সে দুধ কম দিয়েছে। কারণ বাদশাহ্ যখন আচরনের চিন্তা করলেন। এজন্য আজ সে দুধ কম দিয়েছে। কারণ বাদশাহ যখন অত্যাচারী হয় অথবা প্রজাদের উপর অত্যাচার অবিচার করে তখন বরকত শেষ হয়ে যায়। এ বিস্ময়কর ঘটনা দেখে বাদশাহ এ গাভীর মালিককে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, এখন আর গাভীটি জোর করে নেয়া হবে না । সুতরাং পরদিন গাভীটি মাঠে চলে গেল। সন্ধায় বাড়ী ফিরে এলে এতই দুধ দোহন করল যা প্রথম্ দন দোহন করেছিল । এ অবস্থা দেখে বাদশাহর শিক্ষা হল এবং ন্যায় বিচারের সংকল্প করলেন। বাদশাহ তাও অনুভব করলেন যে যখন বাদশাহ অত্যাচারী হয় বা প্রজাদের উপর অত্যাচার করলে বরকত কমে যায়। এখন থেকে আমি অবশ্যই য়্যায় বিচার করব এবং ভাল অবস্থার প্রতি চিন্তা করব।

আরেকটি ঘটনাঃ

ইবনে জাওজী লিখেন যে পারস্যের এক রাজা শিকারে বের হলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে বাদশাহ তার সাথীবর্গ থেকে পৃথক হয়ে গেলেন। এমতাবস্থায় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে গেল। ঝড় তুফান প্রবল ভাবে আরম্ভ হয়ে তার সৈন্য সমস্ত কোথায় গেল তার কোন পাত্তা পাওয়া গেলনা। সুতরাং এ অবস্থায় বাদশাহ্ এমন এক রাস্তায় চলতে লাগলেন যে রাস্তা সম্পর্কে তিনি মোটেই জানেন না যে তিনি কোথায় যাচ্ছেন? কিছুক্ষণ পর বাদশাহ্ এক বৃদ্ধার ঝুপড়ি ঘরের নিকট চলে এলেন। এবং সেখানেই তিনি থেকে গেলেন। বৃদ্ধার ঝুপড়ি ঘরের নিকট চলে এলেন। এবং সেখানেই তিনি থেকে গেলেন। বৃদ্ধা বাদশাহর ঘোড়াটি অন্য একস্থানে বেধে রাখল। বৃদ্ধা তার গাভী দোহন করতে লাগল। বাদশাহ দেখলেন গাভীটি যথেষ্ট পরিমানে দুধ দিয়েছে। বাদশাহ মনে মনে ভাবলেন এখন গাভীর উপরও কর লাগাতে হবে । কারণ গাভীটি পর্যাপ্ত পরিমানে দুধ দেয়।

পরের দিন যখন বৃদ্ধার মেয়ে দুধ দোহন করতে গেল তখন দেখা গেল যে গাভীর উলানে মোটেও দুধ নেই মেয়েটি তার মাকে উচ্চ স্বরে ডাকতে লাগল। মেয়েটি তাকে বল্ল- মাগো বাদশাহ তার প্রজাদের সঙ্গে অসৌজন্য

মূলক ব্যবহারের চিন্তা করেছেন। মা বললেন, একথা তুমি কিভাবে জানতে পারলে? মেয়েটি জবাব দিল- আজ গাভীটি সামান্য পরিমানও দুধ দেয়নি। মা বল্লেন- চুপ থাক। রাতের ব্যাপার। এখন পারস্য রাজ খরাপ আচরনের পরিবর্তে ভাল আচরনের চিন্তা করছেন। ২য় রাতে মা বল্লেন বেটি দুধ দোহন কর । মেয়েটি দুধ দোহনের ইচ্ছা করলে সে দেখল যে, গাভীর উলান দুধে পরিপীর্ণ। মেয়েটি বল্ল মাগো- আল্লাহর কছম! বাদশাহ তার মন্দ ইচ্ছা থেকে প্রত্যাবর্তন করেছেন। দ্বিপ্রহরের সময়ে বাদশাহর সঙ্গী সাথীরা ফিরে এলেন। বাদশাহ সওয়ার হলেন এবং সাথী বর্গকে আদেশে দিলেন যে, বৃদ্ধা এবং তার মেয়েকেও নিয়ে এসো সুতরাং মা মেয়ে বাদশাহর নিকট গেলেন এবং বাদশাহ তাদেরকে বিপুল পরিমানে উপঢৌকন দিলেন এবং বল্লেন তোমরা আমার মনের অবস্থা কিভাবে জেনেছিলে? বৃদ্ধা বললেন, আমরা অনেকদিন যাবৎ এখানে আছি। যখনই যে কেউ আমাদের সহিত ভাল আচরণ করে তখন আমাদের যমীন সবুজ শ্যামল হয়ে যায়। আমাদের জীবনে নেমে আসে অনাবিল প্রশান্তি। আর যখন কোন প্রকার অত্যাচার করা হয় তখন আমাদের জীবন হয়ে উঠে দুর্বিসহ এবং সুখ শান্তি নিঃশেষ হয়ে যায়।'

ত্বারত্বোসী বলেন, মিশরের 'বালায়ী' এলাকাতে একটি খেজুর বৃক্ষ ছিল । এত কমপক্ষে বিশ 'ছা' খেজুর ফলত। (১ছা, সাড়ে তিন সের) অথচ এ মৌসুমে অন্য এলাকাতে এর অর্ধেকও ফলত না । মিশরের বাদশাহ কোন এক কথায় অসন্তুষ্ট হলে সে বৃক্ষে একটি খেজুর ও আসলনা।

ত্বারত্বোসী বলেন, মিশরের 'বালায়ী' এলাকার এক বৃদ্ধ লোক আমাকে বল্লেন আমি এমন খেজুর সম্পর্কে অবগত আছি যে, 'গাবরাহ' নামক স্থানে ২৪০ ছা এবং ২৪ মুদ (৬৭ তোলা) খেজুর ফলত। খেজুরের মালিক অভাবের সময় ২৪ মুদ খেজুর এক আশরাফীর বিনিময়ে বিক্রি করত।

ইবনে খাল্লেকান বলেন, একদা এক বক্তা জালালুদ্দৌলা বাদশাহ সেলজুকীর দরবারে আগমত করলেন। লোকটি তার বৃক্তৃতায় একটি ঘটনা বর্ণনা করল যে, একদা পারস্য রাজ তার সঙ্গী সাথী নিয়ে একটি বাগানে ভ্রমনে আসলেন।বাদশাহ বাগানের ভিতরে প্রবেশ করে- পানি চাইলেন। সুতরাং একটি ছোট শিশু একটি পিয়ালায় করে ইক্ষুর ঠান্ডা শরবত পরিবেশন করল। বাদশাহ

তা পান করে খুব স্বাদ অনুভব করলেন । বাদশাহ বল্লেন এ শরবত কিভাবে তৈরী করলে? শিশুটি জবাব দিল আমি নিজ হাতে ইক্ষুর রস বের করে থাকি। বাদশাহ বল্লেন- আরেক গ্লাস নিয়ে এসো তো । শিশুট বাদশাহকে চিনত না। শিশুটি চলে যাবার পর বাদশাহ স্থির করলেন এই স্থানটি তিনি নিয়ে নিবেন এবং এর পরিবর্তে তাকে অন্য একটি জায়গা দিয়ে দেবেন। শিশুটি ভিতরে প্রবেশ করে কাঁদতে কাঁদতে বের হয়ে আসল । শিশুটি বলতে লাগল আমাদের বাদশাহর নিয়ত খারাপ হয়ে গেছে। বাদশাহ বল্লেন- তুমি একথা কিভাবে জানতে পারলেন যে, বাদশাহর নিয়তে ত্রুতি রয়েছে? শিশুটি জবাব দিল আমাদের কাজ হল আমরা বিনা পরিশ্রমে ইক্ষুর রস যত ইচ্ছা বের করতে পারি। এখন যখন আমি রসের শরবত আনতে গেলাম তখন প্রাণপন চেষ্টা করেও রস বের করতে পারলাম না। অবস্থা দেখে বাদশাহ তার ইচ্ছা পরিত্যাগ করলেন এবং বল্লেন যাও এখন তোমার কাজ তুমি দিয়ে কর। সে দিন থেকে বাদশাহ এ ধরনের আশা করা সম্পূর্ণ ছেড়ে দিলেন। সুতরাং শিশুটি গিয়ে এত রস বের করল যে, সে বেহুসের মত ফিরে এলো।

জালালুদ্দৌলার ব্যাপারে কিছু কথা ঃ

জালালুদ্দৌলা বাদশাহদের মধ্যে একজন পূণ্যবান লোক ছিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি 'মূলকে আদিল' উপাধিতে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি যাবতীয় কর মওকুফ করে দেন । তিনি সমগ্র রাজ্যে নিরাপত্তা পুলিশ নিযুক্ত করেন । এতে সমগ্র শররে নিরাপত্তা ও স্বস্থি লাভ করে । অতঃপর তিনি এমন একজন প্রতাপশালী শাসক হয়ে যান যে, কোন ইসলামী শাসকই তার সমকক্ষ ছিলেন না। তার ছিল শিকারের নেশা। কোন ঐতিহাসিক লিখেছেন যে, তিনি স্ব হস্তে যত শিকার করেছেন। তা দশ হাজার বলে গননা করা হয়েছে। অতঃপর তিনি ওগুলোকে ১০ হাজার আশরাফীর মাধ্যমে বিক্রী করে দিয়েছেন। জালালুদ্দৌলা বলেন, আমি আল্লাহকে ভয় করি এ কারণে যে, আমার দ্বারা এই সমস্ত প্রাণী খাদ্য ব্যতীত এদেরকে বন্দী করে রেখেছি। ইতিহাসের কিতাবে বর্ণিত আছে যে, তিনি যখন প্রাণী শিকার করতেন তখন এক দেরহাম ছদকা করতেন।

কেউ কেউ লিখেছেন যে, একদা জালালুদ্দৌলা কুফার রাস্তায় এত বিপুল পরিমান নীল গাই শিকার করলেন যে, এদের মাধ্যমে লাল রঙ্গের গাভীর খুড় ও

হরিণের শিং দ্বারা সে রাস্তায় একটি মিনার বানানো হল ।

ইবনে খাল্লেকান লিখেছেন, মিনারটি আজও বর্তমান আছে মিনারটির নাম "মিনারায়েকুরুন" রাখা হয়েছে। জালালুদ্দৌলা ৪৮৫ হিঃ ১৬ই শাওয়াল তারিখে বাগদাদে ইন্তেকাল করেন।

ইমাম দামিরী (রহ.) বলেন, আশ্চর্য কথা হল যে, মুক্তাদি বিল্লাহ তার অভিভাবক মুস্তাজহির বিল্লাহর পুত্রকে নিযুক্ত করলেন। কিন্তু বাগদাদের শাসক যখন তৃতীয় বার আক্রান্ত হলেন তখন তিনি মুক্তাদী বিল্লাহকে তা করবে বাধ্য বরেছিলেন এই মর্মে যে, সে তার পুত্র মুস্তাজহির বিল্লাহকে অপসারণ করে তার দৌহিত্র জাপরকে অভিভাবক যেন নিযুক্ত করেন। তিনি মুক্তাদির শাসনামলে বছরা চলে যাওয়াতে মুস্তাজহিরের অপসারণের কাজ মুক্তদি এর কঠিন মনে হল । সুতরাং মুক্তাদি ল্লিাহ বাদশাহ মুস্তাজহিরকে অপসারণ না করার জন্য বার বার বলেন। কিন্তু বাদশাহ তার কথা রাখেননি। অতঃপর মুক্তাদি ১০ দিনের সুযোগ নিলেন যে তিনি এ সময় তার সিদ্ধান্ত মোতাবেক চিন্তা ভাবনা করতে থাকেন অথবা প্রস্তুত হবে থাকেন । সুতারাং বাদশাহ মুক্তাদিকে সুযোগ দেন। সেদিন থেকে মুক্তাদি রোজা রাখতে আরম্ভ করেন এবং ইফতার করার সময়ে বালির উপর বসে ইফতার করেন এবং বাদশাহ'র জন্য বদ দোয়া করেন। সুতরাং এই আমলের দ্বারাই বাদশাহ অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং মারা যান। প্রকাশ্য ভাবে বাদশাহর জানাযার নামাজে কেউ অংশগ্রহণ করেন নাই এবং কেহ তার নামাজে জানাযা ও পড়েননি। মুক্তাদি নিজেও অংশ গ্রহণ করেননি এবং বাদশাহর মরদেহকে একটি মৃতবাহী খাটে উঠিয়ে ইস্পাহান নিয়ে তাকে দাফন করা হয়।

বনী ইস্রাইল কে যে গাভী জবাই করার আদেশ করা হয়েছিল তার ঘটনা প্রসিদ্ধ। এর বিস্তারিত আলোচনা عجل باب العين এর অধ্যায়ে আসবে। এরপর পুত পবিত্র সে সত্তা যিনি তার সৃষ্টিকে কতইন ব্যবধানে সৃষ্টি করেছেন।

হযরত ইব্রাহীম (আ.)কে তার প্রিয় পুত্র ইসমাইল (আ.) কে আল্লাহ পাক কুরবানী কবার আদেশ করার সাথে সাথে তিনি হুকুম তামিল করেন। আল্লাহ তায়ালা বনী ইস্রাইলকে আদেশ করেন তোমরা একটি গাভী জবাই কর। কিন্তু তারা গাবী কুরবানী করার ব্যাপারে বিরুধীতা সহ তাল বাহানা আরম্ভ করেছে। হযরত আবু বকর (রা.) আল্লাহর রাস্থায় তার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ব্যয় করেন।

অপর দিকে ছা'লাবাহ বিন হাতেম যাকাতে কৃপণতা করেছেন। কিন্তু হাতেম ভ্রমনাবস্থায় এবং বাড়ীতে থাকাবস্থায় অন্তর উজাড় করে দান করেছেন। আর হাজিব তার চোখের আলোতেও কৃপণতা করেছেন । এ সমস্ত কথায় কত পার্থক্য। ছুবহান ইবনে ওয়াইল একজন বড় বক্তা ছিলেন আর বাকিরা ছিল বোবা লোক থেকেও অধিকতর অপারগ। এমনিভাবে আল্লাহ্ পাক স্থানের মধ্যেও কতইনা পার্থক্য করেছেন। যেমন অনু পরমানুর আকৃতি একটির অভ্যন্তরে অপরটি প্রবিষ্ট।

আরববাসীয়দের একটি প্রথাঃ

আরবীরা দুর্ভীক্ষের সময় কিছু আশা করলে তারা গাভীর লেজে আগুন বেধে ছেড়ে দিত। তাদের এই বিশ্বাস ছিল যে, এতে করে আল্লাহর দয়া আসবে। এবং বৃষ্টির দ্বারা পুরস্কৃত করা হবে।

কবি যেমন বলেন-

اجاعل انت بيقورا مسعلة :: ذريعة لك بين الله والمطر

তুমি গাভীর মেরুদন্ডকে পথ প্রদর্শক বানাচ্ছ একাজ কি বৃষ্টি এবং আল্লাহ তায়ালার কাছে সুপারিশকারী হবে?

উমাইয়া বিন আবু ছাল্‌র ছাকাফী ও দুর্ভিক্ষের কথা বর্ণনা করেছেন।

سنة ازمة تخيل للنا :: سترى للعضاة فيهاصريرا

অনাবৃষ্টির বছর লোকদের সামনে আছে এত আপনি কি করে বৃক্ষের আওয়াজ পাবেন?

لاعلى كوكب ينودو لا ريح :: جنوب ولاترى طخرورا

তারকা যদিও দৃষ্টি গোচর হচ্ছে না- যা বৃষ্টি হওয়ার কারণ আর না দক্ষিণা বাতাস বইছে যে মেঘকে মালা টেনে আনবে।

ويسقون باقرالسهل للطو:: ومهاذيل خشية ان تبورا

আবার সেই টিলা এবং চুড়াগুলোর উপর বৃষ্টিপাত হবে। জীর্ণ শির্ণ প্রাণী গুলোর উপরও বৃষ্টিপাত হবে। এসব সন্দেহের কারণে যে বন্যায় নাকি সব ধ্বংস হয়ে যায়।

عاقدين النيران فى هلب الاذ:: ناب منها لكئى تهيج البحورا

এ প্রাণীগুলোর লেজে ইগুন বেধে রেখেছে যেন নবীগুলোতে বন্যা আসে।

سلع ما ومثله عشرما:: عائل ماو عالت البيقورا

দলপতি এবং তার ন্যায় ১০ টি অভূক্ত প্রাণী ক্ষুধার জালায় ছটফট করছে। গাভীগুলোর বর্তমানে কি এটুকুই যথেষ্ট?

ইমাম গাযযালী (রহ.) লিখেছেন যে, কে ব্যক্তির নিকট একটি গাভী ছিল। লোকটি দুধে পানি মিশ্রিত করে বিক্রি করত। কয়েকদিন পর এক বন্যা আসল- এতে গাভীটি ডুবে গেল । ছেলে বল্ল আব্বাজান আমরা যে দুধে পানি মিশ্রিত করে বিক্রী করতাম তা একত্রে মিশে একদিন বন্যা হয়ে আমাদের গাভী ডুবে গিয়েছে। ইমাম খালাল জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রা.) উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন- হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন একটি গাভী শরাবে চলে গিয়ে শরাব পান করে ফেল্ল। এরপর লোকো গাভীটি কুরবানী করে ফেল্ল। অতঃপর নবী করিম (স.) এর নিকট এল এবং ও ব্যাপারে তাঁর কাছে জানতে চাইল। নবী করিম (স.) বলেদিলেন এটা তোমরা খেতে পার অথবা তিনি বলেছেন - তা খেলে কোন ক্ষতি হবেনা।

গাভীর শরয়ী হুকুম ঃ

গাভীর দুধ ও গোস্ত সর্বস্মতিক্রমে খাওয়া জায়েয। তাই উম্মুল মুমিনীন (রা.) বলেন -নবী করিম (স.) এরশাদ ফরমান গাভীর চর্বি ও দুধ ঔষধ স্বরূপ এবং গোস্ত ক্ষতিকারক (মুসলিম) হযরত আয়েশা (রা.) বলেছেন- নবী করিম (স.)তার সহ ধর্মিনীদের পক্ষ থেকে গাভী কুরবানী করেছেন। বুখারী।

ইমাম ত্বিবরানী (রহঃ) যুহাইর এর বরাত দিয়ে লিখেছেন একজন মহিলা মালিকা বিনতে আমর যাইদয়াহ খান্দান এর লোক আমার নিকট বর্ণনা করেছেন। একদা আমার গলায় অসুখ হয়। তখন আমি মালিকার কাছে এলাম তখন তিনি আমার অসুখেল জন্য গাভীর চর্বি নির্বাচন করলেন । তিনি আরো বলেছেন- নবী করিম (স.) বলেছেন গাভীর দুধ রোগ নিরাময় কারক, তার ঘি ঔষধ আর তার গোস্ত হল রোগ। ত্বিবরানী)

ইবনে মাসউদ বলেন, নবী করিম (স.) এরশাদ ফরমান তোমরা গাভীর দুধ ও ঘি খাও এবং গোস্ত থেকে বিরত থাক। কেননা এর দুধ ও ঘি ঔষধ এর এর গোস্ত রোগ । (মুস্তাদরাক)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাছউদ (রা.) থেকে অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছেঃ নবী করিম (স.) এরশাদ ফরমান আল্লাহ পাক জগতে যত ধরনের রোগ প্রেরণ করেছেন- তার প্রতিটিরই চিকিৎসাও প্রেরণ করেছেন। যেরোগ গুলো অবগত নয় তার ঔষধও অবগত আর যেগুলো জানা হয়েছে তার ঔষধ জানা । গাভীর দুধ সর্ব প্রকার রোগের ঔষধ। তোমরা গাভীর দুধ পান কর । কেননা সে সব গাছেই মুখ দেয় । ইমাম ইবনে মাজাহ হযরত আবু মুসা থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন অথচ গাভীর দুধের আলোচনা করেননি। কিন্তু উভয় অর্থ একই । এছাড়া বড় বড় দুটি হাদীছ বর্ণনা করেছেন কিন্তু এদের বর্ণনায় মুহাম্মদ বিন জাযির বিন ছাইয়ার যিনি মুহাদ্দিসীনের তে সত্য ও ছহীহ। কিন্তু কোন কোন মুহাদ্দিছ এসে জয়ীফ বলেছেন এছাড়া অবশিষ্ট রাবীগণ ছেকাহ। হাকিম আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক ইমাম আবু হানিফা কাইছ বিন মুসলিম, ত্বারিক বিন শিহাব এবং আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ প্রমূখ থেকেও বর্ণনা করেছেন।

কতিপয় মাসআলা ঃ

কোন লোক যদি গাভীর ব্যাপারে অছিয়ত করে তাহলে এতে বলদ অন্তর্ভুক্ত হবে না। ইহাই ছহীহ। কেননা গাভী শব্দটি স্ত্রী জাতীর জন্য বানানো হয়েছে। কিন্তু নির্ধারিত করে বল্লে- গাভীই অন্তর্ভুক্ত হবে। আর بَقَرَة এর هاء টি এর বচনের জন্য। ইমাম রাফেয়ী (রা.) বলেন, যাকাতের বেলায় গাভীর নেছাব মহিষ দ্বারা পুরা করা যাবে। কিন্তু "عـمـدة" এবং "كـفـايـه" প্রভৃতিতে একথার আলোচনা হল বিপরীত অবস্থা অন্তর্ভূক্ত হবেনা । অর্থাৎ গাভীর নেছাব মহিষ দ্বারা হবেনা । তবে সে সময়ে যদি অন্তর্ভূক্ত মনে করে যখন ওছিয়তকারী একথ বলে مـن بـقـرى অতঃপর যখন অনুসন্ধান করে পাওয়া গেল যে, ওছিয়তকারী শুধ হহিষের বেলায় ছেড়ে দিয়েছে।

ওছিয়ত করার পর জানা গেল যে, তার পরিত্যক্ত সম্পদের মধ্যে শুধু নীল গাই- তাহলে এক্ষেত্রে দুটি অবস্থা হবে, যার আলোচনা হরিণ এবং উটের অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। গৃহ পালিত গাভীর শাছয়াল হল মাঠে চড়ে ঘাস খেতে পারে এমন প্রতি ৩০ টি গাভীর জন্য একটি تبيـــع ওয়াজিব। অর্থাৎ ১ বছর বয়সের গাভী । আর প্রতি ৪০ টি গাভীর জন্য ১টি مسنه অর্থাৎ একটি ২ বছর বয়সেরর বাছুর ইমাম মালেক (রহ.) তাউছের বরাত দিয়ে লিখেছেন-

হযরত মুয়াজ (রা.) এমনিভাবে যাকাত আদায় করতেন। এর ছেয়ে কম হলে তিনি যকাত আদায় করতেন না । এ বছরের বাচ্চাকে تبيع এর জন্য বলা হয় যে, সে বাচ্চা চারন ভূমিতে তার মায়ের সাথে সাথে থাকে। কোন কোন আলেম বলেছেন- যেহেতু এই ধরনের বাচ্চার শিং কোন বরাবর থাকে ।

কেউ যদি যাকাতে تبيع এড়ে বাছুর ব্যতীত تبيعه বকনা বাছুর যাকাত দেয় তাহলে যাকাত আদায় হয়ে যাবে বরং স্ত্রী জাতীয়ের যাকাত স্ত্রীজাতীয় হওয়ার কারণে আরো বেশী ভাল হবে। দু'বছরের বাচ্চাকে مسنه এজন্য বলঅ হয় যে, এর এক বছর পূর্ণ হয়েছে এবং ২ য় বছরে পদার্পণ করেছে।

কেউ যদি ৪০ টি গাভীর মধ্যে এক এক বছরের দুটি বাচ্চ যাকাত প্রদান কে তাহলে ছহীহ কওল মতে তার যাকাত আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু ইমাম বগভী (র.) বলেন তার যাকাত আদায় হবে না । কোননা এক এক বছরের ২ বচ্চা পূর্ণ এক বছব্রের বাচ্চার স্থালাভিষিক্ত হয়না।

বনী ইছরাইলের তিন কাজীর ঘটনা ঃ

হযরত ইকরামা (রা.) বলেন বনী ইছরাইলের মধ্যে তিনজন কাজী ছিল। এদের মধ্যে একজনের ইন্তেকাল হয়ে গেল। এরপর স্থানটি পুরা করা হল। তারা খুব উত্তম মীমাংসা করে। আল্লাহ পাক এদেরকে পরীক্ষা করার জন্য একজন ফেরেস্তা প্রেরণ করেন। ফেরেস্তা দেখলেন একজন তার গাভীকে পানি পান করাচ্ছে। গাভীর পেছনে তার বাছুর দাড়িয়ে আছে। ফেরেস্তা ঘোড়ার উপর আরোহন করে সে বাছুরটি তার পেছনে লাগিয়ে দিল। সুতরাং বাছুরটি ঘোড়ার পেছনে পেছনে চলতে লাগল । গাভীর মালীক এবং এই ফেরেস্তা দু'জনে প্রথমে কাজীর নিকট মামলা করল। পেরেস্তার কাছে যে মূল্যবান মুতিটি ছিল তা বিচারককে দিয়ে দিল এবং বল্ল, বিচারে আপনি আমার পক্ষে রায় দিবেন যে বাছুরটি আমার। বিচারক বল্ল আমি কিভাবে এর মীমাংসা করব? ফেরেস্তা বল্ল আপনি ঘোড়া, গাভী ও বাছুরটি ছেড়ে দিবেন। বাছুরটি যদি ঘোড়ার পেছনে পেছনে চলে যায় তাহলে বুঝবেন বাছুরটি আমার। সুতরাং কাজী তাই করলেন। দেখা গেল বাছুরটি ঘোড়ার পেছনে পেছনে চলে গেল। তখন কাজী সাহেব বিচারের রায় ঘোষণা করলেন যে, বাছুর তোমার (ফেরেস্তার) তুমি তা নিয়ে যাও। এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বি অন্য এক বিচারকের নিকট গেল ।২য় কাজীও এই

মীমাংসাই দিল। তৃতীয় কাজীর নিকট গিয়ে ফেরেস্তা তাকে একটি মূল্যবান মুর্তী দিল এবং বল্ল আপনি আমার ও তার মধ্যে মীমাংসা করে দিন। একথা শুনে বিচারক বল্লেন আমার তো ঋতু স্রাব হচ্ছে। ফেরেস্তা বললেন ছুবহানাল্লাহ্, আপনি একি বলছেন? পুরুষের কি স্রাব হয়? কাজী জবাব দিলেন এমন ঘটনা কোথায় ঘটে যে ঘোড়া (গরুর) বাছুর প্রস্রব করে? সুতরাং বিচারক বাছুরটি গাভীর মালিক কে দিয়ে দিলেন।

ইমাম দামিরী (র.) বলেন, এই সমস্ত কাজীর ব্যাপারে আল্লাহ পাক এরশাদ করেন- দুই কাজী জাহান্নামে এবং একজন বেহেস্তে যাবে

উদাহরণ ঃ

আরবগণ বলেন-

تركت زيدا المبلا حس البقر او لا دها

আমি যায়েদকে এমন এক স্থানে ছেড়ে দিলাম যেখানে গাভী তার বাচ্চাকে চাটতেছে। আরবীগণ এ কথা দ্বারা ধূ ধূ মরুমূমি উদ্দেশ্য নিয়েছেন।

চিকিৎসায় গাভীর উপকারিতা ঃ

গাভী, বলদ ইত্যাদির চর্বি এক রতি পরিমান আলকাতরায় মিশ্রিত করে ঘরে ধুপ দিলে সে ঘরে সাপ, বিচ্ছু পোকা মাকড় থাকুবে না। গাভী, বলদ এর চর্বি কোন এক বর্তনে মালিশ করলে সে বর্তনে মশা একত্র হয়ে যাবে। গাভী, বলদের শিং পাতলা করে পিষে পান করলে যৌন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এর রক্ত প্রবাতি রক্তকে বন্ধ করে। এর পিত্তে গোরুন মিশ্রিত করে অর্শব রোগে ব্যবহার করলে এ রোগ দুর সহ ব্যথা বেদনা চলে যাবে। এর পিত্ত মুখের যে কোন দাগে লাগালে বেশ উপকার হবে। এর পিত্তে মধু, সোহাগ সহিত মিশ্রিত করে সুরম আকারে ব্যবহার করলে চোখের দৃষ্টি শক্তি বৃদ্ধি পায়। এর পিত মধু তুকমার দানা একত্রে মিশ্রিত করে গুহ্য দ্বারে লাগলেও বেশ উপকার দর্শে।

এরিষ্টটল লিখেছেন, কাল রঙ্গের গাভীর পিত চোখে সুরমা বানিয়ে ব্যবহার করলে চোখের জ্যোতি বৃদ্ধি হয়। হাকিম কিমাস লিখেচে যদি গাভীর চোখ ফেটে যায় বা বের হয়ে যায় তাহলে তার ছোখের পানি দ্বারা কোন কাগজে কিছু লিখে তাহলে সে লোক যদি দিনের বেলায় ও কোন কিছু না পড়তে পারে তাহলে সে রাতের বেলায়ও পড়তে পারবে। গাভীর চুল অগ্নিদগ্ধ করে পানিতে

মিশ্রিত করে পান করলে দাতের উপকার হবে। অনুরূপ এর পশম পুরিয়ে শিরকা বা লেবুর রসে মিশ্রিত করে পান করলে প্লীহা রোগ দুর হয়ে যাবে। এমনিভাবে এর পুরা পশম মধুর সহিত মিশ্রিত করে পান করলে পেট থেকে ক্রিমী বের হয়ে যাবে। ইউনুছ লিখেছেন, ছাওয়াফিলকে গাভী বলদের গোবরের সহিত মিশ্রিত করলে তৈলাক্ত দানা হয়ে যায় এবং পানকারী তখন সুস্থ হয়ে যাবে। আর যদি কেহ শক্ত বা ফুলে যাওয়া অঙ্গে মালিশ করে তাহলে তা নরম হয়ে যাবে। কোন স্থানে পিপিলিকায় আক্রান্ত হওয়ার ভয় থাকলে সেখানে তা ধুপ দিলে পিপিলিকা বের হবেনা । কারো পায়ের গ্রন্থি ফুলে গেলে তা ব্যবহার করলে সত্বর মুক্ত হওয়া যাবে। আসন্ন প্রসবা মহিলা যদি বেদনা অনুভব করে তাহলে এর ধুপ দিলে সহজে প্রসব হয়ে যাবে। চাই সন্তান জীবিত বা মৃত হোক, অতি সহজে ভূমিষ্ট হয়ে যাবে। প্রসুতির ফুল ও সহজে পড়ে যাবে। কোন ঘরে এর ধুপ দিলে ঘরের বিষাক্ত পোকা মাকড় চলে যাবে। পুরে যাওয়া রোগীর শরীরে লাগালে বা নাক দিয়ে রক্ত পড়া রোগী যদি এর শ্বাস নেয় তাহলে এসমস্ত রোগ ভাল হয়ে যাবে। শরীরের কোথাও কাটা ফুটলে তা বারবার শরীরে মালিশ করে অথ টুকু দেরী করতে হবে যেন তা শুকিয়ে যায়- তাহলে কাটা বের হয়ে আসবে।

হারমাছ বলেন, পাগলা বলদের নাকে গোলাবজন মালিম করলে সে শান্ত হয়ে যাবে। যদি বলদের গোস্ত রান্না করে বড় কাচের বোতলে ভরে তার ছিপি ভাল করে এটে ৪০ দিন রাকা হয় তাতে কিড়া জন্মাবে। এখন এ কিড়া গুলো অন্য একটি শিশিতে ভরে রাখবে। দেখা যাবে একটি অপরটিকে খেয়ে ফেলেছে। শেষ পর্যন্ত একটি কিড়া বেচে থাকবে। বেচে যাওয়অ কিড়াটি বিষ ধ্বংস কারী হবে। যদি কোন পুকুরে বড় বড় ব্যাংঙ জন্ম হয় এবং সেগুলো ঘ্যংগর ঘ্যংগর করতে থাকে তাহলে বলদের নাড়িভুরি সে পুকুরে ধৌত করে এর মাথা সে পুকুরে বেধে দিলে সমস্ত ব্যাঙ চলে যাবে।

গাভী সংক্রান্ত স্বপ্নের ব্যাখ্যা ঃ

কেউ যদি স্বপ্নে গাভী বা বলদ দেখে, এর তাবীর হবে, সময়ের ভিত্তিতে পরিবেশের উপর। যেমন হযরত ইউসুফ (আ.) এর তাবীর করেছিলেন। যদি মোটা তাজা দেখে তাহলে সবুজ শ্যামল বছর হবে। আর যদি হালকা পাতলা দুর্বল দেখে তাহলে দুর্ভিক্ষের বছর বলে ব্যাখ্যা করতে হবে। তবে শর্ত হল গাভী

বা বলদ সাদা কাল হওয়া শর্ত। অন্যথায় কেহ যদি হলুদ বা লাল রঙ্গের গাভী দেখে তাহলে এর ব্যাখ্যা হবে তার শিং দ্বারা বৃক্ষ উপড়ে ফেলবে। অথবা কোন দালান ধ্বংস করে দেবে। কেননা এ ধরনের গাভী বপর্যয়ের আকারে দেখা দেয়। যে স্থানে প্রবেশ করে সে স্থানকে ধ্বংস করে দেবে। কারণ নবী করিম (স.) এরশাদ ফরমান, শেষ যুগে ফিতনা ফ্যাসাদ বলদের শিং এবং চোখের মত প্রকাশ বসাবে। কেউ স্বপ্নে হলুদ রঙ্গের গাভী দেখল, তাহলে এর ব্যাখ্যা হবে সে বছরটি সবুজ শ্যামল ও সুখের হবে। আর যদি কাল এবং সাদ রঙ্গের গাভী দেখে তাহলে ব্যাখ্যা হবে বছরের শুরু থেকেই কঠিন অভাবের মোকাবেলা করতে হবে। কেহ গাভীর পেছনের অংগ চিত্রল দেখল, তাহলে ব্যাখ্যা হবে বছরের শেষে পেরেশানী বাড়বে। স্বপ্নে কেহ অর্ধেক গাভী দেখল- তাহলে এর ব্যাখ্যা হবে যে স্বপ্ন দ্রষ্টার বোন বা কন্যা কোন বিপদে নিপতিত হবে। এমনিভাবে কেহ যদি গাভীর নির্ধারিত অংশিদারিত্ব দেখে অর্থাৎ ৪ এর ১ অংশ ইত্যাদি তাহলে এর ও এই ব্যাখ্যাই হবে। কেহ স্বপ্নে দেখল যে, সে অন্যের গাভী দোহন করতেছে, এর ব্যাখ্যা হবে দ্রষ্টা কোন মহিলার সহিত বিশ্বাস ঘাতকতা করবে। যদি কেহ নিজের গাভীকে স্বপ্নে দেখে তাহলে, দ্রষ্ট তার স্ত্রী বা কন্যার সহিত অবস্থান করবে। স্বপ্নে দুধ দেখা হালাল মাল প্রাপ্তির আলামত । স্বপ্নে গাভীর আওয়াজ শ্রবন করা, কোন ভাল লোকের সম্মান করার লক্ষণ। স্বপ্নে গাভী দ্বারা আক্রান্ত হওয়া অসুস্থতার লক্ষণ। স্বপ্নে কেহ দেখল যে, গাভী বা বলদ তার উপর আক্রমন করেছে- আর দ্রষ্টা তার প্রতি মনোযোগ ছিলনা তবে এর ব্যাখ্যা হবে দ্রষ্টা এ বছরই মারা যাবে। কৃষক স্বপ্নে গাভী দেখলে ইন্নতির লক্ষন মনে করতে হবে। স্বপ্নে গাভীর ভুনা গোস্ত দেখা ভয় অনুভবকারীর জন্য নিরাপত্তার আলামত। অথবা গোস্ত ভুনাকারীর জন্য নিরাপত্তার আলামত । ভুনাকারি মহিলা হলে তার সুসংবাদ আছে যে সে পুত্র সন্তান প্রসব করবে। স্বপ্নে গোস্ত দেখা সুখী স্বাচ্ছন্দের জীবন হওয়ার লক্ষণ।

গরুর কাঁচা গোস্ত দেখলে মেয়ে লোকের পক্ষ থেকে দুঃখ পাওয়ার লক্ষন। কোন কোন ব্যাখ্যা কারক বলেছেন- গাভীর পাকানো বা ভুনা গোস্ত স্বপ্নে খেলে রিযিকে উন্নতির লক্ষন। স্বপ্নে কেহ দেখল যে, বলদ তাকে শিং দ্বারা আক্রমন করেছে- তাহলে এর ব্যাখ্যা হবে যে, কাজ থেকে তাকে তাড়িয়ে দেয়া হবে। যেভাবে তাকে শিং দ্বারা আঘাত করা হয়েছে এমনিভাবে তার মারাত্মক

ক্ষতি হবে। স্বপ্নে কেহ দেখল যে, সে বলদ জবাই করেছে এবং এর গোস্ত বন্টন করে দেয়া হয়েছে তাহলে দ্রষ্টা মারা যাবে বলে পুর্বাভাস।

কোন মহিলা স্বপ্ন দেখল যে সে বলদের উপর সওয়ার হয়েছে- তাহলে এর তাবীর হবে- মহিলা যদি স্বামী হীনা হয় তাহলে সত্বরই তার স্বামী হবে আর তার স্বামী থাকলে তার প্রতি তার স্বামী অনুগত হয়ে যাবে।

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি যেন একটি টিলার উপর দাড়িয়ে আছি। আর আমার চারপাশে গাভী, বলদ জবাই করা হচ্ছে। তিনি স্বপ্নটি মাসরূক এর নিকট জিজ্ঞেস করলে তিনি জবাব দিলেন, যদি আপনার স্বপ্ন সত্যি হয় তাহলে আপনার সামনে একটি ভয়াবহ যুদ্ধ হবে। আর হয়েছেও তাই। তিনি জঙ্গে জামাল দেখেছেন। স্বপ্নে কেহ দেখল যে গাভী তার বাছুরের দুধ পান করছে তাহলে এর ব্যাখ্যা হবে তার স্ত্রী অন্যের সহিত তার কন্যাকে খেয়ানত করার আহবান করছে। যদি কোন গোলামে এ স্বপ্ন দেখে যে সে তার মনিবের গাভীর দুধ দোহন করছে তাহলে এর ব্যাখ্যা হবে যে সে গোলাম তার মনিবের মেয়ের সহিত সম্পর্ক গড়ে তুলবে।

بقرو حشی
(৮১) নীল গাই

بقر وحشی নীল গাইকে বলা হয়। এটি চার প্রকার। (১) الـمها (২) ايل (৩) يحمور (৪) تيتل এগুলো প্রত্যেকেই গ্রীষ্মকালে পানি পেলে ইচ্ছামত পান করে। আর পানি না পেলে ধৈর্য ধারণ করে। তারা বতাস খেয়ে কৃচ্ছতা অবলম্বন করে। পানির প্রতি ধৈর্য ধারন করার গুন ভেড়া, বাগডাসা, লাল রঙ্গের জংলী গাধা, হরিণ, খরগোস ইত্যাদির মধ্যেও পরিলক্ষিত হয়। الـمهـــاء স্বাধারণতঃ অত্যন্ত যৌন ক্ষমতা সম্পন্ন হয়ে থাকে। এজন্য স্ত্রী مها গর্ভবতী হলে পেটের বাচ্চা নষ্ট হয়ে যাবার ভয়ে পুরুষ مها থেকে দূরে চলে যায়। مها এত যৌন লিপ্সু হয় যে সে কখনো কখনো পুরুষের উপর চটে যায়। এদের মধ্যে কোনটি যখন সঙ্গম করে তখন অন্য স্ত্রী مها মনীর দুগর্ন্ধে উশৃংখল হয়ে পড়ে।

নীল গাইয়ের বৈশিষ্ট হল, এর শিং ফোকলা থাকেনা। যেমন অন্য প্রাণীর শিং ফোঁকলা থাকে। নীল গাই গৃহ পালিত ছাগলের মত হয়ে থাকে। এর শিং এতই শক্ত যে, শিং দ্বারা এরা আত্মরক্ষা করে এবং রাতে আক্রমনকারী অন্যান্য

হিংস্র প্রাণী থেকে এদের শাবককে রক্ষা করে।

হাদীছ শরীফে নীল গাইয়ের আলোচনাঃ

নবী করিম (স.) যখন খালিদ বিন ওয়ালীদকে দাওমাতুল জুন্দুলের বিচারক আকিদুর এর নিকটপ্রেরণ করেন তখন নবী করিম (স.) বলেছিলেন- হে খালিদ আকিদুরকে তুমি নীল গাই শিকার করা অবস্থায় পাবে। সুতরাং জ্যোস্না রাতে খালেদ তার কাছে গেলেন আল্লাহ তায়ালা নীল গাইকে এই আদেশ করেছিলেন যে, তার চতুর্দিক থেকে এসে আকিদুরের প্রসাদে তাদের শিং দ্বারা ঘসতে থাকবে। আকিদুর নিচে ঝুকে দেখল যে, আজ রাতের ন্যায় এত নীল গাই কখনো আসেনি। নতুবা ইতিপূর্বে ২/৩ দিন পর্যন্ত নীল গাইয়ের জন্য ওঁত পেতে বসেছিলাম। কিন্তু কোন নীল গাই নজরে পড়লনা। আল্লাহ যা ইচ্ছে তাই করেন। এর পর আকিদুর ঘোড়ায় লাগাম লাগানোর আদেশ করে । আকিদুর ও তার ভাই হাচ্ছান ইভয়েই সওয়ার হল। আকিদুর স্বর্ণ খচিত আলখেল্লা পরিধান করল। আকিদুর যেমনি ময়দানে আগমত করল তেমনি নবী করিম (স.)এর ঘোরায় চড়ে খালিদ (রা.) ও আগমন করলেন। তাকে বন্দী করে তার আল খেল্লা সহ নবী করিম (স.) রে দরবারে এনে হাজির করলেন। আকিদুরের পোশাকটি নবী করিম (স.) এর কোন কোন সাহাবীর নিকট পছন্দ হল। নবী করিম (স.) এরশাদ ফরমান- ছায়াদের রুমালও বেহেস্তে এর চেয়ে বেশী মূল্যবান হবে।

অতঃপর নবী করিম (স.)আকিদুরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। সে তা অস্বীকার করল। অতঃপর তার কাছ থেকে জিযিয়া গ্রহণ করে তাকে ছেড়ে দিলেন। এ ঘটনাটি ঘটেছিল ৯ম হিঃ রজব মাসে। এই নীল গাইয়ের প্রশংসা করে بجيربن بجرة طائى বলেন-

تبارك سائق البقرات انى :: رائيت الله يهدى كل هاعى গাভীকে হাকানী কারী ভাগ্যবান। ঘটনা আমি অনুভব করছি যে, আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক পথ প্রদর্শককে পথ দেখাল।

فمن يك حائداعن ذى تبوك :: فانا قد امرنا بالجهاد

কে সে জন যে তবুক থেকে পৃথক হয়ে যায়- আমরা তো নিরেট সত্য জিহাদের আদেশ করেছি। (مهاء এর বিস্তারিত আলোচনা باب ميم এ আসবে)

নীল গায়ের শরয়ী হুকুমঃ

নীল গাই এবং যত প্রকার আছে- সর্ব সম্মতক্রমে এর গোস্ত খাওয়া জায়েজ। কেননা পবিত্র।

নীল গায়ের প্রবাদ ও উদাহরণ ঃ

আরববগণ বলেন- تتابعى بقر অর্থাৎ তুমি গাভীর পেছনে পড়ে গেছো। উদাহরণটি তখনই বলা হয় যখন কোন বিষয় অন্বেষণ বেং তথ্যানুসন্ধানে কোন ব্যক্তি পেরেশান হয়ে বলতে থাকে। একদা বশীর বিন হারিছ আসাদি সে বছর তার সম্প্রদায় পেরেশান ছিল। সে বছর সে তার সম্প্রদায়ের সহিত গিয়েছিল। কওম যখন গাভীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিল তখন গাভী ইতস্তত করে পাহাড়ের উপর গিয়ে দাড়াল । সুতরাং বশীর বিন হারিছ তীরের সাহায্যে একে হত্যা করে ফেল্ল। কিছুক্ষণ খোঁজা খুজির পর বশীর বল্ল, তোমরা গাভীর তালাশে হন্যে হয়ে ঘুরছ। আর আমি একে বধ করে ফেলেছি। অতঃপর বশীর বিন হারেস কওমের নিকট এসে গাভীর গোস্ত খেতে এদেরকে দাওয়াত করল।

চিকিৎসা ক্ষেত্রে নীল গাইয়ের উপকারিতাঃ

অর্ধাঙ্গ রোগের ক্ষেত্রে নীল গাইয়ের মগজ বেশ উপকারী। কেহ যদি তার সঙ্গে নীল গাইয়ের শিং রাখে তাহলে হিংস্রপ্রাণী তার কাছেও ঘেষবেনা। অনুরূপ কেহ যদি তার ঘরে নীল গাইয়ের শিং বা চামড়া অথবা খুড় দ্বারা ধুপ দেয় তাহলে সে ঘরে সাপ প্রবেশ করবে না। নীল গাইয়ের পশম দ্বারা ঘরে ধুপ দিলে ঘর থেকে ইদুর পোকামাকড় চলে যায়। কারো যদি প্রচন্ড জ্বর হয় তাহলে - নীল গাইয়ের শিং পুরে খাদ্যের সহিত মিশিয়ে খাইয়ে দিলে জ্বর ভাল হয় এর শিং পুরে পানীয় বস্তুর সহিত মিশ্রিত করে পান করলে যৌন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। অনুরূপ নাক দিয়ে রক্ত পড়া (নাকছির) রোগীর নাকে এর শিং পুড়ে দম করলে রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে যাবে। নীল গাইয়ের শিং এর ভস্ম শিরকায় মিশ্রিত করে সূর্যের দিকে মুখ করে ধবল শ্বেত আক্রান্ত স্থানে লাগালে আশাতীত ফল পাওয়া যায়। যদি কেহ এক মিসকাল পরিমান শিং নিয়ে কারে সাথে যুদ্ধ করে তাহলে বিজয়ী হবে। এর শিং যদি আঠার সহিত পুরিয়ে রক্ত বমি রোগীর উপর প্রয়োগ করা যায় তাহলে উপকার দর্শে।

স্বপ্নের ব্যাখ্যা ঃ

কেউ স্বপ্নে দেখল যে, সে নীল গাই হত্যা করেছে। কিন্তু শিকারের ইচ্ছা ছিলনা। তাহলে সে কোন মহিলার কাছ থেকে অনেক ধন-সম্পদ পাবে।

بقر الماء

(৮২) সামুদ্রিক গাভী

ইমাম কাযবিনী বলেন, মানুষের ধারনা হল যে পানি থেকে একটি গাভী বের হয়ে মাঠে চড়ে। তার লেদা নীল বর্ণের যা সুগন্ধী হয় তবে প্রকৃত ঘটনা আল্লাহ তায়ালাই ভাল জানেন। কারণ তার বলে আন্বার অর্থাৎ সমুদ্রের তলদেশ থেকে বের হয়। যদি তাদের এ কথা সঠিকই হয় তাহলে এই গাভীর লেদা ইন্দ্রীয়ানুভূতি এবং অন্তরের জন্য বিশেষ ফলপ্রদ।

বনী ইস্রাইলের গাভী ঃ

ام عويف—ام بقرة بين اسرائيل বা বনী ইস্রাইলের গাভীরক قيس ও বলা হয়। এটি দু শিং বিশিষ্ট একটি ক্ষুদ্র প্রাণী। যা বালিতে বসবাস করত । যদি আপনি একে কখনো দেখতে চান তাহলে যেখানে সে বসবাস করে সেখানে একটি উকুন বা পিপড়া নিক্ষেপ করে দিন সুতরাং দেখবেন সে খুব তাড়াতাড়ি বের হয়ে আসবে এবং তখন তাকে ধরা যাবে। অতঃপর যখন সে হাতে এসে যাবে কথন একে ধরে তার পিঠে সেলায় করে দিতে হবে। অতঃপর একে নিয়ম মত তিনবার সুরমা হিসেবে ব্যবহার করলে যার চোখ সাদা হয়ে গিয়েছে অর্থাৎ পর্দা পড়ে গিয়েছে এতে তার চোখ সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে যাবে এবং যেখানে চুল উঠে নাই এ প্রাণীটি সে স্থানে ঘর্ষনের কারণে চুল উঠে যাবে।

بق

(৮৩) ছারপোকা

জাওহারী বলেন بقة ছারপোকাকে বলে। এর বহুবছন بق

যফার বিন হারেছ কালাবী বলেন-

الاانماقيس بن عيلان بقة:: اذا وجدت ريح العصير تغنت

স্মরণ রেখো কায়স বিন আইলান মূলত ছারপোকা যে সময় সে আঙ্গুরের শিরার সুগন্ধি অনুভব করে তখন গান গায়। ছারপোকাকে فسافس ও বলে।

(এর আলোচনা ফা অধ্যায়ে করা হবে।)

কারো কারো গরম শ্বাস থেকে ছারপোকার জন্ম হয়। এটি মানুষের রক্তের প্রতি এতই আসক্ত যে, যেমন মানুষ একে সুগন্ধি মনে করে। তাই সে অতিদ্রুত চলে আসে। মিশর ও শিরিয়াতে ছারপোকা বেশী পাওয়া যায়।

ছারপাকার শরয়ী বিধান ঃ

দুর্গন্ধ যুক্ত হওয়ার কারণে ছারপোকার খাওয়া হারাম। যেমন হারাম মশা। ইমাম রাফেয়ী বলেন ছারপোকাতে যে রক্ত আছে তা মানুষের শরীর থেকে চোষা রক্ত। যেমন- উকুন, ছারপোকা ইত্যাদি হারাম পোকা রক্ত চোষে। ইমাম রাফেয়ী ও ইমাম নববী (রহ.) প্রমুখ মনিষীগণ বলেন- সমস্ত প্রাণীর রক্ত হয়না এগুলো ছারপোকাও মশার মধ্যে শামিল। ইমাম রাফেয়ী বলেন যে সমস্ত ছারপোকা আমাদের এলাকাতে পাওয়া যায় এগুলোও রক্তহীন প্রাণীর মধ্যে শামিল। আমি অনেক শহরে এমন রক্তহীন প্রাণী দেখেছি। এজন্য যারা এর আলোচনা করে তারা আসলে মশার কথাই বলেন ছারপোকার নয়

চিকিৎসা ক্ষেত্রে ছারপোকার উপকারিতা ঃ

ইমাম কাযবিনী (রহ.) বলেন ঘরে কালিজিরার ধোপ দিলে আর ছারপোকা থাকবেনা। হাইনুন বিন ইসহাক বলেন, কোন ঘরে যদি হুব্বে মাহলিব দ্বারা ধোপ দেয়া হয় তাহলে ঘর থেকে সমস্ত ছারপোকা দুর হয়ে যাবে এমনিভাবে কোন ঘরে যদি এটেল মাটি ও হাতির দাত দ্বারা বা হহিষের চামড়া বা সাইপ্রাছ বৃক্ষের ডালের সহিত একত্রিত করে ধোপ দিলেও তা থাকবে না। কেহ কেহ বলেছেন- কালজিরার পাতায় শিরকা শিশ্রিত করে ঘরে ছিটালে ছারপোকা বিদুরীত হয়।

ছারপোকা থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় ঃ

ইবনে জামি' লিখেছেন- চারটি কাগজে নিম্নের নকশা লিখে ঘরের চার দেয়ালে লাগিয়ে দিলে ঘর থেকে ছারপোকা চলে যাবে।

নকশা এই ١١١٢١٢ এটি পরীক্ষিত আমল।

হাদীসে ছারপোকার আলোচনা ঃ

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন - আমার এই

দুকান শুনেছে এবং এই চোখ দুটি নবী করিম (স.) কে দেখেছে তিনি (স.) তার উভয় হাতে হযতে হাসান ও হোসাইন (রা.) কে ধরেছেন এবং তাদের দু'পা নবী কমিে (স.) এর কদম মোবারক এর উপরে রেখেছেন। নবী করিম (স.) (অত্যন্ত মহব্বত করে) তাদের বলতেন এবং ছোট ছোট পা দিয়ে উপরে উঠ। ছারপোকার চোক তখন সে বাচ্চা নবী করিম (স.) এর উপরে আরোহন করতেন। এবং তাঁর পা নবী করিম (স.) এর ছিনা মোবারকে রাখতেন। অতঃপর নবী করিম (স.) বল্লেন মুখ খোল- অথঃপর নবী করিম (স.) তাকে চুম্বন করলেন এবং বল্লেন হে আল্লাহ! কে তাকে মহব্বত করবেনা? আমি যেহেতু তাকে মহাব্বত করি। বাজ্জার ও অনুরূপ শব্দে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। ইমাম দামিরী (রহ.) বলেন ছোট ছোট কদমে চলাকে خزق বলে।

মুহাম্মদ বিন আলী বিন মোহাম্মদ (রা.) এর জীবনীতে লেখা হয়েছে যে, اصبغ بن نباتته حنظلى বলেন, আমি হযরত আলী বিন আবু তালিবকে খুৎবাহ দিতে শুনেছি- তিনি বলতেছিলেন, আদমের সন্তান ছারপোকা থেকেও অধিক কষ্ট দেয়। তার ঘামই তাকে দুর্গন্ধময় করে দেয় । দম আটকে গিয়ে তাকে ধ্বংস করে দেয়। اصبغ بن نباتته حنظلى হযরত আলী (রা.) থেকে এমন সব শূল্যবান কথা লিখেছেন- যা অন্যকেহ লিখে নাই। এজন্য তার বর্ণিত কথাগুলো অত্যন্ত মূল্যবান ও নির্ভরযোগ্য। উক্ত রাবী থেকে ইবনে মাজাহ মাত্র একটি হাদীছ বর্ণনা করেছেন- তাহল

نزل جبرئيل على النبى صلى الله عليه وسلم بحجامة الاخد عين والكامل

প্রবাদ ও উদাহরণ ঃ

আরববগণ বলেন فلان اضعفمن بقة অমুক ব্যক্তি ছারপোকা থেকেও অধিক দুর্বল।

ছারপোকা সংক্রান্ত স্বপ্নের ব্যাখ্যাঃ

ছারপেকা স্বপ্নে দেখলে নারী, দর্বল দুশমনের রূপ ধরে আগমন করে। ইহা এমন একটি ঝাঁক যাদের কাছে কোন প্রকার বিশ্বাস আশা করা যায়না । আবার এরা শক্তিশালী ও বলবান নয়। আবার কোন কোন সময় বিষন্নতা ও বিমর্ষতা ইত্যাদিরও ব্যাখ্যা করা হয়। কারণ ছারপোকা ঘুমাতে দেয়না। আর চিন্ত ক্লোশ ইত্যাদির অবস্থাও তাই, যে বিমর্ষতার সময় নিদ্রা আসেনা ছারপোকা ও

মশা ঘর থেকে বের হতে দেখলে তার ঘরে বসবাস কারীদের মৃত্যুর কারণে অন্যত্র চলে যাওয়ার ইঙ্গিত । কেহ যদি ছারপোকা বা মশা নিজ স্থানে দেখে তাহলে এর ব্যাক্য হবে সে স্থানে বসবাসকারীর গোত্রের শাখা-প্রশাখা অসংখ্য থাকবে।

بكر

(৮৪) জোয়ান উট

জোয়ান উটকে بكر বলা। জোয়ান উটনীকে ة بكر বলে। এর বহু বচন بكار হয়। যেমন-فرخ (পাখীর ছানা) এর বহুবচন فراخ আসে। কখনো কখনো ابكر جمع قلت আসে।

হযরত আবু উবায়দাহ (রা.)বলেন জোয়ান উটের বেলায় بكر যুবক মানুষের বেলায় فتى জোয়ান উটনীকে بكرة এবং যুবতী মহিলাকে فتاة বলে। قلوص শব্দটি ও উটের বেলায় প্রযোজ্য। কিন্তু উটের এ সমস্ত নামের মধ্যে পার্থক্য আছে। যেমন قلوص শব্দ ুটের জন্য দাসীর স্থানে بعير উটের জন্য انسانএর স্থানে جمل উটের জন্য পুরুষের স্থানে ناقة উটের জন্য মহিলার স্থানে বলা হয়। হযরত আবু রাফে (রাহ.) বলেন- নবী করিম (স.) এক লোকের কাছ থেকে একটি জোয়ান উট কর্জ গ্রহণ করেন। যখন নবী করিম (স.) এর নিকট ছদকার উট আসল তখন তিনি জোয়ান উটই আদায় করার জন্য- আমাকে আদেশ করেন। আমি আরজ করলাম এতে তো শুধু সে ভাল উটই রয়েছে যার দুধের দাতগুলো পড়ে গিয়েছে। তখন নবী করিম (স.) আমাকে বল্লন ইহাই দিয়ে দাও কেননা-- (ভল উট) আদায় করাই উত্তম আদায়। ইরবায বিন ছারিয়া বলেন- আমি নবী করিম (স.) এর নিকট জোয়ান উট বিক্রী করেছি। এরপর তাগিদ করার আরজীতে নবী করিম (স.) এর নিকট হাজির হলাম এাবং বল্লাম হে আল্লাহর নবী! এই জওয়ানের মূল্য আদায় করে দিন। নবী করিম (স.) বল্লেন হাঁ আদায় করা হবে এবং ভাল করেই আদায় করার কথা বল্লেন। এরপর এক বেদুইন আসল এবং বলতে লাগল। হে আল্লাহর নবী (স.) আমর بكر দিয়ে দিন। তখন নবী করিম (স.) তাকে কাজের উটটি দিয়ে দিলেন। এতে সে লোকটি আসল যে, ইহাতো আমার সেই জোয়ান উট থেকেও উত্তর। তখন নবী করিম (স.) বল্লেন ইহা তোমারই থাকবে। অতঃপর তিনি বল্লেন গোত্রের মধ্যে

সেই লোকই উত্তম যে লেনদেন ভাল করে।

হযরত আব্দুল্লহ বিন আব্বাস (রা.) বলেন, নবী করিম (স.) হজ্জের উদ্দেশ্যে বের হলেন। তিনি যখন وادى عسفان নামক স্থানে পৌছলেন তখন হযরত ওমরকে (রা.) নবী করিম (স.) বল্লেন, হে ওমর! তুমি কি জান যে তা وادى عسفان? হযরত ওমর (রা.) বল্লেন জি জনাব আমি তা জানি। তখন নবী করিম (স.) বল্লেন ইই উপত্তকায় হযরত নূহ (আ.) হযরত হুদ (আ.) এবং হযরত ইব্রাহীম (আ.) প্রমূখ জোয়ান উটে আরোহন করে অতিক্রম করেছেন। তাদের গাধা ছিল- যাদের উপর খালি গধিদ ও এক গুচ্ছ পশম ছিল এবং তাদের লুঙ্গি ও আচকান ছিল। এবং চাদরের স্থানে তা খাল হিসাবে ব্যবহার করতেছিলেন। শিরীন বিন মা,বাদ জুহানী থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ফতেহ মক্কার দিন আমি নবী করিম (স.) এর সাথে ছিলাম। নবী করিম (স.) আমাদের মু'তা (শর্ত সাপেক্ষে স্বল্পকালীন সময়ের জন্য) বিয়ের অনুমতি দেন। সুতরাং আমি এবং আমর সঙ্গী অপর একজন বনু আমের গোত্রের এক মহিলার কাছে গেলাম। মহিলাটি "بكرة عيطاء" অর্থাৎ মহিলাটি মাঝারি গড়নের লম্বা গর্দান বিশিষ্ট এক যুবতি ছিল। আমরা মহিলার পাশে গেলাম। হমিলাটি বল্ল তোমরা আমাকে কি দিবে? আমি বল্লাম চাদর। আমার সঙ্গীটিও চাদরের কথাই বল্ল। আমর সাথীর চাদরটি আমার চাদরের চেয়ে ভাল ছিল; আমি ছিলাম তারচেয়ে কম বয়সের নওজোয়ান। এখন মহিলাটি যখন তার চাদরের দিকে তাকায় তখন তাইে ভাল মনে করে পক্ষান্তরে সে যখন আমর দিকে তাকায় তখন তার দৃষ্টিতে আমিই ভাল বলে মনে করি। মোট কথা সে বল্ল তুমিও তোমার চাদরই আমার জন্য যথেষ্ট । এর পর তিন দিন আমি তার সহিত যাপন করলাম। এরপর নবী করিম (স.) ঘোষণা করলেন যে, যার কাছে মু'তা স্ত্রী আছে সে যেন তাকে পৃথক করে দেয়। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে যে, এখন আমার মুতা'র সময় সীমা অতিক্রম করেনি- এহন মুহুর্তেই তা হারাম ঘোষণা করা হল। (মুসলিম) হযরত আবু হোরায়রা (রা.) বলেন- এক বেদুইন নবী করিম (স.) কে একটি উট উপহার দেয়। তখন নবী করিম (স.) এর বদলে ৬টি জোয়ান উট উপহার দেন। এতে সে গ্রাম্য লোকটি অসন্তুষ্ট হল ।

নবী করিম (স.) এর সংবাদ পাওয়ার পর আল্লাহর গুনগান করলেন এবং বললেন, অমুক ব্যক্তি আমাকে একটি জোয়ান উট হাদিয়া দেয়। এর

পরিবর্তে আমি তাকে ৬টি উট উপহার প্রদান করি। কিন্তু এত সে অসন্তুষ্ট হয়ে যায়। এখন আমি উচ্ছা করেছি যে, قرشی আনসার, ছাকাফী এবং دوسی ব্যতীত অন্য কারো হাদীয়া প্রহণ করবনা।

হযরত আলী (রা.) এর হাদীছে আছেঃ

"صدقنی سن بکرۃ" আরবগণ এ বাক্যকে সত্য সংবাদ দাতার জন্য উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করে থাকে।

বিদ্যান ব্যক্তিদের কথা হলো একজন লোক অন্যজনের কাছ থেকে জোয়ান উট ক্রয় করার জন্য দর কষাকষি করছিল। ক্রেতা বিক্রেতার নিকট উটের বয়স জিজ্ঞেস করলে বিক্রেতা সত্য সত্য বলে দিল। খরিদদার তখন বল্ল صدقنی سن بکرۃ (অর্থাৎ সে আমাকে তার জোয়ান উটের বয়স একদম সত্য বর্ণনা করল)

হযরত উসমান (রা.) এর চাকর বলেন, একদা আম গ্রীষ্ম মৌসুমে আমার মুনিব হযরত ইসমান (রা.) এর সাথে ছিলাম। হঠাৎ করে আমার মুনিব দেখতে পেলেন এক লোক তার দুট জোয়ান উট হাকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আর সে গরমের মধ্যে যমীনে বিছানার মত চিল্লাতে চিল্লাতে চলে যাচ্ছে।

এ অবস্থা দেখে তিনি বল্লেন- লোকটির কি হল? সে যদি মদীনাতে আরাম করে চলাফেরা করত তাহলে তার কি হয়ে তে? ততক্ষনে লোকটি কাছাকাছি হয়ে গেল। হযরত ওসমান(রা.) বল্লেন দেখোতো কে ? সুতরাং দেকলাম যে তিনি খলিফা হযরত ওমর (রা.)। আমি আমার মুনিব হযরত ওসমান (রা.) কে বল্লাম জনাব তিনি তো খলিফা হযরত ওমর (রা.)

একথা শুনে হযরত ওসমান দাড়িয়ে গেলেন এবং মাথা দরজা দিয়ে বের করে দেখলেন তখন তিনি বুঝতে পারলেন ওমর গ্রীস্মের লু হাওয়ায় ঝলসে যাচ্ছেন। অতঃপর ২য় বার যখন তিনি মাথা বের করলেন তখন উভয়ে সামনা সামনি হয়ে গেলেন। হযরত ওসমান বল্লেন এ মুহূর্তে আপনার কি তাড়া ছিল?

একথা শুনে হযরত ওমর (রা.) বল্লেন এই দুটি জোয়ান উট ছদকার ছিল! যা পেছনে পড়ে গিয়েছিল। আর ছদকার উটের বাথান চলে যাচ্ছিল । সময়টাকে আমি উপযুক্ত মনে করলাম যে এদেরকে আমি বাথান পর্যন্ত পৌছে দেই।এমন না হোক যে এই দুই জোয়ান উট হারিয়ে যায়। অতঃপর কিয়ামতের

দিন আল্লাহ পাক আমাকে প্রশ্ন করে বসবেন। অতঃপর হযরত ওসমান (রা.) বল্লেন ঠিক আছে আপনি পানি পান করার জন্য এবং কিছুক্ষণ স্বস্থির থাকার জন্য এখানে চলে আসুন। হযরত ওমর (রা.) বল্লেন আপনি আপনার ছায়ার ব্যবস্থা করুন । হযরত ওমর (রা.) জবাব দিলেন না ভাই আপনারই শীতল জায়গা মোবারক হোক । একথা বলে ওমর (রা.) চলে গেলেন। এহেন ব্যবহার দেখে মুনিব ওসমান (রা.) বল্লেন যদি কেহ কোন স্যাববেচক ও ধৈর্য শীল ব্যক্তিকে দেখার ইচ্ছা করে সে যেন তাকে দেখে নয়। (মাসনাদে শাফেয়ী)

প্রবাদ বাক্য ঃ

(১) جائت هوازن على بكرة ابيها হাদীছে রয়েছে:

হাওয়াজিন গোত্রের সমস্ত মানুষ চলে এলো। পেছনে আর কেহ অবশিষ্ট রইলনা। (এখানে بكرة বলা হয়েছে মানুসের দলকে) তার অর্থ হল তারা সবাই বাপ-দাদা ও গোষ্ঠি শুদ্ধ চলে এলো। মুলতঃ এখানে তাদের স্বল্পতা ও দুর্বলতাই বর্ণনা করা হয়েছে।

(২) جاء اعلى بكرة ابيهم -আরবগণ তাও বলেন-

"তারা সকলেই চলে এলো। কেউই অবশিষ্ট রইলনা।"

অর্থাৎ সবাইকেই হত্যা করা হল। এই বাক্য তাদের জন্যও প্রযোজ্য যারা দলবেধে চলে এলো হযরত আবু ওবায়দা তাও বলেছেন- এ প্রবাদের অর্থ হল যে তারা সব চলে এল কেউ বাকী রইলনা। প্রকৃত পক্ষে এখানে জোওয়ান উট উদ্দেশ্য না। কেউ কেউ বলেছেন এখানে بكرة এর অর্থ যার কাছে কোন কিছু চাওয়ার জন্য আসে। তখন এর অর্থ হবে তার সবাই কারো কারো পরে এসছে । যেমন উট একই প্রশস্ত রাস্তায় আসে।

কেউ কেউ বলেছেন এখানে بكرة এর অর্থ প্রশস্ত রাস্তা। অর্থাৎ তার সবাই তাদের বাপ -দাদার পদাংক অনুস্বরন করে এসেছে। কেউ বলেছেন বাক্যটি অপবাদ। স্বল্পতা এবং অপদস্ত স্থানে বলা হয়ে থাকে। তখন এর উদ্দেশ্য হবে- এদের সওয়ারীর জন্য কেটি মাত্র উটই যথেষ্ট। প্রাবাদে বাপের আলোচনা অপমান এবং অপদস্ত এর জন্য ব্যবহৃত।

بلبل

(৮৫) বুলবুলি

উভয় باء পেশ এবং উভয় ل এ সাকীন। بلبل ـ عصفور ـ گوريا ও چڑا এর কাছাকাছি একটি পাখী- একে جميل বলা হয়। بلبلএর অপর নাম نغر এর বিস্তাতি আলোচনা পরে আসবে। কোন কোন কবি চিত্তাকর্ষক কবিতা বলেছেন যেমন-

ماطائر نصفه كله :: له فى ذوى الروح سير ولبث

কতইনা সুন্দর পাখী যার অর্ধেকটাই পূর্ণ আর যার চলাচল উঠান এবং তার পড়শীদের মাঝেই।

رأينا ثلاثة ارباعه :: اذاصحفوها عذت وهى ثلاث

আমি তার তিন চতুর্থাংশ দেখেছি এবং সে যখন এসমস্ত একত্র করে তখন মাত্র এক তৃতীয়াংশ হয়ে যায়।

আলী বিন মুজাফফর আবুল ফজল আমদী যিনি মধ্য শহরের কাজী ছিলেন তিনি উত্তম কবিতা বলেছেন-

واهاله زكر الحمى فتاوها:: ودعابه داعى الصبافتولها

তার উপর বড়ই অনুসূচনা হয় যখন তার সম্মুখে ছুতারের আলোচনা হয়। তখন হায় হায় করে আর যখন আহবানকারী তার উপস্থিতির জন্য ভালবাসার আহবান করে তখন তার পিছু ধরে।

هاجت بلا بنه البلابل فامثنت:: الشجالة تشنى عن ال حلم النهى

এদের বুলবুলি যখন অন্য বুলবুলির বদনাম করে এবং তার চিন্তা ক্লিষ্টতাকে ধৈর্যের মাধ্যমে সরিয়ে দিয়ে এ থেকে নিষেধ করে।

فشكا جوى وبكا اسىٰ وتنبه :: وجد القديم ولم ينزل منبها

নিপতিত প্রেমজ্বালার বদনাম করে এবং চিন্তাশ্রু বর্ষন করল- প্রাক্ত ভালবাসার মধ্যস্থাতা এবং সে কথার হুশিয়ারী দিতে লাগল।

لاتكرهوه على السل فكالم:: حمل الغرام فكيف يسلومكرها

তুমি তাকে ভুলে যেতে বাধ্য করোনা কেননা কখনো সে ভালবাসার

রোগে রোগাক্রান্ত হয়ে যায় তাহলে আবার কি করে কঠিনত্বকে ভুলা যায়?

لاعتب يا سعدى عليك فسامحى:: وصلى فقد بلغ السقام المنتهى

ও সম্মানী ! তোমার সহিত কোন বৈরীতা বা অসন্তুষ্টি নেই তুমি ক্ষমা ও দয়া কর এবং এড়িয়ে যাও আর সাক্ষাৎ দাও। কোননা রোগ চূড়ান্ত পর্যন্ত রৌছেছে।

ইউসুফ বিন লুলু কতইনা উত্তম কবিতা গেয়েছেন-

باكرالى الروضة تستجلها :: فثغر ها ى الصباح بسام

সে সকাল বেলা ভ্রমন করে বাগানের দিকে। একে সজ্জিত করনের জন্য বের হয় তখন সকাল সকাল তার চেহারা মুছকি হাসি হাসছিল।

والنرجس الغض اعتراه الحيا:: ففض طرفافيه اسقام

মনে হয় সে সদ্য ফোট নাগিস যা থেকে লজ্জার পর্দা ঢেকে রাখা হয়েছে। সে তার দৃষ্টি নিম্নগামী করে রেখেছে কিন্তু তার দৃষ্টিতে খাদ ছিল।

وبلبل الروح فصيح على:: الايكة والسحر ورتمتام

ঘন বৃক্ষের বুলবুলি ঘন বৃক্ষে গাইছে- অগানের পাখীরা গাইছে।

ونسمة الصبح على ضعفها:: لها بنامرد المام

সকাল বেলার মৃদু মন্দ বাতাস যদিও হালকা কিন্তু সে আমার কাছ দিয়ে অতিক্রম করে এবং আমার দিকে তার লক্ষ ও আছে।

فعاطنى الصهباء مشمولة:: عذراء فالو شون نوام

শীতল শরবত সে কুমারীর জন্য আমার গর্দান লম্বা করল কেননা অন্য প ্রহরি ভয়ে রয়েছে।

واكتم احاديث الهوى بيننا :: فضى خلال الروض نمام

আর তার মাঝখানে আসতেছে। মহব্বতের কথা গুলো গোপন করছে। কেননা এ বাগানে কথা প্রকাশকারী চোগল খোরও আছে।

سقى الله ارضانور وجهك شمسها:: وحيا بلادا انت فى افقها بدر

আল্লাহ পাক যমীনকে তৃপ্ত করেছেন। তোমার চেহারার নূর তার সূর্য এবং যমীনকে জীবিত করেছেন তাহলে তুমি সেই দিগন্তে পূর্ণ শশী।

وروى بقاعاجود كفك غيثها:: ففى كل قطر من نداك بها قطر

আর সে এ ভূ-খন্ডেকে প্লাবিত করেছে। তখন তোমার হাতের দান তার বৃষ্টি। শুলকতা, তোমার পর্দা সামান্য হলেও বড়।

تسلسل دمعى وهى لا شك مطلقاً:: وصح حقيقا حين قالوا تكسؤا

আমর অশ্রু বেয়ে পড়ে নিসন্দেহে তা প্রবাহিত। আর নিসন্দেহে লোকেরা এই ব্যাখ্যা করে যে , একটি সন্ধি ছিল তা ছেঙ্গে গিয়েছে।

وفى قلب مائى للقلوب سرة :: وقالوا سيجزى بالهنا وكذا جرى

এবং আমর নম্র অন্তর অন্যের জন্য খুশীর কারণ, লোকেরা একথা বল্ল যে, অচিরেই ব্যবস্থাপনা অতি সুন্দর হবে আর তাই হল।

بعينى رأيت الماء القى بنفسه:: على رأسه من شاهق فتكسرا

আমি স্বচক্ষে দেখেছি যে, পানি উপর থেকে তার মাথায় ঢালা হয়েছে তখন তা ভেঙ্গে গে।

وقام على اثر التكسؤ جاريا :: الافاعجبوا ممن تكيؤ قدجرى

ভেঙ্গে যাবার পরও আবার প্রবাহিত হয়ে গেল। এতে লোকেরা অত্যন্ত বিস্মিত হল (যেখান থেকে ভেঙ্গে ছিল সেখান থেকেই প্রবাহিত হল।

انفقت كنز مداا تحى فى ثغره :: وجمعت فيه كل معنى شارد

আমি আমার ধন ভান্ডারের সমস্ত ধন সম্পদই তার চেহারার প্রশংসায় ব্যয় করে দিলাম। এবং এর ভিতর সমস্ত বিদ্বেষ পোষনকারীকে একত্র করে ফেললাম।

وطلبت منه جراه ذلك قبلة:: فابى وراح تغزلى فى البارد

আর আমি যখন এর বিনিময়ে একটিচুম্বন আশা করলাম তখন সে তা অস্বীকার করল এবং ঠান্ডা এলাকায় গজল গাইতে আরম্ভ করল ।

আরবগণ বলে البلبل يعندل অর্থাৎ বুলবুলি কথা বলছে।

মালেক বিন দিনার বলেন একদা হযরত সুলায়মান একটি বুলবুলি পাখীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। পাখিটি ডালে ডাকছিল। তা দেখে তিনি তার সাথী বর্গকে বল্লেন- তোমরা কি জান এ বুলবুলি কি বলছে? তারা জবাব দিল আমরা

তা জানিনা- তিনি বল্লেন যে পাখীটি বলছে আমি অনেক খেজুর খেয়েছি। অতঃপর দুনিয়া একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে।

وكاين من دابة لا تحمل رزقها

আয়াতের তাফসীরে ইমাম যামাখশারী (রহ.) বলেন- বুলবুলিও তাদের রিযিক মওজুদ করে।

ইমাম মালেক (রহ.) এর প্রতি একটি প্রশ্ন ঃ

ইমাম বুয়াতী ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর বরাতে লিখেছেন যে, তিনি বলেন বাল্য কালে আমি হযরত মালেক বিন আনাসের (রা.) এর সভায় বসা ছিলাম। একজন লোক ইমাম মালেকের দরবারে একটি প্রশ্ন করার জন্য আসল। লোকটি প্রশ্ন করল আমি তিন তালাকের কছম করলাম- যদি সে বুলবুলির মত চিল্লা বিল্লি বন্ধ না করে । ইমাম মালেক বল্লেন- তুমি গোনাহ্ গার হবে। এতেই প্রশ্নকারী চলে গেল। কিছুক্ষন পর ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ইমাম মালেকের অন্যান্য শিক্ষার্থীদের দিকে মনোযোগ দেন। তিনি বল্লেন- যুবকটি ভুল করেছে। সুতরাং এই কথার সংবাদ ইমাম মালেককে দাও যে ইমাম শাফেয়ী এই বলেছেন। ইমাম মালেক (রহ.) অত্যন্ত প্রভাবী লোক ছিলেন । এমনকি তার বৈঠকে কোন মানুষ কোন কথাই বলতে সহস করত না। কখনে কখনো নগর রক্ষক আসতেন ইমাম সাহেবের মজলিশে পিনপতন রিবতায় কতোয়াল কোন কথা বলতে সাহস পেতেন না । ঠাই দাড়িয়ে থাকতেন। ছাত্ররা বলল জনাব এই ছেলেটি বলছে এই যুবক ভুল করছে। ইমাম মালেক বল্লেন- কিভাবে তুমি তা বল্লে? ইমাম শাফেয়ী বল্লেন, আপনি নবী করিম (স.) এর হাদীছ যা ফাতেমা বিনতে কয়েসের ঘটনায় আমাদের থেকে বর্ণনা করা হয় নাই যে, ফাতেমা নবী করিম (.) এর কাছে বল্ল যে, আবু জাহাম ও মুয়াবিয়া আমার বিয়ে প্রস্তাব দিয়েছে। নবী করিম (স.) তখন এরশাদ ফরমান যে, আবু জাহামের লাঠি কাঁধ থেকে নীছে নামেনা আর মুয়াবিয়া সেতো ফকীর তার কাছে কোন মাল নেই। আবু জাহামের লাঠি কি চিরজীবনই তার কাধে ছিল? বরং নবী করিম (স.) এর উদ্দেশ্য অধিকাংশ সময়ের প্রতি ছিল। একথা শুনে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, যখন আমি মদীনা মুনাওয়ারা যাবার ইচ্ছা করলাম- তখন আমি ইমাম মালেক (রহ.) এর কাছে আসলাম। আমি চলে যেতে থাকলে ইমাম মালেক বলেন- ওহে

বৎস আল্লাহকে ভয় কর। আর তোমাকে আল্লাহ যে ইলমের আলো প্রদান করেছেন এগুলোকে পাপের কারণ বানিও না।

আল্লাহ তায়ালার বাণী

ومن لم يجعل الله له نورا فماله نور .(النور)

ইলমের আলো থেকে আল্লাহ যাকে বঞ্চিত রেখেছেন তার হেদায়েতের আলো কোথাও মিলবেনা। এই ঘটনার মধ্যে বুলবুলির আলোচনা আছে কিন্তু অন্য পন্থায় যে আলোচনা হয়েছে সেখানে শকুনের আলোচনা করা হয়েছে। বিস্তারিত পরে আসবে।

চিকিৎসা ক্ষেত্রে বুলবুলির উপকারিতা ঃ

ভারত উপমহাদেশে দু' প্রকার বুলবুলি পাওয়া যায়। একটি পাহাড়ী অপরটি মরুচারী। পাহাড়ী বুলবুলির তুলনায় মরুচারী বুলবুলি সুন্দর ও আকৃতি মনোরমের হয়। বুলবুলির ডিম ও মগজ যৌন শক্তির জন্য বেশ উপকারী। এর বীর্য চামড়ার চিহ্নকে প্রকাশ করতে সহায়ক এবং চেহারার কালিত্ব দূর করে । তার বীর্য চুল পড়ার জন বেশ উপকারী । এর ডিম গর্ভ পাত নিরুধে অত্যন্ত ফলপ্রদ। বুলবুলির পাখার ছাই ভস্ম ক্ষত স্থানের জন্য বেশ উপকারী। বুলবুলির গরম রক্ত শ্বাস প্রশ্বাসের জন্য এবং ফুস ফুস যন্ত্রের পরিস্কারের জন্য উপকারী।

স্বপ্নের ব্যাখ্যা ঃ

স্বপ্নে বুলবুলি পাখী দেখা ধনি হওয়ার লক্ষণ।

بُلَيْ

(৮৬) শকুনের চেয়ে সামান্য বড় পাখী বিশেষ

ইবনে ছাইদাহ বলেন بُلَيْ সাদা -কাল রং এর শকুনের চয়ে বড় এক ধরনের পাখী। এর পালক ছাই রং এর হয়ে থাকে। এই পাখীর পালক যদি অন্য কোন পাখীর পলকের মধ্যে পড়ে যায় তাহলে ভীতিময় করে তুলে। কেউ কেউ বলেছেন بلي বলা হয় বৃদ্ধ এবং পুরাতন শকুনকে। এর বহু বচন بُلْحَان হয়।

بلشون

(৮৭) বক

এর বিস্তারিত আলোচনা মীম অধ্যায়ে করা হবে।

بُلّصوص

(৮৮) পাখী বিশেষ

بـلـصوص এর বহুবচন খেলাফেকিয়াস বা অনিয়মতান্ত্রিক بـلـنـصـى আসে। ইমাম ছুয়ুবী (রহ.) বলেন এর বহুবচনে نـــــــون অতিরিক্ত কারণ একবচনের জন্য بلصوص এবং সাধারণ লোক ابولصيص বলে। বিতলিউনী বলেন- এ শব্দটির এক বচন কোনটি আর বহুবচন কেআনটি তা চেনার কোন নিম নীতি নেই। তাই কেহ বলেন بلصوص ই একবচন এবং بلنص বহু বচন। আবার কেহ এর বিপরীত বলেছেন। ইমাম দামিরী (রহ.) বলেন এই পাখিটির শরয়ী হুকুম সম্পর্কে আমি অবগত নই।

بنات الماء

(৮৯) সামুদ্রিক বালিকা

ইবনে আবুল আশয়াস বলেন بـنـات الـمـاء রোম সাগরে এক প্রকার মাছকে বলা হয়। মাছগুলো মহিলাদের আকৃতি সম্পন্ন। এদের চুল সোজা হয় এবং বাদামী রং এর। এদের লজ্জাস্থান ও বড় বড় স্তন হয়। এরা কথা বলে- তবে কিছুই বুঝা যায় না। তারা হা হা করে হাসে, কখনো কখনো নাবিকরা এদেরকে ধরে সহবাস করে। পরে সমুদ্রে ছেড়ে দেয়। রুইয়ানী বলেন- এক লোক এ ধরনের মৎস স্বীকার করে বাদশাহর দরবারে নিয়ে এল। তখন তার কথা কিছু বুঝ যাচ্ছিল না। লোকটি তাকে বিয়ে করল। তার ঘরে একটি সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। সন্তানটি তার পিতা মাতার কথা বুঝত।

بنات وردان

(৯০) গোবরে পোকা

এর আলোচনা ওয়াও অধ্যায়ে করা হবে ইনশাআল্লাহ।

بهار

(৯১) সাদা রঙ্গের মাছ

بـهـار সাদা ধরনের সামুদ্রিক মাছ। জাওহারী বলেন -بـهـار তিন শত রতলের একটি বাটখারা।

হযরত আমর বিন আস (রা.) বলেন। তালহা বিন উবায়দুল্লাহ যাকে أبن

الصبيه বলে তিনি ইন্তেকালের সময় ১০০ بهار রেখে গিয়েছিলেন। আর প্রতিটি بهـــار এ তিন কিন্তার (প্রতি কিন্তারে একশত রতল হয়) স্বর্ন ছিল। সুতরাং তাতে কেটি পিয়ালা বানানো হয়েছিল। আবু ওবাইদ ইবনে কাসিম ইবনে সালাম বলেন- আরবী ভাষায় بهـــار বলা হয় ৩০০ রতলকে । আমার ধারনা بهـــار আরবে হয়না বরং তা হয় قبطه গোত্রে।

بهثة

(৯২) নীল গাই

এর আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে।

بهرمان

(৯৩) চড়ুই পাখীর পাখী বিশেষ

ইবনে সাইদাহ বলেন بهرمان চড়ুই পাখীর মত একটি পাখী।

بهمة

(৯৪) গাভী, ভেড়া, বকরীর বাচ্চা

بهـــمة বলা হয় গাভী, ভেড়া, বকরী ইত্যাদির শাবককে। এর বহু বচন بُهَم- بُهُم এবং بَهَا مَات

ইমাম আযহারী বলেন- বকরী বা ভেড়ার বাচ্চা স্ত্রী পুরুষ যাই হোক ন কেন এদেরকে سخله (سخال) বলা হয়। অতঃপর কিছুদিন পরই بهمه বলে। যদি বকরীর বচ্চা ৪ মাসের হয় এবং তার মা থেকে পৃথক হয়ে যায় তাহলে তাকে جفار বলে। ঘাস খেয়ে যখন আরো একটু বড় ও মোটা তাজা হয় তখন একে عريض এবং عتود বলে। কারো মতে একে جدى ও বলে। কিন্তু এক বছর না হলে একে عنـــاق বলে। শাবক যদি নর হয়ে এক বছর হয় তাহলে একে تيـــس বলে। আর নারী বাচ্চাকে غـــز বলে। অতঃপর ২ বছর হওয়ার কারণে নর বাচ্চাকে جذع এবং স্ত্রী বাচ্চাকে جذعه বলা হয় । ইমাম আযহারী বলেন যে, এই আলোচনা দ্বারা বুঝা যায় عنـــاقএর ব্যাপারে ইমাম নববী যে আলোচন করেছেন এতে কিছু অতি বঞ্চিত হয়েছে। (والله اعلم)

লক্বীত ইবনে সুবরা বলেন, আমি বনি মুনতাফিক এর পক্ষ থেকে আগমনকারী প্রতিনিধি দলের সহিত নবী করিম (স.) এর কাছে আসতেছিলাম ।

আমরা যখন নবী করিম (স.) এর কাছে চলে এলাম তখন নবী করিম (স.) ঘরে ছিলেন না । আমরা মা আয়েশা (রা.) এর সহিত সাক্ষাৎ করলাম। তিনি আমাদের জন্য হারীর (এক প্রকার খাদ্য যা দুধ, চর্বি এবং আটা দ্বারা তৈরী করা হয়) অতবা دلية (গমের আটা মাখন দ্বারা তৈরী খাবার) তৈরী করার আদেশ করেন। সুতরাং খাদ্য তৈরী হলে আমাদের সম্মুখে বড় থালা আনা হল । থালাতে ছিল খেজুর, আমরা তা খেয়ে ফেল্লাম। অতঃপর নবী করিম (স.) তাশরীফ আনলেন। আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে তিন বল্লেন, তোমরা কিছু খেয়েছ কি ? অথবা তিনি বলেছেন তোমাদের জন্য খাদ্যের আদেশ করা হয়েছি কি ? আমরা বল্লাম জি। হে আল্লাহর নবী। আমরা তখনও নবী করিম (স.) এর সাথেই আছি। এমন সময় এক রাখাল তার বকরীকে بيت الخلاء এর দিকে হাকিয়ে দিল। এর সঙ্গে বকরীর একটি বচ্চাও ছিল। বাচ্চাটি লেদা দিচ্ছিল । নবী করিম (স.) ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করলেন ও বালক সে কি প্রসব করেছে? রাকাল জবাব দিল "بهـــمة" তখন নবী করিম বল্লেন- তুমি এর বদলে একটি বকরী কুরবানী কর। অতঃপর নবী করিম বল্লেন- তুমি রে বদলে একটি বকরী কুরবানী কর। অতঃপর নবী করিম (স.) বল্লেন তুমি কিন্তু একথা বুঝনা যে, আমি তাকে তোমাদের কারণে জবাই করেছি (বরং তার কারণ হল) আমার কাছে ১০০ বকরী আছে- আমি তা চাইনা যে, এখন এর স্থানে একটি বকরী কুরবানী করে দেই।

আমি নবী করিম (স.) এর নিকট আরজ করলাম যে আমার এক স্ত্রী আছে সে খুব ঝগড়াটে । তখন নবী করিম (স.) বল্লেন- একে তালাক দিয়ে দাও ।তখন আমি আরজ করলাম হে আল্লাহর রাছুল সে আমার সহিত ছিল এবং তার ঘরে আমার একজন সন্তান আছে। তখন নবী করিম (স.) বল্লেন যদি এরকম হয় তাহলে তাকে নছীহত কর। যদি এতে সামান্যও উপকার হয় তাহলে সে তা আমল করবে। যার সহিত তুমি ঘর সঙসার করছ তাকে দাসীর মত সব সময় মারধোর করোনা। অতঃপর আমি আরজ করলাম, হে আল্লাহর নবী ওযু সম্বন্ধীয় আমাকে কিছু বলুন। নবী করিম (স.) বললেন, ওযু ভাল করে করো। আঙ্গুল খেলাল কর আর রোজা না থাকলে নাকের ভিতর পানি পৌছাও।

আমর নিব শুয়াইব তার পিতা থেকে, তার পিতা তার দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ নবী করিম (স.) এক দেয়ালের দিকে মুখ করে নামাজ পড়লেন,

একে কেবলা বানালেন। আমরা নবী করিম (স.) এর পেছনে ছিলাম। এমন সময় একটি বকরীর বাচ্চা এলো এবং সম্মুখ দিয়ে চলে যাচ্ছিল । নবী করিম (স.) একে বারণ করতে চাইলে তার পেট দেয়ালে লেগে যায়। শেষে রাগ হয়ে পেছনে চলে গেল। এরকম আরেকটি হাদীছ جـــدی এর বর্ণনায় ইয়াজিদ বিন আছ্লম মাইমুনার বরাতে বলেন- নবী করিম (স.)যখন সেজদাহ করতেন তখন তার পেট মোবারক মাটি থেকে পৃথক রাখতেন । এমন কি কোন বকরীর বাচ্চ সে ফাক দিয়ে যেতে চাইলে তা অনায়াসে চলে যেত।

بهيمة

(৯৫) চতুস্পদ জন্তু

ইবনে ছাইদাহ বলেন স্থলে বা জলে বসবাসকারী চতুস্পদ জন্তুকে بهيمة বলা হয়। এর বহুবচন بهـــائم আসে। নবী করিম (স.) এরশাদ ফরমান দুষ্ট প্রাণীর ইত্স্ত করার ন্যায় এই চতুস্পদের মধ্যেও ইত্স্ততা রয়েছে। এদেরকে بهيمة বলার কারণ হল- এরা কথা বলতে পারেনা, আর না কথা বুঝতে পারে। আর না এদের জ্ঞান আছে। এতেই باب مبهم অর্থাৎ باب مغلق অর্থাৎ ক্ষুদ্র বাব ليل مبهم অন্ধকার রাত পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

احلت لكم بهيمة الانعام

তোমাদের জন্য চতুস্পদ জন্তু হালাল করা হয়েছে।

বিশেষ গুণের কাণে انـــعام এর সম্পর্ক بهيمة এর সাথে করা হয়েছে। আটটি প্রাণীকে انعام বলে। এদের প্রতিটিকেই انعام বলে। যেমনিভাবে এদের সকলকে একত্রে انـــعام বলে । ছিড়ে ফেড়ে খায় এমন প্রাণী যেমন- বাঘ এবং থাবা বিশিষ্ট প্রাণী الانعام بهيمة এর মধ্যে শামিল নহে এজন্য الانعام بهيمة মাঠে চরে ঘাস খায় এমন চতুস্পদ জন্তুকে বলে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন যে, প্রাণী জবাই করার সময় মায়ের পেট থেকে বের হয় এদেরকে بهيـــمة الانـــعام বলে। এদেরকে জবাই ছাড়াই খাওয়া যায়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসও তাই বরেন। এরপর ইবনে ওমর (রা.) বলেন এজন্য আল্লাহ তায়ালা বলেন-

اِلَّا مـايتـلى عليكم (কিন্তু যার হুকুম তোমাদের উপর নাযিল হয়েছে) এ সমস্ত ভুমিষ্ট হওয়া বাচ্চার মধ্যে এমন কোন বস্তু নজরে আসেনি যে কারণে

এদেরকে আলাদা করা করে দেয়া হবে। আল্লাহ্ পাকের ফরমান মতে চতুস্পদ জন্তুর গোস্ত খাওয়া জায়েজ। কারণ রাতের চেয়ে দিনের গুরুত্ব বেশী । যদি রোগ না হত তাহলে সুস্থতার নিয়ামত বিনষ্ট হয়ে যেত । অনুরূপ দোযখ না থাকলে বেহেস্তের সম্মান মর্যাদা বুঝা যেতনা।

গবাদি পশু কুরবানী করা অবিচার হবেনা। বরং তা নাকেছ এর উপর কামেলের অগ্রাধিকার করা যা আইন সিদ্ধা। এমনিভাবে বেহেস্তীরা দোযখীদের উপর ফখর করা ইমানদারদেরকে কাফেরদের উপর প্রাধান্য দেয়া আইনসিদ্ধ। তদ্রুপ নাকেছ বস্তু যদি সৃষ্টি না হত তাহলে কামেল বস্তুর মূল্যায়ন বুঝা যেতনা অনুরূপভাবে আল্লাহ্ পাক যদি এই সমস্ত চতুস্পদ জন্তুকে সৃষ্টি না করতেন তাহলে মানুষের বুর্যুগী মূল্যায়ন হতনা।

হযরত আনাস বিন মালেক বলেন- তিনি হেকাম বিন আইয়ুব এর বাড়ীতে প্রবেশ করে দেখলেন একটি গোত্র মুরগী বেধে একে নিশানা করে। অর্থাৎ চাঁদ মারির জন্য একে নিশানা বানায়। তখন হযরত আনাস (রা.) বলেন- নবী করিম (স.) চতুস্পদ। জন্তুকে আটক রেখে এতে নিশানা বানানো নিষেধ করেছেন।

এর মর্মার্থ হল- আত্মা বিশিষ্ট প্রাণী আটকিয়ে তীর বর্ষা নিক্ষেপ করে হত্যা করা নবী করিম (স.) সমস্ত লোকদের প্রতি লা'নত করেছেন। (বুখারী)

আবার এতঁ কোন প্রাণীক আযাবে নিপতিত করা, কমহীন করা, তার পুজি বাট্টা নিশেষ করে দেয়া এবং যদি এক যবাই করা হয় তাহলে এক ধ্বংস করা হল। নবী করিম (স.) প্রাণীদেব আড় করে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন।

কোন প্রাণীকে দাড় করিয়ে হত্যা করাকে مـجثمه বলে। এ ধরনের কাজ পাখী ও খরগোসের সহিত বেশী করা হয়।

হযরত আব্বাস (রা.) বর্ণনা রেন- চতুস্পদ জন্তুকে একটির উপর অপরটিকে প্রাধান্য দেয়া নিষেধ করেছেন। হযরত আনাস বিন মালেক (রা.) বলেন- নবী করিম (স.) এরশাদ করেন চতুস্পদ প্রাণীর মধ্যে বিচ্ছু, টিড্ডি ঘোড়া, খচ্চর, চতুস্পদ গাভী এবং এগুলো ব্যতীত আরো অন্যান্য জবাই তাছবীহ পাঠ কারীর অন্তর্ভূক্ত। এদের তাছবীহ যখন শেষ হয়ে যায় তখন আল্লাহ তায়ালা এদের রূহ কবজ করে নেন।

হাশরের ময়দানে গবাদী পশু ঃ

ইবনে দাহিয়া যে, হাশরের মাঠে আগত চতুস্পদ জন্তুর কাছ থেকেও কি কেছাছ (প্রতিশোধ) নেয়া হবে? এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। শেখ আবুল হাসান আশরায়ী (রহ.) বলেন, গবাদি পশু ও চতুস্পদ জন্তুর কেছাছ গ্রহণ করা হবেনা। কারণ চতুস্পদ জন্তুর উপর শরিয়তের বিধান প্রযোজ্য নয়। হাদীছে উল্লেখ আছে যে, নবী করিম (স.) বলেছেন, (প্রাণীদের মধ্যে) প্রত্যেকের কেছাছ এদের অনুরূপ গ্রহণ করা হবে এবং এদের মধ্যে বৃদ্ধদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে- তোমরা অন্য বৃদ্ধদেরকে কেন কষ্ট দিয়ে ছিলে? তা তিনি (স.) এজন্য বর্ণনা করেছেন, কিয়ামতের দিন প্রতিটি বস্তুর তিল তিল করে হিসাব গ্রহণ করা হবে। মুলত তাদ্বারা হিসাব যে কঠোর হবে তা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। অত্যাচারীদের পক্ষ থেকে অত্যাচারীকে দ্রুত প্রতিশোধ নেয়া হবে।

উস্তাদ আবু ইসহাক আসফারাইনী (রহ.) লিখেছেন- চতুস্পদ জন্তুর মধ্যে কেছাছ জারী হবে, তবে গবাদি পশু থেকে ইহজগতেই প্রতিশোধ নেয়া অনুমান করা যায়। ইবনে দাহিয়া বলেন- চতুস্পদ জন্তু র মধ্যে কেছাছ জাবী করা জ্ঞানগত ও দলীলগত ভাবে প্রতিষ্ঠিত । কারণ উপকার ও ক্ষতির ব্যাপারে চতুস্পদ জন্তুর পক্ষ থেকেও কিছু আশা করা যায়। সুতরাং এরা লাঠিকে ভয় পায় এবং ঘাসের প্রতি আকৃষ্ট হয়। আর কুকুর যখন এদর প্রতি আক্রমন করে তখন এরা রুখে বসে।

এদেরকে যখন শিকারের প্রতি উৎসাহিত করা হয় তখন এরা প্রস্তুতি নিতেও অনুপ্রানিত হতে পারে এ অবস্থা পাখী ও জংলী প্রাণীদেরও । এরা ক্ষতিকারক পাখী এবং প্রাণী থেকে নিজেদের রক্ষা করে ভাগতে পারে।

কেউ যদি প্রশ্ন করে যে, কেছাছ গ্রহণ করা এক প্রকার প্রতিশোদ অথচ চতুস্পদ জন্তু দায়বদ্ধ নয়। তাহলে এর জবাব হবে চতুস্পদ জন্তু দায় বদ্ধ নয়। তবে একে অস্বীকার করারও জোনেই যে, আল্লাহ যাইচ্ছা তাই করেন। তিনি সমস্ত জিনিষের মালিক। আল্লাহ পাক মানুষের জন্য এ সমস্ত গবাদি পশুকে অধীন করে দিয়েছেন। আর যে সমস্ত প্রাণীর গোস্ত খাওয়া হালাল করেছেন এদেরকে কুরবানী করা বৈধ করেছেন। এজন্য কোন ওজর আপত্তি করা উচিত না।

আবার এদের মধ্যে কোন কোন চতুস্পদ জন্তু থেকে কেছাছ নেয়া হবে। কারণ এদর কোনটি অণ্য প্রাণীকে কষ্ট দিয়েছে কিন্তু এদের কাছ থেকে নিষেধাজ্ঞা দায়িত্ব এবং আল্লাহ তায়ালার আদেশের উপর আমর করার দাবী করা যাবেনা। কারণ দাবী শুধু বাক শক্তি সম্পন্ন প্রাণী ও অনুভূতিপ্রবন সৃষ্টির বেলায় প্রযোয্য।

এ অবস্থায় যখন মত পার্থক্য ও বাধানুবাদ বেড়েই গেল তখন আমরা আল্লাহ তায়ালার এই আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করতে পারি-

فان تنازعتم فى شئى فردوه الى الله والرسول (النساء)

সুতরাং ইখতেলাফের সময় বড়দের কাছ থেকে মীমাংসা দেয়ার জন্য কোরআন বলছে -

আল্লাহ পাক বলেন-

ومامن دابة فى الارض ولا طائر يطير بجناحيه الاامم امثالكم (انعام٣٨).

ধরা পৃষ্টে এমন কোন প্রাণী নেই যে, চতুস্পদ জন্তু যারা দু'ডানায় উড়ে তোমাদের মত সৃষ্টি নয়। অন্য জায়গার আল্লাহ পাক বলেছেন واذالـــو حـوش حشـرت (تـكـويـر) আর যখন প্রাণীদেরকে একত্রিত করা হবে। حشرت এর অর্থ একত্র করা। সুতরাং হাদীছে এসেছে নবী করিম (স.) এরশাদ ফরমান কিয়ামতের দিন মানুষকে (তিন পন্থায়) একত্র করা হবে।

কতক হবে অনুরাগী- কতক হবে ভয়ে আড়ষ্টএবং একটি উটের উপর ২জন করে বা তিনজন করে অথবা ১০ জন করে এবং বাকীদেরকে জাহান্নামে একত্র করা হবে। যেখানে সে উটটি বসবে সেখানে আগনি বসবে আর যেখানে সে রাত অতিবাহিত করবে সেখানে সেও রাত অতিবাহিত করবে। আর যেখানে উটটি সকাল করবে সেখানে সেও সকাল কাটাবে। আর যেখানে সে সন্ধা কাটাবে সেও খোনে সন্ধা কাটাবে। এই হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, উটের হাশরও মানুষের সহিত হবে।

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) বলেন- নবী করিম (স.) এরশাদ ফরমান সৃষ্টির মধ্যে একটি অপরটির কাছ থেক কেছাছ গ্রহণ করবে। এমনকি শিং বিশিষ্ট প্রাণী তার মত শিংহীন প্রাণী থেকে ক্ষুদ্র প্রাণী পিপড়া থেকে। অনুরূপ চতস্পদ

জন্তু পিপড়ার মোকাবেলায়ও কেছাচ গ্রহণ করা হবে। যখন এত ছোট ছোট জিনিষের প্রতিশোধ নেয়া হবে তখন যে সৃষ্টির উপর শরীয়তের বিধান প্রয়োগ করা যায় এদেরকে কি করে ছেড়ে দেয়া হবে? আর সে সৃষ্টি কি করে গাফেল থাকে?

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, নবী করিম (স.) এরশাদ ফরমান কিয়ামতের দিন অবশ্যই প্রকৃত মালিককে তার অধিকার দিয়ে দিতে হবে। এমনকি শিংহীন বকরীর প্রাপ্য শিং বিশিষ্ট বকরীর কাছ থেকে আদায় করা হবে।

অন্য হাদীছেও এ ধরনের শব্দ রয়েছে ঃ

যে লোক উটের মালিক কিন্তু সে তার উটের যাকাত দেয়নি কিয়ামতের দিন তার সম্মুখে এমনি ভাবে দেখানো হবে যে, একটি ধুধু মরুভূমি হবে যা উটের চিল্লাচিল্লিতে ভরে যাবে। উটের এই পালকে পূর্ব থেকে আরো বেশী পুরা করা হবে। কোন উটের বাচ্চাকেও তখন বাদ রাখা হবেনা যা তার মালিক তাকে যাকাত হিসেবে দেয়নি। তাঁরা মালিককে তাদের পায়ের তলায় পিষ্ট করতে থাকবে এবং দাঁত দিয়ে কামড়াতে থাকবে।

হুযূরে পাক (স.) এরশাদ ফরমান- এমন যেন না হয় যে, কিয়ামতের দিন কোন ব্যক্তির চরানো বকরী তার কাধে উঠে আসবে সে কথা বলতে থাকবে। অতঃপর সে তার সুপারিশের জন্য আমাকে আহবান করতে থাকবে। সে সময় আমার জবাব হবে যে, এই পাপিষ্টের প্রতিফলের সংবাদ আমি তাকে পূর্বেই দিয়ে ছিলাম। এখন আমি কিছুই করতে পারবোনা। (বুখারী)

হুজুরে পাক (স.) এরশাদ ফরমান- কিয়ামত দিবসে মানব জাতি ও জিন জাতি ব্যতীত সকল প্রকার চতুস্পদ জন্তু কিয়ামতের হতাশার কারণে চেচামেচী করতে থাকবে। এই সমস্ত জন্তুর চেচামেচী বন্ধ করবে আল্লাহ তায়ালার এলাহামের মাধ্যমে। আল্লাহ পাকের সৃষ্টি করা এসমস্ত প্রাণীর জন্মগত বৈশিষ্ট হল, না তাদের কোন জ্ঞান আছে আর না অনুভূতি। এদের বোধশক্তিও নেই। আল্লাহ তায়ালা প্রতিটি জিনিষের মধ্যে তার বৈশিষ্টানুযায়ী একটি অভ্যাস ও প্রকৃতি সৃষ্টি করেছেন। যার উপকারীতা অপকার ও ক্ষতির যোগ্যতা জন্মগতভাবে দেয়া আছে। যেমন- আল্লাহ পাক পিপিলিকার মধ্যে তার খাদ্য

সংগ্রহ করার ক্ষমতা প্রদান করেছেন। যখন পিপিলিকা শীতের জন্য তার খাদ্যের ব্যবস্থা করে তখন চতুস্পদ জন্তু এবং গাবাদি পশুর এ অভ্যাস হওয়া সে কিয়ামতের দিন তার হক ক্ষতি হওয়ার কারণে চিল্লাতে থাকবে। যে প্রাণীদের অবস্থার তথ্যানুসন্ধানে থাকে সে আল্লাহ্ তায়ালার সে শক্তি অবশ্যই মেনে নেবে। যে আল্লাহ তায়ালা তো এদের মধ্যে জ্ঞান বুদ্ধি দেননি- তবু এদেরকে একটা অনুভূতি শক্তি দিয়েছেন। যা দ্বারা প্রাণীরা উপকার ও ক্ষতি নির্ণয় করতে পারে। আর তাদের উপর বস্তুর আগাম সংবাদ ও দেয়া হয় যে গুলো মানুষের মধ্যে ও পাওয়া যায়না।

মোটকথা হলো, মানুষ নিয়ামত এর অনুসন্ধান করে অথবা এ ব্যাপারে জ্ঞানার্জন করে অথবা দুরদর্শিতায় কৃতকার্য হয়। যেমন, মৌমাছি নিজেদের খাদ্যের জন্য আশ্চার্য ধরনের শক্ত ধনাগার তৈরী করে। এমনকি তা দেখে প্রকৌশলীরা পর্যন্ত হতভম্ভ হয়ে যায়। অনুরূপ মাকড়শাও তার নিজ ঘর খানা সামান্য শক্ত করে তৈরী করে। এমনি ভাবে উই পোকা তার ঘর শুকনা খড়কুটা দ্বারা তৈরী করে। এরূপ চতুস্পদ জন্তু এবং অন্যান্য প্রাণীর পক্ষ থেকে আশ্চর্য ধরনের কর্ম এবং নির্মাণ পাওয়া যায়। এগুলোকে মানুষ দেখে আশ্চার্য ও বিস্ময় প্রকাশ করে থাকে। অথচ আল্লাহ্ তায়ালা এদেরকে বাকশক্তি থেকে বঞ্চিত রেখেছেন। যদি তিনি ইচ্ছা করতেন তাহলে তাদের মধ্যে এদুটু বস্তুও দিয়ে দিতে পারতেন। যেমন হযরত সুলামান (রা.) এর শাসনামলে এক পিপিলিকা কথা বলেছিল।

بهيم এক প্রকার ঘোড়া। এতে নর-নারী এক সমান। بهم কাল রঙ্গের এক ধরনের ঘোড়া যার মধ্যে সাদা বলতে কিছু থাকে না। নবী করিম (স.) এর এক হাদীছে বলা হয়েছে কিয়ামত দিবসে মানুষকে পরিস্কার পরিচ্ছন্নভাবে উঠানো হবে। এর অর্থ হল, যে লোক দুনিয়াতে অসুস্থ ছিল যেমন লেংড়া, অন্ধ, বধির ইত্যাদি এদেরকে হাশরের ময়দানে জান্নাতী হোক বা জাহান্নামী সকলকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে উঠানো হবে। কারণ তাদেরকে এদুস্থানে তথা জান্নাত ও জাহান্নামে চিরকালের জন্য রাখা হবে।

হাদীছে একথাও বলা হয়েছে যে, কিয়ামত দিবসে মানুষকে উলঙ্গ করে উঠানো হবে। তবে এ হাদীছ উক্ত হাদীছের বিপরীত মনে হয়। আর বড়

লোকদের মধ্যে মাছয়ার ইবনে কুদাম এর কবিতা হল -

نهارك يا مغرور سهو وغفلة:: وليلك نوم والردى لك لازم

ওহে অবাধ্য তোমার এই দিন হাসি ঠাট্টা ও অলসতায় আর তোমার এই নিদ্রার এবং তোমার নিশেষ হয়ে যাওয়া অবশ্যম্ভাবী।

وتتعب فيما سوف تكره غبه::كذالك فى الدنيا تعيش البهائم

তুমি এ সমস্ত জিনিষের মধ্যে ডুবে আছ যাকে তুমি কখনো পছন্দ করবেনা। জগতে যেমন চতুস্পদ জন্তু জীবন কাটায়।

মাছয়ালাহ ঃ

ইমাম দামিরী (রহ.) বলেন, শাফেয়ী মতবলম্বীরা বলেন চতুস্পদ জন্তুর লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে ওযু ভেঙ্গে যাবে কি না? কারো কারো মতে ওযু ভেঙ্গে যাবে। কারণ লজ্জাস্থান স্পর্শ করার যে আয়াত আছে তা ব্যাপক কোন শর্ত হীন। কিন্তু ছহীহ কথা হল- ওযু ভাংবে না । কারণ প্রকাশ্য ওযু ভাঙ্গার কোন কারণ এখানে নেই। এ ব্যাপারে আলাদা কোন হুকুমও আসেনি। ইমাম দামেয়ী (রহ.) বলেন- চতুস্পদ জন্তু ও পাখীদের লজ্জাস্থানের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

প্রবাদ বাক্য ঃ

আরবগণ বলেন-

ماالانسان لولا الانسان الاصورة ممثله

মানুষ কি ? মানুষ তো একটি অবয়ব-আকৃতি।

ماالانسان لو لا الانسان الابهيمة مهملة

মানুষ কি? মানুষ তো একটি বেকার প্রাণী।

উদাহরণটি সে ব্যক্তির বেলায় বলা হয় যে কথা বলতে সক্ষম।

بُوم وبُومة

(৯৬) পেঁচা

পেঁচাকে بـــــوم লা হয়। এটি এমন একটি পাখী যার সম্পর্ক নারী ও পুরুষের সাথে করা হয়। কোন কোন আরব একে (পেঁচাকে) صـــــدى এবং فيـاد ও বলে থাকে। এদুটি নাম শুধু পুরুষ পেঁচার জন্য প্রযোজ্য। তার উপাধি ام।

الصبيان ام الخرب ইত্যাদি। পেঁচাকে عرب الليل ও বলা হয়।

জাহিজ বলেন, পেঁচা বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। যেমন بـرمة ـ غـرب ـ خـفاش ـ ضوع ـ صدى ـ هامة ইত্যাদি। এগুলো অবশ্য বিভিন্ন পাখীরই নাম। যে সকল পাখী রাতে বাসা থেকে বের হয় সে সকল পাখীর বেলায়ই এই শব্দ ব্যবহার করা হয। রাতে বিচরণকারী পাখীদের মধ্যে ইদুর খেকো পাখী, টিকটিকি, চড়ুই পাখী এবং অনুরূপ ছোট ছোট পাখী এবং অন্যান্য পাখী মশাও খায়।

পেঁচার কতিপয় বৈশিষ্ট ঃ

পেঁচার অভ্যাস হল প্রত্যেক পাখীর বাসায় এরা প্রবেশ করে পাখীর ছানা বা ডিম খেয়ে ফেলে। পেঁচা রাতে পূর্ণ শক্তিতে আক্রমন করে। পেঁচার আক্রমন প্রতিহত করার ক্ষমতা কোন পাখীর থাকে না। পেঁচা সারা রাত ঘুমায় না। পেঁচাকে দিনের বেলায় যখন অন্যান্য পাকীরা দেখে তাকে মেরে ফেলে। বৈরীতা বশত এর পালক ছিড়ে ফেলে। এজন্য শিকারীরা পেঁচাকে তাদের জালের মধ্যে বেধে রাখে। তা দেখে অন্যান্য পাখীরা একত্রিত হয় এবং জালে আটকে যায়।

মাসউদী ইমাম জাহিজের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, দিনে পেঁচা এই জন্য বের হয় না যে, পেঁচার চোখ খুব সুন্দর। মানুষের বদনজর লাগার ভয় আছে। কারণ পেঁচা নিজেকে সমস্ত প্রাণী থেকে সুন্দর মনে করে। একারণে সে শুধু রাতেই বের হয়।

প্রাচীন কালে আরবদের মধ্যে কুসংস্কার ছিল যে, কোন মানুস মরে গেলে বা কেউ তাকে হত্যা করলে মৃতের আত্মা একটি পাখীর আকৃতিতে তার সামাধির পাশে এসে ভীতি অনুভ করে চিল্লাতে থাকে। আরবদের ধারনা মতে এই পাখীটি হলো পেঁচা। যাকে আরবীরা صدى বলে।

প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব হেমিয়ারী বলেন -

ولو ان ليلى الاحيليتة سلمت :: على ودونى جندل وصفائح

লাইলী যখন আমাকে সালাম করল অথচ সে সময় তার ও আমর মধ্যে একটি বিরাট ধুধু মরুভূমি ও পাথর অন্তরায় ছিল।

لسلمت تسليم البشاشة اوزقا:: اليها صدى من جانب القبر صائح

আমিও তার কাছে গিয়ে সুন্দর করে সালাম করলাম অথচ পেঁচা কবরের পক্ষ থেকে চিল্লাতে ছিল।

কেউ বলেছেন, একদা হেমিয়ার উটের উপর আরোহন করে কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি দেখলেন কররের উপরে পেঁচা উড়ছে। তা দেখে তার উট- ইতস্তত করতে লাগল। তখন তিনি উটের উপর থেকে পড়ে গিয়ে মরে গেলেন এবং সেখানেই তাকে দাফন করা হল।

পেঁচা বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে। প্রত্যেক পেঁচাই একাকিত্ব থাকা ভালবাসে। জন্মগত ভাবে সে কাকের দুশমন। কোন কোন ঐতিহাসিক লিখেছেন যে, একদা পারস্য রাজ তার কোন এক কর্মচারীকে আদেশ করলেন, তুমি আমাকে সবচেয়ে বদছুরত এবং খারাপ পাখী শিকার করে দাও। এবং তাকে আগুনে ভুনা কর। তা করে ছদকায় আদায়কারীকে খাইয়ে দাও।

আবু বকর তার তুসী বলেন, এক রাত আব্দুল মালেক বিন মারওয়ানের নিদ্রা আসছিলনা। আব্দুল মালেক কিচ্সসা বলতে আরম্ভ করলেন। তার বর্ণিত কিসসার মধ্যে একটি কিসাস ছিল এই, মওসেল নগরীতে এক পেঁচা ছিল আর অন্য একটি পেঁচা ছিল বসরাতে। মওসেলের পেঁচা তার ছেলের জন্য বসরার পেঁচার মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব পাঠায়। বসরার পেঁচা বলল আমি একটি শর্ত সাপেক্ষে আমার মেয়েকে বিয়ে দিতে রাজী। শর্তটি হল- মহর বাদে আমার মেয়েকে ১০০ বিঘা অনাবাদী জমি দিতে হবে। মওসেলের পেঁচা বলল বর্তমানে তা দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু বর্তমান শাসক নিজের ক্ষতি করেও যদি শাসক থাকেন তাহলে তোমার এই শর্ত পূর্ণ করা সম্ভব হবে। এঘটনা শুনে আব্দুল মালেকের চোখ খুলে গেল, তার ভুল নিরসন হল। এই ঘটনার পর আব্দুল মালেক প্রতিদিন তার বিচারালয়ে বসে মানুষের অহেতুক কাজের প্রতি নজর রাখতেন এবং তাদেরকে দুর করার চেষ্টা করতেন, তিনি গভর্নরদের প্রতিও দৃষ্টি রাখতেন।

আল্লামা দামিরী (রহ.) বলেন, একদা মামুনুর রশীদ তার মহল থেকে নাটক দেখতে ছিলেন যে, একটি লোক দাঁড়াল। তার হাতে কয়লা। সে লোক কয়লা দ্বারা মহলে লিখছে। তা দেখে মামুনুর রশীদ তার এক কর্মচারীকে বললেন এ কি লিখছে দেখ এবং তাকে ধরে নিয়ে এসো । আদেশ মত কর্মচারী

তার গিয়ে তার লেখাগুলো মনোযোগ সহ পড়ল। তাকে আটক করল। সে লোক নিম্ন কবিতা লিখছিল-

ياقصر جمع فيه الشوم واللوم:: متى يعشش فى اركانك اليوم

"হে মহল। পেঁচা যখন তোমার মধ্যে বাসা বানাবে তখন এতে সব ধরনের ভূল ভ্রান্তির বস্তু একত্রিত হয়ে যাবে। "

يوم يعشش اليوم فيك من فرحى :: اكون اول ماينعيك مرغوم

"পেঁচা যখন আনন্দ চিত্তে তোমার এখানে বাসা নির্মান করবে তখন আমিই হব সর্বপ্রথম ব্যক্তি যে না পছন্দ করে তোমার উপর শোক প্রকাশ করব।"

চাকর তাকে বলল, চলুন জনাব; আপনাকে খলিফা স্মরন করেছেন। সে লোক বলল আমি তোমাকে আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি, তুমি আমাকে তার কাছে নিয়ে যেয়োনা। চাকর বলল তোমাকে অবশ্যই যেতে হবে। তাকে যখন খলিফার দরবারে উপস্থিত করা হল এবং কর্মচারী যা পড়ছিল খলিফাকে অবহিত করল তখন খলিফা বললেন তোমার ধ্বংস হউক। তুমি এসব কেন লিখেছ? জবাবে সে লোক বলল, মহামন্য খলিফা! আপনার মহলে বিপুল ধন সম্পদ তথা মূল্যবান গদি, আহার্যের সামগ্রী, ফার্নিচার, বাসন সামগ্রী, দাস-দাসী ইত্যাদি বেশ পরিমানে রয়েছে। আপনি মনে করছেন, এ সমস্ত বস্তুর প্রশংসা আমি করি নি। এটি আমার স্বভাবিক অভ্যাসই বটে। আমি আজ খলিফার মহলের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। পেটে দারুন ক্ষিধে পেয়েছিল। দাড়িয়ে ভাবতে লাগলাম। মন বলছিল, আমার সম্মুখে তো সুরম্য অট্টালিকা রয়েছে। অথচ এর দ্বারা আমার কোনই উপকার আশা করা যায় না। এছাড়া যদি স্থানটি বিরানভূমি হত, আমি এর কাছ দিয়ে চলে যেতাম। তখন এখানে বিভিন্ন প্রকার লাকড়ী থাকত। সে গুলো আমি বিক্রি করে কিছু খেতে পারতাম। তখন কতই না ভাল হত। ।

আমিরুল মুমিনীন! আপনি কি এই কবিতা শুনেননি?

اذالم يكن للمرء فى دولة امرئ:: نصيب ولا حظ تمنى زوالها

"কোন ব্যক্তির জন্য কোন শহরে যদি কোন ভাগ না থাকে, আর না কোন ধন সম্পদ যেগুলো খতম হয়ে যাবার আশংকা থাকে।"

وماذاك من بغض لها غير انه:: يرجى سواها فهو يهوى انتقالها

"আর এই আকাংখা যখন তার সাথে কোন বৈরীতার কারণ হবেনা বরং আশা করার জন্য করা হয়। তখন সে চায় তাকে পরিবর্তন করে দাও।"

একথা শুনে মামুনুর রশীদ কর্মচারীকে বললেন, এ লোককে এক হাজার আশরাফী দিয়ে দাও। খলিফা আরো বললেন, শুন! এই পরিমাণ সম্পদ তুমি প্রতি বছরই পাবে। শর্ত হল যদি আমার মহল এরকম বাসযোগ্য থাকে। এই বিষয়ের কয়েকটি কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত করা হল

اذا كنت فى امر فكن فيه محسنا:: فعما قليل انت ماض وتاركه

"যখন কোন লেনদেন করবে তখন এতে নিরেট ও নিস্কন্টক থাকার চেষ্টা করবে। কেননা অনেক ছোট ছোট বস্তু তুমি ছেড়ে দিয়ে চলে যাচ্ছ।"

فكم دحت الايام ارباب دولة::وقد ملكوا اضعاف ماانت مالكه

"অনেক কর্তৃত্ব শালীর যুগ অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে অথচ তুমি যত কছুর মালিক হয়েছে এরচেয়ে কত বেশী তাদের হুকুমত ছিল।"

পেঁচার শরয়ী বিধান ঃ

পেচাসহ পেঁচা প্রজাতির সকল প্রাণীর মাংশই হারাম। ইমাম রাফেয়ী (রহ) বলেন, আবুল আসেম উব্বাদী লিখেছেন, গাধার মত পেঁচাও হারাম। ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর এক মতানুসারে পেঁচার গোস্ত হালাল এতে বুঝা যায় ضوع নামক পাখী পেঁচা ব্যতীত অন্য কোন পাখী। কিন্তু সহীহ কিতাবে রয়েছে যে, ضوع রাতে উড়ে এমন পাখী هام নামক পাখীর বংশোদ্ভুত। هام হল এক প্রকার ছোট পেঁচা। মুফাজ্জাল বলেন- ضوع পুরুষ পেঁচাকে বলা হয়। তাই ضوع এর যে বিধান পেঁচারও একই বিধান। কারণ স্ত্রী-পুরুষ একই বিধানের অন্তভূক্ত।

পেঁচার উপকারিতা ঃ

হযরত হাসান বিন আলী বিন আবু তালেব (রা.) বলেন, নবী করিম (স.) এরশাদ করেন, যদি কারো সন্তান জন্ম গ্রহণ করে, তারপর বাচ্চার ডান কানে আযান দেয়া হয় এবং বাম কানে ইকামত দেয়া হয়, তাহলে সে বাচ্চাকে শুক্ক রোগে কোন ক্ষতি করতে পারেনা। হযরত ওমর বিন আব্দুল আজিজ (রহ) এই

হাদীছের উপর নিয়মিত আমল করতেন।

ام الصبيان (উম্মুস সিবিয়ান) কাকে বলে এ ব্যাপারে বিভিন্ন মত রয়েছে। কেউ বলেন পেঁচাকে উম্মুস সিবিয়ান বলে। আবার কেউ বলেছেন- পেঁচার প্রভাবে যে রোগ হয় তাকে উম্মুস সিবিয়ান বলা হয়।

চিকিৎসা ক্ষেত্রে পেঁচার উপকারিতাঃ

পেঁচাকে জবাই করার পরও তার একটি চক্ষু খোলা থাকে এবং অপর চক্ষু বন্ধ হয়ে যায়। খুলা চোখটির বৈশিষ্ট হল যদি এই চোখ আংটির নগের নীচে রাখা হয় তাহলে পরিধানকারী হাত থেকে আংটি না খোলা পর্যন্ত সে আর ঘুমোতে পারবেনা। আর অপর চোখটির বৈশিষ্ট এর উল্টো। অর্থাৎ বন্ধ চোকটি আংটির নগের নীচের স্থাপন করে হাতে পরিধান করে ঘুমালে সে আর ঘুম থেকে জাগ্রত হতে পারবেনা যতক্ষন হাত থেকে আংটিটি খোলা না হয়। তিবরী বলেন, যদি উভয় চোখ পাওয়া যায় তাহলে বন্ধ চোখ কোনটি আর খোলা চোখ কোনটি তা পার্থক্য করার কোন ব্যবস্থা না থাকে তাহলে চক্ষু দুটি পানিতে ছেড়ে দিলে যে চোখটি পানিতে ভেসে উঠবে তাই খোলা চোখ বলে ধরে নিতে হবে। আর যে চোখটি ডুবে যাবে তা হবে বন্ধ চোখ।

হারমাস লিখেন, পেঁচার কলিজা যদি ঘুমন্ত মহিলার হাতে রেখে দেয়া হয় তাহলে মহিলা দিনের বেলা যা কিছু করেছে সব বলে দিবে। পেঁচার পিত্তকে শুকিয়ে সুরমা বানিয়ে চোখে ব্যবহার করলে দৃষ্টি শক্তির জন্য বেশ উপকার হবে। কোন বড় পেঁচার কলিজা যদি ভেড়ার চামড়ায় মুড়িয়ে হাতের কব্জিতে বেধে রাখা হয় তাহলে সে পোকা মাকড়, চোর-ডাকাত থেকে নিরাপদ থাকবে। কোন লোককে সে ভয় করবে না। কেউ যদি পেঁচার চর্বি গলিয়ে চোখে সুরমার ন্যায় ব্যবহার করে তাহলে অন্ধকার রাতে যেখানেই যাবে সমস্ত রাস্তাই তার নিকট আলোকিত মনে হবে।

পেচার বৈশিষ্ট হল, তার দুটি ডিম থেকে বাচ্চা হয় আর অপরটি নষ্ট হয়ে যায়। কোন্ ডিম থেকে বাচ্চা হবে তা বুঝাতে হলে যে কোন একটি ডিমের খড় কুটা দিয়ে পরীক্ষা করবে। যে ডিমে বাচ্চা হবে সে ডিমটিতে পালক দৃষ্টি গোচর হবে। পেঁচার গোস্ত খেলে মানুষ নির্বোধ হয়ে যায়। কারো যদি বহুমুত্র রোগ হয় তাহলে পেঁচার পিত্ত ঝাউ নামক উদ্ভিদের ভস্ম (ঝাউ সমুদ্র তীরের এক প্রকার

গাছ) মধুর সাথে মিসিয়ে পান করলে আল্লাহর রহমতে এ রোগ উপশম হবে। কোন শিশু যদি রাতে বিছানায় পেশাব করে তাহলেও এই ঐষধ ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যাবে। কারো মুখে যদি অর্ধাংগের বাতাস লাগে তাহলে তাড়াতাড়ি পেঁছা জবাই করে এর কলিজা সে আক্রান্ত স্থানে লাগালে ভাল হয়ে যাবে। পেঁচার রক্ত তৈলে মিশ্রিত করে মাথায় ব্যবহার করলে মাথার উকুন নিঃশেষ হয়ে যায়।

পেঁচা সংক্রান্ত স্বপ্নের ব্যাখ্যা ঃ

স্বপ্নে পেঁচা দেখা ডাকাতের চিহ্ন। কারো মতে স্বপ্নে পেঁচা দেখা সাহসী বাদশাহর আলামত। যে বাদশাহর প্রভাবে প্রজা সাধারণের কণ্ঠনালী বের হয়ে যায়। স্বপ্নে পেঁচা দেখা বীর পুরুষ ও নির্ভীক হওয়ারও লক্ষন। কারণ পেঁচা রাতে বিচরণকারী পাখীদের একটি।

بُوْه

(৯৭) পেঁচার সাদৃশ্য পাখী

পেঁচার পাখী বিশেষকে بـــوه বলা হয়।। কিন্তু সে পাখী পেঁচা থেকে আকারে ছোট। পুরুষের জন্য بوهته ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আর কোন কোন সময় بـــوهتـــه বলা হয় নির্বোধ এবং আহমক লোককে। তাই ইমরুল কয়েস বলেছে-

ايا هنده لا تنكحى بوهة:: عليه عقيقة احسبا

"ওহে হিন্দা! তুমি নির্বোধকে বিয়ে করোনা, কারণ তার উপর আহসাব মানুষের আকীকা বাকী আছে।"

"আহসাব" এমন মানুষকে বলে যার চুল গভীর লাল হলুদ বর্ণের হয়ে থাকে। সম্ভবত ইমরুল কয়েস সে ধরনের মানুষকে তিরস্কার করার উদ্দেশ্যেই তা বলেছেন। احسـب লোকটির জন্ম থেকে অদ্যাবধি আকীকা করা হয়নি। যে কারণে তার চুল লাল হলুদ বর্ণের। কারো মতে احســب বলা হয় কমজোর লোককে । আর بـوهة বলা হয় এমন লোককে যাকে বাতাসে উড়িয়ে দিয়েছে। আর بـــوه বলা হয় পুরুষ পেঁচাকে। কেউ বলেছেন বড় ধরনের بـــوه পেঁচার

প্রকারেই হয়ে থাকে। সুতরাং রাবিয়্যা বার্ধক্যের কথা স্মরণ করে বলেন

كالبوه تحت الظلمة المرشوش "পালকী অন্ধকারে পেচার মত।"

কারো কারো মতে احسب এমন মানুষকে বলা হয় যার শরীর অসুস্থতার কারণে সাদা হয়ে গিয়েছে। আর তার চুলও অসুস্থতার প্রভাবে লালচে সাদা হয়ে গিয়েছে। বিশেষ করে احسب এর অর্থ করেছেন برص অর্থাৎ যার ধবল কুষ্ট হয়েছে। পেঁচার আলোচনায় بوه এর স্বপ্নের তাবীর ও শরয়ী বিধান বর্ণনা করা হয়েছে।

بوقير

(৯৮) সাদা রংয়ের পাখী

ইমাম কাযবিনী (রহ.) লিখেন, এক ধরণের সাদা পাখীকে بوقير বলা হয় যে প্রতি বছরের একটি নির্দিষ্ট দিনে ঝাকে ঝাকে তুর পাহাড়ে আসে। কুহেতুর মিশরে বালাঈ এলাকাতে আনসানা শহরের কাছেই অবস্থিত। শহরটি হযরত মারিয়া কিবতিয়া (রা) নবী করিম (স.) এর পুত্র হযরত ইব্রাহীম (রা.) এর মাতা এর সাথে সম্পর্ক যুক্ত। পাখীরা এ পাহাড়েই আসে। এই পাহাড়ে একটি বাতিঘর রয়েছে। এত সব পাখী তাদের মাথা প্রবেশ করিয়ে বের করতে থাকে। এরপর নীল দরিয়ায় পড়ে যায়। আবার নীল নদ থেকে বের হয়ে যেখান থেকে তারা এসেছিল সেখানে চলে যায়। কোন কোন সময় এমন হয় যে, যখন তারা বাতি ঘরে ডুবে যায় তখন তারা কোন জিনিষ ধরে নিয়ে আসে। পরে তারা ছটফট করে করে মরে যায়। এদের মধ্যে কোন একটি পাখী যখন ঝুলে যায় তখন বাকী পাখীরা সোজা হয়ে যায়।

ইমাম কাযবিনী বলেন, সে বছর এই পাহাড়ে যত পাখীর ঝাক এসেছিল এত পাখী আর কখনো আসেনি। ইমাম সূলী বলেন, আমি সে এলাকার নির্ভরযোগ্য লোকের নিকট জিজ্ঞেস করেছি। তারা বলেছে যে বছর শস্য শ্যামল ফসল হয় সে বছর এই বাতি ঘর শুধু দুটি পাখীকে আটক করে। যদি কোন বছর মধ্য ধরনের সবুজ শ্যামলা ফসল উৎপন্ন হয় তাহলে সে বছর একটি মাত্র পাখীকে আটক করে । আর কোন বছর যদি দুর্ভীক্ষ দেখা দেয়, তাহলে সে বাতি ঘর কোন পাখীকেই আটকায় না।

بينيب

(৯৯) সামুদ্রিক মাছ বিশেষ

فيعيل- بيبنيب এর ওজনে। এটি এক প্রকার সামুদ্রিক মাছ। সমুদ্র বিশেষজ্ঞগণ এর ব্যাপারে ভাল জানেন।

بياح

(১০০) মাছ বিশেষ

بيـــاح এর প্রকার মাছ। ইমাম জাওহারী বলেন, কখনো কখনো 'বা' অক্ষরে যবর এবং তাশদীদ পড়া যায়।

ابوبر اقش

(১০১) চড়ুই পাখীর মতই পাখী বিশেষ

ابوبراقش চড়ুই পাখীর মত এক ধরনের পাখী। এগুলো নানা রঙ্গের হয়ে থাকে। কোন কবি বলেন-

كابى براقش كل:: يوم لونه يتخيل

ابوبراقش এর মত প্রতিদিন তার রং পরিবর্তন হতে থাকে।

এধরনের পাখীকে রং বেরঙ্গের জন্য এবং নানা প্রকৃতির জন্য প্রবাদ বাক্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কাযবিনী বলেন, এই পাখীর আওয়াজ চিত্তাকর্ষক। ঘাড় ও পা লম্বা, ঠোঁট লাল, দেখতে সারস পাখীর মতই। সর্বক্ষণই এর রং পরিবর্তন হয়। কখনো একে লাল কখনো নীল কখনো সবুজ কখনো হলুদ-রং দেখা যায়।

ابو برا

(১০২) কুয়েল

ابوبرا কুয়েল পাখীকে বলা হয়। বিস্তারিত باب السين সীন অধ্যায়ে আসবে।

ابوبريص

(১০৩) টিকটিকি

এর আরেক নাম ابرص, এর বিস্তারিত "باب السين" এ আসবে।

باب التاء

تاليب

(১০৪) পাহাড়ী (পুরুষ) ছাগল

ইবনে ছাইদাহ বলেন তালীব বলা হয় পাহাড়ী ছাগকে। আর পাহাড়ী ছাগীকে تالِيَة বলা হয়ে থাকে। এর বিস্তারিত আলোচনা ওয়াও অধ্যায়ে এর وعل শব্দের অধীনে বর্ণনা করা হবে।

تبيع

(১০৫) গো- বাছুর

গাভীর এক বছরের বাচ্চাকে تبيع বলা হয়। কোন কোন সময় শব্দটি গাভীর জন্যও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যে বাচ্চা গাভীর সাথে সাথেই চলে সেরূপ বকনা বাছুরকে تبيعة বলে। এর বহুবচন تبائع وتباع যেমন افيل (উটের বাচ্চা)র বহু বচন افائيل ইত্যাদি আসে।

হযরত মুয়াজবিন জাবাল (রা.) বলেন, নবী করিম (স.) আমাকে ইয়ামেন প্রেরণ করে এই আদেশ করেন যে, প্রতি ৪০ টি গাভীর মধ্যে একটি গাভী এবং প্রতি ৩০ টি গরুর مسنه (দুই বছরের গরু) এর মধ্যে (স্ত্রী পুরুষ যাই হোক) যাকাত আদায় করবে। ইমাম তিরমিযি (রহঃ) এই হাদীছকে হাসান বলেছেন। কিন্তু তার বর্ণনা مرسل এবং তা অধিকতর ছহীহ। مسنه বলা হয় এমন বাচ্চাকে যার বয়স পূর্ণ দু'বছর হয়ে তৃতীয় বছরে পদার্পন করেছে। تبيع বলা হয় এমন বাচ্চাকে যে তার মায়ের সঙ্গে সঙ্গে থাকে- যদিও তার বয়স ১ বছরের চেয়ে কম হোক না কেন। ইমাম রাফেয়ী (রহ.) বলেন কোন কোন মনিষী ৬ বছরের বাচ্চাকে تبيعه এবং এক বছরের বাচ্চাকে مسنه বলেছেন। তবে সঠি ক নয়। ইহা কোরো মাযহাব নয়।

تبشر

(১০৬) হলুদ পাখী

এর বিস্তারিত আলোচনা সাদ অধ্যায়ে এ আসবে।

تَثفل

(১০৭) ভেড়া

تثلف বলা হয় ভেড়ার বাচ্চকে ث অক্ষরে পেশ এবং ث কে ছাকীন। কেহ অবশ্য ت কে অতিরিক্ত বলেছেন।

تدرج

(১০৮) তিতরের মত পাখী বিশেষ

হিন্দী ভাষায় এই পাখীকে لـــــو বলে। এটি তিতির পাখীর মতই এক প্রকার পাখী। এই পাখী বাগানে বসে নানা ধরনে চিত্তাকর্ষক আওয়াজে ডাকে। এই পাখী উত্তরালী বাতাস চলার কারণে এবং আবহাওয়া পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হওয়ার কারণে মোটা তাজা হয়ে যায়। দক্ষিনা বাতাস এবং আবহাওয়া মেঘাচ্ছন্ন হওয়ার কারণে দুর্বল হয়ে যায়। এরা ভেজা মাটিতে বাসা বেধে ডিম পাড়ার কারণে চিন্তাযুক্ত ও অসুস্থ তার মোকাবেলা করতে হয়না।

শরয়ী বিধান ঃ

পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হওয়ার কারণে এর গোস্ত খাওয়া হালাল। এর বিস্তারিত আলোচনা بابدال এর دارع এর অধ্যায়ে আসবে)

চিকিৎসা ক্ষেত্রে এর উপকারিতা ঃ

সকল পাখীর গোস্তের চেয়ে এর গোস্ত উত্তম মনে করা হয়ে থাকে। মস্তিস্ক ও যৌন শক্তির জন্য বেশ উপকারী। কারো শ্বাস কষ্ট ও ঠান্ডা রোগ হলে এই পাখীর পিত্ত শ্বাস টানলে উপশম হবে। এর গোস্ত রান্না করে খেল ও উপকার হবে। কেননা এর গোস্ত গরম। এই পাখীর পালক পুরা ছাই চুলকে কাল করে। এর চর্বি মালিশে মুখের দাগ ও ধবল রোগে বেশ উপকারী। এর গোস্ত দ্বারা কাবার বানিয়ে নিয়মিত খেলে দর্বল হাফেজদের উপকার করে।

تخش

(১০৯) ডলফিন

এর বিস্তারিত আলোচনা دال অধ্যায়ে আসবে।

تفلق

(১১০) জলজ পাখী বিশেষ

زبرج এর ওজন تفلق ইহা জলজ প্রাণীর অন্তর্ভূক্ত

تفه

(১১১) বিড়ালের মত একটি প্রাণী

تفه বিড়ালের মত একটি শিকারী প্রাণীকে বলে। কেউ বলেছেন عناق الارض এবং غنجل (কাল বর্ণের খরগোস)ও বলে। এ ধরনের প্রাণী সাধারণত হিংস্র হয়ে থাকে । ছোট কুকুরের সমান চিতা বাঘের মত হয়। অনেক কষ্ট করে এদেরকে শিকার করতে হয়। এই প্রাণী কোন কোন সময় মানুষকে আক্রমনে আহত করে । আবার মানুষের গোস্তও খায় কখনো কখনো এর শত্রু পাখী বা তার মত অন্য কোন প্রাণীকে শিকার করে। এদের সহিত ভাল ব্যবহার করে। নাশী এদের ব্যাপারে কয়েকটি কবিতা লিখেছেন-

حلو الشمائل فى اجفانه وطف :: مافى الاديم هضيم الكضح ممسود

তার উত্তম চরিত্র প্রসিদ্ধ । তার পেটের নীচে বড় বড় চুল পরিস্কার চামড়া হালকা পতলা কোমর এবং মসৃন শরীর।

فيه من البدر اشباه توافقه:: منها ئه سفحفى وجهه سود

১৪ তারিখের চন্দ্রের সাথে তার তুলনা চলে যে তার সহিত মিলে মিশে থাকে। তার মাথার চুল পরিস্কার এবং মুখমন্ডল কুচকুচে কাল।

كوحه ذاوجه هذا فى تدوره:: كانه منه فى الاجفان معدود

এর মুখমন্ডল চন্দ্রের মত গোলাকার- যেমন সে পলকের মধ্যে চলে আসে।

له من الليث ناباه ومخلبه:: ومن غرير الظباء النحر والجيد

এর দুধ যেমন সাপের খোসা ও পাঞ্জকৃতির আর হরিণের হত কলসী বিশিষ্ট গরদান।

اذارای الصيد اخفى شخصه ادبا:: وقلبه باقتناص الطير مزود

যখন সে শিকার দেখে তখন শান্ত ভাবে তার লেজ নাড়ায়। পাখী শিকারের জন্য তার অন্তর সদা প্রস্তু।

শরয়ী বিধান ঃ

এর গোস্ত খাওয়া হারাম। কারণ হাদীসে রয়েছে যে, যে প্রাণীর ধারালো দাঁত ও চংগল বিশিষ্ট প্রাণী হারাম। কোন কোন শাফেয়ী মাযহাবের লোকের মতামত হল ﻗﻂ বলা হয় ডাঙ্গায় বসবাসকারী বিড়ালকে। যা শৃগালের মত এবং গৃহ পালিত বিড়ালের অনুরূপ। (সম্ভবত বুনু বিড়াল - অনুবাদক)।

কিন্তু এই প্রাণীর হারাম হালাল এর ব্যাপার উভয় মত রয়েছে। সঠিক কথা হল এর গোস্ত হারাম। কারণ এর উদুর খায়।

উদাহরণ ও প্রবাদ বাক্য ঃ

আরবগণ বলেন- هو اغنى من التفه عن الرفه

কুকুরের ও বিড়ালের চেয়ে ছোট গোলাপী এবং কাল মিশ্রিত রং এবং নখর বিশিষ্ট, শুকনা ঘাস খায়। এই দুটি শব্দের اصل হল رفهة এবং تفهه হামজা লিখেছেন যে, এই দুটি শব্দের বহু বচন হল تفات ও رفات সুতরাং কবি বলেন ঃ

غنينا عن حديثكم قد يما:: كما غنا التفات عن الرفات

আমরা তোমার পুরাতন কথায় এমনই নির্ভীক যেমন ভাবে কান কাটা।

تَمّ

(১১২)মাছরাঙ্গার মত পাখী বিশেষ

মাছ রাঙ্গার মত এক ধরনের পাখীকে تَمّ বলা হয়। যার ঠোট লম্বা এবং ঘাড় মাছ রাঙ্গার চেয়ে অধিক লম্বা হয়। গোস্ত খাওয়া হালাল। কারণ এটি পাক পবিত্র পাখী।

تمساح

(১১৩) কুমীর

কুমীর খুবই প্রসিদ্ধ একটি প্রাণী। কোন সময় ছোট মানুষকেও কুমীর বলে। ফার্সী ভাষায় نهنگ এবং হিন্দী ভাষায় কুমির বলে। ইমাম কাযবিনী বলেন, এ প্রাণীটি গুই সাপের মত এবং আর্দ্র জাতীয় প্রাণীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী

আশ্চর্যের হয়ে তাকে। এর মুখ হয় বড়। উপরের পাটিতে ৬০টি সরু দাঁত আর নীচের পাটিতে ৪০ টি সরু দাঁত রয়েছে। দু পাটির দাতের মা ঝখানে একটি চৌকোনা বিশিষ্ট দাত রয়েছে। মুখ বন্ধ করলে পরস্পর মিশে যায়।

কুমীরের জিহবা লম্বা হয়ে থাকে এবং কচ্চপের পীঠ, লোহার মত শক্ত নয়। এই প্রাণী চার পা এবং লম্বা লেজ বিশিষ্ট হয়ে থাকে। পানিতে এর থাবা খুবই শক্ত। এর কাধের নিম্নাংশে আঘাত করলেই কেবল একে কাবু করা সম্ভব। সে পানিতেই বড় হতে থাকে। এটি দশ গজ দৈর্ঘ এবং ২/৩ গজ প্রস্ত হয়। এরা ঘোড়াকে পর্যন্ত নিঃশেষ করে ফেলে। কুমীর যখন সঙ্গম করার ইচ্ছা করে তখন স্ত্রী-পুরুষ উভয়ই স্থলে চলে আসে। স্ত্রী কুমির চিত হয়ে শুয়ে পড়ে এবং উভয়ই একাকার যায়। সঙ্গাম শেষে পুরুষ কুমির যখন চলে যায় তখন স্ত্রীটিকে উল্টিয়ে দিয়ে যায়। কারণ স্ত্রী কুমীর যখন চিত হয়ে শুয়ে পড়ে হাত- পা ছোট এবং শরীর শুকিয়ে যাওয়ার কারণে সোজা হতে পারে না। পুরুষ কুমির যদি স্ত্রীকে এভাবে ফেলে চলে যায় তাহলে স্ত্রী কুমির সে ভাবেই থাকে। দিন কয়েক পর সোজা হয়ে স্থলে উঠে ডিম পাড়ে। এর যে ডিমটি পানিতে পৌছে সেটিতে কুমীর হয় আর যে ডিম স্থলে থেকে যায় তাতে এক প্রকার সামুদ্রিক প্রাণী হয়। যে প্রাণী গ্রীষ্ম কালে পাওয়া যায়। তা গিরগিট থেকে সামান্য বড় এবং মোটা হয়ে থাকে। তার লেজ ছোট হয়।

কুমীরের কতিপয় বৈশিষ্ট ঃ

কুমিরের পায়খানার রাস্তা নেই। এর পেট যখন পুর্ন হয়ে যায় তখন স্থলে এসে মুখ খুলে দেয়। কুমীরের এ অবস্থা দেখে ক্বাত্ব ক্বাত্ব পাখী তার কাছে চলে আসে। তখন কুমীর এই ক্বাত্ব ক্বাত্বের মুখে ঢেলে দেয়। ক্বাত্বক্বাত্ব হল কালোর মধ্যে সাদা ডোরা বা সাদার মধ্যে কাল ডোরা বিশিষ্ট এক প্রকারের ছোট পাখী। সে তার খাদ্যান্বেষণে উড়ে বেড়ায় সে কুমীরের পাশে এসে তার খাদ্যের প্রয়োজন মেটায়। যে কুমীরের জন্য স্থায়ী ভিত্তি হয়ে থাকে। এই পাখীর মাথায় আবার কাঁটা থাকে। যখন কুমীরের মুখবন্ধ করে দেয় তখন সে কাঁটা দ্বারা আঘাত করে যে কারণে কুমীর আবার মুখ খুলে দেয়। (সামনে এর আলোচনা হবে) প্রাণী বিজ্ঞানীগণ লিখেন, কুমীরের ৬০ টি দাঁত থাকে, ৬০টি রগ থাকে ৬০ বার সহবাস করে ৬০ টি ডিম পাড়ে এবং ৬০ বছর বেচে থাকে।

আবু হামিদ স্পেনী লিখেন, কুমীরের ৮০টি সরু দাঁত হয়। ৪০টি দাঁত হয় উপরের পাটিতে আর ৪০ টি হয় নীচের পাটিতে। কুমরি সব সময় তার দুয়াল ঘুরাতে থাকে। তার হাড় বুক পর্যন্ত লম্বা। কুমীরের পায়খানার রাস্তা নেই। তবে তার যৌনাঙ্গ রয়েছে। যা দ্বারা সে ময়লা আবর্জনা বের করে। কুমীর আর্দ্র হিংস্র প্রাণীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী ভীতিজনক হয়ে থাকে। এই প্রাণী শীতকালে চার মাস পর্যন্ত পানির মধ্যে লুকিয়ে থাকে। সামুদ্রিক কুকুর কুমীরের প্রধান শত্রু। কারণ কুমীর যকন ঘুমায় তখন মুখ ঘুমায়। সুতরাং সামুদ্রিক কুকুর মাটির ভিতর প্রবেশ করে লুকিয়ে থাকে। সুতরাং সুযোগ বুঝে কুমীরের মুখের ভিতর প্রবেশ করে নাড়ি ভুড়ি ভুড়ি খেয়ে ফেলে। কুমীর যতক্ষন পর্যন্ত নিহত না হবে ততক্ষণ সামুদ্রিক কুকুর বের হয়ে আসনো। বেজীও কুমীরের জন্য ভয়ের কারণ।

কুমীরের শরয়ী বিধান ঃ

কুমীর সুচালো দাঁতের সাহায্যে শক্তি অর্জন করার কারণে একদল লোক তা খাওয়া হারাম বলেছেন। শেখ মুহিব্বুদ্দীন ত্বিবরী (রহ.)বলেন ক্বরশ (এক প্রকার সামুদ্রিক কুকুর) মাছ হালাল। ক্বরশ এর প্রকার মাছ। একে কালবুল বাহার বা সামুদ্রিক কুকুরও বলা হয়। এই প্রাণী পানির জীব-জন্তুকে দাঁতের সাহায্যে তলোয়ারের মত কেটে ফেলে। এরপর তার বলেন. যদি তুমি তাই বল যে,ক্বরশ মাছ তার দাঁতের কারণে শক্তিশালী হয় তাহলে তার বিধান কুমীরের মতই হবে। কিন্তু সঠিক কথা হল যেহেতু কুমীরের গোস্ত হারাম সেহেতু আমি জবাবে বলব যে আমি এই কথাকে সমর্থন করিনা। সামুদ্রিক প্রাণীর মধ্যে যে কোন প্রাণীই দাঁতের কারণে বলবান হয় তাই হারাম। কুমীর যেহেতু ক্ষতিকারক, পুতিগন্ধময় এবং অপবিত্র, সেহেতু তা আসলেই হারাম। শারহুত তাম্বীহের ভাষ্য মতে বুঝা যায় যে, কুমীরের গোস্ত হারাম হওয়ার কারণ সুঁচালো দাঁতের কারণে। তবে হারাম হওয়ার এই কারণ সঙ্গত নয়। কারণ সমুদ্রে এমন অনেক প্রাণী আছে যারা তাদের সুচালো দাঁতের সাহায্যে শিকার করে থাকে । যেমন ক্বরশ মাছ। অথবা ক্বরশ মাছ হালাল। ইহাই মীমাংসিত যে, সামুদ্রিক হুকুম নানা প্রকারের থাকে যেমন হয়ে থাকে শুকনার হুকুম। ইমাম দামিরী বলেন- এ আলোচনাটি আমার নিকট সুস্পষ্ট মনে হয়।

কিছু প্রবাদ বাক্য ঃ

وكافاه من تمساح هر اظلم সে কুমীরের চেয়েও অধিক অত্যাচারী। مكافاة التمساح সে কুমীরের প্রতিদান দেয়ার মত প্রতিদান ছিল।

চিকিৎসাক্ষেত্রে কুমীরের উপকারিতা ঃ

চোখের ব্যথাতে কুমীর চোখ বেধে দিলে বেদনার উপশম হবে। যদি বাম চক্ষু বেদনা করে তাহলে বাম চক্ষু বেধে ঝুলিয়ে দিলে আর ডান চক্ষু বেদনা করলে কুমীরের ডান চক্ষু বেধে রাখলে চোখের যাবতীয় ব্যথা বেদনা দূর হয়ে যাবে। কুমীরের চর্বি গলিয়ে একটি মোমদানীতে রেখে বাতি জালিয়ে পানিতে রেখে দিলে সে পানির ব্যাংগ গুলো আর ঘ্যাং করবেনা। কারো কান বেদনা করলে এর চর্বি কর্নে প্রবেশ করালে কান বেদনা ভাল হবে। যদি কেহ বধির হয়ে যায় তাহল এর চর্বি কানে ঢাললে বধিরতা ধূরীভূত হয়ে যাবে। যার চোখে সাদা ফুল পড়ে সে যদি কুমীরের পিত্ত দ্বারা সুরমা বানিয়ে চোখ ব্যবহার করে তাহল চোখ ভাল হয়ে যাবে। কুমীরের ডান চোয়ালের কয়েকটি দাঁত কোমরে বেধে সহবাস করলে যৌন ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। এর চর্বি মাথা ব্যাথা ও আধ কপালে মাথা ব্যাথার জন্য বিশেষ ফলপ্রদ। এর কলিজার নির্জাস পাগলের মহৌষধ।

ইমাম কাযবিনী বলেন, কারো দেহে কম্পন রোগ হলে কুমীরের বাম দিকের প্রথম দাঁতটি বেধে রাখলে কম্পন রোগ ভাল হয়ে যাবে। কারে যদি মৃী হয় তাহলে কুমীরের কলিজার ধুপ দিলে এ রোগ ভাল হয়ে যাবে। কুমীরের এক টুকরা চামড়া ভেড়ার কপালে বেধে দিলে সে ভেড়া সমস্ত ভেভড়ার উপর বিজয়ী হবে। কুমীরের পেটে যে পায়খানা হয় তা যদি সুরমা করে চোখে লাগিয়ে দেয়া হয় তাহলে ফুলপড়া চোখে যে নতুনত্ব পয়দা হবে তা পুরাতনের যেয়ে পুরাতন হবে এবং রোগ দুর হয়ে যাবে। কুমীরের পায়খানা মিশ্‌কে আম্বরের মত সুগন্ধি হয়। তাই কিবতীদের নিকট মেশকের বস্তুই বটে। তবে এই মেশকে সামান্য দুর্গন্ধ আছে।

স্বপ্নের ব্যাখ্যাঃ

স্বপ্নে কুমীর দেখা দুশমনের লক্ষণ। কারো মতে স্বপ্নে কুমীর দেখলে গড়াটে দান্দাল, ধোকাবাজ ডাকাত,ইত্যাদি হওয়ার লক্ষন। কুমীরের গোস্ত, চামড়া, হাড় এবং তার সমস্ত শরীর দুশমনের মাল। যে কেহ এই গুলোর কোন

একটি স্বপ্নে দেখে তাহলে ব্যাখ্যা হবে সে তার দুশমন থেকে ধন সম্পদ পাবে।

تميلة

(১১৪)বিড়ালের মত প্রাণী বিশেষ

হেজাজে বিড়ালের সমান একপ্রকার প্রাণী হয় তাকে تميلة বলে। এর বহু বচন تملان

মেশক আম্বর সম্বন্ধে বিশেষ ধারণা ঃ

মেশক একটি অত্যন্ত মূল্যবান বস্তু। কুমীরের আলোচনায় মেশক সম্পর্কে আল্লামা দামিরী (রহ.) কিবতীদের মতবাদ আলোচনা করেছেন। কিন্তু কিবতীদের এ ধারনা একদম ভুল। মেশক শব্দটি মুলত ফার্সী। আরবীতে একে مسك বলে। তুর্কী ভাষায় بيـــار, হিন্দী ভাষায় كستـــورى, রুমান ভাষায় مـوردن, সুরইয়ানী ভাষায় ســكـه বলে। মেশক মূলত বিশেষ প্রকার হরিণের নাভীতে জন্ম নেয়। নাভী হল হরিনের সেই বিশেষ অঙ্গ যাতে মেশক হয়। এ ধরনের হরিণ অন্যান্য হরিনের চেয়ে হালকা পাতলার হয়ে থাকে। এপ্রকারের হরিণের নাভীতে আল্লাহ পাকের হুকুমে রক্ত জমাট হয়। কয়েকদিন পর এতেই অত্যন্ত সুগন্ধি জন্ম নেয়। এই জমাট বাধা রক্তই মেশক। কোন লোকের ধারনা হয়ে যায় যে সে তার নিজের আশপাশের খবর পর্যন্ত রাখতে পারেনা। সে এর খোঁজে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়। এ ব্যাপারে প্রসিদ্ধ হিন্দী কবি কবির দাস লিখেছেন:

کستوری کندلی بے مرگ ڈھونڈے بن ماہی::ایسے گھٹی رام ہیں دنیا دیکھے ناہیں

"মেশক রয়েছে হরিনের নাভীতে । সে এর খোঁজে জঙ্গলে চষে বেড়াচ্ছে। এমনিভাবে আল্লাহ পাক সবস্থানে আছেন কিন্তু মানুষ তাকে চিনতে পারেনা।

হেকিমদের কারো কারো মতে মেশক চার প্রকার।

* হরিণের নাভী থেকে ঋতে প্রাবের রক্তের ন্যায়ে বের হয়ে পাথরের উপর জমাট বাধে- ইহা অত্যন্ত সুগন্ধময় এবং সুখাকৃতির হয়। এই মেশক সর্বোত্তম।

* প্রাণী তার নাভীকে কোন গাছের সহিত ঘর্ষন করতে থাকে। কেননা মেশক যখন হরিণের নাভীতে বেশ কয়েক দিন হয়ে যায় তখন এর নাভীতে

খোস প্যাচরা এবং তপ্ততা এসে যায়। যে কারণে অসহ্য হয়ে হরিণ তার নাভীকে বৃক্ষ অথবা পাথরের সহিত ঘর্ষণ করতে থাকে। যার মেশক বের হয়ে যায়।

* শিকারীা শিকার করার পর নাভী থেকে বে করে। ইহা জমাট রক্ত নয়। বরং চিড়ে বের করে তারা এসে সূঘ্রান করে।

* শিকারীরা শিকার করে তার নাভী থেকে বের করে- অতঃপর এই রক্তকে তার কলিজা এবং বিষ্টার সহিত মিশিয়ে খামীর করে । এভাবে শুকিয়ে টুকরা করে। তবে ওধরনে মেশক খুব স্বল্পমূল্যের ও সাধারণ হয়।

বাকী হাকীমগন বলেন, মেশক দু প্রকার। প্রথমতঃ যে মেশক পাথরে ঘর্ষণের ফলে ঋতু স্রাবের ক্তের মত বের হয়ে জমাট বেধে যায়।দ্বিতীয়তঃ হরিণের খোস প্যাচরা ও তপ্ততার কারণে অসহ্য হয়ে পাথরে বা কৃক্ষের গায়ে ঘর্ষনের ফলে যে মেশক বের হয়। এতে করে মেশক অন্তর্ভুক্ত অংশটুকু আহত হয়। কোন কোন সময় মেশক বিক্রয় কারী আসল মেশক স্বল্প পরিমানে মিশ্রিত করে নকল মেশক বানানোর এর দ্বারা অনেক লাভবান হয় নকল মেশক পদ্ধতি হল- সামান্য পরিমান আসল মেশক এতে চৈতী পসলের চারা চিক্রল বকরীর কলিজা এবং কবুতরের রক্তের সহিত মিশ্রিত করে খামির বানিয়ে সে যা কেটে সাবধানে রেখেছে। হরিণের নাভীতে ভর্তি করে এমনভাবে ছিটি এঁটে দেয়া হয় যে, কেউ দেখলে ভাবতে পারবে না যে, তা নকল না আসল। এ থেকে কিছু ক্রয় করলেই মেশক ক্রয় করা হল- মেশক চেনার উপায় হল- একটি শুইয়ের মধ্যে সুতা সংযোজন করে নাভঅতে রেখে দিতে হবে। অতঃপর সে সুতাটি বের করে রসুনের পানিতে যেখানে অধিক পমিানে রসুন রয়েছে- এত ছেড়ে দিতে হবে। যদি রসুনের ছিদ্র দিয়ে সঘ্রান চলে আসে তাহলে বুঝতে হবে ইহা নকল মেশক অন্যথায় আসল মেশক।

* মেশক যদি নাভীর বাইরে হয় তাহলে সামান্য একটু এতে নিয়ে স্বল্প পানিতে মিশ্রিত করতে হবে। যদি তা গলে যায় তাহলে বুঝতে হবে তা সঠিক আর যদি গলে না যায় এবং মোমের মত হয়ে যায় তাহলে বুঝতে হবে ইহা নকল । তৃতীয়টি হল সামান্য মেশক নিতে হবে। অতঃপর একটি পাত্র আগুনে রাখতে হবে। অতঃপর সে মেশক পাত্রটিতে রাখতে হবে। যদি এ থেকে ত্যাজ এবং সূঘ্রান আসে তাহলে বুঝতে হবে তা আসল অন্যথায় নকল। বেশী দিন

হয়ে গেলে মেশকের প্রভাব চলে যায়। নাভীতে তিন বছর ঠিক থাকে এবং তিন বছর পর এর কোন আছর থাকেনা। নাভী থেকে বের হলে মাত্র এক বছর তার প্রকার থাকে। মেশক যৌন শক্তি সম্পন্ন এবং অন্তর ও মস্তিষ্ককে সুপ্রস্ন রাখে। ভিতরের ইন্দ্রীয়কে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখে এবং দ্রুত বীর্য স্খলনে উপকারী।

تنوط

(১১৫) পাখী বিশেষ

ইবনে রিফায়াহ লিখেছেন تنوط এর تاء এ পেশ, واؤ এ যের।কিন্তু مشدد مضموم এবং نون مفتوح - تائے مشدد مفتوح পড়া যায়। কোন জ্ঞানীগণ বলেন تنوط এক প্রকার পাখী । واؤ এ পেশ এবং زبر উভয়ই পড়া যায়। امام اصمعی বলেন تنوط হল সে পাখী গাছের কুঠুরীতে ডিম পেরে তাতে তা দেয়। এর এক বচন تنوط হয় এই পাখীর বৈশিষ্ট হল রাতে সে অন্য পাখীদের বাসায় চলে যায়। যার কারণে সকাল পর্যন্ত শান্তিতে বসতে পারেনা। এই পাখীকে ضفاء বলে। এর বিস্তারিত আলোচনা باب صاد এ আসবে।

এর শরয়ী বিধান ঃ

এই পাখীর গোস্ত হালাল, কারণ সে চড়ুই জাতীয় পাখী।

চিকিৎসা ক্ষেত্রে এর উপকারিতাঃ

ইমাম কাযবিনী লিখেন , তান্নুত পাখী ছুরী দ্বারা জবাই করে এর রক্ত নেশাখোর ও চরিত্রহীনদের ব্যবহার করতে দিলে উপকার হবে। এর পিত্ত সিরকায় পাক করে শিশুকে খাওয়ালে শিশু চরিত্রবান হবে। যদি কোন শিশুকে মানুষ অপছন্দ করে তাহলে যে সময় চন্দ্র পড়তে থাকে সে সময় تنوط পাখীর হাড় শিশুর গলায় বেধে রাখলে লোকেরা তাকে স্নেহ করবে।

تنين

(১১৬) অজগর সাপ

অজগর সাপকে تنين বলা হয়। এর উপাধি ابومرداس কারো মতে- এক প্রকার মাছকে تنين বলে। تنين এর تاء এ কাছরাহ ও نون مشدد ছাকীন। ইমাম কাযবিনী বলেন এই সাপ বিষাক্ত সাপ থেকেও ভীতি জনক। এর মুখ বল্লমের ফলার মত, সুচালো দাত খেজুরের মত লম্বা হয়। বঙ্কিম চক্ষু, প্রশস্ত

মুখ বড় পেট ভীতি জনক চোখ হয়। এরা অনেক প্রাণীকে গিলে খায়। ডাঙ্গায় ও সামুদ্রিক প্রাণীরা একে অত্যন্ত ভয় পায়। সে যখন চলতে আরম্ভ করে তখন তার শক্তির কারণে সাগর দোলায়িত হতে থাকে । প্রাথমিক অবস্থায় এই সাপ উদ্ধৃত হয়ে থাকে। ডাঙ্গার প্রাণীরক এরা গিলে খায়। এর ঐদ্ধৃত যখন প্রবল আকার ধারণ করে তখন একজন ফেরেস্তা একে সাগরে নিক্ষেপ করে। সুতরাং যে আচরণ ডাঙ্গার প্রাণীর সহিত করত সে আচরণ সামুদ্রিক প্রাণীর সহিতও করতে থাকে। যে কারনে সে খুব মোটা হয়ে যায়। অতঃপর আল্লাহ পাক তার উপর একজন শাসনকারী ফেরেস্তা প্রেরণ করেন- তখন সে ফেরেস্তা তাকে ইয়াজুজ মাজুজ নামক দু ফেরেস্তার নিকট পাঠিয়ে দেন।

কেউ বলেছেন যে, তিনি ২ ফরছখ লম্বা সাপ দেখেছেন ০ (১ফরছখ পৌনে ৪ মাইল ১৮, ০০০ ফুট প্রায়) যার রং চিত্রল। মাছ বা অন্যান্য প্রাণীর চামড়ার উপর যেমন গোটা গোটা দাগ পড়ে সে রকম মনে হল। মাছের দুই পাখার মত পাখা, মানুষের মাথার মত মাথা, দেখতে একটি টিলার মত মনে হচ্ছিল। লম্বা কান, চোখ গোলাকার এবং লম্বা।

হাদীছ শরীফে অজগারের আলোচনাঃ

হযরত আবু সাইদ খুদরী (রা.) বলেন, নবী করিম (স.) এরশাদ করেছেন- আল্লাহ পাক কাফেরদের কবরে ৯৯ টি সাপ পাঠাবেন। তারা কাফেরদেরকে কিয়ামত পর্যন্ত দংশন করতে থাকবে এবং নিষ্পোষন করতে থাকবে। এ ধরনের সাপের কোন একটি যদি যমীনে একবার ছোবল মারে তাহলে যমীন তার উদগত ক্ষমতা হারিয়ে ফেলবে।

আরেক হাদীছে আছে, নবী করিম (স.) একদা মসজিদে প্রবেশ করে দেখলেন যে, লোকেরা আলাপ চারিতায় মগ্ন রয়েছে। এতে নবী করিম (স.) এরশাদ ফরমান মনে হয় তোমরা যে কাজে লিপ্ত রয়েছে, তাছাড় যদি তোমরা স্বাদ-আস্বাদনের অপবাদে লিপ্ত থাকতে (তাহলে ভাল হত) স্বাদ-আস্বাদনের তিরস্কার বেশী বেশী কর। কেননা কবরের ভিতর এমন কোন দিন অতিবাহিত হবেনা যার মধ্যে তোমাদেরকে বলবে যে আমি بيت الغربت (মুসাফিরের ঘর) بيت الوحده (একাকিত্ব ঘর) بيت التراب (মৃত্তিকার ঘর) بيت الدور (পোকা -মাকড়ের ঘর) والهوام সুতরাং যখন কোন মুমিন ব্যক্তিকে দাফন করা

হয় তখন কবর তাকে স্বাগতম জানিয়ে বলে আমার বিশ্বাস তুমি আমার সেই প্রিয় বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত যে আমার পিঠের উপর আমার দিকে চলো। আমি যেহেতু আজ তোমার মালিক হয়ে গেলাম সেহেতু তুতি দেখবে যে, আমার সহিত তোমার কতইনা ভাল সম্পর্ক। নবী করিম (স.) এরশাদ ফরমান তারপর তার কবরটি দৃষ্টি সীমা পর্যন্ত প্রশস্ত করে দেয়া হবে। তার একটি দরজা বেহেস্তের দিকে খুলে দেয়া হবে। আর যখন কোন কাফের অথবা ফাসিক অথবা কোন পাপিষ্ট বান্দাকে দাফন করা হয় তখন কবর তাকে لا مرحبا ولا اهلا বলে তিরস্কার করতে থাকে এবং বলতে থাকে আমার মনে হয় তুমি আমার পিঠের উপর দিয়ে বিচরণকারী সে বস লোকদের অন্তর্ভূক্ত যাদেরকে আমি ঘৃনা পোষণ করতাম এবং যাদেরক আমি মোটেও ভালবাসতাম না । অদ্য যেহেতু আমি তোমার মালিক হয়ে গেলাম এবং তুমি আমার হয়ে গেলে- তখন দেখবে যে তোমর সহিত কি আচরণইনা করা হয়। এরপর তার কবর এতই সংকীর্ণ করা হবে যে, তার কবরের এক পাশ অপর পাশের সহিত মিশে যাবে। এবং তার পাজরের এক হাড় অপর হাড়ের ভিতর প্রবেশ করবে। অতঃপর নবী করিম (স.) হাতের ইশারায় দেখিয়ে (এভাবে ঢুকে যাবে) এক হাতের আঙ্গুল সমূহ অপর হাতের আঙ্গুলের ভিতর প্রবেশ করান (অতঃপর বলেন) তার উপর ৯০ বা ৯৯ টি সাপ লেলিয়ে দেয়া হবে এদের মধ্যে কোন একটি সাপ যদি যমনিে ছোবল মারে তাহলে কিয়ামত পর্যন্ত যমীনে আর কোন (ফসল) উদগত হবেনা। (যমীন ফসল দেয়ার কোন উপযোগী থাকবে না) হিসাব কিতাবের জন্য উঠানোর দিন পর্যন্ত এভাবে তাকে ধ্বংসন ও নিস্পেষণ করতে থাকবে। এবং চেহারা পরিবর্তন হবে থাকবে। রাবী বলেন- অতঃপর নবী করিম (স.) বলেন, কবর হল জান্নাতের একটি পূস্পবিথীর একটি পূস্পবীথি অথবা জাহান্নামের গর্তের একটি বিরাট গর্ত। (তিরমিযী)

হযরত মুসা (আ.) এর লাঠির বৈশিষ্ট ঃ

উলামায়ে কেরাম লিখেছেন যে, যখন হযরত মুসা (আ.) হযরত শুয়াইব (আ.) এর নিকট আরজ করলেন ايما الاجلين তখন হযরত শোয়াইব (আ.) মুসা (আ.) কে এই আদেশ করলেন যে, অমুক ঘরে অনেক লাঠি রাখা হয়েছে। ওগুলোর মধ্য থেকে একটি নিয়ে যান। এরপর মুসা (আ.) ঘরে প্রবেশ করলেন এবং তিনি সে লাঠিটিই হাতে নিলেন যেটি হযরত আদম (আ.) বেমেস্ত থেকে

নিয়ে এসেছিলেন। অতঃপর এই লাঠি খানাই সমস্ত নবীগণের নিকট ওয়ারিশ সূত্রে পর্যায়ক্রমে চলে আসছিল। শেষ পর্যন্ত হযরত শোয়াইব (আ.) এর অংশে চলে আসে। হযরত শোয়াইব (আ.) মুসা (আ.) কে বলেন- লাঠিখানা ঘরে রেখে আসুন ইহা ব্যতীত অন্য আরেকটি লাঠি নিয়ে আসুন। মুসা (আ.) ঘরে প্রবেশ করে সে লাঠিখানাই বের করে আনেন এভাবে হযরত মুসা (আ.) সত বার করলেন। হযরত শোয়াইব(আ.) বুঝলেন আল্লাহ তা'আলার নিকট হযরত মুসা (আ.) নিশ্চয় কোন গুরুত্ব আছে। সকাল বেলা হযরত শোয়াইব (আ.) মুসা (আ.) কে বল্লেন বকরীগুলোকে চারন ভূমিতে নিয়ে যাও। কিন্তু ডানদিকে যাবে যদি সেদিকে কোন ঘাস না থাকে বাম দিকে যাবে, সেদিকে খুব ঘাস রয়েছে সে দিকে কিন্তু একটি বিরাট অজগর সাপ রয়েছে- যে বকরীগুলোকে মেরে ফেলবে। সুতরাং হযরত মুসা (আ.) বকরী গুলোকে চারণ ভূমিতে নিয়ে গেলেন। তখন বকরীগুলো স্বেচ্ছাই বাম দিকে খেতে লাগল। তিনি এদেরকে প্রতিরোধ করতে পারলেন না (তিনি যখন পালেনইনা তখন) এদেরকে স্বাধীনভাবে চড়তে দিলেন। কিছুক্ষন পর হযরত মুসা (আ.) এর নিদ্রা এসে গেল। তখন অজগর সাপটি গর্ত থেকে বের হয়ে এল। লাঠি অজগরের সম্মুখীন হল । শেষ পযন্ত অজগরটি মারা গেল। মুসা (আ.) জেগে দেখল লাঠিতে রক্ত এবং অজগর মৃত। এই ঘটনা তিনি হযরত শোয়াইব (আ.) অবহিত করলে তিনি অত্যন্ত খুশী হয়ে বল্লেন এই বছর যে বকরী দুই রঙ্গের জন্ম গ্রহণ করবে এগুলো তোমার (মুসার) জন্য। সুতরাং সে বছর সমস্ত বকরীই দুই রং হয়ে জন্ম গ্রহণ করল। এসমস্ত ব্যাপারে হযরত শোয়াইব (আ.) বুঝতে পারলেন যে, মুসা (আ.) এর জন্য আল্লাহর এর বিশেষ শান পদমর্যাদা রয়েছে। এরপর মুসা (আ.) খেদমতে ২৮ বছর থাকেন তিনি পদমর্যাদা রয়েছে। এরপর মুসা (আ.) এর খেদমতে ২৮ বছর থাকেন তিনি ৪০ বছর পূর্ণ করেন। এরপর তিনি তার স্ত্রী (সফুরা) কে নিয়ে চলে আসেন।

অজগরের শরয়ী বিধান ঃ

ইমাম কাযবিনী বলেন, অজগর যেহেতু সাপের অন্তর্ভূক্ত এজন্য এর গোস্ত হারাম। যদি তিমি বলেও একে ধরে নেয়া হয় তবু সুচালো দাঁত থাকার কারণে এর গোস্ত হারাম, যেমন হারাম কুমীর।

চিকিৎসা ক্ষেত্রে উপকারিতাঃ

অজগরের গোস্ত বীরত্ব সৃষ্টি করে। এর রক্ত পুরুষাঙ্গে মালিশ করে সহবাস করলে আশাতীত স্বাদ পাওয়া যায়। অজগরের ছাই মধুর সাথে মিশ্রিত করে প্রলেপ দিলে অর্শ-ভগন্দর এবং ধবল কুষ্ট ভাল হয়। কোন স্থানে অজগরে কামড় দিলে স্থানে অজগরের গোস্ত বেধে দিলে উপকার হয়।

স্বপ্নের ব্যাখ্যা ঃ

অজগর স্বপ্নে বাদশাহর আকৃতিতে দেখা দেয়। স্বপ্নে অজগরের ২ বা তিনটি মাথা দেখলে অত্যন্ত ভয়ের কারণ । যদি কোন অসুস্থ ব্যক্তি অজগরকে স্বপ্নে দেখে তাহলে মৃত্যুর লক্ষন। একদা স্বপ্নে এক মহিলা দেখল যে, সে অজগর প্রসব করেছে । বেশ কিছুদিন পর বুঝতে পারল যে, সে ঘটনার কারণেই তার ল্যংড়া সন্তান জন্ম গ্রহণ করেছে। এজন্য অজগর যখন চলতে থাকে তখন টেনে টেনে চলে। তাই ল্যাংড়া মানুষও খুড়িয়ে খুড়িয়ে চলে।

হযরত মুসা (আ.) এর লাঠি সম্পর্কে সামান্য ব্যাখ্যা ঃ

হযরত মুসা (আ.) এর লাঠির ব্যাপারে অনেক ধরনের আশ্চর্য কথা-বার্তা বর্ণিত আছে। কেউ এমনও বলেছেন এই কাষ্ঠ খন্ডটি রাতে বাতির মত আলোকিত হত। তিনি যখন শুয়ে পড়তেন তখনও এই লাকড়ীটি তার ভেড়া -বকরীর পাল দেখা শুনা করত। যখন কোন ছায়া পাওয়া যেতনা তখন এই কাষ্ঠ খন্ডটি মাটিতে খাড়া করে দিলে তাবুর মত ছায়া দিত। কোন কোন লোকে লিখেছেন যে, এই কাষ্ঠ খন্ড খানা হযতে আদম (আ.) এর ছিল ! তিনি তা বেহেস্ত থেকে থেকে এনেছিলেন। অতঃপর ইহা পর্যায়ক্রমে ওয়ারিমী সূত্রে হযরত শোয়াইব (আ.) থেকে হযরত মুসা (আ.) পর্যন্ত পৌছে। কেহ কেহ এই লাকড়ীর নাম 'মাশা' বলেছেন। আরে বলা হয়েছে যে, কিয়ামতের কাছাকাছি সময়ে এই লাকড়ীটিই دابة الارض এর আকৃতিতে প্রকাশিত হবে।

এমনিভাবে হযরত মুসা (আ.) এর লাঠির ব্যাপারে অনেক কথাই বর্ণিত রয়েছে। তবে এ সমস্ত বনী ইস্রাইলের মনগড়া বলে প্রতীয়মান হয়। কোননা পবিত্র কুরআনে রয়েছে- যখন আল্লাহ্ পাক হযরত মুসা (আ.) কে জিজ্ঞেস করলেন- হে মুসা! তোমার ডান হাতে এটা কি? এর উত্তরে মুসা (আ.) বলেছিলেন আমার হাতে লাঠি, এতে আমি ভর করে দাড়াই , আমার বকরীর

জন্য এর দ্বারা (বৃক্ষের) পাতা পাড়ি (এখানে আল্লাহ পাক হযরত মুসা(আ.) এর নিকট জানতে চাইলেন হে মুসা তোমার ডনি হাতে এটা কি? মুলত এখানে লাঠি সম্পর্কে মুসা (আ.) কে সাবধান করাই ছিল উদ্দেশ্য । অতঃপর আল্লাহ পাক মুসা (আ.)কে বললেন, মুসা লাঠিখান মাঠিতে ফেলে দাও। সুতরাং মুসা (আ.) আল্লাহর আদেশ পালনার্থে লাঠিখান মাটিতে ফেলে দাও। সুতরাং মুসা (আ.) আল্লাহর আদেশ পালনার্থে লাঠিখান মাটিতে নিক্ষেপ করলেন। মাটিতে পড়েই একটি প্রকান্ড অজগরে পরিণত হল। এই প্রকান্ড অজগর দেখে মুসা (আ.) ভর্কে যান। আল্লাহ পাক বল্লেন- মুসা ভয়ের কোন কারণ নেই । তুমি একে ধর। এখন আমি একে তার পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দেব। কিন্তু মুসা (আ.) তখন এমন ভীত ছিলেন যে, পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে দ্রুত দৌড়াতে থাকেন। কিন্তু আল্লাহ পাকের কালামের কথা স্বরণ হতেই তিনি ফিরে এলন এবং লজ্জিত হয়ে দাড়িয়ে গেলেন। সেখানে আল্লাহ পাকের আদেশ হল যে, মুসা ফিরে যাও সেখানে যেখানে তুমি ছিলে।

হযরত মুসা (আ.) ফেরত এলন বটে কিন্তু তিনি ভীত ছিলেন। আল্লাহ পাক আদেশ করলেন তোমার ডান হাত দ্বারা একে ধর। আমি একে তার আসল ছুরতে ফিরিয়ে দেব। (সে সময় মুসা (আ.) মোটা পশমী কাপড়ের কম্বল গায়ে জড়িয়ে ছিলেন যা একটি কাঁটা দ্বারা আটকানো ছিল। হযরত মুসা (আ.) সে কম্বলকে তার হাত দ্বারা ধরেন। সে ভীতি জনক সাপকে ধরতে ধরতে চাইলেন। তখন এক ফেরেস্তা বল্লেন- হে মুসা! আল্লাহ পাক যদি একে ছোবল দেয়ার আদেশ করেন তাহলে কম্বলে তোমাকে বাচাতে পারবে?

মুসা (আ.) জবাব দিলেন .কখনোইনা। ইহা আমার দুর্বলতার কারণে হয়েছে। কারণ আমি দুর্বল অবস্থায়ই জন্মগ্রহণ করেছি। এবার তিনি সাহসের সহিত কম্বল সরিয়ে অজগরের মাথায় হাত দিতেই সাপটি লাঠি হয়ে গেল। এখানে আল্লাহ তায়ালার বাণী خذها ولاتخف (একে ধর ভয় পেয়োনা) একথা প্রমান করে যে, অর্থাৎ এ ঘটনাই এই লাঠির প্রথম মো'জেযা ছিল। কেননা আল্লাহ পাকের বাণী যে, "মুসা ভয় পেয়োনা" এ কথা প্রমান করে যে, ইতিপূর্বে এই লাঠির সহিত আর কোন ঘটনা জড়িত ছিলনা। আর যদিও বা আর কোন ঘটনা এই লাঠির সহিত জড়িত থাকত তাহলে মুসা (আ.) এর বিশ্বাস হত এবং আজ এই লাঠি সাপ হওয়ার কারণে তিনি এতটা ভয় পেতেন না। কেননা

তারতো জানাই আছে যে এই লাঠি ইতিপূর্বে বেশ কয়েকবার তার কেরামতি দেখিয়েছে। কিন্তু হযরত মুযা (আ.) এর ভয় পাওয়া এবং আল্লাহ্ পাকের একথা বলা যে, "ভয় পেয়োনা" এ সমস্ত অবগত ছিল খুলে দেয় যারা এই লাঠির ব্যাপারে জড়িয়ে ছিল।

দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ্ পাক পবিত্র কুরআনে سنعيدها سيرتها الاولى বলে ও এই সমস্ত মিথ্যা অল্প কাহিনীর আবরন উম্মুক্ত করে দিয়েছেন। মুলত এখানে "سيرت" এর স্থানে صفرت ও বলতে পারতেন। কিন্তু سيرت বলে মুসা(আ.) কে বিশ্বাস জন্মানোই আল্লাহ্ পাকের উদ্দেশ্য ছিল। আর হয়েছেও তাই। আল্লাহ্ পাক যখন سيـــرتهـــا বল্লেন তখন মুসা (আ.) এর যাবতীয় ভয় ভীতি দুর হয়ে গেল এবং তিনি আশ্বস্ত হয়ে গেলেন যে, একে আর এখন ভয় করা যাবে না। একথাও এসমস্ত অলীক কথা বার্তার মূলে কুঠারাঘাত করে যা বণী ইস্রইলরা বলেছে।

কারণ ইতিপূর্বে তারা এই লাঠির আজব কান্ড কখনো দেখে নাই। এই কারণে আল্লাহ্ পাক যদি سيـرتها শব্দের স্থানে صـورتها বলতেন তাহলে মনে হয় মুসা (আ.) এর ভয় ভীতি দুর হতনা। কিন্তু سيـــرتهـــا বলার পরে তার ভয় ভীতি একদম চলে গিয়েছে এবং তিনি অজগরটিকে ধরে ফেললেন।

تـورم
(১১৭) তিতর পাখী বিশেষ

قـــطـــقـــاط নামক এক ধরনের পাখীকে تـورم বলে। ইবনে বখতিশো লিখেছেন যে, তূরম পাখী কবুতরের মত। একে طير التمساح ও বলা হয়। তার ডানাতে ২টি কাঁটা আছে। যা হাতিয়ারের কাজ করে। যখন এরা কুমীরের মুখের ভিতর প্রবেশ করে তখন কখনো কখনো কুমরি মুখ বন্ধ করে দেয়। তখন এরা ঠোঁট দ্বারা আঘাত করে, এব উড়ে চলে যায়।

ইবনে বখতিশো' লিখেছেন, এই পাখীর কাঁটার বৈশিষ্ট হল উভয় কাঁটা বা একটি কাঁটা নিয়ে কোন এমন স্থানে যদি পুঁতে দেয়া যায়, যেখানে কোন মানুষ পশ্রাব করেছে। যে লোকটি পেশাব করেছে সে ততক্ষন পর্যন্ত অসুস্থ থাকবে যতক্ষন পর্যন্ত সে স্থান থেকে এই কাটা না উঠানো হবে। যদি কারো পাকস্থলিতে রোগ হয় তাহলে এই পাখীর কলিজা বেধে রাখলে ইনশাআল্লাহ্

ভাল হবে।

تولب

(১১৮)গাধার বাচ্চা

تولب গাধার বাচ্চাকে বলে। فلان اطوع من تولب অমুক ব্যক্তি গাধার বাচ্চার চেয়েও অধিক অনুগত سيبويه এর মতে فوعل এর ওজনে হওয়ার কারণে শব্দটি منضرف গাধীকে امام تولب বলে।

এর হুকুম جاء باب এ আসবে।

تيس

(১১৯) ছাগ

জংগলী ছাগকে تيس বলে। এর বহু বচন تيوس এবং اتياس হয়। সুতরাং হযলী বলেন ঃ

من فوقه السرسود واغربة :: وتحته اعنز كلف وايتاس

"তার উপর কাল গাধা এবং এবড়ো থেবড়ো, আর নীচে রয়েছে কাল হলুদ রঙ্গের ছাগ ছাগী।"

কেউ বলেন تيس এর বহুবচন হল تيوسه কিন্তু জাওহারী বলেন এর বিশুদ্ধতা সম্পর্কে আমার জানা নাই। কারো মতে, পুরুষ হরিণকেও تيس বলে। نت التيس ينب نبيبا এর অর্থে ছাগ উত্তেজনার সময় আহবান করে । কারণ নবী করিম এ জাতীয় শব্দ দ্বারা উপমা পেশ করেছেন। সুতরাং জাবের বিন ছামুরা (রা.) বলেন- নবী করিম (স.) এর কাছে এক খর্বাকৃতির ব্যক্তিকে আনা হল। যার চুল ছিল এলোমেলো এবং খুব মোটা সোটা। লোকটি একটি লুঙ্গী বেধে ছিল। সে ব্যবিচারের অভিযোগ দিল। নবী করিম (স.) তাকে দুবার ফেরত দিলেন অতঃপর তাকে পাথর মারার আদেশ করলেন। তাকে পাথর মারা হল। অতঃপর নবী করিম (স.) এরশাদ ফরমান আমি যখন জিহাদের জন্য বের হই তখন তোমাদের মধ্যে কেউনা কেউ পেছনে পড়ে থাক। যা ছাগের মত যৌন লিপসার কারণে বারবার যায় আর সে হহিলাগণের মধ্যে সামান্য পানি দেয় (ব্যাভিচার করে) যখন আল্লাহ পাক আমাকে তাদের মধ্য থেকে কারো উপর ক্ষমতা প্রদান করবেন তখন এমন কড়া শাস্তি প্রদান করা হবে যা দনিয়াতে

শিক্ষনীয় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। (মুসলিম)

হযরত আয়েশো (রা.) বলেন, নবী করিম (স.) হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাছ (রা.) এর কাছে তার ছাহাবীগণের মধ্যে বন্টনের জন বকরীর পাল প্রেরন করেন। বন্টনের পর একটি تيس (ছাগ) অবশিষ্ট রয়ে গেল। হযরত সা'দ একে জবাই করে দিলেন। লাইছ বিন সা'দ এর ব্যক্তিগত সহকারী আবু ছালেহ যার নাম আব্দুল্লাহ বিন ছালেহ তার জীবনীতে কামিল বিন আদ্দী লিখেছেন যে ওক্ববাহ বিন আমের বলেন-

ان رسول الله ﷺ قال اخبر كم بالتيس المستعار وهو المحلل ثم قال لعن الله المحلل والمحلل له .

নবী করিম (স.) এরশাদ করেন আমি কি তোমাদেরকে ধারনকৃত ছাগ সম্পর্কে অবহিত করবে না? সে হিল্লা কারী (তিন তালাক প্রাপ্তা মহিলার সাময়িক বিবাহ যা তার পূর্ব স্বামীর সাথে বিবাহ বসতে সহায়তা করে) তারপর নবী (স.) বলেন লা'নত হিল্লাকারী পুরুষ ও হিল্লাহ কারী নারীর উপর।

এই হাদীছ دار قطنى - ابن ماجه হাসান সনদে كتاب الليات ইবনে ছায়াদ, মাসরুহ বিন হায়ান মিশরী, উকবাহ বিন আমের প্রমুখ থেকে বর্ণনা করেছেন। কোন কোন আলেম বলেছেন হিল্লাহর উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য নবী করিম (স.) লা'নত বলেছেন, কারণ এই উদ্দেশ্যে মহিলাকে আহবান দ্বারা তার চরিত্র বিচ্ছিন্ন করা এবং যার জন্য এই কাজ করা হয়েছে তাকে له محلل বলে। আর ছাগকে অপরের জন্য সঙ্গমের উদ্দেশ্যে লওয়াও অপমানের কাজ। এজন্য নবী করিম (স.) হিল্লাকারীকে কর্জ বকরীর সহিত তুলনা করেছেন। আর আরবগণ বকরী ধার করে লওয়াকে লজ্জা মনে করেন। এই জন্য কবি বলেন ابن وشر منيحة تيس معار অর্জন করা সবচেয়ে বড় দান হল কর্জ করা ছাগ

سبع سبتى লিখেছেন যে, আলী ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন আমার পিতার চোখের আলো যখন চলে যাচ্ছিল তখন তিনি মক্কা শরীফে থেকে গেলেন। একদা আমি তার সাথে ছিলাম । রাস্তায় যম যম কূপের পাশে সিরীয় লোকদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। তারা হযরত আলীকে গাল মন্দ করছিল। আমার পিতা হযরত ছাঈদ বিন যুবাইরকে বললেন, তুমি আমাকে এদের পাশে নিয়ে চল। সাঈদ (রা.) তাকে দাড় করিয়ে দিলেন তোমাদের মধ্যে কোন

লোকটি আল্লাহ ও তার রাছুলকে গালি দেয়নি। আমার পিতা বল্লেন, আচ্ছা তোমাদের মধ্যে কে হযরত আলী (রা.) এর ব্যাপারে সমালোচনা করেছো? তারা বল্ল- হ্যাঁ আলীতো এরকমই ছিলেন। একথা শুনে আমার পিতা বল্লেন- আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি নবী করিম (স.) কে বলতে শুনেছি নবী করিম (স.) বলেছেন যে ব্যক্তি আলীকে গালি দিবে সে আমাকেই গালি দিল। সে যেন আল্লাহকেই গালি দিল। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে গালি দিল তাকে আল্লাহ পাক জাহান্নামে নাক উপুড় করে পরাভূত করবেন। এরপর তিনি তাদের কাছ থেকে চলে আসেন। আমার পিতা বল্লেন- হে আমার বৎস! তুমিতো দেখলে তারা কিভাবে গালি দিয়েছে, আমি জবাব দিলাম আব্বাজান-

نظروا اليك باعين محمرة:: نر التيوس الى شفاء الجاذر

"চলাফেরা আপনাকে তীক্ষ্ণভাবে অবলোকন করছে। যেমন ছাগ জবাইকারী ছুরিকে অবলোকন করে থাকে।

এ কথা শুনে পিতা বললেন- আরো একটি পড়। আমি পড়লাম:

شزر العيون منكى اذقانهم:: نظر الذيل اليالعزيز القهر ام

"লজ্জিত দৃষ্টি চিবুকের উপর ঝুকে কোন কোন বিজয়ী শক্ত ও কোন শক্তিশালীর দিকে কোন অপমানিতকে দেখার মত।"

আব্দুল আজিজ কুরাইশী'র জীবনীতে লেখা আছে , তার দাড়ী লম্বা হওয়ার কারণে আলী বিন হজর ছাদী এই কবিতা বলেছিল:

ليس بطول اللجى :: تستو جيون القضا

"দাড়ী দীর্ঘ হওয়ায় যে কর্তব্য তোমার উপর বর্তায় তা তুমি পালন করছ না।"

ان كان هذا كذا:: فالتيس عدل رضا

"কেননা কথা যদি এ রকমই হত তাহলে ছাগই ন্যায় পরায়ন ও পছন্দের হত।"

আলী বিন হাজর আরো বলেন, তাওরাতে আছে তোমরা লম্বা দাড়ীর ধোকা খেওনা। কারণ ছাগলেরও লম্বা দাড়ী হয়।

(ছাগের শরয়ী হুকুম معز এর অধীনে আসবে)

ইমাম জাহাবী ২৯৯হিঃ ঘটনাসমূহে লিখেছেন একদা খলিফা মুকতাদির বিল্লাহর কাছে মিশর থেকে কিছু হাদিয়া এল। তাতে পাঁচ লক্ষ আশরাফী ছিল। একটি ছাগ ছিল যার উলান থেকে দুধ বের হচ্ছিল। আর এমন একটি লোক ছিল যার পাজর এক বিগত চাওড়া আর ১৪ বিগত লম্বা ছিল।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর বলেন, নবী করিম (স.) এরশাদ ফরমান আমার উম্মতের মধ্যে এমন একটি সময়ে আগমন করবে যখন ফকীহগণ একজনের সাথে অপরজন ঈর্ষা পোষণ করবে। এদের মধ্যে একে অপরের উপর আক্রমন করবে, রক্ত প্রবাহিত করবে যেমন ছাগল একে অপরের উপর আক্রমন করে রক্ত প্রবাহিত করে ।

হযরত মালেক বিন দিনার (রা.) বলেন, ক্বারীদের সাক্ষ্য সব জিনিষেই গ্রহণগোগ্য ও জায়েয। কিন্তু তাদের সাক্ষ্য পরস্পর নাজায়েয, কারণ ক্বারীরা পরস্পর বাড়াবাড়িতে ছাগলের চেয়েও অধিক হিংসা রাখে।

মাছউদী এবং হাফেজ কুতুর উদ্দিন লিখেন, হাজ্জাজ বিন ইউসুফের মা' ফারিয়াহ বিনতে হুমাম, তিনি আরবের হাকিম হারিছ বিন কলদা ছকফী এর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। একদা তিনি সকালে ফারিয়া এর কাছে এসে দেখলেন যে তিনি (ফারিয়াহ) দাত খিলাল করছেন। তিনি তাকে তালাক দিয়ে দিলেন। ফারিয়া তালাকের কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি জবাব দিলেন আমি যখন সকালে তোমার কাছে আসলাম তখন তুমি দাঁত খিলাল কর ছিলে। যদি তুমি সকালের নাস্তা ভোরেই করে থাক তাহলে তুমি পেটের দাসী হয়ে গেলে। আর যদি রাতটি এ অবস্থায় অতিবাহিত কর তাহলে তুমি দুর্গন্ধময়। একথা শুনে ফারিয়া বল্লেন, এ দুটার একটাও ঠিক নয়। তবে আমি ভাল করে মিসওয়াক করছিলাম অর্থাৎ দাঁত পরিস্কার করছিলাম। কয়েক দিন পর ইউসুফ বিন হাকিম বিন আবু খাকীন ছাকাসী ফারিয়াকে বিয়ে করলেন। সে ঘরেই হাজ্জাজের জন্ম হয়। হাজ্জাজ ছিল কুৎসিত চেহারার লোক। তার পায়খানার রাস্তা ছিল না । তাই পায়খানার জন্য ছিদ্র করা হয়। হাজ্জাজ তার মায়ের এবং অন্যান্য মহিলার দুধ খেতে অস্বীকার করে । এজন্য লোকেরা চিন্তিত ছিল। কোন কোন ঐতিহাসিক লিখেছেন শয়তান হারেছের বেশ ধারণ করে এসে লোকদেরকে বলল তোমরা এত চিন্তিত কেন? লোকেরা জবাব দিল এই শিশুটি ইউসুফের, ফারিয়ার গর্ভে

জন্ম গ্রহণ করেছে এবং সে তার মায়ের দুধ পান করছেনা। শয়তান তাদের পরামর্শ দিল যে, তোমরা একটি কাল বকরী জবাই করে এর রক্ত এই শিশুকে চাটতে দাও এবং অন্য আরেকটি কাল বকরী জবাই করে এর রক্তের মধ্যে তাকে ডুবিয়ে দাও। তিনদিন পর্যন্ত এর রক্ত তার মুখমন্ডলে মালিশ করতে থাক এবং ৪র্থ দিন সে তার মায়ের দুধ পান করতে থাকবে। লোকেরা তাই করল এবং সে দুধ পান করতে লাগল। হাজ্জাজ খুনের জন্য অস্থির থাকত। নিজে বলত আমি রক্তারক্তি না করলে আমার ভাল লাগে না ।

হাজ্জাজ বিন ইউসুফের একটি ঘটনা ঃ

ইবনে খাল্লিকান লিখেন, খলীফা আব্দুল মালেক বিন মারওয়ান হাজ্জাজ বিন ইউসুফের কাছে ভীতি প্রদর্শন করে পত্র লিখেন এবং সর্বশেষ তিনি এই কবিতা লিখেছিলেন-

اذاانت لم تترك امورداكرهتها: وتطلب رضايا باللذى انا طالبه

"তুমি যা অপছন্দ কর তা যদি ছাড়তে না পার আর সে জিনিষের বিনিময়ে তুমি আমার সন্তুষ্টি চাচ্ছ যার অন্বেষক আমি নিজে । "

وتخش الذى يخشاه مثلك هاربا:: الى فها قد ضيع الدر جالبه

"তোমার মতই যারা ভয় পায় তুমি তাকে ভয় কর অথচ সে আমার নিকট পলায়ন করে এসেছে। তুমি স্মরন রেখো মুতি প্রাপকরা তাকে ধ্বংস করে দিয়েছে।"

فان ترمنى غفلة قرشية:: فيا ربماقد غص بالماء شاربه

"তুমি যদি আমার উপর কুরাইশী অলসতার অভিযোগ দিতে তাহলে বাঝযা পান কারীকে পানির দ্বারা আটক করা হবে।"

وان ترمنى وثبه اموية:: فهذا وهذا كله انا صاحبه

"যদি তুমি আমার উপর উমাইয়াদের বীরত্বের অভিযোগ দিতে তাহলে মনে রেখো এরা সব আমার বন্ধু।"

فلا تامنتى والحوادث جنة:: فانك تجزى بالذى انت كاسبه

"উদ্দেশ্য হল তুমি আমার পক্ষ থেকে নিরাপদ হয়ে যাওয়া, কারণ আকস্মিকভাবে অনেক ঘটনাই ঘটে থাকে, আর তুমি এর মাধ্যমে প্রতিদান গ্রহণ

করবে যা তুমি অর্জন করছ।''

পত্র পাঠ করার পর হাজ্জাজ জবাব লিখল এর শেষের দিকে লিখল যে, আপনার দু'টি হুকুম আমার নিকট এসে পৌছেছে। হুকুমদ্বয়ের মধ্যে একটিতো সুস্পষ্ট, অপরটি খুবই কঠিন। এর মধ্যে যা সুস্পষ্ট তা মান্য করার জন্য আমি প্রস্তুত। আর যে হুকুমটি কঠিন তার উপর আমি ধৈর্য ধারণ করব। খলিফা আঃ মালেক যখন জবাব পড়ে বললেন, আবু মোহাম্মদ আমার ধমকে ভয় পেয়েছে। আমি তাকে কষ্ট দেয়ার মত কথা পুনরায় লিখব না।

হাজ্জাজ বিন ইউসুফের অভ্যাস ছিল যখন তার কাছে কোন ক্বারী আসত তাকে খুব প্রশ্ন করত। এক দিন এক লোক হাজ্জাজের নিকট আসলে হাজ্জাজ তাকে প্রশ্ন করল যে, পবিত্র কুরআনের আয়াত أمن هوقانت এর পূর্বে কি? সে লোক জবাব দিল:

قل تمتع بكفرك قليلا انتك من اصحاب النار

''হে রাছুল!আপনি বলেদিন তুমি কুফুরী থেকে উপকার গ্রহণ কর তুমি অবশ্যই জাহান্নামী (যুমার-৮)

তার জবাব শুনে হাজ্জাজ চমকে গেল। তাকে আর প্রশ্ন করার মন মানসিকতা থাকল না। তিনি এরপর আর কখনো কাউকে কোন কিছু জিজ্ঞেস করেননি । একদা হাজ্জাজ আব্দুল রহমান ইবনে আশয়াস এর কোন এক ছাত্রকে বলল, আল্লাহর কসম আমি তোমার সাথে অত্যন্ত বৈরীতা রখি। শাগরেদ জবাব দিল, আমাদের মধ্যে যে লোক বেশী ঘৃনীত তাকে আল্লাহ পাক জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

হাজ্জাজ বিন ইউসুফের জীবনীতে রয়েছে, হজ্জাজ প্রাথমিক জীবনে সেনাপতি রুহ বিন যানবাগ এর অধীনে ছিল। যে লোক আব্দুল মালেক বিন মারওয়ানের ওযীর ছিলেন আর আব্দুল মালেক বিন মারওয়ানের কৈন্যারা তাকে মান্য তো করতইনা অধিকন্তু তার আদেশে সৈন্যরা যুদ্ধের প্রস্তুতিও নিতনা এবং শিবিরও স্থাপন করত না। আব্দুল মালেক রুহ বিন যানবাগ এর কাছে সৈন্যদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করল। একদিন রুহ বিন যানবাগ আব্দুল মালেকের নিকট আবেদন করল যে, জনাব আমার সেনা বাহিনীতে একজন লোক হাজ্জাজ বিন ইউসুফ আছে। আপনি তাকে যদি সেনাপতি বানিয়ে দিন তাহলে সৈন্যরা

আপনার কথা মানবে। আপনার আদেশে তারা যুদ্ধে যাবে এবং শিবির স্থাপন করবে। এর উপর আব্দুল মালেক হাজ্জাজকে সোনাপতি বানিয়ে নিয়োগ করেন। একদা আব্দুল মালেক বিন মারওয়ান কোথাও যাওয়ার জন্য প্রস্তুমি নিতে বেশ দেরী করল। কিন্তু রুহ বিন যানবাগ এর অধিনের সৈন্যরা প্রস্তুমি নিতে বেশ দেরী করল। হঠাৎ করে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ তাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, হাজ্জাজ দেখল সৈন্যরা খাওয়াতে ব্যস্ত। হাজ্জাজ বলল- তোমাদের কি হলো! তোমরা সৈন্যদের সাথে কুচকাওয়াজ অংশ নিচ্ছনা কেন? সৈন্যরা বলল, আপনিও আমাদের সাথে দাড়ান,খানা খেয়ে যাবেন। হে ইবনুল হ্যনান কথা বন্ধ কর। (হেয় করার জন্যই ابن الحنان শব্দটি বলা হত) হাজ্জাজ বলল জবাবতো প্রশমে ছিল, তা এখন আর অবশিষ্ট নেই। এরপর হাজ্জাজ তাদেরকে হত্যা করার আদেশ করল আর রুহ বিন যানবাগ এর ঘোড়ার লাগাম কেটে দেয়া হল, তাবু জালিয়ে দেয়া হল। যখন রুহ বিন যানবাগ জানতে পারলেন তখন তিনি দ্রুত আব্দুল মালেক এর কাছে গিয়ে আবেদন করলেন যে, মহামান্য খলিফা হাজ্জাজ আমার সহিত যে আচরণ করেছে এর বিচার করবেন। আঃ মালেক জানতে চাইলেন যে, সে কি করেছে? রুহ বিন যানবাগ বল্লেন যে, সে আমার সব গোলাম হত্যা করেছে। ঘোড়ার লাগায কেটে ফেলেছে তাবুগুলো জালিয়ে দিয়েছে। একথা সুনে আঃ মালেক হাজ্জাজকে তলব করলেন। হাজ্জাজ হাজির হল। আঃমালেক বল্ল তোমার অমঙ্গল হোক । আজ তুমি তোমার বড় রুহ বিন যানবাগ রে সহিত বি করেছ? তা ওনে হাজ্জাজ জবাবা দিল- হে আমিরুল মুমিনীন! আপনার চাবুকই আমার চাবুক, আপনি তো একটি গোলামের পরিবর্তে দুটি গোলাম আর একটি তাবুর পরিবর্তে দুটি তাবু রুহ বি যানবাগ কে দিয়ে দিয়ে দিলেন। আপনি সৈন্য বাহিনীর সামনে মন দুর্বল করবেন না। আব্দুল মালেক বল্লেন ঠিক আছে। তাই করা উচিত। হাজ্জাজের ইচ্ছা পূর্ণ হয়ে গেল। সেদিন থেকে হাজ্জাজ শক্ত হয়ে গেল। আর তার ঔদ্ধত্ব বৃদ্ধি পেয়ে গেল।-

وكان هذا اول ماعرف من كفايته

এটিই ছিল তার সর্বপ্রথম ঐদ্ধত্ব যা ছলনা করে সামনে এসেছিল। তাছাড়াও হাজ্জাজ বিন ইউসুফের আরো অনেক আশ্চর্য ধরনের ব্যাপার প্রসিদ্ধ রয়েছে।

হযরত সুফিয়ান ছুওরীর উদ্ধৃতি দিয়ে আব্দুল মালেক বিন ওমর কুরাইশী বর্ণনা করেন , কুফার জামে মসজিদে বসা ছিলেন আর কুফাবাসীরা সুখে শান্তিতে বসবাস করছিল। এক ব্যক্তি দশটি দশটি বা বিশটি বিশটি গোলাম নিয়ে বের হচ্ছিল। হঠাৎ এক লোক বলল হাজ্জাজ বিন ইউসুফকে ইরাকের গভর্ণর বানানো হয়েছে। তারা দেখল যে, হাজ্জাজ পাগড়ী বেধে অধিকাংশ মুখমন্ডল ঢেকে তলোয়ার এবং তীর ধনুক ঝুলিয়ে মসজিদে আসে মিম্বরের দিকে এগিয়ে গেলো। লোকেরা তার পাশে এলো। হাজ্জাজ মিম্বরে বসে পড়ল। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকল। তা দেখে লোকেরা একে অপরের কাছে বলতে লাগল আল্লাহ তাআলা বনী উমাইয়ার অমঙ্গল করুন, তার মত লোককে যে ইরাকের গভর্ণর বানানো হল। কিছুক্ষন পর উমাইর ইবনে খাইয়ান বরজী বলল আমি পাথর মারব। কেউ বলল একটু অপেক্ষা কর, কিছু পুরস্কার নিয়ে নেই। হাজ্জাজ যখন লোকদের বিরক্তি দেখল তখন তার চেহারা খুলে দাড়াল এবং হামদ ও ছানা পাঠ করার পর বলল ঃ

انا ابن جلا طلوع الثنايا :: متى اضع العمامة تعرفونى

"আমি হলাম যাবতীয় ব্যাপার উম্মোচনকারী এবং পাহাড় ও বালুকাময় ভুমির পথ প্রদর্শক ও মুকুট। আমি যখন পাগড়ী ফেলে দেব তখন তোমরা আমাকে চিনতে পারবে।

এরপর বলল, হে কুফাবাসী! আমি মানুষের মাথাকে সম্পূর্ণ তৈরী দেখছি। এখন ফসল কাটার সময় এসেছে আর আমি তার মালিক আমি আমার পাগড়ী এবং দাড়িতে রক্ত দেখছি।

هذا او ان الشرفاشتدى زيم :: قد لفها الليل بسواف حطيم

"ইহা অমঙ্গল যুগ। বকরীগুলো একত্র হয়েছে দয়াহীন চারণ ভূমির কারণে রাতে সমান করে দেয়া হয়েছে।"

ليس براعى ابل ولا غنم:: ولا يجراز على ظهر وصنم

"উট বকরীর কোন রাখাল নেই, আর নেই গোস্ত কর্তনকারী লাকড়ীর উপর বসা কোন কসাই। এর পর বলল ঃ

وقد لفها الليل بعنصلبى:: اروع خراج من الداوى

"নিঃসন্দেহে রাত তার বড় দেহ বিশিষ্ট অত্যন্ত ভীতিজনক লোকের কারণে একত্র করে, যে ক্রোধ এবং দুঃখ বেদনা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। "

مهاجر ليس باعرابى:: معلود للطعزبالحظى

"মুহাজির কোন গ্রাম্য লোক নয়। যে তার বল্লম দ্বারা বারং বার আক্রমনকারী এর পর সে আবার বলল:-

قدشمرت عن ساقها فشدوا:: وجدت الحرب بكم فجدوا

"যুদ্ধ তার গোড়ালী খুলে দিয়েছে (অর্থাৎ পূর্ণভাবে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছে) তাই তোমরাও তৈরী হয়ে যাও আর যুদ্ধ তোমাদের উপর কঠোর হয়ে দিয়েছে এজন্য তোমরা চেষ্টা কর এবং নিজেকে তৈরী কর।

والقس فيها وترعود::مثل ذراع البكر اواشد

আর ধনুকে জোয়ান উটের ন্যায় বা তার চেয়েও বেশী শক্ত সংযোজিত হয়েছে।

হে ইরাকবাসী। আল্লাহর কসম আমি অত্যন্ত নির্ভীক ও ভয়-ভীতিহীন লোক। মুসিবতকে আমি ভয় পাই না। আর আমি সাপের মত খোসা বদলাইনা। আমি অনেক পরীক্ষা দিয়েছি। খলিফা তুনীরে তীর সংযোজন করেছেন। আর তিনি তুনীরের ধনুককে খুব পরীক্ষা-নিরীক্ষ করেছেন। তিনি আমাকে তিক্তময় পেয়েছেন আর ভেঙ্গে যাওয়া ব্যাপারে তিনি আমাকে অত্যন্ত কঠোর পেয়েছেন। তীর নিক্ষেপের ক্ষেত্রে দূরন্ত পেয়েছেন। তিনি আমাকে তোমাদের শাসক নিযুক্ত করেছেন। কারণ তোমরা বিপর্যয় সৃষ্টি করছ। সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাচ্ছ। আল্লাহর কসম আমি তোমাদেরকে দুর্বল মহিলার মত বেধে রাখব এবং তোমাদের উটের মত ঘাড় উড়িয়ে দেব। তোমাদের অবস্থা সে বস্তীবাসীদের মত হবে যারা আরাম এবং শান্তির জিন্দেগী অতিবাহিত করছে আর তাদের প্রত্যেকের প্রাচুর্য হবে। এছাড়া তারা যদি আল্লাহর নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে তাহলে তাদের কৃত কর্মের দরুন ফাকিবাজ বলে ঘোষণা করবেন।

হে ইরাকবাসী! স্মরন রেখো, আমি যা বলছি তা বাস্তবায়ন করবই । আর আমি যা ইচ্ছা করি তা পুরণ করি। কসম খেলে তা পুরা করি। আমিরুল মুমিনীন তোমাদের সেবা করার জন্য আমাকে আদেশ করেছেন। তোমাদের দুশমন মহলিব ইবনে আবু ছাফরাহ এর সাথে যুদ্ধ করার জন্য আমি তোমাদেরকে

উপদেশ দিচ্ছি। দান গ্রহণ করার পর কেউ যদি আমার বিরোধী কোন কাজ করে তাহলে তিন দিন পর আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেব।

দীর্ঘ ভাষণের পর হাজ্জাজ তার ভৃত্যকে আদেশ করল, এখন আমিরুল মুমিনীনের পত্রখান পড়ে শুনিয়ে দাও। সে পড়ল- "এই চিঠি আমিরুল মুমিনীন আব্দুল মালেক বিন মারওয়ানের পক্ষ থেকে কুফাবাসীদের প্রতি।" এটি শুনার পর কেউই কিছু বললনা। এরপর হাজ্জাজ বলল, গোলাম একটু থাম। এরপর লোকদেরকে উদ্দেশ্য করে বললম আমিরুল মুমিনীনের সালাম তোমাদেরকে পৌঁছানো হয়েছে। কিন্তু তোমরা আমার কাছে কেউ তার জবাব দেও নাই। ইহাতো দেখি ابن سمية বা জারজ সন্তান এর নিয়ম-নীতি। আল্লাহর কসম আমি তোমাদেরকে শিষ্টাচার শিক্ষা দেব। তবেই তোমরা সোজা হয়ে যাবে।

এরপর হাজ্জাজ গোলামকে পত্রটি পড়ে শুনাতে বলল। গোলাম প্রথম থেকে পত্র পাঠ আরম্ভ করল। গোলাম এখনো السلام عليكم পর্যন্ত পৌঁছতেনা পৌছতে উপস্থিত লোকদের মুখ থেকে এই কথা বের হয়ে এলো امير على المؤمنين السلام এর পর হাজ্জাজ মিম্বর থেকে অবতরন করে উপঢৌকন বন্টন করতে আরম্ভ করল, আর লোকেরা তা গ্রহণ করতে লাগল। সবশেষে এক বৃদ্ধ কাঁপতে কাঁপতে আসল। বলল, হুজুর আপনি তো দেখছেন আমি যে ভ্রমন করার উযোগী আমার এক যুবক ছেলে রয়েছে যে ভ্রমনে সক্ষম আপনি তাকে আমার স্থানে নিয়ে যাবেন। একথা শুনে হাজ্জাজ বলল, ওহে বৃদ্ধ আপনার আশা পূর্ণ হবে। বৃদ্ধ যখন হাজ্জাজ এর কাছ থেকে চলে গেল তখন কোন একজন বলল হুজুর ! আপনি জানেন লোকটি কে? হাজ্জাজ বলল নাতো। লোকটি বলল সে উমাইর ইবনে ছাবী বারজামী যার পিতা এ কবিতা বলেছেন-

هممت ولمافعل وكدت وليتنى :: تركت على عثمان تبكى حلائله

"আমি চাই কিন্তু করি না এবং নিকটেই ছিল যে, করব। নিসন্দেহে আমি ওসমান (রা.) উপর তার স্ত্রীদেরকে কান্নাবস্থায় ছেড়ে এসেছি।

যেদিন হযরত ওসমানের ঘরে তাকে শহীদ করা হয়েছেল সেদিন এই বৃদ্ধ ওসমান (রা.) এর পাজরের দুটি হাড্ডি ভেঙ্গে দিয়েছিল।

একথা শুনে হাজ্জাজ বলল এই বৃদ্ধকে ডাক। বৃদ্ধ আসার পর হাজ্জাজ তাকে বলল, হে বৃদ্ধ! ওসমান (রা.) এর হত্যার দিন তোমার পরিবর্তে অন্য

কাউকে কেন পাঠালে না। মনে হয় তোমাকে হত্যা করলে মুসলমানের মধ্যে শান্তি শৃংখলা ফিরে আসত। এরপর হাজ্জাজ রক্ষিদেরকে আদেশ করল যে এই বৃদ্ধ শেষ করে দাও।

হাজ্জাজের মৃত্যুর ঘটনাঃ

ইবনে খাল্লিকান লিখেছেন, হাজ্জাজ যখন মৃত্যুর কাছাকাছি হল তখন সে এক জ্যোতিষীকে ডেকে বলল তোমার জ্ঞানে কি কোন বাদশাহর মৃত্যুর খবর জানা আছে? সে জবাব দিল তবে আপনার ব্যাপারে নয়। হাজ্জাজ বলল এ আবার কেমন? জ্যোতিষী জবাব দিল আমার দর্শনে যে যে বাদশাহ মৃত্যু বরন করবে তার নাম হল কালিব। তা শুনে হাজ্জাজ বলল সে তো আমিই। আল্লাহর কসম, আমার মা আমার নাম কালিবই রেখেছিল। তাই হাজ্জাজ ওছিয়ত করে এবং মৃত্যু শয্যাই এ কবিতা পাঠ করে-

يارب قد حلف الاعداء واجتهدوا:: ايمانهم اننى من سلكن النار

"হে আল্লাহ! শত্রুরা শপথ করে রেখেছে এর তারা চেষ্টায় আছে। তাদের বিশ্বাস আমি জাহান্নামী।"

ايحلفون على عمياء ويحهم:: ماظنهم يعظيم العفو غفار

"সে কি মূর্খতা বশত কসম খাচ্ছে? তার ধ্বংস হোক সে কি ধারনা করে সে মহানসত্তা সম্পর্কে যিনি ক্ষমাশীল রেহাইদানকারী।

৯৫হিজরী সনে ওয়ালীদের শাসনামলে শহরের কেন্দ্র স্থলে হাজ্জাজ ইন্তেকাল করেন । এই শহরে তাকে দাফন করা হয়। তার কবর নিশ্চিহ্ন করে পানি প্রবাহিত করা হয়। তার মৃত্যুর সংবাদ কেউ জানেনি। একজন এ কবিতা পড়ায় মানুষ জানতে পারল যে হাজ্জাজের ইন্তেকাল হয়েছে-

اليوم يرحمنا من كان يخبطنا :: واليوم نتبع من كانو الناتبعا

যে আমাদেরকে হিংসা করত সে আমাদের উপর দয়া করেছে। আর যে আমাদের অনুসারী ছিল আজ আমরা তার অনুসরণ করব।

ইমাম জাহাবী ও ইবনে খাল্লিকান লিখেছেন, যুদ্ধ ব্যতিত হাজ্জাজ ১লক্ষ২০ হাজার লোককে হত্যা করেছিল। ইমাম তিরমিযীও এই পরিমানের কথাই বলেছেন। হাজ্জাজের বন্দী খানায় ৫০ হাজার পুরুষ ও ৩০ হাজার নারী

নিহত হয়। যার মধ্যে ১৬ হাজার কুমারী মহিলা। হাজ্জাজ নারী পুরুষদেরকে একই স্থানে বন্দী করত। হাজ্জাজের ইন্তেকালের পর সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেল ৩৩ হাজার লোক ছিল নিরপরাধ- যাদের উপর হাত কাটার অভিযোগও ছিলনা আর না তারা সুলীতে চড়ার উপযোগী ছিল । ইবনে আছাকির লিখেছেন- সুলায়মান ইবনে আব্দুল মালেক হাজ্জাজের ইন্তেকালের পর তার বন্দীখানা থেকে সমস্ত মজলুমদের মুক্ত করেন। কেহ লিখেছেন- একদিনেই ৮০ হাজার লোককে মুক্ত করা হয়েছিল। কেহ লিখেছেন ৩ লাখের কথা । ইবনে খাল্লিকান লিখেছেন হাজ্জাজের কয়েদখান লক্ষ ছাদহীন ছিল। গ্রীষ্মের সময় রুদ্রের তাপ থেকে বাচার এবং ঠান্ডার দিনে বৃষ্টি থেকে রক্ষা পাওয়ার কোনই ব্যবস্থা ছিল না। পথরের ছোট ছোট কুঠরী ছিল হাজ্জাজ কয়েদীদেরকে হরেক রকম শাস্তি দিত।

একদিন হাজ্জাজ তার সেক্রেটারীকে জিজ্ঞেস করল যে, আমি অভিযুক্ত করে কত লোক হত্যা করেছি? সেক্রেটারী জবাব দিল ৮০ হাজার। ২০ বছর পর্যন্ত হাজ্জাজ ইরাকের গভর্নর ছিল। সে ৫৩ বছর জীবিত ছিল। একদা হাজ্জাজ শুক্রবারে ছওয়ার হয়ে জুমার নামাজে যাচ্ছিল। সে বন্দীদের চিৎকার ও আর্তনাদ শুনতে পেল সে লোকদেরকে জিজ্ঞেস করল ইহা কিসের আওয়াজ। লোকেরা জবাব দিল তা বন্দীদের চিৎকার। তারা ক্ষিধার কষ্টে এসব করছে। তা শুনে হাজ্জাজ জেলখানার একটি নির্জন স্থানে গেল এবং কুরআনের এই আয়াত পাঠ করল:

اخسوا فيها ولا تكلمون (مومن)

এরপর হজ্জাজ আর কোন জুমা আদায় করতে পারেনি। (অর্থাৎ মরন রোগে তাকে আক্রমন করে বসল)

ইমাম দামিরী (রহ.) বলেন আমি ইবনে খাল্লিকানের ওয়াপীয়াতুল আ'য়াল নামক কিতাবের হাশিয়ায় উলামায়ে কেরামের উদ্ধৃতি পড়েছি যে, যে ধরনের শব্দ ব্যবহারের কারণে অথবা অসংখ্য পাপ করার কারণে উলামায়ে কেরাম তাকে কাফের ফতোয়া প্রদান করেন। কোন কোন আলেম তার উপর কাফের ফতোয়া এ জন্য দিয়েছেন যে, একদা লোকদেরকে নবী করিম (স.)এর হুজরা মোবারক তওয়াফ করতে দেখে সে বলল তোমরা পচা হাড্ডির তওয়াফ করছ(না উযুবিল্লাহ)

আল্লামা দামিরী বলেন, এখানে কুফুরীর কথা হল, এতে নবী করিম (স.) এর উপর মিথ্যা অভিযোগ দেয়া হয়েছে। কারণ ছহীহ রেওয়ায়েতে আছে নবী করিম (স.) এরশাদ ফরমান নবীগণের শরীর মাটির জন্য হারাম করা হয়েছে। (আবু দাউদ)

আবু জাফর দাউদী নবীগণের সহিত শহীদ আলেম, মোয়াজ্জিন এর কথাও উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তা হাদীছের উসূল হিসেবে অতিরিক্ত দুর্বল। ইমাম সোহাইলী বলেন, দাউদী ফুকাহা ও উলামায়ে কেরাম রে মধ্যে গন্য।

হযরত ওমর বিন আব্দুল আজিজ (রহ.) স্বপ্নে হাজ্জাজকে দেখেন যে সে পাগলের মত পড়ে আছে। আমিরুল মুমিনীন হাজ্জাজকে জিজ্ঞেস করলেন আল্লাহ পাক তোমার সাথে কি আচরণ করেছেন। সে বলল আমি জীবনে যত লোক হত্যা করেছি, প্রতিটি নিহত ব্যক্তির প্রতিশোধ হিসেবে আমাকে প্রতি মুহূর্তে হত্যা করা হচ্ছে। কিন্তু শুধু ছাঈদ বিন যুবাইরের এক হত্যার প্রতিশোধ হিসেবে ৭০ বার হত্যা করা হয়েছে। তারপর তিনি প্রশ্ন করলেন তুমি এখন কার অপেক্ষা করছ? সে জবাব দিল, একত্ববাদীরা যে জিনিষের অপেক্ষা করে। তার উপর কুফুরীর ফতোয়া দেয়া হয়েছিল। তবে এতে বুঝা যায় যে, সে তাওহীদের উপরই ইন্তেকাল করেছে। (তার ব্যাপারে আল্লাহই ভাল জানেন)।

একটি দ্বন্দ্ব ও তার নিরসন ঃ

কারো অন্তরে যদি এ সংশয় সৃষ্টি হয় যে, আল্লাহ পাক হাজ্জাজকে প্রত্যেক নিহত ব্যক্তির প্রতিশোধ হিসেবে একবার করে হত্যা করছেন। শুধু সাঈদ বিন যুবাইর ব্যতীত। তার হত্যার বদলে হাজ্জাজকে ৭০ বার হত্যা করা হয়। এরই বা কি হেকমত? অথচ আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর নবী করিম (স.) এর সাহাবী ছিলেন। তাকেও হাজ্জাজ তলোয়ারের নিশানা বানিয়েছেন। আর ছাইদ বিন যুবাইর তাবেয়ী ছিলেন। আর তিনি আহলে সুন্নাত এর অনুসারী বিশ্বাসী। যে সাহাবী তাবেয়ী থেকে উত্তম। এর জবাব হল- হাজ্জাজ যখন হযরত যুবাইর (রা.) কে হত্যা করে, তখন অনেক বড় বড় সাহাবী জীবিত ছিলেন। যা তার সমকক্ষ তিনি নিজেই । যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) আনাস বিন মালেক (রা.) প্রমূখ কিন্তু যখন হযরত সাঈদ বিন যুবাইর (রা.) কে হত্যা করা হয় সে যুগে তার মত আলেম ছিল না।

কতিপয় আলেম লিখেন, হযরত ছাইদ বিন যুবাইর (রা.) এর নিহত হওয়ার সংবাদ শুনে হযরত হাসান বসরী (রহ.) বলেছিলেন ছাইদ বিন যুবাইরের হত্যাকান্ডটি এমন এক অন্তিম মুহূর্তে সংঘটিত হল যখন পূর্ব ও পশ্চিমে আল্লাহর জগতে তার ইলমের মুখাপেক্ষী ছিল। এজন্য ছাইদ বিন যুবাইরকে হত্যা করার কারণে তাকে অতিরিক্তভাবে হত্যা করা হয়। (আল্লাহই ভাল জানেন। কারণ ইতিহাস বিকৃতিরও কোন শেষ নেই।)

ছাইদ বিন যুবাইরের হত্যা ঘটনা لبوة অধীনে বিস্তারিত বর্ণনা করা হবে।

প্রবাদ বাক্য ঃ

আরবগণ বলেন: فلان اغلم من تيس بنى حمال

ح বর্ণে যের পড়ে অর্থ হবে অমুক লোক حمان এর বকরীর ছেয়েও উপযুক্ত।

মূল বিষয় হল বনী হামানের ছাগ ৭০ টি বকরীর সাথে সঙ্গম করার জন্য ছেড়ে দেযা হত। অথচ ছাগীর রগ কেটে গিয়ে ছিল। এই দিন থেকে বনী হামান ফখর করত এবং تيس(বকরী) এর জন্যই سفد(সহবাস করা)শব্দ ব্যবহার করা হয়।

হযরত ইবনে জাওযী লিখেন, মাযিনা গোত্রের লোকেরা আবু হাসান আনসারীকে বন্দী করে। এসময় তারা ফিদিয়া হিসেবে জংগলী বকরীই দাবী করেছিল। তা শুনে আবু হাস্‌সান এর গোত্রের লোকেরা ক্রোধান্বিত হয়ে বলে, আমরা তা কখনোই মানবনা। শেষপর্যন্ত তাদের ফিদিয়া দিতেই হল। ফিদিয়ার বকরী নিয়ে এসে তারা বলল তাদের এক ভাই অপর ভাইকে মুক্ত করে নিল। সেদিন থেকে মাযিনার নাম تيس হয়ে যায়। মাযিনা এমন উপধিটি তাদের জন্য বড় লজ্জার কারণ হয়।

চিকিৎসা ক্ষেত্রে (বকরার) ছাগ এর উপকারিতা ঃ

ছাগ খচ্চরের মত দুর্গন্ধময় হয়ে থাকে। কারো কাশি হলে বা প্রচন্ড জ্বর হলে তার দাড়ি বেধে রাখলে উপশম হয়। কারো প্লীহা বড় হয়ে গেলে নিজ হাতে সে ছাগের প্লীহা কেটে তার বসবাস কৃত ঘরে বেধে রাখবে। প্লীহাটি শুকিয়ে গেলে সে ঘরে যার প্লীহা হয়েছে তারই প্লীহা রোগ ভাল হবে। যদি কারো কানে রোগ হয় তবে ছাগের কলিজা কাটার সময় যে পানি বের হয় তা কানে ফোটা

ফোটা ব্যবহার করলে কান ভাল হবে। এর পায়ের টাখনু হালকা করে পিষে পান করলে যৌন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এর পেশাব আগুনে সিদ্ধ করে ঘন হলে সমপরিমান চিনি মিশিয়ে খাজলীতে লাগালে ভাল হয়ে যায়। কোন শিশু বেশী কান্না কাটি করলে এর বিষ্ঠা শিশুর বালিশের নীচে রেখে দিলে তার কান্না বন্ধ হয়ে যাবে। (এর বিস্তারিত আলোচনা معز অর্থাৎ বকরী অধীনে করা হবে)

টীকা: উলামায়ে কেরাম তখন হাজ্জাজকে এজন্য কুফরী ফতোয়া প্রদান করেন যে, হাজ্জাজ নবীগণের মৃত্যুর পরও জীবিত থাকার বিশ্বাসের চরম বিরোধী ছিল। উপরে যে শব্দ বর্ণনা করা হয়েছে তা নবী করিম (স.) কে অবজ্ঞা করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত নবীগণ মৃত্যুর পর জীবিত থাকাকেও অস্বীকার করা, পবিত্র কুরআনের বিরুধিতা করার এবং স্বয়ং নবী করিম (স.) এর পবিত্র বানীরও বিরুধিতা হয়েছে। কারণ পবিত্র কুরআন-হাদীছ দ্বারা তা প্রমানিত। নবীগণের শরীর তাদের ইন্তেকালের পরও অক্ষয় থাকে। কারণ তারা জীবিত। বিশেষ করে নবীগণের ধারাবাহিকতায় তা বর্ণিত রয়েছে। তারা শুধু লোক চক্ষুর অন্তরালে চলে যান। এ ব্যাপারে আমরা পবিত্র কুরআনের বিশেষ আয়াত ও নবী করিম (স.) এর হাদীছ উল্লেখ করছি। যা দ্বারা হাজ্জাজের সে কথার অসারতা প্রমানীত হয়। যে কারণে তাকে কাফের ফতোয়া প্রদান করা হয়। এই সমস্ত আয়াতে কুরআনী ও আহাদীসে নববী (স.) নবীগণের মৃত্যুর পরও জীবিত থাকা অস্বীকার কারীদের জন্য সুস্পষ্ট দলীল। যেমন আল্লাহ পাক বলেন-

ولقد اتينا موسى الكتاب فلا تكن فى مرية من لقائه.(الم سجده ٢٣)

"আর নিঃসন্দেহে আমি মুসাকে কিতাব দান করেছি সুতরাং আপনি তার সাক্ষাতের ব্যাপারে কোন প্রকার সন্দিহান হবেন না।"

অত্র আয়াতে মুসা (আ.) এর সাথে নবী (স.) এর সাক্ষাত করা জরুরী বুঝা যায়। মেরাজ রজনীতে নবী করিম (স.) এর সাথে বায়তুল মোকাদ্দসে হযরত মুসা (আ.) এর সাক্ষাত হয়েছিল। এরপর আকাশ ভ্রমনে নবী (স.)-এর সাথে নামাজ-রোজার সংখ্যার ব্যাপারে মুসা (আ.) এর সাথে বেশ কয়েকবার সাক্ষাত ঘটেছিল। শহীদগণের ব্যাপার আল্লাহ তায়ালা এরশাদ ফরমান:

بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما أتاهم الله من فضله (عمران)

"বরং তারা জীবিত। তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে এদেরকে যিরিক দেয়া হয়। তারা আনন্দিত। তাদেরকে তাদের রবের পক্ষ থেকে যা দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা শহীদগণকে মৃত বলোনা।

কারণ সুরা বাকারার ১৫৪ নং আয়াতে আল্লাহ পাক বলেন "আর তোমরা শহীদগণের মৃত মনে করোনা বরং তারা জীবিত, তাদেরকে রিযিক দেয়া হয়।"

উপরোক্ত আয়াতে শহীদগণের জীবিত থাকা ও তাদেরকে রিযিক দানের কথা স্পষ্টভাবে প্রমানীত হয়। এও প্রমানীত হয়েছে যে, শহীদগণের মর্যাদা নবীগণের চেয়ে অনেক কম। তাদের মর্যাদা নবীগণের উপর ঈমান আনা এবং তাদের শিক্ষার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের কারণে হয়। তারা নবীগণের কাথার উপর বিশ্বাস করে এবং তাদের কথা সংরক্ষনের জন্য নিজের মূল্যবান প্রাণটুকা বির্সজন দিয়েছেন। কিন্তু তাদের শিক্ষাকে ছাড়েন নাই। শহীদগণকে মৃত বলা এবং মৃত মনে করা আরো দৃঢ় বিশ্বাসের ব্যাপার। এই দলীলের ভিত্তিতে আল্লামা ইবনে হাজর আস্কালানী (রহ.) বলেন, কোরআনের ঘোষণা মতে যেহেতু শহীদগণ জিন্দা আবার তা যৌক্তিকও বটে সেহেতু নবীগণের মর্যাদা শহীদদের চেয়েও অনেক অনেক বেশী।

পবিত্র কুরআনে হযরত সুলায়মান (আ.) এর ঘটনা উল্লেখ রয়েছে। তার মৃত্যুর সংবাদ যখন আসল তখন তাকে লাঠির উপর ভর থাকা অসহায়ই মৃত্যু বরণ করতে হয়েছিল। আর এই লাঠির উপরই তাকে পূর্ণ এক বছর ভর করে দাড়িয়ে থাকতে হয়েছিল এবং মাটিতে থেকেও সম্পূর্ণ মাহফুজ থাকেন। আল্লাহ পাক বলেন-

فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دابة الارض تاكل منسأته (السبأ)

"আমি যখন তার উপর মৃত্যুর ফায়সালা দিয়ে দিলাম তখন তার মৃত্যুর সংবাদ জিনদেরকে দেই নাই। কিন্তু ঘুন পোকা তার লাঠি খেয়ে ফেলে। লক্ষ্যনীয় যে, ঘুন পোকা ও অন্যান্য পোকা মাকড়ের সামনে দুটি বস্তু ছিল। একটি হল গোস্ত ও চামড়ার শরীর এবং একটি শুকনা লাকড়ীর লাঠি।

সুতরাং গোস্ত ও চামড়াতেও পোকা লাগার কথা। পিপড়া দলে দলে লেগে যাওয়ার কথা। শরীরের রং পরিবর্তন হওয়ার কথা। কিন্তু লাকড়ীকে পোকা খেয়ে

ফেলল, অথচ নবীর শরীরে স্পর্শ করলনা। এভাবে পবিত্র কুরআনে হযরত উযাইর (আ.) ঘটনা রয়েছে। যা মৃত্যুর পর জীবিত হওয়ার দলীল। আল্লাহ পাক এরশাদ করেনঃ-

فاماته الله مأة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت ماة عام فانظر الى طعام وشرابك لم يتسنه وانظر الىٰ حمارك وليجعلك اٰية للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان الله علىٰ كل شئى قدير ـ(سوره بقره)

"আল্লাহ পাক তাঁকে(হযরত উযাইরকে) একশত বছর পর্যত মৃত্যুঅবস্থায় রেখেছেন তার পর তাকে জীবিত করেছেন। তাকে জিজ্ঞেস করলেন তুমি কত দিন এ অবস্থায় ছিলে। হযরত উযায়র (আঃ) উত্তর দিলেন হয়ত এক দিন ছিলাম অথবা এক দিনের চেয়েও কম। আল্লাহ পাক বলেন না, বরং তুমি এক শত বছর ছিলে। তুমি নিজের খানা পিনার প্রতি দেখ যে, কোন প্রকার পচা লাগেনি এবং তোমার গাধার দিকে দেখ। যাতে আমি তোমাকে মানুষের জন্য একটি দৃষ্টান্ত হিসেবে বানাব। এ গাধার হাড্ডির দিকে দেখ আমি তাকে কত সুবিন্যস্ত করে রেখে থাকি। তার পর উপর গোশতের প্রলেপ দিই। এ অবস্থা যখন সে লোকের সামনে ভাস্বর হল তখন তিনি বলে উঠলেন নিশ্চয়ই আল্লাহপাক সব কিছুর ক্ষমতা রাখে।

এই ঘটনা থেকে প্রমান পাওয়া যায়, বেহুশ হয়ে যাওয়ার নাম মৃত নয়। নতুবা ১০০ বছর মৃত রাখার পর ২য় বার জীবন দান করার উদ্দেশ্য কি ? (২) নবী (আ.) এর শরীর কোন যত্ন ছাড়াই মাটিতে পড়ে থাকে। আর তার গাধার হাড় গোড় গোস্ত চামড়া সব কিছু গলে শেষ হয়ে যায়। (৩) এমনিভাবে খাদ্য যা তার শরীরের অংশ ছিল তাও ১০০ বছর পর্যন্ত অবিকল ছিল এতে কোন দুর্গন্ধ ধরে নাই এবং এর পরিমানও কমে নাই, আর না কোন বস্তু একে স্পর্শ করেছে এই ঘটনায় কত পরিষ্কার দলীল হল যে নবীগণ মৃত্যুর পরও জীবিত।

এমনিভাবে পবিত্র কুরআনে আছহাবে কাহাফ এর ঘটনা ও রয়েছে। আল্লাহ পাক বলেন,

ولبثوا فى كهفهم ثلاث مأة سنين وازدادوتسعا. (كهف)

আছহাবে কাহাফ গুহাতে ৩০৯ বছর থেকেছিলেন কিন্তু যখন তাদেরকে জাগওত করা হয় তখন তারা কি বলেছিল যে এখন এসেছিল।

لبثنا يوما او بعد يوم একদিন অথবা একদিনের সামান্য কিছু অংশ। ইহা ছিল তাদের বরযখী জিন্দেগী। কিন্তু জাগতিক জিন্দেগীর হিসাবে তারা ৩০৯ বছর পর্যন্ত সে গুহায় ছিলেন। সামান্য চিন্তা করলেও তা বুঝে আসবে যে, যদি তাদের নখ বড় হত, অথবা কাপড় ফেটে যেত অথবা চুল বড় হয়ে যেত অথবা এত দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার কারণে তাদের শরীরের কোন পরিবর্তন আসত তাহলে কি তারা একথা বলত যে, একদিন বা একদিনের সামান্য অংশ?" এতেই বুঝ যায় তাদের শারীরীক কোন পরিবর্তন হয়নি। এই ঘটনার শাধ্যমে প্রকাশিত হয়ে গেল যে, মৃত্যুর পর জীবিত থাকার উপর যারা বিশ্বাস করেনা তারা মারাত্মক ভুলের মধ্যে রয়েছে। তারা পাপী। সুতরাং মৃত্যুর পর জীবিত থাকাকে বুঝানোর জন্য এমন কিছু ঘটনা আমরা বর্ণনা করব যা বিশুদ্ধ ও প্রমানীত । প্রসিদ্ধ আলেমে দ্বীন ইমাম আবু উবাইদ ছাক্বাফী (২২৪হিঃ) তার প্রসিদ্ধ কিতাব "كتاب الاموال" এ লিখেছেন- হযরত ওমর (রা.) এর শাসনামলে যখন সওস অধিকারে আসে এবং হযরত আবু মুসা আশয়ারী (রা.) সে সেখানকার শাসনকর্তা নিয়োগ করা হয় তখন তিনি সেখানে গিয়ে দেখতে পান যে, আল্লাহর নবী হযরত দানিয়াল (আ.) এর দেহ মোবারক একটি ইবাদত খানায় পড়ে রয়েছে। তাঁর মরদেহের পাশেই রয়েছে অনেক ধন সম্পদ আর পাশে রয়েছে একটি চিঠি। চিঠিতে লেখা রয়েছে যার কোন মালের প্রয়োজন সে এখান থেকে নিয়ে যাও। প্রয়োজন শেষে তা আবার ফেরত দাও। অন্যথায় তার কৃষ্ঠরোগ হবে। সেখানের লোকেরা বল্ল এর উপর আমল করা হচ্ছে। সুতরাং হযরত আবু মুসা আশয়ারী এই ব্যাপারটি বিস্তারিত ভাবে লিখে খলিফা হযরত ওমরকে অবহিত করেন। উত্তরে হযরত ওমর (রা.) লিখলেন- তার নামাজে যানাজা পড়ে দাফন করে দাও। এবং সমস্ত ধন সম্পদ বায়তুল মালে জমা রেখে দাও।

দলীল ঃ

হযরত দানিয়াল (আ.) হযরত ঈসা (আ.) থেকে আনুমানিক ৭০০বছর পূর্বে অতীত হন। আর হযরত ওমর (রা.)এর যমানা হযরত দানিয়ান (আ.) থেকে ১৪০০ বছর পরের । এ হিসাবে হযরত দানিয়াল (আ.) এর শরীর মোবারক আল্লাহ পাক ১৪০০ বছর পর্যন্ত সংরক্ষণ করেছেন- এতে লোকেরা তাকে স্বচক্ষে দেখতে পেয়েছেন, যে নবীর অঙ্গ ধ্বংস হয়না, বরং তার জিন্দেগী অর্জিত হয়।

হযরত ওমর (রা.) এর খেলাফতের অন্য একটি ঘটনাও আছে যে, নাজরানের

এক লোক একটি পড়ো বাড়ী খনন করার পর দেখল যে, দেয়ালের নীচেমৃত যুবককে বসা অবস্থায় পাওয়া গেল । সে তার কান পাট্টিতে হাত রেখে ছিল। তার একটি আঙ্গুলে অঙ্গুরী ছিল। যাতে লিখা ছিল ربی اللہ নারানের লোকেরা এই ঘটনাটি হযরত ওমর (রা.) এর কাছে পাঠাল। তিনি (ওমর) জানালেন তাকে এই অবস্থায় রেখে দাও। যুবকটির নাম ছিল عبد الثامر সে ঐ সমস্ত যুবকদের অন্তর্ভূক্ত যে, اصحاب الاخدود এর শিকার- যার আলোচনা পবিত্র কুরআনের ছুরা বুরুজে বর্ণিত রয়েছে।

হযরত আমির মুয়াবিয়া(রা.) এর যমানায় উহাদের নিম্নভূমিতে যখন নহর খনন করা হচ্ছিল তখন হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর ও হযরত আমর বিন জামু (রা.) এর লাশ অবিকল পাওয়া গেল। তারা আহতাস্থানে হাত রেখেছিলেন- যখন হাত সরানো হলো তখন রক্ত প্রবাহিত হবে লাগল। কিছুক্ষণ পর আবার নিজ ইচ্ছায় হাত আহত স্থানে চলে যেত।

হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন আমীর মুয়াবিয়া যখন নহর খননের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন তখন লোকদিগকে বল্লেন যে নিজ নিজ শহীদানের লাশ এখান থেকে সরিয়ে ফেলুন। যারা নিজ আত্মীয় স্বজনের কবর খনন করে সেখান থেকে লাশ বের করল, তখন দেখা গেল সমস্ত লাশ এ অবস্থায় ছিল যেন এখন গোসল দেয়া হয়েছে তাদের শরীর থেকে পানি পড়ছিল। ভুল বশত এক শহীদের পায়ে কুদাল লেগে। দেখা গেল টাটকা রক্ত বের হচ্ছে।

প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও মুফাস্সির আল্লামা ইবনুল জওযী (রহ.) তার গ্রহণ যোগ্য কিতাব আল মুন্তাজিম এ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে ২টি ঘটনা এখানে আমরা উল্লেখ করছি।

(১) মুহাম্মদ বিন ইয়াহ ইয়া নামক এক ব্যক্তি ইন্তেকাল করলে তাকে দাফন করা হয়। রাতে কাফন চুরেরা তার কবর খনন করলে তিনি উঠে বসে যান এবং দৌড়ে ঘরে পৌছে যান পরে তিনি অনেকদিন পর্যন্ত জীবিত ছিলেন এ কারণে তাকে পরে حامل كفنه বলা হত।

(২)আরেক ব্যক্তিকে দাফন করার পর যখন কাফন চুরেরা তার কবর খনন করল তখন সে জীবিত হয়ে চলে এলো। অতঃপর অনেক দিন জীবিত ছিল।

আল্লাহ পাক তাকে একটি ছেলেও দান করেছিলেন। ছেলেটির নাম মালেক

ছিল। গুজরাটের এক ওয়ালী উল্লাহ ছালেহ নজিও সিদ্দিকীকে গুজরাটের অত্যাচারী হাকিম ফাঁসির আদেশ দেয়। তার গলায় যখন ফাসির রাশি দেয়া হল তখন তিনি কলমা শাহাদাত পড়তে আরম্ভ করলেন। তার দেহ মাটি থেকে উঠানো হল এবং তার রুহ আকাশে চলে গেল কিন্তু যখন জাল (ফাসির দড়ি) নরম হয়ে গেল তখন শরীর যমীনে এসে লেগে গেল তখন তার শরীরে আবার রুহ ফিরে এলো এবং তিনি কলমা শাহাদতে র বাকী অংশ পাঠ করলেন। আছওয়াদ আনসী (মিথ্যা নবী দাবীদার) আবু মুসলিম খাওলামী এর নিকট বল্ল তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে আমি আল্লাহর রাছুল? আবু মুসলিম বল্ল আমি তোর কথা শুনি নাই। অতঃপর আসওয়াদ আনসী (মিত্যা নবী) বল্ল তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, মোহাম্মদ (স.) আল্লাহর রাছুল (স.) ? তখন আবু মুসলিম নবী (স.) এর গোলাম বল্লেন নিসন্দেহে আমি সাইয়্যেদ দু'আলম নবী (স.) কে আল্লাহর রাছুল স্বীকার করি। এতে আসওয়াদ আনসির আদেশে আগুন জালানো হল। অতঃপর সে আগুনে তাকে নিক্ষেপ করা হল। কিন্তু লোকেরা দেখল যে আবু মুসলিম জীবিত এবং তিনি নামাজ পড়ছেন পরে আগুন ঠান্ডা হয়ে গেল।

নবী করিম (স.) দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার পর আবু মুসলিম মদীনাতে আগমন করলে হযরত ওমর ফারুক (রা.) হযরত আবু মুসলিমকে তাঁর (ওমর) ও আবু বকর (রা.) এর মাঝখানে বসিয়ে বল্লেন! আল্লাহ পাকের অসংখ্য শুকর যে, যিনি আমাকে আমার জীবনে নবী করিম (স.) এর এমন উম্মত দেখিয়েছেন যার উপর আল্লাহ তায়ালা সেই দয়া করেছেন যে দয়া করেছিলেন হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর উপর।

বিখ্যাত মুহাদ্দিস হযরত আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী (রা.) তার কিতাব "আকিদাতুল ইসলাম" নামক কিতাবে লিছেছেন-

فاعلم ان النبوة باها الله تعالى بادم عليه السلام ثم جعلها فى ذريته اردم الثانى وهو نوح عليه السلام ثم جعلها فى ذريته أدم الثانى وهو نوح عليه السلام ثم جعلها فى ذريته ابراهيم عليه السلام وحصرها بعده فى نسله فقال تعالىو جعلنا فى ذريته النبوة والكتاب ثم جعلها شعبتين شعبة بنى اسرائيل فبعث منهم وسلا وانبيائتتزى الى ان اختمها بعيسىٰ عليه السلام ورفعه حيّا وشعبة بنى اسمعيل وبعث مه على دعوة ابراهيم خاتم الانبياء نبينا ﷺ وقضى له سيادة بنى أدم كلهم ولا فخروا بيده لواء

الحمد ولا فخر وامامن نبى يومئذ أدم فمن سواه الاتحت لوائه وقد اخذ الله ميثاق النبين الى منهم بنصرته ان ادركوا زمانه وقد ادركوه فى المسجد الاقضى الخ (عقيدة الاسلام طبع اول ص ١٠) والراجع ان المرازانه اخذ الميثاق من سائر الانبياء فى حق نبينا ﷺ واللام النبين للاستغراق. (ص ١٧)

আলোচ্য ইবারতের বিষয় ও উদ্দেশ্য হল রেসালত ও নবুওয়ের পবিত্র ধারাবাহিকতা হযরত আদম (আ.) থেকেই শুরু করেছেন- অতঃপর হযরত নূহ (আ.) এর বংশধর রেখে দিয়েছে। অতঃপর হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর বংশে সেই নবুওয়তের ধারাবাহিকতা নির্ধারিত করেছেন। অর্থাৎ হযরত ইব্রাহীম (আ.) এরপর যত নবী রাসুল তশরীফ এনেছেন তারা সকলেই হযরত ইব্রাহীম এর বংশ থেকে হয়েছেন। এক শাখা থেকে বনী ইস্রাইলের জন্ম। অর্থাৎ হযরত ইসহাক (আ.) এর ছেলে হযরত ইয়াকুব (আ.) এর বংশ থেকে, যার শেষ নবী হযরত মাছীহ (আ.) হন। যাকে আল্লাহ তায়ালা স্বশরীরে জীবিত উঠিয়ে নেন। আর ২য় শাখা হযরত ইসমাইল (আ.) থেকে নবী করিম (স.) এর আবির্ভাব ঘটে। আল্লাহ তা'য়ালা সব নবীগণের পক্ষ থেকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, শেষ নবী (স.) এর উপর ইমায় আনতে হবে এবং তার দ্বীনের সাহায্য করবে। সুতরাং-

(১) সেই শেষ নবী এই সমস্ত নবী থেকে শ্রেষ্ঠ হবেনা। কেননা তিনি এই সব নবীগণ বায়তুল মোকাদ্দাসে তার সহিত সাক্ষাৎ করবেন এবং তার ইমামতিতে নামাজ পড়বেন। সম্ভবত বায়তুল মোকাদ্দাসকে এই নেতৃত্বের প্রকাশ্য জামনের জন্য নির্ধারিত করেছেন। বায়তুল মোকাদ্দাস নবীগণের কেবলা থাকবে। কার্যত একে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছেন যে, এখন এর নেতৃত্ব নবীগণের অর্জিত হয়েছে।

ইমানের প্রকাশ এবং কর্মের আনুগত্য এসব নবীদের জীবন কর্মের দলীল। নবীদের জীবিত থাকা সম্পর্কে এত হাদীছ বর্ণিত আছে যে, এগুলো تواتر এর পর্যায়ে পৌছেছে।

অতএব গ্রহণযোগ্য প্রসিদ্ধ কয়েকটি কিতাব থেকে বেশ কিছু হাদীছ অনুবাদ সহ আলোচনা করা হল

الانبياء أحياء فى قبورهم يصلون

নবীগণ জীবিত, তাঁরা তাদের কবরে নামাজ পড়েন। হযরত আনোয়ার শাহ

কাশ্মিরী (রহ.) বলেন- হাফেজ ইবনে হজর আসকালানী (রহ.) বুখারী শরীফের শরাহ فتح الباری তে বিশ্লেষণ করেছেন যে, হাদীসখানা হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত এবং বিশুদ্ধ।

(২) قال رسول الله ﷺ اتيت على موسى ليلة اسرى بى عند الكثيب الاحمر وهو قائم يصلى فى قبره

নবী করিম (স.) এরশাদ ফরমান মেরাজ রজনীতে আমি হযরত মুসা (আ.) এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। আমি দেখলাম যে তিনি তার কবরে দাড়িয়ে নামাজ পড়ছেন।

এই হাদীছে বিস্তারিতভাবে নবী (স.) বলেছেন যে , হযরত মুসা (স.) তার কবরে দাড়িয়ে নামজ পড়তেছিলেন প্রমানীত হল দাঁড়ানো শরীরে বৈশিষ্ট।আর রুহ এর জন্য দাড়ানো বা বসা কিছুই নেই। নবী করিম (স.) এরশাদ ফরমান আমি নিজেকে নিজে নবীগণের জমায়াতে দেখেছি যে, হযরত মুসা(আ.) দাড়িয়ে নামাজ পড়ছেন আর আমি তাও দেখলাম যে, মরিয়মের ছেলে ঈসা (আ.) ও নামাজ পড়ছেন। আমি তাকে ওরওয়াহ বিন ছাকাকী ছাহাবীর আকৃতিতে দেখেছি আর আমি ইব্রাহীম (আ.) ও দড়ানো অবস্থায় দেখেছি আর তিনি আমার মত। এ সমস্ত আলোচন দ্বারা বুঝা যায় মৃত্যু অনস্তিত্বের নাম নয় বরং অন্য জগতের ولادت ثانويه (দ্বিতীয় জন্ম) বলা হয়। এই কারণেই স্বাধারণভাবে মৃত্যুকে انتقال শব্দ দ্বারা ও বলা হয়ে থাকে। কেননা মৃত্যুর পর মানুষ অস্তিত্বহীন বস্তুতে পরিনত হয়না। বরং অন্য জগতে স্থানান্তরিত হয় মাত্র। আর সেক্ষেত্রানুযায়ী তার হায়াত অর্জিত হয়। কোন কোন স্বল্প জ্ঞানীর অধিকারী লোকেরা মৃত্যুকে সেই فنا এর নাম দিয়ে থাকে যেমন একজন মানুষের মৃত্যু আসার পর যমীন থেকে পাতার মত গজায়, এমনি ভাবে সে মাটিতে মিশে যায় এবং আগুনে জালিয়ে অস্তিত্বহীন বস্তুতে পরিণত হয়ে যায়। অথচ এই ধরনের ধর্ম বিশ্বাস কোরআন হাদীস ও ইসলামী আকীদা সম্পূর্ণ পরিপন্থী ও ভুল । কেননা মৃত্যু ও আল্লাহ পাকের একটি আদেশ। যেমন জীবন আল্লাহর আদেশ। জীবন মৃত্যু উভয়ই চিরস্থায়ী ও বাস্তব। তাই আল্লাহ পাক এরশাদ করেন خلق الموت والحياة জীবন মৃত্যু আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন।

باب الثاء

ثاغية

(১২০) শেষ

আরবগণ বলে থাকেন ماله ثاغية ولا راغية "তার কাছে কোন মেষও নেই উটও নেই।" অর্থাৎ তার কাছে কিছুই নেই। এমনিভাবে তারা বলেন ماله دقيقة ولا جليلة دقيقة এর অর্থও একই। دقيقة অর্থ ছাগল এর جليلة অর্থ উটনী।

ثرملة

(১৬১) শিয়ালিনী

ثرملة স্ত্রী শিয়ালকে বলা হয়। এর বিস্তারিত আলোচনা ثعلب এর অধীনে করা হবে।

ثعبان

(১৬২) অজগর

প্রত্যেক বড়মাপের সাপকে অজগর বলা হয়, পুরুষ বিংবা স্ত্রী। এর বহুবচন ثعبة، ثعابين · ثعبان এক প্রকার গিরগিটকে বলে। এর আলোচনা الواو অধ্যায়ে এ গিরগিট এর অধীনে করা হবে।

জাহেয বলেন মিশর অঞ্চলেই অজগর বেশী হয়ে থাকে । মিশর ব্যতীত অন্য কোন অঞ্চলে পাওয়া যায় না । এ জন্য আল্লাহ্ পাক হযরত মুসা (আ.) এর লাঠিকে অজগর বানিয়ে ছিলেন। আল্লাহ্ পাক বলেন:

فالقى عصاه فاذا هى ثعبان مبين

"তিনি তার লাঠি ছেড়ে দিলেন, হঠাৎ তা হয়ে গেল এক সুস্পষ্ট অজগর।

আব্দুল্লাহ বিন জিদয়ান জীবনের প্রথম দিকে অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। তাছাড়া তিনি ছিলেন ঝগড়াটে । প্রায়ই নানা অপরাধে জড়িত হতেন। তার পিতা ও পরিবারের লোকজন তার ক্ষতি পূরন দিত। তার পক্ষ থেকে জরিমানা প্রদান

করত। একদা তার পিতা অপারগ হয়ে তাকে নির্বাসনে পাঠিয়ে দেন এবং শপথ করেন যে, কখনোই তার প্রতি আর দয়া দেখাবে না। এই সমস্ত ঘটনার প্রেক্ষিতে আব্দুল্লাহ বিন জিদয়ান বাড়ী থেকে বের হয়ে মক্কার এক সরু রাস্তা দিয়ে রওয়ানা হলেন এবং মৃত্যু কামনা করতেছিলেন। হঠাৎ দেখলেন যে, পাহাড়ে একটিবিরাট গর্ত। তিনি ভাবলেন এর ভিতর নিশ্চয় কোন বিশাক্ত সাপ আছে সুতরাং এ গর্তের পুরুস্কারই আমার প্রয়োজন। তিনি আরো ভাবলেন এর ভিতর এমন কোন জিনিষ রয়েছে যা তার মৃত্যুকে তরান্বিত এবং সেখানে চির দিনের জন্য ঘুমানো যাবে। যখন সে গতে কোন ক্ষতিকারক বস্তু পাওয়া গেলনা তখন সাহেস করে তিনি এর ভিতর প্রবেশ করলেন। গর্তে প্রবেশ করে দেখলেন এর ভিতর বিরাট একটি অজগর সাপ রয়েছে। তার দুচোখ অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত ঝাক ঝক করছে। তিনি সেখানে দাড়িয়ে থেকে সাপটির পুরস্কার নেবার অর্থাৎ এর ছোবল খাওয়ার অপেক্ষা করতে লাগলেন। কিন্তু না সে তাকে কিছুই করছেন। এমনকি তার নড়াচড়া পর্যন্তও নেই। মনে মনে ভাবলেন সম্ভবত সাপটি মানুষের তৈরী অর্থাৎ কৃত্রিম। তিনি সাপটি তার হাত দ্বারা স্পর্শ করলেন এবং বুঝতে পারলেন এটি স্বর্ণের তৈরী। সাপের চোখ দুটো ইয়াকুতের। তিনি চোখ দুটো খুলে ফেললেন। অতঃপর তিনি গর্তের আরো অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। তিনি চোখ দুটো খুলে ফেলেন একটি খাটের উপর চার পা বিশিষ্ট একটি আসন রয়েছে। এত দীর্ঘ আসন তিনি ইতিপূর্বে আর কখনো দেখেননি। আসনটির শীর্ষ দেশে একটি রৌপ্যের ছোট চেয়ার রয়েছে। এতে তার নির্মাণ ইতিহাস লেখা ছিল। তখন বাদশাহ ছিলেন জুরহাম। জুরহাম গোত্রের সর্বশেষ সম্মানীত শাসক ছিলেন হারছ বিন মাজাজ তাঁর পাগড়ীর শিমলা ছিল বেশ দীর্ঘ । তার গায়ে ছিল চিত্রাঙ্কন কাপড়। অনেক দিন পর্যন্ত তা অবিকৃত ছিল। কোন বস্তু যদিও এর উপর বসত তা ঝড় কুটার মত উড়ে যেত। চেয়ারটিতে কিছু উপদেশ মূলক বাক্য খুদাই করা ছিল । ইবনে হিশাম বলেন- চেয়ারটি ছিল মর্মর পাথরের এতে লিখা ছিল ঃ

"আমি নাজিল বিন আব্দুল মাদ্দান বিন খাশরাম বিন আব্দ ইয়া লিল

জুরহাম বিন ফাহত্বান বিন হুদ (আ.)। আমি ৫০০ বছর পর্যন্ত জিবিত ছিলাম। ধন সম্পদ ও রাজত্বের খুঁজে সমগ্র জগত বীর বেশে ঘুরে বেরিয়েছি। কিন্তু এগুলোর মধ্যে কোন কোন বস্তুই আমাকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে পারল না। অতঃপর এই সংকলনের নীচে এই কবিতা লেখাছিল।''

قد قطعت البلاد فى طلب الثر:: وة المجلد قالص الانواب

''ধ্বংস প্রাপ্ত বস্তু, ধন-সম্পদ ও মান সম্মানের অনুসন্ধানে আমি অধিকাংশ শহর ভ্রমন করেছি। ''

وسريت البلاد وقفر القفر:: بقناة ووة واكتساب

''ইচ্ছা সংকল্প, উদ্দম এবং শক্তির মাধ্যমে পানি ঘাসহীন অরন্যের রাস্তায় রাতেও সফর করেছি।''

ناصاب الودى بنات فوادى:: بسهام من المناياصياب

''একসময় মৃত্যু তির সঠিক নিশানায় আমার অন্তর ধ্বংস হয়ে গেল।''

فانقضب مدتى واقصر جهلى:: واستراحت عواذلى من عتاب

''আমার সময় শেষ হয়ে গেল এবং আমার মূর্খতাও দুর হয়ে গেল। আর আমার নিন্দা থেকে ভর্ৎসনা নিরাপদ হয়ে গেল ।''

ورفعت السفاة بالحلم لما:: نزل الشيف فى محل الشباب

''সহনশীলতা আমার চরিত্রকে সাঙ্গ করে দিল। যখন বাধক্য যৌবনকে কাবু করে ফেলল। ''

ماح رأيت اوسمعت براع:: ردفى الضرع ماقوى الحلاب

সে ডেকে বল্ল তুমি কোন রাখালের কাছে শুনেছ? (সে বল্ল) নিজ চক্ষে দেখেছি যে পাত্রে দধ জাম করা হয়েছিল এবং উলানে ফেরত দেয়া হয়েছে।

গর্তটির মধ্যভাগে ইয়াকুত মুক্তা, যবরযদ পাথর, সোনা ও রোপার স্তুপ ছিল। তা থেকে তিনি সামান্য গ্রহণ করলেন। তারপর তিনি গর্তটিতে একটি চিহ্ন দিলেন। যাতে পরে তা সহজে বের করা যায় এবং গর্তের মুখে একটি পাথর

চাপা দিয়ে বন্ধ করে দিলেন। গর্ত থেকে প্রাপ্ত মালামাল তিনি তার পিতার নিকট পাঠালেন- যাতে পিতার কক্ষ থেকে অনুগ্রহ পাওয়া যায়। এবং যাতে বাড়ীতে ফেরত আসতে পারেন এবং যাতে তার বংশের নেতা হতে পারেন। তিনি গর্তের সেই সম্পদ মানুষের জন্য ব্যয় করতে লাগলেন। জনগণকে খান খাওয়াতে লাগলেন। ভাল ভাল কাজে টাকা পয়সা ব্যয় করতে লাগলেন। তার পানি খাওয়ার পেয়ালাটি এত বিশাল ছিল যে উঠ তার আরোহী সহ পেট পর্যন ডুবে যেত। একদা তার পান পাত্রটিতে একটি শিশু পতিত হয়ে মৃত্যু বরণ করল।

হুযূর পাক (স.) এরশাদ ফরমান, আমি আব্দুল্লাহ বিন যিদয়ানের পান পাত্রের ছায়া থেকে ছায়া গ্রহণ করেছিলাম।

হযরত ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলেন যে, এক অন্ধ লোক ছিল। সম্ভবত সে আদওয়ান বা 'আয়াদ' গোত্রর ছিল। জাহেলিয়াত যুগে আরবের ফকীহ হিসাবে খ্যাত ছিল। একদা সে হজ্জ বা ওমরা করে তার গোত্রের নিকট ফিরে এলো। মক্কা শরীফ যখন মাত্র দু মঞ্জিল দরে তখন তিনি তার সম্প্রদায়ের লোককে বল্লেন- যখন তিনি ওয়াস্তায়ে জহীরে ছিলেন এই মুহূর্তে কোন লোক যদি আগামী কাল মক্কাতে আগমন করে তাহলে দুটি ওমরার ছোয়াব পাবে। সুতরাং তারা দ্রুত গতিতে উটকে হাকাতে লাগল। শেষ পর্যন্ত তারা ভোরেই মক্কাতে এসে পৌছল।

আব্দুল্লাহ বিন যিদআন ঃ

আব্দুল্লাহ বিন যিদয়ান তামিমী এর উপাধি আবু যহীর। তিনি উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.) এর ভাতিজা ছিলেন। এ জন্য হযরত আয়েশা (রা.) জনাব রাছুলুল্লাহ (স.) এর কাছে তার ব্যাপারে আলোচনা করে বল্লেন, হে আল্লাহর রাছুল (স.) ইবনে যিদয়ান তো একজন মেহমান প্রিয় এবং ভাল কাজের লোক ছিলেন। কিয়ামতের দিন কি তার কাজের কোন মূল্যায়ন হবে? নবী করিম (স.) বল্লেন হে আয়েশা। বিলকুল না। ইবনে যিদআনের কোন দিনই হাশর ময়দানে গুনাহ থেকে বাচার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার বাগ্যে জুটে নাই।

ইমাম সুহাইলী এবং আহমদ বিন আম্মার বলেন আব্দুল্লাহ বিন যিদআন সেই লোকদের অন্তর্ভুক্ত যারা মদের সাথে সম্পৃক্ততা ছিন্ন করে নিজের জন্য মদ হারাম করেছিলেন। ঘটনার বিবরন এরূপঃ একদা তিনি মদ্য পান করে বেহুশ হয়ে যান। তিনি তার হাত বাড়িয়ে চাঁদের আলো তার মুষ্টিতে নেয়ার জন্য চেষ্টা করতে লাগালেন। সাথীরা তা দেখে হাসতে লাগল। যখন তিনি স্বাভাবিক হলেন- তখন তার বন্ধুরা বল্ল তুমি বেহুশী অবস্থায় একি করেছিলে? এতে তিনি অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে যান এবং আর মদ্যপান করবেন না বলে কছম খেলেন। তিনি যখন বৃদ্ধ হলেন তখন বনু তামীম তাকে অপব্যায় থেকে ফেরানোর চেষ্টা করেন এবং দান খয়রাত থেকে তাকে ফেরান। ইবনে যিদয়ানের অবস্থা ছিল এরকম যে, লোকদেরকে ডেকে এনে মৃদু করে থাপড় মারতেন।তারপর তাকে বলতেন উঠ এবং কছম করে বল যে, আমি তোমাকে থাপপর মেরেছি। এর প্রতিশোধ হিসেবে আমি জরিমানা আদায় করব। লোকেরা সেরূপ করাতে বনী তামীম ইবনে জিদয়ানের ধন-সম্পদ জরিমানা হিসেবে দিত।

আবুল ফাতাহ আলী ইবনে মুহাম্মদ বসনী এই বিষয়ে ভাল এবং দীর্ঘ কবিতা বলেছেন যা উপদেশের সমাবেশ। আবুল ফাতাহ এর গদ্য ও পদ্য উভয় রচনার দক্ষতা ছিল। কোন কোন কবি কবিতায় তার রচনাকে সংযুক্ত করেছেন। প্রসিদ্ধ হল সংযুক্ত কবিতা খলিফা রাজী বিল্লাহর।

زيادة المرأفى دنياه نقصان :: وربحه غر محض الخير خسران

"মানুষের জন্য সীমাতিরিক্ত দুনিয়াদারী ক্ষতিকারক। আর তার উপকার ও নিরেট উত্তম ব্যতীত ক্ষতির সামান হয়।"

وكل وجدان حظلا ثبات له :: فان معناه فى التحقيق فقد ان

"প্রতিটি লোকের জন্যই একটি অপ্রকাশিত অংশ রয়েছে। মূলত এর প্রকৃত অর্থ হল সেও একদিন বিলুপ্ত হয়ে যাবে।"

ياعامر الخواب الدهر مجتهدا:: بالله هل الخراب العمر عمران

"হে দুনিয়া আবাদ করার চেষ্টাকারী, আল্লাহর কছম- দুনিয়া কি সার

জীবনের জন্যই?"

ويا حريصا على الاموال يجعمها:: نسيت ان سرور المال احزان

" হেসম্পদ জমাকারী লোভী! সত্যর ধন-সম্পদ চিন্তার কারণ হয়ে যায়। তুমি কি তা ভুলে গেছ? "

دع الفؤادعن الدنب وزخرفها:: فصفوها كدروالوصل هجران

"দুনিয়া এবং তার রঙ্গিন আকর্ষণের প্রতি আকৃষ্ট হয়োনা। কারণ দুনিয়ার আনন্দ উপভোগ গাদ্দারী এবং বন্ধুত্ব পৃথককারী।"

وادع سمك امثالا افصلها:: كمايفصل ياقوت ومرجان

"তুমি ভাল করে শুনো আমি ;দৃষ্টান্ত দিয়ে এভাবে পৃথক-পৃথক ভাবে বর্ণনা করব যেমন ইয়কুত ও মুতি পরস্পর পৃথক হয়ে যায়।"

احسن الى الناس تستعبد قلوبهم :: فطاطااستعبد ال انسان احسان

"মানুষের সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ কর তাহলে তারা তোমার আনুগত্য করবে। কারণ অধিকাংশ মানুষ উত্তম ব্যবহারের গোলাম।"

وكن على الدهر معو انالذى امل :: يرجوند فان الحرمعوان

"যে লোক তোমার দান ও দয়ার প্রার্থী হয় তুমি তার বিপদাপদে বেশী বেশী কাজ কর। কারণ ভদ্র লোক সুযোগ বুঝে অন্যের সাথী হয়।

من جاء بالمال مال الناس قاطبة:: اليه والمال للانسان فتان

"যে লোক দান করে তার সব উপকার পরেই হয়ে থাকে আর ধন-সম্পদ মানুষকে ফিতনায় ফেলে দেয়।"

من كان للخير منا عافليس له :: عند الحقيقة اخوان واخدان

"কাজ থেকে যে বিরত রাখে বিপদের সময় তার কোন ভাই থাকেনা কোন সাথী থকে না । "

لاتخد شن بمطل وجه عارفه:: قالبر يخد شه مطل وليان

"তুমি কোন পরিচিত ব্যক্তির বাহানার কারণে ধোকা দিওনা, কারণ নেককার লোককে বাহানা এবং মমতা ধোকা দেয়।"

ياخادم الجسم كم تسعى لخدمتة:: اتطلب الربح مما فيه خسران

"হে দেহের গোলাম তুমি কত দিন গোলামীতে পড়ে থাকবে। তুমি কি ক্ষতিকারক বস্তুতে উপকারের ঠিকানা খুজে পাবে?"

اقبل على الناس فاستكم فضائلها :: فانت بالنفس لا بالجسم انسان

"সৎকাজের উপর সাবধানতা অবলম্বন করে পূর্ণভাবে আয়ত্বের কাজে মনোযোগ দাও। কেননা নফছের নামই মানুষ কাঠামোর নাম মানুষ নয়।"

من يتق الله يحمد فى عواقبه:: ويكفه شرمن عزواو من هانوا

"যে আল্লাহকে ভয় করে তার যাবতীয় কর্ম ভাল হয় বড় ছোট সব ধরনের কষ্ট থেকে সে নিরাপদ থাকে।"

حسب الفتى خلا يعاشره :: اذاتحامه اخوان وخلان

"যবকের জন্য তাই যথেষ্ট যে, সে বন্ধুদের মধ্যে বিশ্বস্থ জিন্দেগী অতিবাহিত করছে যখন সে বেচে যায় তখন তার ভাই ও দোস্তের কোন অভাব থাকে না অর্থাৎ তখন তার অনেক ভাই ও দোস্ত হয়ে যায়। "

لاتستشر اغير ندب حازم فطن :: قد استوت منه اسرار واعلان

"তুমি জ্ঞানী এবং জাগ্রত ব্যক্তি ব্যতীত আর অন্য কারো নিকট পরামর্শ গ্রহণ করো না। কেননা এদের ভিতর বাহির এক হয়ে থাকে। "

فلتدبير فرسان اذار كضوا::فيها ابرواكما للحرب نرسان

" রণাঙ্গনের মত চেষ্টা তদবীরেও নিপুন অশ্বারোহী অর্থাৎ জ্ঞানী ও পরীক্ষিত হয়ে থাকে। যখনই সে আক্রমন করে তখনই সে বিজয়ী হয়।"

وللامور موافقيت مقدرة:: وكل امر له حدوميزان

"প্রত্যেক কাজের জন্য একটি সময় একটি চুড়ান্ত সীমা এবং পরিমাপের জন্য পরিমান করেছে। "

من رافق الرفق فى كل الامور فلم:: بندم عليه ولم يدممه انسان

" যে লোক পতিটি কাজ-কর্মে নম্র ভদ্রের পরিচয় দেয় সে কখনো লজ্জিত ও কোন মন্দ কাজের সম্মুখীন হবে না।"

ولا تكن عجلا فى الامر تطلبه :: فليس يحمد قل النضيع بحران

"কোন কোন অন্বেষন করতে তাড়াহোড়ো করোনা কেননা প্রথমেই অনুসন্ধান কর্ম পুর্নাঙ্গ না হওয়ার কারণে তা ভাল হয়না।"

وذوالقناعة راض فى معيشته :: وصاحب الحرص ان اثرى ففضبان

"কৃচ্ছতা সাধন জিন্দেগীতে আনন্দ প্রশান্তির রয়েছে সে যদি লোভী ও ধনী হয় তাহলে সে নিরানন্দ ও চিন্তিত থাকে।"

كفى من العيش ماقد سد من رمق :: ففيه للحران حقيقت غنيان

" জীবন যাপনের জন্য সাধারণ আহারবিহারই যথেষ্ট, ব্যাস এতটুকু পরিমান হলেই শরীফ লোকের জন্য জীবন চলে।"

هما رضيعا لبان حكمه وتقٰى:: وساكنا وطن مال وطغيان

"তারা উভয়ে প্রজ্ঞা ও সংযমশীলতার দগ্ধপোষ্য শিশু। ধন-সম্পদ ও ঔদ্ধত্য এক দেশের দু'টি বাসিন্দা।"

من مدطرفايفرط الجهل نحوهوى:: اغضى عن الحق يوما وهو خزيان

"যে লোক মূর্খতার শত চুড়ান্ত কামনার দিকে ধাবিত হয় সে এক দিন অপদস্ত হয়ে সত্য থেকে প্রত্যাবর্তন করবে।"

من استشار صروف الدهر قام له :: على حقيقة طبع الدهر برهان

"আকস্মিক দুর্ঘটনার প্রভাব যার উপর পতিত হয়, তার জন্য কালের প্রকৃতি সঠিক দলীল বিকশিত হয়ে যায়।"

من عاشر الناس لاقى منهم نصبا:: لانهم طبعهم بغٰى وعدوان

"যে ব্যক্তি মানব সমাজে জীবন কাটায় তার উপর বিপদাপদও আসে, কারণ তাদের প্রকৃতিতে বৈরীতা ও দুশমনী হয়ে থাকে।"

ومن يفتش على الاخوان مجتهدا:: فعل اخوان هذا الدهر خوان

"যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের অনুসন্ধানে আত্মনিয়োজিত হয় সমস্ত ভাই তার সহিত খেয়ানত করে।"

من يزرعه الشر يحصد فى عواقبه :: ندامة والعد الزرع ابان

"যে ব্যক্তি নিন্দার ভূমি কর্ষণ করে তার ফলাফল হয় লজ্জার কাটা। কারণ (ফসল) কাটার একটার একটা নির্দিষ্ট সময় আছে।"

من استنام الى الاشرار نام وفى :: قميصه منهم صل وثعبان

"যে লোক খারাপের সহিত সম্পর্ক রেখে আত্মবিশ্বাসী হয় সে যেন তার জামার ভিতর অজগর নিয়ে শুয়ে যায়।"

من سالم الناس يسلم من غوائلهم :: وعاش وهو قدير العين جذلان

"যে লোক মানুষের সাথে সৌহার্দ-সম্প্রীতির সম্পর্ক গড়ে সে ক্ষতিকারক বস্তু থেকে নিরাপদ হয়ে শান্তি জীবন কাটায়।"

من كان للعقل سلطان عليه غدا::وماعلى نفسه للحرص سلطان

"যে লোক নিজ আকলের মুহাফিজ হয় তাদের কি হয়ে গেল যে সে নিজের খামারের খবর রাখতে পারেনা।"

وان اساء مسى فيكن لك فى :: عروض ذلته صفح وغفران

"যদি কেউ সন্ধ্যায় খরাপের সাথে নিজেকে উপস্থিত করে তার সুনাম সুখ্যাতির উপর চক্ষু লজ্জা এবং উদারতার সহিত কাজ আদায় কর।"

اذانبابكريم موطن فله:: ورائه فى بسيط الارض اوطان

"যদি মাতৃভূমির কোন ভদ্রলোকের ব্যাপারে রিপোর্ট করা হয় তবে মনে রেখো তার জন্য ভূ-পৃষ্টে এ ছাড়াও তার জন্য অনেক স্থান রয়েছে।"

ولا تحسبن سرورا دائما ابدا:: من سرة زمن ساء ته ازمان

"তুমি নিজেকে নিজে সব সময় আনন্দিত মনে কর। কারণ যুগ কাউকে কোন সময় খুশি করলে অন্য সময় তার সহিত দুর্ব্যবহার করে।"

ياظالما فرحابلغو ساعده:: ان كنت فى سبة فالدهريقضان

"ওহে আনন্দিত অত্যাচারী চূড়ান্ত সহায়তায় পৌছ যদিও তুমি তন্দ্রাচ্ছন্ন যুগ কিন্তু লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়।"

ياايها العالم المرضى سيرته:: أبشرفانت بغير الماء ديان

"ওহে বিজ্ঞ পবিত্র চরিত্রের অধিকারী তোমাদের মধ্যে সুসংবাদ দেয় যে পানি ব্যতীতই প্লাবিত হয়। "

وياالخاالجهل لواصبحت فى لجج:: فانت مابينهما لاشك ظمان

"ওহে মূর্খ ভ্রাত! যদিও তুমি সমুদ্রে থাক না কেন তবুও তাতে তৃষ্ণা থাকে। "

دع التكاسل فى الخيرات تطلبها:: فليس يسعد بالخيرات كسلان

"তুমি উত্তম ও কল্যাণের খোজ করতে পরিশ্রান্ত হয়ো না কেননা পরিশ্রান্ত ব্যক্তি সৌভাগ্যের চরম শিখরে পৌছতে পারেনা।"

من حروجك لاتهتك غلالة:: فكل حرلحر الوجه صوان

"তুমি নিজের ইজ্জতের হেফজত কর, তার সম্মান ভূলণ্ঠিত করোনা। কেননা প্রতিজন ভদ্রব্যক্তি অন্য ভদ্র লোকের জন্য মুহাফিজ হয়।"

لاتحسبن الناس طبعا واحدا فلهم:: غرائز لست تحصيها والوان

"তুমি সকলকে একই ছাঁচে ঢেলে দিওনা। কারণ মানুষের চরিত্র সীমাহীন রঙ্গিন বিভিন্নতা হয়ে থাকে।"

ماكل ماء كصداء الورادة:: نعم ولااكل بنت فهو سعدان

"সব পানিই ঘাটে আগমনকারীর জন্য মুক্তি দাতা হয় না, তা ঠিক আর সব ঘরেই বুদ্ধিমান শিশু হয় না। "

من استعان بغير الله فى طلب:: فان ناصره عضز وخذلان

"যে লোক প্রয়োজনের সময় গায়রুল্লাহর সাহায্য কামনা করে তাহলে প্রকৃতভাবে তার সাহায্যকারী অক্ষম ও দুর্বল হয়ে থাকে।"

واشددیدك بحبل الله معتصما:: فانه الركن ان خانتك اركان

"যদি সম্প্রদায়ের লোকেরা তোমার সহিত বিশ্বাস ঘাতকাত করে তাহলে তুমি আল্লাহর রশিকে শক্ত করে ধর। কারণ তাহলো মজবুত ও শক্তিশালী।"

ولا ظلا للمرء يعنى عب تقى ورضا:: وان اظلته اوراق وافنان

"কারো কাছে ভয় ও সন্তুষ্টি থেকে বেপরোয়া ব্যক্তি ছায়া হয়না। যদিও সে স্নিগ্ধ ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেছে।"

سحبان من غير مال باقبل حصر:: وباقبل فى اثراء المال سحبان

"ছোহবান যেমন খতীবে আজম মাল বিহীন বাকিল যা কথা বলতে সক্ষম ছিলনা আর বাকিল ধন সম্পদের সময় ছোহবান হয়ে যায়।"

والناس اخوان من والته دولته:: وهم عليه ازاه عادته اعوان

"ওয়ালী সালতানাতের জন্য মানুষ ভাই ভাই হয়ে যায়। যখন বিচারকের উপর কোন প্রকার আক্রমন হয় তখন সে সাহয্য কারী হয়।"

لاتغرربشاب ناعم خضل:: فكم تقدم قل الشيب شبان

"তুমি সজীবতা ও আত্মহারা যৌবন উম্মক্ততা ধোকায় পড়োনা, কেননা অনেক যুবক বৃদ্ধ হওয়ার পূর্বেই মুক্ত হয়ে গিয়েছে।"

وايا اخاالشيب لو نا صحت نفسك لم :: يكن لمثلك فى الاسراف امعان

"আর বার্ধক্যে উপনতি ব্যক্তি, তোমার আত্মার সুস্থ থাকুক তোমার যেমন নির্থক ব্যয় নেই।"

هب الشيبة تبدى عذرصاحبها:: مابال شيبك ليستهوبه شيطان

"বাধ্যতামূলক জোয়ানী তার কামরার ওযর করছে জিজ্ঞেসকর শয়তানের মাতালতা বৃদ্ধের কি অবস্থা হবে।"

كل الذوب فان الله يغفرها:: ان شيع المرء اخلاص وايمان

"ব্যক্তির মধ্যে যদি ইমান ও একনিষ্ঠতা আসে তাহলে আল্লাহ পাক সব ধরনের পাপ রাশি ক্ষমা করে দেন।"

وكل كسرفان الله يجبره:: ومالكسرقناة الذين جبران

"আল্লাহ তা'য়ালা শরীরের সকল গ্রন্থির ভেঙ্গে যাওয়া হাড়ি জোড়া দিবেন। কিন্তু ঘীনের ভেঙ্গে যাওয়া লাকড়ীকে জোড়া দেয়া যায় না।"

احسن اذا كان امكان ومقدرة:: فلا يدوم على الانسان امكان

"যদি শক্তি সামর্থ হয় তাহলে সৌজন্যমূলক আচরণ কর কেননা মানুষের সামর্থ সব সময় থাকেনা।"

فالروض يزدان بالانور فاغمه:: والحربالعدل والاهسان يزدان

"প্রস্ফুটিত পুষ্প কলি থেকে নববধু বানায়। আর স্বাধীন ও ভদ্র ব্যক্তিত্ব ন্যায়নীতিও এহছান দ্বারা সজ্জিত হয়।"

خذهاسرائر امثال مهذبة:: فيها لمن يتغى التبيان تبين

"সে সমস্ত পুত পবিত্র লোকদের কৌশল স্বরণ কর। যারা আলো অর্জন করতে চায় তাদের জন্য তাতে রয়েছে আলোর ব্যবস্থা।"

ماضر حسانها والطبع صائفها:: ان لم يضفها قريع الشعر

"প্রজ্ঞাপূর্ণ কথার যাদুগর মূলতঃ বিজ্ঞ প্রকৃতি এতে ঢেলেছেন। এতে কেহ ক্ষতি করতে পারেনা। যদি উত্তম কবিতা রচনায় উপযুক্ত কথার কবিগণ অংশ নেয়না।"

وكن لسنة خير الخلق تبعا:: ف انها لنجاة العبد عنوان

"তুমি সবচেয়ে উত্তম চরিত্রের নবী (স.) তরীকার অনুসারী হয়ে যাও। কেননা সুন্নত পন্থাই বান্দার নাজাতের ঠিকানা।"

فهو الذى شملت للخلق انعمه:: وعمهم منه فى الدارين احسان

"সমগ্র মাখলুকে যার মেহেরবানী ছেয়ে গেলে। তিনি সেই মহানুভব ব্যক্তিত্ব এবং দুনিয়া ও আখেরাতের সমস্ত সৃষ্টির উরতার দয়া।"

جبينه قد زانه خفر:: وثغر دررعذر ومر حبان

"তিনি সেই মহান ব্যক্তিত্ব থাকে সম্ভ্রমতা চন্দ্রের মত সুশীল করেছে তার

দাত মোবারক বড় বড় মূর্তির ন্যায় জ্যোতির্ময়।”

والبدر يخجل من انوار طلعته:: والشمس من حسنه الوضاح تزدان

“আর শশী তার নূরানী চেহারা দর্শনে লজ্জিত আর সূর্য তার চেহারার আলোচ্ছটায় অবজ্ঞার পাত্র। ”

به توسلنا فى محودلتنا :: لربنا انه ذوالجودمنان

“আমরা আমাদের তত্বাবধায়ক ও পদস্খলন থেকে রক্ষা করার তরে তাকেও ছিলা বানায়। কারণ তিনি অতি দয়ালু।”

ومذاتى الصبرت عمل القلوببه ::سيل الهدى ودعت للحق اذان

“তিনি যখন শুভাগমন করলেন তখন অন্ধকার অন্তর ও হেদায়েতের পন্থা দেখে ফেলল। আর কর্ণ ও হক কথা শুনে ফেলল। ”

يارب صل على عليه ما همى مطر:: قاينعت منه اوداق واغصان

“হে আল্লাহ যতক্ষণ বর্ষন হতে থাকে ততক্ষণই সে মহন রাছুলের (স.) উপর রহমত বর্ষণ করতে থাকুন। যার কারণে পত্র পল্লব ও ফুল ফুটে।”

وابعث اليه سلاما راكيا عطرا :: والال والصحب لانقنيه ازمان

“তার উপর এবং তার বংশের উপর এবং তার আছহাবগণের উপর কিয়ামত পর্যন্ত দুরুদ ও ছালাম প্রেরণ করতে থাকুন।”

এখন আবুল কাশেম বাস্তীর কথার প্রতি দৃষ্টিপাত করা দরকার। যে লোক নিজেকে সংশোধন করে নেয় তার প্রতি হিংসাকারীরা মাটি হয়ে যায়। যে ক্রোধের অনুগত হয়ে যায় তার শিষ্টাচার ধ্বংস হয়ে যায়। বড় লোকের চরিত্র ভাল হয়, নেককার লোক রাগের সময় থেমে যায়। ঘুষ প্রয়োজনের রশি। মূর্খ হল সে ব্যক্তি যে আপন ভাইয়ের বদনামকারী হয়। আর বাদশাহর উপর ভরসাকারী। বুক জ্ঞানের কিরন। কামনা বাসনার স্বাদ উড়িয়ে দেয়। পাক-পবিত্রতা কৃচ্ছতার উপর সন্তুষ্টির নাম।

ثعالة

(১২৩) মাদী শৃগাল

ثعالة–نخالة এর ওজনে আসে। نخالة এবং فضالة ـزبالة ـ نخالة এতিন জন একই আকৃতির ভাই ছিল। ثعالة একটি প্রসিদ্ধ শৃগালকে বলা হয়। مثعلة এমন ভূমিকে বলা হয় যেখানে বেশী শৃগাল থাকে। معقره এমন ভূমিকে বলে যেখানে অধিক পরিমানে বিচ্ছু থাকে।

প্রবাদ বাক্য ঃ

আরবগণ বলেন, فلان اروغ من ثعاله অমুক শিয়ালের চেয়ে অধিক ধোকাবাজ। কবি বলেন-

فاحتلت حين صرمتنى :: والمرء يعجز لا محالة

"তুমি যখন আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছ তখন আমি চেষ্টা করলাম। আমার বিশ্বাস মানুষ কাবু হয়"

والدهر يلعب بالفتى:: والدهر اروغ من ثعاله

"যুগ যুবকের সাথে আনন্দ করে। আর যুগতো শিয়ালের চেয়েও অধিক ধূর্ত।"

والمرء يكسب ماله:: والشيخ يورثه الفسالة

" মানুষ রোজগার করে এবং লোভ নির্লোভের অংশিদার বানায়।"

والعبد يقرع بالعصا:: والحر تكفيه المقالة

"গোলামকে ডান্ডা দ্বারা খটখট করে অর্থাৎ গোলাম অনেক ভুল ভ্রান্তি করে আর ভদ্রলোকের জন্য বলে দেয়াই যথেষ্ট।

আরবগণ এও বলেন, فلان اعطش من ثعالة অমুক লোক শিয়ালের চেয়ে বেশী তৃষ্ণার্ত।

ثعالة এর অর্থ নিয়ে উলামায়ে কেরামের মতভেদ রয়েছে। মুহাম্মদ বিন জাইবের মতামত হল لومڑی শিয়ালকে বলে। কিন্তু ইবনুল আরাবী তা অস্বীকার করেন بنو محاشع গোত্রের এক লোকের নাম । সে জংগলে তার এক

সাথীর পেশাব পান করেছিল। সুতরাং তার পিপাসা নিবারন হল।

ثعبة

(১২৪) গিরগিট

ইমাম জাওহারী লিখেন, ثعبة এক প্রকারগিরগিটের নাম।

ثعلب

(১২৫) শিয়াল

ثعلب তথা শিয়াল একটি প্রসিদ্ধ প্রাণী। এর বহুবচন ثعالب ও اثعل আসে। স্ত্রীকে বলে ثعلبة ফার্সীতে এর নাম "روباه" আর হিন্দী ভাষায় শিয়ালকে لومڑی ও বলে।

ওয়াবেসা ইবনে মাবাদ বলেন, আমি নবী করিম (স.) এর কাছে শুনেছি যে শিয়াল হিংস্র প্রাণীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী কুচক্রী প্রকৃতির।

শিয়ালের উপাধিঃ

ابو الحصين ، ابو النجم، ابو نوفل، ابو الوثاب، ابو الحيض

পুরুষ শিয়ালকে ثعلبان বলে। কাসাঈ বলেন-

ارب يبول الثعلبان براسه :: لقدذل من بالت عليه الثعالب

এমন কোন প্রতিমা কি মা'বুদ হওয়ার উপযোগী যার উপর শিয়াল পশ্রাব করে অথবা যার উপর শিয়াল পশ্রাব করেছে? সে অবশ্যই অপমানিত ও ধ্বংস হবে। এমনিভাবে অন্যান্য কবিও এ ধরনের কবিতা লিখেছেন। তবে এগুলো চিন্তা মাত্র ثعلبان কে যবরযোগে পড়েছেন এটি ثعلب এর দ্বিবচন।

কেউ কেউ বলেছেন যে, بنو ثعلب এর একটি মুর্তি ছিল, যাকে তারা পূজা করত। একদিন তারা এর পূজা করতেছিল। হঠাৎ করে দুটি শিয়াল দৌড়ে এসে পা উঠিয়ে মূর্তির উপর পেশাব করতে আরম্ভ করল। সে মূর্তিটির এক খাদেম ছিল। তার নাম ছিল গাদী বিন জালেম । সে উল্লেখিত কবিতাটি পাঠ

করে। এর পর মূর্তিকে ভেঙ্গে দেয়া হয়। তারপর সে নবী করিম (স.) এর খেদমতে হাজির হয়। নবী করিম (স.) তার নাম জিজ্ঞেস করেন। সে জবাব দিল- আমার নাম গাদী বিন জালে। নবী করিম (স.) বললেন, না তোমার নাম রাশেদ বিন আবদে রাব্বিহী।

কেউ কেউ ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করেছেন: এক ব্যক্তির কেটি মূর্তি ছিল। সে উক্ত মূর্তির সামনে রুটি এবং মাখন রেখে দিয়ে বলত এগুলো খাও। কিছুক্ষণ পর একটি শিয়াল এসে সে খাদ্য খেয়ে ফেলে এবং মূর্তিটির পেশাব করে চলে যায়। এখানে ثعلبان থেকে উদ্দেশ্য হল পুরুষ শিয়াল। কেউ বলেছেন দুটি শিয়াল এসে রুটি এবং মাখন খেয়ে খেয়ে চলে যেত। এখানে ثعلبان শব্দটি ثعلب এর দ্বিবচন।

হাফেজ ইবনে হজর আসকালানী (রহ.) বলেন-هروى দ্বারা ثعلبان এর অর্থ গ্রহণ করা সহজ হয়েছে। আর তার বর্ণনা করা ব্যাকরণ গত ভুল হয়েছে। রবং ঘটনা হল শিয়াল এসেছে। এখানে ثعلبان এর অর্থ হল পুরুষ শিয়াল। এবং ثعالب পুরুষ শিয়ালকে বলে। যা প্রসিদ্ধ প্রাণী নয়। দ্বিবচন উদ্দেশ্য নয় অতঃপর সে মূর্তির উপর পেশাব করেছিল। এমন সময় লোকটি দন্ডমান হয়ে গেল। এবং পাথর ছুড়ে মুর্তিটি ভেঙ্গে দিল। এরপর লোকটি নবী করিম (স.) এর দরবারে হাজর হল এবং বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে এই কবিতা পাঠ করল-

لقد خاب قوم املوك لشدة :: ارادو انزالان تكون تحارب

" সে সম্প্রদায় অকৃতকার্য যাদের বাদশাহ কঠিন যুদ্ধের জন্য প্রকাশ্য ময়দানে এসে অবতরণ করল।"

فلا انت تغنى عن امور تواترت:: ولاانت دفاع اذاحل نائب

"যে ঘটনা একটার পর একটা হচ্ছিল। তোমরা এর থেকে কোন ফায়দা পেলেনা আর হঠাৎ করে আসার কারণে তোমরা দূর করতে পারলেনা।"

ارب يبول الثعلبان براسه :: لقد ذل من بالت عليه الثعالب

"এমন মূর্তি কি পোষা যায়? যার মাথায় শিয়ালে পেশাব করে গেল? যার

মাথায় শিয়াল পেশাব করে দেয় সে অপদস্থ হয়।”

শিয়াল দুর্বল ভীরু এবং ধাপ্পাবাজ হিংস্রপ্রাণী। কিন্তু সে অপবিত্র ও ধোকাবাজ হওয়ার কারণে বড় বড় হিংস্র প্রাণীর সাথে প্রতিযোগিতা করে সে তার নিজ চেষ্টায় তার খাদ্যের অন্বেষন করে। সে এতই ধূর্ত্য যে, একদম মৃতের মত পড়ে থাকে এবং পেট ফুলিয়ে দেয়। আর তার পাগুলো খাড়া করে শুয়ে থাকে। অন্যান্য প্রাণীরা তাকে মৃত মনে করে পাশে আসা মাত্রই খপ করে ধরে ফেলে। কিন্তু তার এই চালাকী কুকুরের উপর চলেনা। একদা কোন একজন শিয়ালকে প্রশ্ন করল যে, তুমি কুকুরের উপর বেশী আক্রমন কর কেন? সে জবাব দিল আমি কুকুরের উপর এজন্য বেশী আক্রমন করি যে, কুকুর অন্যের জন্য শিকার করে আর আমি নিজের জন্য শিকার করি।

জাহিজ লিখেছেন যে, শিয়ালের প্রধান হাতিয়ার হল ধোকা দেয়া। ধোকাবাজ মুর্দা হয়ে যাওয়ার যোগ্য তার হাতিয়ার । ঘটনার কারিগর হিসেবে পরিচিত। প্রবাদ বাক্য স্বরূপ আরবগণ বলেন-

فلان ادهى وامتن سلاخ الثعلب অমুক শিয়ালের চেয়েও বেশী ধোকাবাজ চতুর।

জাহিজ ঃ

জাহিজের নাম আমর বিন বহর কেনানী লাইছী।কেউ কেউ বলেন جاحظ কে এজন্য جاحظ বলে যে,جاحظ এর উভয় চোখ উত্তেজনা পূর্ণ ছিল। এজন্য তাকে حدتى ও বলে। কারণ বৃদ্ধকালে তার লোভ চলে গিয়েছিল। গ্রীষ্মের গরমের তীব্রতার কারণে শরীরের অর্ধোংশে চন্দন ও কর্পুলের মালিশ করত। শরীরের বাকী অর্ধাংশ অধিকতর ঠান্ডা হওয়ার কারণে কাঁচি দ্বারা কেটে ফেললেও অনুভব করতেন না। তাই তিনি নিজেই বলতেন আমার ডান পার্শ পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত। যদি আমার এই অংশ কাঁচি দ্বারা কেটেও ফেলা হয় তবু আমি টের পাইনা। আমার এই অঙ্গ জোয়ারের সময় চান্দ্র মাসের ২৮ তারিখে ভাল হয়। সে সময় যদি এর উপর মৌমাছিও বসে তাহলেও কষ্ট পাই।

জাহিয বলেন আমার অঙ্গে দুটি বিপরীত বস্তু একত্রিত হয়ে আছে। যদি আমি ঠান্ডা জিনিষ খাই তাহলে আমর পা'কে আক্রান্ত করে ফেলে আর গরম জিনিষ খেলে আমার মাথা আক্রান্ত হয়। جاخظ এই কবিতা পাঠ করতেন।

اترجوان ان تكون وانت شيخ:: كماقدكنت ايام الشباب

"তুমি কি বার্ধক্যে ও এ আশা কর যে, তুমি এমন হয়ে যাবে যা যৌবন কালে ছিলে।"

لقد كذبتك نفسك وليس ثوب:: وليس كالجديد من الثياب

"অবশ্যই তোমাকে তোমার প্রবৃত্তি প্রতারনা করেছে। পুরাতন এবং পঁচা জোড়া নতুন জোড়ার মত হয়না।"

জাহিয প্রত্যেক বিষয়ে কিতাব রচনা করেছেন। তাকে মৃতা'যেলার মরুব্বীদের মধ্যে গন্য করা হয়। তাই মুতাযেলাদের একটি দল جاحظيه নামে প্রসিদ্ধ। তার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ রচনা হল "كتاب الحيوان"। তিনি ২৫৫ হিঃ বসরায় পরলোকগত হন।

জাহিয লিখেছেন, রিযিকের আশ্চর্য বন্টন চিন্তা করার বিষয় যে, বাঘ শৃগালের শিকার করা প্রাণী খায়। আর শৃগাল قنفذ গুহ সাপ কে শিকার করে খায় আর গুই সাপ সাপ ধরে খায়। সাপ চড়ুই পাখী শিকার করে সাবাড় করে। আর চড়ুই পাখী টিড্ডি ধরে আহার করে আর টিড্ডি খায় ভ্রমর আর ভ্রমর খায় মৌমাছি- আর মৌমাছি সাধারন মাছি ধরে গিলে খায়। আর মাছি মশা ধরে ধরে সাবাড় করে। ইমাম শাবী ও জাবির বিন আব্দুল্লাহ বলেন, জনৈক ব্যক্তি হযরত আবু বকর (রা.) এর খেদমতে এসে আরজ করল যে, আমি স্বপ্নে দেখি শিয়ালের সহিত খুব ভাল করে দৌড়াচ্ছি।

হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, এর অর্থ হল তুমি এমন এক প্রাণীর সহিত দৌড়িয়েছ যার সহিত দৌড়ানো উচিত নয়। এর ব্যাখ্যা হল তুমি বেশী বেশী মিত্যা কথা বলে থাক। আল্লাহকে ভয় কর।

শিয়ালের অভ্যাস হল, তার যদি ভেট ভরে যায় তবে কবুতরের পালের

ভিতর প্রবেশ করে কবুতর মেরে ফেলে দিবে। উদ্দেশ্য হল আবার ক্ষিধে পেলে এগুলো এসে খেয়ে যাবে।

· ছারপোকা বিদূরিত করার পন্থাঃ

চারপোকা দূর করার এক মনোমুগ্ধকর পন্থা লিখেছেন কোন অভিজ্ঞ ও পাদর্শী লোক। কারো পশমী কাপড় যদি ছারপোকা বেশী হয় তাহলে সে কাপড়ের এক কোনা নিজের মুখে পুরে ধীরে ধীরে পানির ভিতর প্রবেশ করবে। ছারপোকা যেহেতু পানিকে ভয় পায় সেহেতু সব ছারপোকা কাপড়ের সে অংশে চলে যাবে যেখানে মুখ দ্বারা ধরে রাকা হয়েছে। তারপর কাপড়টি পানিতে নিক্ষেপ করে দিবে এবং দ্রুত সেখান থেকে সরে পড়বে । এভাবে সব ছারপোকা পানিতে থেকে যাবে। আশ্চর্যের কথা হল ব্যাঘ্র শিয়ালের বাচ্চার দুশমন হয়ে থাকে । সে সার্বক্ষনিক শিয়ালের বাচ্চার খোজাখুজিতে পিয়াজের পাতা গর্তের মুখে রেখে দেয় আর তার গন্ধে ব্যাঘ্র চলে যায়।

শিয়ালের চামড়ার পোষাক উত্তম বলে গন্য হয়। শিয়াল সাধারণত কাজলা ও সাদা হয়ে থাকে।

কাযবিনী লিখেন, একদা নূহ বিন মনসুর সামান এর খেদমতে এমন শিয়াল হাদিয়া হিসেবে পেশ করা হয়, পশম ছিল ছাঁটা । যখন কোন মানুষ তার পাশে যেত তখন সে ছড়িয়ে দিত। আর দূরে চলে গেল তার পশম গুলো গুছিয়ে ফেলত। এরপর কাযবিনী লিখেছেন আগেকার দিনে শৃগাল পোষন করা হত।

একটি গল্প ঃ

বলা হয়ে থাকে, একসময় বাঘ, শিয়াল ও হায়েনা শিকারের জন্য বের হল। তিনটি প্রাণী শিকার করল। গুইসাপ, হরিণ ও খরগোস। বাঘ হায়েনাকে বলল, সবার মধ্যে তুমি এসব বন্টন করে দাও। হায়েনা বল্ল ব্যাপার তো পরিস্কারই । গুই সাপটি আপনার জন্য, খরগোসটি শৃগালের আর হরিণটি আমার জন্য। একথা শুনে বাঘ হায়েনার গালে জোড়ে থাপ্পর মারল। এর পর বাঘ শিয়ালকে বলল, যে আল্লাহ হায়েনার ধ্বংস করুন; বন্টনের বেলায় সে তো

মারাত্মক জাহিল। আবু মুয়াবিয়া (শিয়ালের উপাধি) তুমি এসো তো এবং তা বন্টন করে দাও। শিয়াল বলল ابوهرث(বাঘের উপাধি) ব্যাপার তে পরিস্কারই। গুই সাপটি আপনার সকালের নাস্তার, হরিণটি সন্ধ্যার খাবার, আর খরগোসটি আপনার দুপুরের খাবারের জন্যই হবে। তা শনে বাঘ বলল, তুমিতো উত্তম বন্টন করলে। কোত্থেকে এ বন্টন ব্যবস্থা তোমার মগজে এলো? শিয়াল জবাব দিল হায়েনার মাথা তার দেহ থেকে পৃথক হওয়ার ঘটনা দেখে। শা'বী বলেন, বাঘ শিয়ালকে বলে ছিল তুমিতো অত্যন্ত দুরদর্শিতার সাথে বন্টনটি করলে এই সুবন্টন ব্যবস্থা তুমি কোথা হতে শিখলে? শিয়াল বলল, হায়েনার ব্যাপারটি যা আমার সম্মুখে ঘটে গেল- তা থেকেই শিখেছি।

শিয়ালের চালাকী ও তা থেকে বাঁচার উপায়ঃ

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, একদা আমি ইয়ামন ভ্রমন করছিলাম। পথের খাবার আমি একটি পাত্রে রাখলাম । এমন সময় মাগরিবের নামাজের সময় হয়ে গেল। ভাবলাম নামাজের পরই খানা খাব। আমি তখন দস্তরখানা ঐ অবস্থায় রেখে নামাজে দাড়িয়ে গেলাম। দস্তরখানায় ভূনা করা দুটি মুরগী ছিল।এমন সময় একটি শিয়াল আসল এবং একটিমুরগী নিয়ে চলে গেল।নামাজ শেষ করে আমি অনুশোচনা করতে থাকলাম। ভাবলাম বাকীটি খেয়ে ফেলব। এমন সময় শিয়ালটি মুরগীর মত কি যেন একটি মুখে করে নিয়ে এসে আমার অদুরেই রেখে দিল। আমি সেটি মুরগী ভেবে তা আনার জন্য দ্রুত শিয়ালটির পাশে চলে গেলাম । আমি সেটির পাশে যেতেই দস্তর খানায় রাখা অপর মুরগিটিও নিয়ে চলে গেল। আমি যেটিকে মুরগী ভেবেছিলাম তা আসলে মুরগী ছিলনা। খেজুরের ছাল মুরগীর মত বানিয়ে নিয়ে এসেছিল।

প্রাণীদের বুদ্ধি সংক্রান্ত একটি ঘটনাঃ

প্রাণী ও পাখীদের চতুরতার ক্ষেত্রে নীচের ঘটনাটিও প্রসিদ্ধ। কাশেম বিন আবু তালেব তাম্মুখী আশ্বালুঈ উল্লেখ করেন যে, তিনি বলেন একদা আমি কতক সাথী বর্গ নিয়ে انبـــار নামক স্থানে যাচ্ছিলাম। আমার সাথে বাদশাহর শিকারী

পাখীর রক্ষক ও ছিল। আমরা সকলেই বাজপাখীকে শিক্ষা দিচ্ছিলাম। কিছুক্ষণ পর আমরা বাজ পাখীকে তিতর পাখীর উপর ছেড়ে দিলাম। সুযোগ বুঝে ভিতর পাখীর উপর ছেড়ে দিলাম। সুযোগ বুঝে ভিতর পাখী ঝোপের ভিতর চলে গেল এবং কাটা বৃক্ষের ভিতর প্রবেশ করে গাছের শিকড়ে তার পা দ্বারা আকড়ে ধরে থাকল এবং পা উঠিয়ে চিত হয়ে শুয়ে পড়ল।এভাবে সে বাজ পাখী থেকে বাচার জন্য চুপ হয়ে রইল। বাজের মালিকরা যখন সে ঝুপড়ীর নিকট আসল তখন তিতরটি উড়ে গেল। এভাবে সে বাজ মালিকদের কাছ থেকে এবারের মত প্রাণে বেচে গেল। শেষ পর্যন্ত বাজ মালিকরা তিতরকে ধরেই ফেলল। তা দেখে লোকেরা বলাবলি করতে লাগল যে, এই তিতর পাখীর মত চালাক আমরা আর দেখিনি। উপরোক্ত ঘটনাকে কাজী আবুল হাসান তানুখী এভাবে বর্ণনা করেছেন। আমাকে আবুল কাশেম তানুখী এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, একদা আমি সতক সাথী কর্গ নিয়ে বাদশাহর বাজ পাখীর ভান্ডারে গেলাম। কিছুক্ষনের মধ্যেই তিতর পাখী দেখা দিলে বাজপাখী ছেড়ে দিলাম। ততক্ষনে তিতর পাখী উড়ে গেল। কিন্তু বাজ পাখী তিতরের পেছনেই লেগে রইল। সব সঙ্গুরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে তাকবীর দিতে লাগলাম। এমন সময় ইম নিজেও চলে এলাম মনে হল তিতর বাজ থেকে রক্ষার জন্য কাঁটা ঝোপড়ীর ভিতর ঘাপটি মারল এবং বৃক্ষের দুটি শিকড়কে আড়াল করে তার পা দুটি উপরে উঠিয়ে চিত হয়ে শুয়ে গেল। বাজ পাখীটি অনেকক্ষন পর্যন্ততাকে খোজা খুজি করল। কিন্তু তাকে পেলনা। এমন কি রাজপাখী বুঝতেই পরলনা যে, তিরিটি চাতুরতার আশ্রয়ে কাঁটা ঝুপড়ির আড়ালে শুয়ে আছে। শেষ পর্যন্ত শিকারী বাজের মালিক আসাতে ভিতর পাখী উড়ে গেল। আর তখনই বাজ পাখিটি তিতরকে ধরতে সক্ষম হল। তা দেখে আমার সাথী বন্ধুরা বলতে লাগল যে, নিজের প্রাণ রক্ষা করতে তিতরের মত এমন কৌশল অবলম্বন করতে আমরা কখনো শুনিও নাই দেখিও নাই। ঘটনা দেখে আমার বন্ধুরা আঙ্গুল কামড়াতে থাকল। এ ধরনের ঘটনা অন্যান্য পাখীদের চালাকী থেকেও আরো বেশী নিকটবর্তী।

কাজী আবু আলী তানুখী বলেন, আমার কাছে আবুল ফাতাহ বছরী বর্ণনা

করেছেন যে, মৌসেল বাসীরা আমাকে শুনিয়েছেন যে, আর্মেনিয়া অঞ্চলের একজন শিকারী বল্প একদা শিকার করার জন্য আমি জংগলে গেলাম এবং আমর জালে একটি পোষা পাখী ছেড়ে দিয়ে জালটি বিছিয়ে দিলাম আম যমীনের লীচে ঝুপড়ীর মধ্যে মধ্যে চুপ করে বসে রইল এবং সেখান থেকেই জালের প্রতি লক্ষ রাখতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পর জালে একটি বাজ পাখী ফেঁসে গেলে আমি তাকে ধরে ফেললাম। দ্বিপ্রহরের কাছাকাছি সময় হলে দেখলাম একটি সুন্দর শিকারী পাখী যমজ (যা ঈগল থেকে ছোট) জালের উপর দিয়ে উড়ছে। পাখিটি বাজকে দেখার সাথে সাথে নিকটেই কোথাও বসে গেল। আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম। দেখলাম যে, একটি ঈগল উড়ে এলো। জময পাখীকে দেখে সে নিজেও বসে গেল। কিছুক্ষন পর বুঝতে পারলাম আকাশে একটি পাখী উড়ছে। সুতরাং তাকে দেখে যমজ ও ঈগলের আগে উড়ে গিয়ে সে পাখিটি শিছু ধাওয়া করল। শেষ পর্যন ত তাকে শিকার করে নিয়েই এলো। আর যমজ পাখি তার ঠোচ দ্বারা ঠুকরিয়ে খেয়ে সাবাড় করে দিল। খাবার সাথী বানাল ঈগলকেও । গোস্ত খাওয়া শেষ হলে ঈগল পাখী সঙ্গম করার জন্য যমজ পাখীর উপর তার পাখা মেলে ধরল। এতে যমজ পাখী ওর ডানা দ্বারা ঈগলের মুখে জোরে চপেটাঘাত করল। কিন্তু এতে ঈগল কোন পরওয়ানা করে দ্বিতীয় বার তার ডানা মেলে ধরল। যমজ অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে আবারও ঈগলের ঈগলের মুখে খুব জোড়ে আঘাত করল। ঈগল যখন তৃতীয় বার তার ডানা মেলে ধরল তখন যমজ তার ধারালে ঠোটি দ্বারা এমন জোরে আঘাত করল যে, ঈগলটি মরে গেল এবং যমজ জাল থেকে দূরে থাকা এবং জালে না অটিকানোর কারণে আমি চিন্তিত ছিলাম। মনে মনে বলতে ছিলাম, যে কোন না কোন উপায়ে বুঝে ফেলেছে অথবা অতীতে এরকম ভাবে জালে মনে হয় পতিত হওয়ার কারণে সে তা জানতে পেরেছে। আবার তাও হতে পারে যে, ঈগলের পূর্বে তার সহিত অন্য কোন পাখীর ঝগড়া হয়েছে।যে কারণে শেষ পর্যন্ত সে তাকে চুড়ান্ত গ্রাস বানিয়ে নিয়েছে। আমি তাও ভাবছিলাম যে, সে প্রথম যেই ঈগলকে সঙ্গম থেকে বিরত রাখবে। অতঃপর সে তার শিকার করবে এবং এর পরও সে রাজী হয় নাই

সম্ভবত এই কারণে যে, সঙ্গম করার কারণে তাকে মেরে ফেলা হয়েছে। এই অবস্থা দেখে আমি চাইলাম যে, তাকে শিকার করে নেই তাহলে এর কারণে যার কোন মূল্য নেই- অন্য পাখী শিকার করব। এই কারণে আমি এই রাতটা এই ঝুপড়ীতে কাটালাম। সকাল বেলা সে যমজ পাখী তার পূর্বনির্ধারিত সময় অনুযায়ী জালের পাশে এলো। পরক্ষণেই একটি ঈগল সেখানে চলে এলো। তার সহিত ঘেষে বসে গেল। তারপর উপরে একটি শিকার দেখল এবং তার (২য় ঈগল) সঙ্গেও একই ঘটনা ঘটল। যা প্রথম দিন সে ঈগলের সহিত ঘটেছিল। এবং একই পন্থায় যমজ উড়ে গেল।

এমনটি দেখে আমার আর আশ্চর্যের সীমা থাকল না এবং তাকে শিকার করার জন্য আমার মনে আরো আগ্রহ বৃদ্ধি পেল। তৃতীয় রাতেও আমি সে ঝুপড়ী ঘরেই কাটালাম। সকাল বেলা সেই যমজ পাখীটি আবার জালের পাশে এসে বসে গেল। কিছুক্ষণ পরই একটি হালকা পাতালা ঈগল এল যার পালক বন্য প্রাণীর চুলের মত এলোমেলো ছিল। সে যমজ এর পাশে এসে বসল। তারপর এদের মাথার উপর একটি শিকার দৃষ্টি গোচর হলো। যমজ পাখী উপড়ে উড়ার চেষ্টা করল, কিন্তু ঈগল তাকে জোরে জোরে মারতে লাগল। মনে হচ্ছিল যে, ঈগল যমজ কে এখনই মেরে ফেলবে। অতঃপর সে নিজেই উপরে উড়ে গেল এবং উড়ন্ত পাখীটি ধরে এনে সামনে রেখে দিল। শিকারকৃত পাখীটির কোন অংশতো সে খেলইনা বরং যমজ কে খাওয়ার অনুমতি দিল। যমজ যখন খুব ভাল করে খেল তখন বাকীটুকু সে নিজে খেল। পেটপুরে উভয়ে যখন গোস্ত খেল তখন ঈগল সঙ্গম করার জন্য তার উপর ডানা মেলে ধরল। প্রথম সে রাজী হয়নি কিন্তু সে যখন দ্বিতীয় বার ডানা মেলে ধরল তখন সে রাজী হয়ে গেল। এবং তাকে বাধা দিল না এবং নিজের সবজিছু ঈগলকে দিয়ে দিল। সুতরাং ঈগল তৃপ্তি সহ সঙ্গম করল এবং পরে উভয়ে এক সাথে উড়ে গেল।

আরেকটি ঘটনাঃ

কাজী আবু আলী তানুখী একটি ঘটনা উল্লেখ করে বলেন, আরবের

প্রাচীন সৈন্যদের মধ্যে একজন সৈন্য ছিল। যে পরবর্তীতে আবু মুহাম্মদ ইয়াহইয়া ইবনে মুহাম্মদ সুলাইমান এর প্রহরী ছিল। সে আমাকে বর্ণনা করল যে, বাদশাহর এক কমান্ডার সে আবু ইছহাক ইবনে আবু মাসউদ রাজী নামে সমধিক পরিচিত। সে বাদশাহর সাথে বস সময় থাকত।স্পেনের মাদায়েন এবং মদীনার আতীকা এলাকা তার শাসনাধীন ছিল। শহরটি তখন আবাস যোগ্য হয়ে ঠেছে এবং রাজা বাদশাহরা সেখানে আগমন করতেন। শিকারের জন্য সে অত্যন্ত সৌখিন ছিল। একদা আমি সেখানে তার সহিত অবস্থান করছিলাম। একদিন সে রোম শহর যা মদীনার আকীকের বিপরীত দিকে ছিল। আর সে সময় অনাবাদি জায়গাও অবাদী ছিল। সেদিকেই সে আমার সহিত শিকারের জন্য বের হল। সে তার শিকারী পাখী বাজ, শিকার করার জন্য অস্ত্রপাতি এবং অন্যান্য উপকরন এবং কিছু সংখ্যক সৈন্য কাথে নিল। দীর্ঘ ভ্রমনের পর প্রত্যাবর্তনের পথে তার সে বাজপাখীটি যে শিকার ধরে খেতে পরিতৃপ্ত হচ্ছিল তখন হঠাৎ করে তার পাঞ্জা (নখর) তার নিজের বুকের মধ্যে মারতে লাগল এবং অত্যন্ত জোরে আন্দোলিত করতে এবং অস্তিরতা প্রকাশ করতে লাগল।

ইবনে মাছউদ বলেন, মনে হয় সে কোন শিকার দেখেছে- আর এ কারণেই সে এ ব্যাকুলতা দেখাচ্ছে। সুতরাং তুমি কি শিকারের জন্য ছেড়ে দাও । জবাব দিল জনাব সে অত্যন্ত সন্ত্রাসী ও চালাক। তার এই আচরণ একারনে নয়। কেননা সে খুব তৃপ্ত অবস্থায় আছে । আমার ভয় হয় তাকে যদি আমি শিকারের জন্য ছেড়ে দেই তাহলে সে এদিক সেদিক উড়ে উড়ে ভেগে যাবে। তখন তার চাঞ্চল্যতা আরে বেড়ে গেল। আমি বল্লাম কিছুই হবে না তাকে ছেড়ে দাও। যদি সে কিছু হয় তাহলে আমি তার জিম্মাদার। তাকে ছেড়ে দেয়া হলে সে উড়তে তার শিকারের পাশে এসে গেল। আমরা ও তার পিছনে দৌড়াতে লাগলাম। সে একটি ছোট ঝুপড়ীর পাশে এসে নিজেকে আড়াল করতে লাগল। কিন্তু আমরা তাকে দেখতে ছিলাম পাজ পাখিটি উড়ে গিয়ে একটি ঝেপের উপর বসে পড়ল। কিছুক্ষণ পর দেখলাম তীরের ফলারমত একটি কি যেন বের হতেই বাজপাখীটি সেখান থেকে সরে পড়ল। সে ঘরে যেতেই ঝোপের ভিতর পড়ে

গেল। আমরা তার পেছনে সে ঝোপের ভিতর চলে গেলাম। তখন দেখলাম যে একটি মাছরাঙ্গাকে ঘরার জন্য তার পেছনে পেছনে দৌড়াচ্ছে এবং তাকে শিকার করেই ফেল্ল। মাছরাঙ্গার অভ্যাস হল যে শিকারী প্রাণী একে শিকার করে বা শিকার করার জন্য আসে । তাকে তার ডানার সাহায্যে হত করে। তার শরীরের ছিদ্র করার জন্য এবং চামড়া কেটে ফেলার জন্য তার উপর বিষ্ঠা নিক্ষেপ করে। কেননা তার বিষ্ঠা অত্যন্ত গরম ও বহ্নিমান হয়।

মুদ্দা কথা হলো বাজ পাখী যেহেতু তার সৌন্দর্যে মুগ্ধতাই তাকে শিকার করার জন্য অতি সাবধানে তার উপর আক্রমন করল। মাছরাঙ্গা উপরে উঠে বাজের উপর বিষ্ঠা নিক্ষেপ করার জন্য চেষ্টা করল। কিন্তু তার টার্গেট ভুল হল এবং বিষ্ঠা বাজের উপর পড়ল না। তখন বাজ পাখী তার উপর ঝাপিয়ে পড়ে তাকে ধরে ফেলল। এখন আমরা বুঝতে পারলাম যে তীরের ফলার মত যে বস্তুটি উপরে উঠেছিল, তা মাছরাঙ্গার বিষ্ঠাছিল। যা সে বাজের উপর নিক্ষেপ করেছিল। উক্ত ঘটনায় সমস্ত শিকারী বাজ, শিকারী সৈন্য এবং উপস্থিত সকলেই অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হল এবং শিকারী প্রাণীদের যত ঘটনা তাদের জানা ছিল তারা তা আলোচনা করল। এই ঘটনাটিকেও তারা আশ্চর্য মনে করল।

কাজী তানুখী ঘটনাটিকে ফারেসের উদ্ধৃতি দিয়ে এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, ফারেছ বর্ণনা করেন যে, হারুন বিন গরীবুল হিবালী এবং তার সমস্ত সৈন্য হিলওযান নামক স্থানে এর সামনে উপস্থিত ছিল এবং কিছু সৈন্য তখন ভ্রমনে তারা পথিমধ্যে শিকার ও করত। একদা হঠাৎ করে তাদের সামনে একটি হরিনের বাচ্চা এলো। লোকেরা তাকে শিকার করার জন্য নিজ নিজ শিকারী প্রাণী লেলিয়ে দিল। কুকুর, বাজ যেহেতু তখন তাদের পাশে ছিলনা- যেহেতু কোন কুকুর তাদের ছাড়া সম্ভব হয়নি। নতুবা সাধারণত বাজ একা হরিণ বা তার বাচ্চা শিকার করতে পারত না। অধিকন্তু এদের সহিত কোন শিকারী কুকুরও ছিলনা। যদি কুকুর সাথে থাকত তাহলে বাজ উড়ে গিয়ে তার মাথায় আক্রমন করত এবং তাকে আহত করত এবং বাজের পাখা তার চোখ ঢেকে

দিত। এত করে সে দ্রুত দৌড়াতে সক্ষম হত না এবং কুকুর দৌড়ে গিয়ে তাকে পাকড়াও করা সম্ভব হত।

তখন কোন কুকুর বা বাজপাখী তাদের কাছে ছিলনা। তাই ইবনুল হিবাল শুধু শিকারী বাজ তাকে ধরার জন্য প্রেরণ করল। যাতে করে শিকার ছুটে গিয়ে তার ক্ষতি না করে। এবং কুকুরের অপেক্ষায় শিকার থেকে বঞ্চিত না হয়। এজন্য তাকেই (বাজ) উপযুক্ত মনে করে উপস্থিত মুহূর্তে শুধু বাজ পাখীকেই প্রেরণ করা হল। এতে সে গিয়ে হরিণকে ব্যস্ত করে রাখবে এবং দ্রুত দৌড়ানো থেকে বিরত রাখবে। এতে করে আমরা তীরের সাহায্যে এবং ঘোড়ার সাহায্যে তাকে পেয়ে যাব। এবং শিকার করব। মোটকথা বাজপাখী তার দিকে দ্রুত গতি চল্ল এবং আমরাও তার পেছনে পেছনে দৌড়ালাম। আমি ও দৌড়ানো ব্যক্তিদের মধ্যে একজন ছিলাম । হরিণ মাঠের নিম্ন ভূমি দিয়া খুব দ্রুত গতিতে দৌড়াতে লাগল। আর যখন জমীনের বাইন্ডারী শেষ হয়ে গেল তখন বাজ পাখী তার ঘাড়ে এবং মুখমন্ডলে ঝাপটা মারল এবং চোখা নখরগুলো তার ঘাড়ে বসিয়ে দিল। কিন্তু হরিণটি তা সহ্য করেই দৌড়াতে আরম্ভ করল। এদিকে বাজ পাখী তার একটি পা এমনভাবে জমীনে ঝুলিয়ে দিল যে, যমীনে তার চিহ্ন পড়ে যেতে থাকল। সে এ কাজটি এজন্য করল তার পা দ্বারা শক্ত করে ধরে তাকে দ্রুত দৌড়াতে যাতে বাধার সৃষ্টি করতে পারে। শেষ পর্যন্ত মাঠের একটি স্থানে যেখানে কিছু ঘন ঝোপঝাড় ছিল সেখানে গিয়ে আটকে গেল এবং একটি বড় কাটা বৃক্ষের শিকড় লেগে আটকে গেল। বাজ পাখী তার দ্বিতীয় পা দ্বারা তার ঘাড় এবং মুখমন্ডলের মাঝখানে দাড়িয়ে ছিল। সেখানে জোরে টান দিল শেষ পর্যন্ত তার ঘাড় ভেঙ্গে পরাভূত করল।

আমরা সেখানে গেলাম এবং তাকে জবাই করলাম এবং যে সু-সংবাদ দেয়া হয়েছিল তা বাস্তবে রূপায়িত হল। এরপর ইবনে হিবাল এবং তার সাথীরা বলতে বাধ্য হল যে, আল্লাহর কছম আমরা তার মত এমন চতুর বাজ পাখী আর কখনো দেখি নাই এবং তার সহিত ভাল আচরণ করে তাকে মুক্ত করে দেয়া

হল।

কাযী আবু আলী তানুখী একটি ঘটনা বর্ণনা করে বলেন যে, আমাকে আবুল কাশিম বসরী এবং তার বাহিনীর একজন সেপাই বলেছে যে, সে তার সেনাকমান্ডাদের কোন এক জনের সাথে শিকারে ছিল। সে সেনা অফিসারের সাথে একটি ঈগল ছিল। এর দ্বারা সে শিকার করত । সে অনেক শিকার করল। একদা সে বাজ পাখী তার মালিকের হতেই সীমাহীন আনচান করতে আরম্ভ করল। মালিক তখন ঈগলের পক্ষ থেকে তার ক্ষতির আশংকা করতে লাগল যে না জানি সে তার উপর আক্রমন করে বসে । কেননা এ ধরনের পাখকে যদি কখনো তার ইচ্ছা ও কামনা থেকে বাধা প্রদান করা হয় তাহলে অনেক সময় সে তার মালিকের ভয়ের কারণে এবং ধ্বংসের কারণ হয়ে যায়। একারণে শিকারী বাজ ছেড়ে দিল। সে বাজকে পেছনে ফেলে দিয়ে উড়ে গিয়ে অনেক দূরে চলে গেল। এবং অতিশয় বৃদ্ধ ও দুর্বলের উপর হামলে বসল। সে সময় খুরধার লাকড়ীকে তার টাখনুর চুলের সাহায্যে নিয়ে যাচ্ছিল। সে ঝাপটা মেরে তার ঠোটের সাহায্যে পানকরল এবং তার ঘাড় ভেঙ্গে তাকে ধ্বংস করে দিল। আর তার রক্তের মধ্যে নিজেই গড়া গড়ি গেল এবং তার কিছু গোস্ত ও খেয়ে ফেল্ল। তার মালিক এ সংবাদ শুনে কমান্ডার এবং সিপাহ সালারের নিকট চলে গেল। সে আসতেই কমান্ডার জিজ্ঞেস করল- কোন খাছ সংবাদ নিয়ে এসেছো কি? সে বল্ল জনাব, ঈগল তো উৎকণ্ঠিত জংগলী বৃদ্ধকে তার শিকার বানিয়ে নিয়েছে অথচ তাকে ছেড়ে দেয়ার জন্য আমি বলেছিলাম। আমি বলেছিলাম- জংগলী হরিণ বা বিড়াল শিকার কর। সে আমাদের কথা শুনছিল। কমান্ডার মনে করল উৎকণ্ঠিত বৃদ্ধ ও জংগলী হরিণ বা জংগলী বিড়ালের মতই কোন প্রাণী হবে কিন্তু তার- এ বোধ উদয় হল না যে, ঈগল এক মুসলমান বৃদ্ধের জান বাহির করে ফেল্ল। পরে বুঝতে পারল। এরপর কমান্ডার বল্ল তোমার ধ্বংস হোক কি বলছ?

তারপর কমান্ডার ঘটনা স্বচক্ষে দেখার জন্য ঘটনা স্থলে চলে গেল। আমরাও তার সহিত গেলাম সেখানে গিয়ে এক বৃদ্ধের মৃত লাশ পেলাম।

সমান্ডার এবং আমরা তাকে খুব শক্তভাবে ঝাকুনি দিলাম এবং সীমাহীন চিন্তাও অনুশোচনার সঙ্গে সঙ্গে ঈগল ও তার কৃতকর্মের চিন্তিত হল।

আরেকটি ঘটনা ঃ

কাজী তানুখী তার কিতাবে মুহাম্মদ বিন সুলায়মানের উদ্ধৃতি দিয়ে অপর একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মদ বলেন যে আমার কাছে কোন এক শিকারী বর্ণনা করেছেন এবং আমি নিজেও শিকারে ঘটে যাওয়া ঘটনা বারবার করেছি এবং আমি নিজে কোন কোন অত্যাশ্চর্য ঘটনায় উপস্থিত ছিলাম। কিন্তু এ সবের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ঘটনা হল, অমুক ব্যক্তির (বর্ণনা কারীর নাম স্বরণ নেই) কাছে একটি বাজ পাখী ছিল। একদা সে তাকে শিকারের জন্য ছেড়েদিল। সে একটি তিতর শিকার করল। তিতরকে তার পা দ্বারা খুব শক্ত করে ধরে অভ্যাস মত চতে লাগল। এবং মালিকের অপেক্ষা করতে লাগল। মালিক এসে জাবাই করতে এবং তার গোস্ত তাকে খাওয়াবে। তার মালিক এখনও অন্য পাশেই ছিল। এমুহুর্তে আরেকটি তিতর উড়তে দেখল। প্রথমে শিকারকৃত তিতরকে এক পায়ে ধরে রেখেই দ্বিতীয় তিতরটিকে শিকার করার জন্য উড়ে চল্ল। তাকে সে শিকার করে ফেল্ল এবং ভূমিতে অবতরন করে উভয়কে নিয়ে চল্ল। আমরা সেখনে গিয়ে এ অবস্থা পর্যবেক্ষন করলাম এবং আমরা তার কাছ থেকে দুটি তিতর উদ্ধার করে জবাই করলাম।

বাঘের খেদমত এবং শিয়ালের ধূর্ততা ঃ

আল্লামা ইবনে কাইয়ুম জওযী এবং হাফেজ আবু নাঈম ইমাম শা'মী থেকে বর্ণনা করেন যে, একদা কোন একটি বাঘ অসুস্থ হল। তার সেবা শুশ্রুষার জন্য সমস্ত প্রাণীই তার কাছে আগমন করল। কিন্তু শিয়াল আসেনি। শিয়ালের অনুপস্থিতি দেখে এক হায়েনা বাঘের সামনেই শিয়ালের বদনাম করল। শিয়াল যখন আসল তখন হায়েনা বলল, এইতো শিয়াল। এতে বাঘ দাঁত কটমট করতে করতে তাকে ধমকাতে লাগল এবং তার অনুপস্থিতির কারণ জানতে চায়ল। শিয়াল বলল জনাব! আপনার জন্য আমি ঐষধ খুঁজতে ছিলাম। বাঘ বলল ঐষধ

কি পেলে? সে বলল হায়েনার পায়ের গোছাতে শষ্য দানার মত একটি জিনিষ আছে। তাই আপনার উপকারে আসবে। আর তা আপনি নিজে বের করতে হবে। বাঘ একথা শুনে তৎক্ষনাৎ হায়েনার গোড়ালিতে তার থাবা বসিয়ে দিল। এবং তাকে রক্তাক্ত করে দিল। এমতাবস্থায় শিয়াল সেখান থেকে চুপে চুপে সরে পড়ল। এরপর হায়েনা সেই শিয়ালের পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিল। তখনও রক্ত ঝরছিল। শিয়াল তখন তাকে বিদ্রুপ করে বল্ল। ওহে লাল মৌজাধারী! বাদশাহর সম্মুখে বসলে চিন্তা ভাবনা করো যে তোমার মগজ থেকে কি বের হচ্ছে।

আবু নাঈম বলেন, ইমাম শা'বীর উদ্দেশ্য হল-এ ঘটনা বর্ণনা করে শুধু দৃষ্টান্ত দেয়া এবং লোকদিগকে সাবধান করে যিহবা সংযত রাখা, চরিত্রকে সংশোধন করা, সজ্জিত ও গোছালো শিষ্ঠাচারের প্রতি তাকিদ ও জোর দেয়া।

এ ব্যাপারে কবিতা হল-

احفظ لسانك لا تقول فتبتلى:: ان البلاء موكل بالمنطق

"তুমি নিজের জিহবাকে সংযত রাখ। যদি চিন্তা ভাবনা না করে কথা বল তাহলে বিপদে বড়বে। সাধারণত কথা বলার কারণেই বিপদ আসে।

হাদীছ শরীকে শৃগালের আলোচনা ঃ

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) হযরত আবু হোরায়রা (রাহ.) থেকে বর্ণনা করে বলেন, নবী করিম (স.) মোরগের মত তিন ঠোকর দেয়া, কুকুরের মত বসা এবং শিয়ালের মত দৃষ্টি বিনিময় করতে আমাদেরকে নিষেধ করেছেন। ইমাম শা'বীর কাছে কেহ জিজ্ঞেস করল- কাজী শুরাইহকে শিয়ালের চেয়ে চালাক কেন বলা হয়? এর কারণ কি? তিনি বল্লেন- প্লেগ রোগের বছর শুরাইহ ইরাকের নাজাফে চলে গিয়েছিলেন। তিনি যখন নামাজে দাড়াতেন তখন এক শিয়াল এসে তার সামনে দাড়াত। তার মত উঠাবসা করত (অর্থাৎ মনে হত শিয়ালটিও নামায পড়ছে) এবং সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করত। শিয়ালটি নামাজ থেকে তাকে এদিক সেদিক ফিরিয়ে দিত। বেশ কিছুদিন যখন এরকম করতে ছিল তখন তিনি তার গায়ের জামা খুলে একটি মোটা কাষ্ঠ খন্ডকে পরিধান

করালেন এবং জামার হাত বের করে দিয়ে তার টুপি সে কাষ্ঠ খন্ডকে পরালেন শিয়ালটি নিয়ম মত আজও আসল এবং সম্মুখে দাড়িয়ে গেল আর তার কাজ সে করতে আরম্ভ করল। তখন ওবাইহ চুপি চুপি তার পেছনে চলে গেলেন এবং হঠাৎ করে তাকে ধরে ফেললেন। এ কারণে তাকে বলা হয়- "শিয়ালের চেয়েও চালাক"।

শিয়াল এবং বিড়ালের চিৎকারের জন্য ضغايضغوا وضغاء আসে। বলা হয়ে থাকে ضغا الثعلب او السنور يضغوا ضغوا وضغاء অর্থাৎ শিয়াল ও বিড়ালের চিৎকার । তাছাড়া প্রতিটি মজলুম এবং গজবে নিপতিত ব্যক্তির আওয়াজের চিৎকারকে এ ধরনের শব্দ ব্যবহার করা হয়।

ইমাম ছালবী শ্রেষ্ঠ সংকলক ও লিখক উচুমানের সাহিত্যিক ছিলেন। আল্লামা আবু মানসুর আব্দুল মালেক ইবনে মুহাম্মদ নিশাপুরী (আ.) এর উপাধি ছিল ثعالبی তার সুপ্রসিদ্ধ রচনাবলির মধ্যে يتيمة اللغة فقه القلوب يمار ইত্যাদি। الدهرفی محاسن لهل العصر

ثعالبی শিয়ালের চামড়া সেলাইয়ের দিকে সম্পর্ক করেকলা হয়- কেননা তিনি শিয়ালের চামড়া সেলাই করতেন এবং এর দ্বারা অর্থ প্রয়োজন পুরা করতেন। এজন্য এর দিকে সম্পর্ক করে তাকে ثعالبی বলা হয় থাকে। তার রচনা يتيمة الدهر গ্রন্থখানি অন্যান্য রচন থেকে শ্রেষ্ঠ। এই কিতাবের সম্পর্কে আবুল ফাতাহ ইস্কান্দরী নিম্নের কবিতা বলেছেন

ابيات اشعار اليتيمة:: ابكار الفكار قديمة

"ইয়াতিমাতুদদাহর এর কবিতা প্রাক্তন ও নতুন দর্শনের প্রমিক।

ملتؤاو عاشت بعدهم:: فلذلك سميت اليتيمة

"মানুষ উঠে গেল কিন্তু সে অবশ্যও রয়ে গেল আর একারণেই তার নাম ইয়াতিমা রাখা হয়। "

يا سيد ابا المكر مات ارتدى:: وانتعل العيوق والفرقد

জনাব আলী! বদান্যতা ও সম্মান এবং কল্যানের চাদর পরিধান করেছেন। উয়ূক তারকার মুপড়ী জুতা পরিধান করেছেন।

مالك لاتجرى عليمقتضى::مودة طال عليها المدى

তোমার কি হল যে তুমি তার ভালবাসার প্রয়োজনে মুখাপেক্ষী হয়ে অনুগমন করনা? যার ভালবাসার আকাংখা অনেক দীর্ঘ হয়।

ان غبت لم يطلب وهذا سليمان :: بن داؤد بنى الهدى

যদি তুমি আমাদের কাছ থেকে অদৃশ্য হয়ে যাও তাহলে আমরা তোমাকে তালাশ করবনা। কেননা সুলাইমান ইবনে দাউদ (আ.) সত্য নবী।

تفقد الطير على شغله:: فقال مالى لاارى الهدهدى

যারা তাদের ব্যস্ততার কারণে পক্ষকুল অন্বেষণ করল এবং বল্ল যে, কি আশ্চর্য আমি হুদহুদ পাখী দেখি নাই।

تديت مسافرار كب الفيانى :: فاثرنى مماسنة السفار

এমন এক মুছাফিরের আমার প্রাণ উৎসর্গ যে রওয়ানা হচ্ছে সীমাহীন মরুভূমিতে, তখন তার চুলে ভ্রমন চিহ্ন ধুলা বালির মওজুদ।

فمسك ورد خديه السوافى :: وعبر مسك صدغيه الغبار

অতঃপর মোশাক তার পরিস্কার গন্ডদেশে মওজুদ আর মেশকের ধুলাবালি তা কন্যা বরণে বিদ্যমান।

শরয়ী বিধান ঃ

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) একে হালাল বলেছেন। আল্লামা ইবনে ছালাহ (রহ.) বলেন যে, এর হালাল হওয়ার ব্যাপারে একটি হাদীছও নেই। কিন্তু তা হারাম হওয়ার ব্যাপারে ২টি হাদীছ রয়েছে। কিন্তু হাদীছ দ'টির সনদ দুর্বল। শাফেয়ী (রহ.) আরববাসীদের অভ্যাস এবং সাধারণ অবস্থায় তা খাওয়ার রেওয়াজের উপর বিশ্বাস করে তা খাওয়ার ব্যাপারে মত প্রকাশ করেছেন। তিনি প্রমান স্বরূপ কুরআনের আয়াত احل لكم الطيبات অনুরূপ ইমাম তাউস,

ক্বাতাদাহ ও আতা প্রমুখ মনিষীগণ তা খাওয়া হালাল বলে মত প্রকাশ করেছেন।

ইমামুল হাদীছ ওয়ালা ফিকাহ্ আল্লামা আবু সাইদ ইসমানী দারেমী (রহ.) ও একে হারাম বলেছেন। ইমাম মালেকও ইমাম আজম (রহ.) একে খাওয়া মাকরুহ্ বলেছেন- ইমাম আহমদ বিন হাম্বালের অধিকাংশ বর্ণনায় তা হারাম বলা হয়েছে। কেননা এ ও হিংস্র প্রাণীর মধ্যে গণ্য।

প্রবাদ বাক্য ঃ

ধোকাবাজ ও প্রতারকদের জন্য আরববাসীগণ বলে থাকেন هــواروع من الثعلب সে শিয়ালের চেয়েও অধিক ধোকাবাজ।

কবিও সেই অর্থেই বলেছেন-

كل خليل كنت خاللته:: لاترك الله له واضحه

"প্রত্যেক বন্ধুর সাথেই বন্ধুত্ব করেছি। আল্লাহ পাক তাতে একা চেড়ে না দিন।"

كلهم اروغ من يعلب:: وما اشبه الليلة بالبارحه

" সাকলেই শিয়ালের চেয়ে ও অধিক ধোকাবাজ, আর অদ্য রাত বিগত রাতের চেয়ে কি করে সম্পর্ক রাখে।"

দাবনভী বলেন হযরত ওমর ফারুক্ব (রা.) তখনই বল্লেন, যখন তিনি মিম্বরে দাড়িয়েছিলেন যে ব্যক্তি বলে হে আমাদের রব। তাতে অবিচল থাকে শিয়ালের মত কোন পথ অন্বেষণ না করে তখন সে কোন বর্ণনায় ثعالب ব্যতীত ثعلب এক বচন ব্যবহার করা হয়েছে।

হযরত হাসান ইবনে ছামুরাহ (রা.) বর্ণিত, নবী করিম (স.) এরশাদ ফরমান যে ব্যক্তি মৃত্যু থেকে পালায় পালায় তার দুষ্টান্ত হল- এমন শিয়াল যার কাছে যমীন সব সময় ঋণের তাগাদা দেয় আর সে পালাতে থাকে এবং দৌড়াতে থাকে।শেষ পর্যন্ত যখন সে ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ে তখন সে গর্ত্তির ভিতর প্রবেশ করে। কিন্তু যমীন যখন তাকে খুঁজতে থাকে যে আমার ঋণ, আমর ঋণ

তখন সে বের হয়ে ভাগতে থাকে এবং ভয় পেতে থাকে এমন কি তার ঘাড় ভেঙ্গে যায়, এবং মরে যায়। আরবগণ বলে থাকেন-

"فلان اذل ممن بالت علية الثعالب"

অমুক তারচেয়েও অধিক অপদস্ত, যার উপর শিয়াল মরেছে।

ادهى من ثعلب

শিয়ালের চেয়েও অধিক তৃষ্ণার্ত।

হামিদ বিন ছাওর বলেন,

الم ترما بينى وبين بن عامر :: من الردقد بالت عليه الثعالب

"তুমি আমার সে ভালবাসা দেখনি যা ছিল ইবনে আমেরের সঙ্গে নিসন্দেহে শিয়াল তার উপর পেশাব করেছে।"

واصبح صافى الودبينى وبينه:: كان لم يكن والدهر فيه عجائب

"আমার ও তার ভালবাস এমন পরিষ্কার হয়ে শেষ হয়ে গেল, মনে হয় প্রথম থেকেই ছিলনা। যুগের মধ্যে এরূপ আশ্চর্য ঘটনা ঘটেই থাকে।

চিকিৎসা ক্ষেত্রে শিয়ালের উপকারিতাঃ

শিয়ালের মাথা কবুতর থাকার স্থানে ফেলে দিলে সমস্ত কবুতর চলে যাবে। এর দাত অসুস্ত শিশুর শরীরে বেধে দিলে তার অসুখ ভাল হয়ে যাবে। স্বপ্নে ভয় পেলেও তার উপশম হবে। এর পিত্ত কোন পাগল বা মৃগী রোগীর নামে ঢেলে দিলে তার পাগলামী এবং মৃগী থাকবে না। এবং কখনো এ রোগ আর হবে না। এর গোস্ত কুষ্ঠ রোগী এবং মস্তিস্ক বিকৃত রোগীর জন্য উপকারী। এর চর্বি গলিয়ে গেঁটে বাতে মালিশ করলে দ্রুত উপশম হবে। এর পিত শিশুদের গলায় বেধে দিলে শিশুর দাত সহজে বের হবে। এর মাথার চুল ও চামড়া ঠান্ডা মেজাজের লোকদের জন্য বিশেষ ফলপ্রদ। একে আবার প্রগাঢ় করে এবং ধুনা দিয়েও ব্যবহার করা যায়। এর রক্ত যদি শিশুদের মাথায় মালিশ করা যায় টাক দূর হয়ে চুল গজাবে। কেহ যদি এর রক্ত নিজের সাথে রাখে তাহলে কারো

ধোকায় পড়বে না। তার শ্বাসনালী পিষে যদি কেহ পান করে তাহলে বায়ু রোগ দুর হয়ে যাবে। এর দাঁত যদি কোন মৃগী রোগী অথবা পাগলের শরীরে বেধে দেয়া হয় তাহলে রোগ ভাল হয়ে যাবে। পায়ের পাতার রোগে এর পায়ের পাতা শরীরে বেধে রাখলে সত্বরই আরোগ্য লাভ করবে।

হারমাছ বলেন, কেউ যদি তার কলিজা হাতে রাখে তাহলে সে কুকুরকে তো ভয় পাবেই না এমন কি কুকুরও তাকে আক্রমন করবে না । এর কান যদি ঘাড়ের শীর্ষে রেখে দেয় তাহলে প্রভূত উপকার সাধিত হবে। তার লিঙ্গ যদি কারো মাথা ব্যাথায় ব্যবহার করে তাহলে মাথ ব্যথা ভাল হয়ে যাবে। এর পিত্ত যদি স্বর্ণে মিশ্রিত করে তাহলে স্বর্ণের রং পিতলের মত হয়ে যাবে। কানের পাশের কোঁড়ায় তার অন্ডকোষ ঘসলে আস্তে আস্তে কোড়া মিশে যাবে।পায়ে বহেরা রোগী যদি রে সামান্য কলিজা পানির সহিত মিশিয়ে অতি সামান্য পান করে তাহলে কোন কষ্ট ব্যতীতই এ রোগ ভাল হয়ে যাবে। এর চর্বি যদি হাতে পায়ের তালুতে মালিশ করে তাহলে সর্দির প্রকোপ থেকে রক্ষা পাবে। এর মগজ যদি দরস নামক ঘাসে মিশ্রিত করে মাথায় ব্যবহার করে তাহলে মাথার খুশকী ও টাক দূর হবে। চুল পড়ার সমস্যা ও দূর হবে। যে শিশু রাতে ভয় পায় ও কাঁদে তার শরীরে বাধলেও এ সমস্যার সমাধান হবে। এর চর্বি যে কোন স্থানে মালিশ করলে উইপোকা যেখানেই থাকুক না কেন সেখানে এসে একত্রিত হবে। এর অন্ডকোষ শুকিয়ে পিষে এক দেরহাম পরিমান পান করলে যৌন শক্তি বৃদ্ধি পাবে। এর লেজ পিষে যাফরানের পানিতে মিশ্রিত করে লজ্জানের ছিদ্রে ব্যবহার করলে যৌন ক্ষমতা অতিশয় বৃদ্ধি পাবে। যতক্ষণ ইচ্ছা সে সহবাস করতে পারবে। كتاب الايمان এ উল্লেখ রয়েছে যে- তুমি শিয়ালের চর্বি না পাও তাহলে ভেড়ার চর্বি দিয়েই কাজ চালাবে।

স্বপ্নের ব্যাখ্যা ঃ

কেউ যদি স্বপ্নে দেখে যে সে শিয়ালের সহিত কৌতুক করছে এবং তার সাথে খেলা করছে, তাহলে এর তাবীর হবে যে তার বিবাহ এমন মহিলার সহিত

হবে যে তাকে আশাতীত ভালবাসবে। কোন কোন ব্যাখ্যা কারক বলেছেন- কেহ্ শিয়াল দেখলে সে ধোকাবাজের খপ্পরে পড়ে যাবে। কেহ স্বপ্নে দেখল যে সে শিয়ালের সহিত ঝগড়া করছে তাহলে এর ব্যাখ্যা হবে যে স্বপ্ন দ্রষ্টা তার ঋণ দাতার সহিত ঝগড়া করবে। স্বপ্নে এর গোস্ত খেতে দেখলে- গোস্ত ভক্ষক কোন উপকারী খাদ্য খেয়ে ক্ষতির সম্মুখীন হরেও পরে ঠিক হয়ে যাবে। কেহ্ কেহ্ বলেছেন এ ধরনের স্বপ্ন দেখলে বাদশাহর পক্ষ থেকে তার নিকট কোন দুশমন আসবে। ইহুদীরা এই স্বপ্নের ব্যাখ্যায় বলে যে, সে কোন গনক অথবা কোন ডাক্তারের কাছে পৌছবে। নাছারারা বলে যে, স্বপ্নে শিয়ালকে চুম্বন করলে এ ধরনের স্বপ্নের ব্যাখ্যা হল অচিরে তার একজন অতি সুন্দরী স্ত্রী মিলবে। স্বপ্নে কেহ দেখন যে, সে শিয়ালকে হত্যা করেছে- তাহলে ব্যাখ্যা হবে সে কোন ভদ্র ঘরের সন্তানকে হত্যা করবে। স্বপ্নে কেহ এর দুধ পান করলে ব্যাখ্যা হবে সে অচিরেই রোগ মুক্তি লাভ করে সুস্থ হবে।স্বপ্নে শিয়ালের সহিত ঝগড়া করলে সে তার বন্ধু বান্ধব ও নিকটাত্মীয়ের সহিত ঝগড়া করার লক্ষন।

ثفا

(১২৬) বুনের বিড়াল

বন্য বিড়াল শিয়ালের সাথে মিলে মিশে বসবাস করে। এটি দেখতে পোষ্য বিড়ালের মতই হয়। এর বিস্তারিত আলোচনা السين। অধ্যায়ে আসবে।

ثقلان

(১২৭) মানব দানব

ثـقـل অর্থ ভারী এবং ঘনত্ব, পুরত্ব ইত্যাদি হয়ে থাকে। মানুষ ও জ্বিনকে ثقلان(দ্বি বচন) বলা হয়।

নাম করণের কারণ ঃ

যেহেতু এদুটিপ্রাণী পৃথিবীতেই হালকা ও ভারী হয় সে এদুটিকে ثقلان বলা হয়। কেউ কেউ বলেছেন যে, এদের মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রেখে তা বলা হয়েছে। এদের মান মর্যাদার কারণে ثـقـلان বলা হয়েছে। কোননা আরবীরা

প্রত্যেক ভদকেই ثـقـيـل বলে। কেহ বলেছেন- কোননা এরা পাপ করবে তাই এদেরকে ثقلان বলা হয়।

ثلج

(১২৮) ঈগল

এর আলোচনা عقاب ঈগল অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে।

ثنى

(১২৯) দুই বছরের প্রাণী

ثـنـى বলা হয় এমন প্রত্যেক প্রাণীকে যাদের সামনের বিষ দাত পড়ে গেছে। আর এমন ভাবে ফেটে গিয়েছে যার তৃতীয় বছর এবং বড় দাত বিশিষ্ট প্রাণী প্রাণী ছয় বছরে হয়।

ثور

(১৩০) বলদ

ثـور বলদকে বলা হয়। এর উপনামابـوعـجـل "বাছুরের পিতা"। স্ত্রী লিঙ্গ তথা গাভীর বেলায় ثـورة ব্যবহৃত হয়। এর বহুবচন وثـيـرة.وثـيـران ثـورة. ইত্যাদি। নাহ্ শাস্ত্রের ইমাম সীবোয়ায়হ বলেন, ثـيـرة যে ثـور এর বহুবচন হতে ث এর পরে واؤ কে يـاء দ্বারা বদল করা হয়েছে যে, তা যের এর পরে ছিল। আর يـاء যের এর অনুকুল অক্ষর। واؤ চায় পেশ। কারণ ثـور অর্থ ফেঁটে ফেলা এবং যমীন কর্ষন করা। যেহেতু সে যমীনকে ফেটে ফেলে এবং কর্ষণ করে সে কারণে একে ثور বলা হয়। بقرة এরও একই অর্থ।

পশুদের পারস্পরিক মমতা ও ঘনিষ্টতা ঃ

হযরত আবুদ্দারদা (রা.) একদা দেখলেন যে, দুটি বলদ একই রশিতে বাধা রয়েছে এবং এর দ্বারা চাষের কাজ করা হচ্ছে। এদের একটি যখন তার শরীর আচড়াতে থাকে তখন দ্বিতীয়টিও তাই করতে থাকে। তা দেখে আবু

দারদা (রা.) কাঁদতে শুরু করলেন। বলতে লাগলেন আসলে এ দুটি বলদ পরস্পর ভাই ভাই। তাদের ভ্রাতৃত্ব শুধু আল্লাহর উদ্দেশ্যেই। এদের একটি যখন থেমে যায় তখন অপরটি তাই করে। তারা একনিষ্টভাবে তাদের একাত্মতা বজায় রেখে নিজ নিজ অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌছে যাচ্ছে। কেউ যদি তার ভাইয়ের অধিকারের প্রতি আন্তরিক না হয় তাহলে সে নিঃসন্দেহে মোনাফিক। তিনি ইখলাস এর গুনাগুন বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন- আন্তরিকতার নাম হল উপস্থিত মুহূর্তে মুখ ও অন্তর এক হওয়া।

একটি বর্ণনা ঃ

ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ (রা.) বলেন, আল্লাহ পাক যখন যমীনকে সৃষ্টি করলেন তখন যমনি নৌকার মত ভাসতে, দুলতে থাকে এবং এদিক সেদিক নড়াছড়া করতে থাকে। আল্লাহ পাক তাকে স্থির করার জন্য একজন বিরাট ও শক্তিশালী ফেরেস্তা বানালেন এবং তাকে আদেশ করলেন যে, এর নীচে গিয়ে একে তোমার কাধে উঠিয়ে নাও। তিনি তাই করলেন। ফেরেস্তা নৌকা প্রতিম জগতটা কাধে উঠিয়ে তার এক হাত পূর্বে ও অপর হাত পশ্চিম দিকে বের করে উভয় পাশে জড়িয়ে ধরলেন। কিন্তু জগতের ভারে তার পায়ে ঝিঝি ধরল এবং সে কাঁপতে আরম্ভ করল। আল্লাহ পাক তাকে স্থিতিশীল করার জন্য লাল ইয়াকুতের এক বিরাট মরুভূমি সৃষ্টি করলেন। যার মাঝখানে সাত হাজার ছিদ্র ছিল। আর প্রত্যেক ছিদ্র দিয়ে একেকটি বৃহৎ বৃহৎ সাগর প্রবাহিত হতে লাগল। যার দৈর্ঘ্য প্রস্তের হিসবা একমাত্র আল্লাহই ভাল জানেন। সমুদ্রকে সে ফেরেস্তার উভয় পায়ের ফাক দিয়ে প্রবেশের আদেশ করলেন। আদেশ অনুযায়ী সে প্রবেশ করল। কিন্তু আবার সে লাল ইয়াকুত পাথরের ভারে তার পায়ে ঝিঝি ধরলে কাঁপতে আরম্ভ করল এবং সে স্থির থাকতে পারছিল না। তখন আল্লাহ পাক তাকে স্থিতিশীল করার জন্য একটি বিরাট বলদ তৈরী করলেন। তার নাক, কান, জিহবা, পা ইত্যাদি সবই ছিল। তার এক পা থেকে অপর পায়ের দুরত্ব ছিল ৫০০শত বছরের রাস্তা। এবার আল্লাহ পাক সে বলদকে নির্দেশ দিলেন ঐ

পাথরটি তার পিঠে উঠানোর জন্য । নির্দেশ মতে বলদটি পাথরের নীচে গিয়ে তার পিঠে উঠিয়ে নিল। বলটির নাম 'কিউছা'। কিন্তু এ বলদের পায়ে ঝিঝি আসায় সে কাপতে আরম্ভ করল। সে স্থিত থাকতে পারছিল না। তখন আল্লাহ পাক এর জন্য একটি প্রকান্ড মাছ সৃষ্টি করলেন। তার বিশালতা ও চোখের জ্যোতির কারণে মানুষ তার প্রতি দৃষ্টি দেয়া সম্ভব হতনা। বলা হয়ে থাকে জগতের সব সমুদ্রকে যদি সে মাছটির নাকের একটি ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করানোর হয় তাহলে অবস্থা এমন হবে যে, একটি সীমাহীন মাঠের মধ্যে একটি রাই সরিষার মত। আল্লাহ পাক বলদটির স্থিতিশীলতার জন্য মাছটি তৈরী করলেন। মাছটির নাম 'বাছমোত' । মাছের আবাসস্থল বানালেন পানি, পানির নীচে বাতাস, আবার বাতাসের নীচে পানি। অতঃপর পানির নীচে অন্ধকার। আর সে অন্ধকারের নীচে কি তা একমাত্র আল্লাহ পাকই ভাল জানেন। ইতিভূর্বে বান্দার জ্ঞানের তীক্ষ্নতা ছিল না আর আল্লাহ পাক তার বান্দাদেরকে এর জ্ঞান ও দান করেননি। (মাছালিকুল আবছার ফি মুখালিকুল আমছার ২৩ খন্ড)

জান্নাতের খাদ্য ঃ

হযরত ছাওবান (রা.) থেকে বর্ণিত যে, বেহেস্তবাসীরা যখন বেহেস্ত প্রবেশ করবে তখন এদর জন্য বেহেস্তের এমন একটি বলদ জবাই করা হবে যাকে বেহেস্তের আশপাশে চরানো হত। তাছাড়া বেহেস্তীগণ মাছের কলিজার সে ছোট একটি টুকরাও খাবেন যা কলিজার পাশেই তা হয়ে থাকে।

হযরত ইবনে ইছহাকের ছহীহ বর্ণনা মতে শহীদগণ যখন বেহেস্তে প্রবেশ করবেন তখন বেহেস্তের মাছ ও বলদ তাদের দুপুরের খাবারের জন্য বের হয়ে আসবে। তারা পরস্পর খেলতে থাকবে। এ দুটি প্রাণী যখন বেহেস্তীগণের ভাল লেগে যাবে তখন বলদ তার শিং দ্বারা মাছটিকে আক্রমন করবে। মাছটিকে সে এমনভাবে টুকরা টুকরা করে ফেলবে যেন বেহেস্তীগণই একে টুকরা করেছেন। সন্ধার খাবারের জন্য আবার সবাই ফিরে আসবে এবং তারা খেলতে থাকবে। খেলতে খেলতে এক সময় মাছটি তার লেজের সাহায্যে বলদটিকে

এমন ভাবে ছিড়ে ফেড়ে তৈরী করে দেবে যেন বেহেস্তীরাই একে জবাই করেছে।

আল্লামা সোহাইলী বলেন, এ হাদীছে কয়েকটি বস্তুর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। যখন এই যমীনের স্থিরতা একটি মাছের উপর যা আহারযোগ্য। এদিকেই সাধারণ লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করা এবং অনুভূতি সৃষ্টি করা যে, এ স্থান এবং জগত ধ্বংসশীল। এ স্থানটি একটি মাত্র আকস্মিক স্থান। যার দুর্গ ধ্বংসশীল এস্থান সবসময় থাকার নয়। আর যখনই বেহেস্তে প্রবেশ করবে তখনই জবাই করা হবে। আর বেহেস্তীরা এর কলিজা খাবে। তখন তারা ধ্বংস প্রাপ্ত স্থান থেকে বের হয়ে এমন এক স্থানে পৌছে যাবে যেখানে সার্বক্ষনিক থাকা যাবে। আর এরই দিকে ঈঙ্গিত করার জন্য পুলছিরাতে বেহেস্তীদের জন্য নীল রং বিশিষ্ট ভেড়া জবাই করা হবে। তাহলে সে বুঝে যাবে এবং জেনে যাবে যে, এরপর তার আর কোন মৃত্যু নেই। নেই কোন ধ্বংস। এখন রইল বলদের কথা। যেহেতু বলদ কৃষি কর্ম করার উপকরন, আর যেহেতু জগদ্বাসীর নিকট দুই ধরনের স্বভাব রয়েছে, ইহ জগতের ও পর জগতের সেহেতু একে জবাই করে দেয়ায় সেই দিকে ইঙ্গিত করা যে, সে এখন কৃষ্টি কর্মের কষ্টশিষ্ট থেকে বেচে গেল। এখন শুধু তার শান্তিই শান্তি।

চন্দ্র সূর্য বলদ প্রতিম ঃ

হযরত আবু হেরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম (স.) এরশাদ করেন, চন্দ্র সূর্যকে কিয়ামতের দিন আলোহীন করে দেয়া হবে।(বুখারী) হাফেজ ইবনে হাজর (রহ.) এই হাদিসটি আবু বকর বাযযার এর উদ্ধৃতি দিয়ে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন দানাজ বলেন যে, হযরত খালিদ বিন কুশাইরী (রহ.) এর যুগে আমি আবু সালমা ইবনে আব্দুর রহমান হতে কুফার মসজিদের এভাবে শুনেছি যে হযরত হাসান (রা.) আগমন করলেন এবং তাঁর পাশে বসে গেলাম। তখন তিনি (হাসান) হযরত আবু হোরায়রা (রা.) এর বরাতে এ ভাবে বলেছেন। "নবী করিম (স.) এরশাদ ফরমান চন্দ্র সূর্য জাহান্নামের বলদের আকৃতিতে হবে। এতে হযরত হাসান (রা.) জিজ্ঞেস

করলেন এদের অপরাধ কি? অর্থাৎ কোন পাপে এরা জাহান্নামে যাবে? তখন আবু সালমা বলেন, আমিতো হাদীছ বর্ণনা করছি আর তুমি এর কি পাপ বলছ।

ইমাম বাযযার বলেন, হাদীছটি আবু হোরায়রা (স.) থেকে শুধু এভাবে বর্ণিত এবং আব্দুল্লাহ দানাজ আবু সালমা থেকে তা ছাড়া আর কোন হাদীস বর্ণনা করেননি। হযরত আনাস থেকে বীর্ণত যে, নবী করিম (স.) এরশাদ ফরমান, চন্দ্র সূর্য জাহান্নামে চিন্তিত বলদের মত হবে। হযরত কাব আহবার (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন কিয়ামতের দিন চন্দ্র সূর্যকে চিন্তিত, ভীত বলদের মত উঠানো হবে। এদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তখন এদের ইবাদত যারা করত তারা দেখতে থাকবে। যেমন আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন. "তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদের ইবাদত করতে তারা জাহান্নামের ইন্ধন:"

হযরত আনাস বিন মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম (স.) এরশাদ ফরমান চন্দ্র, সূর্য জাহান্নামে দুটি ভীত বলদ হবে।(আবু দাউদ)

নেহায়াতুল গারীবে আছে যে, চন্দ্র সূর্যকে তাদের চাল চলনের কারণে, আল্লাহ পাক বলেন: كل فى فلك يسبحون (সবাই নভোমন্ডলের সন্তর করছে) যখন সংবাদ দেয়া হল যে তারা এবং তাদের পূজারীরা জাহান্নামে যাবে, আর এ সকল পুজারীদের আযাব এ রকম হবে, সে তাদের উপর সব সময় বিজয়ী থাকত, সে ভীতির কারণে সে ভীতু বলদের মত হয়ে যাবে যার ভয় ভীতি কোন সময়ই শেষ হবে না।

কেউ বলেছেন, চন্দ্র-সূর্যকে জাহান্নামে দেয়ার কারণ হল যে, এরা দুনিয়াতে আল্লাহ ছাড়া তাদের পূজারী বানিয়ে ছিল। আর এই আযাব তাদের জন্য হবে না। কারণ এরা প্রাণহীন বস্তু। বরং এতো শুধু কাফেরদের অপমান করা এবং এদের কান্নাকাটি আরো বাড়িয়ে দেয়ার জন্যই করা হবে।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) কা'ব আহ্বারের একথা প্রত্যাখান করে বলেন-আল্লাহর সত্তা অতি পুত পবিত্র। তিনি চন্দ্র সূর্যকে শাস্তি দিবেন আল্লাহ পাক এদেরকে কিয়ামতের দিন আলোহীন করে দিবেন। যখন সে

আরশের নিকট যাবে তখন সে আল্লাহ্ পাকের নিকট সবিনয়ে আরজ করবে। হে আমাদের আপনি তো জানেন, আমাদের আনুগত্য একমাত্র আপনার উদ্দেশ্যই নিবেদিত ছিল। আর জগতে আমাদের অস্তাচল আপনার আদেশেই ছিল। তাই কাফেরদের ইবাদতের কারণে আমাদেরকে দোযখে দিবেন না । তখন আল্লাহ্ পাক বলবেন, তোমরা সত্য বলেছ। আমি নিজের উপর অত্যাবশ্যকীয় করে নিয়েছি যে, আমি সৃষ্টি করব এবং এদেরকে পূর্বতনের দিকে নিয়ে যাব। তোমাদের উভয়কেই সে জিনিষের দিকে ফিরিয়ে নেব যেখান থেকে তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছিল। আর আমি তোমাদেরকে আরশের নূর দ্বারা সৃষ্টি করেছি। তাই তোমরা সেদিকেই ফিরে যাও। তারা ফিরে যাবে এবং আরশের নূরে তারা মিশে যাবে। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ ফরমান "তিনি সেই সত্তা যিনি সৃষ্টি করেন এবং দ্বিতীয় বার ফিরিয়ে দিবেন।

সীরাতে সাইদ ইবনে যুবাইর-এ আবু নাঈম লিখেছেন- হযরত ছাঈদ বলেন যে, আল্লাহ আল্লাহ পাক হযরত আদম (আ.) এর কাছে একটি লাল রংঙ্গের বলদ প্রেরণ করেন। যার দ্বারা তিনি জমি চাষ করতেন। সে কষ্টের কারণে তার কপালে যে ঘাম বের হত তা মুছে ফেলতেন। তাই সেই কষ্ট যার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে এরশাদ ফরমান:

فلا يخرج بكما من الجنة فتسقى

হযরত আদম (আ.) প্রায় সময় হযরত হাওয়া (আ.) কে বলতেন তুমিই আমার সাথে এই আচরণ করেছ। অর্থাৎ তোমার কারণেই আমার এই কষ্ট করতে হল। এরপর হযরত আদম (আ.) এর সন্তানদের যে কেউ এই বলদ দ্বারা কাজ করে সে অবশ্যই বলে حواد خلت عليه من قبل ادم আদম (আ.) এর পূর্বেই হযরত হাওয়া সেখানে পৌছে যায়।

আরবগণগাভীকে কোন ঘাটে পানি পান করানোর জন্য নিয়ে গেলে এবং সে পানিতে ময়লা থাকায় বা পিপাসা না থাকার কারণে পানি পান না করলে সে বলদকে তারা মারতে থাকত। যাতে সে পানিতে প্রবেশ করে এবং তাকে দেখে

আবার গাভীও পানিতে প্রবেশ করে। গাভী সাধারণত বলদের অনুসরণ করে এবং তার পিছনে পিছনে চলতে থাকে। সে জন্যই আরবরা এরূপ করত।

সালিক বিন সালাকাহকে হত্যা করার পর আনাস বিন মুদরেকাহ এ বিষয়ে কবিতা বলেন-

انى وقتلى وسليكا ثم اعقله :: كالثور يضرب لما عافت البقر

আমি এবং সালিকের হত্যাকৃত এবং এর বুদ্ধিমান লোকগণ এসরূপ বলদের মত যাকে সে সময় মারা হবে যখন গাভী পানি পান করতে অনিহা প্রকাশ করবে।

বলদ সম্পর্কে প্রবাদ বাক্য ঃ

আরববগণ বলেন الثوريحمى انفه بروقه "বলদ তার শিং দ্বারা নাকের হেফাজত করে।" উদাহরণটি ঘরের চৌহদ্দির নিরাপত্তা এবং রক্ষনা বেক্ষনের জন্য বলা হয়ে থাকে।

হযরত আবু বকর (রা.) যখন নবী করিম (স.) এর সাথে মদীনায় পৌছলেন তখন তাঁর ও আমের বিন ফহিরাহ এবং বেলাল বিন রাবাহ (রা.) এর জ্বর এসে যায়। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি যখন তাদের পাশে উপস্থিত হলাম তাখন তারা সবাই একটি জায়গায় ছিলেন। আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞেস করলাম, রাত কিভাবে কেটেছে আব্বাজান? তিনি জবাব দিলেন-

كل امرئى مصبح فى الهله::والموت ادنى من شراك نعله

যে সকল লোক নিজের পরিজনদের সাথে প্রভাতে জাগে মৃত্যু তাদের জুতার বন্ধনীর চেয়েও কাছে।

فقالت انا لله وانا اليه راجعون ان ابى ليهذى

হযরত আয়েশা (রা.) বললেন, انا لله وانا اليه راجعون অসুস্থতার কারণে আব্বাজান বকাবকি করছেন। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন- আমি আবার আমের বিন ফহিরাহ (রা.) কে জিজ্ঞাসা করলাম। আপনার অবস্থা কি? তিনি এই

কবিতা পাঠ করলেন-

لقد وجدت الموت قبل ذوقه:: والمرْ باتى حتفه من فوقه

"মৃত্যুর স্বাধ পাওয়া আগেই আমি তা পেয়েছি আর মানুষের মৃত্যু ও ধ্বংস উপর থেকে আসে।"

كل امرْى مجاهل بطوقه:: كالثور يحمى انفه بروقه

সকল মানুষ নিজের ক্ষমতা, শক্তি অনুযায়ী চেষ্টা করে থাকে। যেমন গরু নিজের শিং এর মাধ্যমে নিজের নাকের রক্ষা করে। অর্থাৎ নিজের হেফাজত করে।

এতে হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, والله هذا مايدرى مايقول আল্লাহর শপথ তিন কি বলছেন, আমি তা কিছু বুঝিনা। তারপর তিনি হযরত বেলালকে বললেন আপনার রাত কিভাবে কাটল? তিনি জবাব দিলেন কবিতার মাধ্যমে:

الاليت شعرى هل ابيتن ليلة:: بفخ وحولى اذخروجليل

"হায় ফখ নামক স্থানে আমার একটি রাত অতিবাহিত হত এবং আমার আশেপাশে সবুজ ঘাষ উৎপাদন হত।

وهل اردن يوما مياه مجنة:: وهل يبدون لى شامة وطفيل

আর মহিলারা মাজনাহ বাজারের পানি কখনো আমার জন্য চেয়েছে? তারা কি আমার জন্য শামা ও ত্বোফায়ল হয়ে পাহাড়ে প্রকাশিত হবে।

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, তারপর আমি নবী করিম (স.) এর পাশে গেলাম এবং এ ঘটনা শুনালাম। তা শুনে নবী করিম (স.) এই দোয়া করেন- "হে আল্লাহ! আপনি আমাদের অন্তরে মদীনার ভালবাসা এমনভাবে ঢেলে দিন যেমনিভাবে মক্কার ভালবাসা ঢেলে দিয়েছিলেন। হে আল্লাহ্ আপনি আমাদেরকে মাপ যন্ত্রে ছা' ও মুদে বরকত দিন। আর মদীনার জ্বরকে জোহফাতে পাঠিয়ে দিন।"

হযরত আমরের (রাঃ) কথায় طـوق শব্দটি এসেছে যার অর্থ শক্তি। আর হযরত বেলাল (রা.) এর কথায় فـخ এর উল্লেখ রয়েছে। তা পবিত্র মক্কার একটি উপত্যকার নাম। আর مـجنـه পবিত্র মক্কার সমুদ্র তীরবর্তী স্থানে অবস্থিত একটি বাজারের নাম। আর شـامـه এবং طـفيـل. মাজনা বাজারের পার্শে উচু স্থানে অবস্থিত দুটি পাহাড়ের নাম। আর নবী করিম (স.) এর কথায় উল্লেখিত مهيـعة জোহযারই অন্য আরেকটি নাম।

আরবগণ বলেন ঃ هـوراعـى مـن ثور (১) সে বলদের চেয়ে অধিক বিচরন কারী।

انـمـا وكـلـت يـومـا اكل الثور الابيض (২) আমি সেদিন খেয়েছি, যেদিন সাদা বলদকে লোকমারফত বানানো হয়েছে।

হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার আর হযরত উসমানের (রা.) উদাহারণ হল এমন তিনটি বলদের মত যারা একই ঝোপে থাকে। এদের মধ্যে সাদা, একটি লাল এবং একটি কাল ছিল । আর তাদের সাথে সে ঝোপে একটি বাঘও থাকত। তারা পরস্পর মিলে মিশে থাকার কারণে কেউ কাউকে ক্ষতি করার সামর্থ রাখত না। একদিন বাঘ লাল ও সাদা বলদকে বলল, সাদা বলদের রং যেহেতু প্রসিদ্ধ (এবং দুর থেকে দেখা যায়) সেহেতু (শিকারীদেরকে) এখানে আমাদের অবস্থান জানিয়ে দেয় আমার রং তোমাদের দুজনের রং এর মতই । এজন্য তোমরা যদি আমাকে তাকে খেয়ে ফেলার জন্য দিয়ে দাও এবং তার অনুমতি নিয়ে নাও তাহলে এ ঝোপ তোমাদের দুজনের জন্যই হয়ে যাবে। দুই বলদে ঝটপট বলে দিল ঠিক আছে তাকে খেয়ে ফেল। তবে কিন্তু আমাদের উপর আক্রমন করোনা। সে তাকে খেয়ে ফেলল। বেশ কয়েকদিন পর সে লাল বলদকে বলল, তোমার আর আমার রং তো একই। তাই তুমি কাল বলদটি আমাকে দিয়ে দাও। লাল বলদ বলল আপনার যা ইচ্ছা তাই করুন। তাকেও সে নিঃশেষ করে ফেলল। কিছুদিন পরই লাল বলদকে সে বলল এখন আমি তোমাকে অবশ্যই খেয়ে ফেলব। তখন সে সময় চেয়ে আবেদন

করল যে, তুমি আমাকে তিনবার আওয়াজ করার সময় দাও। বাঘ তাকে সময় দিয়ে বল্ল ঠিক আছে আওয়াজ করে নাও তখন সে তিনবার এ আওয়াজ দিল যে, "আমিতো সেদিন খেয়ে ফেলেছিলাম যেদিন সাদা বলদকে খাওয়া হয়েছে" এরপর হযরত আলী (রা.) তার আওয়াজ উচ্চ করে বল্লেন আমিতো সেদিন দুর্বল হয়ে যাব যেদিন হযরত উসমান গনি(রা.) কে শহীদ করা হবে।

চিকিৎসা ক্ষেত্রে বলদের উপকারিতা ঃ

ষাঢ় গাভীর সাথে সহবাস করে যে মাটিতে দ্রুত পেশাব করে দেয় সে মাটি উঠয়ে যদি বিশেষ অঙ্গের ছিদ্রে ঘর্ষন করা হয় তাহলে যৌন ক্ষমতা অতিশয় বৃদ্ধি পায়। যে ব্যক্তি নিদ্রাবস্থায় পেশাব করে, সে যদি ষাড়ের বা বলদের মুত্র থলি শুকিয়ে সিরকার সাথে মিশিয়ে পান করে তহলে আর এ দোষ বিদূরিত হয়ে যায়। এ ধরনের লোকদের জন্য ঠান্ডা পানিও বেশ উপকারী।

আল্লামা দামরী (রহ.) বলেন, বলদের একটি আশ্চর্য অভ্যাস হলো যদি সে হঠাৎ দাড়িয়ে যায় তাহলে এর অন্ডকোষে ধরে চাপ দিলে তার মধ্যে এক প্রকার প্রফুল্লতা সৃষ্টি হয়। যে কারণে সে খুব দ্রুত বেগে চলতে থাকে। তার কানে যদি লোহার গোরা ঢেলে দেয়া যায় তাহলে সেখানেই সে লেজ ছিড়ে ফেলবে। তার নাকে যদি গোলাব জল দেয়া হয় তাহলে সে অতি তাড়াতাড়ি মাটিতে পড়ে যাবে। বলদের পেশাব দ্বারা যদি কোন লোহাতে লিখা হয় তাহলে লেখা জিনিষ খুবই পরিস্কার দেখা যাবে।

স্বপ্নের তাবীর ঃ

স্বপ্নে ষাড় বা বলদ দেখা এতই উপকারী যে, কোন কোন সময় অত্যন্ত শক্তিশালী ও সম্মানীত লোক হওয়ার ইঙ্গিত বহন করে। আবার কোন কোন সময় অত্যন্ত বলিষ্ট ও সুদর্শন পুরুষও হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ ষাড় বা বলদকে আরবীতে ثور বলে। ثور অর্থ তেজোদীপ্ত হওয়া। যুবকের যৌবন তার তেজোদীপ্ত যৌবনেই হয়ে থাকে। এজন্য এর ব্যাখ্যা যুবকের দিকেই ধাবিত হয়। কোন কোন সময় কোন কৃষক যদি স্বপ্নে বলদ দেখে তাহলে ব্যাখ্যা হবে যে তার

যাবতীয় কঠিন কাজ সহজ হয়ে যাবে। কোন কোন সময় অলসতা ও বিলাসিতার দিকেও ইঙ্গিত করে। চিত্রল বলদ দেখা আরাম আয়েশ ও শান্তির লক্ষন। আর কাল বলদ দেখা চুড়ান্ত বুর্যুগী ও ভদ্রতার লক্ষন।

الثول

(১৩১) পুরুষ মৌমাছি

ث বর্ণে যবর এবং واؤ বর্ণে ছাকীন পড়া হবে। সাধারণত: শব্দটি মৌমাছির জন্যই ব্যবহৃত হয়। একটি হোক বা বেশি। হযরত ইমাম আছমাঈ (রহ.) বলেন- মৌমাছির জন্য আলাদাভাবে কোন শব্দ ব্যবহার করা হয় না।

ثـــــاء বর্ণে যদি যবর পড়া হয় এবং واؤ কে ছাকীন করে এবং যদি واؤ কে যবর যোগে পড়া হয় তাহলে এ অবস্থায় অর্থ হবে পাগলী বকরী। যা তার পাগলামীর কারণে পাল থেকে পৃথক থাকে। পাহাড়ী বকরীর জন্যও এ শব্দ ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

স্বপ্নের ব্যাখ্যা ঃ

স্বপ্নে পুরুষ মৌমাছির দৃষ্টিগোচর হওয়া সুচতুর এবং ভদ্র বালক হওয়ার আলামত।

الثيتل

(১৩২) পাহাড়ী বকরী

পাহাড়ী ছাগলকে الثيتـــــل বলা হয় । পবিত্র হাদীছে এর আলোচনা এভাবে এসেছে। নবী করিম (স.) এরশাদ ফরমান فـى الثيتـل بـقـرة কেউ মুহরিম অবস্থায় পাহাড়ী ছাগল শিকার করলে শরীয়ত মত তার উপর একটি গাভী বা তার মূল্য জরিমানা দেয়া ওয়াজিব।

আল্লাহর অপার রহমতে

হায়াতুল হায়ওয়ানের প্রথম খন্ড সমাপ্ত